(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১৫শ বর্ষ—১ম খণ্ড

(ফাল্গুন ১৩২৯—শ্রাবণ ১৩৩০)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল

কলিকাতা

১৪-এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী" প্রেসে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩৩০

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

(ফাল্গুন ১৩২৯—শ্রাবণ ১৩৩০)

বিষয়-সূচী

লেখক-সূচী

ত্রিবর্ণ চিত্র

জয়পুর রমণী—যাঁতা পিষিতেছে
(চিত্রকর—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়।)

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ ১ম খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩২৯ | ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা

জগৎ-রূপ

যাহাকে আমরা বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহং প্রভৃতি নাম দিয়া থাকি, তাহাই আমাদের দেশের দর্শনবাদের মতে জ্ঞাতা বা বিষয়ী বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই। এবং যাহা জ্ঞাতা ও বিষয়ী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল, তাহা এই মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অতিরিক্ত এক "চিৎ" বা আত্মপুরুষ। সেই চিদাত্মক আত্মপুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞেয় এই বাহ্য বিশ্বরূপ নহে, তাহার সাক্ষাৎ জ্ঞেয় হইতেছে বুদ্ধি এবং বুদ্ধির 'ভাব' সকল। অতএব জ্ঞাতৃ-পুরুষের পক্ষে এই বাহ্য জগৎ-রূপ হইতেছে পরোক্ষরূপ মাত্র,—তাহা "বুদ্ধি-সচিবের" মন্ত্রণা ও বর্ণনা মাত্র। এ সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে ইহাই যদি সত্য তথ্য হয়, তবে সহজেই প্রশ্ন উপস্থিত হয়,—এই যে বিশ্বব্যাপী রূপ রসের বৃহৎ ও বিচিত্র মেলা, যাহাকে প্রতিক্ষণ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া আমরা এই জগৎ-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেছি,—তাহা বাস্তবিক পক্ষে সৎ না অসৎ? অর্থাৎ এই যে বিশ্বরূপ, ইহা শুধু আমাদের মনেরই রূপ ও কল্পনা মাত্র, না সেই মানস-রূপ ও কল্পনার অতিরিক্ত তাহাদের কোনও সত্য অস্তিত্বও আছে?

সাধারণ প্রাকৃত জনের পক্ষে, ইহা যতই অনুচিত প্রশ্ন ও অবৈধ কৌতূহল বলিয়া বিবেচিত হউক, কিন্তু কোনও দেশের, কিংবা কোনও কালের দর্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানেই এ সন্দেহ উপেক্ষিত হয় নাই। কারণ, সকল দেশের দর্শন বিদ্যাই স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে যে, জগতের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয়, তাহা আমাদের মনের মধ্য দিয়া, মনেরই নিজের ভাষায় এক পরোক্ষ পরিচয় মাত্র। স্বরূপতঃ তাহা বুদ্ধিদূত প্রমুখাৎ এক পরিজ্ঞাত সমাচার মাত্র। এবং ইহাও সকলেরই জানা আছে যে, সেই বুদ্ধিদূত কোনই অভ্রান্ত দূত নহে। সে, কখন কখনও শুক্তিকে মুক্তা বলিয়া, মরীচিকাকে জল বলিয়া এবং দূরস্থ বৃহৎ বিষয়কে ক্ষুদ্র বলিয়া, মিথ্যা সংবাদ দ্বারা আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকে। উক্তঞ্চ—

প্রাদেশমাত্রঃ পরিদৃশ্যতেঽর্কঃ
শাস্ত্রেণ সন্দর্শিতো লক্ষযোজনঃ।
মানান্তরেণ ক্বচিদেতি বাধাং
প্রত্যক্ষমপ্যত্র হি ন ব্যবস্থা ॥ *

অর্থাৎ, সূর্য্যকে প্রাদেশ-মাত্র (এক বিঘৎ) পরিমিত বলিয়া দেখায়। কিন্তু শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায় সূর্য্য লক্ষ যোজন পরিমিত। অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যক্ষ প্রমাণও প্রমাণান্তরের দ্বারা বাধিত হয়। তাহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও সত্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা বিহিত নহে।

এই সকল কারণেই কদাচিৎ, দর্শন-জগতে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে সিদ্ধ এই বাহ্য জগৎ-রূপ, সৎ না অসৎ? এবং সেই সদসতের তথ্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল সমস্ত দেশ কালের দর্শন বিদ্যার এক চিরন্তন সমস্যা। এই ভারতবর্ষীয় দর্শন বিদ্যাও এ সমস্যাকে পরিহার করিয়া চলিতে পারে নাই। এবং শুধুই পরিহার নহে,—আমরা দেখিতে পাই এই সমস্যারই উত্তুঙ্গ ও অবিচল পাষাণে প্রতিহত হইয়া, আমাদের দেশের দর্শন বিদ্যার ভাব-মন্দাকিনী ত্রিপথগামিনী হইয়াছিল। তাহাতে, যোগ ও সাংখ্য বিদ্যার আদ্যধারা পূর্ব্বগামিনী হইয়া "জগৎ-সত্যং" এই সিদ্ধান্তের সাগর-সঙ্গম প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈনাশিক ও বৌদ্ধ বাদ ইহার বিপরীত মার্গ অবলম্বনে, "জগৎ শূন্যং" এই সিদ্ধান্তকে লাভ করিয়াছিল। এবং শঙ্কর-দর্শন এক মধ্য-ধারা অবলম্বনে "জগৎ মিথ্যা" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল,—শঙ্করাচার্য্য সেই "মিথ্যাকে", সত্য এবং শূন্য হইতে ব্যতিরিক্ত, "অনির্ব্বচনীয় মায়া" নাম অভিহিত করিয়াছিলেন।

প্রাচ্য দর্শন-বিদ্যার এই ত্রি-ধারার কোনই ধারা-বাহিক সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আলোচ্য মোক্ষ-বাদের উপসংহারে এইটুকু মাত্র আমাদের জানা প্রয়োজন যে, যাঁহারা এই জগৎ-রূপকে সত্য বলিয়া মানিয়াছিলেন, তাঁহারাই কি জন্য আবার এক জগদতীত মোক্ষকেই জীবের পরম শ্রেয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন? সেই উদ্দেশ্যে, অগ্রে আমাদিগকে এই প্রবন্ধে দেখিতে হইবে, জগৎ-সত্য-বাদী কোন্ যুক্তিবলে জগৎকে মায়া ও শূন্যের মধ্যে বিলীন হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন। সেই যুক্তির প্রথম পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে—

১। বিজ্ঞান-বাদ।

যাঁহারা নাকি বলিতেন যে বাহ্য জগৎ শূন্যময়, তাঁহাদের নাম ছিল বিজ্ঞান-বাদী। Berkeley সাহেবের জন্মগ্রহণের অনেক পূর্ব্বে, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-বাদী বলিয়াছিলেন যে বহির্জ্জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, এবং যাহাকে আমরা বহির্জ্জগৎ বলিয়া ভ্রম করি, তাহা আমাদের মনেরই 'বিজ্ঞান' বা বিশেষ জ্ঞান মাত্র। প্রচীন পুঁথি-পত্র দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে পুরাতন কালের বিজ্ঞান-বাদী (Idealist) জগতের সত্য অস্তিত্বের বিরুদ্ধে দুইটি প্রধান যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তাহার প্রথমটি হইতেছে এই :—

আমরা যাহাকে "অর্থ" বা বাহ্য বিষয় বলিয়া থাকি, সেই "অর্থের" বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোনই উপলব্ধি সম্ভব নহে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারাই আমরা বিশেষ বিশেষ অর্থ ঘট পটাদিকে বিদিত হই। অর্থ সম্বন্ধে আমাদের এই যে জ্ঞান তাহা অবশ্যই বিজ্ঞানাত্মক (ideal) জ্ঞান। কিন্তু যাহাকে আমরা অর্থ বলিয়া বিদিত হই, তাহা আমাদের প্রতীতি অনুসারে, বিজ্ঞানাত্মক সত্তা নহে, তাহা অর্থাত্মক (Non ideal) সত্তা। বিজ্ঞানবাদী বলেন আমাদের এই অর্থাত্মক প্রতীতি সত্য হইতে পারে না, কারণ "যৎ বেদ্যতে যেন বেদনেন, তৎ ততো ন ভিদ্যতে, যথা, জ্ঞানস্য আত্মা—"অর্থাৎ, যাহাকে যে জ্ঞানের (বেদনের) দ্বারা বিদিত হওয়া যায়, তাহা (অর্থাৎ সেই বেদ্য বিষয়) সেই জ্ঞান হইতে ভিন্ন জাতীয় হইতে পারে না। ইহার উদাহরণ যথা, আমরা জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞানময় আত্মাকে

* সর্ব্ববেদান্তসার।

বিদিত হই। অতএব বিজ্ঞান-বাদের মতে, জ্ঞেয় কখনই জ্ঞান হইতে ভিন্ন জাতীয় বিষয় হইতে পারে না। তত্রাচ জ্ঞেয় অর্থকে আমরা যে জ্ঞান হইতে ভিন্ন জাতীয় সত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকি, সে মনে করা হইতেছে আমাদের ভ্রান্ত-বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানবাদীর দ্বিতীয় যুক্তি এই—

যখনই আমাদের কোন বিজ্ঞান হইয়া থাকে, তখনই সেই সঙ্গে আমাদের "অর্থের"ও উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সকল সময়েই যে সেই তথাকথিত বাহ্য অর্থ বিদ্যমান আছে, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। যেমন স্বপ্নাদি কালেও আমাদের বাহ্য অর্থ জ্ঞান হয়, কিন্তু এ কথা কেহই বলিতে পারেন না যে স্বপ্নদৃষ্ট হাতী ঘোড়াও যথার্থপক্ষে বিদ্যমান আছে। অতএব বিজ্ঞানবাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

> সহোপলম্ভ-নিয়মাৎ অভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
> ভেদস্তু ভ্রান্তি-বিজ্ঞানং দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে। (১)

অর্থাৎ (বাহ্য বস্তু থাকুক আর নাই থাকুক) বাহ্য অর্থের সহ উপলব্ধিই আমাদের প্রত্যেক বিজ্ঞানাত্মক উপলব্ধির নিয়ম। তাহাতে বাহ্য নীলরূপ যে অর্থ, তাহা নীলবুদ্ধি হইতে ভিন্ন, ইহা বলা যায় না। কারণ, তথা কথিত নীল অর্থ হইতেছে নীল বিজ্ঞানেরই অঙ্গীভূত অংশ। তথাপি বহিঃস্থ নীল অর্থকে আমরা যে নীল বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করি, সে উপলব্ধি হইতেছে এক চন্দ্রকে দুই চন্দ্র রূপে উপলব্ধি করার ন্যায় ভ্রান্ত উপলব্ধি।

এই দুইটি যুক্তির মর্ম্মানুসারে বিজ্ঞানবাদ বলিতে বলিতে চাহিয়াছেন, বাহ্য অর্থ বলিয়া কিছুই নাই এবং বাহ্য জগৎ হইতেছে শূন্যময়। যাহাকে আমরা বহির্জ্জগৎ বলিয়া অনুভব করি, তাহা আমাদের "বিজ্ঞানেরই পরিকল্পনা" মাত্র।

(১) যোগসূত্রের (৪।১৪) ব্যাসভাষ্য ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রধৃত বিজ্ঞানবাদের পূর্ব্বপক্ষ। শঙ্কর ও সায়ন উভয়েই এই যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

২। বিজ্ঞানবাদের উত্তরপক্ষ।

বিজ্ঞানবাদের এই যুক্তি-তন্ত্রকে সাংখ্য ও বেদান্ত দুই বিপরীত দিক্ হইতে তির্য্যক্ ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। কারণ জগৎ শূন্যবাদ হইতেছে—মায়াবাদ ও জগৎ সত্যবাদ উভয় বাদেরই বিরোধী। বেদান্ত দর্শন বলিয়াছেন—"ন বৈধর্ম্ম্যাচ্চ স্বপ্নাদিবৎ" (২।২।২৯)। —অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী স্বপ্নাদিকালের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, বাহ্য অর্থ আছে বলিয়াই বাহ্য অর্থের উপলব্ধি হয় না—অর্থসহ উপলব্ধিই প্রত্যেক বিজ্ঞানাত্মক উপলব্ধির নিয়ম বলিয়া বাহ্য অর্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। উত্তরে বেদান্তদর্শন বলিতেছেন, বিজ্ঞানবাদীর এই স্বপ্নাদি কালের দৃষ্টান্ত ব্যর্থ দৃষ্টান্ত। কারণ, স্বপ্নজ্ঞান ও জাগরিত জ্ঞানের ধর্ম্ম এক নহে। স্বপ্ন জ্ঞান হইতেছে জাগরিত জ্ঞানের দ্বারা বাধিত জ্ঞান। কিন্তু জাগরিত জ্ঞানের কোন বাধক জ্ঞান নাই। দ্বিতীয়তঃ জাগ্রত অবস্থায় আমাদের যে অর্থ জ্ঞান হয়, তাহার স্মৃতিই স্বপ্ন জ্ঞানের কারণ। সেই জন্য বাহ্য অর্থ ব্যতিরেকেও স্বপ্নকালে বাহ্য অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে অর্থ সহ উপলব্ধিই সকল উপলব্ধির নিয়ম।

এতৎ প্রসঙ্গে, বিজ্ঞানবাদের উদ্দেশে, যোগভাষ্যে (৪।২৪) ব্যাস বলিয়াছেন "বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান আমাদের কোনই বাসনা বশে উৎপন্ন হয় না। ইচ্ছা করিলেই কেহ ঘট দেখিতে পায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষে প্রত্যুপস্থিত বিষয় সকল নিজের মাহাত্ম্যবলে, এবং বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য বলে নহে, বাহ্য জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব বাহ্য সত্তা নাই, ইহা প্রমাণিত হয় না।"

ইহার পরে, বিজ্ঞানবাদের অবশিষ্ট তর্ক এই থাকে, জ্ঞেয় সত্তা জ্ঞান হইতে ভিন্ন জাতীয় হইতে পারে কি না? অর্থাৎ Berkeley সাহেবের ভাষায় বিজ্ঞানবাদীর অবশিষ্ট তর্ক এই দাঁড়ায়—How can that which is insensible be like that which is sensible?*

* Dialogue p. 56

(যাহা অচেতন তাহা কিরূপে অচেতনাকারেও প্রতিভাসমান হইতে পারে ?)

এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য বলিয়াছেন—"ন বিজ্ঞান মাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ" (১।৪২) * অর্থাৎ পদার্থ সকল যদি বিজ্ঞানমাত্র হয় তবে তাহাদের পক্ষে বাহ্যরূপে প্রতীত হওয়া সম্ভব নহে। কেন সম্ভব নহে তাহা বাচস্পতি মিশ্র যোগ ব্যাখ্যায় (৪।১৪) বিশদ ভাবে দেখাইয়াছেন। বাহ্য প্রতীতি বলিতে বিজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন প্রদেশে সত্তার অবস্থিতি বুঝাইয়া থাকে। এই বহ্য প্রতীতি যদি বিজ্ঞানেরই ধর্ম্ম হয়, তবে সেই ধর্ম্মের বিজ্ঞানাত্মক উপলব্ধি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ একই বিজ্ঞান বহিঃপ্রদেশস্থিত ও অন্তঃপ্রদেশস্থিত বিরুদ্ধ প্রতীতির দ্বারা কখনই সঙ্গত বিজ্ঞান হইতে পারে না।"—এই যুক্তির মর্ম্ম পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিলে দেখিতে পাইবেন, Berkeley সাহেব যেমন বলিয়াছেন, অচেতন সত্তা কখনই চেতনাকারে প্রতিভাসমান হইতে পারে না, তেমনি পাল্টা আমরাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি, বিজ্ঞানবাদের মতে চেতনসত্তা মন এই যে অচেতন বহিঃসত্তারূপেও প্রতীতিযোগ্য হইয়াছে, তাহাই বা মনের কোন্ ধর্ম্মানুসারে সম্ভব হইয়াছে ?

কিন্তু বিজ্ঞানবাদী প্রাচীন দার্শনিক, ইহা হইতেও গভীরতর প্রদেশে অবগাহন করিয়া পদার্থ সত্তার মূলোচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, পদার্থবাদীর স্বকৃত স্বীকার অনুসারেই পদার্থ সত্তা আমাদের মনের কল্পনা মাত্র হইতে বাধ্য, কারণ পদার্থবাদীর মতে এই গবাদি ও ঘটাদি অর্থই চরম (ultimate) অর্থ নহে। তাঁহার মতে এই গবাদি ও ঘটাদি পদার্থের "অন্ত্য ও অবিভাজ্য" অবয়ব, পরমাণু (কিম্বা দ্ব্যণুক) সকলই হইতেছে পরম অর্থ। অর্থাৎ পদার্থবাদীর মতে ঘটরূপ অবয়বী পদার্থ হইতেছে অণু অবয়বের সমষ্টি মাত্র। এবং পদার্থবাদী বলেন যে সেই সকল অণু অবয়বের "গুণ"ও পৃথক। অতএব তাঁহার মতে, অবয়বী অর্থকে সত্যরূপে প্রতীত হইতে হইলে তাহাকে অণুপুঞ্জ এবং সমবেত অণুগণরূপেই প্রতীত হওয়া উচিত, এটি ঘট, এটি গরু এইরূপে প্রতীত হওয়া উচিত নহে। এবং এই গরু কিংবা ঘটের প্রতীতি যদি কোন সত্য অর্থের প্রতীতি হয়, তবে সে অর্থ আমাদের মনের কল্পনা ছাড়া অন্য কি হইতে পারে ?

বিজ্ঞানবাদের এই সুদূর অবগাহী যুক্তি, বিশেষ ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল যোগপন্থিগণকে। কারণ, যোগমতে যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎ ফল হইতেছে—যথা-অর্থ বা যথা-বস্তু জ্ঞান। বস্তুবিষয়ক এই পরিশুদ্ধ জ্ঞানের যোগশাস্ত্রে নাম হইয়াছিল "নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি।" এখন এই নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি ও যথাবস্তুজ্ঞান যদি পরমাণু-জ্ঞান মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তবে যোগীর পক্ষে এ ঘট-পটাদিময় জগৎ একেবারেই অসৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু আমরা জানি যে যোগীর জগতেও এ সব তুচ্ছ জিনিসের স্থান আছে।

অতএব কোন এক প্রাচীনতম যোগাচার্য্য বাহ্য পদার্থের সত্য স্বরূপ অবধারণ-কল্পে সূত্র রচনা করিয়াছিলেন "এক বুদ্ধ্যুপক্রমঃ হি অর্থাত্মা, অণুপ্রচয় বিশেষাত্মা গবাদির্বা ঘটাদির্বা লোকঃ।" * এই সূত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই। যথাবস্তু জ্ঞান যাহারা লাভ করেন, তাঁহারা দেখিতে পান যে এই গবাদি ও ঘটাদি লোক, অণু সকলের সংস্থান বিশেষ বটে, সেই জন্য তাহারা অণুপুঞ্জ বিশেষাত্মক। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও দেখিতে পান যে সেই সকল অণুপুঞ্জকে ব্যাপিয়া তাহাদের এক সাধারণ ধর্ম্ম আছে যাহা সর্ব্বদাই এক বুদ্ধি বা অবয়বী বুদ্ধিকেও উৎপন্ন করিতে উপক্রমশীল হইয়াছে। সেই সাধারণ ধর্ম্মই হইতেছে বস্তুভূত অবয়বী ঘটাদি পদার্থ, এই জন্য পদার্থজ্ঞান অবস্তুক জ্ঞান নহে, তাহা অর্থাত্মক জ্ঞান।

এই জন্য পদার্থজ্ঞান মনের কল্পনামাত্র নহে।

* বেদান্তসূত্র "নাভাব উপলব্ধেঃ।" ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বিস্তৃতভাবে বিজ্ঞানবাদ আলোচনা করিয়াছেন। তাহা অবশ্য পঠিতব্য।

* ১।৪৩ ব্যাসভাষ্যে ধৃত।

এইরূপে জগৎ সত্যবাদ বিজ্ঞানবাদকে নিরস্ত্র করিয়া তাহার দ্বিতীয় প্রতিপক্ষের সংবাদ লইয়াছেন। তাহা—

৩। মায়াবাদ।

শঙ্কর-বাদ বাহ্য অর্থকে বিজ্ঞানময় এবং বাহ্য জগৎকে শূন্যময় অবশ্যই বলেন নাই। বরং আমরা দেখিতে পাই বিরোধী বিজ্ঞানবাদের অভিযানে শঙ্কর কদাচিৎ যোগ ও ও সাংখ্যের সহিত এক নৌকাতেই রণযাত্রা করিয়াছিলেন। যোগ ও সাংখ্যের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ অন্যত্র।

সে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল বাহ্য সত্তা ঘটপটাদির সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধি লইয়া। এ কথা অবশ্যই সকলে বুঝিতে পারেন যে, ঘটপটাদিকে একান্তপক্ষে সত্য হইতে হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই বিভিন্ন পদার্থ হইতে হয়। কিন্তু মায়াবাদ বলিয়াছেন, কোন প্রকার ভেদবুদ্ধিই সত্য হইতে পারে না, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "তদনন্যত্বম্" কোন পদার্থই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

ঘটপটাদি জ্ঞানের মূলীভূত প্রভেদ-জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান বলাতে মায়াবাদ যে শূন্যবাদের "সন্দিগ্ধ নৈকট্যে" সমুপস্থিত হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এবং বোধ করি সেই জন্যই সেকালে এক গুজব উঠিয়াছিল—"মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র, ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত।" কিন্তু এ গুজব, গুজব ছাড়া আর কিছুই নহে। শঙ্করের লোকোত্তর প্রতিভা, এই প্রত্যক্ষ জগৎ-রূপের এক অস্থায়ী সত্য মর্য্যাদাকে, শূন্যবাদের বুভুক্ষিত কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

তিনি বলিয়াছিলেন, এই "নামরূপে ব্যাকৃত" জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ভেদ জ্ঞান, তাহা এই ব্যবহারিক মায়াজগতে কোনই অপ্রাকৃত ভেদজ্ঞান নহে। স্বপ্ন জগতের বিষয় সকলের, স্বপ্নকাল ব্যাপিয়া, যেমন এক সাময়িক সত্যতা আছে, তেমনি এই ব্যবহার জগতের বিভিন্ন ঘটপটাদি সত্তারও মায়াকাল ব্যাপিয়া এক সাময়িক সত্যতা আছে। কিন্তু জীব যখন এই ব্যবহার জগতের মায়া নিদ্রা অবসানে, ব্রহ্ম জাগরণে জাগরিত হয়, তখন তাহার পক্ষে কোনই ঘটপটাদি ভেদ থাকে না—তাহার পক্ষে সমস্তই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" হইয়া যায়।

অতএব, শঙ্করাচার্য্যের মতে মায়াই হইতেছে এই জগৎ-ব্যবহারের মূলতত্ত্ব। তাহাই এই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপের প্রসূতি ও প্রকৃতি। এই মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে শঙ্কর শারীরক ভাষ্যে (২।২।২৪) বলিয়াছেন— "এই নামরূপে ব্যাকৃত জগৎ হইতেছে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভূত অবিদ্যাশক্তির দ্বারা কল্পিত। সেই অবিদ্যা ঈশ্বরের আত্মভূত শক্তি বলিয়া তাহা তত্ত্ব (অর্থাৎ সৎ পদার্থ)। কিন্তু ঈশ্বরের শুদ্ধ বুদ্ধ ব্রহ্ম-স্বভাব হইতে অবিদ্যা অন্য বলিয়া অবিদ্যা অতত্ত্ব (বা অসৎ পদার্থও) বটে। এইরূপে তত্ত্ব ও অতত্ত্ব বলিয়া, জগৎ প্রপঞ্চের বীজভূত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়া-শক্তি হইতেছে অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ।"

সাংখ্য ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া বলিয়াছেন, "ন তাদৃক্‌পদার্থা প্রতীতেঃ" (১।২৪)—মায়া যুগপৎ সৎ ও অসৎ বিরুদ্ধরূপ পদার্থ হইতে পারে না, কারণ তাদৃশ বিরুদ্ধরূপ পদার্থের কোনই প্রতীতি সম্ভব নহে। এবং সেই জন্য তাঁর সিদ্ধান্ত হইয়াছিল—"জগৎ-সত্যত্বম্. অদুষ্ট কারণ জন্যত্বাৎ, বাধকাভাবাৎ" (৬।৫২)।—জগতের সত্যত্বই সিদ্ধ হয়, কারণ জগৎ কোনই দুষ্ট-কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, যাহার জন্য পিত্তরোগীর হরিদ্রা-দর্শনের ন্যায় জগতের সমস্তই মিথ্যা-দর্শন হইতে বাধ হইয়াছে। এবং এই প্রপঞ্চ জগৎ-জ্ঞানের কোনই বাধক জ্ঞান নাই।

৪। চিত্তের সর্ব্বার্থতা।

এই রূপে যোগ ও সাংখ্য বিদ্যা, জগৎ সত্তাকে ব্রহ্ম-বিদহন ও বিজ্ঞান-নিমজ্জন হইতে রক্ষা করিয়া, আমাদের প্রতীতির ভিত্তির উপরই তাহার সত্যরূপকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে প্রথমে অবধারণ করিতে হইয়াছিল কোন্ কোন্ বিষয়কে অর্থ-রূপে বিদিত হওয়া আমাদের সম্ভব হইয়াছে।

অচেতন বাহ্য অর্থকে, অর্থাকারে অবশ্যই আমরা বিদিত হইয়া থাকি। এবং বাহ্য অর্থ ব্যতিরেকে, ক্রোধ লোভ ও রাগদ্বেষাদি মানসিক অর্থ সকলও আমাদের জ্ঞেয়। এই সকল মনোভাবের আশ্রয় ও অবলম্বনস্বরূপ যে মন—এবং বুদ্ধি, চিত্ত, অহং প্রভৃতি যাহার নামান্তর —তাহাও আমাদের এক বিজ্ঞেয় বিষয়। ইহা ছাড়াও অন্য এক অর্থ আছে, যাহা আমাদের মন ও মনোভাবের সহিত মিশিয়া চৈতন্য বা জ্ঞানরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। সেই চৈতন্য জ্ঞান-স্বরূপ হইলেও, তাহা আমাদের জ্ঞেয় বিষয়। যদিও আমরা ব্যবহারতঃ চিত্তকেই চৈতন্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ দ্বারা চিত্ত হইতে চৈতন্যের পৃথক্ উপলব্ধি কোনই অসাধ্য উপলব্ধি নহে।

আমরা দেখিয়াছি চৈতন্য উপরঞ্জিত চিত্তই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞেয়, এবং বাহ্য অর্থ সকল মনের মধ্য দিয়া মনসাকারে আমাদের জ্ঞেয় হইয়াছে। ইহা হইতেছে আমাদের বিধি বিহিত জ্ঞানবিধি। এবং এই জ্ঞান-বিধি কিরূপে সম্ভব হইয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র বিবিধ দৃষ্টান্ত ও উপমার আশ্রয় লইয়াছেন। তাহার দু'একটির এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

একটি উপমা হইতেছে এই। আমরা দেখিতে পাই একত্র অবস্থিত অয়স্কান্ত মণি (Lodestone) অন্যত্র অবস্থিত লৌহের নৈকট্য সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইলে, লৌহকেও চুম্বক-ধর্ম্মে অভিরঞ্জিত করে। সেইরূপ "অয়স্কান্তমণি-কল্প বিষয় সকল চিত্তের সহিত অভিসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, অয়োধর্ম্মক চিত্তকে বিষয়-রাগে অভিরঞ্জিত করিতেছে। বিষয় সকল যখন এইরূপে চিত্তের সহিত অভিসম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় না, তখন চিত্তও বিষয় রাগে রঞ্জিত হয় না, এবং বিষয় সকল বিদ্যমান থাকিলেও সেই কারণে বিষয় জ্ঞান হয় না।"

আর একটি উপমা এই—স্ফটিক যেমন শুদ্ধ স্বচ্ছ স্বভাব, এই চিত্ত সত্বও সেইরূপ শুদ্ধ স্বচ্ছ স্বভাব। সেই জন্য স্ফটিক ও মণিকল্প এই চিত্ত-সত্ব, চেতন ও অচেতন অর্থের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া চেতন ও অচেতন অর্থাকারে প্রতিভাসমান হইতেছে। অর্থাৎ স্ফটিক যেমন স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ নহে, জবারাগে অভিরঞ্জিত হইয়া রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি মন ও চৈতন্য কিংবা বাহ্য বিষয়ও নহে, বাহ্য বিষয় ও চৈতন্য দ্বারা অভিরঞ্জিত হইয়া মন চেতন ও অচেতন রূপে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে।

চিত্তের চৈতন্য অভিরঞ্জিত ভাবকে শাস্ত্র চিৎ ছায়াপাত দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি। ইহার উদাহরণ হইতেছে এইরূপ—স্বরূপতঃ অনুজ্জ্বল লৌহ যেমন অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত হইলে অগ্নিবৎ উজ্জ্বল হয়, তেমনি স্বরূপতঃ অচেতন চিত্ত, চিৎ সান্নিধ্যে চিদুজ্জ্বল হইয়াছে।

অতএব যোগ-দর্শন বলিয়াছেন "দ্রষ্টৃ দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্" (৪।২৩)।—দ্রষ্টা বা চেতন এবং দৃশ্য বা অচেতন অর্থ সকলের দ্বারা উপরক্ত হইয়া চিত্ত সমস্ত অর্থাকারে প্রতিভাসমান হইতেছে। কিন্তু প্রতিভাসমান হইলেও চিত্তই চেতন ও অচেতেন অর্থ নহে। চিত্তাকারে প্রতীয়মান অর্থ সকল চিত্ত হইতে যে পৃথক্ ও অন্য ইহাই পূর্ব্বোক্ত উপমা সকলের মর্ম্ম কথা।

উপমা ও দৃষ্টান্ত যে প্রমাণ নহে, ইহা আমরা যতটা জানি, প্রাচীনগণও অবশ্য ততটাই জানিতেন। সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত উপমা দ্বারা এইটুকুমাত্র সিদ্ধ হইয়াছে, যে, চেতন ও অচেতন অর্থ সকল, চিত্ত হইতে অন্য হইলেও, কিরূপে তাহাদের চিত্তাকার প্রাপ্ত হওয়াও সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অর্থ সকল হইতে চিত্ত সত্তা যে ভিন্ন ইহার "প্রমাণ" অন্যত্র।

সেই প্রমাণ হইতেছে এই। আমরা দেখিতে পাই চেতন ও অচেতন অর্থাকার চিত্ত ও জ্ঞেয় ও বিষয়। যাহা জ্ঞেয় ও বিষয় তাহাই জ্ঞাতা ও বিষয়ী হইতে পারে না। অতএব যাহাকে জ্ঞান বলিয়া জানিতেছি তাহা নিজেই নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না। পাঠক বিদিত আছেন, মহাত্মা Kantও অবিকল এই যুক্তি অবলম্বনে এক Transcendental আত্মাকে

মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবং এই যুক্তির ফলে, আমাদের দেশের দর্শন, চেতনাকারে প্রতীয়মান চিত্তকে স্বরূপতঃ অচেতন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিল।

ব্যাসদেব এই চিত্ত ও চৈতন্য তত্ত্বের উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা পাঠকের উদ্দেশে সাগ্রহে নিবেদন করিতেছি—

"চেতন ও অচেতন অর্থ সকলের সহিত চিত্ত সমান-রূপতা বা সা-রূপ্য প্রাপ্ত হইতেছে। অর্থ সকলের সহিত চিত্তের এই সারূপ্যে ভ্রান্ত হইয়া কেহ বলিতেছেন চিত্তই চেতন। কেহ বলিতেছেন চিত্তই এই গবাদি ও ঘটাদি লোক, এবং চিত্ত হইতে অন্য কোনই গবাদি ও ঘটাদি লোক নাই। ইঁহারা অনুকম্পনীয়। কারণ, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং তাঁহাদের ভ্রান্তিবীজ হইতেছে এই যে, বিষয়ী ও বিষয়াকারে নির্ভাসমান চিত্ত হইতেছে নিজেই বিষয়ী ও বিষয়। কিন্তু যোগিগণ সমাধিবলে যে পরিশুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট জ্ঞান (প্রজ্ঞা) প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে দেখিতে পান, যে, তাঁহাদের পরিশুদ্ধ জ্ঞানে যাহা অর্থাকারে উপলব্ধ হইতেছে তাহা প্রতিবিম্বীভূত বিষয়াকার চিত্তমাত্র।"

জগৎরূপের সত্যমিথ্যা।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ লইয়া আমাদের যে জগৎ-ব্যবহার, তাহা কোনই সনাতন প্রতারণাবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং আমূলতঃ তাহা মিথ্যা ব্যবহারও নহে। এই জগৎ-প্রতিমার যাহা কাঠামো ও অস্থিপঞ্জর তাহা অনিবার্য্য সত্য। এবং এই জগৎ-রূপের যাহা সত্য তাহা যে এক অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত ও অনবধার্য্য তত্ত্ব ইহাও আমাদের উপযাচিত সন্দেহ নহে।

কিন্তু তা' বলিয়া এ জগতে মিথ্যা প্রতীতিরও অসম্ভাব হয় নাই। বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে সত্য অবধারণা সিদ্ধ বলিয়া অসত্য অবধারণাও অসিদ্ধ নহে। বাহ্য তত্ত্বজ্ঞানী যেমন জানেন যে সূর্য্যের প্রাদেশ পরিমাণ এক মিথ্যা পরিমাণ, অন্তস্তত্ত্বজ্ঞানীও তেমনি দেখিতে পান যে আমাদের অন্তরের রাগদ্বেষানুবিদ্ধ বাসনা ও কামনা অযথাভাবে হেয় ও উপাদেয় অবধারণ করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে। আমাদের ব্যবহারিক বস্তুজ্ঞানও বিশুদ্ধ অর্থাকার জ্ঞান নহে। তাহা শব্দ জ্ঞান অর্থ জ্ঞানের সহিত মিশিয়া গিয়া এক ব্যামিশ্র বিষয় জ্ঞান হইয়াছে। তাহা শ্রুত ও অনুমিত জ্ঞানের সহিত মিশিয়া গিয়া এক "সংকীর্ণ ও বিকল্প" জ্ঞান হইয়াছে। এবং সেই "শব্দ অর্থ জ্ঞান-বিকল্প সংকীর্ণ" জ্ঞান নিশ্চয়ই যথা-বস্তু ও যথা-অর্থ জ্ঞান নহে। এই জন্য যোগিগণ যখন যথাবস্তু জ্ঞানের সাধনা অবলম্বন করেন, তখন তাঁহাদের স্মৃতির বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া, বিভক্ত অর্থ সকল আর অবিভক্তভাবে প্রতীয়মান হয় না। এবং তখন তাঁহারা সত্য অর্থকে মনের কল্পনা ও স্মৃতির রচনা হইতে বিভক্ত করিয়া, যথার্থ ও বিভক্ত সত্য অর্থরূপেই দেখিতে পান। এই পরিশুদ্ধ অর্থজ্ঞানই যোগশাস্ত্রে নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার সমাপত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে।

জগৎরূপের অবধারণায় এইরূপে সত্য মিথ্যার সমাবেশ হইয়াছে বলিয়া দর্শন বিদ্যা কখনই হতাশ্বাস হয়েন নাই। কারণ বুদ্ধির জটিল তন্ত্রে প্রতারণা ও অযথা সংযোজনা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া, তত্ত্বজ্ঞান ও সত্য বিচরণাও অসম্ভব হয় নাই। এই ভ্রান্ত তন্ত্রের মধ্যেই অভ্রান্ত সত্যের অমোঘ পরিমাণদণ্ডও গোপনে সুবিহিত ও সুরক্ষিত হইয়াছে। এবং তাহা যদি না হইত, তবে বহিরন্তর বিষয়ক সর্ব্ববিধ জ্ঞান-বিধি ও তত্ত্ববিচার অন্ধের মৃগয়াবৎ এক অসাধ্য ও অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িত। আমাদের বিধাতা পুরুষ, যখন আমাদিগকে এক ভ্রান্ত বুদ্ধির বশবর্ত্তী করিয়া এ জগতে পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি সেই ভ্রান্তির নিগূঢ় অভ্যন্তরে একমাত্র অভ্রান্ত আলোকের অনির্ব্বাণ শিখাও জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। সে আলোক না থাকিলে এই জীবলোক, অন্ধকারের অপার পারাবারে গতিহারা হইয়া নিবিয়া যাইত। এবং সেই জন্যই, আমাদের পক্ষে এই অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত সৃষ্টি ও জগৎ হইতেছে, অন্ধকার ও আলো-

কের," সত্য ও মিথ্যার এক অনাদি সংগ্রাম। এখানে, জীব চরম সত্যের অভিসন্ধানেই যুধ্যমান জীব হইয়াছে। তাহাতে পদে পদে তাহার পদস্খলন ও পরাজয়ও সম্ভব হইয়াছে বটে। কিন্তু তথাপি সে তাহার সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ও জয় পরাজয়ের মধ্যে এক অন্তর্ভেদী প্রবণতায় মিথ্যার দুর্দ্ধর্ষ কাণ্ডারকে পিছনে রাখিতেই চাহিতেছে; তাহার সত্যানুসন্ধানের সুদীর্ঘ পথ, বহুজীবন ও বহু জন্মের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া, একই নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিয়াছে। তাহাতে একদিন অনন্তকালের কোন্ এক অনাগত শুভক্ষণে, তাহার এ অনাদি পথযাত্রা অন্তলাভ করিয়া পরিসমাপ্ত হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, তাহার সমস্ত উত্থান পতনের মধ্যে, একই অনাহত প্রার্থনা তাহার কাতর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকিবে—"অসতো মা সদ্গময়"—অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও। কারণ সেই "সৎ"ই হইতেছে তাহার চরম গন্তব্য ও পরমা গতি। সেইখানেই তাহার জীবন পন্থার পরিসমাপ্তি, সেইখানেই তাহার সংসার সংগ্রামের চরম রণজয়। এবং যেদিন সে সেই চরম জয়ে জয়ী হইবে, সে দিন তাহার বুদ্ধির অখিল ভ্রান্ত প্রমাদও ঘুচিয়া যাইবে। সেদিন হইতে সে বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগতের অনাবিল ও অবিতথ সত্যরূপকেই দেখিতে পাইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

বাঙ্গলা নাট্য-সাহিত্য ও সমালোচনা

বাঙ্গলা নাট্য-সাহিত্য যে বাঙ্গলা সাহিত্যে আজিও যথেষ্ট সমাদর লাভ করে নাই, তাহার কারণ আমরা কি রাষ্ট্রতন্ত্রে, কি সমাজে, কি সাহিত্যে সর্ব্বত্রই রক্ষণ-পন্থী। আমরা বাঙ্গালীরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাতী মদ পুরাতন বোতলে ঢালাই করিয়াছি, কিন্তু মাতলামী করিয়াছি বাহিরে, অন্তরের অন্দরমহলে সনাতন চাল চলনের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইতে দিই নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতীয় একতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছি; কিন্তু সমাজে তাহা অস্বীকার করিয়াছি; সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদির পক্ষে বক্তৃতা দিয়াছি, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে গৃহে তাহার প্রবেশাধিকার দিই নাই; মুসলমান-আমলে চাপকান পরিয়া ও ইংরাজ আমলে হ্যাট কোট পরিয়া চাকরি করিয়া আসিয়াছি, গৃহে ফিরিয়া পূর্ব্ববৎ স্নান করিয়া শুচি হইয়াছি। নূতনত্বের বার্ত্তা চিরকাল আমাদের কাণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু মরমে পশিতে পারে নাই।

বাঙ্গলাসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতেও আমাদের এই বাঙ্গালীত্বের পরিচয় পাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের অভ্যুদয়কে আমরা সনাতন ও নব্যপন্থী উভয়েই, প্রথমতঃ আমল দিই নাই। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ তাহাকে ভাষায় শূদ্র ও অস্পৃশ্য জ্ঞানে সংস্কৃতের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেন নাই। ইংরাজী শিক্ষিতগণ বাঙ্গলা জানা অপেক্ষা না জানাই অধিকতর প্রশংসার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং অন্দরের কথাবার্ত্তার অন্তরালে ও দলীল দস্তাবেজের নিচের তলায় তাঁহাদের ভাষা জননীকে দাসীবৃত্তি করিবার অধিকার দিয়াছিলেন মাত্র। ভদ্র ভাষা পরিবারে একাসনে বসিয়া ভাব বিনিময়ের সামর্থ্য যে তাঁহার থাকিতে পারে সে কথা তাঁহার সন্তানগণ বিশ্বাস করিতেন না। এমন সময় রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন প্রমুখ মনীষিগণ বাঙ্গলা ভাষায় যখন ভাবের বন্যা লইয়া নামিয়া আসিলেন এবং বাঙ্গলা ভাষাকে অন্যান্য ভাষার সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব তাঁহাদের সেই বাণী সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিবার পথে

যে সকল বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার দিনে, সেদিনকার মধুসূদনের সেই কাতরোক্তি "যারে রে যা অবোধ তুই যারে ফিরে ঘরে, বঙ্গভাষা খনি তোর পূর্ণ মণি জালে" আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আজ স্যর আশুতোষ বাঙ্গলা ভাষাকে যে অনুগ্রহ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু একদিন ছিল যখন মিসনারীরা অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গলা বলিতেন ও লিখিতেন এবং বাঙ্গালী তাহা দেখিয়া হাসিত ও ঠাট্টা করিত! বাঙ্গলা সাহিত্যে যে আজ রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রাণিতত্ব ঘটিত রচনার অভাব দেখা যাইতেছে, তাহার কারণও বাঙ্গালীর এই বাঙ্গালীত্ব—অর্থাৎ তাহার মনোবৃত্তিকে নতুন পথে চালাইবার পক্ষে অপ্রবৃত্তি। উপন্যাস ও কবিতা ব্যতীত যে যে বিভাগে সে প্রতিভা লাভ করিয়াছে তাহা ব্যতীত বাংলা সাহিত্যে নূতনত্বের অবতারণা আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। পাশ্চাত্য-সাহিত্যে নাট্য সাহিত্যের স্থান কত উচ্চে তাহা জানিয়াও আমরা গিরিশচন্দ্রকে সমাদরে গ্রহণ করি নাই, দ্বিজেন্দ্রলালকে ভুলিতে পারিয়াছি। নাটক ও নাট্যকলা যে সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ তাহা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না, এমন কি অনেকে মনে করেন তাহাতে সাহিত্যের শুচিতা নষ্ট হয়। তাই বাঙ্গলা সাহিত্যে এ সম্বন্ধে রীতিমত সমালোচনারও অবকাশ নাই। কিন্তু নাট্য সাহিত্য ও নাট্যকলা সম্বন্ধে আমাদের এবম্বিধ উদাসিন্য ও উপেক্ষা সত্বেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছেন না, এবং রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষগণ ফরমায়েসী নাটক লিখাইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। ফলে নাটক লেখা ও অভিনয় করা অনেক অপেক্ষাকৃত ভদ্র উপার্জ্জন প্রণালী অপেক্ষা লাভবান হইয়া উঠিল। অতএব সাহিত্যে শুচিতা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় সাহিত্যের অভিভাবকগণ এখনও যদি রীতিমত সমালোচনার দ্বারা এই শ্রেণীর সাহিত্য ও কলা বিদ্যার গতি সুনিয়ন্ত্রিত এবং এ সম্বন্ধে লেখকগণের রুচি সুমার্জ্জিত করিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন, তবে বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাণ্ডার নাট্য সাহিত্যরূপ এক ঐশ্বর্য্য হইতে তো চিরকাল বঞ্চিত থাকিবেই, অধিকন্তু সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পাইবে এবং প্রকৃত আদর্শের দিকে লক্ষ্য না থাকায় যে ক্রমে আগাছা কুগাছার সৃষ্টি হইবে তাহাতে সাহিত্যের শ্রী ও শুচিতা রক্ষা করা আর সম্ভব হইবে না। আমাদের বিবেচনায় নাট্য সাহিত্য ও নাট্য কলা সম্বন্ধে এইবার রীতিমত সমালোচন-সাহিত্যের প্রয়োজন হইয়াছে।

এক পক্ষে সমালোচনা ব্যতীত যেমন রচনার প্রকৃত রস গ্রহণ করা অসম্ভব, অপর পক্ষে সমালোচনাই রচনার জনক ও নিয়ামক। রচনার প্রকৃত সৌন্দর্য্য নির্দ্দেশ করিয়া একপক্ষে সমালোচক যেমন প্রতিভাবান লেখককে সাধারণ পাঠকের সহিত পরিচিত করিয়া দেন, অপরপক্ষে তেমনই প্রতিভাহীন অকিঞ্চিৎকর রচনার কদর্য্যতা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিয়া সাহিত্যের আসর হইতে তাহা বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সমালোচক এক সঙ্গে লেখকের স্তাবক ও নিয়ামক উভয়ই। আবার যখনই সাহিত্যে গ্লানির উদয় হয়, তখনই সমালোচনার আবির্ভাব। রচন যুগের পরই সমালোচন যুগের আগমন, যাহা রচিত হইয়াছে তাহার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ করতঃ নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার জন্য এবং পরবর্ত্তী লেখকের সম্মুখে আদর্শের চিত্র জাজ্জ্বল্যমান করিবার জন্য। সুতরাং সমালোচন যুগের পরই আবার রচন যুগের আগমন স্বাভাবিক। বাঙ্গলা নাট্য সাহিত্যে আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রচন যুগ অন্তর্হিত হইয়া থাকে, তবে যেন তাহা সমালোচন যুগের সূচনা করে। প্রকৃত সমালোচনার সাহায্যে যদি আমরা এই অবসরে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিতে পারি এবং বর্ত্তমান লেখকগণের রচনার মধ্যে তাঁহাদের ভুল ত্রুটী দেখাইয়া দিয়া তাঁহাদের সম্মুখে নাট্য কলার উন্নত আদর্শ খাড়া করিয়া ধরিতে পারি, তবে ভবিষ্যতে বাঙ্গলা নাট্য সাহিত্য যে উৎকর্ষতার অভিমুখে ধাবিত হইবে সে

বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশা করা যায় এই সমালোচন যুগের রীতিমত সাময়িক সদ্ব্যবহারের দ্বারা আমরা উৎকৃষ্ট রচন যুগকে আহ্বান করিয়া আনিতে পারিব।

অপরাপর সাহিত্য সমালোচনা হইতে নাট্য সাহিত্য সমালোচনার একটু বিশেষত্ব আছে। নাট্যকলা সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে হইলেই অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের আলোচনা অপরিহার্য্য। এমন কি Oscar Wildeএর মতে অভিনেতাও নাটকের একজন প্রধান সমালোচক— "The actor is a critic of the drama...... His own individuality is a vital part of the interpretation."

নাট্য সাহিত্য সেই শ্রেণীর সাহিত্য যাহা অভিনয়-কলার সাহচর্য্য ব্যতীত আপনাকে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করিতে পারে না। অপর পক্ষে অভিনয় কলাও সেই শ্রেণীর কলাবিদ্যা যাহার প্রতিভাস্ফুরণ নাটকের উৎকর্ষতার অপেক্ষা রাখে। নাট্যকারের প্রতিভা অভিনেতার প্রতিভার সহিত সম্মিলিত না হইলে কেহই স্ফূর্ত্তি পায় না। অভিনেতা যেমন একদিকে নাটকের সমালোচক, অপরদিকে নাট্যকারও তেমনই অভিনেতার অভিনয় প্রতিভার নির্দ্দেশক ও নিয়ামক। সমশ্রেণীর প্রতিভার এইরূপ সংযোগস্থলে নাটকও সুপাঠ্য হয়, অভিনয়ও দর্শনযোগ্য হইয়া থাকে। অন্যথায় একের উৎকর্ষতা অনেক সময়ে অপরের অপকর্ষতারই কারণ হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভা তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া রঙ্গমঞ্চ ব্যতীত তাঁহার রচিত নাটকের প্রকৃত সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আবার নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সমসাময়িক অভিনেতার অভিনয় প্রতিভার সহিত পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে যোগযুক্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার রচিত নাটক রঙ্গমঞ্চের বাহিরেও খ্যাতিলাভ করিয়াছে, এবং যে প্রতিভাবান অভিনেতা অভিনয় চাতুর্য্যে সেই সকল নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার অভিনয় চাতুর্য্যও উৎকর্ষতার চরমত্বে পৌছিয়াছিল। আজ সমযোগ্য নাট্য প্রতিভার অভাবে অভিনেতার প্রতিভা ও মৌলিকতা সত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল-অঙ্কিত চরিত্র অভিনয়ের চর্ব্বিত চর্ব্বণ হইতেছে মাত্র। ইহা অভিনয় প্রতিভার অপকর্ষতা ভিন্ন আর কি বলিব? "ভাস্কর পণ্ডিতে" (বঙ্গে বর্গী) আমরা কি দ্বিজেন্দ্রলালের "চাণক্যে"র আভাস পাই না? এত কথা বলিবার কারণ এই যে, নাট্য সাহিত্য সমালোচনা করিতে যাইলেই র মঞ্চ ও অভিনয় সম্বন্ধেও আলোচনা প্রাসঙ্গিক এবং অপরিহার্য্য।

ইতঃপূর্ব্বে মাসিক পত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের দুই একখানি পুস্তক লইয়া যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহাতে এ প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। কোনও একটি নাটকের চরিত্র আলোচনা দ্বারা নাটকের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করা বিজ্ঞানসম্মত নহে। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে রঙ্গমঞ্চ ও অপরাপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্য সাহিত্যে যে নৈপুণ্যের অবতারণা করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব এবং পরে বর্ত্তমান নাট্য সাহিত্যের আলোচনা করতঃ সাধ্যমত আধুনিক নাটক লেখকের সম্মুখে আদর্শ নাট্য সাহিত্যের আদর্শ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চৌধুরী।

অশ্রুনদী

হে প্রিয়! স্নানের তরে যাও তুমি নদীতীরে;
তবে কেন, আসনাক হায়,
এই দুটী আঁখি তটে, যেথা মম অশ্রুনদী
লাজ দেয় গঙ্গা যমুনায়? ("জামী" হইতে)

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

মুক্তিনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮ই মার্চ্চ ১৯২২—অতি প্রত্যুষে (৪টার সময়) শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। ব্রহ্মচারী, গাইড, ভারিয়া সকলেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

আবশ্যক দ্রব্যাদি পূর্ব্ব রাত্রেই গুছাইয়া ভারিয়ার "ডোকো"তে রাখা হইয়াছিল। অবশিষ্ট বিছানাটী বান্ধিয়া এখন তাহার মধ্যে রাখা গেল। ডোকো জিনিষটী বংশ ও বেত্র নির্ম্মিত ঝুলি বিশেষ। ইহার মধ্যে দ্রব্যাদি রাখিয়া চামড়ার দোয়াল কি শণের বেণী দড়ি দ্বারা ইহাকে কপালে সংযুক্ত করে এবং পৃষ্ঠে বহন করে।

চা ও জলখাবার প্রস্তুত হইয়াছিল। ভোজন ও পানান্তে যাত্রার উদ্যোগ করিলাম।

সুধীর বাবু তাঁহার নাম ও ঠিকানা লেখা কয়েকখানা খামে নেপালী ডাক টিকেট আঁটিয়া এবং কিছু চিঠির কাগজ পূর্ব্বেই আমার ব্যাগে রাখিয়া দিয়াছিলেন। যাত্রাকালে বলিয়া দিলেন যে হাতের কাছে পোষ্টাফিস পাইলেই যেন তাঁহাকে চিঠি লিখি। নেপালী ভাষাতে গাইড্ ও ভারিয়াকে কিছু উপদেশ দিলেন। উপদেশের শব্দার্থ বুঝিতে না পারিলেও ভাবার্থ বুঝিতে পারিলাম, যে, পথে যাহাতে আমার কোন কষ্ট না হয় তৎপ্রতি তারা যেন যথেষ্ট দৃষ্টি রাখে।

অধ্যাপক বন্ধুত্রয়, পাচক হরিহর এবং ভৃত্য রামশরণ ও "বাচ্চার" নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মচারী, গাইড বীরবল গুরুঙ্গ, ভারিয়া জিৎবাহাদুর লামা ও আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া ৫-৩০ মিনিটের সময় মুক্তিনাথ উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

কাঠমণ্ডু সহরে ষোল দিন ছিলাম, কোনদিন এত সকালে শয্যা ত্যাগ করি নাই—রাস্তায় বাহির হওয়া দূরের কথা। নেপালী শীতের প্রকোপ অদ্য বেশ অনুভব করিলাম। গত রাত্রে তুষারপাত হইয়াছিল, রাজপথে যেন লবণ ছড়াইয়া রাখা হইয়াছে। যেখানে অল্প তুষারপাত হয় সেখানে ঘাসের উপর উহা দেখায় বেশ। আমি ব্যতীত অপর তিনজনই নগ্নপদ। ভারিয়া ও গাইডের তুষারের উপর দিয়া নগ্নপদে চলিবার অভ্যাস আছে, কিন্তু ব্রহ্মচারীজীর খুব কষ্ট হইতে লাগিল।

সূর্য্যোদয়ের অল্প পরেই আমরা বালাজী নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। আমাদের সঙ্গে একজন পুলিশ প্রহরী পাঠাইবার যে আদেশ আছে সেই আদেশপত্র বালাজীর পুলিশ কর্ম্মচারীকে দেখান হইল। আমাদের সঙ্গে যাইবার উপযুক্ত কেহ তখন থানাতে উপস্থিত না থাকাতে, ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে লোক পাঠাইবার উপদেশ দিয়া আমরা বালাজী ত্যাগ করিলাম।

কাঠমণ্ডু হইতে বালাজী পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ। বালাজীর পর হইতেই আবার পাহাড়ীয়া পথ। উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া যে শোভন ও প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইতে পারে গোহাটী খারিয়াঘাট রাস্তা তাহার প্রমাণ। নেপাল রাজ্যে কাঠমণ্ডু সহর ব্যতীত অন্য কোথাও ভাল রাস্তা নাই। নেপালীরা নাকি ভাল রাস্তার বিরুদ্ধ-বাদী। কথিত আছে যে ১৮৫১ খৃঃ ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মিঃ এস্‌ক্রাইন তাৎকালিক প্রধান মন্ত্রী বিখ্যাত জঙ্গ বাহাদুরকে সমতল ভারত হইতে কাঠমণ্ডু পর্য্যন্ত একটি ভাল রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে মন্ত্রীপ্রবর বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশবাসী-দের উত্তম রাস্তার বিরুদ্ধে একটি অযৌক্তিক সংস্কার আছে। তাহাদের বিশ্বাস, যতদিন পথ ঘাটের অবস্থা এইরূপ (অনুন্নত) থাকিবে, ততদিন কোন বিপক্ষ সৈন্য নেপাল উপত্যকা আক্রমণ করিতে পারিবে না। মন্ত্রী বাহাদুর নিজে অবশ্য এ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন

নাই। তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং সেখানে ইংরেজের রেলপথ ও তলবর্ত্ম (tunnel) প্রভৃতি দেখিয়া তাহাদের ক্ষমতা ও নৈপুণ্য সম্বন্ধে তাঁহার কোনই সন্দেহ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ইংরেজ অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে না পারিলেও, ইচ্ছা করিলে তলবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ এবং তখন কোনও পর্ব্বতই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিবে না।

সত্তর বৎসর পূর্ব্বে পথ ঘাটের অবস্থা কি ছিল জানি না, কিন্তু বর্ত্তমানেও নেপালে (কাঠমণ্ডু সহর ব্যতীত) রাস্তার যে অবস্থা, ব্রিটিশ ভারতের রাস্তার তুলনায় তাহা যে নিতান্ত হীন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বালাজীর পর একটি অগভীর অপ্রশস্ত নদীর কূলে কূলে অনেক দূর গিয়া একটি পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। শেষাগিরি কি চন্দ্রাগিরির ন্যায় এ পর্ব্বতটী উল্লঙ্ঘন করিতে হয় নাই, পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত পর্ব্বতটীর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম এবং ১০-৩০ মিঃ সময় পাচম্যনে নামক একটী বস্তিতে উপস্থিত হইলাম। পথের বামদিকে অনেক নীচে একটি পার্ব্বত্য নদী। পথ হইতে নদী পর্য্যন্ত জায়গা বেশ ঢালু। এক খণ্ড পরিষ্কার জায়গায় আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। যদিও আজ ফাল্গুনের মাসের ২৪শে, তবু সূর্য্যকিরণ এতই নিস্তেজ যে কোনও ছায়ার আবশ্যক হইল না।

নদীতে স্নান সমাপন করিয়া বাসা হইতে আনীত খাদ্যই চারিজনে গ্রহণ করিলাম। এখানে পাকের ব্যবস্থা করিতে গেলে রাত্রে সুবিধামত আশ্রয় স্থানে যাইয়া পৌছিতে পারিব না, এই আশঙ্কায় জলযোগান্তে রওয়ানা হওয়াই স্থির করিলাম। বালাজী হইতে আদিষ্ট [illegible] আসিয়া পৌছিল। আমরা পাঁচজন তখন [illegible] যাত্রা [illegible]লাম।

এ পর্ব্বতে প্রস্তররেণুর সহিত অভ্র খণ্ডও দৃষ্ট হইল। আমি কয়েকখণ্ড সংগ্রহ করিয়া পকেটে পুরিলাম। অপরাহ্ণ ৫টার সময় আমাদের পর্ব্বত অতিক্রম শেষ হইল। পর্ব্বত শেষ হইলে পর একটী অপ্রশস্ত অগভীর নদী। নদীগর্ভে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া জুতা পায়ে রাখিয়াই নদী পার হওয়া যায়। নদী পার হইয়া আমরা এক উপত্যকায় প্রবেশ করিলাম।

কনেষ্টবল, ব্রহ্মচারী ও আমি একসঙ্গে ছিলাম, গাইড ও ভারিয়া তখনও আসিয়া পৌছায় নাই। নদীতীরে এক স্থানে আক্ মাড়াই হইতেছিল। আমি কিছু ইক্ষুরস ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে কৃষক বলিল, আমি আক্ কিনিতে পারি, কিন্তু রস পাইব না। কৃষকের কথা ভাল বুঝিতে না পারায় কনেষ্টবলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল ইহারা আকই বিক্রয় করে, রস কখনও বিক্রয় করে না। এ ব্যক্তি আকের রস আমাকে "প্রেম্‌সে" দিবে, কিন্তু বিক্রয় করিবে না।

কৃষক তাহার একটী পিত্তলপাত্র পরিষ্কৃত করিয়া তাহার মুখ আমার রুমাল দ্বারা আবৃত করিল। সেই পাত্রে রস ধরিয়া আমাকে দিল। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পরে আকের রসটা বেশ লাগিল।

এখান হইতে মুক্তিনাথ এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অনেক স্থলে অনেক জিনিষ, বিশেষতঃ দুগ্ধ আমাদিগকে "প্রেমসে" সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই গরু মহিষ আছে, কিন্তু সকলে "গোরস" বিক্রয় করে না। দুগ্ধ বিক্রয় যাহার ব্যবসায় নহে, তাহার নিকট দুগ্ধ প্রার্থনা করিলে তাহার যদি ইচ্ছা হয় সে দান করিবে, নতুবা প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবে—বিক্রয় করিবে না। তবে প্রায়শঃই অগ্রাহ্য করে না।

ইক্ষুরস পানান্তে জলমধ্যস্থ একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া সূর্য্যাস্ত দর্শন করিলাম। কিছু পরে গাইড ও ভারিয়া আসিয়া পৌছিল। কনেষ্টবল ও ব্রহ্মচারীজী আশ্রয় অনুসন্ধানে নিকটবর্ত্তী বাজারে পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন এবং এক নেওয়ারের দোকান ঠিক করিয়াছিলেন। আমরা তিনজন পরে আসিয়া সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

বাজারটীর নাম চায়েকেন্দী। বীচাগড়িতে প্রথম দোকানে রাত্রিবাসের পর অন্ত দ্বিতীয়বার দোকানে রাত্রিবাস। বাসনপত্র আমাদের সঙ্গেই ছিল, দোকান হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মচারীজী স্বপাকভোজী। তিনি আমাদের দুই জনের পাক সমাধা করিলেন। গাইড কনেষ্টবল ও ভারিয়া পৃথক পাক করিয়া আহার করিল। গাইড ও কনেষ্টবলের জন্য ক্রীত জিনিষাদির মূল্য আমারই দেয়।

আহারান্তে রাত্রেই জিনিষপত্রগুলি পরিষ্কার করিয়া ভারিয়া তাহার ডোকোতে রাখিয়া দিল। পথে জল আনা, বাসন ধোয়া এবং এইজাতীয় অন্যান্য কর্ম্ম জিৎ বাহাদুরই সম্পন্ন করিত, তজ্জন্য তাহার প্রাপ্তি জলখাবার দৈনিক অর্দ্ধ আনা এবং পর্য্যটন শেষে বিদায়কালে আমার 'বিবেচনা'।

আমাদের চারিজনের আহারের ব্যয় দুই মোহুর অর্থাৎ বার আনা পড়িয়াছিল।

জ্যোৎস্না রাত্রি, আকাশ বেশ পরিষ্কার। যে সমস্ত ভারিয়ারা আমাদের সঙ্গে অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে আসিয়াছিল, তাহারা আহারান্তে ত্রিশূলী অভিমুখে যাত্রা করিল। ভারিয়ারা রাত্রে পাহাড়ের উপরের পথ দিয়া চলে না, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির পথে জ্যোৎস্না রাত্রে গমনাগমন করিয়া থাকে।

আমাদের রাত্রে পর্য্যটনের অসুবিধা ভোগ করিবার কোনই প্রয়োজন না থাকাতে নেওয়ারের দোকানে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া শয্যার আশ্রয় অবলম্বন করিলাম।

আমরা এখন যে উপত্যকায় আসিয়াছি তাহার নাম নয়াকোট। সন্ধ্যায় যে নদীটী উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম তাহার নাম সূর্য্যমতী। সূর্য্যমতী নয়াকোটের পূর্ব্বসীমা। নয়াকোটের পশ্চিম সীমা ত্রিশূলী গঙ্গা। উভয় নদীই গোঁসাইথান তুষারশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া নয়াকোট উপত্যকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক দিয়া উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে দেবীঘাট নামক স্থানের নিম্নে মিলিতা হইয়াছে।

নয়াকোট উপত্যকা সমুদ্রবক্ষ হইতে মাত্র দুইহাজার চারিশত পঞ্চাশ ফিট উচ্চ। উত্তরে গোঁসাইথান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমনিম্নভাবে একটি খণ্ডপর্ব্বত এই উপত্যকাটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই পর্ব্বতের উপর নয়াকোট সহর। ইংরেজের সহিত নেপাল রাজের যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নয়াকোট গোর্খা রাজাদের শীতাবাস ছিল। বর্ত্তমানে এখানে একটি সৈন্যাবাস আছে।

নয়াকোট উপত্যকার জমীতে মাটির অংশই বেশী, এই কারণে এখানে যথেষ্ট ধান্য জন্মে। এখানে উৎকৃষ্ট কমলা ও আনারস এবং আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ও আতাফল উৎপন্ন হয়।

৯ই মার্চ্চ—৬-৩০ মিনিট সময় পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির উপর দিয়া পথ। কিছু দূরে একটা বস্তি এবং তাহার পর একটা ক্ষীণ জলস্রোত। বস্তিগুলি সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমির উপর। এই ক্ষীণ পার্ব্বত্য নদীটী বস্তির অনেক নিম্নে।

নদী পার হইয়া এক বিস্তীর্ণ মাঠে প্রবেশ করিলাম। আমাদের গন্তব্য স্থান এখান হইতে সোজা পশ্চিমে, কিন্তু আমাদের পথ অবরোধ করিয়া নয়াকোট পর্ব্বত দণ্ডায়মান। নয়াকোট পর্ব্বত উপত্যকা হইতে মাত্র সহস্রফিট উচ্চ। নয়াকোট উপত্যকায় যেমন বঙ্গদেশের ধান আনারস আম কাঁঠাল আছে, তদ্রূপ বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়াও আছে। মার্চ্চ এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ।

নয়াকোট পর্ব্বত হাতের ডানদিকে রাখিয়া আমরা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এক দল ভুটীয়া সওদাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ছাগল ও মেষের পৃষ্ঠে ছোট ছোট শণের ছালায় চাউল বোঝাই করিয়া স্ত্রীপুত্র পরিজন সহ ইহারা দেশে ফিরিতেছে। দশ বৎসরের বালকের পৃষ্ঠেও একটা বোঝা। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই পৃষ্ঠে বোঝা লইয়া ন্যুব্জদেহে চলিতেছে।

স্ত্রীলোকেরা হাতে সূতা পাকাইতেছে, পায়ে পথ চলিতেছে। পুরুষদের কাহারও কাহারও হাতে প্রার্থনা-চক্র—পথ চলিতেছে আর চক্র ঘুরাইতেছে। একজনের হাতে বিলাতী বাদ্যযন্ত্র "ব্যাঞ্জো"র ন্যায় একটী যন্ত্র দেখিলাম। আলাপে জানিলাম ইহারা কেরাং গিরিশঙ্কটের পথে তিব্বতে যাইব; নেপাল হইতে চাউল লইয়া যাইতেছে।

ভুটীয়া সার্থবাহদের গতি অতি মন্থর। উহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নয়াকোট পর্ব্বত ক্রমে অপ্রশস্ত ও নিম্ন হইয়া দক্ষিণদিকে গিয়াছে। আমরা সমতল ত্যাগ করিয়া সোজা পশ্চিম মুখে পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। পর্ব্বতের উপর একটী বস্তি এবং তাহার পর হইতেই উৎরাই আরম্ভ। কিছুদূর নামিবার পর এক ভীষণ গর্জ্জন কর্ণে প্রবেশ করিল। আরও অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম ত্রিশূলী গঙ্গা ভীমনাদে উদ্দাম গতিতে দক্ষিণ দিকে ছুটিয়াছে। নদীগর্ভে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড—যেন এক একটী পাহাড়।

জলরাশি প্রচণ্ডবেগে এই সমস্ত শিলাখণ্ডের উপর পতিত হইয়া ভীষণ শব্দ উৎপন্ন করিতেছে। এ নদীতে কবির "নদীগানে কলতান" নাই, এখানে "ভৈরবের মহাসঙ্গীত "।

বাল্যে পাঠ করিয়াছিলাম "বর্ণঃ শুক্লো রসস্পর্শৌ জলে মধুরশীতলঃ"। তার পর পড়িলাম জল "tasteless, colourless, inodorous"। ত্রিশূলীর জল বর্ণগুণে যেন উভয় শাস্ত্রকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে। নদীর জল সবুজাভ নীল।

নদীতীর দিয়া ক্রমে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং ৯-৩০ মিঃ সময় ত্রিশূলীর সেতুর নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম।

ত্রিশূলীর উপর এখন একটী দোলায়মান লৌহসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এখান হইতে চারিমাইল দক্ষিণে দেবীঘাটের নিম্নে ত্রিশূলী ও সূর্য্যমতীর সঙ্গম। চৈত্রমাসে সেখানে দেবী ভৈরবীর মেলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই নদী-সঙ্গমস্থলে একটী কাষ্ঠসেতু নির্ম্মাণের চেষ্টা অনেকবার করা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এখানে প্রথমে একটী কাঠের ও পরে এই লৌহসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

ত্রিশূলীর পূর্ব্ব তীর দিয়া উত্তর দিকে কেরাং গিরিশঙ্কটে ও গোঁসাইকুণ্ডের যাইবার পথ। এই পথ নয়াকোটের উত্তরে ডাম্‌চা নামক স্থানে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক পথ কেরাং পাসের দিকে ও অপরটী গোঁসাইকুণ্ডে গিয়াছে।

শীতকালের সঞ্চিত তুষাররাশি দ্রবীভূত হইয়া অপসারিত হইলে পর যখন পার্ব্বত্য পথ উন্মুক্ত হয়, তখন, জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত অনেক যাত্রী গোঁসাই কুণ্ডে স্নান ও কুণ্ডস্থ শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিবার জন্য তথায় যাইয়া থাকে।

ডাম্‌চা ও গোঁসাইকুণ্ডের মধ্যে একটী গোলাকার খণ্ড পর্ব্বত আছে। পর্ব্বতটী স্বভাবের উদ্যান। শীতাবসানে নানাজাতীয় পার্ব্বত্য পুষ্প বিকশিত হইয়া পর্ব্বতটীকে সুশোভিত করে।

ত্রিশূলীর পূর্ব্ব তীরে দুই একখানা দোকান, বাজার পশ্চিম পারে। বাজারটী মন্দ নয়। পার্ব্বত্য পথের উভয় পার্শ্বে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিন্যস্ত ক্রমশঃ উচ্চ দোকানগুলি বেশ দেখায়। পুল পার হইয়াই বাম দিকে একটী পুলিশের আড্ডা। একজন হাবিলদার শ্রেণীর কর্ম্মচারী এই আড্ডার ভারপ্রাপ্ত। থানার দক্ষিণ দিকে পোষ্ট আফিস।

ব্রহ্মচারী ও আমি আসিয়া পৌঁছিয়াছি। অপর তিন জন আমাদের অনেক পশ্চাতে। আমরা পুল পার হইয়া থানার নিকট আসিলে পর পুলিশ কর্ম্মচারী আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। দরবার হইতে প্রাপ্ত অনুমতি ও আদেশপত্র দুইখানি আমি কর্ম্মচারীর হস্তে দিলাম।

বেঙ্গল পুলিশের নিম্নশ্রেণীর (subordinate) কর্ম্মচারীদের ব্যবহারের জন্য প্রথম যখন আণ্ডারভেষ্ট (under-vest) ও হোল্‌ডল্ (Holdall) প্রচলিত হয়, তখন সদর আফিস হইতে প্রত্যেক থানার দারোগা বাবুর নামে

পরোয়ানা দেওয়া হইয়াছিল যে তাঁহার থানায় উক্ত উভয় জাতীয় জিনিষের কতগুলি প্রয়োজন। গল্প প্রচলিত যে এক দারোগাবাবু উত্তর দিয়াছিলেন— "অধীন সবইং ইংরেজী জানে না। থানার রাইটার বাবু ছুটিতে বাড়ী গিয়াছেন। স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে পরোয়ানা দেখানে তিনি অভিধান দেখিয়া বলিলেন যে আণ্ডারভেষ্ট নীচে গায়ে দিবার কিছু, কিন্তু হোল্ডল্ অর্থ কি তাহা তিনিও বলিতে পারিলেন না।"

ত্রিশূলীর এই "অধীন" হাবিলদার লেখাপড়া জানে না, সে কাগজ দুইখানি লইয়া "স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার বাবু"র নিকট গেল, ব্রহ্মচারীজী ও আমি থানার বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে হাবিলদার ও পোষ্টমাষ্টার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পোষ্টমাষ্টার বাবু অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আফিসে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। আফিসের নিম্নতলে এক কম্বল বিস্তৃত হইল এবং আমরা উপবেশন করিলাম। হাবিলদার তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা ঘরের এক অংশ পরিস্কৃত করাইয়া পাকের স্থান নির্দ্দেশ করিল।

গাইড কনেষ্টবল ও ভারিয়া আসিয়া পৌছিল। হাবিলদারও আমাদের পরিচর্য্যার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিল। আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইলে ব্রহ্মচারীজী স্নানান্তে রন্ধনে নিযুক্ত হইলেন।

আমি যদিও বহুদিন অবগাহনে অনভ্যস্ত, তথাপি ত্রিশূলীর জল দেখিয়া অবগাহনের ইচ্ছা সংবরণ করিতে পারিলাম না। অবগাহনও যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল। নদী অত্যন্ত গভীর ও খরস্রোতা, নদীগর্ভে অতি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। যদি কোনও মতে স্রোতোবেগে একবার পদস্খলন হয়, তবে প্রস্তরখণ্ডের উপর পতন ও মৃত্যু অনিবার্য্য।

একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের অন্তরালে অবগাহন সম্পন্ন করিলাম। জল কি বিষম ঠাণ্ডা! বড় জোর ৩।৪ মিনিট জলে ছিলাম, সমস্ত শরীর যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

স্নান ভোজনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। সুধীরবাবুকে একখানা চিঠি লিখিলাম। আমি ও ব্রহ্মচারীজী যেন দুইটি অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব। আমাদিগকে দেখিবার জন্য বাজারের অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল। কেহ কেহ কিছু আলাপ করিল—কিন্তু অধিকাংশই নির্ব্বাক্ দ্রষ্টা।

বাঁলাজী হইতে আগত কনষ্টবলকে এখান হইতে বিদায় দিলাম এবং নয়াকোট হইতে আগত দ্বিতীয় কনেষ্টবল আমাদের সঙ্গী হইল।

১-৩০ মিঃ সময় ত্রিশূলী ত্যাগ করিলাম। হাবিলদার ও পোষ্টমাষ্টার বাবু অনেকদূর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিলেন। উচ্চ পর্ব্বতের উপর মহারাজের আম্র কানন। সকল গাছগুলিতেই এখন মুকুল দেখিলাম।

সায়াহ্নে ৫-৩০ মিনিটের সময় সামরী নামক এক বস্তিতে উপস্থিত হইলাম।

একটি প্রায় বৃত্তাকার অধিত্যকার উপর সামরী অবস্থিত। স্থানটী বড়ই সুন্দর। এখান হইতে চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টি চলে। নিম্নের সমতল ও দূরের শৈলমালা বড়ই শোভন দৃশ্য।

ত্রিশূলী ত্যাগ করিয়া এই অধিত্যকায় পৌছিতে অনেক "চড়াই উৎরাই" করিতে হইয়াছিল। পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে অধিত্যকা পর্য্যন্ত সমস্ত পথের উভয় পার্শ্বে অতি উচ্চ বৃক্ষ এবং তাহার পর উচ্চতর পর্ব্বতশ্রেণী আমাদের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যথেষ্ট মুক্ত বায়ু পাইতেছি না এবং গ্রীষ্মাতিশয্য বোধ করিতেছিলাম। অধিত্যকায় পৌছিয়া অবধি বিশুদ্ধ এবং স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া বড়ই স্ফূর্ত্তি পাইলাম।

অধিত্যকায় একটী ধর্ম্মশালা এবং ধর্ম্মশালার কিছু দূরে পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে লোকালয়। ধর্ম্মশালাটী দ্বিতল এবং প্রাঙ্গণে আর একখানি লম্বা ঘর আছে। নিকটেই জলাধার। দুরস্থ ঝরণা হইতে বাঁশের চোঙ্গ লাগাইয়া এখানে জল আনা হয়।

ধর্ম্মশালার প্রাঙ্গণস্থিত ঘরে প্রায় বিশ জন মুক্তিনাথ

যাত্রী রামানন্দী সাধু আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মশালার নিম্নতলে অনেক নেপালগামী ভুটীয়া ও নেপালী ভারিয়া আশ্রয় লইয়াছে। আমরা দ্বিতলের একটী প্রকোষ্ঠ অধিকার করিলাম এবং নিকটবর্ত্তী এক দোকানে পাকের আয়োজন করিলাম।

পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি। বালক বালিকারা একে অন্যকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া পথে খেলা করিতে আরম্ভ করিল। রামানন্দী সাধুগণ শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি করিয়া তাঁহাদের সঙ্গীয় বিগ্রহের আরতি করিতে লাগিলেন। সমস্ত স্থানটীতে যেন একটি আনন্দধারা বহিতে লাগিল।

১০ই মার্চ্চ। গত রাত্রে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছিল। অদ্য একাদশী, আমরা খুব বেশী দূর যাইব না, এই দুই কারণে একটু বেলা হইলেই শয্যা ত্যাগ করিলাম। ৭—৩০ মিনিটের সময় সামরী ত্যাগ করিয়া ২—৩০ মিঃ সময় পর্ব্বতের অপর প্রান্তে চৌরঙ্গী ফেদী নামক স্থানে আমরা উপস্থিত হইলাম। ত্রিশূলী হইতে আরম্ভ করিয়া চৌরঙ্গী ফেদী পর্য্যন্ত পথ অবিচ্ছিন্ন উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া—কোথাও সমতল ভূমিতে অবতরণ করিতে হয় নাই। পর্ব্বতের দুই পার্শ্বে বহু নিম্নে সমতল ভূমি। স্থানে স্থানে এক একটি পর্ব্বত এতই অপ্রশস্ত, যেন মনে হয় ক্ষেত্র মধ্যস্থ খুব উঁচু রেলপথের উপর দিয়া হাঁটিতেছি। নিকট-বর্ত্তী পাহাড়ে লোকালয় ও কোনও কোনও বস্তিতে "দেউল" (বৌদ্ধমন্দির) দৃষ্ট হইল। পথে একজন নেপালী ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে টাইফয়েড জ্বরের আবির্ভাব হওয়াতে চিকিৎসার্থ তিনি নেপাল দরবার হইতে প্রেরিত হইয়াছেন। কিছু দূর এক সঙ্গে গমনান্তর তিনি নিম্নে এক বস্তির দিকে চলিয়া গেলেন।

চৌরঙ্গী ফেদীতে নামিয়া আমরা এক পার্ব্বত্য নদীর তীরে আশ্রয় লইলাম। আমাদের পূর্ব্বে দুইজন সন্ন্যাসী ও পাঁচজন ভৈরবী সেখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপে জানিলাম তাঁহারাও মুক্তিনাথযাত্রী। মুক্তিনাথের পর ইঁহারা মানস সরোবর ও কৈলাস যাইবেন এবং সেখান হইতে আশ্রমে গাড়োয়াল জেলায় ফিরিবেন। এই সমস্ত ভ্রমণে তাঁহাদের প্রায় ৯ মাস লাগিবে। একজন সন্ন্যাসী বলিলেন যে ইহার পূর্ব্বে তিনি আরও দুইবার মানসসরোবরে গিয়াছিলেন। মানস সরোবরে যাইবার পথ তিনি আমাকে বলিলেন; আমি নোটবুকে টুকিয়া লইলাম।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর ভৈরবী ও সন্ন্যাসীর দল চলিয়া গেল। ব্রহ্মচারীজী এবং আমি স্নানান্তে নিকট-বর্ত্তী "পশলে" (দোকান) আহার্য্য অনুসন্ধানে গেলাম।

পর্ব্বতের পাদদেশে এক গৃহস্থের বাড়ী এবং তাহার অল্প দূরে দুই তিনখানা অতি সামান্য দোকান। দোকানে চিড়া দধি ও গুড় ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। আমরা কিঞ্চিৎ দধি পান করিয়া গাইড ও ভারিয়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

বেলা ৫—৩০ মিনিটের সময় গাইড ভারিয়া ও কনেষ্টবল আসিয়া পৌছিল। তখন আমরা পর্ব্বতের পাদদেশস্থ গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। আমরা ও ব্রহ্মচারীজীর রাত্রিবাস জন্য গৃহস্থ তাহার একখানা ঘর ছাড়িয়া দিল এবং অপর তিনজনকে তাহার ঘরের বারান্দায় স্থান দিল।

রাত্রে ব্রহ্মচারীজী ও আমি "পিনালু" অর্থাৎ কচুর গাঠী সিদ্ধ করিয়া খাইলাম এবং গৃহস্থের "প্রেমসে" প্রদত্ত কিছু দুগ্ধ পান করিলাম। সঙ্গী তিন জনের খাদ্য গৃহস্থের বাড়ী হইতে ক্রয় করিয়া দিলাম, উহারা পাক করিয়া খাইল।

অদ্য হইতে যে গাইড ও ভারিয়া, আমি ও ব্রহ্মচারীজী অপেক্ষা প্রায় দুই ঘণ্টা পশ্চাতে থাকিতে আরম্ভ করিল, এই ভাবেই তাহারা পর্য্যটনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল; আর কোনও দিন তাহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ, ভারিয়ারা প্রায় পনের মিনিট অন্তর দুই এক মিনিট বিশ্রাম করে। ইহা তাহাদের জাতীয় অভ্যাস। বিশ্রামের জন্য পথের পার্শ্বে অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে; পথের পার্শ্বে প্রস্তরখণ্ড স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া প্রায় একজন মানুষের সমান উঁচু করিয়া রাখা হইয়াছে। মধ্যভাগে একটা স্তর একটু বাহির করা;

এই স্তরের উপর পিঠের বোঝাটী একটু হেলান অবস্থায় রাখিয়া কেহ কেহ দাঁড়াইয়াই বিশ্রাম করে। যাহার অধিকক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন সে বোঝাটী নামাইয়া রাখিয়া বিশ্রাম করে। বোঝা রাখিবার এইরূপ উচ্চস্থান থাকাতে বোঝা নামাইতে কি উঠাইতে ভারিয়া দিগকে মাটীতে বসিতে হয় না কিংবা অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। ভারিয়ারা পথ চলিবার সময় মধুর স্বরে শিষ দিয়া চলে, বিশেষতঃ রওয়ানার সময়!

কনেষ্টবল ও গাইড ভারিয়ার সঙ্গেই চলিত সুতরাং তাহারা ও ব্রহ্মচারীজীও আমার পশ্চাতে থাকিত। ব্রহ্মচারীজী ও আমি এক ঘণ্টা অন্তর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করিতাম।

১১ই মার্চ্চ—ভোর ৬—৪৫ মিনিটে চৌরঙ্গী ফেদী ত্যাগ করিয়া আকু বাজারে পৌছিলাম। বাজারটী বড় অপরিস্কার। বাজারের নিম্নে একটি নদী আছে। নদীটী অপ্রশস্ত কিন্তু গভীর ও অত্যন্ত বেগবতী।

নদীর উৎপত্তিস্থল গোসাইথান তুষারশৃঙ্গ এবং নাম বেগবতী। নামটী পরিচিত হইলেও নদীটী বাণভট্টের "শ্রীমান্ শুদ্রকো রাজা"র রাজধানী বিদিশা নগরীর পাদ-মূলে প্রবাহিতা পরিচিতা বেত্রবতী নহে। এই বেত্রবতী কিছুদুর অগ্রে প্রবাহিতা হইয়াই ত্রিশূলীর সহিত মিলিতা হইয়াছে—মালবদেশ পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই।

নদীগর্ভ হইতে তীরভূমি অনেক উচ্চে। নদীতে অবতরণ কষ্টসাধ্য হইবে বিবেচনায় এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন না করিয়া বেত্রবতীর উপরিস্থ লৌহ সেতু পার হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

৮—১০ মিনিটের সময় আসে পশল নামক এক বাজারে পৌছিলাম। এস্থানটীও নদীতীরে, তবে নদী অপেক্ষাকৃত সমতলে প্রবাহিতা বলিয়া বেগ অত্যন্ত সংযত। নদীকূলে একস্থানে পাকের স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। অবগাহন, পাক, ভোজন ও বিশ্রাম অন্তে বেলা ১১--৫০ মিনিটের সময় আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। অনেক দুর পর্য্যন্ত নদীর কূলে কূলে যাইয়া পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় পর্ব্বতের উপর তৃণাচ্ছাদিত অতি বিস্তীর্ণ এক সমতল প্রান্তর আমাদের সম্মুখে পড়িল। প্রান্তরে তরু গুল্মাদির বাহুল্য নাই, পশ্চিম প্রান্তে মাত্র একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। স্থানটী বড়ই সুন্দর। বট বৃক্ষের পরেই খাড়া উৎরাই। পথিকেরা প্রায় সকলেই এই বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করে। আমাদের পূর্ব্বেও অনেকে বিশ্রাম করিতেছিল, আমরাও উপবেশন করিলাম।

একজন অন্ধ মন্দিরা বাজাইয়া ভজন গাহিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছিল, তাহার নিকটে একটি নয় দশ বৎসরের বালক দণ্ডায়মান। একজন স্ত্রীলোক অন্ধকে কিছু দান করিল। স্ত্রীলোকটীকে ভিক্ষা দিতে দেখিয়া বালক দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের নিকট উপবিষ্ট তাহার অভিভাবকের গলা জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার কাণের কাছে মুখ দিয়া কি যেন বলিল। লোকটি তখন হাসিয়া বালকে হাতে কিছু পয়সা দিল, বালক আবার দ্রুত গতিতে গিয়া ভিক্ষুককে দান করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

বিশ্রাম অন্তে আমরা নামিতে আরম্ভ করিলাম। উৎরাই শেষ করিয়া বুড়ী গণ্ডকীর তীরে পৌছিলাম। ৫--৩০ মিনিটের সময় বুড়ী গণ্ডকী উত্তীর্ণ হইয়া আরু ঘাট নামক স্থানে আসিলাম। বুড়ী গণ্ডকীও ত্রিশূলী ও বেত্রবতীর ন্যায় খরস্রোতা। নদীতে একটি লৌহ সেতু আছে।

আরুঘাট একটি সমৃদ্ধ সহর এবং পার্ব্বত্য সহরের হিসাবে যথেষ্ট পরিষ্কার। হৃদয়কৃষ্ণ নামক এক নেওয়ারের দোকানে আমরা আশ্রয় লইলাম। হৃদয়কৃষ্ণ নেপাল কলেজের অধ্যক্ষ বটকৃষ্ণ বাবুর অনুগত লোক। বটকৃষ্ণ বাবু হৃদয়কৃষ্ণের নামে আমার নিকট একখানা চিঠি দিয়াছিলেন। হৃদয়কৃষ্ণ অতি সাদরে আমাদিগকে স্থান দান করিল। আমরা অদ্য রাত্রে হৃদয়কৃষ্ণের অতিথি।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

অপূর্ণ

(উপন্যাস)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ত্যাগ।

সেইদিন অপরাহ্নে অশোক, যোগমায়া ও অম্বুর ভ্রাতাকে লইয়া আপনাদের বাড়ীর নিকটে একখানা ভাড়াটে বাড়ীতে লইয়া গেল। অশোকের পিতা মাতা বলিয়াছিলেন এবং অশোকেরও ইচ্ছা ছিল যে যোগমায়াও আপাততঃ কিছুদিন তাঁহাদের ওখানেই থাকেন, তার পর রীতিমত মকদ্দমা করিয়া কি ফল হয় দেখিয়া অন্য ব্যবস্থা। কিন্তু যোগমায়ার মাতৃগর্ব্বে এমন একটা আঘাত লাগিয়াছিল যে তিনি সম্মত হইতে পারিলেন না। রুক্মিণী অবস্থা বুঝিয়া আর সেই দিনটা থাকিয়া যাইতে যোগমায়াকে বলিতে সাহস করিল না। কিন্তু এই অক্ষমতার ক্ষোভ ও দুঃখে তাহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। যাঁহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া শ্রদ্ধা করে সেই তাহার পরমাত্মীয়কেও তাহার নিজের বাড়ীতে একটা দিন রাখিবার ক্ষমতা বা অধিকার নাই, এটুকু আজ দ্বিপ্রহরে যখন নূতন করিয়া এতখানি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন তাহার মনে হইল তাহারও যেন এ সংসারে আর সত্যকার স্থান নাই।

যোগমায়া চলিয়া যাইবার সময়ে রুক্মিণী তাঁহার পায়ে মাথা রাখি যখন প্রণাম করিয়া বলিল—"দিদি, আমার মত পোড়াকপাল কারুরও যেন না হয়। যাই হোক না কেন,আমায় তুমি যেন মন থেকে ঠেলো না। এইটুকু আমায় দয়া করো তুমি।"

অশ্রুজলে রুক্মিণীর কথা হারাইয়া গেল। রুক্মিণীর চোখের জলে যোগমায়ার পায়ের উপরটা ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি সস্নেহে রুক্মিণীকে উঠাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"ছোট বৌ, তুই যে আমায় কত ভালবাসিস তা কি জানি না আমি? তোর মন যে আমার কাছে দর্পণের চেয়েও পরিষ্কার। আমি সর্ব্বদা মন খুলে তোকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, তুই সাবিত্রী সমান হ। তুই কিছু ভাবিসনে ভাই, আমি যে আজ এমনি করে চলে যাচ্ছি এতে তোর কোন অকল্যাণ হবে না।" বলিতে বলিতে তিনি সজল নেত্রে বাড়ীর বাহির হইলেন।

অশোক যোগমায়াকে সংবাদ দিবার আগে অনেক কাণ্ড করিয়াছিল। মায়ের পত্রে বাড়ী বন্ধ করা সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সে প্রিন্সিপাল সাহেবকে অনেক বলিয়া কহিয়া ছুটি লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া স্বচক্ষে দেখিল যে শরতের বাড়ীর দুয়ার শরতের মায়ের নিকট রুদ্ধ করা হইয়াছে। তখন ক্রোধে ও ঘৃণায় সে একবারে জ্ঞানহারা হইল। সে একেবারে পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাসায় খবর দিয়া আসিল এবং যোগমায়াকে আনিবার জন্য টেলিগ্রাম করিল।

মা আসিয়া ছেলের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, আর সে এমন ছেলে যে মা বলিতে আত্মহারা হইত। ইহা মনে করিয়া অশোক সমস্ত দিন পরামর্শ প্রতিকারের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছিল। দুই চারিজন উকিল তাহাকে ভরসা দিয়াছিল যে শরতের মা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে চাবি ভাঙ্গিবার অভিযোগ করিলেই হেরম্ব বাবু কাবু হইয়া পড়িবেন। আজ যখন যোগমায়া দেশে আসিয়া পৌছিলেন তাহার পূর্ব্বেই সে উঠিয়া ডেপুটীবাবুকে এই সংবাদ দিবার জন্য ছুটিয়াছিল।

যোগমায়াকে নূতন বাসায় আনিয়া তাঁহার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অশোক তাঁহাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। হেরম্ব বাবুর নামে নালিশ করিতে হইবে। তাঁহাকে আদালতে শুধু এই কথা বলিতে হইবে যে তিনি সমস্ত চাবি

বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন এবং আসিয়া দেখিতেছেন সে সব তালা নাই তাহার স্থলে নূতন তালা। নালিশ করিতে হইবে তিন জনের নামে—হেরম্ব বাবু, বিষণ সিং দারোয়ান ও হেরম্ববাবুর সম্বন্ধী কেবলরাম।

সেইদিন যোগমায়া বাহিরে স্থির থাকিলেও তাঁহার অন্তরটা একেবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল। শরতের ম্লান মুখখানি যেন এই অতি ক্ষুদ্র নূতন বাড়ীটার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। শরতের ক্ষুব্ধ আত্মা যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া ফিরিতেছিল—"কেন মা তখন সে কথা শুনিলে না?" যোগমায়ার অন্তরে এখন ঝটিকা বহিতেছিল। তিনি অশোকের কথাগুলি শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া ছিলেন।

অশোক বলিয়া গেল, "সাক্ষীর অভাব হবে না খুড়িমা। যারা সব জানে, এমন দুই একজন বেঁকে দাঁড়িয়েছে সত্য, তবু সব সত্য কথা বল্‌বে।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া যোগমায়া বলিলেন—"আচ্ছা বাবা আমি যদি বলি ওসব হাঙ্গামে আর কায নেই, তুই কি বড় দুঃখিত হোস্?"

অশোক ব্যস্ত হইয়া বলিল—"না না খুড়িমা, তা কেন তুমি বল্‌তে যাবে? এতে তোমার ত লজ্জা নেই। যে ছোটলোকের মত লোভীর মত ব্যাভার করেছে তারই লজ্জা।"

যোগমায়া বলিলেন, "দেখ অশোক, আমি ভেবে দেখলাম এ বিবাদের মধ্যে আমি আর যাব না। এই দুখানা ঘরেই যে ক'টাদিন বাঁচবো, খুব কেটে যাবে। মেয়েটার জন্য ভাবনা। তা তুই রয়েছিস। মনে দুঃখ করিসনে বাবা!"

অশোক অত্যন্ত বিস্ময়ে যোগমায়ার পানে চাহিয়া বলিল, "বল কি খুড়িমা তুমি? সব ছেড়ে দেবে?"

যোগমায়া বলিলেন, "আটকে রাখবার উপায়ও ত নেই বাবা। তালা ভাঙ্গার মামলায় না হয় ওরা সাজা পেলে, আমিও আপাততঃ জিনিসপত্র ও বাড়ী পেলাম। তার পর জানিস্ তো বাবা, এসব কিছুতেই ত আমার আইন মত কোন অধিকার নেই। বাড়ী থেকে আমি উঠে যাই এই যখন ওঁদের ইচ্ছা, তখন কেন আমি আর বাধা দেব? আমি যদি থাক্‌বার স্বত্ব চাই, তখন ত মামলা কত্তে হবে বৌমার সঙ্গে—আমার শরতের বৌয়ের সঙ্গে!"

এইখানটায় যোগমায়ার গলাটা ধরিয়া আসিল।

একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তাতে আর কায নেই বাবা! যা নালিশ লিখিয়ে এসেছ উঠিয়ে নিয়ে এস। যাদের অধিকার তারাই নিক্ বাবা! আমার যা কিছু ছিল সব ত শরতের—কাযেই সবই বৌমার। সে বড় অভাগী। এ নিয়ে যদি একটু ভুলে থাকে, থাক্।"

অত্যন্ত আহত হইয়া অশোক বলিল, "আর তুমি মা হয়ে কি ভেসে যাবে খুড়িমা?"

যোগমায়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমায় যে ভগবান ভাসিয়েছেন বাবা! মানুষে তার কি করবে? আমিও তো অনেক পেয়েছি। শরতের কাছে আমি যা পেয়েছি সে যে আমার মনের মধ্যে জমা হয়ে আছে। বাড়ী ঘর তার তুলনায় তো কিছুই নয় বাবা!"

অশোক একবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল—"কিন্তু খুড়িমা, এমন করে শেষটা অত্যাচারীর কাছে হেরে যেতে হবে? তোমার বাড়ীঘর খুড়িমা, ওরা সুযোগ পেয়ে এমনি করে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে নেবে, আমরা তার কোন প্রতিকার করবো না?"

বলিতে বলিতে অশোক কাঁদিয়া ফেলিল।

"কেন অশোক দুঃখ করছিস্ বাবা? তুই কি আমাদের ভার নিতে পারবিনে? তোর কাছে কিছু নিতে ত আমার লজ্জা নেই বাবা! মনে কর্ ওদের জিনিস ওদের কাছে দিয়ে আমি তোর কাছে এসে আশ্রয় নিলাম। শাশুড়ী বৌয়ে মামলা সেটা কি ভাল? তার চেয়ে আর এক ছেলের কাছে আশ্রয় নেওয়া কি ভাল নয়?" বলিয়া যোগমায়া এমন পুত্রস্নেহের দাবীতে অশোকের পানে চাহিলেন যে, অশোক মনের ক্ষোভ অনেকটা ভুলিয়া বলিল, "তা হলে খুড়িমা আজ থেকে

তোমাদের ভার আমার। কিন্তু তুমি যে কিছু বলনা খুড়িমা।"

যোগমায়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা বাবা আজ থেকে বলব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মামলার তদ্বির।

যোগমায়া পুরী হইতে ফিরিয়াছেন এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবামাত্র হেরম্ব বাবুর দল কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। যোগমায়া আসিবার পরদিনই অপরাহ্নে হেরম্ব বাবুর বৈঠকখানায় তাঁহার হিতৈষিগণের একটা সভা বসিল।

এক বন্ধু বলিলেন, "ওহে এ খবরটা পাকা যে ডেপুটি একবার গোপনে তদন্ত করবেন। তা হলে আমাদের তদ্বিরটা একটু ভাল করে করতে হবে "

একজন পাকা উকিলের মুহুরী সেখানে ছিল। সে এই সুযোগে একটু আত্মীয়তা দেখাইয়া বলিল, "তার জন্য কিছু ভাববেন না শ্যাম বাবু, সে সব শিখিয়ে পড়িয়ে আমি ঠিক করে নেব। মামলা এমন সাজিয়ে দেব যে বাড়ী অনেকদিন থেকে আপনাদের দখলী সম্পত্তি তা প্রমাণ হয়ে যাবে।"

হেরম্ব বাবু তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "যা করবার তা হলে এখনি করে ফেল বাঁড়ুয্যে। শেষটা আবার বলে বস না যেন দুদিন আগে যদি বলতেন তাহলে কি এমন মামলা ফসকায়। তোমাদের আবার সে গুণটি বিলক্ষণ আছে।"

লোকটি সত্যকারই পাকা মুহুরী বলিয়া এই খোঁচাতে কিছুমাত্র না দমিয়া অন্ততঃ বাহিরে সে ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া কহিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ছোট বাবু, আপনার যদি জিৎ না হয় আমি মুহুরীগিরি ছেড়ে দেব। এ ত আপনার ন্যায্য অধিকার। কত বলে রামের জিনিষ শ্যামকে দখল দিয়ে দিলাম। এই সেদিনও ত হরিশ রায়কে এক কথায় তার মামীর বাড়ীতে বসিয়ে দিলাম। মাগী এখন কাশীতে গিয়ে কোন ছত্তরে বুঝি রাঁধে আর খায়। মাগী কি কম জাঁহাবাজ, বাপরে বাপ! যাবার আগে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করে বল্লে কি না আমায় যেমন তুমি পাকেচক্রে আমার স্বামীর ভিটে থেকে তাড়ালে, তোমার পরিবারকেও একদিন যেন ছেলে মেয়ের হাত ধরে এমনি করে বেরুতে হয়। মাগীকে এক ধাক্কা দিয়ে বাড়ী পার করে দরজা বন্ধ করি, তবে থামে।"

ঘরের শেষ প্রান্তে একজন নূতন লোক কোন ফাঁকে আসিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "মাগীর বড় অপরাধ বাঁড়ুয্যে মশায়! তাকে আপনি ভিটে ছাড়া কল্লেন, সে কি এসে আপনার স্তবস্তুতি করবে বল্‌তে চান?"

বাঁড়ুয্যে লোকটি তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, একি বড় বাবু যে! কবে এলেন? দেশের দিকে যে ফিরেও চান না। কেবল তীর্থ ধর্ম্ম নিয়েই দিন কাটাচ্ছেন?"

বলিয়া জিজ্ঞাসুভাবে তাহার পানে তাকাইল। হরিশ রায় ও তাহার ভগিনীর কথা যে কখনও উঠিয়াছিল এমন ভাবও তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না।

পূর্ব্বোক্ত লোকটি কহিলেন, "কাল সবে এসেছি, এসেই তোমাদের সব সাধু কীর্ত্তিকলাপের কথা শুনছি।"

তার পর হেরম্ব বাবুর পানে চাহিয়া কহিলেন, "যেরকম সব করে তুলছ মণি, এতে আর তোমাদের এদিকে ফিরবার ইচ্ছে নেই। এইবার শেষ।"

যিনি বলিলেন ইনি হেরম্ব বাবুর জ্যেষ্ঠ ভাই। নাম ভৈরবচন্দ্র। ইনি এককালে খুবই সৌখীন ও বাবু ছিলেন। তখন অবস্থাও খুব ভাল ছিল। হঠাৎ স্ত্রী-বিয়োগ হইলে একেবারে বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাসীগোছ হইয়া পড়িয়াছেন। হেরম্ব বাবুকে নিজের বিষয়ের অংশের যাহা কিছু আয় সমস্তই ছাড়িয়া দিয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে কাটাইয়া থাকেন। বৎসরে কেবল একবার দেশে ফিরেন; ২।১ দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যান।

দাদার কথা শুনিয়া হেরম্ব বাবু বলিলেন, "আসতে না আসতে আপনি কি এমন শুনলেন যার জন্তে অমন বলছেন ?"

তাঁহার দাদা বলিলেন, "শরৎ বাবাজীর মাকে তুলে দিয়ে তুমি যে ভাড়াটে বসাবার সংকল্প করেছ, বা নিজেই মেয়ের হয়ে দখল করবে ভেবেছ, সেটিকে ত আমি কিছুতেই ভাল বলতে পারিনে মণি।"

হেরম্ব বাবু যুক্তি মনের মধ্যে যেন বেশ করিয়া একটু শাণাইয়া লইয়া বলিলেন—"আপনিও যে একবারে পরোপকারী লোকদের মত কথা বল্‌ছেন। ভেবে দেখুন ওটা আমার বিধবা মেয়ের সম্পত্তি, কারও উপর দয়া করে ওটা ছেড়ে দেবার অধিকার আমার নেই। আর এখন বেঁচে থাকতে ওর বাড়ীর ব্যবস্থাটা করে না গেলে আমার অবর্ত্তমানে কি ওরা একে বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে দেবে ভেবেছেন ? কথনো নয়। তার উপর সম্পত্তির অবস্থাও জানেন ; তার জন্তে আলাদা করে কোন ব্যবস্থা করে যাব সে ক্ষমতাও নেই। ছেলেটা এখনি যে রকম হয়ে উঠছে, ও যে বড় হয়ে কাউকে তুমুঠো ভাত দেবে তার ভরসাও খুব কম। এ অবস্থায় আমাকে কি করতে বলেন ?"

ভৈরব বাবু বলিলেন, "শরতের মাকে জীবনসত্ত্ব তুখানা ঘর দিয়ে বাকী গুলো দখল করলেই পারতে। ঘরের ত অভাব ছিল না।"

হেরম্ব। তা হলে ত সে তুখানা ঘর থেকে আমার মেয়েকে বঞ্চিত করতে হ'ত। যখন সব শুনেছেন তখন ওদের কথাও ত শুনেছেন ! আইনতঃ ওঁর তো কোন অধিকার নেই। এ অবস্থায় আমার অধর্ম্ম করা কোন খানটায় হল ? হিন্দু আইন হিসেবেই ওঁর এতে কোন অধিকার নেই।"

ভৈরব। আইন পালন করাটাই সব সময়ে ধর্ম্ম পালন করা নয় মণি। তোমার বাড়ী থেকে যদি কোনও লোক ক্ষিদের জালায় তুমুটো চাল চুরী করে, আর তার জন্তে যদি তুমি তাকে পুলিশে দাও, তাহলে তোমার আইনমতে কায করা হবে, কিন্তু ধর্ম্ম মতে নয়।"

উপরের কথাগুলি এমনি জোরের সহিত ভৈরব বাবু বলিলেন যে কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য তাঁহার মনে অত্যধিক জাগরূক থাকিলেও হেরম্ব বাবু বলিলেন, "আমি কি শরতের মাকে একেবারে বাড়ী থেকে চিরকালের মত তাড়িয়ে দিতে বলছি ? বাড়ীটা একবার আগে দখল নিই, তার পর তাঁকে ডেকে এ'ন নীচের একটা ঘর ছেড়ে দেব। বিধবা—তাঁর একটা ঘরই যথেষ্ট। আমার কাছে একবার আসতে তাঁর অপমান হল। তিনি গেলেন আমার নামে নালিস করতে ! আমিও অল্পে ছাড়ছি না।"

তার পর সেই পরিপক্ক উকিলের মুহুরির পানে চাহিয়া বলিলেন, "কৈ বাড়ুয্যে, বিষণ সিং টিংদের একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ দিকি। আবার তারা যা তা না বলে বসে।"

ভৈরব বাবু নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মুহুরি মহাশয়ের আদেশে স্বরূপ ও কেবলরাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্বরূপের প্রতি মুহুরীর প্রশ্ন হইল—"তুমি কদিন হল এখানে ফিরেছ ?"

স্বরূপ। সবে পরশু ফিরেছি।

মুহুরী। এর আগে কোথায় ছিলে ?

স্বরূপ। বাবুর এক চিঠি নিয়ে ঘোড়ামারায়।

মুহুরী। সেখানে কতদিন ছিলে ?

স্বরূপ। দশ বার দিন।

মুহুরী। ৩রা চৈত্র বুধবার কোথায় ছিলে মনে আছে ?

স্ব। সেই ঘোড়ামারাতেই।

মুহুরী। কি করে তোমার মনে থাকল যে ৩রা চৈত্র তুমি সেখানে ?

বি। আজ্ঞে আজ ১০ই চৈত্র বুধবার। আমি এসেছি পশু ৮ই। সেখানে ছিলাম ১০।১২ দিন। কাযেই সেখানেই ছিলাম।

তার পর বিষণ সিংকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তাহার বারের বা তারিখের ঠিক মনে নাই ! তবে

সপ্তাহ দুই হইতে তাহার মরিবার সময় ছিল না— জামাই বাবুর বাড়ী যাওয়া ত দূরের কথা। সকালে উঠিয়া বাবুর আদেশে সে এ গ্রাম ও গ্রাম করিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া রান্না বান্না করিয়া খাইয়া তৎক্ষণাৎ শয়ন করিয়াছে।

তার পর আসিল কেবলরামের পালা। সে বেচারা তাহার সেই সেদিনকার অসৎকর্ম্মের সঙ্গীদের 'কথা-বার্ত্তায় স্তম্ভিতপ্রায় হইয়াছিল। তাহার সেই নিরীহ চোখ দুটা যেন বড় করিয়া চাহিয়া তাহাদের বলিতে চাহিতেছিল, "অ্যাঁ! বল কি বিষণ, বল কি স্বরূপ? সে রাত্রের কথা কিছুই জান না?"

কেবলরাম যে বাবুর সম্বন্ধী তাহা মুহুরী জানিত বলিয়া সে কেবলরামকে একটু আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এবার তোমার কথা বলত ভাই।"

কেবলরাম তাহার গরুর মত শান্ত চোখ দুটা মেলিয়া মুহুরির পানে একবার চাহিল। ভাবটা—কি কথা বলিবে?

মুহুরী জিজ্ঞাসা করিল, "দিন ৬।৭ আগে তুমি একদিন তোমার ভাগ্নীর শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলে?"

কেবলরাম মৃদুস্বরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ গিয়েছিলাম।"

হেরম্ব বাবু তাহার পানে কটমট করিয়া চাহিলেন।

মুহুরী বলিল, "বাঃ দিন আষ্টেক থেকে তোমার খুব পেটের অসুখ হয়েছিল তখন বল্লে, আর এখনই ভুলে গেলে!"

কেবলরাম একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, "আপনি বল্লেন তা মনে আছে। তবে আমার ত পেটের অসুখ হয় না।"

"বাঃ শ্রীবিলাস কবরেজের ডালিম পাতার রস দিয়ে ওষুধ খেলে ক'দিন সে বুঝি শুধু শুধু?"

বেচারা অবাক হইয়া রহিল। কবে বা তাহার পেটের অসুখ হইল, এবং কবে বা কি করিয়া তাহা সারিল ইহা ভাবিয়া সে কিছুই কূল কিনারা পাইল না।

মুহুরী আর অন্য রকমে চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আজ কি বার বল ত?"

কেবলরাম এতক্ষণ পরে একটা জবাব দিবার মত প্রশ্ন পাইয়া সোৎসাহে বলিল, "বলব? আজ বুধবার।"

মুহুরী। আচ্ছা আজ বুধবার, এর আগের বুধবারের রাত্রে তুমি কোথাও গিয়েছিলে?

কেবলরাম একটু ভাবিয়া বলিল, "হ্যাঁ গিয়েছিলাম বৈকি। জামাই বাবুর বাড়ী। ছোট দাদাই ত আমাকে -"

কিন্তু কেবলরামের আর অগ্রসর হওয়া হইল না। হেরম্ব বাবু অত্যন্ত উগ্রস্বরে স্বল্প কথায় বলিলেন, "গাধা!"

কেবলরাম তাহার জামাই বাবুর বাড়ী যাওয়ার সহিত ঐ ভারবাহী পশুর কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিস্ময় ও ভীতিবিহ্বল মুখে তাহার অন্নহারক ও আশ্রয়দাতা ভগিনীপতির পানে চাহিয়া রহিল।

হেরম্ব বাবুর ইচ্ছা হইতেছিল কেবলরামের কর্ণ দুটি ধরিয়া কি তাহাকে বলিতে হইবে তাহা ঠিক সাধারণ রকমে নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠের সন্নিধিতে সেই হিতকারক কার্য্যটা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তবু তাহার দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া কহিলেন - "বেশী জেঠামো করিসনে কেবলা। তুই কোনওদিন কোনওকালে কোনও রাত্তিরে শরৎদের বাড়ী যাস্‌নি। আমি তোকে কোথায়ও কখনও পাঠাইনি।"

তথাপি সেই নির্ব্বোধ শিশুর মত সরল যুবক বলিল, "সেই যে আপনি আমাকে যেতে বল্লেন ছোট দাদা!" বলিয়া সেই দাদার ক্রুদ্ধ ও ভীষণ মুখভাবের পানে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন কেহ তাহাকে বলিল বোকারাম, কেহ বলিল অকালকুষ্মাণ্ড, কেহবা বলিল, বাবুর ঘরে এমন গাধাও জন্মায়। এমন কি যে মুহুরীটি একটু আগে তাহাকে বাবুর শ্যালক বলিয়া একটু সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিল, সেও বলিয়া ফেলিল, "এ সাদা কথাটিও

বুঝতে পার না—ভগবান্ বুঝি ঘটে বুদ্ধি জিনিসটা একেবারেই তোমায় দিতে ভুলে গিয়েছেন।"

সকলে যখন কেবলরামের উপর এই বিদ্রূপ ও অপমান বর্ষণ করিতে ব্যস্ত, এমন সময় ভৈরব বাবু উঠিয়া কেবলরামের কাছে গিয়া তাঁহাকে কাছে আনিয়া সস্নেহে বলিলেন, "কেবল, তুমি দুঃখ কোর না ভাই। ভগবান্ বুদ্ধি তোমায় একটু কম দিয়েছেন বটে, কিন্তু বুদ্ধির চেয়ে বেশী ভাল, সত্যের মর্য্যাদাটা এখানকার অনেকের চেয়ে বেশী দিয়েছেন। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ভাই? কত দেশে বেড়াব তোমাকে নিয়ে।"

কেবলরাম তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছিয়া বলিল—"হ্যাঁ বড়দা যাব। কবে আপনি যাবেন?"

ভৈরব বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যেদিন যাব তোমাকে নিয়ে যাব।"

পরে হেরম্ব বাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "মণি, তোমার এই বোকা সম্বন্ধীকে আমাকে দেও। এঁর কাছে তোমার ত আর কোন প্রত্যাশ নেই।"

কথার ভিতর যে খোঁচাটুকু ছিল তাহা যথাস্থানে পৌঁছিল। কিন্তু যে দাদার বিষয়ের অংশের আয় হইতে যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ হইতেছে তাহার উপর ক্রোধ বা আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন—"তা নিয়ে যাবেন—আমিও বাঁচি।"

এই কথা শুনিয়া কেবলরাম সমস্ত মন দিয়া যেন মুক্তিলাভ করিল। সে ভৈরব বাবুর দিকে আর একটু সরিয়া বসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

যে ঘরে হেরম্ব বাবুরা বসিয়া এই সব আলোচনা করিতেছিলেন তাহার পাশেই একটা ঘরে ভৈরব বাবুর জন্য একখানি চৌকির উপর কম্বল বিছান ছিল। যখন তিনি আসেন ঐ ঘরটাই অধিকার করেন। বাড়ীর মধ্যে বড় একটা যানই না।

কেবলরামকে ছাড়িয়া দিতে ভ্রাতার কোন আপত্তি নাই শুনিয়া তিনি তাঁহার ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। সঙ্গে কেবলরামও আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল।

হেরম্ব বাবুর ঘরে তখন পুরাদমে জবানবন্দী ও জেরার রিহার্সাল চলিতে লাগিল। কিন্তু কেবলরামকে লইয়া কি করা যাইবে সেই সম্বন্ধে মস্ত একটা খটকা রহিয়া গেল।

এই সব ব্যাপার লইয়া যখন সকলেই ব্যস্ত এমন সময় একটি লোক আসিয়া হেরম্ব বাবুর হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি পড়িয়াই হেরম্ব বাবু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সকলে শুনাইয়া তিনি বলিলেন, "ওহে, হরেন বাবু লিখছেন—একটা সুসংবাদ। মোকদ্দমার জন্য আর ভাবতে হবে না। বেয়ান কেস্ উঠিয়ে নিয়েছেন—তিনি মামলা চালাবেন না।"

শ্যামবাবু নামক বন্ধু বলিলেন, "মাগী বোধ হয় শেষটা ভয় পেয়ে গেল।" কথাটা হেরম্ববাবুর মনঃপূত হইল।

তার পর শেষে "বেশ হল, খাসা হল," ইত্যাদি অভিনন্দনে হেরম্ব বাবুকে আপ্যায়িত করিয়া একে একে সকলে উঠিয়া পড়িলেন। সবাই চলিয়া গেলে ভৈরব বাবু ডাকিলেন, "মণি, শুনে যাও"

হেরম্ব বাবু ভ্রাতার নিকটে আসিলেন। কেবলরাম তখন বাড়ীর ভিতর গিয়াছিল।

ভৈরব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করবে ভাবছ মণি?"

হেরম্ব বাবু বলিলেন, "যদি শরতের মা এসে বলেন, আমাকে থাকার জায়গা দিন, তবে দেব, নইলে দেব না।"

ভৈরব বাবু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ মণি, যদি আমার কথা শোন, তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে ঐ বাড়ীতে বসাও। সুনুকেও সেখানে পাঠিয়ে দেও। তাহলে তোমার মুখও থাকবে, ধর্ম্মের কাছেও অপরাধী হতে হবে না।"

হেরম্ব। আমি ত আপনাকে আগেই বলেছি মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমি তা করতে পারিনে। আর উনি ভেবে চিন্তে সুবিধে না দেখে কেস্ তুলে

নিলেন বলে আমাকে বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে?

ভৈরব। মণি, কখনো ভেবনা যে তিনি ভয়ে বা আশঙ্কায় মকদ্দমা তুলে নিচ্চেন। তিনি মোকদ্দমা চালালে তোমাকে বিপদে পড়তে হত। তোমার নিজের বাড়ীতে যদি কেউ বাস করে, তারও অবর্ত্তমানে তুমি তাকে বাড়ী চড়াও করে জিনিষ আনতে পার না। কিন্তু তিনি ছেড়ে দিয়েছেন এই জন্যে যে তার মাতৃগর্ব্বে আঘাত লেগেছে। যার মনে একটু বেশী আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে তাঁর পক্ষ লোকের কাছে বলা বড় শক্ত যে আমি মা, আমার বাড়ী থেকে তাড়াতে পার না।

হেরম্ব। তা হলে কি আপনি বলতে চান যে তিনি মামলা তুলে নিলেন বলেই আমাকে তাঁর খোসামদ করতে হবে?

ভৈরব। তুমি যদি তাঁকে বাড়ীতে ফিরে আসতে না বল, তা হলে তোমার একটা মহা অনিষ্ট হবে এ আমি তোমাকে বলছি।

হেরম্ব। এ কথা আপনার বলবার কি হেতু?

ভৈরব। তোমাকে একটা কথা বলি শোন। আমি অনেক সাধু সন্ন্যাসীর কাছে শুনেছি, আর নিজেও প্রত্যক্ষ করেছি যে, একজন যদি আর একজনের উপর বিনা দোষে অত্যাচার করে, আর সেই নির্দ্দোষ লোক যদি কোন অভিসম্পাত না দিয়ে কোন দুর্ব্বাক্য না বলে শুধু ভগবানকে সে কথা জানায়, তাহলে যে অত্যাচার করে তার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। নিজে হাতে দণ্ডের ভার না নিয়ে ভগবানের হাতে দণ্ডের ভার দিলে দণ্ডের পরিমাণ খুব বেশী হয়ে থাকে।

হেরম্ব। এখানে বিনাদোষে অত্যাচার হচ্চে?

ভৈরব। অত্যাচার আর কাকে বলে মণি? অদৃষ্টদোষে বিধবা হল। তার পর ছেলে মারা গেল—তবু সেখানকার মায়া কাটাতে পারলে না। আর তুমি আইনের ওজর দেখিয়ে তার অনুপস্থিতিতে সেই বাড়ী অধিকার করে বসলে! আইন যাই কেন বলুক না, ভগবান আর মানুষের হৃদয় কিছুতেই মানবে না যে মায়ের কোন অধিকারই নেই, বৌয়েরই অধিকার।

হেরম্ব ঠিক মত উত্তর দিতে না পারিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনার বিষয়ের আয়টা ক'বছর থেকে নিচ্চি কি না, তাই আপনি অত করে দুর্ব্বাক্য বল্লেন।"

ভৈরব বাবু হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তার পর ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, "এতদিন পরে তুমি যদি এই কথাটাই ঠিক করে থাক যে আমার বিষয়ের আয়টা তুমি ভোগ করছ বলেই আমি তোমাকে এসব কথা বলচি, তা হলে আমার আর বলবার কিছু নেই। বিষয়ের আয় ত তুমি জোর করে বা ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছ না যে, আমার সে জন্য কোন রকম অসন্তোষ হবে। আমার ইচ্ছে ছিল সে সম্পত্তিটা তোমার নামে না দিয়ে সুধীরের নামে দেব, সে জন্য এতদিন দানপত্র করে দিইনি। এবার সব শেষ করে যাব। কিন্তু এখনও আমার অনুরোধ শোন মণি। তাঁকে সন্তুষ্ট করে ফিরিয়ে আন। মেয়েটীকে দুচারবার সেখানে পাঠাও। ক্রমশ আপনি আপনি দখল হয়ে যাবে। নইলে সত্য বলছি মণি, তোমার জন্যে নয়, আমার বেশী ভয় হয় সুধীরের জন্যে। আমি এরকম ঘটনা ২।৪টা দেখেছি।

শেষের কথাকয়টি ভৈরব বাবু মৃদুস্বরে যেন আপনা আপনি কহিলেন।

"কিছু না হলেও আপনি কেবল ঐ রকম করে অমঙ্গল ডেকে আনবেন। আপনার বেশী স্নেহ কি না।" —বলিয়া হেরম্ব বাবু দ্রুতবেগে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ভৈরব বাবু আপনা আপনি কহিলেন—"ভগবান্ যাকে তুমি ধ্বংসের পথ নিয়ে যাও, স্নেহেরই হউক আর বুদ্ধিরই হোক কোন কথাই তুমি তখন তার কাণে তুলতে দাওনা।" বলিতে বলিতে সেই সংসারত্যাগী স্নেহময় ভ্রাতার মুদ্রিত চক্ষুতে ফোটাকয়েক জল পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির প্রভাব*

সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই মানুষ এই বিশ্ব প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার জীবন যাত্রাকে নিয়মিত করিয়াছে, তাহার প্রভাবে সুখে দুঃখে হর্ষে বিষাদে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অথচ আবার সুদীর্ঘ পরিচয়ের ফলে এই সমস্ত ব্যাপারেই একান্ত অভ্যস্ত হইয়া ইহাকে নিতান্ত সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা কবি ও দার্শনিক, তাঁহারা এই বিরাট বিশ্ব ব্যাপারের অন্তরালে যে এক অখণ্ড ও অসীম রহস্য লুক্কায়িত আছে, প্রাত্যহিক জীবনের অভ্যস্ত ঘটনা ও আবেষ্টনীর মধ্যে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান আছে, তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছেন এবং দর্শন ও কাব্যের মধ্য দিয়া আপনাদের সেই প্রকাণ্ড বিস্ময় ও সৌন্দর্য্য-বোধকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।

কিন্তু কাব্য ও দর্শন উভয়েরই উৎপত্তি এই এক বিস্ময় ও সৌন্দর্য্য বোধ হইতে হইলেও ইহাদের প্রকৃতি ও কার্য্য একরূপ নহে। দর্শন যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে গিয়াছে, সৌন্দর্য্যকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা কাব্যের কার্য্য নহে। সে ভাষার তুলিকাপাতে প্রকৃতির এই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে, কল্পনার সাহায্য লইয়াই এই অনন্ত রহস্যের মীমাংসা করিয়াছে; এবং নিখিলের এই বিচিত্রতার মধ্যে মানুষের জন্য যে আনন্দরস নিঃসৃত হইতেছে তাহার বণ্টনভার লইয়াছে।

পৃথিবীতে যে কয়জন মহাকবি নিপুণতার সহিত এই কার্য্য করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম।

তাঁহার কাব্যের যে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব পাঠকের চক্ষে পড়ে সে হইতেছে প্রকৃতির সহিত তাঁহার নিবিড়তম পরিচয়। তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রেই দেখিতে পাই প্রকৃতির প্রতি গভীরতম অনুরাগ এবং বিশ্বব্যাপারের মধ্যে যে অসীম রহস্য ও সৌন্দর্য্য, তাহার তীব্রতম অনুভূতি দেদীপ্যমান হইয়াছে।

প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য ও রহস্য চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের মনকে আকুল করিয়াছে। শৈশবে দুষ্টা সহচরীর মত ইহা তাঁহাকে তাঁহার শৈশব কর্ত্তব্য হইতে ভুলাইয়া লইয়াছে।

> "বারে বারে
> শৈশব কর্ত্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে,
> ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি
> দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
> পাঠশালা কারা হ'তে; কোথা গৃহকোণে
> নিয়ে যেতে নির্জ্জনেতে রহস্য ভবনে,
> জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে
> কি করিতে খেলা, কি বিচিত্র কথা ব'লে
> ভুলাতে আমারে!"

যৌবনে ইহাই আবার প্রেয়সীর রূপ ধরিয়া মোহন-সংগীতমুগ্ধ কুরঙ্গসম কোন্ কল্পলোকে তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেছে; এবং প্রাণে অসীম আকাঙ্ক্ষা-রাশি জাগাইয়া স্বপ্নগঠিত মূর্ত্তির মত ধরা না দিয়া নভোনীলিমার মাঝে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়াছে। আবার জীবনসন্ধ্যার পরপারের খেয়ামাঝির মূর্ত্তি ধরিয়া অস্তায়মান রবির সুবর্ণ আভায় কাজ ভাঙ্গান গান গাহিয়া ইহা তাঁহার মনকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে।

'সুরদাসের প্রার্থনা'র মধ্য দিয়া কবি তাঁহার চিত্তের উপর প্রকৃতির এই অসীম প্রভাবের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই অপার ভুবন, উদারগগন ও শ্যামল কানন তল এই 'শরৎ আকাশের অসীম বিকাশ শুভ্রতনু জ্যোৎস্না,' ও 'তড়িৎ-চকিত সঘন বরষার পূর্ণ ইন্দ্রধনু' এই 'দিগন্ত-প্রসারিত বিচিত্র শোভাময় শস্যক্ষেত্র' এবং 'সুনীল গগনের

* শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদীন্দ্র নাথ রায়ের সভাপতিত্বে রামমোহন লাইব্রেরী হলে পঠিত।

ঘনতরু-নীল অতিদূর শস্যক্ষেত্র' সমস্তই নিশিদিন তাঁহাকে অভিভূত করিতেছে।

"ইহারা আমাকে ভুলায় সতত
কোথা নিয়ে যায় টেনে,
মাধুরী-মদিরা পান করি শেষে
প্রাণ, পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরী কাড়ি,
পাগলের মত রচি নব গান
নব নব তান ছাড়ি'।
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া
আপনি অবশ মন,
ডুবাইতে থাকে কুসুম গন্ধ
বসন্ত সমীরণ!
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে
ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না প্রবাহ
সর্ব্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার,
বেষ্টন করে কায়া।"

নিখিল ভুবনের মধ্যে এই ভুবনমোহিনী মায়া, the light that never was on sea or land রবীন্দ্রনাথের মতে আর তিনজন কবিকেও মুগ্ধ করিয়াছিল; তাই সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে তাঁহারাও এক স্নিগ্ধ শান্ত সৌন্দর্য্য ও আনন্দের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। Wordsworth বলিয়াছিলেন—

My heart beats up when I behold
A rainbow in the sky!

মেঘদর্শনে রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভাবোচ্ছ্বাস উঠে—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে নাচেরে
ময়ূরের মত নাচেরে
হৃদয় আমার নাচেরে

তাহারই সহিত ইহা এক পর্য্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের মত Wordsworthও যে অনুভব করিয়াছিলেন—

There is joy in the mountains,
There is life in the fountains,

এই বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি পদার্থই তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার আনিয়াছিল।

The birds around me hopped and played
Their thoughts I cannot measure;
But the least motion that they made,
It seemed a thrill of pleasure.

The budding twigs spread out their fan
To catch the breezy air,
And I must think, do all I can,
That there was pleasure there!

Keats প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে এমন তন্ময় হইয়া যান যে দেশ. কাল পাত্রের কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া পড়েন। আনন্দের আতিশয্যে সমস্ত প্রাণের মধ্যে যেন এক বেদনা ও অবশতা অনুভব করেন।

My heart aches, and a drowsy
numbness pains
My sense, as though of hemlock
I had drunk.

প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যে কত গভীর, তাহা প্রাণে যে কি উন্মাদনা জাগাইয়া তুলে তাহা ধীরভাবে যাঁহারা Keatsএর "I stood tiptoe upon a little hill" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন।

Shelley এই ভুবনমোহিনী মায়াকেই বুঝি Spirit of Beauty বলিয়াছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে ইহার চকিত স্পর্শ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে ইহার অস্ফুট চিত্র ও তিনি লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত তাঁহারও

রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়
তরু মর্ম্মরে ছায়ার খেলায়
কি মুরতি তব নীলাকাশ শায়ী
নয়নে ওঠেগো আভাসি!

কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতিকে অন্তরেরমধ্যে তিনি

ধরিয়া রাখিতে পারেন যাই। তাই সারাজীবন ইহার জন্য কাঁদিয়াই তিনি শেষ করিয়াছেন। কাঁদিয়া বলিতেছেন—

Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost glance upon
Of human thought and form, where art thou gone?
Why dost thou pass away and leave own own state
This dim, vast vale of tears, vacant and desolate?

Shelley প্রকৃতিকে ভালবাসিয়াছিলেন; প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে এক ইন্দ্রিয়োম্মাদনাকারী আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিপ্রাণ প্রকৃতির স্পন্দন আপনার জীবনে অনুভব করিয়াছিল, প্রকৃতির অসীম রহস্যে বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া কবি তাই বলিতেছেন—

Mother of this unfathomable world!
Favour my solmen song, for I have loved
Thee ever, and thes only; I have watched
Thy shadow and the darkness of thy steps,
And my heart ever gazes on the depth
Of thy deep mysteries.

আবার বলিতেছেন—

I love snow, and all the forms of the radiant frost;
I love waves, and winds and storms, eveything almost
Which is nature's and may be
Untainted by man's misery.

কিন্তু তাঁহার কবিতা ধীরভাবে পড়িলে মনে হয় তাঁহার মন

The awful shadow of some unseen power
Floats though unseen among us, visiting
The various worlds with as inconstant wing
As summer wind that creeps from flower to flower.

অর্থাৎ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যাপেক্ষা যে অজ্ঞাত রহস্য ইহার মধ্য দিয়া ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল দক্ষিণ বাতাসের মত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে তাহার জন্যই অধিকতর ব্যাকুল হইয়াছে।

"Harmonies
Of the plains and of the skies,
Of the forests, and the mountains,
And the many-voiced fountains

অর্থাৎ প্রান্তর এবং আকাশের, অরণ্য পর্ব্বত এবং নির্ঝরিণীর সংগীত ধ্বনি তিনি শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনকে ইহা তেমন করিয়া আকুল করিতে পারে নাই; ইহার মধ্যে যে অনন্ত দিক্‌প্লাবী সংগীতের প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে সেই দিব্য সংগীতের জন্যই তিনি পাগল হইয়াছেন। Shelley তাই বলিতেছেন—

I pant for the music which is divine
My heart in its thirst is a dying flower.

Shelleyর ন্যায় রবীন্দ্রনাথও চিরদিন ইহার জন্য উতলা হইয়াছেন; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমেই তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে এই ব্যাকুলতা অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় দিব্য সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষায় পার্থিব সৌন্দর্য্যের প্রতি তিনি কোনদিনই বীতশ্রদ্ধ হন নাই। বরং আমার মনে হয় Shelley অপেক্ষাও তিনি বাহ্যপ্রকৃতির মধ্যে মজিয়া গিয়াছেন। Wordrworth বলিয়াছিলেন—

The earth and every common sight
To me did seem
Apparelled in celestial light.

অর্থাৎ জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক পদার্থই এক দিব্যজ্যোতিতে বিমণ্ডিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার মত বিশ্বের কোথায়ও তুচ্ছতার ও কদর্য্যতার চিহ্ন দেখিতে পান নাই। সোণার ক্ষেতে বসিয়া কৃষকেরা পাকাধান কাটে, ছোট তরী পাল

তুলিয়া গান গাহিয়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া যায়, দূর মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা সন্ধ্যার স্তব্ধতা ভেদ করিয়া দিগন্তে প্রতিধ্বনি জাগায়, ইহার সমস্তের মধ্যেই কবি তাই এক অপূর্ব্ব প্রাণোন্মাদক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করেন; তাই তাঁহার

'অন্তরে সঞ্চার করি আনন্দের বেগ
ব'হে যায় ভরানদী; মধ্যাহ্নের মেঘ
স্বপ্নমালা গাঁথি দেয় দিগন্তের ভালে।

বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া কবি তাই বলিতেছেন

'হে সুন্দরী বসুন্ধরে! তোমাপানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাস ভরে; ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র-মেখলা পরা তব কটিদেশ।
প্রভাত রৌদ্রের মত অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
প্রত্যেক কম্পায়মান পল্লবের পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি;
প্রত্যেক তরঙ্গপরে সারাদিন দুলি
আনন্দ দোলায়।

সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যেখানে যাহা কিছু আছে তাহার সকলের সঙ্গেই কবি আপনাকে 'বসন্তের আনন্দের মত' ব্যাপ্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন; বিশ্বের সকল পাত্র হইতেই নব নব স্রোতে আনন্দমদিরাধারা পান করিবার জন্য কবি আকুল হইয়াছেন। কবি Keatsএর মধ্যেও আমরা এই ব্যাকুলতা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও বলিয়াছিলেন—

O for ten years that I may overwhelm
Myself in poesy; so I may do the deed
That my own soul has to itself decreed.
Then I will pass the countries that I see
In long perspective, and continually
Taste their pure fountains. First the realm I'll pass.
Of flora and old Pan; sleep in the grass
Feed upon apples red, and strawberries,
And choose each pleasure that my fancy sees;

কিন্তু প্রকৃতির কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যেই রবীন্দ্রনাথের চিত্ত তন্ময় হইয়া যায় নাই, তাহার প্রাচুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যেও তাঁহার মন অভিভূত হইয়াছে। নববর্ষার স্নিগ্ধ শ্যামল মূর্ত্তি তাঁহার কল্পনাকে কিরূপ উধাও করে তাহা তাঁহার পাঠকেরা সকলেই অবগত আছেন। ভাবে, সৌন্দর্য্যে, অলঙ্কারে ও ভাষার সমৃদ্ধিতে তাঁহার বর্ষার কবিতাগুলি কাব্য সাহিত্যে উপমাহীন। কিন্তু 'ঝঞ্ঝার মঞ্জীরতালে উন্মাদিনী কালবৈশাখীর' নৃত্যও তাঁহার প্রাণে 'মুনিসম উলঙ্গ নির্ম্মল কঠিন সন্তোষ' জাগাইয়া দেয়। গিরিশিরে গগনঘেরা সজল মেঘদলের মধ্যে তিনি তাঁহার স্নিগ্ধ ঘনবরণ মনোহরণকে দেখিয়া যেমন বলিয়া উঠেন—

'জগৎ জুড়ে দাও আমারে দেখা
জীবন জুড়ে মিলন আজি হোক্;'

তেমনই আবার নিদাঘের শস্যশূন্য তৃষ্ণাদীর্ণ মাঠে প্রকৃতির ধূলি ধূসরিত পিঙ্গলজটাবৃত রুদ্র ভৈরব মূর্ত্তিতেও ভীত না হইয়া তিনি তাহাকে শান্তিমন্ত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। 'নদীভরা কূলে কূলে, ক্ষেতে ভরাধান' দেখিয়া তাঁহার হৃদয় যেমন আনন্দে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয় তেমনই আবার সমুদ্রের ক্ষিপ্ত অট্টহাস্য ও অভ্রভেদী হিমালয়ের তপোমূর্ত্তিও তাঁহার প্রাণের তন্ত্রী আঘাত করে। কিন্তু তবুও প্রকৃতির গম্ভীর মূর্ত্তি অপেক্ষা তাঁহার শান্ত সুন্দর রূপেই যেন তাঁহার মন অধিকতর মজিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। শেলির প্রকৃতি-চিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এখানেই আমরা প্রভেদ দেখিতে পাই। শেলির রচনার মধ্যেও প্রকৃতির বিশালতা ও গাম্ভীর্য্যের দিকই অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছে; প্রকৃতির যে সকল বস্তু অপেক্ষাকৃত চঞ্চল ও চিত্তোন্মাদক শেলির মন তাহাতেই অধিকতর মজিয়াছে। তাঁহার অশান্ত হৃদয় সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ, পর্ব্বতের অভ্রভেদী

শৃঙ্গ, তুষার ঝঞ্ঝাঝটিকা প্রভৃতির মধ্যেই অধিকতর আনন্দলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকৃতির মধুর ও শান্তমূর্ত্তিই অধিকতর প্রধান্য লাভ করিয়াছে।

পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থার বিভিন্নতা উভয় কবির মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ কিনা বলিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই অতলস্পর্শ সৌন্দর্য্যসাগরে এমনই আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছেন যে স্বর্গের অনন্ত সুখের অথবা মুক্তির কল্পনাও তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। স্বর্গ হইতেও বিদায় চাহিয়া পৃথিবীর ধূলিমাটীর মধ্যে যে অসীম সৌন্দর্য্য তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। স্বর্গে অমৃতধারা প্রবাহিত হউক; মর্ত্ত্যভূমি তাহার 'সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত' প্রেমধারা লইয়া অশ্রুজলে চিরশ্যাম হইয়া বিরাজ করুক ইহাই তাঁহার পরম বাঞ্ছিত। কবি বলিতেছেন—

> জন্মেছি যে মর্ত্ত্যলোকে, ঘৃণা করি তারে
> ছুটিবনা স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

কারণ বৈরাগ্য সাধনে যে মুক্তি, নিখিলের রূপরস গন্ধ স্পর্শকে ঘৃণাভরে অথবা মিথ্যা বলিয়া তুচ্ছ করিয়া পরলোকের জন্য যে সাধনা, তাঁহার কবিহৃদয় তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।

Wordsworth প্রকৃতির মধ্যে নিরাবিল শান্তি পাইয়াছিলেন। মানুষের কৃত্রিম সৌন্দর্য্য অপেক্ষা প্রকৃতির সৌম্য গম্ভীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মানুষের সংশ্রবে আসিয়া যখন তাঁহার হৃদয়ে অশান্তি আসিয়াছে, প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মন যখন অস্থির হইয়াছে তখন প্রকৃতির মধ্যে মনকে সমাহিত করিয়াই তিনি আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। আবার কখন কখন প্রকৃতির সহিত তুলনায় মানুষের দুঃখপীড়িত অবস্থার কথা মনে করিয়া ব্যথিতও হইয়াছেন।

Shelleyর অশান্ত মন প্রকৃতির মধ্য হইতেও শান্তি পায় নাই। প্রকৃতি মধ্যে যে প্রাণের প্রাচুর্য্য ও আনন্দের উচ্ছ্বাস তাহা তাঁহার নিজের বেদনা ও অতৃপ্তিকেই তীব্রভাবে অনুভব করাইয়াছে। কখনও কবি Skylarkকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

> Teach me half the gladness
> That thy brain must know.

কখন বা পশ্চিম বাতাসকে ব্যথিতচিত্তে ব্যাকুল ভাবে অনুরোধ করিতেছেন—

> Oh lift me as a wave, a leaf, a cloud!
> I fall upon the thorns of life! I bleed!

আবার কখনও কবি নিজের নিরানন্দ ও দুঃখের সহিত প্রকৃতির শান্তি ও আনন্দের তুলনা করিয়া এমনকি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতেছেন।

> And on the Earth lulled in her winter sleep
> I woke, and envied her as she was sleeping
> Too happy Earth!

রবীন্দ্রনাথ Words worthএর মতই প্রকৃতির মধ্যে শান্তিলাভ করেন। তাঁহার 'সন্ধ্যা' 'জ্যোৎস্নারাত্রে' 'জীবন মধ্যাহ্নে' প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করিলে এই শান্তি ও তৃপ্তির আভাস আমরাও কিছু কিছু পাইয়া থাকি।

স্তব্ধ সন্ধ্যায় ছায়াচ্ছন্ন বিশ্বব্যাপিনী নীরবতার মধ্যে দাঁড়াইয়া কবি মুগ্ধ হইয়া বলেন

> ক্ষান্ত হও, ধীরে কহ কথা, ওরে মন,
> নত কর শির; দিবা হল সমাপন
> সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী!⋯⋯⋯
> ⋯ ⋯ ⋯
> বিষাদের মহাশান্তি
> ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
> সান্ত্বনা-পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
> শান্ত মনে, সন্ধি কর অনন্তের সনে
> সন্ধ্যার আলোকে! বিন্দু দুই অশ্রুজলে
> দাও উপহার—অসীমের পদতলে
> জীবনের স্মৃতি!

বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠ, বাসনার নিষ্ফল বিলাপ ও অভিযোগ দূরে রাখিয়া অসীমের পদতলে সমস্ত জীবনকে তখন বিসর্জ্জন দিবার জন্য কবি ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

জ্যোৎস্নারাত্রে প্রকৃতির এই শান্তসৌম্যমূর্ত্তিই কবির মনকে অভিভূত করে।

৮ হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী, হে বীণাবাদিনী
আজি মোর চিত্তপদ্মে বসি একাকিনী
ঢালিতেছ স্বর্গসুধা।

'শ্যামলা বিপুলা এ ধরণীপানে'. মুগ্ধনয়নে চাহিয়া চাহিয়া এক অব্যক্ত আনন্দের যে আবেগে আঁখিজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যায়; লাভ ক্ষতির হিসাব, পাওয়া না পাওয়ার বেদনা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়; সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণমদিরা পান করিয়া 'লাবণ্য প্রবাহভরে অন্তরের শিরা উপশিরা' পূর্ণ হইয়া উঠে। মুহূর্ত্তের মধ্যে তখন

'ভুলে যাই সব
কি আশা মেটেনি প্রাণে, কি সঙ্গীতরব
গিয়েছে নীরব হ'য়ে, কি আনন্দ সুধা
অধরের প্রান্তে এসে, অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে।'

প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া দুর্ব্বল মানুষের নিরাশ্রয় অবস্থার কথাও মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হয় সত্য; কিন্তু Wordworthএর মত মানুষের সামাজিক অসম্পূর্ণতা ও অত্যাচারের কথা, 'what man has made of man' তাঁহার মনে আসেনা। কবি প্রকৃতির মধ্যে যখন নিমজ্জিত হইয়া যান, তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার মনে হয় যেন

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব।

Shelleyর মত এত দুঃখ ও অতৃপ্তির গান রবীন্দ্রনাথ গাহেন নাই। প্রকৃতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার কবিপ্রাণে যে সকল সূক্ষ্মতম, অতীন্দ্রিয় অশরীরী ভাব জাগাইয়াছে, তাহাকেই তিনি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আপনার ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তি ও অতৃপ্তির রঙে সমস্ত প্রকৃতিকে রঞ্জিত করিয়া তিনি দেখেন নাই। প্রকৃতি Shelleyর মত তাঁহার মনে বিষাদ জাগায় না। জাগাইলেও তাহা ক্ষণিকের জন্য। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যেই তাঁহার হৃদয় তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অশান্তি ও অতৃপ্তির কথা প্রাকৃতিক দৃশ্যে যখন তাঁহার মনে হয়, তখনও তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের অন্তরের কথাই হইয়া উঠে। Byronএর মত নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের চিত্র আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বড় বেশী দেখিতে পাই না। বর্ষার নির্জ্জন নিশায়, অবিশ্রাম ধারাপাত; বাতাসের হুহুশ্বাস ও বিদ্যুতের মুহুর্মুহু কটাক্ষপাতের মধ্যে মেঘদূত পড়িতে পড়িতে সমস্ত বিশ্বমানবের বিরহদুঃখেই তাঁহার প্রাণ ভরিয়া যায়।

ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রে অনিদ্র নয়ানে,
কে দিয়াছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন উর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?

ভরা বাদরে সিক্ত শ্যামল সৌন্দর্য্যে শূন্য মন্দিরে যখন কবির মনে হয়

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরষায়!
এমন মেঘস্বরে—বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়!

তখন কবির প্রাণের সে আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া বিশ্বের বিরহীজনের সকলেরই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়া থাকে। কোকিলের কুহুস্বরে যুগযুগান্তরের সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখ উৎসবের স্মৃতিই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। এই চিরন্তনত্ব ও সার্ব্বজনীনতাই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার বিশেষত্ব। আপনার অনুভূতির মধ্য দিয়া তিনি সমস্ত মানুষের মনে প্রকৃতি নিশিদিন যে সুখদুঃখের ঝঙ্কার তুলিতেছে তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই এই সকল কবিতা পাঠ করিতে করিতে ইহার মধ্যে আপনাদের অন্তরের চিত্র দেখিয়া আমাদের হৃদয় অপূর্ব্ব ভাবরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী।

"আবার তোরা মানুষ হ"

একজন কবি একটা গান লিখেচেন যার গোড়ার ছত্র হলো "আবার তোরা মানুষ হ।" তার পরের ছত্র কি তা আমি বল্‌তে পারব না। কেন না ঐ গোড়ার ছত্র পড়লেই আমি রাগে অন্ধকার দেখি। "আবার তোরা মানুষ হ"—কি আশ্চর্য্য! যেন আমরা সব মানুষ নই, গরু! অথচ ঐ কবিই আঁর একটা গানে লিখেচেন "মানুষ আমরা নহি ত মেষ।" কী আত্মবিরোধ!

"আবার তোরা মানুষ হ!" একে একে দেখা যাক্। 'আবার' কথা দিয়ে বোঝানো হচ্চে আমরা আগে মানুষ ছিলুম। আগে মানুষ ছিলুম তার প্রমাণ? হাল বিজ্ঞানের মতে আমরা ত আগে বনমানুষ ছিলুম। যদি বল বনমানুষের পরই মানুষ হয়েছিলুম তা হলে জিজ্ঞাস্য এখন আমরা কি? অমানুষ বল্লে চল্‌বে না অমানুষ ত মানুষের উল্টো। কোনো জীবের উল্টো জীব পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত হয়নি। মানুষ পা দিয়ে হাঁটে আমরা মাথা দিয়ে হাঁটি না—মানুষ মাথা দিয়ে ভাবে আমরা পা দিয়ে ভাবি না। তবে কি আমরা পশু? কোন্ পশু? গরু নই, গাধা নই, উট নই। গরু হলে গরু আমাদের গুঁতোতে আসতো না, গাধা হলে গাধা আমাদের মোট বইতো না, আর উট হলে আমরা আকাশের দিকেই চেয়ে চলতুম, পায়ের দিকে চাইতুম না। যদি বল সকলে গরু নই, সকলে গাধা নই, সকলে উট নই কিন্তু কেউবা গরু, কেউবা গাধা, কেউবা উট—অর্থাৎ আমাদের সমাজ একটা পুরো দস্তুর চিড়িয়াখানা—তা হলেও সমস্যার কথা। শুনেছি বটে কুড়ি বছর ধরে মাষ্টারী করলে মানুষ গরু হয়, দশ বছর ধরে ধ্রুপদ ভাঁজলে গাধা হয় এবং পাঁচবছর ধরে দর্শন পড়লে উট হয়। কিন্তু আমরা যখন মানুষই নই তখন আমরা ও আশঙ্কার বাইরে। আমরা মানুষও নই, অমানুষও নই, পশুও নই। কোন্ পশু হলপ করে মিথ্যা কথা বলে? কোন্ পশু কাপড় পরে আগুন নিয়ে খেলা করে? ও:—আমরা চেহারাতেও পশু নই, বুদ্ধিতেও নই—আমরা পশু চরিত্রে! আমাদের চরিত্র আর পশুর চরিত্র এক? কাক চরিত্র আমরাই লিখেছি; নারীর চরিত্র আমাদের দেবতারাও জানেন না। আসল কথা পশুদের চরিত্র আছেও বটে, নেইও বটে।' হনুমান চরিত্র পড়ে দক্ষ বলতে পারেন কোন্ হনুমানটী সাধু, কোন হনুমানটী অসাধু, কোন্‌টী পাপী, কোন্‌টী পুণ্যাত্মা, কোনটী ধার্ম্মিক কোনটী পাষণ্ড?

তাহলে সাব্যস্ত হল, আমরা আগে মানুষ ছিলুম, কিন্তু এখন কি তা বল্‌তে পারি না—এখন যাহোক একটা কিছু। সত্যিই কি আমরা আগে মানুষ ছিলুম? যে একবার মানুষ হয়, সে কি তার পর যাহোক একটা কিছু হতে পারে? যে মানুষ তার মানুষত্বকে খোয়াতে পারে, বুঝতে হবে সে মানুষই হয়নি। আমরা কি নদীর জোয়ার ভাটা যে একবার মানুষ হয়ে ফেঁপে উঠচি, একবার যা হোক একটা কিছু হয়ে চুপসে যাচ্চি?

এইবার 'তোরা'কে ধরা যাক্। তোরা কারা? এমন অশিষ্ট সম্বোধনে কাদের সম্বুদ্ধ করা হয়েচে? আমাদেরই—যদিও কবিও আমাদেরই একজন। আমরা মানুষ হব এ কথার মানে? যদি 'আমরা' মানে হয় যারা বেঁচে আছি তারাই, তাহলে আমরা যা আছি তাই আছি। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে আমরা কবেই বা মানুষত্বের মটকায় উঠলুম, কবেই তা থেকে ধপাস করে পড়ে গেলুম, আর কবেই বা ফের বুকে হেঁচড়ে সেই মটকায় ঠেলে উঠবো? যদি 'আমরা' মানে হয় আমাদের জাত, তা হলে বুঝতে হবে আমাদের কোন একদল পূর্ব্বপুরুষ মানুষ ছিল, তার পর কোন একদল পিছলে পড়ে গিয়ে যাহোক একটা কিছু হল, তার পর যে হেতু আমরা সেই পিছলে পড়া পূর্ব্বপুরুষদের দলেই পড়ে আছি, সুতরাং আমাদের গা ঝাড়া দিয়ে ঠেলে উঠতে হবে সেই

মানুষ পূর্ব্বপুরুষদের দলে। খুব ভাল প্রস্তাব। কিন্তু আমাদের মানুষ হয়ে লাভ? আমরা এত কষ্টে এত বিদ্যার তেল পুড়িয়ে, এত প্রেমের সল্‌তে উস্‌কে যে মানুষত্বের আলো জ্বাললুম, আমাদের পরপুরুষেরা যদি তা এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দেয়? যদি সে আলোর স্মৃতিটুকুও কাব্য দর্শন শিল্প বিজ্ঞানের বুক থেকে ঘষে তুলে ফেলে? তখন কি আবার গাইতে হবে 'আবার তোরা মানুষ হ?' তাহলে "তোরা'টাকে এত তাড়াতাড়ি প্রয়োগ করবার দরকার কি? শেষ পুরুষদের জন্য মুলতুবী রাখলেই ত ভাল হয়।

এইবার 'মানুষ'। ধরলুম,আমরা মানুষ নই, কিন্তু মানুষ জিনিষটা কি তা না বুঝলে মানুষ হব কি করে? কেউ ত বলেন আমরা জন্মাইলেই মানুষ, কেননা মানুষের ছেলে। আমরা পক্ষহীন দ্বিপদও বটে, হাস্য-রন্ধন-কারী জীবও বটে। আবার কারো মতে আমরা মোটেই মানুষ হয়ে জন্মাই না—আমাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করতে হয়। কিন্তু খেয়ে পরে মানুষ হলেও অনেকে আপ্‌শোষ করে বলেন—"মানুষ হলোনা—না শিখ্‌লে দু'কলম লিখ্‌তে, না শিখ্‌লে দু'টাকা আন্‌তে।" যদি লিখ্‌তেও শিখ্‌লুম, টাকা আনতেও শিখ্‌লুম তাহলেও হয়ত একজন জটা-জুটধারী এসে শিঙ্গা বাজিয়ে শোনাবেন—"সকলেই মানুষ হল তোরা হলিনা; তোরা যে তিমিরে সে তিমিরে।" তার পর সে মানুষও যদি হয়ে উঠ্‌লুম, তখনও রক্ষা নেই। হয়ত একজন দিগম্বর এসে মিষ্টি হেসে বল্লেন "মানুষ হতে চাস্ তো লোটাকম্বল নে।" ব্যস সারাটা জীবন ধরে মানুষ হতেই চল্লুম, কিন্তু মানুষ হওয়া আর হল না। এ যেন ঠিক সেই কথা—"আকাশ কতদূর?" না "ঐ গাছের মাথা যেখানে।" গাছের মাথায় চড়লুম—না, ঐ মেঘের যেখানে উড়চে। এয়ারোপ্লেনে চড়লুম—না, ঐ চাঁদ যেখানে ঝুল্‌চে। যদি কামান দেগে কেউ আমাদের চন্দ্রলোকে ছুড়ে ফেলে দেয়, তাহলে হয়ত চান্দ্র-জীবের মুখে শুনবো—"ঐ সূর্য্য যেখানে জ্বলচে," কি "ঐ তারারা যেখানে মিট্‌মিট্‌ করচে।" যতই উপরেই ওঠ—আকাশ যে দূরে সেই দূরে। মানুষ হ'! মানুষ কি কেউ কখনো হয়েচে না হতে পারবে? মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বল্‌বেন, 'মানুষ হইনি।' পরমহংসকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিও বল্‌বেন তাই। মানুষের যে ছবি বাজারে চল্‌চে সে হল মনগড়া ছবি, ফটো নয়। কি দেখে মানুষ হব?

আচ্ছা, ধরলুম আমরা মানুষ হ'তে পারি। 'হ' বলবার মানে? ইচ্ছা করলেই হওয়া যায়? হবার শক্তি আছে কি না তা না ভেবে চিন্তে একসাপ্‌টা খামখেয়ালী হুকুম "মানুষ হ"? ছেলেটী একদম খাজা, যা পড়ে তাই ভুলে যায়, বাপ হুকুম করলেন 'পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হ।' হোক্ দেখি সে কেমন করে ফার্ষ্ট হতে পারে? প্রশ্নপত্র চুরি করলেও ত পারবে না। লাভে হতে রাত জেগে জেগে পড়ে হয়ত 'লাষ্ট' হবার শক্তিটুকুও খোয়াবে—অর্থাৎ ইহসংসার থেকেই বিদায় নেবে। যদি বল, "মানুষ হ" মানে "যতটা মানুষ হতে পারিস্, ততটা হ"—তাহলে বলি "হুকুম করচো কেন?" যদি বা হতে পারতুম তোমার 'হ' শুনে যে ভড়্‌কে যেতে হয়।" ছেলে আপনা হতে গাছে উঠ্‌চে—বাপ এসে বল্লেন 'ওঠ্'। অম্‌নি পা থর থর করে কাঁপতে লাগ্‌লো; আবার একবার 'ওঠ্'—ব্যস্ সশব্দে চিৎপাত। যদি বল, ওটা অনুজ্ঞা নয়, অনুরোধ—তাহলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না! আমার বেশ বিশ্বাস, যদি কেউ আমাকে অনুরোধ করতো "মানুষ হওয়া সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখ্"—তাহলে আমি এতটা দূরে থাক্, এর এত-টুকুও লিখ্‌তে পারতুম না। সুতরাং দাঁড়াল এই যে, 'হ' কথাটারও কোনো মানে নেই।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

পরিচিত

(গল্প)

রামুঘোষের লেনে একখানি দোতালা বাড়ীর বাহিরের ঝুলানো বারান্দায় বসিয়া একটী আঠার উনিশ বছরের মেয়ে সম্মুখে রাস্তার অপর পারে খোলাঘরের বস্তির দিকে নিবিষ্ট চিত্তে চাহিয়া ছিল। কৃষ্ণপক্ষের জমাট-অন্ধকার ও রাত্রির গভীরতায় সে গলিপথ জনশূন্য, খোলাঘরগুলি নীরবতায় সমাচ্ছন্ন। দূরের গ্যাসালোক ঘন অন্ধকারজাল ছিন্ন করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল।

"কাদি ও কাদি, ভূতের মত আঁধারে বসে থাকতে কি তোর এত ভাল লাগে বাছা?"

কাদি ওরফে কাদম্বিনী ফিরিয়া দেখিল, বামুন দিদি। মনে মনে বলিল—"যার সমস্ত জীবনটাই ঐ আঁধারের মত কালো, তার আঁধার ভাল লাগবে না' ত কি?"

বামুন দিদি বলিল, "বলি কথা কচ্ছিস না যে! কাল কর্ত্তা-গিন্নীর সঙ্গে তাদের দেশে যাওয়াই ঠিক করলি নাকি?"

কাদম্বিনী এবারেও কথা কহিল না, খোলাঘর গুলির দিকেই দৃষ্টি স্থির করিয়া রহিল।

এই দুই তিন বৎসর সে এই খোলাঘরের অধিবাসীদের দেখিয়া আসিতেছে; উহাদের দৈনন্দিন কাযকর্ম্ম হইতে সাংসারিক সর্ব্ববিধ খুঁটিনাটি দেখিতে দেখিতে সে একরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; যাহার যেমন সঙ্গতি সে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলাফেরা করিতেছে—এই লোকগুলির ক্ষুদ্র সংসারের বাহুল্যবর্জ্জিত ভাবগুলি তাহার হৃদয়ে এক প্রীতির উৎস ঢালিয়া দিয়াছিল।

প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে এবং এই দীর্ঘকাল একত্র থাকিয়া ইহাদের উপর তাহার কেমন একটা মমতাও জন্মিয়াছিল, তাই ইহাদের এই বিচ্ছেদ তার হৃদয়ে এমন ভাবে আঘাত করিয়া মনকে এত আকুল করিয়া তুলিয়াছে।

অবশ্য আগে অনেকবার তার মনে হইয়াছে "কবে এ আপদগুলো উঠে যাবে, এদের কোন্দল থেকে পাড়াটা উদ্ধার পাবে!" কিন্তু আজ আবার সেই ইহাদের জন্যই তার প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া রুদ্ধ বেদনায় ভরিয়া উঠিতেছে।

২

সন্ধ্যা হইবামাত্র প্রতি কুটীর হইতে একে একে জোনাকির মত যে ক্ষীণ আলোকগুলি জ্বলিয়া উঠিত, আজ সেগুলিও নির্ব্বাপিত। কেবল ঐ বৃদ্ধার ক্ষুদ্র কুটীর হইতে এখনও একটি আলোক রাত্রিশেষের শেষ নক্ষত্রটীর মত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল ঐ বৃদ্ধা তাহার ক্ষুদ্র ঘরকন্নার জিনিসগুলি আগলাইয়া দরজার কাছে বসিয়া ঝিমাইতেছে, বোধ হয় জিনিষগুলি বহিয়া নিবার লোক সে এখনও পায় নাই। আজ যে মাসের শেষ তারিখ; যাইতেই হইবে সে যেমন করিয়াই হউক—সহরের উন্নতিকল্পে ইহাদের যে এই নির্ব্বাসনদণ্ড।

এমনই ঘন সন্নিবেশিত কতকগুলি ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে তারও অতি প্রিয় অতিপরিচিত একখানি কুটীর ছিল। তার মধ্যে সে তার দিদিমার স্নেহনীড়ে একদিন বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তার পর ঐ বৃদ্ধার মত তার দিদিমাও এক জনের আশা-পথ চাহিয়া এমনই করিয়া দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইত।

বড় আশা করিয়া তাহার দিদিমা একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের হাতে তার সুখ দুঃখের ভার অর্পণ করিয়া তাহাকে ঘরজামাই রাখিয়াছিল। ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষার বীজ স্বরূপ মনে করিয়াই বৃদ্ধা তাহাকে আপন গৃহে স্থান দিয়াছিল। কিন্তু যৌবনে সে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হইয়া উঠিয়া, বৃদ্ধার সকল আশার কুহেলিকা ছিন্ন করিয়া একদিন কোথায় পলাইয়া গেল।

তার পর দিদিমার মৃত্যু হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেও সেখান হইতে বিতাড়িত হইল।

বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের সুখদুঃখময় স্মৃতি বিজড়িত সেই স্নেহ নীড়টুকু ত্যাগ করিবার ইচ্ছা কোন দিনই তার ছিল না। তার মনে মনে আশা ছিল স্বামী একদিন না একদিন অবশ্যই সেখানে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু আসিলেন কৈ?

তার এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া পাড়ার কতকগুলা দুষ্টলোক মিলিয়া তাহাকে এমনই উত্যক্ত করিয়া তুলিল যে গ্রামে টিকিয়া থাকা তাহার মত অল্পবয়স্কা যুবতীর পক্ষে অসাধ্য। তার রূপের খ্যাতি ছিল, লোকে বলিত নীচ কৈবর্ত্তের ঘরে সেই রূপরাশি ঠিক যেন গোবরে পদ্মফুল।

এই সময় এই বামুন দিদি কলিকাতায় আসিবেন জানিয়া সে তার শরণাপন্ন হইল; এক পাড়াতেই ইঁহাদের বাড়ী।

কিন্তু কলিকাতায় পৌছিবার কিছুদিন পরে কাদম্বিনী তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল। বামুন দিদির মিষ্ট কথার অন্তরালে তার প্রচ্ছন্ন পাপ অভিসন্ধির কথা বুঝিতে পারিয়া সে অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া পড়িল। এ কলিকাতা সহর! কোথায় কার কাছে সে যাইবে, কে তাহার দুরবস্থা বুঝিবে ও আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিবে?

এই সঙ্কট সময়ে ভগবান তাহাকে রক্ষা করিলেন। কি একটা কর্ম্ম উপলক্ষ্যে অরুণ বাবুর বাড়ী ঝিয়ের দরকার হওয়ায় এই বামুন দিদিই তাহাকে দিন কয়েকের ঠিকা বলিয়া সেখানে দিয়া আসিল। কর্ম্মান্তে তার প্রাপ্যগণ্ডা মিটাইয়া দিয়া অরুণ বাবুর স্ত্রী তাহাকে বিদায় দিতে চাহিলে সে তাঁহার পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া আপনার অসহায় অবস্থার কথা জানাইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল। তিনি তাহার চরিত্রের নির্ম্মলতা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে নিজ গৃহে স্থান দিয়া কন্তার স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

গায়ে ঠেলা দিয়া বামুন দিদি বলিল, "কিলো কথা কইবি না পিতিজ্ঞে কারছিস নাকি? দেখ, আমার কথা শোন, কোন সে পাড়াগাঁ বন বাদাড়ের দেশ, সেখানে যাসনি, বুঝলি? এখানে কাযের ভাবনা কি?"

বিরক্তিভরে কাদম্বিনী বলিয়া উঠিল, "কেন এক কথা নিয়ে বারবার বিরক্ত কর বামুন দিদি? আমার ভাল মন্দ সে আমি বুঝবো। যাই না যাই তাতে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? ফের জ্বালাতন করবে ত মাকে বলে দেব।"

বামুনদিদি গর্জ্জিয়া উঠিল। শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বলিল, "ওঃ বড় মা পেয়েছিস না, এতদিন এ মা কোথা ছিল? কলকাতার পথ তোকে কে দেখালে? কোন পাঁদাড়ে পড়ে মরতিস যদি আমি সঙ্গে করে না আনতুম?"

"ও মাগো—ওটা ভূত নাকি?" ভয়ে বামুনদিদি কাদম্বিনীকে আঁকড়াইয়া ধরিল। কাদম্বিনী দেখিল একটি লোক অতি সন্তর্পণে বৃদ্ধার ঘরে ঢুকিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র এদিক চাহিয়া প্রদীপটি নিবাইয়া দিল। ক্ষণ পরেই বৃদ্ধার ঘর হইতে একটা গোঙানির শব্দ আসিল।

* * *

"বলি আজ তোর কি হয়েছে? এখনও বসে থাকবি নাকি? কত লোক জড় হয়েছে দেখছিস? পাহারাওলা এল বলে; সাক্ষী দিতে হবে ওরা যদি দেখতে পায়!"

কাদম্বিনীর উঠিবার লক্ষণ না দেখিয়া অগত্যা বামুনদিদি উঠিয়া গেল।

কাদম্বিনী স্তব্ধ। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে নিমেষ মাত্র ঐ ক্ষীণ আলোকে আজ সে যাহাকে দেখিল, সেই কি তাহার স্বামী?—হাঁ তাহাই।

কিন্তু এ কি মূর্ত্তিতে আজ এতদিন পরে দেখা দিলে স্বামী—চোখের সম্মুখে তোমার এ নরঘাতী মূর্ত্তি কেন দেখাইলে প্রভু!

কতকগুলি লণ্ঠনের আলোক ও অনেকগুলি লোকের কোলাহলে যখন তার চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন সে বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল বৃদ্ধাকে সে খুন করে নাই, তার হাত পা বাঁধিয়া মুখে কাপড় গুজিয়া দিয়া তাহার দ্রব্যজাত অপহরণ করিয়াছে মাত্র।

৩

অরুণ বাবু দীর্ঘ কাল পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে কর্ম্ম করিয়া সম্প্রতি পেন্সন লইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ তাঁহার পল্লীভবনে কাটাইবার উদ্দেশ্যে দেশে আসিয়াছেন। কর্ম্ম দক্ষতায় সন্তুষ্ট উপরিতন কর্ম্মচারী-বৃন্দের অনুরোধে এবং আপনার কর্ম্মের নেশার ঝোঁকে এখনও মাঝে মাঝে তাঁহাকে কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। তাঁহার নিজ গ্রাম মাধবীনগরের নিকটবর্ত্তী দুইখানি গ্রামের ডাকাইতির তদন্ত করিবার ভার এই সময় তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল।

গৃহিণীর পিত্রালয় নিকটেই। সংসার ও বৃদ্ধ স্বামীর সেবার ভার কাদম্বিনীর উপর দিয়া তিনি দিনকয়েকের জন্য সেখানে গিয়াছেন।

এখানে আসিবার পূর্ব্ব দিনের সেই ঘটনা হইতে কাদম্বিনীর মনের উপর একটা বিপ্লব চলিতেছে। আজ এক মাসের উপর সে ভাবিতেছে "কে সে? স্বামীই তো ঠিক!"

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রিতে চিন্তাভারাকুল হৃদয়ে নিত্যকার মত আজিও সে অনেকক্ষণ বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। ক্রমে একটু ঘুমের মত হইয়াছিল। সহসা এক অমানুষিক চীৎকারধ্বনিতে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে শঙ্কিত চিত্তে বিছানায় উঠিয়া বসিল।

আজ কয়দিন হইতে সে গভীর রাত্রে ঘরের আশে পাশে মানুষের পায়ের শব্দ ও ফিস্ ফিস্ কথার আওয়াজ শুনিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া বলিয়াছে, "ও বাবা, বাঘের ঘরে ঘুঘুর বাসা—চোরের বুদ্ধির বাহাদুরী তো কম নয়!" এখন তার অনুশোচনা উপস্থিত হইল, এত দিন অরুণ বাবুকে এ কথা না জানান উচিত হয় নাই। আশে পাশে প্রায়ই ডাকাইতি হইতেছে। তার উপর দীর্ঘকাল পুলিস বিভাগে কাষ করিয়া যে অরুণ বাবু বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন লোকের মুখে মুখে একথা এমন ভাবে রাষ্ট্র হইয়াছে যে কাহারও অবিদিত নাই। এখন ভালয় ভালয় রাত্রিটা কাটিলে হয়—কাল সকালে উঠিয়াই সে সকল কথা অরুণ বাবুকে জানাইবে।

কিন্তু ও কিসের শব্দ আসে? এযে গোঙানির শব্দ! পাশের ঘর হইতে তো আসিতেছে।

কাদম্বিনী প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করিল। দরজা খুলিতে গিয়া দেখিল, দরজা বাহির হইতে বন্ধ। পাশের ঘরই অরুণ বাবুর শয়ন কক্ষ। সে দুই ঘরের মাঝের দরজা টানিল—বিপরীত দিক হইতে তাহাও অর্গলবদ্ধ। তার বেশ মনে আছে, নিত্যকার মত আজও সেই দুই দরজার মাঝখানে লণ্ঠন রাখিয়াই শয়ন করিয়াছিল। দাসী গোপালের মা যে তার ঘরের মেঝেতেই ঘুমাইয়া আছে তাহাও তাহার মনে হইল না। মাঝের দরজার ফাটল দিয়া অরুণবাবুর ঘরের আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতেছিল, সে সেই ফাটলে চোখ দিয়া যাহা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

সে ঘরে তখন এক লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল। ঘরের মেঝেয় অরুণবাবুকে ফেলিয়া একজন লোক তাঁহার বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছে এবং অপর তিন চারিজন লোক অরুণ বাবুর লোহার সিন্দুক হইতে টাকার তোড়াগুলি বাহির করিতেছে। যে গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল সে এইবার বলিয়া উঠিল, "এই চটপট নে তোরা, এদিকে কাষ সাবাড়!"

কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া কাদম্বিনী দস্যুর মুখের দিকে চাহিল—মুখাবয়ব বিকৃত করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও সে মুখ কাদম্বিনীর চিরপরিচিত।

অরুণবাবুর মৃত দেহ খাটের উপর তুলিয়া রাখিয়া দস্যুদল অন্তর্হিত হয় দেখিয়া কাদম্বিনী চীৎকার করিতে গেল। কিন্তু কণ্ঠ ও জিহ্বা আড়ষ্ট। তখন সে ক্ষিপ্তের মত দরজায় ক্রমাগত পদাঘাত করিতে লাগিল। জীর্ণ দরজা অর্গলচ্যুত হইল। সে সেই হত্যাকারীর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "কোথা যাও, আমি তোমায় চিনেছি।"

অন্য তিনজন ততক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল হত্যাকারীই একা। হঠাৎ সম্মুখে এই বাধায় সে কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। বুঝিল, তাহাদের কার্য্যকলাপ এ সবই দেখিয়াছে। ইহাকে—না না ইহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত! তা সে কিছুতেই পারিবে না? কিন্তু এ যে এখনই একটা অনর্থ করিয়া বসিবে! সে তাড়াতাড়ি কাদম্বিনীর মুখের মধ্যে খানিকটা কাপড় গুঁজিয়া দিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্রে তাহাকে খাটের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া পলায়ন করিল।

৪

মোকদ্দমা সেসনে গেল; আজ শেষ বিচারের দিন। বিচার গৃহ জনতায় ভরিয়া উঠিয়াছে; উকিল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি ছাড়া দর্শকের সংখ্যাই অধিক। সকলেই উৎসুক—স্বামীর বিপক্ষে স্ত্রী সাক্ষী দিবে—তাতে আবার খুনের মামলা।

সাক্ষীর তলব পড়িল; মলিন বস্ত্র পরিহিতা দীনা কাদম্বিনী আসিয়া সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়াইল। উৎসুক দর্শক মণ্ডলীর মৃদু গুঞ্জনে বিচার গৃহ ভরিয়া উঠিল।

সম্মুখে কাঠগড়ায় শৃঙ্খলাবদ্ধ আসামী বিনোদ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্তে উভয়ের দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। যাহার দর্শন আশায় কাদম্বিনী কত দেবমন্দিরে অনাহারে হত্যা দিয়াছে, যাহার আসিবার আশে দিদিমার ঘরে বসিয়া কত রাত্রি সে বিনিদ্র নয়নে অতিবাহিত করিয়াছে, একবার মাত্র চোখে দেখিবার জন্ম এই সুদীর্ঘ পাঁচটী বৎসর কাটাইয়াছে, সেই স্বামী খুনী আসামী রূপে তাহারই সম্মুখে আজ দাঁড়াইয়া। আর, তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী সে নিজে! স্বামীর করুণ নয়ন দুটী আজ তার প্রতিই স্থির; আজ সে তার দয়ার ভিখারী—ঐ সকরুণ দৃষ্টি যেন বলিতেছে—"ওগো এ অভাগার জীবনমরণ আজ তোমারই হাতে।"

কাদম্বিনীর নিশ্চল দেহ কাঁপিয়া উঠিল। সে করযোড়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "বিচলিত হইলে চলিবে না, মনে বল দাও প্রভু, সত্যের আসন যে অনেক ঊর্দ্ধে!"

তার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত মুখে এক স্বর্গীয় দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। বিস্ময়বিমুগ্ধ জনমণ্ডলী অবাক হইয়া সেই স্থির মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল।

সেই আবরণহীন মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বিচারকের সাদা মুখও অকস্মাৎ রাঙা হইয়া উঠিল, তিনিও ক্ষণকালের জন্ম মুগ্ধের মত চাহিয়া রহিলেন।

এই কঠিন সমস্যাস্থলেও কাদম্বিনীও সত্যের অপলাপ করিল না।

আজ বিনোদের ফাঁশি। জেলের প্রহরী ও রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই উপস্থিত। কতলোক ফাঁসি দেখিতে আসিয়াছে। এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী। রজ্জু ও মুখোস পরিহিত বিনোদলাল ফাঁশীমঞ্চে দণ্ডায়মান। পায়ের নীচের টুল খানি এখনই সরিয়া যাইবে—সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য দুর্বৃত্তের জীবনের সমাপ্তি।

আর মুহূর্ত্তমাত্র। টুল নড়িয়া উঠিয়াছে, দর্শক মণ্ডলী কম্পিতবক্ষে সেই দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়াছে।

কিন্তু এ কি! আলুলায়িত কুন্তলা স্খলিত বসনা কে এ পাগলিনী নারী ছুটিয়া আসিয়া মৃত্যুপথযাত্রীর দোদুল্যমান পদযুগল বক্ষে চাপিয়া ধরিল। পরক্ষণেই সে মূর্চ্ছিতা হইয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। এ কে? কাদম্বিনী।

শ্রীকিরণবালা দেবী।

সতীত্বের কথা

সতীত্ব ও মনুষ্যত্বের ভিতর বড় কে এ কথা লইয়া "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে মামলা চলিয়াছে। "শুভা"কে সৃষ্টি করিয়া আমি এ মামলায় একজন আসামী বনিয়া গিয়াছি। সেই জন্য এতদিন এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করি নাই। কিন্তু কথাটা এত দরকারী যে কিছু বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"শুভা"র সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় যে কথা বলিয়াছেন তার কোনও প্রতিবাদ করিব না, "শুভা"র পক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতীও করিব না। গ্রন্থকার বই লিখিয়া পণ্ডিত সমাজে হাজির করিয়া খালাস, তার বিচারের ভার লেখকের নয়। আমার যাহা বলিবার তাহা "শুভা" ও "পাপের ছাপ"এর উপোদ্ঘাতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি।

কিন্তু সতীত্ব সম্বন্ধে কথার সঙ্গে শুভা বা কিরণময়ী বা আর কাহারও কোনও নিত্য সম্বন্ধ নাই। সেই জন্য এই কথাটা আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম।

বাদানুবাদে অনেক সময় অনেক গোড়ার খাঁটি কথা চাপা পড়িয়া যায়। তাই সর্ব্বাগ্রে কয়েকটা কথা বলিতে চাই। সতীত্ব যে রমণীর শোভা, সতীত্ব যে একটি উচ্চ শ্রেণীর সদ্গুণ সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে চাই। সকল নারীরই সতীত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত,—এবং যে নারী এই চেষ্টায় সফলতা লাভ করেন তিনি বরেণ্যা।

সতীত্ব বলিতে সত্য সত্য বুঝায় কি? সতীত্ব নৈতিক পবিত্রতার একটা বিকাশ মাত্র, ইহা নৈতিক জীবনের সর্ব্বস্ব নয়। সমস্ত আচারে শুচি ও পবিত্রাত্মা হওয়াই নারীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু শুধু নারীর নয়, পুরুষেরও ঠিক সমান শুচি ও পবিত্রাত্মা হওয়া উচিত। যে পুরুষ এই শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন তিনি সকলের শ্রদ্ধার যোগ্য।

এই সতীত্ব ও শুচিতা অন্তরের জিনিষ। কেবল বাহ্যিক আচারে শুচি হইলে কিছুই লাভ হয় না যদি মনটা পঙ্কিল থাকে। বাহ্যিক আচারটা সাধনার অঙ্গ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু আসল জিনিষ আন্তরিক শুচিতা ও পবিত্রতা। যেখানে তা নাই সেখানে আচারের খোলস কি বাঁধাবাঁধির জোরে কাহারও সতীত্বের পদবী জন্মায় না। যে নারী পেটের দায়ে বা প্রাণের ভয়ে পরপুরুষকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, মনের দিক হইতে দেখিলে তাহাকে, অনেক সময়ে, যে নারী কেবল ফাঁক পাইল না বলিয়া পরপুরুষসঙ্গ করিল না তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখা যাইবে।

সতীত্বের সঙ্গে স্বামীর ইচ্ছানুবর্ত্তিতার নিত্য সম্বন্ধ নাই। একথা একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেখাইলে সকলেই স্বীকার করিবেন। স্বামী যদি স্ত্রীকে নিজের বন্ধুর সঙ্গে সহবাস করিতে আদেশ দেন, সতী স্ত্রীর সে স্থলে আদেশ প্রতিপালন অকর্ত্তব্য হইবে। তেমনি স্বামী যদি স্ত্রীকে পাপ করিতে আদেশ দেন, তবেও স্ত্রীর তাহাতে প্রতিবাদ অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্ম না করিয়াও স্বামী যদি অন্যায় জোর জুলুম করেন, তবেও স্ত্রীর স্বামিবাক্য প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হওয়া কেবল স্বাভাবিক নয়, ইহার নজীর হিন্দুশাস্ত্রে আছে। সতী দ্রৌপদী স্বামী কর্ত্তৃক দ্যূতে পরাজিত হইয়াও সেটা মানিয়া না লইয়া আইনের ফাঁক ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; সভায় আসিয়াও স্বামীদিগকে এবং ভীষ্মের মত গুরুজনকেও তিরস্কার করিয়াছিলেন। আর আদর্শ সতীকুলশিরোমণি সীতাকে যখন বাল্মীকির তপোবন হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া রামচন্দ্র অগ্নিপরীক্ষার আদেশ দিয়াছিলেন, সীতাদেবী তখন নির্ব্বিবাদে অগ্নিপ্রবেশ করেন নাই। তিনি তখন জোর করিয়া বলিয়াছিলেন "মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।"

সতীত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় পত্নীর প্রেমের একটা

প্রকাশ। যে সত্য সত্য প্রেমময়ী, সে কখনও "মনসা বাচা" তার প্রেমাস্পদ স্বামী ব্যতীত অন্যের কথা ভাবিতে পারে না। তেমনি যে স্বামী সত্য প্রেমিক সে কখনও অপর স্ত্রীর উপর অনুরক্ত হইতে পারে না। সুতরাং সতীত্ব ধর্ম্মের স্বাভাবিক ভিত্তি অনুরাগের উপর। Normal বা সহজ অবস্থায় সতীত্ব এইরূপ অনুরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহার ভিতর কোনও জোরা-জোরী বা বাঁধাবাঁধির কথা উঠিতে পারে না। রামচন্দ্রের মত পত্নীপরায়ণ স্বামী সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু রামচন্দ্রের এই পত্নীপরায়ণতা কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রের বা আচারের বা আইনের বাঁধনে সৃষ্টি হয় নাই। ইহা তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি। তেমনি সীতাদেবীরও সতীত্ব তাঁহার অপরিসীম অনুরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সতীত্বই আসল সতীত্ব। ইহার ভিতরে চেষ্টা বা যত্ন নাই, শাসনের রক্তচক্ষু নাই, এমন কি ন্যায়ান্যায়ের বিচারও নাই। ইহা ছাড়া আর কোনও রকম সতীত্ব খাঁটি নহে। বিধি-নিষেধে সতীত্ব গড়িয়া তোলা যায় না। তাহাতে একটা মেকী মালের আমদানী করা যাইতে পারে যেটার সঙ্গে আসল সতীত্বের সম্পর্ক নামের সম্পর্ক। তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস, তিনি, তোমাকে ভালবাসেন—তোমরা পরস্পরের প্রতি একাগ্রভাবে অনুরক্ত। এখানে প্রকৃত সতীত্ব পরিস্ফুট। তুমি তোমার স্ত্রীকে ভাল না বাসিলেও তিনি তোমার উপর অনুরক্ত হইতে পারেন এবং যথার্থ সতীর মত তোমাগত প্রাণ হইতে পারেন। কিন্তু যেখানে এই ভালবাসা নাই, সেখানে যে সতীত্ব সেটা নিতান্ত 'ধরে বেঁধে' সতীত্ব—সেটা সতীত্বের খোলস—তার ভিতর শাঁসের গন্ধও নাই। এই আসল ও মেকী জিনিসের মধ্যে প্রভেদটা বুঝা দরকার। আমরা আসল সতীত্ব চাই, মেকীটা চাই না। ধরিয়া বাঁধিয়া সমাজের রক্তচক্ষুর শাসনে যাহাদিগকে সতীত্বের বাহিক খোলস রক্ষা করান হইতেছে, তাহাদিগকে সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসান চলে না। মেরী মডলিনের স্থান তাদের অনেক উচ্চে।

সতীত্ব খুব ভাল জিনিষ। সতীত্বরক্ষা নারীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু সতীত্বেই মনুষ্যত্বের শেষ সীমায় পৌছান যায় না। যে নারী সতী সে চোর হইতে পারে। মিথ্যা-বাদিনী সতী বোধ হয় গণিয়া শেষ করা যায় না। নিষ্ঠুর অত্যাচারী সতীরও অবধি নাই। ইংলণ্ডের রাণী মেরীর দুর্গতির কারণ হইয়াছিল তাঁহার স্বামী ফিলিপের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও সতীত্বের উপর কেহ কোনওদিন দোষারোপ করে নাই। কিন্তু তিনি ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করিয়াছেন সেটা মোটেই সম্মানের নয়। সতীত্ব সম্বন্ধে যত লম্বা চওড়া কথাই বলি না কেন, ইহাই যে নারীর একমাত্র ধর্ম্ম তাহা কেহ বলিবে না। নারীর যেমন সতী হওয়া উচিত, তেমনি তাহার সত্যনিষ্ঠ, পিতৃভক্ত, পুত্রবৎসল, সেবা-পরায়ণ, ত্যাগশীলা, বিদ্যানুরাগিণী ইত্যাদি নানাগুণে গুণবতী হওয়া উচিত। সমস্ত জীবনে চারিদিক দিয়া যদি তাহার ভিতরকার মনুষ্যত্বটা পরিস্ফুট হইয়া না উঠে, তবে নারীর জীবন ঠিক আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না।

এ সব কথায় কোনও গুরুতর রকমের আপত্তি হইবে এ রকম আমি মনে করি না। কিন্তু এই সব অবিসম্বাদী সত্য, সতীত্ব সম্বন্ধে মতভেদের কথাটার মীমাংসার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মতভেদটা এই লইয়া যে, একদল লোক বলিতেছেন সতীত্ব লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি কেবল পুরুষের প্রভুত্বের পরিচয়; পুরুষ নিজে পত্নীপরায়ণ হইতে চায় না, অথচ পত্নীর কাছে পরিপূর্ণ সতীত্ব আদায় করিতে চায় লাঠির জোরে। আর সেই লাঠির জোরটা এই সতীত্ব ধর্ম্মের আবরণে আমাদের দেশে এমন ভাবেই প্রয়োগ করা হইয়াছে যে ইহাতে নারীর স্বাধীনতা ও চিত্তের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি একেবারে সঙ্কুচিত করিয়া তাহা-দিগের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করা হইতেছে—এটা সমাজের পক্ষে হিতকর নহে; সতীত্বের চেয়ে মনুষ্যত্বের দাবী ঢের বড়—কাযেই সতীত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াও মনুষ্যত্বের পথে নারীকে ঠেলিয়া দেওয়া দরকার হইতেছে।

এ কথার ভিতর যে কতখানি সত্য আছে তাহা

একটা সামান্য দৃষ্টান্ত হইতেই দেখা যাইবে। সতীত্ব বলিতে আমরা কতটা বুঝি সেটা সব সময় স্বীকার করি না। স্বামীর প্রতি অনুরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত যে শুচিতা সতীত্বের প্রকৃত লক্ষ্য, তাহা ছাড়াও অনেক জিনিষ সতীত্বের কল্পনার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। স্বামীর পরিপূর্ণ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, স্বামীর অন্যায় আদেশে হাসিতে হাসিতে প্রাণত্যাগ, স্বামীর অন্যায় ও অধর্ম্ম-প্রসূত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি-সাধন সতীত্ব ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের 'দেশী' শাস্ত্রে কেবল বেহুলাই সতী বলিয়া বরণীয় হয় নাই, যে নারী দাসীবৃত্তি করিয়া লক্ষহীরার সঙ্গে স্বামীর সংযোগ সাধন করিয়াছিল, সেও সতী শিরোমণি বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এক বিজ্ঞ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরের চরিত্র আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—আরও অনেক জায়গায় এমন কথা শুনিয়াছি—যে, সে চরিত্রে হিন্দু সতীর আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। আমি বলিয়াছি, এ সব 'দেশী' শাস্ত্রের কথা, আসল শাস্ত্রের কথা নয়। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীবধ মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত। মহাপাতকী স্বামী পরিত্যাগ করা পত্নীর কর্ত্তব্য; তবে তাহার শুদ্ধি সম্ভব হইলে সেই শুদ্ধির জন্য প্রতীক্ষা করা স্ত্রীর উচিত—আশুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতং। বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছিলেন যে গোবিন্দলাল আসিবার পূর্ব্বে ভ্রমর স্বামিগৃহ ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিল, কেননা, "গোবিন্দলাল যে মহাপাতকী তাহা ভ্রমর ভুলিতে পারিতেছিল না।" কিন্তু আমাদের "দেশী" শাস্ত্রে এ তত্ত্ব চলিল না।

এই যে "দেশী" শাস্ত্রের পরিকল্পিত সতীত্ব, এটা যে নিতান্তই গায়ের জোরের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কথা কি বলিয়া দিতে হইবে? ইহার মানে এই যে, নারীর ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে হইবে, কেবল নিঃশেষে তাহাকে স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইবে। অর্থাৎ সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ ছাড়িয়া, তাহার স্বামীর খড়ম যোড়া আশ্রয় করিয়া ভবসমুদ্রে পাড়ি দিতে হইবে। সতীত্বের এই মেকী আদর্শ সমাজের একটা চরম অবনতির পরিচয়—ইহা অমানুষ সমাজের মনুষ্যত্বহীনতা-প্রসূত। প্রাচীন ভারতের আদর্শের দোহাই দিয়া এই যে সতীত্ব প্রচার করা হয়, ইহার কোনও পরিচয় প্রাচীন হিন্দু সমাজে পাওয়া যায় না। অরুন্ধতী, সীতা বা দময়ন্তী এ দলের সতী ছিলেন না, দ্রৌপদী তো ছিলেনই না। তাঁহারা কোনও দিনই স্বামীর আদেশে অধর্ম্ম করিতে যান নাই বা স্বামীর অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেন নাই।

যাঁহারা নারীজাতির মনুষ্যত্বের দাবীর পক্ষে ওকালতি করেন, তাঁহাদের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সতীত্বই নারীর মনুষ্যত্বের একমাত্র বিকাশ নয়। মনুষ্যত্বের আরও নানারকম পন্থা আছে। যদি কোনও নারী সতীত্বে হীন হইয়াও সত্যনিষ্ঠ, দয়াবতী, উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত, এবং দেশের ও সমাজের সেবায় সমর্পিত জীবন হন, তবে তাঁহাকে একেবারে নরকের কীট বলিয়া গণ্য করিতে হইবে,—আর যে নারী এই সমস্ত গুণে একেবারে বঞ্চিত হইয়া কেবল সতীত্ব ধর্ম্মে বড়, তাহাকে মাথায় তুলিয়া রাখিতে হইবে—এই বিচারের কোনও ভিত্তি নাই। সমাজের অবস্থা বিশেষে এমন একটা ধারণা থাকা সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারা অসম্ভব নয়, কিন্তু আধুনিক সমাজে এমন একটা ধারণাকে কোনও মতেই প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐতিহাসিক হিসাবে ধরিতে গেলে নারীর বিভিন্ন গুণের মধ্যে সতীত্বের এই আপেক্ষিক গুরুত্বের একমাত্র মূল পুরুষের প্রভুত্ব ও অধিকারবোধ এবং নারীতে সম্পত্তিবোধ।

অবশ্য কোনও কোনও লেখক হয়তো অসাবধানতা বশতঃ এই সব যুক্তি সতীত্ব সম্বন্ধে এমন ভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় যেন তাঁহাদের মতে সতীত্ব বস্তুটাই বাঞ্ছনীয় নয়, এবং উহা কেবল প্রভুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমি আসল সতীত্বের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সেই প্রকৃত আন্তরিক সতীত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা কেহই এ কথা বলিবেন বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আক্রমণ করিয়াছেন মেকী

সতীত্বকে—যে সতীত্ব "দেশী" শাস্ত্রের নিয়মে গড়িয়া উঠিয়াছে। এ সতীত্ব যে মনুষ্যত্বের পরিপন্থী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সতীত্ব না থাকাটা দোষের কথা তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু অসতী সম্বন্ধে যে শুচিবাইয়ের পরিচয় আমরা যতীন্দ্র বাবু প্রমুখ লেখকগণের মুখে পাই, সেটা অসহ্য। কোনও নারী সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইলেই একেবারে অভিশপ্ত হইয়া যাইবে, তা' তার যতই সদ্‌গুণ থাকুক না কেন, তাহার মনুষ্যত্ব চারিদিক দিয়া যতই স্ফুরিত হউক না কেন; পক্ষান্তরে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্বহীন নারী কেবলমাত্র শারীর ধর্ম্মে সতীত্ব বজায় রাখিয়াও পূর্ব্বোক্ত পতিতাদের মাথায় পা তুলিয়া দিবে, এমন কথা আজকালকার দিনে বড় অশোভন। একথা সেই দিনে সাজিত যখন নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ছিল সঙ্কীর্ণ এবং গৃহস্থালীর বাহিরে নারীর নিরাপদ স্থান ছিল না। আজ সে দিন নাই। পুরুষ ও নারীর চরিত্র ও প্রতিভার বিকাশ আজ বহুমুখী, আজিকার দিনে সে সব মুখ রুদ্ধ করিয়া কেবল এক সতীত্বের গৌরব-ধারাকে একমাত্র জীবনের ধারা করিবার চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া মনে হয়। প্রশ্নটা ইহা নয় যে সতীত্ব ভাল কি না? কথাটা এই যে—যে সতীত্বের আদর্শে উচ্চ স্থান পাইতে পারে না, তাহাকে আমরা সমাজে কোনও সম্মানের স্থান ও কর্ম্মক্ষেত্র দিতে পারি কি না? সত্যনিষ্ঠা একটা অবিসম্বাদিত ধর্ম্ম। সকলেরই সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। কিন্তু অসত্যবাদী হইয়াও যে ব্যক্তি আর্ত্তের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করে, তাহাকে আমরা মাথায় তুলিয়া রাখি। এমন নারী আছেন যিনি সতী নন, অথচ যাঁহার মত বুদ্ধিমতী, দয়াবতী বা শুশ্রূষাকারিণী সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার সতীত্বের খর্ব্বতা বশতঃ, তাঁহার সমাজসেবার যে শক্তি আছে, মনুষ্যত্বের যে প্রকাশ তাঁহার ভিতর আছে তাহা স্ফুরিত হইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র বা অবসর আমরা দিতে পারি না কি? অসতীকে শ্রদ্ধা করা কি একেবারেই অসম্ভব?

যাঁহারা একথা বলেন তাঁহাদিগকে নৈতিক শুচিবাই-গ্রস্ত ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু এ শুচিবাইয়ের তলায় যে এক ফোঁটাও সত্য নাই সেইটাই সব চেয়ে বেশী দুঃখের কথা। সমাজে আমরা প্রতিদিন, অসতীকে মাথায় করিয়া রাখিতেছি। ঢাক ঢাক গুড়গুড় করিয়া জানিয়া শুনিয়া যে কত কেলেঙ্কারী মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতেছি, তার একটু পরিচয় শরৎ বাবু তাঁহার "পল্লীসমাজে" দিয়াছেন। পুণ্যক্ষেত্র কাশী-ধামের অনেক কুকীর্ত্তির কথা মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। সবাই জানে, তবু সবাই বলে 'চুপ চুপ।' প্রকৃত প্রস্তাবে অসতীর প্রতি যে তীব্র বিরাগের পরিচয় যতীন্দ্রবাবুর লেখায় পাই, সেটা সমাজে কোথাও দেখিতে পাই না। সমাজ জানিয়া শুনিয়া হাজার হাজারে অসতীকে প্রশ্রয় এবং এমন কি সম্মান দিতেছে; কেন না সতীত্বের এই শুচিবাই সমাজে প্রকৃত প্রস্তাবে চলিতে পারে না। অথচ এই শুচিবাইয়ের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া সকলে কেবলই সত্য গোপন করিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা এই সত্যটা স্বীকার করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছেন যে অসতী মাত্রকে অপাংক্তেয় করিতে অসম্মত হইয়া সমাজ কোনও অন্যায় করে নাই, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে নারী-মর্য্যাদার প্রকৃত মানদণ্ড কেবল সতীত্ব নয় মনুষ্যত্ব, তাঁহারা যতীন্দ্রবাবুর কাছে তিরস্কৃত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্ততঃ এইটুকু সান্ত্বনা আছে যে তাঁহারা সত্যনিষ্ঠ।

যতীন্দ্র বাবুর শুচিবাইয়ের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে তিনি নিরাশ্রয় বিধবাদের জন্ত যে প্রেস্ক্রপশন করিয়াছেন তাহাতে। কোনও কুটুম্ববাড়ীতে আশ্রয় লইয়া তাহাদের ঝাঁটা লাথি খাইয়া জীবন যাপন করা উচিত, তবু স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়, কেন না তাহাতে সতীত্বের হানি হইবার আশঙ্কা আছে। "আশঙ্কা"ই শুধু আছে, নিশ্চয়তা নাই; স্বাধীনভাবে এই আমাদের দেশেও লক্ষ লক্ষ নারী বিচরণ করিতেছে (বলা বাহুল্য নারী বলিতে কেবল ভদ্রমহিলা বুঝায় না)। তাহারা সবাই অসতী নয়, এবং আমার বিশ্বাস তাহাদের

মধ্যে অসতীর সংখ্যা, গুপ্তাদিগের মধ্যে অসতীর সংখ্যার চেয়ে খুব বেশী হইবে না। এই "আশঙ্কা"টুকুর ওজুহাতে যতীন্দ্রবাবু এই হতভাগ্য নারীদিগকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিতে চান। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যতীন্দ্রবাবু কি কখনও শোনেন নাই যে, নিরাশ্রয় বিধবা কুটুম্ববাড়ীতে আশ্রয় লইয়া সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়াছে? তাঁহার অভিজ্ঞতায় বিধবা কুটুম্বিনী কি কোনদিন গৃহিনীকে কোণঠেসা করে নাই? সত্যের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিতে পারেন কি যে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থায় সতীত্বহানির "আশঙ্কা" নাই।

সতীত্ব সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারদিগের খুব কড়া শাসন ও উচ্চ আদর্শ ছিল। কিন্তু তাঁহাদেরও যতীন্দ্র বাবুর মত শুচিবাই কখনও ছিল না। ব্যভিচারিণী পত্নী একেবারে অভিশপ্ত বলিয়া কোনও শাস্ত্রেই বিবেচিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিব।

ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
গর্ভ ভর্ত্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে॥

বিজ্ঞানেশ্বর এই বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ত্যাগ মানে গৃহবহিষ্কৃতা করা নয়। ইহা ছাড়া আরও রাশি রাশি বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ব্যভিচারিণী নারীকে শাস্ত্রকারেরা খুব হীনচক্ষে দেখেন নাই।

পুনশ্চ

আমার প্রবন্ধটি পাঠাইবার পর রায় বাহাদুর যতীন্দ্রনাথমোহন সিংহের প্রত্যুত্তর বাহির হইয়াছে। সে প্রবন্ধের মাত্র একটি কথা বর্ত্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। যতীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—

"সতীত্বের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে গেলে তাহাকে নানা প্রকার সামাজিক আইন কানুনের বাঁধনে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। যেখানে যত অধিক উৎকর্ষ আশা করা যায় সেখানেই আইন কানুনের তত বেশী কড়াকড়ি।"

এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিবার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধির মাপকাঠির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে ইংরাজী ছাপার হরপে লেখা বই হইতে মত উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অসতী সম্বন্ধে যদি সমাজ খুব বেশী কড়াকড়ি না করে তবে সতীত্ব মাটিতে গড়াগড়ি যাইবে।

রায়বাহাদুরের ইংরাজী নজীরে সম্পূর্ণরূপ অভিভূত হইতে পারিলাম না। তার উত্তরে সাদামাঠা বাঙ্গালা বোলে বলিতে চাই—

"বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।"

এ সামান্য কথাটা যে কতবড় সত্য তাহাও আমরা যে কেবল দৈনিক জীবনে দেখিতে পাই তাহা নহে, সমাজের ইতিহাসে, দেশ বিদেশের আইনের ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যদি শাসন অতি কঠোর হয়, তবে তাহা কেমন করিয়া নিষ্ফল হইয়া পড়ে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত ইউরোপের মধ্য যুগের খ্রীষ্টীয় মঠে দেখা যায়— আমাদের সমাজে তো দেখা যায়ই। শাস্তি অতিলঘু হইলে যেমন তাহা অপরাধ নিবারণে অসমর্থ হয়, তাহা অতিকঠোর হইলেও তেমনি নিষ্ফল হইয়া পড়ে এ সম্বন্ধে Benthamএর অতিপরিচিত পুরাতন তত্ত্বগুলির চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যনাশ করিব না। কিন্তু রায় বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া Theory of Legislation খানা পাঠ করিলে বাধিত হইব।

আর একটা সাদা কথা রায় বাহাদুরকে স্মরণ করাইতে চাই। উপমা যুক্তি নয়। ভারতীয় ন্যায়ে (Syllogism) অবশ্য দৃষ্টান্তের একটা স্থান আছেই— কিন্তু দৃষ্টান্তই যুক্তি নহে। দৃষ্টান্ত যদি দিতেই হয় তবে সেটা সঙ্গত হওয়া দরকার। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাশফেলের মাপকাঠির সঙ্গে সতীত্বের শাস্তির পরিমাণের যে কোনও তুলনাই হয় না সেটা যতীন্দ্রবাবুও একটু স্থিরভাবে ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন। তার চেয়ে বরং বক্ষ্যমান দৃষ্টান্তই বেশী খাটে—

"খাঁচার ভিতর বাঘকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তার বাহির হইবার উপায় নাই। তার খাঁচার আশে পাশে মানুষগুলো ঘোরাফেরা করিতেছে, কিন্তু বাঘ নিশ্চিন্তমনে শুইয়া আছে। কিন্তু বনের বাঘ মানুষকে

সামনে পাইলেই খায়।" তাই বলিয়া খাঁচার বাঘ যে বনের বাঘের চেয়ে কম হিংসাপরায়ণ তাহা প্রমাণ হয় না।

তেমনি শক্ত শক্ত বিধি নিষেধের দ্বারা যে নারীকে সমাজের রক্ত চক্ষুর তলায় রক্ষা করা হইয়াছে, সে যদি অসতী হইবার অবসর না পায় তবে তাহার সতীত্ব গৌরব খুব বাড়িয়া যায় না। বাঁধনের কড়াকড়ি উৎকর্ষের মানদণ্ড নয়, ঠিক তার উল্টা। যেখানে বাঁধন বেশী সেখানে চরিত্রের উৎকর্ষের পরিচয় কম।

"যেখানে যত অধিক উৎকর্ষ আশা করা যায় সেখানেই আইন কানুনের তত বেশী কড়াকড়ি!" যতীন্দ্রবাবুর এই Obiter dictum যে সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তাহা আর একদিক দিয়া দেখান যায়। আজকাল চুরি করিলে লোকের জেল হয়, সেকালে হইত প্রাণদণ্ড। সুতরাং যতীন্দ্রবাবুর নজীর অনুসারে বলিতে হয় যে সেকালে চুরি না করা বিষয়ে লোকের কাছে যতটা উৎকর্ষ আশা করা যাইত আজকাল ততটা করা যায় না। সত্যটা যে ঠিক উল্টা তাহা নানা দেশের জাতীয় ব্যবহার শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যায়। আমাদের আদিকালে মানুষের অনেকগুলি প্রবৃত্তি তীব্রভাবে সমাজের জীবনের পরিপন্থী ছিল। তাই তখন কঠোর শাসনদ্বারা সেগুলি দমন করার দরকার ছিল। যতই সমাজ উন্নত হইতেছে ততই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অধিক নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমাজের অনুকূল হইতেছে এবং ততই শাস্তির কঠোরতা ও নিয়মের বাঁধাবাঁধি সমাজের চরিত্রের উৎকর্ষের পরিচায়ক নয়, বরং তাহাতে অপকর্ষই সূচিত হয়।

আমি আমাদের দেশের নারীর স্বভাবজাত পবিত্রতায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। আমি বাঙ্গালীর মেয়ের সতীত্বকে মোটেই ঠুনকো জিনিষ মনে করি না। কাজেই সতীত্বগৌরবে হীনা অথচ মহীয়সী কোনও নারীকে যদি আমরা সম্মান করি, কিংবা কোনও হতভাগিনী পতিতাকে যদি আমর দয়া করি তবেই যে বাঙ্গালী নারী দলে দলে ছুটিয়া সতীত্বের খোলস ফেলিয়া দিবেন এরকম আমি মনে করিতে পারি না। যদি তাই হইত, যদি সতীত্বটা তাঁদের স্বভাবগত না হইয়া একটা বাহ্যিক খোলসমাত্র হইত, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিলেও সমাজের যে বিশেষ ক্ষতি হইত তাহা মনে হয় না। কিন্তু সে অন্য কথা। কিন্তু যতীন্দ্রবাবু মনে করেন যে অসতীর সম্বন্ধে কড়াকড়ি যদি আমারা একটুও ছাড়ি, নারীর শাসন যদি একটুও আলগা করি, যদি তাহাদিগকে পথে বাহির হইতে দিই বা চাকরী করিতে দিই, কিংবা আজকালকার এই সর্ব্বজন-হেয় ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করি, তবে আর সতীত্বটা তত বড় থাকিবে না।

অথচ বোধহয় তিনিই বড় গলায় মনুর সঙ্গে গাহিবেন "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" ফুল বেলপাতায় পূজা হয় না, পূজার আসল উপকরণ অন্তরের শ্রদ্ধায়। যাঁহাদের নারীর ভিতরকার মনুষ্যত্বের উপর এতটা শ্রদ্ধার অভাব, তাঁদের মুখে নারীর দেবীত্ব, তাঁদের আধ্যাত্মিক গৌরব ও স্বাধীনতা প্রভৃতির কথা বড় বেমানান শোনায়।

রায় বাহাদুর যদি দয়া করিয়া তর্ককণ্ডূতি পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় করেন এবং একটু ধীরভাবে ব্যাপারটা আলোচনা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে তিনি যেটার জন্য এত ব্যস্ত সেটা আসল সতীত্ব নয়, সতীত্বের খোলস, তার বাহ্যিক আড়ম্বর। খাঁটি সতীত্বের সঙ্গে তা'র সম্পর্ক একেবারে নাই তাহা নয়, কিন্তু সে সম্পর্ক তাদাত্ম্য নয়।

যতীন্দ্রবাবু অন্যান্য যে প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নহে বলিয়া সে সব কথা আলোচনা করিলাম না।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

প্রতিবাদের উত্তর

আমার "সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব" প্রবন্ধের আর একটি প্রতিবাদ "সতীত্বের কথা" এই নাম দিয়া শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মানসীতে পাঠাইয়াছেন। মানসীর সম্পাদক মহাশয়গণের সৌজন্যে আমি তাহা, প্রকাশের পূর্ব্বে দেখিতে পাইয়া, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি। এইসঙ্গে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত "সাহিত্য ও নীতি" নামক আমার "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" পুস্তকের সমালোচনা, যাহা মানসীর মাঘ সংখ্যায় বাহির হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলিব।

১। সতীত্বের কথা।

আমার "সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব" প্রবন্ধে বিচার্য্য বিষয় ছিল নারীর সতীত্ব তাঁহার মনুষ্যত্বলাভের অন্তরায় কি না? শ্রীযুক্ত নরেশবাবু সেদিক দিয়া না গিয়া অনেক অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া বলেন, সতীত্ব ভিন্ন অন্যান্য অনেক গুণের দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে। এ কি রকম হইল?—না যেমন, একজনকে যদি প্রশ্ন করা যায়, ইংরাজী সাহিত্য পাঠ এম, এ পাশ করার অন্তরায় না সহায়? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "ইংরাজী সাহিত্য না পড়িয়াও কতজনে সংস্কৃতে, অঙ্কে, ইতিহাসে, বাঙ্গালায় এম, এ, পাশ করিতেছে।"

অনেক সময় দেখা যায়, যে উকীলের মোকদ্দমা দুর্ব্বল তিনি আসল বিচার্য্য বিষয় পাশ কাটাইয়া ছাড়িয়া গিয়', অনেক উভয়তঃ স্বীকার্য্য ও অবান্তর কথার অবতারণা করেন এবং অবশেষে প্রতিপক্ষের উকীলকে গালাগালি করিয়া মক্কেলের মনে একটা 'এফেক্ট' সৃজন করেন। ইহাকে বলে "Lawyer's argument"—নরেশবাবু উকীল বলিয়া আমি একথা বলিতেছি না।

নরেশবাবু তাঁহার দুর্ব্বলতা নিজেই বুঝিয়াছেন, তাই প্রবন্ধের মধ্যস্থানে বলিতেছেন, "এসব কথার কোনও গুরুতর রকমের আপত্তি হইবে এরকম আমি মনে করি না।" সে সব কথা কি, একে একে দেখা যাক্।

(১) "সতীত্ব নারীর শোভা… …সকল নারীরই সতীত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত।—এবং যে নারী সেই চেষ্টায় সফলতা লাভ করেন তিনি বরেণ্যা।" অতি উত্তম কথা।

(২) "সতীত্ব নৈতিক পবিত্রতার একটা বিকাশ মাত্র, ইহা নৈতিক জীবনের সর্ব্বস্ব নয়………কিন্তু শুধু নারীর নয়, পুরুষেরও ঠিক সমান শুচি ও পবিত্রাত্মা হওয়া উচিত।" ঠিক কথা,—তবে যে পুরুষ লম্পট স্বভাব,' সে যদি হিন্দুর পুরোহিত অথবা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য হয়, তবে সে ঈশ্বরভক্তি দ্বারা নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করিবে কি? নারীর বেলায়ও সেইরূপ হইবে।

(৩) "সতীত্ব ও শুচিতা অন্তরের জিনিষ। কেবল বাহিক আচারে শুচি হইলে কিছুই লাভ হয় না, যদি মনটা পঙ্কিল হয়।" ঠিক কথা। তবে ভিতরের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য বাহিরের একটা আচারও দরকার। যেমন ফলের ভিতরের শাঁস রক্ষার জন্য বাহিরে আপনা হইতেই একটা খোসা প্রস্তুত হয়, সামাজে ও অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এইরূপ কতকগুলি বাহিক আচারের সৃষ্টি হইয়া থাকে—যাহাকে convention বলে। ভিতরের জিনিষটীর উৎকর্ষের মাপকাঠি (standard of excellence) যত বড় হইবে, সেই দেশাচারও তত কঠিন হইবে। যেমন ফল যত বড় তাহার খোসাও তত কঠিন, আমের খোসা অপেক্ষা নারিকেলের খোসা অনেক বেশী শক্ত। নিম্নে দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

(ক) একজন বিচারক মনে মনে জানেন তিনি খুব ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু আদালতের বাহিরে অথবা নিজ-

গৃহে যদি তিনি কোন পক্ষকে তাঁহার নিকট আনাগোনা করিতে দেন তবে তাঁহার নিন্দা হয়। সেজন্ম তাঁহাকে একটা বাহিরের খোলস অবলম্বন করিয়া খুব কঠোর হইয়া থাকিতে হইবে।

(খ) একজন সচ্চরিত্র জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেশ্যাগৃহে গমনাগমন করেন, তবে তাঁহার উপর লোকের সন্দেহ আসিতে পারে। এমন কি প্রলোভনে পড়িয়া তাঁহার পতনও হইতে পারে। এজন্ম তাঁহাকে বাহিরের শুচিতা অবলম্বন করিয়া বেশ্যাপল্লী পর্য্যন্ত এড়াইয়া চলিতে হইবে।

(গ) ইংরাজ সমাজে অনূঢ়া যুবতী নারীর কোনও যুবকের সহিত নির্জ্জনে আলাপ নিষিদ্ধ কেন? তাহার কারণও বাহিরের শুচিতা দ্বারা অন্তরের শুচিতা রক্ষা।—আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না।

(৪) "সতীত্বের সঙ্গে স্বামীর ইচ্ছানুবর্ত্তিতার নিত্য সম্বন্ধ নাই।" কে বলে আছে? গৃহস্থ ঘরে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর ত সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে মতভেদ হয়। এমন কি কলহ হইয়া কথাবার্ত্তা ও মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হয়। তাই বলিয়া কি সেই সকল গৃহিণী সতী নহেন? এ জন্ম নরেশ বাবুর দ্রৌপদী ও সীতার দৃষ্টান্ত অবতারণা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি মহাভারতকে "হিন্দুশাস্ত্র" বলিয়াছেন, বাস্তবিক ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, ইতিহাস।

(৫) "সতীত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় পত্নীপ্রেমের একটা প্রকাশ।.........সহজ অবস্থায় সতীত্ব এইরূপ অনুরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহার ভিতর কোনও জোরাজুরী বা বাঁধাবাধির কথা উঠিতে পারে না।" অতি উত্তমকথা।

"কিন্তু যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে যে সতীত্ব সেটা নিতান্ত 'ধরে বেঁধে' সতীত্ব—সেটা সতীত্বের খোলস —তার ভিতর শাঁসের নাম গন্ধও নাই।" ঠিক কথা। তবে একটা কথা এই, যেখানে শাঁস নাই, খোসা আছে —সেখানে সেই খোসাটাকে কি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে? অর্থাৎ যে নারী কোন কারণে—যেমন স্বামীর চরিত্র-দোষের জন্ম—তাঁহার স্বামীকে ভালবাসিতে পারেন না, নরেশবাবু কি তাঁহাকে সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁহার "শুভার" ন্যায় বাজারে বাহির হইতে বলেন? আমি কিন্তু "শুচিবাইগ্রস্ত" হইলেও সেরূপ পরামর্শ দিব না। আমি সেই স্বামী স্ত্রীকে "ঢাক্-ঢাক্" "চুপ-চুপ" করিয়া সমাজে থাকিতেই বলিব, কারণ তাহাদের সেই বাহিরের খোসাটার মধ্যে যদি আবার "নারিকেলফলাম্বুবৎ" সার পদার্থটি কখনও আসে—"মন্ত্রশক্তি"র নায়িকা ও "দিদি"র নায়কের মধ্যে যেমন আসিয়াছিল।

(৬) "সতীত্ব খুব ভাল জিনিষ।......কিন্তু সতীত্বেই মনুষ্যত্বের শেষ সীমায় পৌছান যায় না।...... নারীর যেমন সতী হওয়া উচিত, তেমনি তাহার সত্যনিষ্ঠ, পিতৃভক্ত, পুত্রবৎসলা, সেবাপরায়ণা ত্যাগশীলা বিদ্যানু-রাগিণী ইত্যাদি নানারূপ গুণে গুণবতী হওয়া উচিত।" এসকল কথা কে অস্বীকার করে?

কথাটা হইল কেমন, না ইংরাজী না পড়িয়া সংস্কৃত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক ইত্যাদি পড়িয়া এম, এ পাশ করার মতন। ইংরাজী সাহিত্য পড়া এম, এ পাশ করার অন্তরায় কি না, লেখক সেই প্রশ্নের বাড়ীর কাছ-দিয়াও গেলেন না।

সতীনারী যদি চোর হয়—অর্থাৎ যেমন কোনও নারী দুর্ভিক্ষপীড়িত স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য যদি চুরি করে,—তবে সে যেমন সতীত্বের জন্ম প্রশংসা পাইবে, সেইরূপ চুরির জন্ম দণ্ডও পাইবে। তবে উদ্দেশ্য (motive) বুঝিয়া তাহার দণ্ডটা খুব লঘু হইবে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ব্যবসায়ে অন্যকে ঠকাইয়া লক্ষপতি হয় এবং সেই টাকার কতক অংশ দিয়া হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করে, তাহাকে এই দানের জন্য লোকে যেমন প্রশংসা করিবে, তেমন প্রবঞ্চক বলিয়া ঘৃণাও করিবে। শুনিতে পাই একটি বেশ্যা কোনও তীর্থস্থানে বহুঅর্থ ব্যয় করিয়া একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে, সে জন্ম লোকে তাহার নিকট যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তেমন তাহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া ঘৃণাও করে। সংসারের অধিকাংশ লোকই দোষগুণের সমষ্টি। সতীত্ব নারীর একমাত্র ধর্ম্ম একথা কেহ বলে না, আবার সতীত্বের

মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন নারীই আদর্শ-চরিত্রা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু এসকল কথায় আসল প্রশ্নের মীমাংসা হইল কৈ ?

(৭) এতক্ষণে নরেশ বাবুর সে কথা মনে পড়িয়াছে। তাই তিনি বলিতেছেন, "মতভেদটা এই লইয়া যে একদল লোক বলিতেছেন সতীত্ব লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি কেবল পুরুষদের প্রভুত্বের পরিচয় ; পুরুষ নিজে পত্নী-পরায়ণ হইতে চায় না, অথচ পত্নীর কাছে পরিপূর্ণ সতীত্ব আদায় করিতে চায় লাঠির জোরে।"—এসকল কথা লেখক কোথায় পাইলেন জানি না, অন্ততঃ আমি ত কোথায়ও এরূপ কথা শুনি নাই। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন তাঁহারা দেশের ও সমাজের কোন খবর রাখেন না।

'সতীত্বের চেয়ে মনুষ্যত্বের দাবী ঢের বড়, কাজেই সতীত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াও মনুষ্যত্বের পথে নারীকে ঠেলিয়া দেওয়া দরকার হইতেছে [অর্থাৎ তিনি যেমন "শুভা"কে ঠেলিয়া দিয়াছেন।]

আজকাল আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেমন দুইটি কুঠুরীতে বিভক্ত, নরেশ বাবুও মনুষ্যত্বকে দুই কুঠুরীতে ভাগ করিতেছেন—তাহার মধ্যে সতীত্বকে "Transferred subjects" এর মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া, নারীর অন্যান্য গুণ-গুলিকে "Reserved subjects" করিয়া রাখিয়াছেন। মিনিষ্টারদের হাতে যে "Transferred subjects" আছে তাহার উৎকর্ষ না হইলেও গবর্ণমেণ্টের শাসন যেমন চলিতে পারে, সেইরূপ তাঁহার মতে সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হইলেও মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু মিনিষ্টারদের হাতে যে "nation-building departments" রহিয়াছে, যাহার উপর জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে, একথা ভুলিলে চলিবে কেন ? অন্নবস্ত্র, রোগচিকিৎসা ও সুশিক্ষা অভাবে যদি জাতিটা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তবে পুলিশ ও শাসন বিভাগের উন্নতিতে কি হইবে? ইন্দ্রিয় সংযম মনুষ্যজীবনের একটি প্রধান নৈতিক বল—যেখানে তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সেখানে মনুষ্যত্বের সৌধও ধূলিসাৎ হইয়াছে।

সতীত্বের দ্বারা মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয় একথার কোনও উত্তর না দিয়া লেখক সেই একই কথা প্রকারান্তরে আবার বলিতেছেন—সতীত্ব ক্ষুণ্ণ করিয়াও মনুষ্যত্ব জন্মিতে পারে, অর্থাৎ ইংরাজী না পড়িয়াও কতলোক এম, এ পাশ করিতেছে। এটা যে একটা false issue লেখক তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না।

নারী সতী না হইয়াও পিতৃভক্তি, পুত্রবৎসলতা, সেবা-পরায়ণতা ইত্যাদি গুণের অধিকারিণী হইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ হইয়াছে একথা কেহই বলিবে না। তাহার অন্য গুণের জন্য যেমন প্রশংসা হইবে, অসতী বলিয়া তাহার সেইরূপ নিন্দাও হইবে। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাহিত্য সমালোচনা উপলক্ষে যখন একথা উঠিয়াছে; তখন জিজ্ঞাসা করি প্রাচীন কাব্যে (Classical literature) কখনও কি এরূপ নারীচরিত্র কেহ দেখাইতে পারিবেন যে, অসতী হইয়াও সে মনুষ্যত্বগুণে আদর্শ নারী ? বরং পরপুরুষাসক্ত নারী যে অনায়াসেই পিতামাতার অবাধ্য, স্বামীর বিত্তাপ-হারিণী, এমন কি পুত্রঘাতিনী হইতে পারে—কি সংসারে, কি কাব্যে ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসের বিমলা সন্দীপের প্রতি আসক্ত হইয়াই ত স্বামীর টাকা চুরি করিয়াছিল। কলসী ছিদ্র হইলে যেমন তাহা দিয়া সব জলটুকু পড়িয়া যায়, নারীরও ঐ চরিত্ররন্ধ্র দিয়া সব গুণ উবিয়া যাইতে পারে।'

(৮) নরেশবাবু আবার কোথাকার "দেশী শাস্ত্রের" পরিকল্পিত সতীত্বের আর একটা "মেকি আদর্শ" খাড়া করিয়াছেন। ইহার মানে "নারীর ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইতে হইবে।" এরূপ আদর্শের কথা আমি জানি না। আমি ত প্রাচীন ভারতের আদর্শ অর্থাৎ অরুন্ধতী, সীতা, দময়ন্তীর আদর্শই সকলকে অবলম্বন করিতে বলিয়াছি। এসম্বন্ধে বেশী বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

(৯) কিন্তু এতক্ষণে নরেশবাবু সেই আসল 'ইস্যু'-টার জবাব দিতেছেন। যাঁহারা সতীত্ব মনুষ্যত্বের পরিপন্থী বলেন, "প্রকৃত সতীত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা কেহই একথা বলিবেন বলিয়া মনে করি না।" তাঁহারা "মেকি সতীত্ব"কেই আক্রমণ করিয়াছেন।

যাহাহউক, এতক্ষণে বুঝিলাম ইংরাজি পড়াটা এম, এ পাশ করার অন্তরায় নহে। তবে ইংরাজীর নামে যে country dialect অর্থাৎ "দেশী" ভাষা (slang) প্রচলিত আছে, তাহাই এম, এ পাশ করার পক্ষে বিঘ্ন। একথাটা প্রথমে বলিলেই চুকিয়া যাইত।

কিন্তু যাঁহারা সতীত্ব মনুষ্যত্ব লাভের অন্তরায় বলেন তাঁহারা ত এইরূপে সতীত্বকে খাঁটি ও মেকি এই দুইভাগে বিভক্ত করেন না।

(১০) এতক্ষণ পরে তাঁহার মক্কেলের পক্ষে কবুল জবাব দিয়া নরেশবাবু আমার "শুচিবাই" দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে উকীলের মোকদ্দমা দুর্ব্বল, তিনি প্রতিপক্ষকে গালি দিয়া মক্কেলের মনস্তুষ্টি করেন। কিন্তু আমি তাঁহার এই গালিকে compliment বলিয়া মনে করি, কারণ অশুচিবাই অপেক্ষা শুচিবাই ভাল জিনিষ। তিনি বলেন আমার লেখাতে অসতীদের প্রতি তীব্র বিরাগের যে পরিচয় পাইয়াছেন; সমাজে বা শাস্ত্রে তাহা দেখা যায় না। আমাদের সমাজ যে সময় সময় নীলকণ্ঠের ন্যায় কত বিষ হজম করিয়া লইতেছে, একথা ত আমি মাঘের "মানসী"তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। আর আমার কোন্ গ্রন্থে তিনি "অসতীর প্রতি তীব্র বিরাগের" পরিচয় পাইয়াছেন, নরেশ বাবু তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব। তবে আধুনিক বাঙ্গলা উপন্যাসে আর্টের নামে সুনীতি-নাশক যে সকল সংক্রামক রোগের বীজ সমাজে ছড়াইয়াছে, আমি আমার পুস্তকে তাহাই প্রদর্শন করিয়াছি। সতীত্ব রক্ষার জন্য শাস্ত্রকারদের শাসন কিরূপ কঠোর ছিল তাহা মনুর সেই বচনটাতেই প্রকাশ—যেখানে তিনি কোন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কেও যুবতী নারীর সহিত নির্জ্জনে উপবেশন করিতে নিষেধ করিয়াছেন—কারণ,

"বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।"

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান যে জ্ঞানী ব্যক্তিও তাহাদের উত্তেজনায় পড়িয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হন।

—আর সে জন্য কোন কোন উদারনৈতিক ব্যক্তি মনুকে বর্ব্বর বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

(১১) নিরাশ্রয় বিধবা রমণীকে আমি চাকুরী করিতে না বলিয়া কোন কুটুম্বের আশ্রয়ে থাকিতে ব্যবস্থা দিয়াছি। এই জন্য নাকি আমার "শুচিবাইয়ের পরাকাষ্ঠা" লাভ হইয়াছে। কিন্তু ইহা ত আমার নিজের ব্যবস্থা নহে, সেই উদার প্রকৃতি শাস্ত্রকারদেরই ব্যবস্থা। যথা স্ত্রীলোক বাল্যে পিতামাতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, বিধবা হইলে পুত্র বা অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের অধীনে থাকিবে, কারণ—

"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"

অর্থাৎ স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। নরেশ বাবু কোন্ শাস্ত্রের বলে তাঁহাদিগকে স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে আদেশ দেন? বিধবা নারী আত্মীয় কুটুম্বের গৃহে থাকিলে সেখানে "লাথি ঝাঁটা" খাইতে বাধ্য হন, কোন কোন স্থলে একথা সত্য বটে। আবার অনেক গৃহে দেখা যায় বিধবা ভগিনী, খুড়ী, পিসী, মাসী গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া সংসার চালান। এরূপ দৃষ্টান্ত আজকালও অনেক গৃহে দেখা যায়। তবে আমাদের মনুষ্যত্বের অভাব হওয়াতে বিধবার নির্য্যাতন যে না হইতেছে এরূপ নহে। আমরা যদি আবার মানুষ হইতে পারি, তবে আবার আশ্রিত প্রতিপালন করিতে শিখিব। আর যদি মানুষ না হই, তবে ইহার পর বৃদ্ধ পিতামাতাকেও Alms House এ পাঠাইব।

নারী বিধবা হউন, সধবা হউন, বা কুমারী হউন পুরুষের অধীনতা স্বীকার না করিয়া যদি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করেন তাহা হইলেই কি তাঁহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়? পুরুষদের তাহা হইতেছে না কেন? আবার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার "মার্কিণে চারিমাস" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "মার্কিণীয় স্ত্রীলোকদিগের আগে ছিল পরিবারের দাস্যতা, এখন হইতেছে দোকানের বা কলকারখানার দাস্যতা।" (মাঘের মানসীতে আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। আফিসের সাহেব অথবা দোকান বা কল কারখানার মালিকের "লাথি

ঝাঁটা" খাওয়া অপেক্ষা নিজের দেবর, ভাসুর, ভাই, ভাইপোর লাথি ঝাঁটা খাওয়া অনেকগুণে ভাল।

আফিসে বা দোকানে স্বাধীনভাবে চাকুরি করিতে গেলে নারীর পরপুরুষসঙ্গে সতীত্ব নাশের আশঙ্কা আছে আমি এ কথা বলায় নরেশ বাবু "ছি ছি" করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সকল রমণীই যে চরিত্রভ্রষ্ট হন একথা আমি বলি নাই। চরিত্রভ্রষ্ট হওয়া না হওয়া নিজের উপর যেমন নির্ভর করে, তেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও নির্ভর করে। বিপিন বাবু বলেন মার্কিণীয় রমণীগণ বেশভূষার পারিপাট্য দ্বারা দোকানের বা কলকারখানার প্রভুদিগের মনস্তুষ্টির জন্য অনেক সময় "নিজের শরীর বেচিয়া" অর্থ উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। নরেশ বাবু যদি বলেন ইহাও এক প্রকার মনুষ্যত্বের বিকাশ, তবে আমি নিতান্তই নাচার।

(১২) নরেশ বাবু আমার মাঘ মাসের প্রবন্ধটী পড়িয়া আবার একটি "পুনশ্চ" জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহাতে একটি বিষয়ের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে—"যেখানে যত বেশী উৎকর্ষ আশা করা যায়, সেখানেই আইন কানুনের তত বেশী কড়াকড়ি।" ইহার উত্তরে তিনি বলেন "বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো"—আর খাঁচার বাঘ বনের বাঘ অপেক্ষা কম হিংস্রক হয় না। অবশেষে তিনি বলেন, তিনি আমাদের দেশের নারীর স্বভাবজাত পবিত্রতায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাদের সতীত্ব নিতান্ত ঠুনকো জিনিষ তিনি মনে করেন না।

আর আমিই কি ঠুন্‌কো জিনিষ মনে করি? আমিই কি তাঁহাদের সতীত্বে কম শ্রদ্ধাবান্? দুঃখের বিষয় তিনি উল্টা বুঝিয়াছেন—যাহাকে বলে holds the wrong end of the stick। সামাজিক আইন কানুনের কড়াকড়ি অনেক স্থানেই নারীদিগকে সন্দেহ করিয়া নহে, পুরুষদিগকে সন্দেহ করিয়া। সেই জন্যই সকল সমাজে কতকগুলি conventionএর সৃষ্টি হইয়াছে। মনু যে বলেন "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংষমপি কর্ষতি" ইহাও বিদ্বান্ পুরুষদিগের উপর সন্দেহ জন্য—বিদুষী নারীদিগের উপর সন্দেহ জন্য নহে। বিশেষতঃ আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের ত দূরের কথা, তথাকথিত সুশিক্ষিত লোকও নারীদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে শেখেন নাই। যত দিন সমাজের পরিবর্ত্তন না হয়, ততদিন নারীদিগকে নিজ নিজ সম্মান বজায় রাখিবার জন্য কতকগুলি সামাজিক conventionএর মধ্যে থাকিতেই হইবে। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি, সহরে যতটা কড়াকড়ি পল্লীগ্রামে ততদূর নহে। পল্লীগ্রামে সকলেই সকলকে জানেন ও চেনেন, সে জন্য মেলামেশার কোন বাধা নাই।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের standardএর ন্যায় সতীত্বের যে একটা standard কল্পনা করিয়াছি, নরেশ বাবু তাহাকে রূপক বা উপমা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। কিন্তু যাহা সমাজে আছে তাহা অস্বীকার করিলেই তাহার অস্তিত্ব লোপ হইবে না। ইংরেজ সমাজে একটি নারী কোনও পুরুষের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া, পরে আবার আর একজনকে বিবাহ করিতে পারেন তাহাতে সমাজে কোন নিন্দা হয় না। কিন্তু আমাদের সমাজে সেরূপ করিলে দোষ হয়। আবার আমাদের সমাজে সতী নারীর পরপুরুষস্পর্শ নিষেধ। ইংরেজ সমাজে একজন বিবাহিতা স্ত্রী পরপুরুষের সহিত নৃত্য করিতে পারেন। এই সব ভিন্ন ভিন্ন সমাজে সতীত্বের ভিন্ন ভিন্ন standard আছে তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? তবে তাহার কোন্ standard কতদূর উৎকৃষ্ট তাহা ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর করে। আমরা অবশ্য আমাদের standardকে খুব উৎকৃষ্ট ও পবিত্র বলিব। নরেশ বাবু হয় ত তাহা মানেন না।

আমরা গৃহে নারীর পূজা করিয়া থাকি, তাহা যে ফুল বিল্বপত্র দিয়া নহে এ কথা আর বলিয়া দিতে হইবে না। আমাদের পূজা, পথে ঘাটে যুবতী নারীর রুমাল কুড়াইয়া দেওয়া বা তাহার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামান নহে। আমরা আমাদের কন্যা বা ভগিনীদিগকে গৃহের বাহিরে দোকানে আফিসে রোজগার করিতে পাঠাইয়া তাহাদিগকে সংসারের ধূলিমলিন

হইতে দিতে ইচ্ছা করি না ; আমরা তাহাদিগের ভরণ পোষণের ভার নিজ স্কন্ধে সানন্দে বহন করিয়া তাহাদিগের নানাপ্রকার লাঞ্ছনা এমন কি আফিসে বা দোকানে লাথি ঝাঁটা খাওয়া হইতে রক্ষা করি। আমাদের কন্যাদায়ের অর্থ—পিতামাতার সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও মেয়ের সুখ স্বচ্ছন্দতার বিধান করা। যদি ইহাকে নারী পূজা না বলে, তবে নারীপূজা কি জানি না।

এসব বাদানুবাদে কোন ফল নাই, বিশেষতঃ দেখিতেছি নরেশ বাবুর তর্কের ঝাঁজটা যেন ক্রমেই উগ্র হইয়া আসিতেছে। তাঁহার মনে রাখা উচিত, তিনি যত বড় আইনের ডাক্তারই হউন না কেন, আমাদের সমাজ-ব্যাধির প্রতিকার ব্যবস্থা করিতে কখনও তাঁহাকে মনু যাজ্ঞবল্ক পরাশরের আসনে বসাইয়া কেহ তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বসায় নাই।

২। সাহিত্য ও নীতি।

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর সাহিত্য পরিষদ্ শাখার এক অধিবেশনে তাঁহার এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছিলেন। সেই সভাতেই আমি ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াছিলাম। পরে আমার "সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা" পুস্তকে তাঁহার যুক্তিগুলির অবতারণা করিয়া তাহা খণ্ডনও করিয়াছি। দুঃখের বিষয় ললিত বাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

প্রথমতঃ তিনি বলেন সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয়, তবে সাহিত্যে বীভৎস প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে দেখিয়া বুঝিতে হইবে যে সমাজেরও স্বাস্থ্য পূর্ব্ব হইতেই আক্রান্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি লিখিয়াছি—

"সমাজে বিনোদিনী, বিমলা বা কিরণময়ী অপেক্ষাও অনেক খারাপ স্ত্রীলোক আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের কে খোঁজ রাখে? কবি তাঁহার আর্টের দ্বারা তাহাদের প্রলোভনময় পাপ চিত্র অধিকতর প্রলোভনীয় করিয়া ধরাতে তাহারা আমাদের পরিচিত হইয়াছে, এমন কি অনেকের অনুকরণীয়ও হইতে পারে।" ১০৫ পৃ

ললিতবাবু বলেন, "কিন্তু সাহিত্য শুধু সমাজের দর্পণ নহে। সাহিত্য নূতন আদর্শ ও চিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তাহার প্রভাব সমাজের উপর পড়িয়া মনুষ্য হৃদয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলে।"

আমিও ঠিক সেই কথা বলি। এবং সেই জন্যই কবিদিগের এরূপ চরিত্র সৃজন আপত্তিজনক মনে করি, যদ্দ্বারা মনুষ্য সমাজ নৈতিক ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে পারে। আর আমি যে সকল গ্রন্থকারের পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছি, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমার নালিশও এই যে, আমাদের সমাজে যাহা নাই, যাহা real (সত্য) নহে, তাঁহারা সেই সকল চিত্র realismএর দোহাই দিয়া সাহিত্যে প্রচলিত করিতেছেন। আমি লিখিয়াছি :—

"আমাদের উপন্যাসলেখকগণ আর্টের সাহায্যে এই বিলাতী প্রেমকে আমাদের সমাজে আমদানী করিতেছেন। ১২১ পৃঃ।

ইহার পরে ললিত বাবু তাঁহার আসল কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি আমারই ন্যায় স্বীকার করেন যে সমাজ ও মনুষ্যত্বের মঙ্গলই সাহিত্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।" তবে "সাহিত্যকে যদি শুধু শিক্ষকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়—কেবলমাত্র উপদেষ্টার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে সাহিত্য প্রতিভা এবং সৌন্দর্য্য বিকাশ হইবে কেমন করিয়া?"

অর্থাৎ আমি যেন এতই কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত যে কবিদিগকে কেবল স্কুল-মাষ্টার হইতে বলিতেছি। আমি লিখিয়াছি, "তাঁহারা (বাঙ্গলার উপন্যাস লেখকগণ) কি কেবল moral text-book রচনা করিবেন? না, আমি তাঁহাদিগকে কেবল হিতোপদেশ রচনা করিতে বলি না। তাঁহারা বাঙ্গালী জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবেন" ইত্যাদি। বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না—১১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ললিত বাবু বলেন, "কল্পনা যদি অবাধে বিচরণ করিতে না পাইল, তবে তাহা হইতে নূতন বিষয়ের

সৃষ্টির উদ্ভাবনা হইবে কেমন করিয়া? সাহিত্যে সৌন্দর্য্য কোথায়? মানব চিত্তের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সকল সঙ্কীর্ণতার উপর দাঁড়াইয়া সত্য চিন্তা ও মনোভাবের অভিনব চিত্রাঙ্কনের বিকাশেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য।"

"কল্পনা যদি অবাধে বিচরণ করিতে না পাইল"— এ সম্বন্ধেও আমি ১১৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছি:—

"আর্টকে নীতিমার্গ অবলম্বন করিতে বাধ্য করিলে, আর্টের স্বাভাবিক বিকাশ নষ্ট হইবে, আর্ট পঙ্গু ও কৃত্রিম হইয়া পড়িবে। সুতরাং আর্টকে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দেওয়াই কবির কর্ম্ম।" ইহার উত্তরে আমি লিখিয়াছি:—

"এত দিন আমরা কবিকেই নিরঙ্কুশ বলিয়া জানিতাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর্টও যে নিরঙ্কুশ হইবে এরূপ কখনও শুনি নাই। একজন যোদ্ধা অপেক্ষা যদি তাহার তরবারি অধিকতর স্বাধীন হইয়া উঠে, তবে সংসারে অনর্থক মারামারি কাটাকাটির বিলক্ষণ সম্ভাবনা ... অতএব আমরা দেখিলাম Shakespeare তাঁহার আর্টের অধীন ছিলেন না, আর্ট তাঁহার অধীন ছিল।" ১১৪ পৃঃ।

সাহিত্যকে যদি মানব চিত্তের সকল বাধা অতিক্রম করিতে হয়, তবে ব্যাপার যে কতদূর সাংঘাতিক হইয়া পড়ে ললিত বাবু তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা আনন্দ দান সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইলে "সমাজ ও মনুষ্যের মঙ্গল" থাকে কোথায়? সৌন্দর্য্য মাত্রই মঙ্গল আনয়ন করে না। ধরুন একটি পরমসুন্দরী সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা রমণীতে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও আর্টের চরম বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাহার নীতিচরিত্র অতি দূষণীয়। আমরা ভদ্র পল্লীতে তাহাকে স্থাপন করিয়া তাহাকে দেখিয়া আমাদের সৌন্দর্য্য স্পৃহা চরিতার্থ করিতে পারি কি? না সমাজের মঙ্গলের জন্য আমরা তাহাকে বলিতে বাধ্য হইব, "হে সুন্দরি! তুমি অতি সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি অন্যস্থান খুঁজিয়া লও, যেখানে তোমার রূপ ও সৌন্দর্য্য কলার আদর হইবে।"

আসল কথা হইতেছে, মানুষ বড় না আর্ট বড়? সমাজ বড় না সাহিত্য বড়? মানুষের জন্য আর্ট, না আর্টের জন্য মানুষ? সমাজের জন্য সাহিত্য, না সাহিত্যের জন্য সমাজ? ফুলের সৌন্দর্য্যের ন্যায় অন্য কোন সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে নাই এ কথা সকলেই স্বীকার করি- করিবেন। বিশ্বস্রষ্টা সেই ফুলের সৌন্দর্য্য কি কেবল মানুষকে আনন্দ দান করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়া তাঁহার আর্টের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন? তাহা নহে। সেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অন্তরালে তাঁহার একটা মঙ্গল ভাব নিহিত আছে। ফুলের সৌন্দর্য্যের দ্বারা ফলোদ্গমের সম্ভাবনা হয়, এবং ফলোদ্গমের দ্বারা সৃষ্টিধারা অব্যাহত থাকে, ইহাই তাঁহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কেবল সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য তাঁহার ফুল সৃষ্ট নহে। কবি যদি বিশ্বকবির ন্যায় একজন যথার্থ আর্টিষ্ট হন, তবে তাঁহাকেও এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে।

যদি বল, এ সকল কবিও সৃষ্টিধারা রক্ষা করিতে চান, তবে তাঁহাদের শিক্ষা কাব্য সৌন্দর্য্যের অন্তরালে গূঢ়ভাবে থাকে—ঠিক ফুলের মধ্যে বীজের ন্যায়। নীতিশিক্ষকের ন্যায় তাঁহাদের শিক্ষা সৌন্দর্য্য ছাপিয়া উঠে না। ইহাতেই তাঁহাদের প্রকৃত আর্টের পরিচয়।

খুব উচ্চাঙ্গের কাব্যে নীতিশিক্ষা এইরূপ গুপ্তভাবেই থাকে তাহা আমি স্বীকার করি। শকুন্তলা নাটকের মধ্যে কি নীতিশিক্ষা নিহিত আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অতুলনীয় সমালোচনা দ্বারা পরিস্ফুট না করিলে কে বুঝিতে পারিত? আবার বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিষ- বৃক্ষে কি শিক্ষা লাভ হয় তাহা পাঠকের চক্ষে পাছে সহজে ধরা না পড়ে এই ভয়ে তাহা তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু আধুনিক কোন কোন কবি তাঁহাদের আর্টের দ্বারা ফুলের স্বর্গীয় সৌরভ বিস্তার করিবার পরিবর্ত্তে যে পূতিগন্ধ বিস্তার করেন, তাহাতে সেই আর্টের অন্তস্তলে যে সুশিক্ষা নিহিত আছে সে পর্য্যন্ত পৌঁছিবার অবকাশ দেন কোথায়? তাঁহারা মানবের অন্তর্জ্জীবনের সূক্ষ্ম

সত্তাগুলি যেভাবে dissect (বিশ্লেষণ) করিয়া দেখান, তদ্দ্বারা পাঠকের moral sense ভোতা হইয়া যায়। আমার পুস্তকে আমি একথা লিখিয়াছি :—

"শরীরবিজ্ঞানবিৎ মানব দেহের গোপনীয় অংশ যে ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখান, তাহাতে কাহারও মনে রিপুর উত্তেজনা হয় না, কিন্তু কবি অথবা চিত্রকর নগ্ন মানব দেহ বা সমাজকে তাঁহার শিল্পকলার সাহায্যে যেরূপ লোভনীয় করিয়া চিত্রিত করেন তাহাতে সাধারণ নরনারীর মনে কুভাবের উদয় হওয়াই স্বাভাবিক।" ১০৬—৭ পৃষ্ঠা।

"ঘরে বাইরে" উপন্যাসের নায়িকা বিমলাচরিত্রে, প্রবৃত্তিকে বড় করিয়া লইয়া চলিলে জীবনে কি বিপত্তি ঘটে, কবি তাহা যেমন শিক্ষা দিয়াছেন, তেমন আবার নানা প্রকার ঘটনার মধ্যে পড়িয়া সে কি প্রকারে পাপের সিঁড়ি দিয়া ধাপে ধাপে নামিয়া চলিল তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়া, তাহার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার আর্টের গুণে তাহা সফলও হইয়াছে। তাই ললিতবাবু বলিতেছেন, "নায়িকার জীবন-ইতিহাসে বিস্ময় এবং করুণায় পুর্ণ হই।" বলা বাহুল্য যেখানে পাপীকে অবস্থার দাস বলিয়া মনে হয়, সেখানে পাঠক তাহার দোষ দেখিতে পায় না। সুতরাং কবির যদি কাব্যের অন্তস্তলে সৎ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা থাকে, তাহা বিফল হইয়া যায়।

সন্দীপ চরিত্র রচনা প্রসঙ্গে কবি সীতার উল্লেখ করাতে অনেকে তাঁহার দোষ দিয়াছেন, ললিত বাবু রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, "সন্দীপের তাৎকালীন মনের ভাব ঐ একটি প্রসঙ্গের দ্বারা যেরূপ প্রকাশ হইয়াছে তাহা বোধ হয় আর অন্য কোন প্রকারে অমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করিয়া বলা যাইত না।"

সন্দীপের মুখ দিয়া কবি সীতা দেবীর প্রসঙ্গ একটা উদাহরণস্বরূপ বাহির করিয়াছেন মাত্র। যে সীতা দেবী ভারতবর্ষে আপামর সাধারণ হিন্দুর নিকট জননীর ন্যায় পূজিতা, তাঁহার নাম এরূপ একটা খারাপ বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার না করিয়া কবি অন্য ভাবেও সন্দীপের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধে আমার পুস্তকে লিখিয়াছি—

"কোন গৃহস্থ নিতান্ত সর্ব্বস্বান্ত না হইলে এ 'লক্ষ্মীর কৌটা'য় পুরুষানুক্রমে রক্ষিত সুবর্ণ মুদ্রা খরচ করিবার জন্য বাহির করে না। সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ভাব-রাজ্যের কি এতদূর দরিদ্র হইয়াছিলেন? আবার কোন ব্যক্তি নিতান্ত বিপদে না পড়িলে নিজের পিতামাতার প্রতি কলঙ্কারোপ করে না। রবীন্দ্রনাথ এরূপ কোন্ বিপদে পড়িয়াছিলেন? তিনি বিশ্বকবি হইয়াছেন বলিয়া কি জাতীয় ভাবের কোন ধার ধারেন না?" ৮৬ পৃঃ

ললিত বাবুর প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্যগুলির আলোচনা করিলাম। তিনি যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার পুস্তকখানি আবার পাঠ করিয়া তাঁহার প্রবন্ধটি ছাপিতে দিতেন, তবে আমাকে এত কথা লিখিতে হইত না। পুস্তক না পড়িয়া তাহার সমালোচনা করিলে এইরূপই হইয়া থাকে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের কথা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমুদ্র বক্ষে।

৭ই জুন ভোর বেলায় আমাদের ষ্টীমার ছাড়িল। যুদ্ধে সাহায্যের জন্য মান্দ্রাজবাসীরা P. and O. Company র এই জাহাজখানি দুই বৎসরের জন্য ভাড়া করিয়া ইহাকে হাঁসপাতাল জাহাজে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় ১০০০ রোগীর জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সর্ব্বোচ্চ ডেকে অফিসারদের থাকিবার স্থান। তাহার পর নীচের তিন তালায় সৈন্যদের
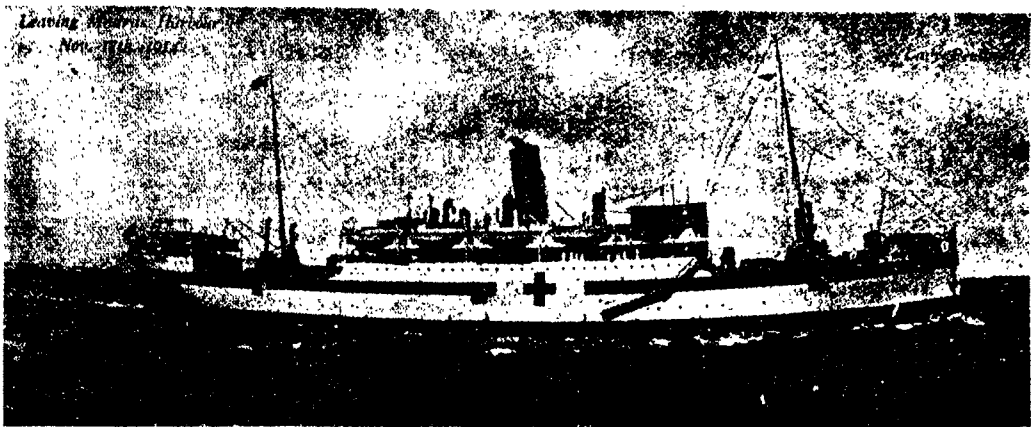
"মান্দ্রাজ" ইাসপাতাল জাহাজ

থাকিবার স্থান। অপেক্ষাকৃত আরামে আসিতে পারিবে বলিয়া ডেকের উপর সারি সারি Rocking bed বা দোলনা-বিছানা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সমুদ্রের ঢেউয়ে জাহাজখানি বেশী দুলিলেও আহত ও রোগীদের সে জন্য বিশেষ কষ্ট হইবে না।

জাহাজ যতক্ষণ বাহির সমুদ্রে পৌছায় নাই ততক্ষণ জাহাজের প্রধান অফিসার আমাদের কিরূপে সমুদ্রপীড়া' হইতে রক্ষা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। লোকটী স্কটলাণ্ডবাসী ও বেশ আমুদে। তাঁহার কথিত প্রধান উপায়টি হইতেছে আধপেটা খাইয়া দূর সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকা। জাহাজের বুড়া ষ্টিউয়ার্ড (খানসামা বলিল, সোডার সহিত হুইস্কি খাও, ভিতরে দুলিলে বাহিরের দোলে কিছুই হইবে না। যাহা

আমার ক্রীক
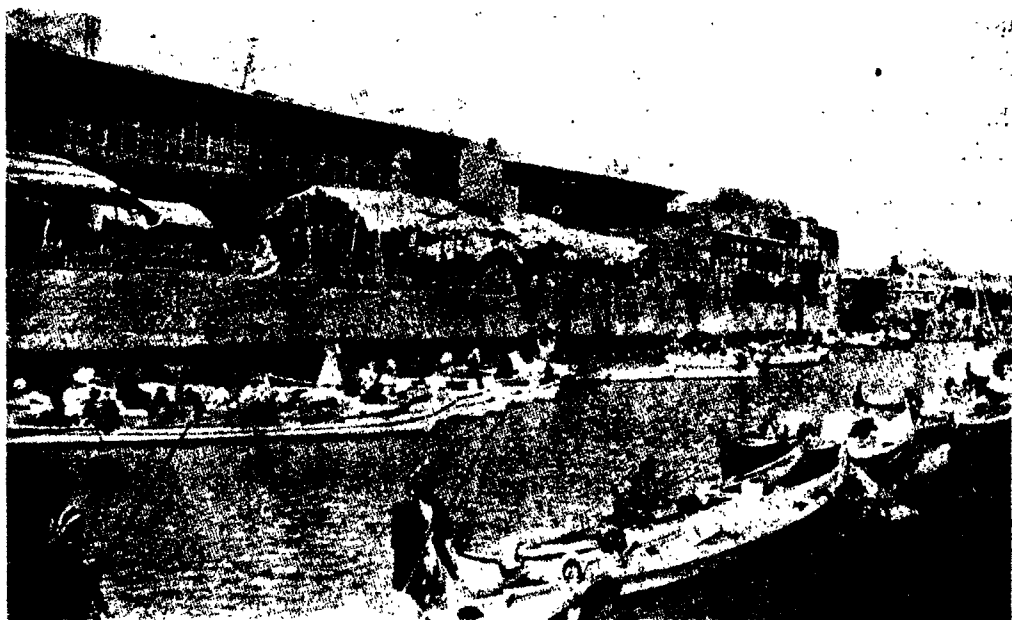
হউক সমুদ্রে পড়িবামাত্র জাহাজখানির দোলনে অনেকে শয্যাশায়ী হইলেন। তিন দিন শয্যাগত থাকিয়া চতুর্থ দিনে সকলে ফোরক্যাসলে বা সম্মুখ ভাগের অনাবৃত ডেকে আসিয়া গায়ে হাওয়া লাগাইলেন।

ষ্টীমারখানিতে কয়েকজন ইংরাজ ডাক্তার, কয়েকজন মান্দ্রাজী ডাক্তার ও কয়েকটি মান্দ্রাজী মেডিকেল কলেজের স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত ছিলেন এবং ইহা ব্যতীত প্রায় জন কুড়ি ইংরাজ নার্স বা শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন। "বসরা বেস হস্পিটাল" হইতে যে সৈন্যদের রোগের জন্য কিংবা আঘাতের জন্য অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করা হইত তাহাদের ভারতবর্ষে ফিরাইয়া লইয়া আসা হইত। "মান্দ্রাজ হস্পিটাল শিপ" এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত ছিল। কখনও মোসাপটোমিয়ায় কখনও পূর্ব্ব আফ্রিকায় যাইয়া রুগ্ন সৈন্যদিগকে লইয়া আসিত।

জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা কোথায় যাইতেছি তাহার ঠিক খবর জানা যায় নাই। সমুদ্রে পৌঁছাইয়া দিয়া যখন পাইলট্ জাহাজ হইতে নামিয়া যায়, তখন যুদ্ধকালীন ব্যবস্থামত কাপ্তেন সাহেব সরকারী শীলমোহর করা ব্যবস্থাপত্র খুলিয়া, নির্দ্দেশ মত বসরা অভিমুখে জাহাজ চালাইলেন।

মনসুনের পূর্ণ প্রকোপ বলিয়া সমুদ্র সে সময় অতিশয় তরঙ্গায়িত ছিল। অবিরাম ঢেউয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইদিকেই শুধু কৃষ্ণবর্ণ অসীম জলরাশির উদ্দাম নৃত্য। ঢেউগুলি একটির পর একটি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বদিকে ছুটিতেছে, সে শ্রেণীরও অন্ত নাই, যতদূর দৃষ্টি চলে, চক্রবাল-রেখার প্রান্ত হইতে জাহাজের খোল পর্য্যন্ত কেবলই শুভ্রফেনশীর্ষ তরঙ্গের শ্রেণী। জাহাজ বামে দক্ষিণে দুলিতে দুলিতে লাফাইয়া লাফাইয়া ঢেউগুলি অতিক্রম করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক একটী ঢেউ আসিয়া জাহাজের অনাবৃত ফোরক্যাসলের উপর দিয়া যাইতে লাগিল।

আরব সাগরে যে পাঁচদিন থাকিতে হইল, সে কয়দিনই এই অবিশ্রান্ত ঝড়ের মধ্য দিয়া জাহাজ চলিল। প্রথম তিন দিন সমুদ্রপীড়ার জন্য কাহারও আহার করিবার সামর্থ্য ছিল না। আমাদের দলের 'ওল্ড সেলর' ডাক্তার বাগচীর উপদেশ মত তেঁতুল ও গুড় সহযোগে ভিজা চিঁড়া খাইয়া সকলে ক্ষুধা নিবৃত্তি

লেফ্টেনেন্ট পি, কে, গুপ্ত

করিতাম। তিন দিন পরে সকলে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। আমাদের দলের আর একজন 'ওল্ড সেলর' কয়েকবার হংকং গিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তিনি জাহাজ বসোরায় লঙ্গর করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শয্যাত্যাগ করিতে পারিলেন না। ডাক্তার বাগচী যখন তাঁহাকে বিছানার নিকট

আসিয়া উপহাস করিতেন, তখন তিনি বলিতেন যে, "এযে আরব সাগর, এতো প্রশান্ত সাগর নয়।"

জাহাজের ষ্টিউয়ার্ড বা সর্দ্দার খানসামাটী এ সময় আমাদের বড় উপকার করিয়াছিল। সে প্রকাণ্ড একটি জগে করিয়া লেবুর সরবৎ লইয়া আসিয়া আমাদের বিতরণ করিত এবং আমরা সুস্থ হইয়া উঠিলে সস্তায় জাহাজের খানা খাওয়াইত। লোকটার মুখে ইংরাজি শুনিয়া আমরা তাহাকে গোয়ানিজ ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা যেদিন বসরায় নামিয়া যাইব সেদিন সে আমাদের সিগারেট বিক্রয় করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, "ওরে ছোঁড়ারা, বেশী খেজুর খাসনি, ফোড়া হবে।" তখন আমাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য বলিল, সে বাঙ্গালী, খিদিরপুরে তাহার বাড়ী। জাহাজের বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারটীও বাঙ্গালী ছিলেন।

স্থলে সৈন্যনিবাসের ন্যায় জাহাজেও রাত্র ৯॥০টার সময় বিগল বাজাইয়া আলো নিবাইয়া দেওয়া হইত। কেবল জাহাজের দুই পাশে দুইটী বড় বড় রেডক্রশ চিহ্নের উপর তীব্র আলো জ্বলিত। পাছে শত্রুর সাবমেরিন অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া টর্পীডো ছোড়ে সেই জন্যই হাঁসপাতাল জাহাজের চিহ্ন রেডক্রশ দুইটী আলো জ্বালাইয়া দেখান হইত।

বসরাবাসী আরব ভদ্রলোক, তাঁহার স্ত্রী ও ভৃত্য

ষষ্ঠ দিনে জাহাজ ওমান উপসাগর অতিক্রম করিয়া অরমুজ প্রণালী বহিয়া পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করিল। এদিকে মনসুনের বাতাস নাই বলিয়া সমুদ্র একেবারে সমতল। আরব সাগরের জল দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও নিকটে গাঢ় নীলবর্ণ, কিন্তু পারস্য উপসাগরের জল ঈষৎ হরিদ্রাভ ও জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ। আরব সাগরে যে উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক দেখা যাইত, এখানে তাহারা অদৃশ্য হইল।

পারস্য উপসাগরে পড়িয়াই অতিশয় গরম অনুভব করিতে লাগিলাম। বামে আরবের ধূসর রৌদ্রদগ্ধ তটভূমি ও বহুদূরে পারস্যের সুনীল পর্ব্বতরাজি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সপ্তম দিবসে পারস্য উপসাগর ত্যাগ করিয়া সট্‌এল-আরব বা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর সম্মিলিত প্রবাহের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কাফিখানায় ইরাকদেশীয় লোক

নদীতে জল অগভীর বলিয়া সট্‌-এল-আরবের মুখ হইতে বসরা পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য অষ্ট্রীয়ানদের একখানি prize ship বা কয়েদকরা জাহাজ "ফ্রান্স ফার্ডিনাণ্ড" উপস্থিত হইল। এই দ্বিতীয় জাহাজখানিতে প্রায় পাঁচ শত রুগ্ন দেশীয় সিপাহী ছিল। আমরা তাহাদের ষ্ট্রেচারে করিয়া মান্দ্রাজ হাঁসপাতাল জাহাজে উঠাইয়া দিলাম। আমরা একটু সঙ্গীতপ্রিয় বলিয়া মান্দ্রাজ জাহাজের একজন কর্ম্মচারী মেসোপটেমিয়া যাত্রী কয়েকজন দেশীয় ও ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকটে আমাদের উপহাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্স ফার্ডিনাণ্ডের সিপাহীদের সুখ্যাতি করিলেন এবং আমাদের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাত্রে পাশাপাশি দুইটী জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকিল।

১৯ই জুলাই ভোর বেলায় মান্দ্রাজ জাহাজ নঙ্গর তুলিল। কর্ণেল নট বাঙ্গালা দেশের পক্ষ হইতে মান্দ্রাজ জাহাজের অধ্যক্ষ Colonel Giffard (গিফার্ড) এর নিকট মান্দ্রাজবাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। আমরা মান্দ্রাজ জাহাজের আতিথেয়তার জন্য তিনবার জয়ধ্বনি করিলাম এবং নিজেরাও নঙ্গর তুলিয়া বসরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

কিছুদূর আসিয়া দেখিলাম যে নদীর গর্ভে তিনখানি সমুদ্রগামী জাহাজ নিমজ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে। আমাদের জাহাজের একজন গোরা সৈনিক বলিল যে তুর্কীরা হটিয়া যাইবার সময় এগুলি মাইন সহযোগে উড়াইয়া জলমগ্ন করিয়াছে, উদ্দেশ্য পশ্চাৎ-ধাবমান East India squadron বা পূর্ব্ব ভারতীয় মানোয়ারী জাহাজ গুলির গতিরোধ করা। এখন এই ষ্টীমারগুলিকে সরাইয়া নদীর উত্তর পারে রাখা হইয়াছে। এখানে সট্‌-এল-আরব নদীর প্রসার প্রায় দেড়মাইল হইবে।

বেলা প্রায় ৩টার সময় বসরা পৌঁছিলাম। সাটেল আরবের মুখ হইতে বসরা পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বের দৃশ্য প্রায় বাঙ্গালা দেশের মত। নদীর দুইধারে ছোট ছোট গ্রাম, ঘরগুলি মাটির নির্ম্মিত। প্রধান উল্লেখযোগ্য দৃশ্য নদীর উভয় পার্শ্বের ঘন খেজুর গাছের বাগান। এক খেজুর গাছ ভিন্ন অন্য কোনও গাছ দৃষ্টিগোচর হইল না। এই পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে

বেদুইন জীবন

উভয় পার্শ্বে কেবল মাত্র সুদীর্ঘ ও সুপুষ্ট খেজুর গাছই দেখিতে লাগিলাম।

বসরার যে স্থানে আমাদের জাহাজ আসিল তাহার সম্মুখে অসংখ্য সেনানিবাস ও হাসপাতাল দেখিলাম। নদীর ধারে এই স্থানটিকে 'আসার' বলে, পুরাতন বস্‌রা ইহা অপেক্ষা চারি মাইল দূরে ভিতরের দিকে অবস্থিত। সে রাত্রে আমাদের জাহাজেই বাস করিবার হুকুম হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

নদী পথে।

বসরা নিম্ন মেসোপটেমিয়ার বা ইরাকের একটি প্রধান সহর। প্রায় ৬ হাজার অধিবাসী বস্‌রা সহরে বাস করে। মেসোপটেমিয়া আক্রমণ করিবার ভার ৬ষ্ঠ সংখ্যক পুণা বাহিনীর উপর পড়িয়াছিল। পূর্ব্ব ভারতীয় নৌবহরের তোপের আড়ালে সর্ব্ব প্রথম বিগ্রেডটি জেনারেল ডিলা মেইনের নেতৃত্বে 'ফাও' নামক স্থানে অবতরণ করে এবং ঘণ্টাকয়েক যুদ্ধের পর স্থানটিকে অধিকার করিয়া লয়। এখানে তুর্কীদের একটি ফাঁড়ি বা outpost ছিল। কয়েক দল সৈন্য, একটি তোপখানা ও একটি টেলিগ্রাফ আফিস এখানে অবস্থান করিতেছিল। ইহার ডিভিসনের অন্য দুইটি বিগ্রেড ফাওতে অবতরণ করে এবং ছোটখাট আর কয়েকটি যুদ্ধের পর বসরা হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে সইবা নামক স্থানে তুরস্কের বাহিনীর সহিত তিনদিন ঘোর যুদ্ধের পর জেনারেল ব্যারেট বসরা অধিকার করিয়া লয়েন। এই ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাহিনীর নেতা জেনারেল টাউনসেণ্ড। ইঁহার অধীনে ডিলামেইন, মেসিল, হটন প্রভৃতি কয়েকজন অধিনায়ক ছিলেন। ইহা ব্যতীত একটি

আর্টিলারি বিগ্রেড ও ক্যাভালরি বিগ্রেড এই অভিযানে যোগ দিয়াছিল। বসরা অধিকার করিবার কিছু পরে ব্যারেট ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং দক্ষিণভারতের সেনাপতি জেনারেল নিক্সন (Nixon) মেসোপটে মিয়া'র প্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচিত হন।

আমরা যে সময় বসরা পৌছাই, সে সময় আক্রমণকারী বাহিনীর অগ্রগামী দল কুরণার যুদ্ধে তুর্কীদিগকে পুনরায় পরাজিত করিয়া টাইগ্রিস নদীর বামপার্শ্বস্থ 'আ-মারা' সহর অধিকার করিয়াছে। আ-মারায় একটী ষ্টেশনারি হস্‌পিট্যাল স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমাদের আমারায় অগ্রসর হইবার আদেশ দেওয়া হইল। ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাহিনী টাইগ্রিসের পথে তুরস্কের পশ্চাদ্‌গামী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতেছিল এবং জেনারেল গরিঞ্জ ইউফ্রেটিসের পথে তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবন করিতেছিলেন।

বৈকালে মেডিকাল বিভাগের ডিরেক্টর Surgeon General Hathaway জাহাজে আসিয়া আমাদের পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

পরদিন ভোরবেলায় লেফটেনাণ্ট গুপ্তের অধীনে নৌকাযোগে আমরা তীরে অবতরণ করিলাম এবং আসারে খানিকটা বেড়াইয়া আসিলাম। বাখরগঞ্জ জেলার গণ্ডগ্রামের ন্যায় আসার অনেকগুলি খালের দ্বারা বিভক্ত, এ খালগুলি অধিকাংশই কৃত্রিম। খেজুর বাগানে জলের বন্দোবস্ত করিবার জন্য এগুলি কাটা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খাল, আসার ক্রীক্, বসরা সহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই খালটিই আসার এবং বসরার প্রধান রাজপথ বলা যাইতে পারে। অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা খাল দিয়া যাতায়ত করিতেছিল। কোনওটিতে তরমুজ ও ফুটি বোঝাই, কোনওটিতে গ্রাম্য বেদুইন রমণীরা দুধ ও দই লইয়া যাইতেছে, কোনটিতে আবার রেশমী কাপড়ে রঙের বাহার তুলিয়া ইহুদী পুরুষ ও রমণীরা যাত্রা করিয়াছে।

আমরা আসার ক্রীক হইতে দক্ষিণদিকে একটি ছোট গ্রামের মধ্যে আসিলাম এবং একটি খেজুর বাগানের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এখানকার খেজুর গাছগুলি দেখিতে আমাদের দেশের নারিকেল গাছের ন্যায় বড়

বেদুইন জীবন। যাঁতা পিষিতেছে

এবং পাতাগুলি দীর্ঘ ও পুষ্ট। গাছের উপরের অপক্ক খেজুরগুলি আমাদের দেশের নারিকেলি কুলের ন্যায় বড় বড় ও রসাল। গাছের অপক্ক ফলগুলির প্রতি অতগুলি লোককে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া একটি বৃদ্ধ একটি ছোট চাঙ্গারিতে কতকগুলি পাকা ফল আনিয়া আমাদের বিতরণ করিল। খেজুরগাছই ইরাকের গৃহস্থের প্রধান অবলম্বন বলিয়া দখলকারী সৈন্যগণের হস্ত হইতে সেগুলি রক্ষা করিবার জন্য সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি রেজিমেণ্টে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, খেজুর গাছ হইতে ফল পাড়িলে সামরিক আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

ষ্টীমারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমরা কেহ কেহ পুনরায় ছোট বাল্লাম বা নৌকাযোগে আসার বাজারে বেড়াইতে গেলাম। আসার সহরের রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কিন্তু বেশ পরিষ্কার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে রৌদ্রদগ্ধ ইষ্টকের গৃহ ও দোকান। দোকানের অধিকারী প্রায়ই ইহুদী। কাপড়ের দোকানগুলির মালীক আরব দেশীয় বলিয়াই বোধ হইল। বাজারে মাছ তরকারী প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে, বিক্রেতা সকলেই গ্রামবাসী বেদ্‌ন কিংবা নদীর উত্তর পারে ইরাণী। দুগ্ধ, দধি, গৃহে প্রস্তুত চিড়া, প্রভৃতি রমণীরা বিক্রয় করিতেছে। বৃহৎ ও স্থায়ী দোকানের মালীকেরা প্রায়ই হিন্দী বলিতে পারে। মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্য বোম্বাই ও করাচী হইতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া হয়, এবং ব্যাপার উপলক্ষে প্রায়ই বোম্বাই যাইতে হয় বলিয়া বসরার সওদাগরেরা অনেকেই হিন্দি বলিতে পারে। পারস্যের বহির্বাণিজ্যও বোম্বাই ও করাচী হইতে প্রসারিত।

কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আমরা কয়েকজনে একটি কাফিখানায় আহার করিতে প্রবেশ করিলাম। দোকানটিতে খেজুরের ডালে তৈয়ারী কতকগুলি বড় বড় লম্বাকৃতি ডাইভান নামক আসন ও একটি লম্বা টেবিল। ছোট কাচের পেয়ালায় করিয়া দুগ্ধবিহীন পারস্য দেশীয় সুগন্ধী চা ও তুন্দুরে প্রস্তুত চাপাটির মত যবের রুটী বা খবুস্ দিয়া গেল। কাবাবের সহিত এক প্রকার লম্বা সুগন্ধী ঘাস ইহারা আহার করিয়া থাকে। কাফি প্রস্তুতের পাত্রগুলি এক একটি জালার ন্যায় বড় হয়।

ষ্টীমারে ফিরিয়া দেখিলাম যে কয়েকটি গ্রামবাসী আবার নৌকায় করিয়া আঙ্গুর বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। দুই আনায় ১ হোক্ বা পাঁচ পোয়া। ইহার পর লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ পত্রের দামও চড়িয়া গিয়াছিল। গ্যাঙ্গওয়ের ধারে দেখিলাম রায় ও ঘোষ দুই লান্সনায়েক চক্ষু বুজিয়া হাঁ করিয়া পড়িয়া আছে। পর্য্যাপ্ত আঙ্গুর দেখিয়া প্রায় ৬০ জনই প্রত্যেকে ১ সের করিয়া ফল কিনিতেছে বলিয়া, ইঁহারা বুদ্ধিমানের পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধু সাজিয়াছিলেন, এক একজন উপরে উঠিয়া যাইতেছে আর ইঁহারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে নিজ নিজ উন্মুক্ত মুখ গহ্বর দেখাইয়া দিতেছেন। কেহ দুইটি কেহ চারিটি করিয়া ফল সেইখানে নিক্ষেপ করিতেছে। কিছুক্ষণ পর উদরাময়ের আশঙ্কা করিয়া সাধুদ্বয় পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। জাহাজের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা সকৌতুকে এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

সেদিনও আমরা "ফ্রান্স্ ফার্ডিনাণ্ড জাহাজেই বাস করিলাম। তৃতীয় দিনে বৈকালে একখানি নদীগামী চাকাওয়ালা ষ্টীমার আসিয়া জাহাজে লাগিল। আমরা শুনিলাম যে তাহার পর দিন আহারাদির পর আমাদিগকে ঐ ষ্টীমারটীতে আরোহণ করিয়া আ-মারা সহরে যাত্রা করিতে হইবে।

পর দিন ভোর বেলা হইতে আমাদের জিনিস পত্র সেই ষ্টীমারে সরাইতে লাগিলাম। বেলা চারিটার সময় সকলে মিলিয়া তাহাতে গিয়া উঠিলাম। এই ষ্টীমারগুলি ব্রহ্মদেশীয় ইরাবতী নদী হইতে সমুদ্রযোগে এতদূর আনীত হইয়াছে। অনেকগুলি পূর্ব্ববঙ্গের পুলিশ লঞ্চও মেসোপটেমিয়ার নদী দুইটিতে তখন কার্য্য করিতেছিল। ইহা ব্যতীত মেসোপটেমিয়ার লিঞ্চ কোম্পানী নামক ইংরাজ জাহাজ কোম্পানীর ষ্টীমারগুলিও সৈন্য বিভাগ নিজের কাজে লাগাইতেছিলেন।'

কিছুদূর অগ্রসর হইলে আমরা সট-এল-আরব ত্যাগ করিয়া টাইগ্রীস নদীতে প্রবেশ করিলাম। স্থানটি বসরা হইতে প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে। ইহারই বাম-দিকে যে জলাভূমি দৃষ্টিগোচর হয় ইহুদীরা তাহাকেই বাইবেলের পুরাতন ইডেন গার্ডেনের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং নিরক্ষর ভক্তেরা এখনও একটি বহু পুরাতন ডুমুর গাছকে তাহাদের শাস্ত্রে বর্ণিত জ্ঞানবৃক্ষ বলিয়া ভক্তি সহকারে দর্শন করিতে যায়। সন্ধ্যার সময় আমাদের ষ্টীমার সেখানেই নঙ্গর করিল।

বহুদিন যাবত লোনাজলে স্নান করিয়া যে অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, তাহার লাঘবের জন্য আমরা কেহ কেহ নদীতে লম্ফ প্রদান করিয়া স্নান সমাধা করিয়া লইলাম। নদীর স্রোত অতিশয় প্রখর এবং এই স্রোতের প্রখরতার জন্যই ইহাকে পুরাকালীন গ্রীকেরা টাইগ্রীস বা ধনুকের তীর নাম দিয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই তীরের শব্দায়মান মশকে ঝাঁক আমাদের ষ্টীমারকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী এই স্থানটীর জমি অপেক্ষাকৃত কোমল বলিয়া টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীস বার বার এখানে দিক পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং সেই জন্যই চারিদিকে বড় বড় বিল ও জলাভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। মশকের অত্যাচারে মেসোপটেমিয়ার এই অংশ ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত। কত দিন ধরিয়া এই টাইগ্রীস ইউফ্রেটিসের নাম পাঠ করিতেছি। কখনও পাঠ্যরূপে কখনও বা মনোরম উপন্যাসের বর্ণনার বিষয়ীভূত হইয়া ইহারা আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ভাসিয়াছে, আজ স্বচক্ষে সেই ইতিহাস বিশ্রুত নদী দুইটী দেখিয়া বড় আনন্দলাভ করিলাম! এই নদী দুইটির ধার বহিয়াই দশ সহস্র গ্রীক্ যোদ্ধার সহিত জেনোফন্ স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ইহার খরস্রোতেই তরণীমুক্ত করিয়া সিন্দাবাদ নাবিক সমুদ্র যাত্রা করিত।

বসরা হইতে যাত্রা করিবার সময় আমাদের রসদ ষ্টীমারে উঠাইয়া লইয়াছিলাম, সেই সঙ্গে আমাদের কয়েক বস্তা ভাজা ছোলা ও গুড় দেওয়া হইয়াছিল। সে রাত্রে আমরা সেই ছোলা ভাজা ও গুড় দিয়া আহার সমাধা করিলাম। বসরা হইতে ক্রীত প্রচুর আঙ্গুর, ফুটি ও তরমুজ প্রভৃতিও আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট ছিল।

পরদিন প্রত্যূষে আবার ষ্টীমার চলিতে আরম্ভ করিল। বেলা প্রায় ৯টার সময় কুর্ণা নামক সহরে পৌছিল। কুর্ণা একটি ছোট সহর। নদীর দুই ধারে তুর্কিদের তৈয়ারী ট্রেঞ্চ শ্রেণী তখনও বর্ত্তমান ছিল। ষ্টীমার দেখিতে বহুলোক ঘাটে আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা সকলেই আরব। স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেই সে দলে উপস্থিত ছিল। সদ্যোবিজিত অধিবাসীদের যেরূপ সসঙ্কোচ ভাব থাকা স্বাভাবিক ইহাদের তাহা নাই দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বৃটিশ পতাকার অমর্য্যাদা ইংরাজ কি ভারতবর্ষীয় সিপাহী কাহারও দ্বারা হয় নাই। যদি যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা বৃটিশ কর্ম্মচারীদের নিকট সদয় ও নির্ভয় ব্যবহার না পাইত, তাহা হইলে এইরূপ অসঙ্কোচে স্ত্রী পুরুষ একত্র জাহাজ দেখিতে কখনই আসিতে পারিত না।

কুর্ণা হইতে একদল পাঞ্জাবী সৈন্য আমাদের ষ্টীমারে উঠিল এবং একখানি তদ্দেশীয় বাল্লাম বা বজরা ষ্টীমারের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তাহার উপর হারিয়ানা লান্সার্ নামক অশ্বারোহী দলের রিশালদার মেজর ও কয়েকটি সওয়ার আ-মারায় যাইতেছিল। পাঞ্জাবীদের অধিনায়ক একজন জমাদারও ষ্টীমারে উঠিলেন।

কয়েক ঘণ্টার পরই কুর্ণা হইতে ষ্টীমার ছাড়িল এবং পুনরায় পশ্চিম দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। নদীর দুধারে মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য আরবী বা বেদুইনদের আড্ডা দেখিতে লাগিলাম। ইহারা যাযাবর জাতি বলিয়া কখনও কোথায় স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করে না। খেজুরের পাতা নির্ম্মিত কয়েকটী চালা ও ভেড়ার লোমের প্রকাণ্ড তাম্বুই ইহাদের প্রধান বাসস্থান। কোনও কোনও স্থানে মাটির ঘরও দেখিলাম। ইহাদের অধিবাসীরা কৃষি ব্যবসায়ী বেদুইন বলিয়া শুনিতে পাইলাম। ইহাদের সম্বন্ধে সহর বর্ণনাকালে বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

সে দিন ভোর হইতেই প্রধান চিন্তা হইল, আহার্য্য প্রস্তুতের উপায়। ষ্টীমারে মাত্র একটি পাকশালা তাহাতে অফিসারদের পাক হইতেই প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল এবং তাহার পর জাহাজের খালাসীরা নিজেদের পাক করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের জন্য উনান ছাড়িয়া দেওয়া হইল বেলা তিনটার সময়। চাল ও ডাল একসঙ্গে চাপাইয়া লান্স নায়েক রায় পাকের ভার লইলেন। কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই দলস্থ একজনের চীৎকারে নীচে নামিয়া দেখি যে পাঞ্জাবীদের জমাদার তাহার দলের লোকের রুটী সেকিবার জন্য রায়কে তাহার ডেকৃচি নামাইতে বলায় সে নামায় নাই বলিয়া, জোর করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করায় রায়ের হাতে প্রহার খাইয়াছে। ক্রোধোন্মত্ত একজন পাঞ্জাবী হাবিলদার চীৎকার করিয়া বলিতেছে "তোম অ্যায়সা বেকুফ্ হায় কি সর্দ্দারকো মার দিয়া, চলা আও কোই শিখ জাঠ হায়?" নিজে তাহাদের থামাইতে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ চম্পটী বাবুকে সংবাদ দিলাম এবং আমাদের ওস্তাদ বাঘ সিংও আসিয়া জুটিল। বহুমিষ্ট কথার পর সিপাহীর দল ঠাণ্ডা হইল। রায় ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। আমাদের ছোলা-ভাজার এক বস্তা শিখদের অর্পণ করিলাম। তাহারা পরম সন্তুষ্টচিত্তে তাহা লইয়া গেল ও আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ দিল। তাহাদের সরল ব্যবহারে, আমরা আমাদের অপরাধের জন্য বহু ক্ষমাপ্রার্থনা করিলাম ও শীঘ্রই তাহাদের পরম বন্ধুরূপে পরিগণিত হইলাম। তাহারা বলিল যে পথ পর্য্যটনের জন্য তাহারা দুদিন কিছুই খায় নাই, তাই এত তাড়াতাড়ি করিয়াছে; তা না হইলে অনাহারে থাকা তো সিপাহীদের দৈনন্দিন কার্য্য।

আমাদের ষ্টীমারে কয়েকজন ইংরাজ সৈন্যও উঠিয়াছিল। তাহারা তাহাদের সঙ্গে Army biscuits ও টিনে রক্ষিত মাংসদ্বারা আহার সমাধা করিয়া লইল। যুদ্ধের সময় যখন কখন কোথায় যাইতে হইবে কিছুই ঠিক নাই, তখন এরূপ প্রস্তুত ও রক্ষিত আহারের বিশেষ উপকারিতা আছে। ভারতীয় সৈন্যবিভাগে এ নিয়মটি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম এক রাজপুত রেজিমেণ্টের কর্ণেল প্রত্যেককে কাঁচা আটা ডাল না দিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্তুত রুটি খাওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু জাতিভেদের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হিন্দু সিপাহীরা তাহাতে রুষ্ট হইয়া উঠে। সেইজন্য সিপাহীদিগকে প্রতিজন পিছু আটা, ডাল, ঘি, কাঠ রসদ বিভাগ হইতে দেওয়া হইত এবং ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষও করিয়াছি যে অভিযানের অর্দ্ধেক কষ্ট হিন্দুস্থানী সিপাহীরা এই সংকীর্ণতা দোষের জন্য ভোগ করিত। আমরা বাঙ্গালীরা যদিও প্রস্তুত খাদ্য ও টিনে রক্ষিত খাদ্য খাইতে প্রস্তুত ছিলাম, তথাপি হিন্দুস্থানী সিপাহীর শ্রেণীভুক্ত বলিয়া সেই কাঁচা রেশনই প্রাপ্ত হইতাম। অন্যকোন দেশীয় ফৌজের তুলনায় ভারতবর্ষীয় ফৌজের কর্ম্মকুশলতা এই একটি কারণেই অনেকটা লাঘব হইয়া পড়ে।

সেদিন অসহ্য গরম পড়িয়াছিল। চারিদিকে প্রখর রৌদ্র, ষ্টীমারটিও ভীষণ গরম হইয়াছিল বলিয়াই কর্ণেল হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা সকলেই প্রায় অর্দ্ধনগ্ন গাত্রে থাকিলাম। দূরে চক্রবালের নিকট গাছগুলি খুব বড় বড় দেখাইতেছিল। কর্ণেল বলিলেন উহাও একরূপ মৃগতৃষ্ণিকা।

প্রায় তিনদিন নদী বহিয়া ১৬ই জুলাই তারিখ আমরা বৈকালে আ-মারা সহরে পৌছাইলাম। সহরের নীচে নদীর পাড় প্রায় একমাইল ধরিয়া ইটের পোস্তা দিয়া বাঁধান। সম্মুখেই তুর্কী সৈন্যের সেনানিবাস। তাহাদের খুটায় তখন ইউনিয়ন জ্যাক উড়িতেছিল। সে রাত্রে আমরা ষ্টীমারেই থাকিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

নিদ্রাতুরা

(গল্প)

গভীর রাত্রি। বারবছরের বালিকা নন্দরাণী দোলনা দোলাইতে দোলাইতে দোলনায় শয়ান শিশুটিকে শান্ত করিবার জন্য নিদ্রাবিজড়িত স্বরে বলিতেছিল—"খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো—"

অদূরে পিতলের পিলসুজের উপর তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ঘরের দেওয়ালে পেরেক গাড়িয়া লম্বালম্বি একগাছা দড়ি টাঙ্গানো—তাহাতে শিশুর গায়ের জামা, কাঁথা প্রভৃতি ঝুলিতেছিল। দেওয়ালের উপর পিলসুজের লম্বা কালো ছায়া—দড়িতে ঝুলানো কাপড়জামার ছায়াও ঘরের মেঝেয়, দোলনায় ও নন্দরাণীর গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রদীপের শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিলে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই ছায়াগুলিও যেন জীবন্ত হইয়া নড়িয়া চড়িয়া উঠিতেছিল।

শিশুটির ক্রন্দনের বিরাম নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও সে চীৎকার করিতেছিল—কখন যে চুপ করিবে তাহার ঠিক ছিল না। এদিকে নন্দরাণীর ঘুম পাইয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল—চোখের পাতা কে যেন আঠা দিয়া বন্ধ করিয়া দিতেছে। তাহার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, ঘাড় অসহ্য বেদনায় টন্ টন্ করিতেছে। তার চোখের পাতা, কিংবা ঠোঁট নাড়িবার সামর্থ্য ছিলনা। তাহার মনে হইতেছিল মুখ শুকাইয়া কাঠ হইয়াছে আর তাহার মাথাটি যেন আলপিনের মাথার মত ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। তবু সে কোনও রকমে মুখে বলিতেছিল—"খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো—।"

বাহিরে ঝিঁঝিঁ পোকা অবিশ্রান্তভাবে ঝিঁ ঝিঁ করিয়া ডাকিতেছিল। পাশের ঘর হইতে তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নীর ভীষণ নাকডাকার শব্দ আসিতেছিল। দোলনা দোলার শব্দ, নন্দরাণীর অস্পষ্ট ছড়া মিশ্রিত হইয়া এক মধুর শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই শব্দ, যে বিছানায় শুইয়া তাহার নিকট প্রীতিপ্রদ হইলেও, নন্দরাণীর বিরক্তিজনক মনে হইতেছিল, কারণ, এই শব্দের জন্যই ঘুম তাহাকে আরও পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু তাহার তো ঘুমাইবার উপায় নাই—যদি সে হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়ে, তাহ হইলে তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নীর প্রহারে সমস্ত শরীর জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে।

প্রদীপের শিখা নড়িয়া উঠিল—সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ভিতরের ছায়াগুলিও যেন প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়া নড়িতে লাগিল। নন্দরাণী আধখোলা স্থির চক্ষু দিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার নিদ্রাভারাক্রান্ত মস্তিষ্ক ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছিল না—এগুলি কি। তাহার মনে হইল যেন আকাশে খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ পরস্পরকে তাড়া করিতেছে, এবং তাহারা শিশুর মত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ বাতাস বহিতে লাগিল—মেঘ কাটিয়া গেল। নন্দরাণী দেখিতে পাইল তাহার সম্মুখে প্রশস্ত কর্দ্দমাক্ত পথ। সেই পথের উপর কত গাড়ীঘোড়া চলিতেছে, আর কত নরনারী পিঠের উপর কম্বল ফেলিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যাইতেছে; সহসা লোকগুলি কর্দ্দমাক্ত রাস্তার উপর শুইয়া পড়িল।

নন্দরাণী প্রশ্ন করিল—"কি করছো তোমরা?"

তাহারা উত্তর দিল—"আমরা ঘুমাবো—আমরা ঘুমাবো।" তারপর তাহারা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

নন্দরাণী তখন মুখে বলিতেছিল—"খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো—।"

এবার তাহার মনে হইল সে এক অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে রহিয়াছে। এই ঘরের ভিতর তাহার মৃত পিতা রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। অন্ধকারে তাহাকে

দেখিতে পাইতেছে না—কিন্তু তাহার অসহ্য যন্ত্রণাজনিত শব্দ কাণে আসিতেছিল। তাহার মা মনিববাড়ী খবর দিতে গিয়াছে যে তাহার স্বামীর মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। সে অনেকক্ষণ গিয়াছে—এতক্ষণ তাহার ফিরিবার কথা। —এমন সময়, তাহাদের কুটীরের সামনে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মা মনিবকে বলিয়া ডাক্তার লইয়া আসিয়াছে।

ডাক্তার ঘরের ভিতর অন্ধকার দেখিয়া আলো জ্বালিতে বলিল। রঘু যেন অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

নন্দরাণীর মা একটুকরা মোমবাতি লইয়া আসিয়া আলো জ্বালিল। রঘু ডাক্তারকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, "আমি মরছি ডাক্তারবাবু, আর আমি বাঁচবো না।"

ডাক্তারবাবু যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ও কি বলছ রঘু? আমি তোমায় ভাল করবো।"

রঘু বলিয়া উঠিল, "সে আমি জানি! আর সান্ত্বনা দিয়ে ফল কি ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া নন্দরাণীর মাকে বলিয়া গেলেন, "আমি কিছু করতে পারবো না। হাঁসপাতালে পঠানোর ব্যবস্থা কর। আমি তোমার মনিবের গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে আলো নিবিল। আবার তাহার পিতার আর্ত্তনাদ যেন তুমুল হইয়া উঠিল। আধ ঘণ্টা পরে গাড়ী আসিল। সেই গাড়ীতে তাহার পিতা হাঁসপাতালে চলিয়া গেল। পরদিন সকাল বেলা তাহার মা হাঁসপাতালে স্বামীকে দেখিতে গেল। নন্দরাণীর তখনও মনে হইতেছিল একটী শিশু কাঁদিতেছে, আর তাহারই গলার স্বরে কে যেন বলিতেছে,"খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো।"

কিছুক্ষণ পর তাহার মা যেন কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নন্দরাণীর বাপ সকালবেলা মারা গিয়াছে। ইহা শুনিয়া নন্দরাণী রাস্তার উপর দৌড়াইয়া গিয়া কাঁদিতে বসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কে যেন তাহার মাথায় এমন জোরে আঘাত করিল যে তাহার কপাল সম্মুখের গাছে ঠুকিয়া গেল। নন্দরাণী এইবার চোখ মেলিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল তাহার মনিব চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"এতবড় পাজির ধাড়ী তুই! ছেলেটা কেঁদে সারা হচ্ছে আর দিব্যি ঘুম দিচ্ছিস্!" —বলিয়া তাহার গালে এক চড় কসিয়া দিতেই, নন্দরাণী মাথাটী একবার ঝাঁকাইয়া লইয়া, দোলনা দুলাইতে দুলাইতে সুর ধরিল- "খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো।"

মনিব চলিয়া গেলেন। আবার সেই আলো-ছায়ার স্পন্দন তাহার মস্তিষ্ককে অধিকার করিয়া বসিল। সে পুনরায় দেখিতে লাগিল যেন সেই কর্দ্দমাক্ত রাস্তার উপর মানুষগুলি ঘুমে নিদ্রামগ্ন রহিয়াছে। তাহাদের দিকে চাহিয়া নন্দরাণীরও ঘুমাইতে ইচ্ছা হইল। সে হয়ত এতক্ষণ ইহাদের সঙ্গেই ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু তাহার মা তখন তাহাকে লইয়া দ্রুত সহরের দিকে কাজের চেষ্টায় চলিয়াছে।

তাঁহার মা যাহাকে দেখিতেছে তাহারই নিকট যেন আবেদন করিতেছে, "গরীবকে কিছু ভিক্ষা দেও বাবা!"

হঠাৎ পরিচিত স্বর তাহার কাণে গেল—"খোকাকে এখানে দিয়ে যা!" তারপরই নন্দরাণী শুনিল—"কি? ঘুম হচ্ছে হতভাগী!"

নন্দরাণী লাফাইয়া উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়াই বুঝিতে পারিল ব্যাপারখানা কি। সেখানে রাস্তাও নাই তার মাও নাই, শুধু তাহার প্রভুপত্নী ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া। সে শিশুকে তাহার মায়ের কোলে তুলিয়া দিল। মা শিশুকে দুধ খাওয়াইতে লাগিলেন, আর নন্দরাণী দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। বাহিরের অন্ধকার তখন ফিকে হইয়া আসিয়াছে, এবং ঘরের ছায়াগুলি ক্রমশঃ অস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। শীঘ্রই রাত্রি প্রভাত হইবে।

প্রভুপত্নী কিছুক্ষণপর সেমিজের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে বলিলেন "নে—আর কাঁদেনা যেন।" সে শিশুকে লইয়া আবার দোলায় দোলাইতে আরম্ভ করিল। মনের ভিতর ছায়াগুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্ট-তর হইয়া মিলাইয়া গেল। নন্দরাণীর মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত

করিতে আর সেগুলি রহিল না। কিন্তু চোখের ঘুম তাহার ছাড়িল না। সে তাহার মাথাটা দোলনার পাশে রাখিয়া সমস্ত দেহের ঝাঁকানি দিয়া দুলাইতে লাগিল —যদি ইহাতেই ঘুম চলিয়া যায়। কিন্তু কিছুতেই তাহার ঘুম দূর হইল না।

"নন্দরাণী—উনুনে আগুন দাও।" মনিবের এই আদেশেই সে বুঝিতে পারিল ভোর হইয়াছে। এখন কাষ করিতে হইবে। সে দোলনা ছাড়িয়া সজোরে চোখ রগড়াইয়া কয়লা ভাঙ্গিতে গেল। এইবার তাহার মন অনেকটা প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কারণ, ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলে আর তেমন ঘুম আসিবে না। সে কয়লা আনিয়া উনুন ধরাইল। তাহার মনে হইতে লাগিল— দেহের সে জড়ভাব যেন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, আর তাহার মস্তিষ্কও অনেকটা পরিস্কার হইয়া আসিয়াছে।

গৃহকর্ত্রীর হুকুম হইল—"নন্দরাণী, বাসনগুলো মেজে ফেল।"

অর্দ্ধেক বাসন মাজা হইতে না হইতেই আবার তাহার প্রভুর হুকুম হইল—"এই নন্দ, আমার জুতোয় কালি দিয়ে যা।" জুতোয় কালি দিতে দিতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি সে এই জুতোর মধ্যে ঢুকিয়া একটু ঘুমাইয়া লইতে পারিত! ঘুমের কথা ভাবিতেই তাহার মাথা আবার ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। সে দেখিল যেন জুতাখানি বড় হইতে হইতে ঘরের সমান হইয়া উঠিয়াছে। নন্দরাণীর হাত হইতে ব্রাসটি পড়িয়া গেল—সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার তন্দ্রাটুকুও ছুটিয়া গেল। সে চোখ মেলিয়া স্পষ্টভাবে ভাবিতে চেষ্টা করিল, যেন আর তার চোখের সামনের জিনিষগুলি বৃহদাকার হইয়া না উঠে।

আবার মনিবপত্নী আদেশ করিলেন, "নন্দরাণী বাইরের বারান্দাটা ধুয়ে ফেল।"

বারান্দা ধুইয়া ঘরদ্বার পরিস্কার করিয়া যে বাজার করিতে চলিয়া গেল। তাহার কাযের অন্ত ছিল না— এক মুহূর্ত্ত তাহার অবসর ছিল না।

কিন্তু সব চেয়ে তার কঠিন কাষ ছিল আলুর খোসা ছাড়ানো। এই সময় তার মনে মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত, আর আলুগুলি যেন চোখের সামনে নৃত্য করিত।

দিন এমনি ভাবে চলিয়া যায়। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিলে নন্দরাণী তাহরে শরীর টিপিয়া দেখে যে তাহা মাংসের না কাঠ দিয়া তৈরী, আর মনে মনে হাসিতে থাকে—কেন তা সে নিজেই জানে না। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখে নিদ্রা আসিয়া ভর করে, কিন্তু ঘুমাইবার উপায় নাই। তখন আবার গৃহকর্ত্তার বন্ধুরা বাড়ীতে আড্ডা জমাইয়া বসে।

সন্ধ্যা হইলেই প্রভুর হুকুম হয়—"নন্দরাণী, চা নিয়ে আয়।" "নন্দরাণী পাণ আনতে এত দেরী কেন?" ইত্যাদি। সে অনবরত ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, যাহাতে ঘুম তাহাকে চাপিয়া না ধরে।

অবশেষে, বন্ধুবর্গ চলিয়া গেলে প্রভু ও প্রভুপত্নী নৈশ আহার শেষ করিয়া তাঁহাদের শেষ হুকুম দিয়া যান "নন্দরাণী, পাখীর ছোলা ভিজাতে দে।"

রাত্রে আবার সেই ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতে থাকে, প্রভু ও প্রভুপত্নীর ভীষণ নাকডাকা সুরু হয়, ঘরের ভিতরে আলোহাওয়ার নর্ত্তন তাহার মস্তিষ্ককে আবার পাইয়া বসে। আর নন্দরাণী সেই একভাবে নিদ্রা-জড়িতস্বরে বলিতে থাকে, "খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো।" কিন্তু একই ভাবে চীৎকার করিতে করিতে ক্লান্ত হয়, তবু সে নীরব হয় না। নন্দরাণী সেই বড় রাস্তা, কম্বল কাঁধে নরনারী, মাতা ও পিতা সবই দেখিতে থাকে। সে বুঝিতে পারে সব, চিনিতেও পারে সকলকে, কিন্তু আধ তন্দ্রার ভিতর দিয়া এই কথাটাই ধরিতে পারে না যে কোন্ শক্তি তাহার হাত পা বাঁধিয়া নিয় তাহার উপর এমন ভারী বোঝা চাপাইয়া তাহাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। নন্দ-রাণী চারিদিকে তাকাইয়া সেই শক্তির অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করে—কিন্তু কিছুতেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না।

অবশেষে সে একবার প্রাণপণ চেষ্টায় আয়ত লোচনে ঘরের ছায়াগুলি দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া শিশুর ক্রন্দন শুনিল। সহসা সে যেন বুঝিতে পারিল কে তার শত্রু—কে তাহাকে মরণের মুখে পাঠাইতে চায়।

'এই শিশুই তার শত্রু।'

নন্দরাণী বিকটভাবে হাসিয়া উঠিল। সে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইল, কেন এই সহজ কথা এতদিনও বুঝিতে পারে নাই। সেই ঘরের ছায়াগুলি, বাহিরে ঝিঁঝি সবই যেন তাহার হাসির সঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

এই খেয়াল নন্দরাণীকে একেবারে পাইয়া বসিল! সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করিতে লাগিল। সে এই ভাবিয়া আনন্দিত হইল যে, এখনই এই শিশুটিকে নিকাশ করিয়া ফেলিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইবে।

নন্দরাণী হাসিয়া নিঃশব্দে দোলনার কাছে উপস্থিত হইয়া শিশুটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। শিশুর গলা সজোরে টিপিয়া দিয়াই সে তাড়াতাড়ি সেইখানেই শুইয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্তেই অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। *

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়।

* রুষ ঔপন্যাসিক শেখভের অনুসরণে।

ফাল্গুন

আহা ও—রঙের আগুন কে লাগাল
ঐ ফাগুনের বন জুড়ে?
ও আগুন—ছাইয়ে গেল, ছাই হলো যে
শ্যামল স্বপন সব পুড়ে।
আগুনের—আঁচ লেগে দশ হাজার পাখী
সঘনে—একতানে ঐ উঠ্‌ল ডাকি,
আগুনের—রাঙা রাঙা আঙার গুলো
ভ্রমর হয়ে যায় উড়ে॥
আগুনে—নটকোনা বন ফটফটিয়ে
ওই ফাটে
শিমুলের—পুড়ল পাতা, জ্বলছে আগুন
তার কাঠে।
ও আগুন—ঢেউ খেলে যায়, উঠ্‌ল গিয়ে
পলাশে—গাবগাছে দ'য় ঝিলমিলিয়ে,
ও শিখা—বাদাম গাছের ফাঁকে ফাকে
লক্‌লকিয়ে যায় ঘুরে।
আগুনের—আঁচ লাগে সব সখাসখীর
অন্তরে,
তড়াগে,—চখাচখী বন ছেড়ে ঐ
সন্তরে।
ও আগুন—মলয় বায়ে যায় বেড়ে ওই
ও তাতে—তরুণীদের প্রাণ বাঁচে কই!
আগুনের—ফুলকি গিয়ে লাগল যত
বিরহিণীর প্রাণপুরে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

কাশ্মীর ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আর একমাইল যাইতেই দেখি দূরে বাম দিকে 'গুলমার্গ' পর্ব্বতের তুষারশৃঙ্গের উপরে একখানি কৃষ্ণ-বর্ণ মেঘের অন্তরাল হইতে অস্তগামী সূর্য্যকিরণ সার্চ্চ লাইটের মত পড়িয়া এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ঠিক যেন দ্রবীভূত রজত ও সুবর্ণধারা বিরাট পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া নামিয়া আসিতেছে।

চাহিয়া দেখি জাফরাণ ক্ষেত্রে ৩।৪টি ফুল ফুটিয়াছে। বন্ধু একটী ফুল তুলিয়া লইলেন। এই ফুলের তিনটী কেশর, ইহাই প্রকৃত জাফরাণ। আমরা দোকানে যাহা কিনি তাহা ফুলের পাপরি ও ডাঁটা সমেত। আর প্রায় আধ মাইল যাইতে একটী উচ্চ স্থানে দুটী লোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম। তাহার মধ্যে একজন বলিল "পোষ" বন্ধু বলিলেন "পোষ কেয়া ?" প্রশ্ন হইল "ফুল নিকালা ?" বন্ধু বলিবেন "নেই দেখা।" আমরা চলিলাম। বুঝাগেল যে এই মূল্যবান ফুলের জন্ত প্রহরীর বন্দোবস্ত আছে।

ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। গুলমার্গ শৃঙ্গ এমন কি ডানদিকের উচ্চ মহাদেব পর্ব্বত শৃঙ্গ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাঁটিতেও কষ্ট হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই। প্রায় পাঁচ মাইল আসিবার পরেই নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত-কন্দর হইতে "হুঁ-উ, হুঁ-উ" শব্দ আসিতে লাগিল। কোনও বন্যজন্তু হইবে—উভয়েই ছুটিলাম। বাম দিকে চেনার আর ডানদিকে উইলো বনের গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া দুটী পরিশ্রান্ত প্রাণী আমরা প্রাণভয়ে ছুটিতেছি। আমাদের পদশব্দে চমকিত হইয়া পক্ষীগুলি গাছের ডাল হইতে শব্দ করিয়া উঠিতেছে। প্রায় পাঁচ মিনিট এইরূপে ছুটিয়া একেবারে হাঁফাইয়া বসিয়া পড়িলাম; তখন আর শব্দ শুনা যাইতেছে না। আর শীত নাই, হাত পা গরম হইয়া উঠিয়াছে। বসিয়া দেখি যে আমি একা, বন্ধু দৌড়ান আবশ্যক বোধ করেন নাই। খানিকটা পরে তিনি আসিয়া বেদম হাসিতে লাগিলেন। তিনি ওখানকার ওয়াকীব-হাল লোক, কেবল মজা করিবার জন্য দৌড়ের অভিনয় করিয়া-ছিলেন। পায়ে ফোস্কা উঠিয়াছে, রাগও বিলক্ষণ হইয়াছে কিন্তু বুদ্ধিমানের মত তাঁহার হাসিতে যোগদান করিয়া আবার উভয়ে চলিলাম। আমি বলিলাম, "এই সুযোগে গাটা গরম করিয়া লইয়াছি।" ৭ ৩০টায় বাড়ী ফিরিলাম।

২১শে অক্টোবর—১১টায় রৌদ্র উঠিল, শরীর অতিশয় শ্রান্ত ছিল, এবেলা বাহির হইলাম না।

বেলা ২—৩০ এ দুটী বয়স্ক সঙ্গীর সহিত বাহির হইলাম। ইঁহাদের মধ্যে একজন 'অমরনাথের' ফেরতা। ৩নং 'প বাবু' ইনি অতিশয় অমায়িক ও ধর্ম্মভীরু। এখানে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, এখন কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ৭।৮ দিন পরে রৌদ্র হওয়ায় সমস্ত শ্রীনগর আজ যেন হাসিতেছে। রাস্তায় বহু লোক, সকলেই যেন আনন্দিত। কতকগুলি বালক খোলা গায়ে খেলা করিতেছে। তাহাদের শুভ্র-শরীরে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া যেন তুষারশৃঙ্গে রৌদ্রপাতের দৃশ্য দেখাইতেছে। আজ পাখীর আওয়াজও কাণে আসিতেছে—তাহার মধে শালিক, বুলবুল্ ও কাকই অধিক। এখানকার কাকগুলি আমাদের কাক হইতে আকৃতিতে অনেক ছোট, ইহাদের ঠোঁটও ছোট। কিন্তু তফাৎ ইহাদের ডাকা। সে "কাঃ কাঃ" বাজখাঁই শব্দ নাই, বেশ মৃদু "কঃ কঃ" রব কর্ণে মধুবর্ষণ না করিলেও অসহ্য বোধ হয় না।

আমরা বাজার ছাড়াইয়া বামদিকে খানিকক্ষণ গিয়া শ্রীপ্রতাপ মিউজিয়মে উপস্থিত হইলাম। মিউজিয়মের অবস্থানাদি অতি সুন্দর। অবশ্য কলিকাতার তুলনায় ইহা অতি ক্ষুদ্র, তবে কাশ্মীরের জীব জন্তু, কাশ্মীরের শাল ও ওয়ালনট (walnut) কাষ্ঠের উপর অসামান্য কারুকার্য্য দেখিবার মত। একখানা শালের উপর

সূচিকার্য্যে সমস্ত শ্রীনগরের সুন্দর মানচিত্র প্রস্তুত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কাশ্মীরের পুরাতন মুদ্রা, ষ্ট্যাম্প এবং ওলাদাদ ও আস্কারদু হইতে আনীত অনেক দ্রব্যাদি রহিয়াছে।

একটী পুস্তক ঘরে অবন্তিপুরা, পাণ্ডবাথান প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতির প্রস্তর মূর্ত্তি, অনেক ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিতেছে।

বাসায় ফিরিয়া দেখি এক পণ্ডিত ভিক্ষার জন্য নিচে দাঁড়াইয়া কাতরস্বরে মিনতি করিতেছে। আমি উপরে আসিতে বলিলেও আসিতে সাহস করিল না। অবশেষে একটা সিকি নিক্ষেপ করিলে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিল। বোধ হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্রমাগত অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া এই জাতি এত কাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে।

২২শে অক্টোবর - আজও বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। আহারাদির পর পূর্ব্বদিনের বন্ধুদ্বয়ের সহিত নদীর ধারের রাস্তা দিয়া ৪। ব্রীজ 'জিনা কদলে' পৌঁছিলাম। এইখানে সমস্ত পাথরের দোকানদারের আড্ডা। যেখানেই ভ্রমণকারীর সমাবেশ, সেইখানেই এই সমস্ত প্রস্তরের দ্রব্য বিক্রেতার সমাবেশ দেখা যায়। এখানে Tiger Stone এবং Turquoiseই বেশী। মুসলমান কারিকরগণ বসিয়া একরূপ সূক্ষ্ম করাত দিয়া পাথর কাটিয়া নানারূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। হ্যাট দেখিলেই মূল্য চতুর্গুণ হইতে দশগুণ হইয়া যায়। সঙ্গী বহুকাল কাশ্মীরে আছেন সুতরাং তাঁহাকে ঠকাইতে পারিল না। ২।৩টি দোকান দেখিয়া অবশেষে এক যায়গায় ফরমাইস দিয়া আমরা বাসায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেই, একদল শিকারাওয়ালা ঘিরিয়া ধরিল। প্রায় ১॥মাইল নদীতে উজাইয়া যাইতে হইবে। আমি মনে করিলাম যে ১৲ কি ১॥০ দর স্থির হইবে। বন্ধু ৵০ হইতে সুরু করিয়া ।০ আনায় রফা করিলেন। ফলতঃ এখানে শিকারাই যাতায়াতের প্রধান উপায়।

নদীর উভয় পার্শ্বে সেইরূপ সুন্দরাকুলের সমাবেশ। একটী পণ্ডিত বালিকা ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার আয়ত চক্ষু, অলোকসামান্য রূপ এবং সর্ব্বোপরি পবিত্র মুখভাব দেখিবার যোগ্য।
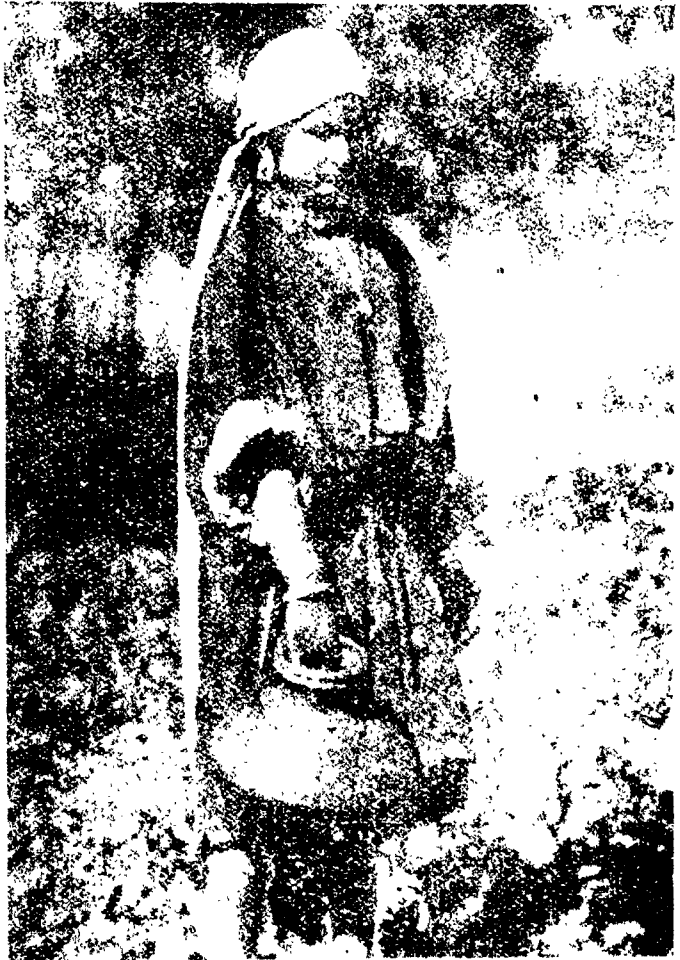
কাশ্মীরী রমণীর সাধারণ পরিচ্ছদ।

চা পানান্তে সন্ধ্যার সময় Mr. J.র সহিত আবার বাহির হইয়া বাজারে কাশ্মীরের বিশেষত্ব একটি কাঙ্গরী কিনিতে গেলাম। হঠাৎ বাজারের সমস্ত বৈদ্যুতিক্ আলো নিবিয়া যাওয়াতে আমরা প্যারেড আদালতের দিকে গেলাম। ফিরিয়া দেখি বাজারে আলো জ্বলিয়াছে। একটি কারুকার্য্য খচিত 'কাংরী'র দর করায় দোকানী হাঁকিল ৪৷৷০—মাথায় হ্যাট্ ছিল। লওয়া হইল না। ফিরিয়া Mr. J.র বাসায় গিয়া আর একটী লোক পাঠাইয়া সেইরূপ একটী কাংরী ১৷৵০তে আনানো হইল।

২৩শে অক্টোবর—আজও বেশ রোদ উঠিয়াছে। সকাল বেলা য বাবু আসিয়া তাঁহাদের টেক্নিকেল স্কুলের শিল্প প্রদর্শনীতে যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। বেলা ১১টার সময় মিঃ জে আসিলেন। তাঁহার সহিত চশমা-সাহী গিয়া তথা হইতে ফিরিয়া প্রদর্শনী দেখিতে যাইব স্থির ছিল, কিন্তু মিঃ জে আসিলেন না। হঠাৎ মিঃ কিউ উপস্থিত। তিনি দেশীয় খৃষ্টান, এখানকার একজন বড় কনট্রাক্টর, পূর্ব্বে একদিন মাত্র তাঁহার সহিত আলাপ হইয়াছিল। আমি চশমাসাহী যাইব শুনিয়া তিনি তখনই আমাকে তাঁহার মোটরকারে তুলিয়া লইলেন এবং নিজেই চালাইতে লাগিলেন। গুপকরের পাশ দিয়া ক্রমে উঠিয়া আমরা চশমাসাহী উদ্যানে পৌছিলাম। উদ্যানটী ক্ষুদ্র—সালেমার প্রভৃতির তুলনায় কিছুই নয়। সেইরূপই স্তরে স্তরে উপরে উঠিয়াছে, সেইরূপই বাহার। আমরা সকলের উপরের স্তরে উঠিয়া দেখি একটী 'চশমা' অর্থাৎ স্বাভাবিক উৎস হইতে অবিশ্রান্ত নির্ম্মল জল উঠিতেছে এবং তাহাই ফোয়ারা হইয়া ক্রমে 'নহর'এ পরিণত হইয়াছে। এখানে বিশ্বাস যে এই জলে খনিজ পদার্থ থাকায় ইহা অতিশয় উপকারী এবং পান করিলেই ক্ষুধা পায়। মিঃ জে'র দৃষ্টান্ত মত আমিও উপুড় হইয়া মুখে করিয়া সেই জল পান করিলাম। বাস্তবিক জল অতি পরিষ্কার ও সুস্বাদু। মিঃ কিউ আমাকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে গেলেন এবং "গরীবের বাড়ী আসিয়া কিছু খাইতে হইবে" বলিয়া কতকগুলি ফল আনিয়া দিলেন। আমি সেখানে বসিয়া ফল ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে রোজনামচা লিখিতে লাগিলাম।

অপরাহ্নে মিঃ জে আমাদিগকে জম্মুর বিখ্যাত খাম্বিরা খাওয়াইলেন। খাম্বিরা একরূপ ঢাকাই পরটার মত, কিন্তু ভিতরটা পাঁউরুটী। ময়দা পচাইয়া লইয়া ইহা প্রস্তুত হয়, ঘিয়ে ভাজিয়া লওয়া হয়।

২০শে অক্টোবর—শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রায় সমস্তই দেখা হইয়াছে, এইবার বাহিরে যাইতে হইবে। আজ মিঃ কিউর নিকট হইতে দু দিনের জন্য তাঁহার মোটর চাহিয়া লইয়া কাল 'মাটন' বা মার্ত্তণ্ড ভবন, 'অনন্তনাগ', 'ভেরনাগ' ইত্যাদি দেখিয়া পরশু ফিরিয়া আসিব ব্যবস্থা করিয়া গেলাম।

৩-৩০ টায় ৩নং প বাবুর সহিত রওনা হইয়া আমরা পূর্ব্বদিনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অমরসিংহ টেক্নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউটের দরজায় উপস্থিত হইলাম। বড়লাট সাহেবের আগমন উপলক্ষ্যে সমস্ত অট্টালিকা পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছে। এখান হইতে গুল-মার্গ পর্ব্বতের গভীর তুষার মণ্ডিত রজতশৃঙ্গগুলি অপরাহ্নের রবিকিরণে বড়ই মনোরম বোধ হইতেছিল।

'ম' বাবু এই স্কুলের শিক্ষক। তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া আমাদিগকে সমস্ত দেখাইলেন। উইলো বাস্‌কেট প্রস্তুত, চিত্রাঙ্কন, ইঞ্জিনিয়ারিং, কার্পেণ্টারি প্রভৃতি বহু বিষয়ে এই স্কুলের কাশ্মীরী ছাত্রগণ বিশেষ দক্ষতা দেখাইতেছে এবং তাহাদের উন্নতিও বেশ দ্রুত হইতেছে।

এ সমস্ত দেখিয়া আমরা প্রাঙ্গণে কাশ্মীরী শাল, আলোয়ান, জামিয়ার ও অন্যান্য পশমির উপর অসাধারণ নিপুণতার সহিত প্রস্তুত সূচিকার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। একখানা জামিয়ার দুই আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের দেখা গেল। তাহার পরই কাশ্মীরের বিখ্যাত walnut wood-carving—কাঠের উপর এরূপ সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কার্য্য আর কোথাও দেখা যায় না।

Papier mache (প্যাপিয়া-মাশে) অথবা

কাগজের পাল্প দিয়া প্রস্তুত বহুবিধ দ্রব্য এবং তাহার উপর অসামান্য নৈপুণ্যের সহিত কারুকার্য্য আর সোনারূপার দ্রব্যের উপর কারু কার্য্য এ সমস্তই দেখিবার মত। এ সকল দেখিয়া, অন্ধকার ঝেলম বক্ষ বাহিয়া শীতে প্রায় জমাট অবস্থায় বাসায় ফিরিলাম।

২৫শে অক্টোবর—আজ ১২টায় 'মাটন' রওনা হইবার কথা ছিল, কিন্তু কোন কার্য্যবশতঃ মিঃ কিউ আসিতে পারিলেন না। ৪-৩০টায় তিনি আসিয়া সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে কাল সমস্ত দিনের জন্য গাড়ী লইয়া প্রথমে 'ভেরনাগ' দেখিয়া আসিব; অন্য একদিন 'মাটন' দেখিব অর্থাৎ কোথায়ও রাত্রিবাস করা হইবে না।

সন্ধ্যার পর মিঃ জে আসিয়া বলিলেন, রাত্রি ৯--৩০টায় বাজি পোড়ান হইবে। বাহির হইতেই দেখিলাম সম্মুখে শঙ্কর পর্ব্বতে মশাল দিয়া এক অদ্ভুত ভূতের আলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মশাল এদেশীয় একপ্রকার কাঠের চেলা মাত্র। তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিলেই তাহা মশালের মত জ্বলিতে থাকে। আমি এক খণ্ড কাঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে একপ্রকারে তেল আছে বোধ হয়। অন্ধকারে পর্ব্বতের গাত্রে এ আলোকরাশি কেমন যেন একটা স্বপ্নরাজ্যের ভাব আনিয়া দিল। অন্য মনে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিলাম। ক্রমে আলোকগুলি নিবিয়া যাইতে লাগিল। বাহির হইয়া শুনিলাম আতসবাজী কাল হইবে, সুতরাং দারুণ শীতে আর বেশী দূর না গিয়া বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম।

কাশ্মীরী কুম্ভকার-রমণী।

ভেরিনাগ।

২৬শে অক্টোবর—সকাল বেলা উঠিয়া দেখি আকাশ বেশ পরিষ্কার। পর্ব্বতরাজি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। গুপকর পর্ব্বতের মস্তকে রক্তচ্ছটা দেখিয়া সূর্য্যোদয় বুঝিতে পারিলাম। এই ক'দিনেই দৃশ্যাবলীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চারিদিকে হেমন্তের শোভাসম্পদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সফেদা (poplar) হরিদ্বর্ণ আর চেনার

হয়। একটু যাইয়া একটী সেতু। লেখা রহিয়াছে "মোটরকারের পক্ষে বিপজ্জনক।" কাশ্মীরের দরবার এইরূপ একটী নোটিস দিয়াই খালাস, সে সেতুটীকে মেরামত করা কর্ত্তব্য বোধ করেন না। সকলে নামিয়া পড়িলাম। আর অন্য দিক দিয়া যাইবার উপায় নাই। আমরা সকলেই পদব্রজে সেতু পার হইলাম। চালক অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে নদী পার হইয়া গেল।

আবার চলিলাম। সম্মুখে বিরাট পর্ব্বতপ্রাকার—বরফে ঢাকা। ভেরনাগ আর ১১ মাইল। রাস্তা ক্রমে অসমান হইয়া উঠিতেছে। মোটরের বেগও কমিয়া আসিয়াছে। একটা মোড় ঘুরিতেই একটী লাল ফেরণ-পরা প্রাণী চমকিয়া প্রায় মোটরের গায়ে আসিয়া পড়িল। তরুণী রূপসী পাহাড়ী।

ঝেলম ক্রমেই ক্ষীণকায়া হইয়া ঝরণায় পরিণত হইতেছে। পাহাড় নিকটে আসিয়াছে; গাছের অর্দ্ধেক বরফে ঢাকা। আমরা সোজা বরফের দিকে চলিতেছি। বরফের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগিতেছে। ভেরনাগ আর আধ মাইল মাত্র। চারিদিকে ঝেলমের জল ঝরণার আকারে বাহির হইতেছে। আমরা ১—১০ মিনিটে ভেরনাগে পৌছিলাম।

এটী ক্ষুদ্র গ্রাম। মোটর থামিতেই বহুলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা নামিতেই একদল লোক 'মহান্ত' 'পাণ্ডা' ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রকাণ্ড খাতা হাতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমরা একটী অতি সুন্দর নালার পাশ দিয়া চলিলাম। অতি স্বচ্ছ জলে অসংখ্য ছোট ছোট মাছ চলিতেছে। প্রায় এক রশি যাইতেই একটী ঘেরা যায়গায় পৌছিলাম। এইটী সাহাজাহান বাদশা প্রস্তুত বিখ্যাত Verung spring একটী উচ্চ পাইন বৃক্ষসমন্বিত পাহাড়ের পাদদেশে এই 'চশমা' অবস্থিত। এই ঝেলমের উৎপত্তিস্থল। সম্রাট্ শাহজাহান সুন্দর স্থানটী পছন্দ করিয়া চশমাটীকে এক প্রকাণ্ড ইঁদারার মত করিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছিলেন এবং এই চশমাটীকে কেন্দ্র করিয়া এক বিশাল অট্টালিকা নিজ গ্রীষ্মাবাসের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে অট্টালিকা আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু সেই বিরাট কূপ হইতে এখনও সেই ভাবেই জল উঠিয়া একটী প্রণালী দ্বারা স্রোতের আকারে বাহির হইয়া যাইতেছে। জল অতিশয় স্বচ্ছ. নিম্নের পাথরের টুকরাগুলি পর্য্যন্ত বেশ দেখা যাইতেছে। আর সেই জলের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ছোট বড় মাছ আনন্দে বিচরণ করিতেছে। চারিদিকে দেওয়াল দিয়া ঘেরা। তাহার গায়ে ছোট ছোট কামরার মত করা হইয়াছে। স্থানটি এতই সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ যে সম্রাট্ শাহজাহান মৃত্যুকালে নাকি বলিয়াছিলেন "আমাকে সেইখানে লইয়া যাও।"

দেয়ালের গায়ে দুখানি কালো পাথরে সম্রাটের নাম ও এই চশমা অথবা উৎস নির্ম্মাণ করিয়া তারিখাদি উর্দ্দুতে লেখা আছে। আমরা ঢুকিতেই ৫।৭টী পাণ্ডা ধরিয়া বসিল। ৩নং প বাবু ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান হিন্দু সুতরাং এই মুসলমান নির্ম্মিত চশমার দেয়ালে একটী গণেশ স্থাপিত দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিল। আমি এক পাণ্ডাকে কিছু পয়সা দিয়া বাজার হইতে মাছের জন্য খাবার আনাইলাম। চালগুলি নিক্ষেপ করিতেই হরিদ্বারের ঘাটের মত হাজার হাজার মাছ কাড়াকাড়ি করিয়া তাহা খাইতে লাগিল। এখান হইতে .মাইল দূর পর্য্যন্ত জলে মাছ ধরা মহারাজের নিষেধ। সুতরাং মাছগুল নির্ভয়ে একরকম হাত হইতে খাবার লইয়া খায়।

চশমা হইতে বাহির হইয়া আমরা সম্মুখের বাগানে প্রবেশ করিলাম। এই বাগানের ঠিক মধ্য দিয়া একটী নহর এবং চারি পাশ দিয়া একটী নালা চলিয়া গিয়াছে। দুইটীই মাছে পরিপূর্ণ। বাগানে ঢুকিতেই মালী কতকগুলি সুন্দর আপেল ও একরাশি ফুল লইয়া আসিল, আর একটী সুন্দর বালক কতকগুলি আলু বোখারা ও আখরোট ভেট লইয়া উপস্থিত হইল।

আমরা নহরের ধার দিয়া চলিলাম। খানিকটা গিয়া দেখি একটী ঘর, তাহার নিচে দিয়া নহর চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর আর একখানি ঘর, তাহার প্রায় ১৫।২০ হাত নিম্নে ঝেলমের পরিস্কার জল

লাফাইয়া পড়িয়া জল প্রপাতের সৃষ্টি করিতেছে। আর যে নালাটী বাগানের চারিদিক ঘুরিয়া গিয়াছে তাহার দুই মুখ আসিয়া ইহারই সহিত মিশিয়াছে। এই হইতেই ঝেলমের উৎপত্তি।

বাগান হইতে বাহির হইতেই রেষ্ট হাউসের চৌকদার আমাদের সঙ্গ লইল। ফিরিয়া আসিয়া বাগানের পাশে একটী পরিষ্কার স্থানে কম্বল বিছাইয়া বসিলাম। সকলকে যথাযোগ্য বখসিস্ দিয়া বিদায় করিয়া ভৃত্য গোবিন্দকে চা প্রস্তুতের হুকুম দেওয়া গেল। তখন বৃদ্ধ যুবক আমাদিগকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। তাহারা নানারূপ গল্প করিতে লাগিল।

৩-৪৫ আমরা ফিরিলাম।

অসমান রাস্তা ছাড়াইয়া নক্ষত্রবেগে মোটর ছুটিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা

অবন্তিপুরী

পৌঁছিলাম। 'অবন্তিপুরী' খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাজা অনন্ত বর্ম্মা কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ইহা এক সময়ে

অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ।

কাশ্মীরের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে সমস্ত সহরটি মৃত্তিকাগর্ভে। কিছুদিন হইল খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়া দুটী মন্দির উদ্ধার হইয়াছে। আমরা সেখানে নামিয়া এই প্রত্নতত্ত্ববিতের লোভনীয় পদার্থটী দেখিতে গেলাম। বৃদ্ধ ৩নং প বাবু গাড়ীতেই রহিলেন। অবশ্য মন্দিরের ছাদ নাই। কতকগুলি ভগ্ন দেওয়াল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতির মূর্ত্তি। আমি এই পুরাতন মন্দিরের একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ লইয়া আসিলাম।

আমরা বৃদ্ধ ৩নং প বাবুর নিকট এক ঘণ্টার বিদায় লইয়া চৌকিদারের সহিত দুই বন্ধুতে পিছনের পর্ব্বতের দিকে রওনা হইলাম। খানিক উঠিয়া একটু সমভূমি। সেখান হইতে চৌকিদার সম্মুখের পর্ব্বতগাত্রে বিখ্যাত 'বানিহাল' ও জম্মুর রাস্তা দেখাইয়া দিল। এখান হইতে আর প্রায় দুই মাইল উপরে যাইতে পারিলেই বরফ পাওয়া যায়। উভয়ের নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সময়াভাবে নিবৃত্ত হইতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি চা প্রস্তুত হইয়াছে। ফল ও সন্দেশ সহকারে জলযোগ সম্পন্ন হইল। বহু বালক

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

৺রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

বিগত ১৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বেলা চারিটা চল্লিশ মিনিটের সময় উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য রাজা প্যারী- মোহন মুখোপাধ্যায় ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁহার ন্যায় সরলচেতা ও নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিক, তাঁহার ন্যায় বিদ্যা- নুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে হারাইয়া বাঙ্গলার সকল সম্প্রদায় যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

রাজা প্যারীমোহনের পিতা বাঙ্গালার অন্ধ রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পিতা সৈনিক বিভাগে বেনিয়ানের কার্য্য করিতেন। সৈন্যবিভাগ সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়েই জয়কৃষ্ণ সৈনিক বিভাগে অন্যতম প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন এবং ভরতপুর অবরোধের সময় ৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সহিত ভরতপুরে উপস্থিত ছিলেন। ইহার পরে তিনি লুণ্ঠিত অর্থের অংশী হন। অনন্তর তিনি হুগলী কলেক্ট- রীতে কিছুকাল কার্য্য করেন। এই সময়ে তিনি অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। কুশাগ্রবুদ্ধি জয়কৃষ্ণ তাঁহার জমী- দারীর এরূপ উন্নতি সাধন করেন যে, অধিককাল তাঁহাকে সরকারী কার্য্য করিতে হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই জয়কৃষ্ণ হুগলী জিলার অন্যতম প্রধান জমীদার বলিয়া গণ্য হইলেন। তিনি তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত জঙ্গলাদি পরিস্কার ও বাসযোগ্য করিয়া জমীদারীর আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বর্দ্ধিত করেন। কুলীন ব্রাহ্মণগণ অনেকে আবহ- মানকাল্ পর্য্যন্ত কোনও খাজানা দিতেন না, ইঁহাদিগের নিকট হইতেও জয়কৃষ্ণ কর আদায় করিতে আরম্ভ করেন। তিনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে প্রজাশাসন করিতেন এবং ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিবার জন্য মামলা মোকদ্দমা করিতে বিরত হইতেন না। একবার স্বয়ং একটি মোক- দ্দমায় এরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন যে তাঁহার লাঞ্ছনার একশেষ হয়। তিনি জাল করার অপরাধে সদর নিজা- মত আদালত কর্ত্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন এবং ৫ বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস এবং দশ সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রিভিকৌন্সিলের আপিলে কিন্তু তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হয় এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করেন।

জয়কৃষ্ণ এদেশের রাজনীতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় তদানীন্তন প্রধান রাজনীতিক সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তিনি স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং দেশে বিদ্যা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় ও সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কবি হেমচন্দ্র "হুতোম প্যাঁচার" গানে ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন –

তার পর গুড়ি গুড়ি এসো বুড়ো শিব,
গঙ্গার ওপারে বাড়ী অদ্ভুত 'নসীব'।
জমিদারী মিণ্টে ঢালা আদোৎ 'মডেল,'
বাঙ্গালার কাদাহোড়ে পাথুরে পাটকেল।
বয়েসে অনাদি লিঙ্গ 'জরাসিন্ধ' বলে,
দাপোটে এখনো যায় হুগ্‌লি জেলা টলে॥
মাল্ আইনে তোদরমল রোখে হাইদর আলী,
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে বলি।
গুষ্টী বহু বাস্তুভূমি যেন লঙ্কাপুরী,
ইন্দ্রজিৎ সম পুত্র কৌন্সলে মুহুরি।
দিগ্বিজয়ী দণ্ডধর রাষ্ট্র যুড়ে নাম,
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ চরণে প্রণাম।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণ অন্ধ হন। অন্ধ হইলেও তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদনে কখনও অবহেলা করেন নাই। তিনি কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সংবাদপত্রাদি পাঠ করা- ইতেন এবং সভাসমিতিতেও যোগদান করিতেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। শেষ

অবধি তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও অন্যান্য মানসিক বৃত্তিনিচয় অক্ষুণ্ণ ছিল।

প্যারীমোহন জয়কৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর দিবসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্য-কালে উত্তরপাড়া স্কুলে প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রে এম্-এ এবং পর বৎসর বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজা প্যারীমোহনই বোধ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞান শাস্ত্রে এম-এ উপাধি লাভ করেন। বিজ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। উত্তম ইংরাজী শিখিবার জন্যও যৌবনে তাঁহার অদম্য ইচ্ছা ছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির ইংরাজী রচনাপদ্ধতির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং কিরূপে তাঁহাদের ন্যায় ইংরাজী লিখিতে শিখিবেন তাঁহার সেই চেষ্টা ছিল। তাঁহারা কিরূপে ঐরূপ বিশুদ্ধ রচনা পদ্ধতি শিখিয়া-ছিলেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতেন। হরিশ-চন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কয়েক বৎসরের 'এডিনবরা রিভিউ' পড়িয়া তিনি যুক্তিতর্ক সমন্বিত ওজস্বিনী রচনা লিখিতে শিক্ষা করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়া-ছিলেন, থ্যাকারের গ্রন্থাবলী বারম্বার পাঠ করিয়া তাঁহার রচনাশক্তি বিকশিত হয়। গিরিশচন্দ্র শেষ জীবনে বেলুড়ে অবস্থান করিতেন। সেই সময়ে তাঁহার সহিত প্যারীমোহনের ঘনিষ্ঠতা হয়। বিজ্ঞানামোদী প্যারীমোহন যৌবনে যখন নূতন ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিতেছিলেন, তখন একবার গিরিশচন্দ্রকে উত্তরপাড়ায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং উত্তরপাড়া লাইব্রেরীর সম্মুখে তাঁহার ফটোগ্রাফ তুলেন, কিন্তু একটি আরক দিতে ভুল হওয়ায় ফটোগ্রাফ উঠে নাই। ইহার অল্প-কাল পরেই গিরিশচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মেরী কার্পেণ্টারের চেষ্টায় এদেশে একটি সমাজবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারীমোহন এই সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং ইংরেজী ভাষায় কতকগুলি সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভ পাঠ করেন। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য—

On the condition of the Bengal Ryot (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পঠিত)

On the examination of witnesses in Mofussil Courts (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে পঠিত)

Agriculture (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে পঠিত হয়)

প্রথমোক্ত প্রবন্ধটী সভার তাৎকালীন সভাপতি মাননীয় বিচারপতি স্যর জন বাড ফিয়ার কর্তৃক বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়।

প্যারীমোহন ১৫ বৎসর হাইকোর্টে ওকালতী করেন। তিনি কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, হেমচন্দ্রের জীবনচরিত পাঠক-গণের তাহা অবিদিত নাই। তিনি ভূমি সংক্রান্ত আইনে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

প্যারীমোহন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর ইনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ঐ সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সভায় Bengal Tenancy Bill বিধিবদ্ধ হইবার সময় ইনি জমিদারী ও রাজস্ব বিষয়ক জ্ঞানের যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ বিলের প্রস্তাব-কর্ত্তা স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলি চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন :—

"Though the death of our lamented colleague Rai Kristo Das Pal Bahadur in the middle of our discussion was a grievous loss of the Bengal Zemindars and indeed to all of us, yet their interest could hardly have found a better representative than in his successor, who

with inflexible constancy and even a more perfect knowledge of detail than his predecessor, contested every inch of ground and displayed a temper and ability which showed how wisely the British Indian Association had made their selection."

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে Bengal Tenancy Actএর সংস্কারকালে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্যারীমোহন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ পুনর্গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিমত ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্যবস্থাপক সভায় বিশিষ্ট কার্য্যের জন্য ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্যারীমোহন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এককালে 'রাজা' ও 'সি-এস-আই' উপাধিতে ভূষিত হন। একই দিনে এই দুইটি সম্মানজনক উপাধিলাভ পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে নাই।

দেশহিতকর সকল সভা সমিতিতে প্যারীমোহন আন্তরিকভাবে যোগ দিতেন। বহু বৎসর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার তিনি সম্পাদক এবং পরে সভাপতি ছিলেন। তিনি কলিকাতা য়ুনিভারসিটীর অন্যতম অনারারী ফেলো ছিলেন, এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভার সভাপতি ছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের অন্যতম নেতার পদ অধিকার করিয়া নানা দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও প্রদান করা সম্ভবপর নহে।

সদনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিতে প্যারীমোহন কখনও কার্পণ্য করেন নাই। উত্তরপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের জন্য পঁচিশ সহস্র মুদ্রা এবং উত্তরপাড়া কলেজের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়ে তিনি বিস্তর অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

তিনি আইন ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। তিনি হোমিওপ্যাথির পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে দরিদ্রগণকে ঔষধ বিতরণ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের বাটীতে গিয়াও চিকিৎসা করিতেন।

তাঁহার ন্যায় সরল, উদার, অমায়িক ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। তিনি বিনয় ও সৌজন্যের আকর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বার তেরো বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতামহ, 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জীবনচরিতের উপকরণ সংগ্রহ মানসে আমি উত্তরপাড়ায় গিয়াছিলাম। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং নানাবিধ উপদেশ ও সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন স্মৃতিপটে মুদ্রিত থাকিবে। সেদিন ছুটী ছিল বলিয়া উত্তরপাড়া লাইব্রেরী বন্ধ ছিল। রাজা আমার জন্য পুস্তকালয় খুলাইয়া দেন। আমি আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করিয়া দুইখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বাটীতে লইয়া আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গ্রন্থাধ্যক্ষ আমাকে বলেন যে পুস্তকাগারের অধ্যক্ষগণের বিনানুমতিতে কোনও গ্রন্থ উত্তরপাড়ার বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হয় না। উত্তরপাড়ায় আমার পরিচিত ব্যক্তি কেহ ছিলেন না। কাহারও পরিচয়পত্র না লইয়াই রাজার সহিত প্রাতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। এক্ষণে কাহার সুপারিশ লইয়া অধ্যক্ষগণকে ধরিব? গ্রন্থাধ্যক্ষ বলিলেন রাজার অনুমতি পাইলে পুস্তক দুইখানি আমাকে দিতে পারেন এবং একখানি ক্ষুদ্র কাগজ ও পেন্সিল দিয়া আমাকে রাজার অনুমতি চাহিতে পরামর্শ দিলেন। আমি কয়েক ঘণ্টামাত্র পূর্ব্বে রাজার সহিত পরিচিত হইয়াছি, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থদ্বয় বাহিরে লইয়া যাইয়া অনুমতি চাহিলে কি তাহা পাইব? আমি সন্দিগ্ধচিত্তে সেই ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে পেন্সিল দ্বারা একটি পত্র লিখিয়া রাজার অনুমতি চাহিলাম। অনুমতি আসিতে বিলম্ব হইল না এবং আমি অনতিকালমধ্যে হৃষ্টচিত্তে অভিলষিত গ্রন্থদ্বয় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা।

বৈশাখ মাস প'ড়িতে না পড়িতেই কলিকাতায় অসহ্য গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল। রৌদ্রের যেমন উত্তাপ, তেমনি তাহার ঔজ্জ্বল্য। দ্বিপ্রহরের সময় জানালা খুলিয়া বাহিরে চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। হাত পা'র দাম দুই পয়সার স্থানে চারি পয়সা হইয়াছে, বরফের মূল্যও পরিবর্দ্ধিত। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক কারবার আরম্ভ হয় নাই, মানুষে পাখা এবং ঘোড়ায় ট্রাম টানিত। যাঁহাদের বাড়ীতে টানাপাখা আছে তাঁহারা পাখাকুলি খুঁজিয়া পাইতেছেন না; মধ্যাহ্নে রাজপথে বাহির হইলে স্থানে স্থানে ট্রামের ঘোড়া সূর্য্যাহত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পড়িয়া মৃত্যু যন্ত্রণায়ছটফট করিতেছে দেখা যাইতে লাগিল। সমস্ত দিন এমন গুমট করিয়া থাকে যে গাছের পাতাটিও নড়ে না। সন্ধ্যার পর, আটটা কি নয়টা বাজিলে তবে একটু বাতাস বহিতে আরম্ভ হয়;—লোকে খোলা ছাদের উপর মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিয়া বলে—"আঃ—প্রাণটা বাঁচলো!"

এইরূপ একটি গ্রীষ্মের প্রভাতে, ভবানীপুরে কোনও অট্টালিকামধ্যস্থ দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া দুইজন যুবক কথোপকথন করিতেছিল। তখন মাত্র আটটা বাজিয়াছে। উভয়ে একটি টেবিলের দু'ধারে উপবিষ্ট, সম্মুখে এক একটি চায়ের পেয়ালা।

যুবক দুইটীর মধ্যে একটির বয়স ত্রিংশৎবর্ষ হইবে। সেই গৃহস্বামী। ইংরাজি রাত্রিবসনের উপর একটী সুচিত্রিত জাপানী কিমোনো তাহার অঙ্গোপরি বিরাজ করিতেছে। পদদ্বয়ে তৃণ নির্ম্মিত চটী জুতা যোড়াটীও কিমোনোর ন্যায় জাপানী চিত্রে শোভিত। টেবিলের উপর ইজিপ্‌সিয়ান সিগারেটের একটী বাক্স রহিয়াছে। চা পান শেষ হইবার পূর্ব্বেই গৃহস্বামী যুবক একটি সিগারেট ধরাইয়া, বাক্সটি অপর যুবকের দিকে ঠেলিয়া দিল।

দ্বিতীয় যুবকটী আগন্তুক। তাহার বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিক হয় নাই। গাত্রে বাঙ্গালী পোষাক—সূক্ষ্ম ধুতির উপর একটী আদ্দির পাঞ্জাবী; একটি রেশমী উত্তরীয় বসনের কিয়দংশ স্কন্ধদেশে জড়িত। লোকটী গৌরকান্তি, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। চক্ষু দুইটী বৃহৎ ও উজ্জ্বল। ভাবভঙ্গি দেখিলে তাহাকে কবি বলিয়া সন্দেহ জন্মে।

প্রথম যুবকের নাম হেমচন্দ্র কর; দ্বিতীয়টির নাম কিশোরীমোহন নাগ। হেমচন্দ্র ধনীসন্তান—বহু সহস্র মুদ্রা ডিপোজিট দিয়া কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ সওদাগরী আফিসে কেসিয়ারি কর্ম্ম লইয়াছে। কিশোরীমোহন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, বিশেষ কোন কাযকর্ম্ম নাই—মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রে কবিতা লেখে।

চা পান শেষ করিয়া অত্যন্ত গরম বোধ হইল, তাই হেমচন্দ্র কিমোনোটি খুলিয়া ফেলিল। পাখাকুলীকে সজোরে পাখা টানিতে আদেশ দিয়া বলিল, "আর ত কলকেতায় টেকা যায় না।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "ছুটির দরখাস্ত করেছিলে তার কি হল?"

"ছুটী পাব। বোধ হয় আসছে সোমবার থেকেই ছুটী পাব। কিন্তু এই ৪।৫দিনই বা কাটে কি করে?"

কিশোরী প্রশ্ন করিল, " দার্জ্জিলিঙে এখন শীত কেমন?"

মুখ হইতে সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে

হেম বলিল, "এই—অর্থাৎ এখানে পৌষ মাঘ মাসে যেমন হয়, সেই রকম আর কি!"

"রাত্রে লেপ গায়ে দিতে হয়?"

হেম হাস্য করিয়া বলিল, "বেশ দিতে হয়। দুখানা কম্বল সহ্য হয়।"

"বরফ দেখা যায়?"

"দূরে—মাঝে মাঝে দেখা যায় বৈ কি। তা, তোমার কবিতা লেখবার খুব সুবিধে হবে। কবিতার উপকরণ সেখানে যথেষ্ট পাবে।"

কিশোরী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম? কি রকম?"

হেম গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, "এই ধর, চারিদিকে শৈলশ্রেণী—'উত্তুঙ্গ' মানে কি হে?"

কিশোরী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "উত্তুঙ্গ মানে খুব উঁচু।"

"তা হলে ঠিকই বলছিলাম। চারিদিকে উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী। রবিকরকিরণে তাদের গা—"

কিশোরী বলিল, "মড়াদাহ কোর না—বরবপু বল। রবিকিরণ সম্পাতে—"

হেম বলিল, "রাইট্‌-ও! রবিকিরণ সম্পাতে তাদের বর বপু বেশ সবুজ। এমারেল্‌ড যাকে বলে তার বাঙ্গলা কি?"

"মরকত মণি।"

"মরকত? বাঃ বাঃ—সুন্দর কথাটি। রবি কিরণ সম্পাতে তাদের বর বপু মরকত মণির ন্যায় কান্তি ধারণ করে। আবার মেঘোদয়ে তাদের দেহবর্ণ শ্যামায়মান হয়। 'শ্যামায়মান' কথাটা ঠিক হল ত? ব্যাকরণ ভুল হচ্চে না?"

"না, ঠিক হচ্চে—বলে যাও।"

"যখন সূর্য্যোদয় হয়নি, তখন তারা ধূসরাভ—যেন যোগীঋষিরা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন।—কেমন বলছি?"

"বেশ বলছ। —— পর?"

"এই ত গেল জড় (বায়ু) প্রকৃতির শোভা। তার পর চঞ্চল প্রকৃতি—অর্থাৎ পাহাড়ী ছুঁড়িগুলো—সিগারেট মুখে করে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমি এক একটা রঙ দেখেছি, প্রায় ইউরোপীয়দের মত পরিস্কার—অথচ ওদের মত ফ্যাকাসে নয়, বেশ গোলাপী রঙ। কেমন, কাব্যকলা চর্চ্চার উপযুক্ত স্থান নয়?"

কিশোরী বলিল, "লোভনীয় বটে। অনেকদিন থেকে ইচ্ছে, একবার দার্জ্জিলিঙটে বেড়িয়ে আসি, কিন্তু সঙ্গীর অভাবেই এতদিন তা হয় নি। এবার বেশ আমোদে থাকা যাবে।"

হেম দগ্ধপ্রায় সিগারেটটা ফেলিয়া নিজের দেহ চেয়ারে এলাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাপড় চোপড় সব তৈরি হল?"

"আজ বিকেলে দেবে বলেছে।"

"কি কি করালে?

"একটা কাশ্মীরা সুট, দুটো ফ্লানেলের সুট, একটা ইভ্‌নিং ড্রেস, আর দুপ্রস্থ রাত কাপড়।"

"দুপ্রস্থ রাতকাপড় মাত্র? তাতে হবে না।"

কিশোরী একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "কিছু ধুতি টুতিও সঙ্গে থাকবে কি না।"

হেমচন্দ্র যদিও বিলাত প্রত্যাগত "সাহেব" নহে, তথাপি তাহার একটি সিভিলিয়ন জাটতুতো ভাই আছে—সেই সুবাদে সে সাহেব। তখনকার দিনের বিলাত ফেরতেরা ধুতি পরাকে নিতান্ত বর্ব্বরোচিত বলিয়া মনে করিতেন, হেমচন্দ্রও সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। সে বলিল, "আরে না না—দার্জ্জিলিঙে আর ধুতি টুতি নিয়ে গিয়ে কায নেই।"

কিশোরী একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে আরও দুটো রাত কাপড়ের সুট তৈরি করতে দিই না হয়।"

"তাই দাও।"

কিশোরীমোহন লোকটা যতদূর সৌখীন, তাহার আর্থিক অবস্থা ততটা স্বচ্ছল নহে। তাহার পিতা সামান্য কিছু বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই আয় হইতে কিশোরীর ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া যায়, চাকরি করিতে হয় না এই মাত্র। সে নিজে অবিবাহিত।

আত্মীয়ের মধ্যে কেবল এক তাহার বড়দাদা, তিনি পশ্চিমে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মাও সেইখানেই থাকেন। তাহার স্কন্ধে সংসার ভারশূন্য।

"তাই দাও"—বলিয়া পাখাওয়ালাকে হেমচন্দ্র বলিল, "সবুর।" পাখা থামিলে সে নিজে একটি সিগারেট ধরাইল, কিশোরীকেও একটি দিল। আবার পাখা চলিতে লাগিল।

কিশোরী কহিল, "কলার নেকটাইগুলো, হ্যাট ট্যাটগুলো কেনবার সময় তুমি সঙ্গে থাকলেই ভাল হয় হেম।"

"আচ্ছা, তোমায় আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কিনে দেবো এখন।"

কিশোরীমোহনের অপর কোনও বন্ধুবান্ধব এ সময় উপস্থিত থাকিলে বিস্মিত হইত। তাহারা এপর্য্যন্ত কেহই জানে না যে কিশোরীকে ভিতরে ভিতরে সাহেবী রোগে আক্রমণ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইংরাজ বেশধারী বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে সে কত না বিদ্রূপোক্তি করিয়াছে—তাহাদিগকে স্বজাতিদ্রোহী—ময়ূরপুচ্ছ শোভিত দাঁড়কাক ইত্যাদি কত কি বলিয়াছে। এ সম্বন্ধে তাহার একটা ব্যঙ্গপূর্ণ কবিতাও কোনও এক মাসিক পত্রে ছাপা হইয়াছিল। সেই কিশোরীমোহন দার্জ্জিলিঙ যাত্রার প্রাক্কালে "মিষ্টার" বনিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে—বিস্ময়ের বিষয় বৈ কি! আহারাদি সম্বন্ধে তাহার হিঁদুয়ানি পূর্ব্ব হইতেই ছিল না। আজ বৎসরখানেক হেমচন্দ্রের সঙ্গে জুটিয়া ছুরি কাঁটা চালানো বিলক্ষণ অভ্যাস করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহা গৃহাভ্যন্তরে—সুতরাং নির্ঝঞ্ঝাট। বন্ধুবান্ধবের বিদ্রূপের আশঙ্কায় এ পর্য্যন্ত ইংরাজি পোষাক ধারণ করিতে সে সাহস করে নাই—এবার করিবে।

তাহার অন্তরে আরও একটি গোপন বাসনা আছে, তাহাও চরিতার্থ করিবার সুযোগ হইবে। মনে মনে অনেক দিন হইতেই তাহার সাধ, বিলাতফেরত সমাজে একটু মেলামেশা করে। পোড়া ধুতি ও চাদরের শৃঙ্খল এতদিন কাটিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়াই এ সাধ আজিও অপূর্ণ আছে। এ সকল বিষয়েও হেমচন্দ্রের সহিত পূর্ব্বাবধিই তাহার পরামর্শ স্থির হইয়া গিয়াছে।

বেহারা একখানি পত্র আনিয়া হেমচন্দ্রের হাতে দিল। পড়িয়া হেমচন্দ্র বলিল, "ভালই হল। ঘোষেরাও যাচ্ছেন।"

কিশোরী প্রশ্ন করিল, "ব্যারিষ্টার মিষ্টার ঘোষ?"

"না, হাইকোর্ট বন্ধ না থাকলে ঘোষ কেমন করে যাবেন? মিসেস্ ঘোষ আর তাঁর মেয়ে দুটি যাচ্ছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন আমি কবে যাব, তা হলে তাঁরাও আমার সঙ্গে যেতে পারেন।"

কিশোরী বলিল, "সে ত ভালই হয়।"

"খুব ভাল হয়। সেখানে গিয়ে মিসেস্ ঘোষের বড় মেয়েটির সঙ্গে আমি প্রেমে পড়ব এখন, তুমি ছোটটির সঙ্গে পোড়—কি বল?"—বলিয়া হেম হাহা করিয়া হাসিতে লাগিল।

এই মেয়ে দুটি বিখ্যাত সুন্দরী। কিশোরী ইহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইবে ইহা মনে করিতে ;তাহার বক্ষে আনন্দ হিল্লোল বহিল। তাহার ভাব দেখিয়া হেম বলিল, "আর তা যদি না পছন্দ হয়, তুমিই না হয় বড়টিকে বিয়ে করবে—আমি ছোটটিকে নেবো এখন।"—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিশোরী গলা ঝাড়িয়া বলিল, "তোমার ত কেবল মুখই সার। প্রেমে পড় কৈ? তোমার মত সুযোগ পেলে আমরা এতদিন কোন্ কালে বিয়ে থাওয়া করে ভদ্রলোক হয়ে যেতাম। তোমার হৃদয়টি পাষাণের মত কঠিন; কন্দর্পের বাণ ওতে ঠেকে, ফল ভেঙ্গে ভোঁতা হয়ে পড়ে যায়।"

হেমচন্দ্র তখন ব্যঙ্গ করিয়া, নিরাশ প্রণয়ীর ন্যায় বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া করুণ স্বরে কহিল, "ভাই, আমার হৃদয় কঠিন? আমার হৃদয়ে ঠেকে কন্দর্পের বাণ ভোঁতা হয়ে পড়ে যায়? তা নয়, তা নয়। আমার হৃদয় মাখনের মত কোমল,—কন্দর্পের চার পাঁচটি বাণ এতে বিঁধে রয়েছে।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আমি এমনই মূঢ় যে, এক সঙ্গে চার পাঁচটি তরুণীকে ভালবেসে ফেলেছি। কোন্‌টিকে প্রার্থনা

করব কিছুই ঠিক করতে পারিনে—তাই এত দিনেও আমার আইবুড়ো নাম ঘুচলো না।"

এইরূপ হাস্য পরিহাসে নয়টা বাজিল। রৌদ্রতেজ প্রবল হইতেছে দেখিয়া সেদিনকার মত কিশোরী বিদায় গ্রহণ করিল। আগামী রবিবার দিন দার্জ্জিলিঙ যাত্রাই স্থির।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাত্রার আয়োজন।

আজ রবিবার। আজ কিশোরীমোহন, হেমচন্দ্র প্রভৃতির সহিত দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিবে। আজ তাহার অত্যন্ত আনন্দের দিন। তাহার বহুদিনের আশা আজ ফলবতী হইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রথমতঃ দার্জ্জিলিঙ ভ্রমণ, দ্বিতীয়তঃ নব্য সমাজে অবাধ মিশ্রণ। কিন্তু তথাপি তাহার মুখমণ্ডল আজ যেন শুষ্ক, যেন চিন্তাযুক্ত। ইহার কারণ কি?

দার্জ্জিলিঙ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের যে একটি বিপৎসঙ্কুল পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ সূচিত হইল, তাহা সে এখনও অবগত নহে। ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্ব্বাবধিই নাকি মানবচিত্তে নিজ ছায়াপাত করিয়া থাকে, তাই কি আজ কিশোরীর মনটা এমন বিষণ্ণ? হইতে পারে। কিন্তু আরও একটা স্ফুটতর কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

নব্যতন্ত্রের মহিলাগণের সহিত সে অদ্য প্রথম পরিচিত হইবে। তাই তাহার মনে একটা অশান্তির একটা আশঙ্কার রেখা পড়িয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তায়, তাহার ব্যবহারে যদি তাহার অনুপযুক্ততা প্রকাশ পায়? যখন হেমচন্দ্র প্রথম তাহাকে ইঁহাদের নিকট 'ইন্‌ট্রো-ডিউস' করিয়া দিবে, সে সেময় কি কি করা কর্ত্তব্য তাহা হেমচন্দ্র উত্তমরূপে শিখাইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে যদি ভুলচুক হইয়া যায়? তাহার 'বাউ' (শিরোনমন) যথানিয়মের অপেক্ষা যদি কিঞ্চিৎ অধিক বা কিঞ্চিৎ অল্প হইয়া পড়ে? কথাবার্ত্তায় যদি ইংরাজি কোনও শব্দ অশুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত হয়? পদ্মাবক্ষে জাহাজে সান্ধ্যভোজনের সময় হেমচন্দ্রের শিক্ষানুসারে মহিলাগণের প্রতি তাহার 'মনোযোগে' যদি কোনও আনাড়ীত্ব প্রকাশ পায়? এক কথায়, যদি তাঁহারা কিশোরীকে একটি 'জানোয়ার' বলিয়া ধার্য্য করেন? সেই বিখ্যাত সুন্দরী কুমারীদ্বয়ের চারিচক্ষু যদি তাহার অলক্ষিতে ঘৃণা ও বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্য বিনিময় করিয়া লয়? যদি কাহারও গোলাপী অধরযুগল রুমালের অন্তরালে গোপনে একটু হাস্য করে?

এইরূপ দুশ্চিন্তায় প্রভাতকাল অতিবাহিত হইল। ক্রমে স্নানের সময় আসিল। কিশোরীর একটি কুকুর ছিল তাহার নাম টম বা টমি। ইদানীং কিশোরী তাহাকে আদর করিয়া মিষ্টার টম বলিয়াও ডাকিত। আজ নিজে স্নান করিবার সময় সে স্বহস্তে টমির গাত্রে উত্তমরূপে সাবান ঘষিয়া তাহাকেও স্নান করাইয়া দিল, কারণ টমিও তাহার সহিত দার্জ্জিলিঙ যাইবে। টমি তাহার বড় আদরের কুকুর। টমির যখন একমাস মাত্র বয়স, তখনই কিশোরী তাহাকে পুষিয়াছিল—সে আজ দুই বৎসরে কথা। তখন টমি ভেউ ভেউ করিতে পারিত না—শুধু কুঁই কুঁই করিত; ছুটিতে পারিত না, আস্তে আস্তে থপ্ থপ্ করিয়া চলিত। তখন দ্বিতলে শয়ন করিতে যাইবার সময় কিশোরী তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইত, কারণ সিঁড়ি উঠিবার শক্তি তখন টমির ছিল না। প্রভাতে আবার কোলে করিয়া নীচে নামাইয়া আনিতে হইত। তখন টমি দুধ পাইলে চক্ চক্ করিয়া খাইত, ভাত কিংবা মাংস কিংবা বিস্কুট খাইতে জানিত না। সেই টমি এখন দুইবৎসরের হইয়াছে, পূর্ণ যুবা কুকুর।

অল্প আহার করিয়া কিশোরী পাণ খাইল না—সুপারি ও লবঙ্গ মুখে দিল। সাহেবিয়ানার জন্য এই তাহার প্রথম ত্যাগস্বীকার। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ নিদ্রার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মন এতই উত্তেজিত যে নিদ্রা আসিল না। ক্রমে একটা বাজিল। জিনিষ-পত্র পূর্ব্ব হইতেই বাঁধাছাদা দিল। এখন দুয়ার বন্ধ করিয়া সে পোষাক পরিতে আরম্ভ করিল। প্রধান

সমস্তা নেকটাইটা নির্দ্দোষভাবে বাঁধা। দুই তিন দিন অভ্যাস করিয়া এ বিদ্যা তাহার কতকটা আয়ত্ত হইয়া আসিয়াছে। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক নেকটাই সে কতবার বাঁধিল কতবার যে খুলিল তাহার সংখ্যা নাই। অবশেষে যখন কতকটা পছন্দসই হইল তখন তাহার দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরপি দর্পণের সম্মুখে গিয়া নূতন উজ্জ্বল ষ্ট্র হ্যাটটি মাথায় দিয়া দাঁড়াইল। মোহিত হইয়া নিজের চেহারাটি দেখিতে লাগিল। তাহার পর, হেমচন্দ্র যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে মহিলাগণের নিকট তাহাকে ইন্‌ট্রোডিউস্ করিয়া দিবে, তখন কিরূপ ভঙ্গিতে টুপীটি তুলিয়া শিরোনমন করিবে, বারম্বার তাহারই আখড়া দিতে লাগিল। হেমচন্দ্র বলিয়াছে, প্রথম আলাপে মহিলাগণ তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিবার জন্ম হস্তপ্রসারণ করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন —প্রথম আলাপে ইহা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু যদি তাঁহারা হাত বাড়াইয়া দেন, তবে ক্ষিপ্রহস্তে টুপীটি মস্তকে পুনঃস্থাপন করিয়া করমর্দ্দন করিতে হইবে। সে সময় তাড়াতাড়িতে পাছে টুপীটি মাথায় সিধাভাবে না বসে তাই বারম্বার কিশোরী সেটি কসরৎ করিতে লাগিল। তাহার মনে অত্যন্ত ভয় ছিল পাছে পরিচয় কালে টুপীটি তুলিতেই সে ভুলিয়া যায়। কোনও কোনও "আনাড়ী" সাহেব নাকি প্রথম প্রথম এরূপ ভুল করিয়া থাকে, তাই হেমচন্দ্র কিশোরীকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল। যদি ভুলিয়া যায়, তবে তাহার লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না—তখন হাওড়ার পুলে গিয়া গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেওয়াই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

টম এতক্ষণ বাহিরে কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার মনিবের দুয়ার বন্ধ। তাই সে কবাটে আঁচড়াইতে লাগিল।

কিশোরী দ্বার খুলিয়া দিল। টম প্রবেশ করিয়া, এই অদ্ভুত নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে অবাক্। অপরিচিত ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে ভাবিয়া, কয়েক পদ পিছু হটিয়া দুই তিন বার ভেক্ ভেক্ করিয়া ডাকিয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। কিশোরী কুকুরের ভ্রম বুঝিয়া ডাকিল—"টম্।" কণ্ঠস্বরে টমের ভ্রম দূর হইল—লজ্জায় তখন সে অধোবদন। কাণদুইটা পশ্চাদ্‌ভাগে গুটাইয়া সবিনয়ে লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল।

কিশোরী তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "টমি, কোথায় গিয়েছিলি? এত করে' সাবান দিয়ে গা পরিস্কার দিলাম, এখনই ধূলো মেখে এসেছিস্?"

টম এ আদরে, তাহার পূর্ব্ব অসভ্যতার মার্জ্জনা হইয়াছে বুঝিয়া, মনিবের পদদ্বয়ের বস্ত্রাবরণ আঘ্রাণ করিয়া তাহার মুখের দিকে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভাবটা যেন—এ আবার কি সব পরা হয়েছে? এরকম ত কোনদিন দেখিনি!

কিশোরী কুকুরের গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিতে দিতে বলিল, "টম্, আজ আমরা কোথায় যাচ্চি তা জানিস্‌নে বুঝি? আজ আমরা দার্জ্জিলিঙ যাচ্চি।"

টম এ সংবাদে কোনও উৎসাহ প্রকাশ করিল না; কেবল ধীরে ধীরে লেজটা নাড়িতে নাড়িতে, মনিবের মুখের পানে আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেকালে শুনা যাইত, পশুপক্ষীরা ভবিষ্যৎ জানিতে পারে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে টম নিশ্চয়ই মিনতি করিয়া তাহার প্রভুকে দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিতে নিষেধ করিতেছিল।

ক্রমে তিনটা বাজিল। কিশোরী তখন গাড়ী ডাকাইয়া, জিনিষপত্র লইয়া, কুকুর লইয়া, শিয়ালদহ ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

কিশোরী যখন শিয়ালদহে পৌঁছিল তখনও ট্রেণ ছাড়িবার বিলম্ব আছে। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা গাড়ীতে উঠিতেছে বটে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ তখনও বড় একটা কেহ আসে নাই। কিশোরী নিজের জিনিষপত্র একটা কামরায় উঠাইয়া, কুলিদিগকে বিদায় দিয়া, চুরট মুখে পাৎলুনের পকেটে বামহস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অত্যন্ত "সম্ভ্রান্ত" ভাবে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পদচারণা করিতে লাগিল।

আকাশে তখন অল্প অল্প মেঘ উঠিতেছে। কাল-বৈশাখীর পূর্ব্বলক্ষণ।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেমচন্দ্রের দ্বারবান আসিয়া তাহাকে সেলাম করিল। কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব কাঁহা?"

দ্বারবান বলিল, "হুজুর, সাহেব তো হামকো লাগিজ-উগিজ সাথ ভেজ দিহিন হাঁয়। সাহেব মালুম ঘোষ মেম সাহেবলোগকো সাথ আওয়েঙ্গে।"

ইহ শুনিয়া কিশোরী নিজ অধিকৃত কামরা দেখাইয়া দিল; দ্বারবান জিনিষপত্রগুলা তাহাতে উঠাইতে লাগিল।

আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, ঘোষ সাহেবের বিপুলকায় মুড়ীগাড়ী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। হেমচন্দ্র একলম্ফে অবতরণ করিয়া, মহিলাগণকে নামিতে সাহায্য করিতে লাগিল। মিষ্টার ঘোষ একটা কন্সাল্টেশন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া সঙ্গে আসিতে পারেন নাই, তবে ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিবেন আশ্বাস দিয়াছেন।

মেঘটা তখন একটু বাড়িয়াছে, বাতাসও একটু প্রবল হইয়াছে। কুমারীদ্বয়ের বাহুল্য বস্ত্রাদি ফরফর করিয়া উড়িতে লাগিল। দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া টেম্পেষ্ট নাটকে মিরান্দার চিত্র কিশোরীমোহনের মনে পড়িল। সে বেড়াইতে বেড়াইতে প্ল্যাটফর্ম্মের বিপরীত প্রান্ত অবধি চলিয়া গেল। ইঁহারা আসিলে সে আবার এই দিকে আসিবে। এখনি দেখা হইবে, হেমচন্দ্র তাহাকে ইন্ট্রোডিউস করিবে। ভালয় ভালয় সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কিশোরী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

দূর হইতে কিশোরী যখন দেখিল ইঁহারা প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন সে ধীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল।

টুপী তোলার কথাটা মনে আছে ত?—হাঁ, বেশ মনে আছে।

ঐ অদূরে ঘোষজায়া কন্যাদ্বয় সহ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের তিন জনেরই পরিধানে রেশমী শাড়ী—তবে ঘোষজায়ার শাড়ীখানি শুভ্রবর্ণ, মেয়ে দুইটির রঙীন। একখানি ঈষন্নীল, অপরখানি ফিকা বাদামী। ঘোষজায়ার মস্তকে একটি "ব্রাহ্মিকা" টুপী, তাহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে এক খণ্ড সুদীর্ঘ শিফ ঝুলিতেছে। কুমারীদ্বয়ের মস্তকার্দ্ধ কেবলমাত্র শাড়ীর প্রান্ত দ্বারা আবৃত—তাঁহারা ঐ শিফ টুপী পছন্দ করেন না, বলেন উহা পরিলে dowdy (বুড়ো বুড়ো) দেখায়।

কিশোরী ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহার অনতিদূরেই যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে তাহা উপভোগ করার সময় এখন তাহার নহে।

নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র হেমচন্দ্র ইংরাজিতে বলিল, "হেল্লো স্নগ, কতক্ষণ?"

"এই কতক্ষণ।"—কিশোরী দেখিল মহিলারা কেহ প্ল্যাটফর্ম্মের পানে কেহ অন্যদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র বলিল, "Ladies, allow me to introduce my friend." (মহিলাগণ, আমার বন্ধুকে আপনাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিব, অনুমতি করুন)

এই কথা শুনিবামাত্র মহিলাগণ নিজ নিজ দৃষ্টি ফিরাইয়া, কিশোরীমোহনের মুখের দিকে চাহিলেন।

কিশোরী টুপী তুলিয়া অভিবাদন করিল। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ ঘোষ করপ্রসারণ করিলেন।

যথাশিক্ষা কিশোরী টুপীটি মাথায় বসাইয়া, তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা দমকা বাতাস আসিয়া হতভাগ্য যুবকের টুপী উড়াইয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর ফেলিল। টুপী প্ল্যাটফর্ম্ম স্পর্শ করিবামাত্র বায়ুবেগে গড়াইয়া চলিল।

কিশোরী সেখান হইতে এক লম্ফে টুপীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। গড় গড় করিয়া টুপীও যত ছুটে, কিশোরীও ক্ষিপ্তের মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে। আর এদিকে, "আমার মনিব কোথায় যায়" ভাবিয়া টমি কুকুরটিও ঊর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া কিশোরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল।

অনেকটা দূর গিয়া অবশেষে টুপী গেরেপ্তার হইল। তখন কিশোরী থামিয়া টুপী মাথায় পরিয়া, চিন্তা করিবার অবসর পাইল।

ছি ছি, ছিছি, এ কি চলানটা চলাইলাম! এতক্ষণ তাহারা মুখে রুমাল দিয়া কত হাসিই না জানি হাসিতেছে। হেম ত পাখী পড়ানো করিয়া শিখাইয়া দিয়াছিল, তাহা সত্ত্বেও টুপী মাথায় ভাল করিয়া বসাইতে পারি নাই। পারিলে, কখনই উড়িয়া যাইত না। ছি ছি, কি কেলেঙ্কারি, কি কেলেঙ্কারি। উঃ এ কালা মুখ তাহাদিগকে দেখাইব কোন্ লজ্জায়? 'নাগ' স্থানে 'ন্যগ' উচ্চারণ করিলেই বাঙ্গালী কি আর সাহেব হইয়া যায়?

দুই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই কিশোরীমোহনের মস্তিষ্ক দিয়া এই প্রকার চিন্তাস্রোত বহিয়া গেল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, হেমচন্দ্র তাহার সন্ধানে আসিয়াছে।

বন্ধুর সহিত কিশোরী ফিরিল। তাহার মুখচন্দ্র লজ্জায়, ক্ষোভে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

মহিলাগণের নিকট ফিরিয়া আসিবামাত্র মিস্ ঘোষ বাঙ্গলায় বলিয়া উঠিলেন, "আপনার টুপীটি জখম হয়নি ত মিষ্টার ন্যগ?"

কিশোরীর কণ্ঠস্বর তখন কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে সে বলিল, "না।"

হেমচন্দ্র বলিল, "ঝড় বাতাসের দিনে হ্যাট জিনিষটে সময় সময় বড়ই ধোঁকা দেয়। সেই জন্যে আমি যখনই কোনওখানে যাতায়াত করি, দ্বিতীয় একটা হ্যাট সঙ্গে নিই। একবার চলন্ত গাড়ী থেকে আমার হ্যাট উড়ে পড়ে গিয়েছিল, সেই অবধি আমি সাবধান হয়েছি।"

এ কথা শুনিয়া কিশোরীর মন কতকটা শান্ত হইল। তবে হেমচন্দ্রের মত লোকেরও টুপী উড়িয়া যায়!

মিস্ বীণা বলিলেন, "মা, বাবার বিলেতে সেই টুপী উড়ে যাওয়ার গল্পটা বল না!"

ইহা কিশোরীর দগ্ধ হৃদয়ে যেন অমৃতসিঞ্চনের ন্যায় বোধ হইল। মিষ্টার ঘোষ, অমন প্রবল সাহেব, তাঁহারও টুপী উড়িয়া গিয়াছিল! এবং যেখানে সেখানে নয়, বিলাতে! তবে আর তার লজ্জাই বা কিসের, দুঃখই বা কিসের?

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, "সে আমি তাঁর মত তেমন মজা করে বলতে পারবো না। তিনি ত এখনই আসবেন তাঁকেই বলতে বলিস্।"

বীণা আবদারের স্বরে বলিল, "তিনি ক—খোন্ আসবেন, ততক্ষণ জুড়িয়ে যাবে। তুমিই বল মা!"

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, "সেও ট্র হ্যাট। হবর্ণ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দমকা বাতাসে টুপী উড়ে গেল। এত হাওয়া যে টুপীটা রাস্তায় পড়েই ডাকগাড়ীর মত গড়াতে লাগলো। তিনিও দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে টুপীর পিছনে ছুটলেন। সমুখে একখানা অম্নিবাস আসছিল, একটা পুলিসম্যান তাঁকে ধরে ফেল্লে, নইলে অম্নিবাসের নীচে পড়ে প্রাণটা যেত আর কি! সেই অম্নিবাসের চাকাতেই টুপীটা গুঁড়ো হয়ে গেল।"

হেমচন্দ্র বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তার পর?"

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, "সেখানে কাছাকাছি কোথাও টুপীর দোকান ছিল না, থাকলেও কেনবার টাকা সঙ্গে ছিল না। খালি মাথায় বাসায় আসেন কি করে? চট্ করে একটা ক্যাব ডেকে, তার মধ্যে ঢুকে বাসায় ফিরে এলেন।"

মিস্ ঘোষ বলিলেন, "মা, সেই ক্যাবির উপদেশটাও বলে দাও।"

ঘোষজায়া বলিলেন, "ক্যাবিটা আগাগোড়া সমস্ত দেখেছিল কিনা। বাড়ী পৌছে দিয়ে ভাড়াটি নিয়ে বল্লে—মশায়, টুপী উড়ে গেলে কি করতে হয় জানেন না? Pickwick Papers পড়ে দেখ্‌বেন।"

বীণা বলিলেন, "Pickwick বেচারীরও ঠিক ঐ বিপত্তি হয়েছিল কি না! সেই যে ছবিটে আছে, যখনই দেখি, হেসে আর বাঁচিনে। টুপী গড়িয়ে যাচ্ছে, আর পিছু পিছু Pickwick—একে বুড়ো মানুষ, তায় মোটা—থপাস্ থপাস্ করে দৌড়চ্ছে। Pickwickএর সব ছবির চেয়ে সেইটেই আমার ভারি মজার লাগে।"

ইহা শুনিয়া কিশোরীর মন হইতে অবশিষ্ট গ্লানিটুকুও নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া গেল।

হেম জিজ্ঞাসা করিল, "উপদেশটা কি?"

মিস্ ঘোষ বলিলেন, "উপদেশটা হচ্চে, রাস্তায় টুপী উড়ে গেলে, খবরদার তার পিছু পিছু ছুটবে না। ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে। আর পাঁচজনে যেমন হাসবে, তুমিও

তেমনি হাসবে, যেন কত মজাই হচ্চে। তারপর কেউ টুপীটা ধরে' তোমার হাতে এনে দেবে এখন, তখন তাকে বলবে থ্যাঙ্কিউ।"

হেমচন্দ্র বলিল, "বাঃ বাঃ, এ উপদেশ মহামূল্য। ডিকেন্স, তুমিই ধন্য। আহা, ডিকেন্সের বই পড়লে যেমন সাংসারিক জ্ঞানলাভ হয়, তেমন আর কারও বই পড়লে হয় না।"

মিসেস ঘোষ বলিলেন, "এ সব সাহিত্যআলোচনা পরে হবে এখন। চল, এখন আমরা গাড়ীতে উঠি।"

হেম জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি মেয়েদের গাড়ীতে উঠবেন না কি? চলুন না দামুকদিয়াঘাট অবধি একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।"

মিসেস ঘোষ বলিলেন, "তোমাদের গাড়ীতে হয়ত একগাদা ইংরেজ উঠে পড়বে, সে দরকার নেই।"

হেম বলিল,"এখনও অনেক গাড়ী পুরো খালি রয়েছে। আমরা পাঁচ কালোমূর্ত্তি উঠে বসে থাকি আসুন, তা হলে কোনও ইংরেজ আর সে গাড়ীতে উঠবে না।"

মিস্ ঘোষ কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিলেন, "আপনি আমাদের কালো বল্লেন মিঃ কার? আপনাদের সঙ্গে আমরা যাব না, যান।"

হেমচন্দ্র বলিল, "আপনি বুঝি রাগ করলেন?—এঃ পৃথিবীর কোনও খবরই রাখেন না? আমি আপনাদের একটু খোসামোদ করেই কালো বল্লাম বই ত নয়। আজকাল কালো রঙের যে বড় কদর, তা শোনেন নি? একজন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মানুষের সাদা রঙই কুশ্রী এবং অস্বাভাবিক। শ্যামবর্ণই সুন্দর, কেন না তা প্রকৃতির নিজের গায়ের রঙ। দেখুন আকাশ শ্যাম, পাহাড় শ্যাম, সমুদ্র শ্যাম, গাছপালা—"

মিস্ ঘোষ বাধা দিয়া বলিলেন, "বৈজ্ঞানিক, না কবি বলুন!"

হেমচন্দ্র কিয়ৎকাল স্মরণ করিবার ভাণ করিয়া বলিল, "হঁ্যা হঁ্যা ঠিক তাই। কবিই বটে, কবিই বটে।"

মিস্ ঘোষ হাসিতে হাসতে বলিলেন, "এবং সে কবিটি—আপনিই।"

হেম হাতযোড় করিয়া বলিল, "দোহাই আপনার। এ জীবনে অনেক পাপ করেছি বটে, কিন্তু ঐটি করি নি—কবিতা কখনও লিখিনি। সে যদি বলেন, তবে আমাদের এই নাগভায়া।"—বলিয়া হেম, কিশোরীর পিঠ ঠুকিয়া দিল।

মিস্ ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার নাগ, আপনি কবি?"

এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় কিশোরীর সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল। প্রফুল্লভাবে উত্তর করিল, "আপনি ঐ অসম্ভব কথায় বিশ্বাস করেন?"

বীণা বলিলেন, "নাগ? নাগ?—আপনার পুরো নামটি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

কিশোরী উত্তর করিবার পূর্ব্বেই হেম বলিয়া দিল, "কিশোরীমোহন নাগ।"

শুনিয়া মিস্ ঘোষ বলিলেন, "ওঃ হো, তাই বলুন। শুধু মিষ্টার নাগ শুনলে বুঝবো কি করে? মাসিক পত্রে ত ওঁর কত কবিতা পড়েছি। এবারকার বঙ্গদর্পণে 'বসন্তে কুহুধ্বনি' কবিতা আপনিই ত লিখেছেন?"

কিশোরী মনে মনে পুলকিত হইয়া উত্তর করিল, "ও রকম করে যদি ধরেই ফেল্লেন, তবে আসামী কবুল জবাব করছে।"

সকলে হাসিতে লাগিলেন। এই হাসির মধ্যে মিষ্টার ঘোষ আসিয়া পৌঁছিলেন।

কিশোরী তাঁহারও নিকট পরিচিত হইল। ক্রমে ভীড় হইতেছে দেখিয়া, মিসেস ঘোষ প্রভৃতিকে মহিলা-কক্ষে উঠাইয়া দেওয়া হইল; কিশোরী ও হেমচন্দ্র অন্য কামরায় উঠিল।

বাঁশী বাজিল, নিশান উড়িল, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।*

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

---

* ষোল বৎসর পূর্ব্বে, "ভারতী" পত্রিকায়, এই দুইটি পরিচ্ছেদ "লীলাকুমারী" নামক উপন্যাসের শিরোনামাভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন ঐ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াই বন্ধ হইয়া যায়। এখন এই নূতন নামে ধারাবাহিক ভাবে ইহা "মানসী"তে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।—লেখক।

"প্রতাপসিংহ"-এর গান।

(নবম গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

৪র্থ দর্শক।

মিশ্র মল্লার——কাহারওয়া।*

কি সুখেরই হ'ত পৃথিবী রে—
আমি যদি হতাম একাই পুরুষ, আর অন্যে সবাই আমার স্ত্রী রে।
যদি, শুভ্র শয্যায় করে' শয়ন, বিভোর হয়ে, মুদে নয়ন,
অধর চুম্বনেই হ'ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি রে !!

[স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

স্থায়ী

	০	১		২´		৩		NN
II{	সরা	মররা ।	মা	পা I	মপা	ধর্রা ।	সর্রর্সা	সর্সা ।
	কিসু	খেরই	হ	ত	পৃথি	বীo	রেoo	আহা

	০	১		২´		৩		
।	সর্রা	সধধা ।	র্সা	ধণা I	পধা	মপা ।	মমা	-রা }।
	কিসু	খেরই	হ	তo	পৃথি	বীo	রে	o

		১		২´		৩		
।{	দদা	পদা ।	পমা	-গমা I	সগা	মদা ।	দা	-র্সা।
	আমি	যদি	হতা	oম্	একা	ইপু	রু	ষ্

* যতটুকু আমার জানা আছে, কলিকাতার বড় বড় অভিনয়ে এ গানখানি হয় না। ইতঃপূর্ব্বে হইত কি না—জানি না। কিছু দিন হইল এক সখের থিয়েটার পার্টী তে এ গানখানি অভিনয় কালে যে সুরে ও তালে গীত হইতে শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করিয়াই স্বরলিপি করিলাম। —লেখিকা।

০ ১ ২´ ৩
। র্রর্া সর্রা । সধা -ধ ধা পধপা মপা । মমা -রা ।
আর্ অন্তে সবা ০ই আমার্ স্ত্রী০ রে ০

০ ১ ২´ ৩
N NNN
। সসা ধসা । -সরা -সরা I গগগগা পপা । পধা ধা ।
শুধু আমা রস্ত্রী ০ রে কেবল্আ মার্ স্ত্রী০ রে

০ ১ ২´ ৩
N N N
। র্সা সর্সা । সর্ণা ধধা I পা -ধা । মগা -রা } II
নি ছ ক্ আ০ মার্ স্ত্রী ০ রে ০

অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
II { জ্ঞজ্ঞা ররজ্ঞজ্ঞা । রা নূনূসা I পনা -সরা । সা -রা ।
যদি শু০ভ্র০ শ যা০য় করে ০শ য় ন্

০ ১ ২´ ৩
। র্রা পপা । মা পা I গসা গা । মগা -মমা ।
বি ভোর্ হ য়ে মু০ দে নয় ০ন্

০ ১ ২´ ৩
। মপা -না । র্সা -র্রা I র্সা -ণা । ধপা -মগা ।
যদি ০ ই ০ ই ০ ই০ ০০

০ ১ ২´ ৩
। মা পপা । না নর্সর্সা I ধা না । র্সনা -র্সর্সা ।
শু ভ্র শ য্যা০য় ক রে শয় ০ন্

০ ১ ২´ ৩
N N
। র্সর্সর্সা র্রজ্ঞা । র্রা র্রা I না নর্রা । নর্সা -া ।
কসেবি ভোর্ হ য়ে মু দেন য়০ ন্

```
  0                      ১              I ২´              .. ৩
  NNNN.
| ধ ধধধদা     পপা । মগা     মমা  I সা        গদা । পা        -া } ।
  একদনবি     ভোর্   হ০      য়ে০    মু         দেন   য়          ন্

  0                      ১              I ২´              .. ৩
| পা          পা । -না     ননা  I র্সা       র র্রা । নর্সা       র্সা ।
  অ           ধ    র্       চুম্    ব্        নেই    হ০         ত

  0                      ১              I ২´                 ৩
| র্সা         র্সা । না     -পক্ষা I পা       ননা , ধনা         না ।
  ক্ষু          ধা   তৃ      ষ্ঞা    নি        বৃৎ   তি০         য়ে

  0
  NN..                  ১...            .. I ২´           ..  ৩
| সর্সর্ণা      -ণধা । -মমপধা   মগা  I া       গগা । মপা        -ক্ষপা ।
  আহাঅধ       বুচু    মূব নেই   হত    ০       হত    হ০          ০ত

  0                ..   ১               I ২´           ..  ৩
| -মা          মপা । নর্সা     র্সা  I -র্জ্ঞা    র্রা । নর্সা      র্সনা ।
  ০            ক্ষুধা  তৃষ্     ঞা    ০এ       ক্ষুধা  তৃষ্       ঞা০

  0                      ১         .NN  I ২´                ৩
| র্সা         ধধা । ণধা    পপপা I মা       পপা । ধা         -র্সর্সা ।
  নি          বৃৎ    তি০    য়ে,ওরে  নি       বৃৎ   তি          ০য়ে

  0           NN         ১              I ২´                ৩
| -া          র্সর্সা । ধা     পপা  I মা       -পধা । মা      -গরা } IIII
  ০           যদি    নি     বৃৎ    তি        ০০    য়ে        ০০
```

স্বরলিপির যে যে স্বরাক্ষরগুলির উপরে ইংরাজি N অক্ষর বসান হইয়াছে, সেগুলি স্বাভাবিক (natural) আওয়াজে অর্থাৎ সুর করিয়া নহে, অথচ 'উদারা' বা 'মুদারা' কিম্বা 'তারা'—গ্রামত্রয়ের অনুপাতে, অর্থাৎ নিম্ন বা মধ্যম কিম্বা চড়া গলায় আওয়াজে, যেখানে যেমন লিখিত হইয়াছে, উচ্চারিত হইবে। এখানে 'আওয়াজ' মানে এই যে, সাধারণ ভাবে কথা কহিবার সময় যেমন কণ্ঠ হইতে শব্দ উচ্চারণ করা হয়।

—লেখিকা।

খড়মের বোলো

(নক্সা)

রামরূপ ভট্টাচার্য্য সুবর্ণবর্ণ এক টুকরা কাঁঠালকাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া ভাবিলেন যে, উহার দ্বারা এক যোড়া সুদৃশ্য খড়ম প্রস্তুত হইতে পারিবে। ঐ কাষ্ঠখণ্ড লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইবার পথে তিনি সূত্রধরকে উহা প্রদান করিলেন; এবং অনুরোধ করিলেন, সে যেন অল্পদিন মধ্যে উহা হইতে এক যোড়া খড়ম প্রস্তুত করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ লাভ করে।

সপ্তাহকাল অতীত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় পথিপার্শ্বে সূত্রধরের কুটীর-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা মিস্ত্রী, আমার খড়ম যোড়াটা কি তৈরী হয়েছে?"

সূত্রধর তখন সবেমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া, এক ছিলিম তামাক সাজিয়া, ধূমপানের দ্বারা আপনার নিদ্রা-বিজড়িত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলকে সজীব করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রামরূপ ভট্টাচার্য্যকে গৃহপ্রাঙ্গণে সমাগত দেখিয়া, সে সসম্ভ্রমে হুঁকাটি দ্বারপার্শ্বে রাখিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিল; এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে কহিল, "আজ্ঞে আরও কিছু দিন আপনাকে সবুর করতে হবে; হাতে কাযের একটু ঝঞ্ঝাট আছে; এই ঝঞ্ঝাটটা মিটলেই আপনার কাযে হাত দিব।"

ভট্টাচার্য্য গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। আবার সপ্তাহ কাল পরে সূত্রধরের গৃহে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, খড়ম যোড়াটা কি তৈরী হয়েছে।"

সূত্রধর বলিল, "আজ্ঞে এখনও হাত দিতে পারি নি। এ মাসের এ ক'টা দিন আর হবে না। আসছে মাসের প্রথমেই পাবেন।"

পরমাসের প্রথম পক্ষ অতিবাহিত হইলে, খড়মপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার সূত্রধরের বাটীতে দেখা দিলেন। সূত্রধর দীর্ঘসূত্রতার অনুরক্ত উপাসক; সে তখনও খড়ম প্রস্তুত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। বস্তুতঃ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত কাষ্ঠখণ্ড সে কোথায় রাখিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণই ছিল না। সে ভট্টাচার্য্যের মনস্তুষ্টির জন্য বলিল, "আজ্ঞে, এই পরশুদিন নিয্যশ পাবেন।"

সেই দিন ভট্টাচার্য্য সূত্রধরের বাটীতে যাইয়া আবার খড়ম চাহিলেন। ভট্টাচার্য্যের মনস্তুষ্টির জন্য সূত্রধর সেদিনও বলিল, "আজ্ঞে, কাল এই সময় বেওজর পাবেন। এবার আর কথার নড়চড় হবে না।"

২

পরদিন যথাসময়ে ভট্টাচার্য্যকে উপস্থিত দেখিয়া সূত্রধর ভাবিতে লাগিল, আজ কি মিথ্যা বলিয়া সে তাঁহাকে বিদায় করিবে? একটু চিন্তার পর সে মনোমধ্যে একটা উত্তর রচনা করিয়া কহিল, "আজ্ঞে, খড়ম আপনার তৈরী হয়ে গেছে; এখন কেবল বোলো বসাতে বাকী। একযোড়া বোলো যদি কাউকে দিয়ে কল্‌কাতা থেকে কিনে এনে দেন, তা'হলে আজই বিকেলবেলায় খড়ম আপনার ছিচরণে পরিয়ে দিব।"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "আমাদের পাড়ার বিমল গাঙ্গুলী 'ডেলিপ্যাসেঞ্জার'—রোজই কল্‌কাতায় যায়। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; আজ আর হবে না; কাল তাকে দিয়ে এক যোড়া বোলো কিনে আনিয়ে তোমাকে দিয়ে যাব।"

পরদিন সূত্রধর ভট্টাচার্য্যকে গঙ্গাস্নানের পথে তাহার বাড়ী অতিক্রম করিয়া যাইতে দেখিয়া উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ভটচায্যি মশাই, বোলো যোড়াটা আনতে দিয়েছেন কি?"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "ঐ দেখ, বোলোর কথা একে·

বারে বিস্মরণ হয়েছিলম। আজ আর হবে না; কাল আন্‌তে দেব। পরশু এই সময় তোমাকে দিয়ে যাব।"

পরদিন গঙ্গাস্নানের পথে অগ্রসর হইয়া, পথিপার্শ্বে সূত্রধরের কুটীর দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের মনে পড়িয়া গেল যে খড়মের জন্য বোলো আনিতে দেওয়া হয় নাই। অতএব তিনি সূত্রধরের সহিত বাক্যালাপ না করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী ফিরিলেন। তৎপরদিবস সূত্রধরের বাটীর নিকট যাইয়া, তাঁহার আবার মনে পড়িল যে, সে দিনও বোলো আনিতে দেওয়া হয় নাই।

নির্ব্বাকভাবে বাটী অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে ত্বরিত পদে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সূত্রধর সাহসপূর্ব্বক হাঁকিল, "দণ্ডবৎ, ভটচার্য্যি মশাই! বোলো যোড়াটা কি আনিয়েছেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিব্রত হইয়া কহিলেন, "না, আনতে দেওয়া হয় নি! কাযের ঝঞ্ঝাটে মনে পড়ে নি। কাল নিশ্চয় আন্‌তে দেব। আর ভুল হবে না; এই গামছায় গেরো বেঁধে রাখলাম। পরশু তুমি নিশ্চয়ই বোলো পাবে।" কিন্তু পরদিন রবিবার ছিল; তজ্জন্য আফিস বন্ধ থাকায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতিবেশী সেদিন আর কলিকাতায় যান নাই। কাযেই বোলো আনিতে দেওয়া হইল না।

সোমবারে সূত্রধরের বাটী দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র ভট্টাচার্য্যের হৃদয়টা আশঙ্কিত হইয়া উঠিল;—মনে পড়িল, আজও বোলো আনিতে দেওয়া হয় নাই। সূত্রধর জিজ্ঞাসা করিল, "ভট্টাচার্য্যি মশাই, বোলো যোড়াটা?"

ভট্টাচার্য্য বিহ্বল নেত্রে সূত্রধরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বোলো আজও আনতে দেওয়া হয় নি। আজ বাড়ী গিয়েই গিন্নীকে বলে রাখব; আর কিছুতেই ভুল হবে না।"

মঙ্গলবার দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। বুধবার দিন সূত্রধর তাঁহার গমনপথে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভটচার্য্যি মশাই, বোলো যোড়াটা?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "দেখ, কাল গিন্নীকে বলে রেখেছিলাম, আর তিনিও রাত্রে আমাকে মনে ক'রে' দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সকালে উঠে সংসারের কাযে আমার আর মনে ছিল না। কিন্তু কাল আর ভুল হবে না। যদি কোন গতিকে ভুলে যাই, তুমি মনে পড়িয়ে দিলে, আমি নিজে কল্‌কাতায় গিয়ে বোলো কিনে নিয়ে আসব। কাল্ বিকালে তোমায় বোলো দেবই দেব।"

বৃহস্পতিবার দিন সূত্রধর স্মরণ করাইয়া দিল— "ভটচার্য্যি মহাশয়, বোলো যোড়াটা?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কহিলেন, "আজও ভুল করেছি। কিন্তু আজ আহারাদির পর আমি নিজে কলকাতায় গিয়ে বোলো নিয়ে আসব। বিকাল বেলা তুমি নিশ্চয়ই পাবে।" কিন্তু আহারাদির পর তিনি কলিকাতায় যাইতে উদ্যত হইলে, গৃহিণী আসিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। বলিলেন, "আজ বৃহস্পতিবার; আজ আর যাওয়া হবে না। আর একদিন এনে দিও।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহিণীর অকাট্য যুক্তি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। মনে করিলেন যে পরদিন স্মরণ রাখিয়া উহা প্রতিবেশীর দ্বারাই আনাইবেন। কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া, সংসারের নানা অভাবের জন্য তিনি গৃহিণীর নিকট অভিযুক্ত হইলেন। কাযেই বোলোর কথা তাঁহার মনে পড়িল না।

৩

শুক্রবার দিন গঙ্গাস্নানের পথে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া তিনি ভাবিলেন, "তাই ত! আজও ত বোলো আনতে দেওয়া হয় নি। আজ মিস্ত্রি জিজ্ঞেস করলে কি বলব? তার চেয়ে অন্য পথ দিয়ে অন্য ঘাট থেকে গঙ্গাস্নান করে আসি।" তাহার পর দিনও অর্দ্ধপথে যাইয়া বোলোর কথা মনে উদিত হওয়ায়, তিনি অন্য ঘাটে যাইয়া স্নান করিলেন। এইরূপ কয়েক দিন চলিল।

কিন্তু সূত্রধর তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। কয়েকদিন ভট্টাচার্য্যের দর্শন লাভ করিতে না পারিয়া, সে অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে তিনি অন্য একঘাটে স্নান করেন। তখন সে সেই ঘাটে যাইয়া তাঁহাকে

ধরিল ; এবং জিজ্ঞাসা করিল, "ভট্‌চায্যি মশাই, বোলো যোড়াটা ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে ঘাট ত্যাগ করিয়া, অন্য এক দূরবর্ত্তী ঘাটে যাইয়া স্নান করিতে লাগিলেন। সূত্রধর সন্ধান পাইয়া, সেখানে যাইয়াও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ভটচায্যি মশাই, বোলো যোড়াটা ?"

অবশেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয় গঙ্গাস্নান ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার পাইলেন না। সেই অধ্যবসায়ী সূত্রধর, হাটে বাজারে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেই নত মস্তকে প্রণত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "ভটচায্যি মশাই, বোলো যোড়াটা ?"

তিনি হাটে বাজারে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সূত্রধর যাত্রার দাতা-কর্ণের ন্যায় হস্তে করাত লইয়া, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছে, "ভটচায্যি মশাই, বোলো যোড়াটা ?"

আমরা শুনিয়াছি, রামরূপ ভট্টাচার্য্য মৃত্যুকালে পুত্র পৌত্রগণকে নিকটে ডাকিয়া আদেশ করিয়াছিলেন,— "আমার বংশে কেউ যেন কখনও খড়ম পায়ে না দেয় ; দিলে সে নির্ব্বংশ হবে।"

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কোকিল

বসন্তের হাসি সহ মিলাইয়া তান
রোমাঞ্চিত করিতেছ রসিকের চিত—
কদম্বের শাখে যথা গোবিন্দের গান ;
সকলি মধুর—শুধু গায়ক অসিত।
জনম ক্ষত্রিয় বংশে, গোপের আশ্রয়ে
যশোদার স্তনে দেহ বৰ্দ্ধিত হরির ;
তুমিও কোকিলকুলে সুখে জন্ম লয়ে
করেছ বায়সগৃহে পুষ্ট ও শরীর।
কৃষ্ণের বাঁশরী-রবে গোপাঙ্গনাকুল
ধাইত সরম ত্যজি যমুনার ধারে ;
তব কণ্ঠরবে, শুনি, হইয়া আকুল
কত বিলাসিনী ডোবে অকূল পাথারে।
মহতের সহ তব এত যদি মিল,—
মেরনা ক্ষুদ্রেরে প্রাণে, শুনরে কোকিল।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

প্রাথমিক শিক্ষা

কলেজে ও য়ুনিভারসিটিতে যে ভাবে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে তাহার সহিত ব্যক্তিগত ভাবে জড়িত থাকিয়া আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, কলেজে প্রবেশের পূর্ব্বে ছাত্রগণ যে ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার বিশেষ সংস্কার না হইলে দেশে প্রকৃত শিক্ষার যথেষ্ট প্রচার হইবে না। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য নানা প্রকার। কেহ কেবল মাত্র নিজের জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা পরিতৃপ্তির জন্যে বিদ্যাভ্যাস করেন, কেহ পৃথিবীতে নূতন তথ্য বিস্তারের জন্য বিদ্যাচর্চ্চাতে নিযুক্ত থাকেন, কেহ সমাজ ও দেশের হিতার্থে নিজকে নিয়োজিত করিবার জন্য লেখাপড়ার চেষ্টা করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা স্বীয় জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। যিনি যে উদ্দেশ্য লইয়াই বিদ্যালয়ে যোগদান করুন না কেন, যদি তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তাঁহার উদ্দেশ্য একেবারেই সফল হইবে না, অথবা যদি উহা সফল হয় তাহাও অত্যন্ত আয়াসসাধ্য হইবে।

দেশে শিক্ষপ্রচারের যে সমস্ত অন্তরায় আছে তন্মধ্যে শিক্ষার বাহনের প্রশ্ন সর্ব্বপ্রধান। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের মাতৃভাষাতে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত দেশে শিক্ষার বহুল প্রচার অসম্ভব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন সম্বন্ধে ভারত রাজসরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ দিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটি বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও বিশেষ সন্তোষজনক নহে। এ সম্বন্ধে আমার নিজের যাহা বক্তব্য তাহা ইতঃপূর্ব্বে অন্যত্র বলিয়াছি, এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত স্যাড্‌লার কমিটি আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যে সমস্ত ত্রুটীর উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে একটী এই যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কেহই পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ের গণ্ডীর বাহির যাইতে প্রস্তুত নহেন। এই অভিযোগ আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয়ের প্রতি প্রযোজ্য। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে দর্শন শাস্ত্রে এম-এ উপাধিধারী ব্যক্তি হয়ত, জলের কি উপাদান তাহা জানেন না এবং অনেক অঙ্কশাস্ত্রে উচ্চ উপাধিধারী হয়ত গাল্‌ফ ষ্ট্রীম কাহাকে বলে সে খবর রাখেন না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যাহাতে ছাত্রগণ পরীক্ষার গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ না থাকে সে বিষয়ে গত বৎসর হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থের চেষ্টাতে উক্ত কলেজে কিঞ্চিৎ কার্য্য করা হইতেছে। বিজ্ঞানের শিক্ষকগণ আর্ট বিভাগের ছাত্রদিগের বিজ্ঞান-বিষয়ক এবং আর্টের শিক্ষকগণ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদিগকে আর্ট বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই প্রথা সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকের ও অভিভাবকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য এই যে, যদি ছাত্রগণ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত কৃতকার্য্য হয় তাহা হইলেই তাহাদের দায়ীত্বের শেষ হইবে না। এই কথাটি একটু বিশদভাবে বলিতে চাই।

সভ্যজগতে শিক্ষকের মত দায়িত্বপূর্ণ কায আর কাহারও নাই। বেতনের মাপকাঠিতে শিক্ষকের দায়িত্ব পরিমিত হইতে পারে না। বিদ্যা ও চরিত্র ব্যতীত শিক্ষকের আরও একটী গুণ থাকা উচিত, সেটী কার্য্যে একাগ্রতা। সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য সেই শিক্ষক হইবেন, যিনি ওতপ্রোত ভাবে ছাত্রদের সঙ্গে মিশিতে কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করিবেন না। নানা কারণে বাধ্য হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাত্রদিগকে পড়াইতে হয়, এবং এই অবস্থা হেতু শিক্ষকগণ অপেক্ষা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ অধিকতর

দায়ী। কর্ত্তৃপক্ষের মনে রাখিতে হইবে যে, যদি শিক্ষক চিরকাল আর্থিক অভাবে বিব্রত থাকেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে উপযুক্ত কার্য্য পাওয়া যাইবে না। আবার ইহাও বক্তব্য যে, যিনি শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিবেন, তিনি যদি ইহাকে কেবলমাত্র অর্থ উপার্জ্জনের অন্যতম উপায় মনে করেন, তবে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তিনি যেন এই কার্য্য গ্রহণ না করেন। যে শিক্ষক শিক্ষকতাকে একটী মিশনের ন্যায় মনে না করিবেন, তিনি কখনই উপযুক্ত শিক্ষক হইতে পারিবেন না। শিক্ষক নিযুক্ত করিবার সময় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান কার্য্য হইবে ভাল করিয়া দেখা যে, যে আবেদনকারীকে নিযুক্ত করা হইতেছে সে খাঁটী শিক্ষক কি না। খাঁটী শিক্ষক নিযুক্ত না করিয়া, যদি কর্ত্তৃপক্ষের কোন বেকার আত্মীয়কে, যেহেতু সে সম্প্রতি কোন কার্য্য পাইতেছে না সেই হেতু ও অপর স্থানে তাঁহার সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত নিযুক্ত করা হয়, তবে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হইবে। এই শ্রেণীর শিক্ষকের মন সর্ব্বদাই অন্যদিকে ধাবিত হইতে চাহিবে, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে যথার্থ কার্য্যের আশা দুরাশা মাত্র! শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে যে যদি তিনি রীতিমত পড়াশুনা করিয়া নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ রাখিতে না পারেন, তবে তিনি কখনও উপযুক্ত শিক্ষক হইতে পারিবেন না। শিক্ষককে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্রকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করান শিক্ষকের একমাত্র কার্য্য নহে। ছাত্রের চরিত্রগঠন শিক্ষকের এক অতি প্রধান কার্য্য। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে শিশু-মনোবিজ্ঞান বিশেষ ভাবে শিক্ষা করিতে হইবে। বেত্রের সাহায্যে শিশুচরিত্র গঠিত হইতে পারে না বলিয়া অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। উপযুক্ত ভাবে চেষ্টা করিলে প্রত্যেক শিশুকেই একজন উপযুক্ত মানুষে পরিণত করা যাইতে পারে, পরীক্ষা দ্বারাও ইহা স্বিরীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত "জুনিয়র রিপাব্লিক"এর খবর রাখেন তাঁহাদিগকে এই কথা নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। শিক্ষকের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি যদি ছাত্রকে যথোচিতভাবে শিক্ষিত করিতে না পারেন সেই ছাত্রের অকৃতকার্য্যতার জন্য তিনিও আংশিক ভাবে দায়ী। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষাদান ব্যতীত, বালকের বুদ্ধিবৃত্তি যাহাতে ক্রমশ বিকশিত হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষককে সতত লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাতে লেখাপড়ার সঙ্গে বালকের চরিত্র গঠিত হয়, অর্থাৎ যাহাতে বালক সত্যবাদী, নির্ভীক, সৎসাহসী পরোপকারী, পরদুঃখকাতর, অপরের সুবিধার জন্য নিজের কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, দেশ ও সমাজ হিতৈষী এবং অপরাপর সৎগুণে ভূষিত হয় সে বিষয়ে শিক্ষকের প্রখর দৃষ্টি থাকা উচিত।

সাধারণতঃ আমাদের দেশের বিদ্যালয় সমূহে যে ভাবে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে, তাহাতে অধিকাংশ স্থলে কুইনাইন গলাধঃকরণ করার ন্যায় শিক্ষার্থী তাহার পাঠ গ্রহণ করে। এই দুরবস্থার জন্য শিক্ষকই মুখ্যতঃ দায়ী। যে স্থানে শিক্ষক পাঠদানের জন্য গৃহে অধ্যয়ন না করেন, সেই স্থানেই এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইতিহাসের শিক্ষক গল্পচ্ছলে ও চিত্রশোভিত পুস্তকাদির সাহায্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য ছাত্রদিগকে জানাইতে পারেন, এবং যদি তিনি ইতিহাস বলিবার সময় নিজেকে একজন প্রকৃত 'ঠাকুরদাদা' বানাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার ছাত্রগুলি হইতে অনেক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন বাহির হইয়াছে। ভূগোলের শিক্ষকের কর্ত্তব্য, মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগকে বাহিরে লইয়া যাওয়া যাহাতে ছাত্রগণ ভূগোলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে হাতে কলমে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারে। ভূগোল সম্বন্ধে হাতে কলমে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ছাত্রদিগকে বিদ্যালয় গৃহের বাহিরে আসিয়া উন্মুক্ত মাঠ, নদীতীর প্রভৃতি বালকদের প্রিয়স্থানে কায করিতে হইবে এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি এইভাবে ভৌগোলিক শিক্ষা আরম্ভ হয় তবে ভবিষ্যতে এভারেষ্ট পর্ব্বতশৃঙ্গ সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয়ের জন্য সমিতি বিদেশী

কর্তৃক গঠিত হইয়া লজ্জায় আমাদিগকে অধোমুখ করিবে না।

শিক্ষক হয়তো বালকদিগকে এক আখ্যায়িকা পড়াইলেন এবং এই আখ্যায়িকা হইতে ছাত্রগণ কি উপদেশ লাভ করিতে পারে তাহা তাহাদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু যদি ছাত্রগণ বুঝিতে পারে যে শিক্ষক মহাশয় নিজের জীবনে পূর্ব্বোক্ত উপদেশের বিপরীত আচরণ করিতেছেন তাহা হইলে সেই শিক্ষকের সমস্ত উপদেশই ব্যর্থ হইবে। শুনিতে পাওয়া যায় যে অনেক বিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে আছে যে, শিক্ষক বেতন হিসাবে খাতাতে যত টাকা পাইয়াছেন বলিয়া স্বাক্ষর করেন, বাস্তবিকপক্ষে সেই টাকা অপেক্ষা অল্প টাকা তিনি বেতন হিসাবে পাইয়া থাকেন। যে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত থাকে, সে বিদ্যালয়ের উচ্ছেদ হইলে সমাজের ও দেশের কল্যাণ বই অকল্যাণ হইবে না। আমাদের সদাসর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যে অনুষ্ঠান মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইতে কোনও স্থায়ী সুফললাভের আশা নাই। যে শিক্ষক এইরূপ ব্যবস্থাতে সম্মত হইয়া সুকুমারমতি বালকগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য বালকগণকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে রাখা।

আজকাল প্রায়শই আমাদের দেশে লোকের মুখে বিজ্ঞান-শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেরই ইচ্ছা যে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা বিশেষভাবে প্রচলিত হউক। দেশের বিজ্ঞানালোচনার বিস্তার দেখিতে চাহিলে ছাত্রের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থাতেই তাহাকে বিজ্ঞান শিক্ষাতে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে ইতঃপূর্ব্বে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান রিডার নামক যে সমস্ত পুস্তক পড়ান হইত, এখন নাকি তাহা হয় না। এই সংবাদে আমি ক্ষুব্ধ হই নাই, কারণ যে ভাবে এই সমস্ত পুস্তক পড়ান হইত, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে বিজ্ঞানের নামে ছাত্রদের মনে এক বিভীষিকা উপস্থিত হইত। ইহাতে দেশের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল সাধিত হইত না। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির এক প্রধান দোষ এই যে, সমস্ত স্কুলেই ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তকের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়, যে বিষয় সম্বন্ধে পুস্তক পড়ান হয় সে বিষয়ের উপর তত জোর দেওয়া হয় না। সাহিত্যে পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যদি শিক্ষকের দৃষ্টি কেবল মাত্র পাঠ্যপুস্তকে নিবদ্ধ থাকে, তবে তাঁহার কার্য্য অনেক পরিমাণে অসম্পূর্ণ থাকিবে। পাঠ্য পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রদের নিকট হইতে আমরা কোন্ বিষয় সম্বন্ধে কতখানি জ্ঞানের আশা করি তাহার আভাস আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বিজ্ঞানের যে ভাগ বৃক্ষ লতা প্রভৃতির আলোচনাতে ব্যস্ত তাহাকে উদ্ভিদ্ বিদ্যা বলা হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ বিদ্যাতে বৃক্ষের সমস্ত অংশ যথা ফুল সম্বন্ধে নানা তথ্য জানিতে পারা যায়। উদ্ভিদ্ বিদ্যার প্রাথমিক অবস্থাতে ফুল সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার জন্যে যে ছাত্র প্রস্তুত হইতেছে তাহাকেও ফুল সম্বন্ধে নানা বিষয়ে পাঠ লইতে হয়। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর ছাত্রের অধীত বিদ্যার মাপকাঠি কখনও এক হইতে পারে না। এবং এই দুই শ্রেণীর ছাত্রের পাঠ্যপুস্তকে আমরা ইহাই বুঝিয়া থাকি।

এক হিসাবে বিজ্ঞান রিডার পাঠ উঠিয়া যাওয়াতে আমি দুঃখিত হই নাই বটে, কিন্তু অপর হিসাবে আমি ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান রিডারগুলি যখন প্রচলিত ছিল তখন এই সমস্ত পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে অনেক তীব্র সমালোচনা কাগজে দেখিয়াছি। কিন্তু এই সমস্ত পুস্তক ও পুস্তকে আলোচিত বিষয়গুলির পঠন ও পাঠন যখন উঠিয়া গেল, তখন দেশে কোনও আন্দোলনের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে কি করিয়া বলিতে পারি যে দেশের লোক বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য বিশেষভাবে উৎসুক? আমা-

দের দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশের ধনাগম বৃদ্ধি করা। কোনও বৈজ্ঞানিক এই কথাতে সায় দিবেন না। সত্য বটে যে বিজ্ঞানের কোন কোন অংশ ধনার্জ্জনের জন্য বা মানুষের সুখ সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞানালোচনার আসল উদ্দেশ্য ইহা নহে। বিজ্ঞানের যথার্থ উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে সম্যক্‌ভাবে বুঝা এবং চরিত্র গঠন।

প্রধানতঃ বিজ্ঞান আলোচনাতে তিনটী পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়,—যথা প্রক্রিয়া, অবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের জন্য জ্বর হইলেই সাধারণতঃ চিকিৎসক সিডালিজ চূর্ণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই ঔষধ দুইটী পৃথক পুরিয়াতে দেওয়া হয়। ঔষধ গ্রহণের পূর্ব্বে এই দুই পুরিয়াস্থিত দ্রব্য আলাদা করিয়া জলে দ্রব করা হয়। পরে এই দুইটি দ্রবীভূত জিনিষ এক সঙ্গে মিশাইলে সমস্ত ঔষধ উথলাইয়া উঠে ইহা আমরা দেখিতে পাই। এই দৃষ্টান্তে পুরিয়াস্থিত দুইটী দ্রব্য দুই ভিন্ন আধারে জলে মিশানো ও দুই আধারস্থিত জলে একত্রীকরণ বৈজ্ঞানিকের প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। মিশ্রণের পর উথলান দেখা বৈজ্ঞানিকের অবেক্ষণ। এই দুই আধারস্থিত দ্রব্যের উপাদান ভিন্ন। এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য একত্র করিলেই সংমিশ্রিত দ্রব্য বুদ্‌বুদযুক্ত হইয়া থাকে এবং ইহা হইতে রাসায়নিক এই দুই শ্রেণীর দ্রব্যের পারস্পরিক আচরণ সম্বন্ধে এক নিয়ম খাড়া করিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়ম বা সিদ্ধান্ত স্থাপন করার পূর্ব্বে যে রাসায়নিককে কত প্রক্রিয়ার সম্পাদন ও অবেক্ষণের তালিকা সঙ্কলন করিতে হইয়াছে, তাহা রাসায়নিক মাত্রেই অবগত আছেন।

বিষয়টি এই ভাবে চিন্তা করিলে সকলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিজ্ঞান শিক্ষাতে কি ভাবে চরিত্র গঠিত হইতে পারে। বিজ্ঞান পাঠে অবেক্ষণ, অধ্যবসায়, চিত্ত সংযোগ ও বিচার শক্তি ক্রমিক ও স্বাভাবিক ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। একটী বালককে একটী কাঁঠাল গাছের পাতা অঙ্কিত করিতে দিয়া আমার কথা ঠিক কি না তাহা আপনারা পরীক্ষা করিতে পারেন।

জর্ম্মানজাতি যে বিজ্ঞানালোচনাতে পৃথিবীতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহা সকলেই জানেন এবং এই উচ্চস্থানের ভিত্তি জর্ম্মনদের কিণ্ডেরগার্ডেন শিক্ষাপ্রণালীর উপর স্থাপিত। "কথচ্ছলেন বালানাং নীতস্তদিহ কথ্যতে" এবং কিণ্ডেরগার্ডেন প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান মুখ্যতঃ এক। পরলোকগত স্যর এ, পেডলার আমাদের দেশে এই কিণ্ডেরগার্ডেন প্রণালীতে শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্যের জন্য তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যে সময় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় তখন আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন ছিল না এবং উপযুক্ত শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানে শিক্ষিত অনেক যুবক বিদ্যালয় হইতে প্রতিবৎসর বাহির হইতেছে, সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষকের অভাব আর এখন নাই। সুতরাং আশা করা যায় যে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হউক আর না হউক, প্রত্যেক মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে অবিলম্বে বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার অনুপাতে দুই একটী বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন এবং এই জন্য যাহা অধিক ব্যয় হইবে তাহা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়া, দেশবাসী যে বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাকুল তাহা প্রমাণিত করিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে কোনও ভাল কাজ ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন সুসম্পন্ন হইতে পারে না—সে কাজ যত বড়ই হউক বা যত ছোটই হউক।

শিশুর সম্যক্ বিকাশের জন্য দায়িত্ব কেবলমাত্র শিক্ষকের উপর ন্যস্ত রাখিলে চলিবে না। অভিভাবকেও শিশুর প্রতি সতত লক্ষ্য রাখিতে হইবে ও মনে রাখিতে হইবে যে শিশুর চরিত্র গঠনের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য আর কিছুই নাই। সাধারণতঃ চরিত্র শব্দ আমাদের দেশে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমি কিন্তু

এস্থলে চরিত্র শব্দ খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। যদি নিজের বালককে অভিভাবক সুচরিত্র করিতে চান, তবে অভিভাবককেও সুচরিত্র হইতে হইবে। শিশুর সম্মুখে পিতা মাতা ও অপরাপর অভিভাবককে সর্ব্বদা অতি শুদ্ধ মনে থাকিতে হইবে। পিতাকে হয়ত তাগিদদার তাগাদা করিতে আসিয়াছে, পিতা অন্তঃপুরে আছেন, কিন্তু হাতে টাকা নাই, তাগিদদারকে ফিরাইয়া দিবার জন্য পিতা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; পুত্র বাহিরে গিয়া সংবাদ দিল যে বাবা বাড়ী নাই। তাগিদদারের কিঞ্চিৎ কটুবাক্যের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পিতা যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন, তাহাতে যে পুত্রের তিনি কি অপকার সাধিত করিলেন তাহা ভাবিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু এক এক করিয়া বৃহৎ বস্তু প্রস্তুত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণার সমষ্টিতে যমুনা নদীর অভ্যন্তরস্থ বড় বড় চর প্রস্তুত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে এই ভাবে পিতা, মাতা ও অভিভাবকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত শিশুর চরিত্র-গঠনের উপর প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করে। মদ্যপানাসক্ত অভিভাবকের বালক যদি মদ্যপানাসক্ত হয়, তবে সে দোষ কাহার এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ।

কেবল মাত্র চরিত্রগঠন ও বিদ্যাশিক্ষায় সহায়তা করিলেই অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হইল না। যাহা ত উপযুক্ত ব্যায়ামাদির দ্বারা বালকের স্বাস্থ্য গঠিত হয় সে বিষয়েও অভিভাবক ও শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

অররাজ অশোকস্তম্ভ

মতিহারীর ১৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ও বিখ্যাত বোসরিয় স্তূপের ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অররাজ মহাদেবের মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে একমাইল দূরে একটি অশোক প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরস্তম্ভ আজিও দণ্ডায়মান দেখা যায়। স্তম্ভটী সাধারণের নিকট শিবলিঙ্গ বলিয়া পরিচিত এবং তাহার অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্রগ্রামখানি লৌড়িয়া নামে পরিচিত। অশোকস্তম্ভ ঐ গ্রামের পূর্ব্বসীমানা হইতে ২০০ হস্ত দূরে অবস্থিত।

আধুনিককালে স্তম্ভটী Mr B. N. Hodgson কর্ত্তৃক সাধারণের পরিচিত হইয়াছে। তিনি ইহাকে "রাধিয়া স্তম্ভ" নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাই স্তম্ভটী ঐ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। বেতিয়ার উত্তরের অপর অশোকস্তম্ভটি হজসন সাহেব "মাথিয়া-স্তম্ভ" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের নামও লৌড়িয়া। তাই মনে হয় যে, তাঁহার মুন্সী ইচ্ছা করিয়াই নিন্দাবাচক গ্রামের নাম না করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী গ্রামের নাম করিয়াছিলেন। রাধিয়া গ্রামের প্রকৃতনাম রহরিয়া—উহা অশোকস্তম্ভের আড়াই-মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সেইরূপ মথিয়া গ্রামও অপর লৌড়িয়া স্তম্ভ হইতে দক্ষিণদিকে তিনমাইল দূরে অবস্থিত। কানিংহাম নিকটবর্ত্তী গ্রামের নাম বজায় রাখিয়া এবং উভয়স্তম্ভের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য মতিহারীর দক্ষিণের স্তম্ভটীর নামকরণ করেন "লৌড়িয়া-অররাজ স্তম্ভ" এবং বেতিয়ার উত্তরের স্তম্ভের নাম রাখেন "লৌড়িয়া নন্দনগড় স্তম্ভ।" উভয়স্তম্ভের মধ্যের ব্যবধান প্রায় ৫৬মাইল হইবে।

অশোকপ্রতিষ্ঠিত অন্যান্য স্তম্ভের ন্যায় এটীও এক অখণ্ডপ্রস্তর নির্ম্মিত এবং মসৃণ ও উজ্জ্বল পালিসযুক্ত। স্তম্ভটী বর্ত্তমানে ভূপৃষ্ঠের উপর ৩৬৷৷ ফুট উচ্চ। ইহার তলদেশের ব্যাস ৪১৮ ইঞ্চি ও উপরিঅংশের ব্যাস ৩৭৷৷ ফুট—অর্থাৎ ৯ফুটে একইঞ্চি কমিয়াছে। অপর লৌড়িয়া-স্তম্ভের হ্রাসের পরিমাণ ৩৩ ফুট ৯ ইঞ্চি, বা প্রায় ৪ ফুটে

এক ইঞ্চি কম। এই জন্যই নন্দনগড় স্তম্ভের গঠন এত সুন্দর ও সুগোল। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত-হ্রস্বাকার অথচ স্থূলতর বলিয়া অররাজ স্তম্ভ তাহার তুলনায় নিতান্তই কুগঠন। কানিংহাম অনুমান করেন স্তম্ভটীর ওজন প্রায় ৩৫ টন হইবে। কিন্তু ভূগর্ভপ্রোথিত অমসৃণ অংশ সমেত তাহা ৪০ টনের কম হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ত্তমানে অররাজ স্তম্ভের শীর্ষদেশে কোনও পশুমূর্ত্তি নাই। কিন্তু এক কালে যে ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। গ্রামবাসীরা বলে যে তাহারা বরাবরই স্তম্ভটী এই ভাবে থাকার কথা শুনিয়া আসিতেছে, উপরে কোনও জন্তুর মূর্ত্তি ছিল বলিয়া কখনও শুনে নাই। অনুসন্ধান করিয়াও এখানে জন্তুমূর্ত্তি বা তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া এখানে যে কোনও কালে কোন পশুমূর্ত্তি ছিল না এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। অশোক প্রতিষ্ঠিত সমস্ত স্তম্ভই পশুমূর্ত্তিশিরস্ক ছিল। ত্রিহুতের মধ্যেই অশোকের তিনটী সিংহমূর্ত্তিযুক্ত স্তম্ভ অবস্থিত। মথিয়া, রামপুরায় উভয় স্তম্ভেই সিংহমূর্ত্তি দেখা যায়। তাই মনে হয় যে, অশোকের ছয়টী অনুশাসনযুক্ত এই স্তম্ভটীও ঐ দুইটীরই মত পশুরাজমূর্ত্তি-শীর্ষ ছিল।

অশোকের অনুশাসন সমূহ স্তম্ভগাত্রে দুই অংশে উৎকীর্ণ। দক্ষিণদিকে ২৩ লাইনে প্রথম চারিটি ও উত্তর দিকে ১৮ লাইনে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুশাসন খোদিত। অক্ষরগুলি বেশ পরিষ্কার ও সুন্দর এবং গভীরভাবে খোদিত—সর্ব্বাংশে দিল্লী ও এলাহাবাদ স্তম্ভের বর্ণমালার অনুরূপ। শুধু "৮" অক্ষরটির গঠনে সামান্য কিছু প্রভেদ দেখা যায়। এই ধরণের "জ" ত্রিহুতের অপর দুইটি স্তম্ভেও দেখা গিয়াছে। রাধিয়া এবং মথিয়া স্তম্ভে ছয়টী যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা কৃত্থ, ত্য,ধ্য,খ্য, স্ত ও স্ব—ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি দিল্লীর স্তম্ভে নাই। রাধিয়া, মথিয়া ও রামপুরার প্রথম স্তম্ভে অশোকের ছয়টি স্তম্ভলিপি আছে। এই তিন স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখা যায়। যৎসামান্য যেটুকু প্রভেদ দেখা যায়, তাহা লিপিকরকৃত প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়। তাই বুলহার মনে করেন যে, একই পাণ্ডুলিপি হইতে বা একই কারণে লিখিত এক পাণ্ডুলিপির তিন প্রতিলিপি হইতে এই লিপিত্রয় খোদিত হইয়াছিল। *

লৌড়িয়া গ্রাম খুব নির্জ্জন অঞ্চলে অবস্থিত এবং ইহার নিকটেও কোন প্রাচীন যুগের ধ্বংসরাজি দেখা যায় না। তাই অররাজ স্তম্ভ দর্শকবৃন্দের নাম খুদিয়া অমর হইবার উৎপাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কানিংহাম যখন দেখিয়াছিলেন তখন Reuben Burrow 1772 শুধু এই নামটি ছিল। এই নাম মথিয়া এবং বখিরা স্তম্ভেও দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া প্রাচীন শম্বুকাকৃতি অক্ষরের কতকগুলি লেখাও অররাজ স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ দেখা যায়। প্রিন্সেপ, কানিংহাম প্রভৃতি অনুমান করেন যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী এই অক্ষরগুলির কাল। এলাহাবাদ দুর্গের অশোকস্তম্ভে প্রিন্সেপ সর্ব্বপ্রথম এই ধরণের অক্ষর আবিষ্কার করেন। তিনিই ইহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতে অবস্থিত প্রায় সমস্ত প্রাচীন স্তম্ভেই এইরূপ অজ্ঞাত রহস্যপূর্ণ অক্ষর দেখা যায়।*

ফাহিয়ান ও হিউয়েনসঙ্গ-এর বৃত্তান্ত মধ্যে রাধিয়া, মথিয়া এবং রামপুরা স্তম্ভের উল্লেখ দেখা যায় না। তাহার এক মাত্র কারণ যে তাঁহারা কেহই এ অঞ্চলে পদার্পণ করেন নাই। হিউয়েনসঙ্গ বৈশালী পর্য্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে ৫০০লি উত্তর পূর্ব্ব বৃজ্জিরাজ্যে ও তথা হইতে নেপালে গিয়াছিলেন। তিনি যদি এ অঞ্চলে আসতেন তবে এ সকল স্থানের প্রাচীন তথ্য আমরা তাঁহার লেখা হইতে জানতে পারিতাম। প্রাচীন ভারতের অনেক তথ্যের জন্যই আমরা তাঁহার

* Epigraphia Indica, Vol. II, p. 245

* A. S. R. Vol I, p 310 যথা বিহার, চিতারী, কাহাউ, কুইন্স কলেজের স্তম্ভ, কৌশাম্বী, প্রয়াগ, সিংভূমজেলার বিজয়া পাহাড় ইত্যাদি।

নিকট ঋণী, তাই বড়ই দুঃখের বিষয় যে হিউয়েনসঙ্গ চম্পারণ জেলায় আসেন নাই।

অশোকের স্তম্ভলিপি হইতেই প্রকাশ যে ঐগুলি তাঁহার অভিষেকের ষড়বিংশ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সে হিসাবে অনুমান ২৪৩—৪২ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ এগুলির কাল। সুতরাং অররাজ স্তম্ভও ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্থির হইয়াছে।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ সমালোচনা

সৌন্দর নন্দ—শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম এ বি এল কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১৮১ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধান, মূল্য ১৲

মূল পুস্তকখানি কনিষ্কের বৌদ্ধ গুরু বুদ্ধ চরিত রচয়িতা অশ্বঘোষ কর্তৃক লিখিত। অনুবাদ-পুস্তকের ভূমিকা-লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় প্রথমে ইহা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশ করেন। অনুবাদক লিখিয়াছেন, "ইহা আজ পর্য্যন্ত কোন ভাষায় অনূদিত হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস।" কিন্তু চতুর্থ বর্ষের 'গৃহস্থ' পত্রিকায় (১৩১৯-২০) ইহার যথাযথ না হউক সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। লাহা মহাশয় ইহার যথাযথ অনুবাদ করিয়াছেন। যেখানে যথাযথ অনুবাদে অর্থ স্পষ্ট হয় নাই সেখানে ভাবার্থ দিয়াছেন।

কাব্যখানি অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত। নিজ বৈমাত্রেয় ভাই সুন্দর নন্দকে বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করান। নন্দ স্বীয় গৃহে সুন্দরী নামে সুন্দরী স্ত্রী ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। কাযেই সংসার ত্যাগ দ্বারাও তাঁহার সংসারাসক্তি কমিতেছিল না। তাই দেখিয়া বুদ্ধদেব নানারূপ উপদেশ দিয়া তাঁহার সংসারাসক্তি ঘুচাইয়া দেন। শেষে নন্দ সদ্ধর্ম্মের সাধন পদ্ধতির অনুষ্ঠান করিয়া অর্হৎ পদ লাভ করেন।

ভূমিকা লেখক শাস্ত্রী মহাশয় ও গৃহস্থে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে অশ্বঘোষ স্থানে স্থানে কবি কালিদাসকেও পরাজিত করিয়াছেন। মূল কাব্যের সৌন্দর্য্য এই পুস্তকখানিতে অধিকাংশ স্থলেই বজায় আছে।

হিন্দীশব্দ ও অনুবাদ মালা—শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। হিন্দী প্রচার কার্য্যালয় (ভবানীপুর) হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০

ইংরাজী Wordbook এর প্রণালীতে এখানি বাঙ্গালীর হিন্দী শিখিবার জন্য লিখিত। অথচ বাঙ্গলা হইতে হিন্দীতে অনুবাদ করিবার পদ্ধতি দেখাইয়া প্রত্যেক পাঠের শেষে কতকগুলি অনুশীলনী দেওয়া হইয়াছে। ব্যাকরণের অবশ্যজ্ঞাতব্য সূত্রগুলিও দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালীর হিন্দী শিখিবার পক্ষে প্রধানতঃ দুইটি অন্তরায়, এক উচ্চারণ অপর লিঙ্গজ্ঞান। দন্ত্য স, অন্তস্থ য ও ব এই তিনটীর উচ্চারণের বিশেষত্ব ভূমিকায় যতদূর সম্ভব বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যেও স্থানে স্থানে বাঙ্গলা অক্ষরে উচ্চারণ লিখিত হইয়াছে। কেবল হিন্দী অকারের উচ্চারণের কোন উল্লেখ নাই। ইহা বাঙ্গলা অক্ষরের সাহায্যে বুঝান দুষ্কর। গ্রন্থকারদ্বয় তাই বলিয়াছেন, অপর ভাষার উচ্চারণ শ্রুতিসাধ্য। অপর অন্তরায় দূর করিবার জন্য প্রত্যেক পাঠে স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ভেদে বিশেষ্যগুলি পৃথক করিয়া লেখা হইয়াছে। এই পুস্তকের সাহায্যে হিন্দী শিক্ষার্থী বাঙ্গালী সহজেই হিন্দী ভাষা শিখিতে পারিবেন। কেবল মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করিয়া হিন্দুস্থানীর উচ্চারণ শুনিতে হইবে।

বিপথগা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ডবল-ক্রাউন ১৬পেজী ২১১ পৃঃ। লালকাপড়ে বাঁধা সোণারজলে নামলেখা, দাম ১।০

বইখানি উপন্যাস। সমালোচনার খাতিরে কোনরকমে ১৪২ পৃঃ পড়িয়াছি, আর ধৈর্য্য থাকিল না। গল্পের মাথামুণ্ডু নাই। প্রথমাংশের সঙ্গে শেষাংশের সামঞ্জস্য নাই, কথ্যভাষায় ও সাধুভাষায় খিঁচুড়ী পাকান হইয়াছে। উপমাগুলি অদ্ভুত রকমের। সাধুভাষার মধ্যে ইতরলোকের ভাষা মিশান আছে। আর্টের দোহাই দিয়া আজকাল যে সকল গল্পের বই বাহির হইতেছে,

গ্রন্থকার সেক্সপিয়র ব্যর্থ অনুকরণচেষ্টা করিয়া গোটাকতক চুম্বন, অধর, পয়োধর প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সম্ভ্রমসূচক সর্ব্বনাম ও ক্রিয়ার রূপের প্রয়োগে গ্রন্থকার কেমন সিদ্ধহস্ত দেখুন। তিনি লিখিতেছেন, "সে বুঝিল আর সংসারে তাঁহার স্থান নাই।" তবে একটা প্রশংসার কথা এই যে, এইটুকু ছোট বইয়ে সাতখানি ছবি আছে।

ভাগ্য-রেখা—বা লালা গোলকচাঁদ, প্রথম খণ্ড—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু (ভিখারী নীরানন্দ) প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ৬৪, পৃষ্ঠা প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷৹

পুস্তকমধ্যে শার্ট ও চাপকান পরিহিত, চেয়ারে উপবিষ্ট ভিখারী নীরানন্দের একখানি ছবি, কয়েকটি বিজ্ঞাপন এবং বক্তব্য আছে। আমরা সেগুলির বিষয় কিছু না বলিয়া আখ্যায়িকার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। পুস্তকখানি সমালোচনার্থ প্রেরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে আখ্যায়িকা শেষ হওয়া দূরে থাকুক, আরম্ভমাত্র হইয়াছে। এজন্য এবিষয়ে এখন কোনও মত প্রকাশ করিতে পারা যায় না; তবে স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কনের দোষ এবং ভাষায় কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষিত হইল। আমরা নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

(১) "বৃদ্ধ বিপিনের সহিত কথা কহিতে কহিতে তিনি ভীত হন" (পৃঃ ১২)—এস্থলে' যখন 'বৃদ্ধ' রহিয়াছেন, তখন পুনরায় 'তিনি'র আবশ্যকতা কি?

(২) ১৬ পৃষ্ঠায় ভক্তিবৌর উক্তিতে একস্থানে 'তোমাদের, এবং 'তোমাপর' আছে—দুইটী একপ্রকারই হওয়া উচিত। 'বাগানো'র পরিবর্ত্তে 'বাধানো'ই লেখা উচিত।

(৩) অনেক স্থলে 'নাহি' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, অথচ 'নাই' শব্দও যে পুস্তকমধ্যে দেখা যায় না, তাহা নহে। আমাদের মতে দ্বিতীয় শব্দটিরই প্রয়োগ হওয়া উচিত।

(৪) ১৯ পৃষ্ঠায় 'পৌরবে'র স্থলে 'পৌরুষ'ই ঠিক।

(৫) "আমাদিগের বিদেশীয় মহাজনগণ বিদয় হইলে আমাদিগের অভাবের পরিসীমা থাকে না"। (২০ পৃষ্ঠা) এখানে 'আমাদিগের' শব্দের দুইবার ব্যবহার হইয়াছে—প্রথমটীর ব্যবহার না হইলেও ভাব ঠিক থাকে।

(৬) হিন্দুস্থানী জিতুসিংহের মুখে শুদ্ধ হিন্দীর পরিবর্ত্তে 'বাঙ্গালা হিন্দি' শুনিলে শ্রোতার কর্ণে কি রকম ঠেকে? (পৃঃ৩০)

(৭) 'ধরণ' (পৃঃ ৩১), 'হারামজাদ' (পৃঃ ৩৬), 'বছর সালিয়ানা' (পৃঃ ৩১), 'মুরুব্বি দাঁড়াইয়াছে' (পৃঃ ৪০) এবং 'খুলতে হইবে ত' (পৃঃ ৬১)—এইগুলিতে স্থলে যথাক্রমে 'ধারণ,' 'হারামজাদ', 'সালিয়ানা', 'মুরুব্বি হইয়া দাঁড়াইয়াছে', এবং 'খুলতে হ'বে ত' হইবে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, গ্রন্থকারের যখন আরও পুস্তকরচনার আকাঙ্ক্ষা আছে, তখন শুদ্ধতার দিকে তাঁহার লক্ষ্য রাখা উচিত।

নারীর গৌরব (উপন্যাস) শ্রীসুচারুভূষণ ঘোষ বি-এ প্রণীত। কলিকাতা নিউ সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত ও ১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে মেসার্স ঘোষ এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৫৫৬ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৩৲

ইহা একখানি সামাজিক বা গার্হস্থ্য উপন্যাস। বইখানির "নারীর গৌরব" নাম পড়িয়া আমরা প্রথমে একটু শঙ্কিত হইয়াছিলাম; কারণ আজকাল নাকি বিবাহিত স্বামীকে কদলী প্রদর্শন করিয়া স্থানান্তরে গমনই বাঙ্গালা সাহিত্যে (সৌভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালীর সমাজে নহে) নারীর যথার্থ গৌরব বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম আমাদের সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক।

গ্রন্থকার বর্ণিত গার্হস্থ্য চিত্রগুলি বেশ সরস ও উজ্জ্বল হইয়াছে। গল্পের প্রবাহটিও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই—পড়িতে পড়িতে আগ্রহ কোথাও মন্দীভূত হয় না। অরুণপ্রকাশ, শেফালি, আইরীণ প্রভৃতির চরিত্রগুলি বেশ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত। ইহাই বোধ হয় গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যম, কিন্তু তাঁহার বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে, এতবড় একখানি সাড়ে পাঁচশত পৃষ্ঠার উপন্যাসেও, তিনি আগাগোড়া বেশ সামঞ্জস্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। আশা করি সুচারুভূষণ বাবু লেখনীকে ক্ষান্ত না দিয়া নব নব উপন্যাস সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে আনন্দদান করিবেন।

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন

(চিত্রকর শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন)

যৌবনে—চিমটা কম্বল চরণ সম্বল হিমালয়ে বসবাস।

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ
১ম খণ্ড

চৈত্র, ১৩২৯

১ম খণ্ড
২য় সংখ্যা

পন্থা

গীতা বলেন—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"

এখানে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্ভবতঃ ক্ষাত্রধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন। এখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে উঠিয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে। অন্যত্র উহা ছিল না বলিলেই হয়।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আর যাহাই করুক, এদেশে জীবনসংগ্রাম কমাইয়া দিয়াছিল। তখন লোক ছিল কম, ভূমি ছিল বিস্তর,—ব্রাহ্মণের বৃত্তি অনায়াসেই চলিত। জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মচিন্তার জন্য একদল মানুষ পুরুষানুক্রমেই একরূপ পরের উপর দিয়াই ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের কাজটা সারিয়া লইতেন, অন্য বর্ণের লোকও আপন আপন বৃত্তি অনুসরণ করতঃ সহজভাবেই গ্রাসাচ্ছাদনের কাজটা নির্ব্বাহ করিত। ওকাজটা এখনকার এত মারাত্মক ভাব ধারণ করে নাই।

এখন এই কাজটাই সকল কাজের উপর। ধর্ম্ম-চিন্তার অবসর এখন অনেকেই পান না—অন্ততঃ এইরূপ তাঁহাদের ধারণা। জ্ঞানচর্চ্চার পথটা খুবই খুলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে পথে যাঁহারা অগ্রসর হন তাঁহাদের অধিকাংশেরই গন্তব্যস্থান বা লক্ষ্য ঐ ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ। এই ক্ষুৎপিপাসাটা দেশে বড়ই বিকট ভাব ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে। নানারকমের ক্ষুধা, নানারকমের পিপাসা যাহা সে কালে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, এখন দেশবাসীকে ভারাক্রান্ত করিতেছে। পাশ্চাত্য আকাঙ্ক্ষা আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্য কার্য্যকরী শক্তি আসে নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার একদেশ মাত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমরা ঘরের শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছি; ঘরের ধন পদাঘাতে ফেলিয়া দিতেছি।

এদেশে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল—অতিথিসৎকার, এখন নিজের 'সৎকার'ই ঘটিয়া উঠেনা, কাজেই অতিথির প্রতি অর্গলবদ্ধ। "পিতৃ"গণ "দেব"গণ ও "ভূত"গণ, জ্বালাতন করিতে আসেন না, সুতরাং তাঁহাদের খোঁজ নেওয়া অনাবশ্যক।

ঋষিদিগের আদর্শ ত উঠিয়াই গিয়াছে; কিন্তু এই যে

উদরটিকে কেন্দ্র করিয়া একটি নূতন আদর্শ মস্তক উত্তোলন করিয়াছে, তাহারই বা সাধনা হইতেছে কোথায় ? অভাব বাড়িতেছে বই কমিতেছে না, উদর-পূর্ত্তির উপকরণ লোকসংখ্যার অনুপাতে কমিতেছে বই বাড়িতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশ বা অন্তর্দ্দেশ হইতে এত যে যুবকদল প্রতিবৎসর সংসারক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতেছে, কার্য্যস্থলে তাহারা দেখিতেছি নিতান্তই নিঃসম্বল। শাস্ত্রকার মনু দ্বিজাতি সম্বন্ধে যে শ্বৃত্তিকে এতদূর নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, সেই শ্বৃত্তি মাত্র অবলম্বনে কয়জনের বিলাসবাসনা তৃপ্ত হইতে পারে ? অনেকে অনেক পুথি মুখস্থ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়মাল্যে আপনাকে ভূষিত দেখিয়া মনে করে কার্য্যক্ষেত্রেও আমাদের গৌরব এইরূপই থাকিবে। কিন্তু সংসারের আসরে নামিয়াই তাহারা দেখে এখানে স্বতন্ত্র মানদণ্ড।

সরকারী কাগজে প্রকাশিত "রিপোর্ট" বিশেষের লেখকগণ বলেন :—

"The majority of small landholders and permanent tenure holders are Hindu Bhadralok......

They have striven hard to provide their sons with education which will procure employment, by establishing Anglo Vernacular schools throughout the country ; but, as these schools have imparted nothing but an indifferent literary education, they have largely failed to fit their pupils for careers which are regarded as satisfactory. Posts and avenues of employment have indeed greatly increased in Bengal, and if every young man, who wants work were content to take what he could get and be thankful, there would be few left idle in the market place. But after careful enquiries in all directions we have decided that the greater part of the economic difficulty at present is, that many youngmen rate the value of school or college English education much higher than does the average employer. Graduates and those who have passed the Intermediate Examination in Arts are very reluctant to serve away from towns and decline to take any post which they consider an indequate recognition of the credential which has rewarded their laborious efforts. Thus they lose chances and sometimes spend months or years loitering about some district head-quarters and living on the joint family to which they belong. As a general rule, they sooner or later accommodate themselves to circumstances, but often with an exceedingly bad grace and with a strong sense of injury received from Government, the universal scape-goat. So much for the sucessful in the examinations. Unsucessful and those who never proceed to examinations, nevertheless generally consider that the mere fact of their English education places them well above the performance of manual labours or the acceptance of salaries which content relations who have not learnt English at all. They frequently end by declining (sic !) upons some poorly paid post which just enables them to live.

Bengal District Administation Committee Report (1913-14).

ভাবার্থ—"দেশের সর্ব্বত্র হিন্দুভদ্রলোকগণ ইংরাজী-বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপন করতঃ তাঁহাদের সন্তানগণের চাকরী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রদানের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়ে অপূর্ণাঙ্গ লেখাপড়া ভিন্ন অন্যরূপ শিক্ষা না হওয়ায় বিদ্যালয়গুলি অনেকস্থলেই ছাত্রদিগকে এরূপ কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই, যাহা সন্তোষজনক বিবেচিত হইতে পারে। বঙ্গদেশে চাকরী এবং কার্য্যে ঢুকিবার পথ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে; এবং যদি প্রত্যেক যুবক যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থাকে, তাহা হইলে বাজারে অল্প লোকই অলস থাকিয়া যায়। কিন্তু আমরা সকল দিকে সতর্কভাবে অনুসন্ধান লইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, অনেক যুবক স্কুল বা কলেজে প্রাপ্ত শিক্ষার মূল্য, সচরাচর কর্ম্মকর্ত্তারা যতদূর মনে করেন, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক মনে করে, এবং ইহাই বর্ত্তমান অর্থসমস্যার প্রধান কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বা মধ্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ নগরের বাহিরে চাকরী গ্রহণ করিতে বড়ই নারাজ, এবং পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে যে নিদর্শন দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছেন, সেই নিদর্শনের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিলে কার্য্যগ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। এইরূপে তাঁহারা সুযোগ হারাইয়া ফেলেন, এবং কখন কখন মাসের পর মাস বা বৎসরের পর বৎসর কোন জেলার প্রধান নগরে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং তাঁহারা যে যৌথ পরিবারের অন্তর্গত তাহার উপর দিয়াই খরচটা চালাইয়া লন। সাধারণতঃ শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক ইঁহারা অবস্থানুরূপ কার্য্যে লাগিয়া পড়েন, কিন্তু প্রায়ই সেটা নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে এবং সকল অপরাধের জন্য দায়ী গভর্ণমেণ্টই তাঁহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে এইরূপ ভাব দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন। এই হইল পাশ করাদের কথা। যাহারা পাশ করে নাই বা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই; তাহারাও সাধারণতঃ মনে করে যে তাহারা ইংরাজী শিখিয়াছে, সুতরাং, শারীরিক পরিশ্রম অথবা ইংরেজী অনভিজ্ঞ আত্মীয়েরা যে বেতনে কাজ করে সেই বেতন ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে ইহারা এমন সামান্য বেতনের চাকুরী-গ্রহণ করে যাহাতে কোনমতে খোরাকীটা চলিয়া যায়।"

বাস্তবিকই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এখন আপনাদিগকে যতখানি বড় মনে করেন, দেশের জনসাধারণে আর তাহা করেনা। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ চলিয়া গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পল্লবগ্রাহিতা বাড়িয়াছে, উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা বিবেচনা করিলে "কাজের লোক" তেমন বাড়িতেছে না, অভাব জাগরিত ও উৎপন্ন হইতেছে, দূরীভূত হইতেছে না। তাহা দূর করিবার পন্থা কোথায়?

দেশের ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থা ভুলিয়া যওয়াতেই এই দুর্ণীবায়ুর উৎপত্তি। অতীতের উপর বর্ত্তমানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলেই নানা বিপদ ও অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। যে দেশের পাদুকাসংস্কারক দুদিন পরে সমগ্র দেশের কর্ত্তা হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে, সে দেশের তরঙ্গে গা ছাড়িয়া দিলে কেবল ভাসিয়াই যাইতে হইবে। এদেশের পাদুকা-সংস্কারকের পক্ষে দেশের মন্ত্রিপদ লাভের আশা এখনও বহুদূর। শ্রমজীবী এখনও এদেশে কেবল নিম্নশ্রেণীর অর্থোপার্জ্জক নহে, নিম্নস্তরের জীব। কোনও শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি এখনও এদেশে উদরের সংস্থানের জন্য পাদুকা-সংস্কারক বা মুটিয়ার কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহে। একজন মুটিয়া মাসে ৪৫ ৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করে, তাই বলিয়া একজন "ভদ্র" সন্তান কখনও এদেশে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না—দশ টাকার মুহুরীগিরি পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে, অথবা কোথাও অধিকতর সৌভাগ্যশালী আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া গৌরব অনুভব করিতে থাকবে। ইংরেজী শিক্ষা সত্বেও এই ভাবটা এখনও দেশের অস্থি-মজ্জাগত।

দেশের জল বায়ু ও সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তিত

না হইলে কেবল দুপাতা ইংরেজী পুস্তক মুখস্থ করিয়া কেহ পাশ্চত্য মানবে পরিণত হইতে পারে না। পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে নানাবিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান, কর্ম্মকুশলতা এবং সমালোচনা-শক্তি আমাদিগকে অবশ্যই লইতে হইবে। কিন্তু কৃষ্ণচর্ম্মের যেমন শ্বেত চর্ম্মে পরিণত হওয়া অসম্ভব, ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ ইংরেজ হইয়া যাওয়াও সেইরূপ।

কিন্তু ইংরেজ হইতে না পারিলেই যে এ মর্ত্য জীবন বৃথা হইল এরূপ মনে করারই বা কারণ কি? "আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি" ভাবটী সকলের না আসিতে পারে, কিন্তু এটা যে কোনও সময়ে একটা দেশের মত দেশ ছিল, সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতায় যে দেশের মানবজীবনের বিকাশ, সে দেশ কুসংস্কার ও কুশিক্ষার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও যে একেবারে নিন্দনীয় নহে একথা আমরা ভুলি কেন? শতচেষ্টা করিয়াও আমরা প্রাচ্যভাব ছাড়াইতে পারিনা, তবে বাহিরে এত পাশ্চাত্য ধরণের অনুসরণ করি কেন? ভারতীয় প্রাচ্যভাব কি এতই উপেক্ষার বিষয়?

আমাদের চতুর্ব্বর্গ হইল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অর্থ ও কাম্যবস্তুর দিকে মানুষের মন স্বভাবতঃই ধাবমান হয়। সেই ধাবনের বেগ সংযত করতঃ, ধর্ম্ম ও মোক্ষ পথের দিকে মানবকে টানিয়া লওয়া চিরকাল এদেশের মুনিঋষিগণের ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল। স্নান, ভোজন, শয়ন, বিষয়কর্ম্ম সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য আমাদের দেশে ব্যবস্থার ছড়াছড়ি। অনেকেই এখন এদিকে ততটা মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ পান না বলেন। কিন্তু এদিকে মনোযোগ দিলে যে অর্থচিন্তা ও কাম্যবস্তুর অনুসরণও কতকটা রূপান্তরিত ভাবে, কতকটা কম উৎকট ভাবে মানুষকে পীড়ন করে, সেটা অস্বীকার করিবার যো নাই। এদেশের গৌরব ত্যাগে, ভোগে নহে। এদেশের সমাজের শীর্ষস্থানে দিনান্তভোজী দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দুগ্ধফেননিভ-শয্যাশায়ী শ্রেষ্ঠী নহে। আবহমান কাল হইতে এদেশের মাহাত্ম্য বর্জ্জনে, বিলাসিতায় নহে। দয়া ও দান সর্ব্বত্রই পূজার জিনিষ, কিন্তু এদেশের প্রাচীন আদর্শ তাহার অনেক উপরে। অথচ আমাদের শাস্ত্রানুসারে এদেশ, এ পৃথিবীটাই কর্ম্মভূমি।

সেই আদর্শ আমরা হইয়াছি। হয় ত' সেরূপ ভাবে আর কখনও তাহাকে পাইব না। এ দেশের যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম জীবন-সংগ্রাম কমাইয়া দিয়া, অর্থলিপ্সার পথেও কতকটা অবরোধ স্থাপন করিয়াছিল, সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভালই হউক্ আর মন্দই হউক্—আর ফিরিয়া আসিবে না। ফিরিয়া না আসিলেও তাহার আনুসঙ্গিক সামাজিক প্রথাগুলি আমরা ছাড়িতেছি না। সহজে ছাড়িতেও পারিবনা। উচ্চ বর্ণের লোক যে পাদুকা সংস্কার অথবা মুটিয়ার কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ বা অসমর্থ, ইহা ঐ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরই আনুসঙ্গিক সামাজিক ফল।

এই সামাজিক প্রথার সহিত যখন আমরা এতদূর জড়িত, তখন যে আদর্শের সংশ্রবে সেই সামাজিক প্রথার উৎপত্তি, সেই আদর্শটা সময়োপযোগী ভাবে সম্মুখে স্থাপন করিয়া এই "কর্ম্মক্ষেত্রে" চলিনা কেন? পূর্ব্বে ভূমি অনেক, লোক সংখ্যা অল্প ছিল সত্য, কিন্তু দ্রব্য উৎপন্ন করিবার প্রণালীও এতটা আবিষ্কৃত হয় নাই। তখন যদি আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম, তবে এখন এত কাঁদি কেন?

ভারতবর্ষে,—বাঙ্গালায়—কি নাই?—এই ধর্ম্ম-কর্ম্মময় দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিলাসিতাকেই আমরা জীবনের লক্ষ্য করিতেছি ইহা নিতান্ত ঘৃণা ও ক্ষোভের বিষয়। বিলাসিতার বেগ কমাইয়া দিলে যে জীবন সংগ্রাম অনেকটা কমিতে পারে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। দান, ধ্যান এবং উপবাসের পালা আমরা পূর্ব্বের মত আর আশা করিতে পারি না। দান এখন নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, ব্যক্তিগত না হইয়া সাধারণের হিতকর ব্যাপারের দিকে ঝুঁকিতেছে। ইহাই হয়ত এখনকার সময়োপযোগী। বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়াও এখন একদল লোক সমাজের অন্য শ্রেণীর স্কন্ধের উপর নির্ভর করিয়া উদরের ব্যবস্থা করিয়া লইবার আশা করিতে পারে না। সকলেরই

বাহুবল আবশ্যক। একদিকে অভাব বর্জ্জন, অন্যদিকে অভাব পূরণ, দুইটাই চাই।

এই বাহুবল দেশে যে নাই তাহা নহে। কিন্তু ইহার অপব্যয় হইতেছে। কর্ম্মকার বা সূত্রধরের পুত্র দুপাতা পুঁথি আওড়াইয়া হাতুড়ি ত্যাগ করিতেছে। কৃষক-পুত্র তথাবস্থ হইয়া মুহুরী বা পিয়ন হইবার জন্ম নগরে ছুটিতেছে। ব্রাহ্মণের স্ববৃত্তি উঠিয়া যাওয়ায় স্ববৃত্তির লিপ্সা স্বাভাবিকই। সূত্রধরের পুত্র হইলেই যে তাহাকে চিরকাল হাতুড়ি বাটালি লইয়া থাকিতে হইবে একথা আমরা বলিনা। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম তাহা চাহে না। কথা হইতেছে লোকের প্রবৃত্তি লইয়া। কতকগুলি লোককে যে কামার বা সূত্রধরের কাজ করিতেই হইবে এবং কিঞ্চিৎ পুঁথি অভ্যাস করিবার সঙ্গে ঐ কার্য্যটা করিলে যে তাহা আরও ভাল রকম হইতে পারে এই জ্ঞানটাই আমাদের জন্মিতেছে না; যেন সকল বিদ্যার লক্ষ্য ঐ কেরাণীগিরি, যাহার দশটির জন্য দশ সহস্র উমেদার। আমাদের শিক্ষার মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট দোষ আছে। জীবন সংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা এখনও হইতেছে না। এদিকে সাধারণের এবং কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি পড়িয়াছে। শিক্ষার কিরূপ সংস্কার হয় তাহা দেখিবার ও জানিবার বিষয় বটে। কিন্তু যে শিক্ষাই হউক তাহা মানুষকে অধিকতর কর্ম্মপটু না করিয়া কর্ম্মের অযোগ্য করিবে কেন? সামাজিক প্রথার অন্ধ অনুসরণ, তথাকথিত উচ্চবর্ণের বৃত্তির অন্ধ অনুসরণই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। কোন কর্ম্মই ঘৃণার বিষয় নহে, পাশ্চাত্য শিক্ষার এই মূল্যবান উপদেশ, আমরা, দেশের সামাজিক শাসন ছিন্ন ভিন্ন না করিয়া, যতদূর গ্রহণ করিতে পারা যায়—তাহা করিনা কেন? আমাদের সাধারণ লোক যথেষ্ট কষ্ট-সহিষ্ণু, দুপাতা পুঁথি পড়িয়াই আমরা অন্যরূপ জীব হইয়া পড়ি, যে গ্রাম্য সমাজ আমাদের দেশের বিধি ব্যবস্থার ভিত্তি, তাহা ছাড়িয়া নগরে নগরে মরীচিকা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। ইহা হইতেই জীবন সংগ্রাম ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাব ধারণ করিতেছে। গ্রামের জল, গ্রামের মাটী যদি পূর্ব্বে আমাদের শরীর পোষণ করিতে পারিত, তবে এখন তাহা পারে না কেন? ডাল, ভাত, মাছ, দুধ, ইহার সকলটারই জন্মস্থান মফঃস্বলে; জন্মস্থান নয় কেবল বিলাসিতার। অবশ্য এখন গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ারও জন্মস্থান হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ইহার নিবারণ আমাদের হাতে। আমরা গ্রামে বাস করিলে ও সশস্ত্র হইলে ম্যালেরিয়া কখনও আমাদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। আমরা নগরে আসিয়া গ্রামকে জঙ্গলে পরিণত করিব, আর "দেশ" বাসের অযোগ্য বলিয়া চীৎকার করিব, ইহাতো ঠিক "দেশ"এর উপর সুবিচার করা হইল না!

এদেশের কৃষিশিল্প চিরকাল পরিবারগত। বিলাতী ভাবে সুদীর্ঘ কৃষিক্ষেত্রের চাষ এখনও এদেশে আরব্ধ হয় নাই বলিলেই চলে। বিলাতী ধরণে কারখানা কতক কতক চলিতেছে। কিন্তু পরিবারগত শিল্প কি উন্নত অভিনব প্রণালীতে জাগরিত হইয়া কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার চেষ্টা করিয়াছে? পরিবারগত শিল্প মানুষের মনুষ্যত্ব যতটা রক্ষা করে, বড় কারখানা ততদূর নহে। বড় কারখানার উপকারিতা, উপযোগিতা অনেক আছে, নগরে বাসও অনেক, সময়ে অনেক কারণে আবশ্যক, কিন্তু সকলের পক্ষে বা সকল সময়ে তা আবশ্যক নহে। পরিবারগত শিল্প বা ক্ষুদ্র কারখানা বড় কারখানার সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিলে গ্রাম্য সমাজের ও দেশের যে উপকার হয় তাহা বর্ণনাতীত। কেরাণীগিরি বা পিয়নগিরির পরিবর্ত্তে এই দিকে কি দেশের লোকের প্রবৃত্তি যাইবে না? আমরা পুরাতন ভিত্তির উপরে নূতন প্রণালীতে সংস্কৃত, স্বাস্থ্য মণ্ডিত, হাস্যমুখর কৃষিশিল্প যুক্ত গ্রাম্য সমাজ দেখিতে চাই। পন্থা এই দিকে।

আমাদের কবি "বায়ু উল্কাপাত, বজ্রশিখা" ধরিয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। বজ্র-শিখাকে যে মানুষ কতদূর কাজে লাগাইতে পারে কবি তাহা জানিতেন না। অবশ্য বজ্রশিখার দাসত্বটা নগরের মধ্যেই এখনও ভালরূপ চলিতেছে, কিন্তু একটু

চেষ্টা করিলেও সমবেত ভাবে কার্য্য করিলে তাহাকে গ্রামের মধ্যেও যে খাটান যায় ইহা নিশ্চিত। আর বায়ু? নগর অপেক্ষা গ্রামেই তাহার চলাচলটা বেশী, সুতরাং যুবকগণ বাস্তবিক শিক্ষিত হইলে তাহাকে গ্রামের মধ্যে ভালরূপই খাটাইয়া লইতে পারেন। উল্কাপাত সম্বন্ধে কোন॰ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আবশ্যক হইতেছে প্রবৃত্তি, চেষ্টা ও উদ্যম। ইহা কি আসিবে না? আমাদের যুবকগণ বুদ্ধিমত্তায় হেয় নহেন। ভ্রান্তি সকলেরই হইতে পারে, সময় থাকিতে তাহা সারিয়া লওয়াই মনুষ্যত্বের কার্য্য। একটা মোটা কথা বলিতেছি। বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ শুধু নগরে নয়, অনেক পল্লীগ্রামেও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশ কি এতই নিঃসম্বল যে আমরা দুগ্ধের জন্য এই কৃষিসম্পন্ন পূর্ব্ব দেশে সুইজার্লণ্ডের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব? সমুদ্র পার হইতে আগত টিনের কৌটার দুধ আমাদের ছেলেপিলের জীবন রক্ষা করিবে এবং আমাদের যুবকগণের চা পানের ব্যবস্থা করিবে ইহা মনে করিলেও শরীর অবসন্ন হয়! গোচারণের ভূমি বাঙ্গলায় অল্প আছে সত্য, কিন্তু এখনও এমন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যাহাতে দেশে দুধ ঘি ও মাখন আবশ্যক মত প্রস্তুত হইতে পারে। ইউরোপের বহুদেশেই কৃষি সমিতি আছে। আমাদের শিক্ষিত যুবকগণের অধিকাংশেরই "দেশে" অল্প বিস্তর জমী আছে। তাঁহারা কি নিজ গ্রামে চেষ্টা করিয়া সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক কৃষির উন্নতি ও আনুসঙ্গিক রূপে কৃষিজাত দ্রব্য হইতে উন্নত প্রণালীতে অন্য দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারেন না? স্পেন্ দেশে যে পরিমাণ জমীতে যতটা ধান্য জন্মে, ভারতের ন্যায় উর্ব্বর দেশে সেই পরিমাণ জমীতে তাহার এক পঞ্চমাংশ মাত্র জন্মে; এলজ্জা কি রাখিবার স্থান আছে? জাপান, ডেন্মার্ক, ইটালী প্রভৃতি দেশ এই কৃষিজীবী দেশ অপেক্ষা কৃষিকার্য্যে অনেক উন্নত; এ কলঙ্ক মোচন করিবার কোনও চেষ্টা আমরা করিব না, অথচ সামান্য চাকরীর জন্য বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া নগরে নগরে ঘুরিব ও অন্যকে বিব্রত করিয়া তুলিব এই কি পাশ্চাত্য শিক্ষা?

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রবে আমরা অনেক জিনিষের অভাব অনুভব করিতে শিখিয়াছি। তাহার সকলগুলিই আবশ্যক নহে। যাহার অবস্থায় কুলায় না সে কেন এই অনাবশ্যক অভাব পূরণ করিতে আবশ্যক দ্রব্যের অভাব জন্মাইয়া আপনার ও আত্মপরিবারের স্বাস্থ্য ও সুখ নষ্ট করে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। পেটে দুবেলা ভাত যোটে না কিন্তু মুখে সিগারেট্, পায়ে বুট ও কণ্ঠে চা চাই—এ কি রকম বিকৃতি?—দেশের প্রাচীন ভাবটার আত্মাটা হারাইয়া ফেলিয়াছি কিন্তু খোলসটা ছাড়িতে পারিতেছি না। আবার ইউরোপের স্বাবলম্বন, ইউরোপের কর্ম্মপ্রাণতা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু ইউরোপের বিলাসিতা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে—এই হইয়াছে অধিকাংশের অবস্থা। এমন দিন ছিল যখন বাঙ্গলার গ্রামগুলি অন্যের নিরপেক্ষ ভাবে নিজেদের অভাব নিজেরাই মোচন করিত। বর্ত্তমান যুগে অভাব অনেক বেশী, কার্য্যক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত ও বিভক্ত; সুতরাং তাহা হইতে পারে না; কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের অনেক উন্নতি হইতে পারে, পরিমাণও অনেক বাড়িতে পারে। যদি বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলই গ্রহণ না করিলাম, তবে পাশ্চাত্যশিক্ষায় চোখমুখ ফুটিয়া কি হইল? এমন সব লোকও আছেন যাঁহারা নগরে চাকরী করিয়া কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ ও সামর্থ্য মত থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন, কিন্তু গ্রামে বা "দেশে" যে কিঞ্চিৎ ভূ-সম্পত্তি আছে তাহার খবর পর্য্যন্ত রাখেন না। কালেক্-টারী নামজারি সেরেস্তায় জরীমানা হইলে এই গ্রাম্য উৎপাতটুকু ছাড়িয়া ফেলার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। অন্নসমস্যা ইহাতে তীব্র হইতে তীব্রতর না হইবার কথা কি?

গ্রাম বর্জ্জন ও নগরের পুষ্টিতে এক শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয় যাহারা নিজের ও অন্যের জীবন ক্রমশঃ দুঃসহ করিয়া ফেলে। বাঙ্গালায় আর্থিক

জীবনের ধারা ঠিক সেইদিকে বহিতেছে না সত্য—বড় বড় কলকারখানার শ্রমজীবী অধিকাংশই বাঙ্গালার বাহিরের লোক, কিন্তু তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ এইদিকে দেশটাকে আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা ঠিক হইতেছে না। তাঁহারা পথভ্রান্ত, এই সোণার দেশটাকে মাটী করিতেছেন। প্রকৃত পন্থা গ্রাম্য সমাজের সমবেত সাহায্যে ব্যক্তিগত উদ্যমে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি। ইক্ষু হইতে রস নির্গমনের কল এক্ষণে অনেক গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা ইক্ষু ক্ষেত্রের অধিকারিগণের সমবেত চেষ্টার ফল, অথচ তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে আপন আপন রস বাহির করিয়া লয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি শিল্পের উন্নতি কতকটা এই ভাবেই হইতে পারে। হয়ত' এতটা সহজে নয়; কিন্তু চেষ্টা ও উদ্যম থাকিলে হতাশ হইবার কারণ নাই। যাঁহারা এই ভাবে ত্যাগ ও ভোগনীতির সমন্বয় করিয়া গ্রাম্য সমাজ পুনর্গঠনের চেষ্টা করিবেন, তাঁহারাই বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের প্রকৃত হিতৈষী, তাঁহারাই এই হতভাগ্য দেশে জীবনরক্ষার পথপ্রদর্শক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বসন্ত-শেষে

এলোনা বসন্ত এবার বলছ তুমি কেমন করে'?
কোথায় তুমি ছিলে, আহা, ছিলে তুমি কিসের ঘোরে?
চিরটাকাল যেমন আসে তেম্‌নি করেই সে যে এল,
দ্বারে দ্বারে শিঙার ফুঁয়ে তেমনি করেই ডেকে গেল।
তেম্‌নি রঙীন পত্রে পত্রে রটলো তাহার নিমন্ত্রণ,
তেম্‌নি মুখর করলো ভুবন কুঞ্জবনের গুঞ্জরণ।
কুহুস্বরের শাণিত শর স্মরের সুরের শরাসনে।
তেম্‌নি করেই ছুটলো যেগো বিঁধলো তরুণ প্রাণে মনে।
তেম্‌নি বরণ সেই আয়োজন তেম্‌নি মদির মহোৎসব,
সেই ভূষাবেশ তেম্নি আবেশ তেম্নি হাসির কলরব,
বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে যেমনটি হয় তেম্‌নি হলো,
এলোনা বসন্ত এবার হায়রে কেমন করে' বলো?

ঐ দেখনা হোলীর রঙে লাল হয়েছে পথের ধূলি,
এখনো ঐ আবিরমাখা কুঞ্জশালার দোলনাগুলি।
ঐ দেখনা পলাশবাগে শুকনো কুসুম রাশি রাশি,
এখনো ঐ নতাবধূর ঠোঁটের কোণে জাগছে হাসি।
দেখ দেখি, পাখীর পালক ছিল কি আর এম্‌নি চারু?
এম্‌নি চিকণ পেশল পেলব ছিল কি আর ও দেবদারু?
দ্বারে দ্বারে দুলছে হের শুকনো ম্লান মুকুলমালা,
প্রদীপশিখার রেখাঙ্কিত চুলছে ঘুমে নাট্যশালা।

তরুণ এবং তরুণীদের ডাগর চোখে যাচ্ছে দেখা,
মধুনিশার জাগর-ব্যথা এঁকে গেছে কাজলরেখা।
যেমন করে আসে সে গো তেম্‌নি করেই এসেছিল,
অভীষ্ট সে যাদের, তারা আড়ম্বরেই বরে' নিল।
মদধারায় মাতলো কবী, শিল্পীরা তার আঁকলো ছবি,
দুললো তরী, উড়লো পরী, গাইল প্রেমে প্রেমিককবি।
মহোৎসবে মাতলো তারা জাগলো তারা জ্যোৎস্নানিশা,
একই পাত্রে প্রিয়ার সাথে মধুপ মিটাইল তৃষা।
কাজে দিয়ে জলাঞ্জলি জুটলো সবাই কুঞ্জবনে,
গাইল তারা নাচলো তারা নূপুর-বর সঞ্চরণে।
রঙ বেরঙে বসন্তেরে ভূত সাজালে সবাই মিলে,
কোথায় তুমি ঘুমাচ্ছিলে? কিসের মোহে কোথায় ছিলে?

লাবণ্যে যার পড়লো ভাঁটা, তারুণ্য যার অপগত,
রসের নিঝর শুকাল যার, জীবন যাহার ভারের মত,
চোকঢাকা যে কলুর বলদ সংসারেরি ঘূর্ণীপাকে,
অন্নাভাবে দৈন্যজ্বালায় জীবন যাহার জ্বলতে থাকে,
স্বার্থমোহে মুগ্ধ যেজন, বদ্ধ যেজন বিষয় পাশে
তাদের ফাগুন আসেনাক—মাঘের পরেই বোশেখ আসে
বসন্ত তার এসেছিল বসন্ত যার প্রেমের গুরু
কোথায় পাবে সে, যার প্রাণে মেরুর পরেই মরুর সুরু।

শ্রীকালিদাস রায়।

একটি দিন

(ভ্রমণ)

সেদিন রবিবার—৩০শে জুলাই—কি জানি, কি একটা অজানা বিষাদে আমার হৃদয় ভরিয়াছিল। কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

পূর্ব্বদিন হইতে কোনও হিন্দুস্থানী পর্ব্বোপলক্ষে আমাদের বালিকা-বিদ্যালয় তিন দিনের জন্ত বন্ধ হইয়াছে। কাযের তাড়া নাই; অনেকেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। কিন্তু আমার পক্ষে কায ব্যতীত অলস ভাবে বর্ষার সুদীর্ঘ দিন কাটাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল, অথচ প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না।

বৈকালে একজন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমাকে বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি নীরব রহিলাম। তিনি হয়ত ভাবিলেন, দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের পর সবে মাত্র সেদিন বাড়ী ছাড়িয়া আসায় মনটা খারাপ হইয়াছে। আমি সকলের সঙ্গে বেড়াইতে না গিয়া বোর্ডিংএ একা চুপচাপ বসিয়া থাকি বলিয়া তিনি অনেক তিরস্কার করিলেন।

তাঁহার তিরস্কারে হঠাৎ খেয়াল হইল, কেন এ ছুটিতে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বিন্ধ্যাচল বেড়াইয়া আসি না! তাঁহাকে আমার খেয়ালের কথা বলিলাম। তিনি প্রথমে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন; পরে আমার শরীরের পক্ষে বিন্ধ্যাচল যাওয়া কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না এবং আমি যেন সম্প্রতি তথায় যাইয়া দুঃসাহসের পরিচয় না দিই এইরূপ উপদেশ দিলেন। তবে বিন্ধ্যাচলের অনেক গল্প বলিলেন। তাঁহার গল্পে বিন্ধ্যাচলের প্রতি আমার আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইল; আমি তথায় যাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম যত শীঘ্র পারি ভাল সঙ্গী যুটাইয়া যাইবই।

যিনি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তিনি চলিয়া গেলে, আমার সংকল্পের কথা বোর্ডিংএ একজন শিক্ষয়িত্রীর নিকট বলিলাম। তিনি আমার সঙ্গে পরদিন যাইতে স্বীকৃত হইলেন। আমার মনটা আনন্দিত হইল। পরে আরও অনেক শিক্ষয়িত্রীই সম্মত হইলেন।

আমরা রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া শয়ন করিতে গেলাম। অতি প্রত্যূষে "ট্রেণ"—কথা রহিল, যাঁহার নিদ্রা পূর্ব্বে ভাঙ্গিবে তিনি অপর সকলকে জাগাইয়া দিবেন।

সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না। গভীর রাত্রে মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বারি-বর্ষণ আরম্ভ হইল। আমার সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। ভাবিলাম, হায়! এত আকাঙ্ক্ষা এত আয়োজন সব পণ্ড হইতে চলিল! একাগ্র চিত্তে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। আমার প্রার্থনায় বুঝি বা তাঁহার আসন টলিল।

ঘড়িতে টং টং করিয়া চারিটা বাজিল। তখনও আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া রহিয়াছে। একজন অতি সন্তর্পণে আসিয়া আমার শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। বুঝিতে পারিলাম, আমার ন্যায় তিনিও বিন্ধ্যাচল যাইবার জন্ত ব্যস্ত—কাযেই, আমি নিদ্রিত কি জাগরিত দেখিতে আসিয়াছেন।

আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া মুক্ত বাতায়নে গিয়া দাঁড়াইলাম। কিয়ৎক্ষণ প্রকৃতির এ গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম। সুজলা সুফলা বাংলার কত কথাই স্মৃতি-পথে উদিত হইতে লাগিল। বারবার মনে পড়িতে লাগিল।

"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে;
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি,
পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি।
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।"

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিরাশাব্যঞ্জক স্বরে তিনি আমায় ডাকিলেন। আমি বাহির হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলাম। কহিলাম, "এখনও যথেষ্ট সময় আছে—হয়ত আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

ক্রমে ক্রমে সকলেই শয্যা ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু আকাশের দিকে চাহিয়া কেহই যাইতে সম্মত হইলেন না। আমার উৎসাহ তখনও অটল। যাহা হউক অনেক পরামর্শের পর যাওয়া স্থির হইল।

প্রায় পাঁচটা বাজে—আমি তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার কালে, মাথা ঘুরিয়া চৌকাটে পড়িয়া গেলাম। বাম পায়ে যথেষ্ট আঘাত পাইলাম। এক স্থানে খানিকটা কাটিয়া গর্ত্ত হইয়া গেল। তখন আমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—কয়েক মিনিট মধ্যেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিলাম। প্রথমেই একটা বাধা পাওয়ায় মনটা একটু খারাপ হইয়া রহিল। কাহাকেও কোন কথা বলিলাম না।

বাংলার সম্মুখেই বালিকা বিদ্যালয়ের "Bus" গাড়ী প্রস্তুত ছিল। সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম স্মরণ করিয়া উহাতে চড়িয়া বসিলাম। আমরা যখন ষ্টেশনে পৌছাইলাম তখন ভোরের আলো দেখা দিয়াছে।

প্ল্যাটফরমে প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানা দাঁড়াইয়াই ছিল। টিকেট কিনিয়া উহাতে আরোহণ করিলাম। গাড়ীখানা যথাসময়ে ধীরে ধীরে আপনার গন্তব্য পথে যাত্রা করিল। আমি জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া তৃণাচ্ছিত শ্যামল ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া একমনে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে লাগিলাম। কখন্ যে সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে সে হিসাব আমার ছিল না, হঠাৎ গাড়ী থামায় আমরা একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। চাহিয়া দেখিলাম বিন্ধ্যাচল। হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া সকলের সহিত ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম।

কোথায় আশ্রয় লওয়া যায় তাহাই এক্ষণে চিন্তার বিষয় হইল। আমি একজন পাণ্ডার নাম জানিতাম; তাহার সন্ধান লইতে চাহিলে দুই একজন আপত্তি প্রকাশ করিলেন। কারণ, পাণ্ডা যে ভয়াবহ জীব তাহাতে কেহ সংজে তাহার সংস্পর্শে আসিতে চাহে না।

অগত্যা কোন উপায় না দেখিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা পরে পাণ্ডার সন্ধান লওয়াই স্থির হইল। ষ্টেশনের বাহিরে একদল পাণ্ডা তর্ক বিতর্ক করিতেছিল; তাহাদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, "ঈশ্বর পাণ্ডা কে বলিতে পার?" দল হইতে "দস্ত উচু" এক পাণ্ডা বাহির হইয়া বলিল, "আমি ঈশ্বর পাণ্ডার লোক; চল, তোমাদের তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইতেছি।" তাহার চেহারা দেখিয়াই আমাদের ভক্তি উড়িয়া গেল। কিন্তু একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলাম।

সে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে কিছুই বোঝা যাইতেছিল না। জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও পরিষ্কার ভাবে কোন কথার উত্তর দিতেছিল না। কেবলই অনন্ত পথে চলিয়াছে। সে অনন্ত পথের অবসানও হয় না এবং ঈশ্বর পাণ্ডার বাড়ীও মিলে না।

তাহার ব্যবহারে আমাদের অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইল। আমরা তাহার সহিত আর একপদও অগ্রসর হইতে চাহিলাম না। সে কি এত সহজে ছাড়িতে চায়? অনেক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। তখন একজনের মাথায় একটা উপস্থিত বুদ্ধি আসিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যে আমাদের ঈশ্বর পাণ্ডার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছ, আমরা কিন্তু 'ইশাহী' তা জান তো।"

আমাদিগের বেশভূষা দেখিয়া "ঈশাহি" অর্থাৎ খৃষ্টান মনে করা আশ্চর্য্য ছিল না। তাহার হাতে ছিল একটা জলের কুঁজা—সে তৎক্ষণাৎ উহা সেইখানেই ফেলিয়া দিয়া, "রাম রাম" বলিতে বলিতে একেবারে চম্পট। একবার পশ্চাতে ফিরিয়াও চাহিল না।

অদূরে একটা পিপুল বৃক্ষ ছিল, তাহার তলায় কয়েক খণ্ড প্রস্তর সজ্জিত ছিল। আমরা তথায় উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। স্থির হইল বৃক্ষতলে রান্না করিয়া আহারাদি করা হইবে, পরে সহরের যবতীয় দর্শনীয় বস্তু দেখিতে বাহির হওয়া

যাইবে। বর্ষাকাল—কখন্ আচম্বিতে বৃষ্টি আরম্ভ হয় বলা যায় না। সুতরাং পুনরায় সিদ্ধান্ত হইল, আমাদিগের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।

সঙ্গীদিগের মধ্যে একজনের কোনও আত্মীয় চিকিৎসা ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এস্থানে শান্তিতে জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার গৃহে আশ্রয় লওয়ার কথা হইল। বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া পথে পথে ডাক্তার বাবুর বাটীর সন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোনও সন্ধান মিলিল না। আরও কিয়দ্দূর গমন করিবার পর দুই তিনটী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তাহারা গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে চলিয়াছে। আমাদিগকে কোনও নূতন জীব বিবেচনা করিয়া বোধ হয় তাহারা একটু বিস্মিত হইয়াছিল। একজন অগ্রসর হইয়া, আমরা কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করিল। আমরা তাহাকে ডাক্তার বাবুর বাটীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম। সে সম্মুখস্থ একখানি ছোট দ্বিতল বাটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ডাক্তার বাবুর বাটী দেখাইয়া দিয়া অন্য পথে চলিয়া গেল। আমরা অকূলে যেন কূল পাইলাম। একটি বালক বাটীর সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল। আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া কাছে আসিয়া আলাপ করিল এবং সঙ্গে লইয়া দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত হইল। সেস্থানে বাটীর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। সে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক কষ্টে একজন স্ত্রীলোককে আমাদিগের নিকট লইয়া আসিল। স্ত্রীলোকটি আমাদিগকে দেখিয়া এরূপ হতবুদ্ধি হইলেন যে, কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত তাঁহার বাক্যস্ফূরণ হইল না। পরে বোধ হয় লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমাদিগের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলা হইলে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে আমরা ডাক্তার বাবুর বাটী ভ্রমে জনৈক কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছি। তাঁহার মুখের ভঙ্গিমায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

তখন বেলা বারোটা বাজিতে চলিয়াছে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় সকলেরই কষ্ট হইতেছে। আবার পথে নামিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলাম, এখন কি করা যায়। এক বাঙ্গালী পরিবার যেরূপ অতিথি সৎকার করিলেন, তাহাতে আর দ্বিতীয়বার অন্য কোন বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি রহিল না।

আমাদিগের সঙ্গে একজন দরওয়ানকে আনা হইয়াছিল। যদিও সে অনেকবার এস্থানে তীর্থ করিতে আসিয়াছে, তথাপি এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই। বোধ হয় এইবার নীরব থাকা আর যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না। সে একরূপ জোর করিয়াই তাহার পরিচিত অন্য এক বাঙ্গালী বাবুর গৃহাভিমুখে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল। আমরা যাইতে আপত্তি প্রকাশ করিলে কহিল, সে বাবুর ঐ গৃহে অতিথি হইয়াছে এবং গৃহস্বামী তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। কয়েক মিনিট মধ্যেই আমরা তাহার অভীষ্ট গৃহে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু প্রথমতঃ উহা কোন বাঙ্গালী বাবুর বাটী বলিয়া বিশ্বাস হইতেছিল না। কারণ, উহা সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী ধরণে প্রস্তুত। বাঙ্গালী বাবুর নাম করিয়া হয়ত কোন পাণ্ডার বাড়ী লইয়া আসিয়াছে ভাবিয়া বিরক্তিও প্রকাশ করিতেছিলাম।

অল্পক্ষণ মধ্যেই আমাদিগের সন্দেহ দূর হইল। কয়েকদিন পূর্ব্বে বিবাহোপলক্ষে গৃহস্বামী পরিবার সহ কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন—গৃহের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছেন দুইজন দাস দাসী। তাহারা আমাদিগকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল। এরূপ অভ্যর্থনা করিতে বোধ হয় ভদ্রনামধারী অনেক শিক্ষিত পরিবারও জানেন না।

গৃহের বারান্দায় জিনিষাদি নামান হইল। দরওয়ান পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। আমরা চা পান করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অনতিদূরে ভাগীরথী কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছেন। আমরা গঙ্গাস্নানের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। অপরিচিত স্থানে জিনিষাদি রাখিয়া সকলের একত্র যাওয়া উচিত নহে বিবেচনায় দুইজন গৃহে রহিলেন এবং আমরা পরিচারিকাকে পথ দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত সঙ্গে লইয়া চলিলাম। একটা রাস্তায় মোড়ে আসিয়া সে কহিল,

গঙ্গায় স্নানের দুইটি ঘাট আছে, একটি কাঁচা এবং অপরটি সান বাঁধান? আমরা কোন ঘাটে স্নান করিব? আমরা ভাবিলাম, কাঁচা ঘাটে সান বাঁধান ঘাট হইতে লোক সমাগম অনেক কম হইবে। সুতরাং ঐ ঘাটে স্নান করাই যথেষ্ট সুবিধাজনক। সে আমাদিগের কথানুসারে কাঁচা ঘাটে লইয়া গেল বটে, কিন্তু ঘাটের অবস্থা দেখিয়া কাহারও নামিতে সাহসে কুলাইল না। কারণ প্রতি মুহূর্ত্তে পদস্খলন হইয়া গঙ্গার অতল সলিলে চিরতরে নিমজ্জিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সে স্থান হইতে পুনরায় সান বাঁধান ঘাট অভিমুখে চলিলাম। এ ঘাটটা বেশ সুন্দর; গঙ্গাবক্ষে বহুদূর পর্য্যন্ত সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে। সেদিন কি একটা যোগ থাকায় অনেক লোক গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিল। আবার এস্থানে আসিয়া ভাবনা হইল, কিরূপে এত লোকের সম্মুখে স্নান করিব? অথচ স্নান না করিলেই নহে। বাটীতে যে দুইজন অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে আনিয়া একসঙ্গে স্নান করা উচিত বিবেচনা করিয়া বাটীতে ফিরিয়া চলিলাম।

একে স্থান নূতন—তদুপরি কেবলি গলির পর গলি অতিক্রম করিতে হয় এবং প্রত্যেকটী গলি একই প্রকারের; সুতরাং পথ ভুল হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। অনেক কষ্টে পথ চলিয়া বাড়ী আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া ঘাটে গেলাম।

তখন অনেকেই স্নান সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করায় ঘাটটা বেশ একটু নির্জ্জন হইয়াছিল। কেবলমাত্র জন কয়েক পাণ্ডা তীরে চৌকী পাতিয়া বসিয়া সিন্দুর ও গঙ্গামৃত্তিকা সাজাইয়া যাত্রীদিগের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল। যাত্রীরা স্নানান্তে উপরে আসিলে তাহাদিগকে ফোঁটা দিয়া পয়সা আদায় করিতেছিল।

আমরা জলে নামিবার কয়েক মিনিট পরই আকাশের পশ্চিম প্রান্ত কালোমেঘে ঢাকিয়া গেলএবং সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। গঙ্গার স্রোতের সহিত বৃষ্টির বিন্দু মিশিয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আমরা জলে দাঁড়াইয়া তন্ময় চিত্তে সে শোভা দেখিতেছিলাম। উপর হইতে দুই এক ব্যক্তি আমাদিগকে তীরে উঠিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আহ্বান করায়, আমাদিগের জ্ঞান হইল আর জলে থাকা নিরাপদ নহে। আমরা তীরে উঠিলাম।

তীরে একখানি গোলপাতার কুঁড়ে ঘর ছিল; আমরা তথায় আশ্রয় লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কখন্ বৃষ্টি থামে। ইচ্ছা, বৃষ্টি থামিলে ফিরিব। যখন একঘণ্টা পরও বৃষ্টি থামিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল, তখন বাধ্য হইয়াই বৃষ্টি মাথায় করিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিতে হইল।

অনেক কষ্টে বৃষ্টিতে ভিজিয়া পথ চলিয়া বাড়ী ফিরিলাম এবং আহারাদি করিয়া জিনিষাদি প্যাক করিয়া লইয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম। আমরা যেস্থানে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহার নিকটেই বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির। আমরা সর্ব্বাগ্রে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির দেখিতে গেলাম। মন্দিরটি একটী ছোট গলির মধ্যে অবস্থিত। মন্দির লোকে লোকারণ্য; প্রবেশ করে কাহার সাধ্য! তথাপি নিরুৎসাহ না হইয়া আমি ও আর একজন প্রবেশের উদ্যোগ করিলাম। বারান্দায় জনৈক বিপুলকায় পাণ্ডা যাত্রীর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল; সে আমাদিগের নিকট আসিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, "দেবীকে পাঁচ সিকা না দিলে ভিতরে যাইতে পারিবে না। তোমাদের পাণ্ডা কে?" তাহার গম্ভীর স্বর শুনিয়া এবং বিপুলায়তন দেহ দেখিয়া ভিতরে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা তদ্দণ্ডেই মিটিয়া গেল, পাঁচ সিকা দেওয়া ত দূরের কথা।

আমরা ধীরে ধীরে অন্য পথে রওনা হইলাম। দরওয়ান এতক্ষণ আমাদিগের জিনিষ বহন করিয়া বেড়াইতেছিল। ষ্টেশনের নিকটেই তাহার পাণ্ডার বাড়ী; সে পাণ্ডাবাড়ী জিনিষগুলি রাখিয়া আসিল এবং সহর দেখিয়া ফিরিলে উহা লওয়া যাইবে স্থির রহিল।

এক্ষণে কোন্ দিকে যাওয়া যায় সকলে বলাবলি করিলেন। বহুবার কলিকাতা হইতে পশ্চিম যাইবার পথে ট্রেণ হইতে "বিন্ধ্য পর্ব্বত" এবং তদুপরিস্থ একখানি ধবলকায় মনোহর বাড়ী দেখিয়াছি। কতবার সাধ

গিয়াছে বিন্ধ্যপর্ব্বতোপরিস্থ ঐ বাড়ীর উপর হইতে প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নয়ন সার্থক করি। এত দিন সে সুযোগ হয় নাই এবং হইবার আশাও ছিল না। তাই তাড়াতাড়ি মনে পড়িয়া গেল, আজ কেন মনের সে সাধ পূর্ণ করিয়া লই না। আমার প্রস্তাবে সকলেই স্বীকৃত হইলেন। পর্ব্বতটা ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে। বেলাও দেড়টা প্রায়; খুব জোরে পথ চলিতে লাগিলাম। মাইল দুই আন্দাজ চলিয়া ২।১ জন বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। গাড়ীর সন্ধান করিলেন; ঐরূপ স্থানে গাড়ী না মিলায় তাঁহাদিগকে পদব্রজেই যাইতে হইল।

দুইজন ব্যতীত আমরা সকলেই অল্পক্ষণ মধ্যে পর্ব্বতস্থিত বাটীর নিকটেই উপস্থিত হইলাম। বাটীর সম্মুখে একটা বটবৃক্ষে দোলনা প্রস্তুত করিয়া উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া একদল পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক মনের আনন্দে দোল খাইতেছিল। আমাদিগকে দেখিতে পাইবামাত্র দোলনা হইতে নামিয়া নিকটে আসিয়া অনেক আদর যত্ন প্রদর্শন করিল এবং বাটীর ভিতর যাইবার জন্ম অনুরোধ করিল। তাহারা আমাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেও, তাহাদিগের আকার প্রকারে আমাদিগের মনে একটা খারাপ ধারণা জন্মিয়াছিল; কাযেই তাহাদিগের অনুরোধ মত বাটীর ভিতর প্রবেশ করা ন্যায়সঙ্গত মনে হইল না। দীর্ঘ পথ চলিয়া অতিশয় তৃষ্ণা পাইয়াছিল; তাহাদিগের নিকট জল চাহিলাম। তাহারা তৎক্ষণাৎ একটা পরিষ্কার ঘটীতে জল আনিয়া দিল। আমরা তাহা পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিয়া, অপর দুইজনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

তাঁহারা আসিলে বাটীর ছাদে উঠিলাম। তথা হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য কি সুন্দরই দেখাইতেছিল! উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ—নিম্নে ভাগীরথী আঁকিয়া বাঁকিয়া অজানা দেশের উদ্দেশে চলিয়াছেন। আকাশের একপ্রান্ত যেন গঙ্গার সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

বর্ষাকাল—প্রতি মুহূর্ত্তে আকাশের রং পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্ট বাতাস বহিয়া প্রাণ মন আকুল করিতেছিল। কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই সমস্ত আনন্দ উৎসাহ পশ্চাতে ফেলিয়া, আবার বোর্ডিংএর সীমাবদ্ধ নিয়মের মধ্যে যে আপনাদিগকে ধরা দিতে হইবে সে কথা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। এইবার ধীরে ধীরে ষ্টেশনে গিয়া বিশ্রাম করা যাইবে অনেকের মত হইল। আসিবার পূর্ব্বরাত্রে একজন বলিয়া দিয়াছিলেন, বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপর একটী কৃত্রিম হ্রদ আছে, হ্রদটির নাম "গেরুয়া তালাও"। উহার জল গেরুয়া রঙের, জলের বর্ণানুসারেই হ্রদের নাম হইয়াছে "গেরুয়া তালাও"; আমরা যেন উহা দেখিয়া আসি।

তখনও যথেষ্ট সময় ছিল-ট্রেণের নিমিত্ত ষ্টেশনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত। সুতরাং ষ্টেশনে না ফিরিয়া "তালাও" দেখিতে চলিলাম। পথ চিনিয়া তথায় পৌছিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। কারণ, পরদিন "তালাওয়ে" একটা বড় মেলা থাকায় সহর হইতে বিক্রয়ের নিমিত্ত নানাবিধ জিনিষাদি লইয়া অনেক লোক যাইতেছিল, আমরাও তাহাদের সঙ্গ লইলাম। হ্রদটী প্রকৃতপক্ষেই দেখিবার বস্তু! যদিও বিশেষ বড় স্থান নহে, তথাপি তার সুন্দর। চারিধার বাঁধান। পথিকদিগের বিশ্রামার্থ হ্রদের নিকট প্রস্তর নির্ম্মিত বসিবার আসন রহিয়াছে। বহুবিধ বৃক্ষরাজি আসনগুলিকে বেষ্টন করিয়া আছে। যেন সুশীতল ছায়াদান করিয়া প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ হইতে পথিকদিগকে রক্ষা করাই তাহাদিগের একমাত্র কার্য্য। আমরাও সেই প্রস্তরনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিয়া হ্রদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। মৃদু মৃদু বাতাসের সহিত দুই এক বিন্দু বৃষ্টি আমাদের গায়ে পড়ায় আনন্দই হইতেছিল। একজন গান ধরিলেন—

"যাবনা, যাবনা, যাবনা, ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে।
ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয়
ছুলে ছুলে ফুল বলে আমায়।"

গান শেষ হইলে আমরা আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলাম। আমরা যেপথে পাহাড়ে আসিয়াছিলাম, সে পথে না ফিরিয়া অন্যপথে ফিরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, যেহেতু তাহা হইলে "অষ্টভুজা" দেবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যাইতে পারিব। দেশ দেশান্তর হইতে কত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি কষ্টস্বীকার করিয়া বিন্ধ্যাচলে দেবী দর্শন করিতে আসেন, আর আজ আমরা এমন সুযোগ হেলায় হারাইব ভাবিতেও ব্যথা পাইলাম।

একবার "বিন্ধ্যবাসিনীর" মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইয়া যে শিক্ষালাভ করিয়াছি, এত অল্পসময়ে তাহা বিস্মৃত হইয়া, পুনরায় "অষ্টভুজার" মন্দিরে যাইবার সংকল্প করায় অনেকে হাসিলেন বটে; কিন্তু একজন এমন ক্রুদ্ধ হইলেন যে তিনি ভিন্নপথে কিছুতেই ফিরিবেন না জেদ ধরিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলের সহিত পূর্ব্বপথে ফিরিতে বাধ্য হইলাম। "গেরুয়া তালাওয়ের" সন্নিকটেই একটা বকুল বৃক্ষ ছিল, তাহা হইতে অজস্র ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল। শৈশবের একটা গান মনে আসিল,—

"ঝর ঝর ঝরছে বকুল ফুরফুরে হাওয়ায়
ফুলকুমারী ঘুমিয়ে পড়েছে লতায় পাতায়।"

আমি ফুল কুড়াইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আঁচল ভরিয়া ফুল কুড়াইয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। মনটা কিন্তু বিরক্তিতে পূর্ণ রহিল।

ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিয়া দরওয়ান পাণ্ডার বাড়ী জিনিষ আনিতে চলিল। আমরা সকলে ষ্টেশনে প্রবেশ করিলাম। "অষ্টভুজা" দেবীকে দর্শন করিতে না পারিয়া এত দুঃখ হইতেছিল যে, সবাই নিষেধ করা সত্ত্বেও দরওয়ানের সহিত পুনর্ব্বার "বিন্ধ্যবাসিনী"কেই দেখিতে চলিলাম।

প্রায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে—যাত্রীরা একে একে মন্দির হইতে বিদায় লইয়াছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে কেবলমাত্র কয়েকজন স্ত্রীলোক বিক্রয়ার্থ পূজোপকরণ লইয়া বসিয়া আছে। দরওয়ান এবং আমি উভয়েই তাহার পাণ্ডার সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিব স্থির করিলাম। তাহার পাণ্ডা নাকি অতি ভদ্র, সে কখনও যাত্রীদিগকে টাকাকড়ির নিমিত্ত উত্যক্ত করে না, যে যাহা স্বেচ্ছায় প্রদান করে তাহাই সে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে ইত্যাদি অনেক কথাই সে আমাকে বলিল। আমিও তাহা সরল অন্তঃকরণেই বিশ্বাস করিয়া লইলাম। একবার সন্দেহও হইল না যে পাণ্ডাজাতীয় জীবকে বিশ্বাস করিতে নাই।

মন্দিরে প্রবেশের পর কয়েকজন পাণ্ডা আমাকে টাকার জন্য বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যে টাকা চার্জ্জ করিল আমি তাহা দিতে একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। আমার সঙ্গে যথেষ্টই টাকা আছে পাণ্ডারা জানিতে পারিয়াছিল। কাযেই তাহাদিগের টাকা দিবার পীড়াপীড়িতে আমার মনে বেশ একটু ভয় হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা যাহাতে মুখে প্রকাশ পাইতে না পায় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। এদিকে দরওয়ানকেও নিকটে দেখিতে পাইলাম না। বাহিরে পাণ্ডারা তাহার সহিতও গোল করিতেছে বুঝিতে পারিলাম। তাহাদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত একটা ফন্দী বাহির করিলাম। বলিলাম, "আমার নিকট দশ টাকার নোট আছে; পাশের দোকান হইতে নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা আনিয়া দিতেছি।" তাহারা ইহা বিশ্বাস করিল। নোট ভাঙ্গাইবার ফাঁকি দিয়া একটা ছোট দরজা দিয়া আমি মন্দিরের বাহিরে আসিলাম।

হয়ত পাণ্ডারা টাকার জন্য আমার সঙ্গ লইবে ভাবিয়া পরিচিত পথ ছাড়িয়া গঙ্গার তীর ধরিয়া বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। সন্ধ্যাকাল—অপরিচিত স্থানে পথ ঘাট কিছুই জানি না। বেশ বৃষ্টিও পড়িতেছিল; সুতরাং আমার কষ্টের অবধি ছিল না। মনে যথেষ্ট ভয়ও ছিল—পাণ্ডারা বিলম্ব দেখিয়া যদি অনুসরণ করে!

ভর সন্ধ্যায় আমাকে বৃষ্টিতে পথ চলিতে দেখিয়া বোধহয় রাস্তায় দুই একজন হিন্দুস্থানী ব্যক্তির মনে দুঃখ হইতেছিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছিল, আমি

পথ হারাইয়াছি কি না এবং কোথায় যাইব। আশ্চর্য্যের বিষয়, দূরে দাঁড়াইয়া ভদ্র বেশধারী এক বাঙ্গালী যুবক তামাসা দেখিতেছিলেন।

নিরাপদে ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। আমাকে একা ফিরিতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে তাঁহারা একাধারে আমার সাহসের প্রশংসা করিলেন বটে, আবার তিরস্কারও করিলেন।

এদিকে আমাকে মন্দিরে দেখিতে না পাইয়া দরওয়ানের মনে অতিশয় ভয় হইল। যে পথগুলিতে আমার যাওয়া সম্ভব হইতে পারে সে পথগুলিতে আমার অনুসন্ধান করিল। এমন কি পথে যাহার দেখা পাইল তাহাকেই আমার কথা জিজ্ঞাসা করিল। যখন কোন সন্ধানই মিলিল না, এক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত তখন ভয়ে ভয়ে বিমর্ষমুখে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তথায় আমাকে নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

সময় হইয়া আসিলে "রেলওয়ে" সেতু পার হইয়া ওপারে গিয়া ট্রেণের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। কি ভিড়! এরূপ ভিড় ঠেলিয়া ট্রেণে চড়া সহজসাধ্য নহে ভাবিয়া ভয় হইতে লাগিল। যাহা হউক কোন প্রকারে ট্রেণ ছাড়িবার সঙ্গেই মনটা খারাপ হইয়া গেল। যেহেতু বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত "বিন্ধ্যাচল ভ্রমণ" আজও আমার অসম্পূর্ণই থাকিয়া গেল।

যথাকালে ট্রেণ খানি আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিল। ষ্টেশনের বাহিরে স্কুলের "Bus" আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; তাহাতে চড়িয়া আবার নিরানন্দ "বোর্ডিং হাউসে" ফিরিয়া আসিলাম।

তখন রাত্রি সাড়ে দশটা প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎও চমকাইতেছিল। মনে পড়িল—

"ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
সে কথা এজীবনে রহিয়া গেল মনে,
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।"

"বঙ্গনারী"।

মুক্তিনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হৃদয়কৃষ্ণের দোকানের বারান্দায় আমাদের আশ্রয় স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বারান্দার সমস্ত দৈর্ঘ্য নূতন কম্বল দ্বারা আবৃত হইল, যেন কোন মতে বাহিরের বাতাস না আসিতে পারে। বারান্দার একস্থানে [illegible]য়োজন হইল।

[illegible]জী প্রথমতঃ একটু অসুস্থ বোধ করিতে-[illegible] কুইনিন্ পিল ও কিছু চা সেবনান্তে [illegible]বোধ করিতে লাগিলেন।

[illegible]দ দিয়া জঠরানল নিবৃত্ত করিতে হইয়া- [illegible] ভূরিভোজন। ষোড়শোপচারে না হউক অন্ততঃ দশোপচারে উদর দেবতার পূজা শেষ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

১২ই মার্চ্চ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিলাম। আজ আরুঘাটে অবস্থান করিয়া বুড়ী গণ্ডকীতে স্নান এবং সমস্ত দিন বিশ্রাম গ্রহণ জন্য হৃদয়কৃষ্ণ অনুরোধ করিলেন। তাঁহার ভদ্রতা ও আতিথেয়তার উপর আর দাবী করা অসঙ্গত—বিশেষতঃ আমরা এখও পথশ্রান্ত হই নাই। আতিথেয়তা ও ভদ্রতার জন্য হৃদয়কৃষ্ণকে ধন্যবাদ দিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলাম।

ত্রিশূলী হইতে আগত সঙ্গী কনেষ্টবলকে এখান

হইতে বিদায় দিলাম। নয়াকোটের কর্ম্মচারীর নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম যে আমি স্বেচ্ছায় কনেষ্টবলকে বিদায় দিতেছি এবং আমার লোকের প্রয়োজন হইলে গোর্খা হইতে আনাইয়া লইব।

সাত ঘটিকার সময় আরুঘাট ত্যাগ করিয়া এগারটায় খান্চোক বস্তিতে পৌছিলাম। সমগ্র পথ অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া—ত্রিশূলী হইতে চৌরঙ্গীফেদী পর্য্যন্ত পথের ন্যায় একটী অপ্রশস্ত পর্ব্বতের উপর খান্চোক অবস্থিত। নিকটে কোনও নদী নাই। দূরে একটী ঝরণা আছে। কাঠমণ্ডু সহর হইতে গোর্খা সহর পর্য্যন্ত পথ খান্চোক হইয়া দক্ষিণে গিয়াছে। আমাদিগকে এখান হইতে এই পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে পোখরা যাইতে হইবে।

গাইড্ ও ভারিয়া বেলা বারটা ত্রিশ মিনিটে আসিয়া পৌছিল। ঝরণার জলে স্নানান্তে প্রায় সাড়ে তিনটায় আহার শেষ করা গেল। এখন যাত্রা করিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোনও আশ্রয় স্থানে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় এখানেই রাত্রি বাস স্থির করিলাম।

অপরাহ্ণে বস্তির মধ্যে বেড়াইতে গেলাম। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই গৃহসংলগ্ন চালায় একখানি তাঁত। স্ত্রীলোকেরাই তুলা পেঁজে, চরকায় সুতা কাটে এবং তাঁতে কাপড় বুনায়।

গোর্খার পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটী টিলা। এই টিলায় উঠিলে উত্তর দিকে একটী তুষার শৃঙ্গ দৃষ্ট হয়। চন্দ্রকিরণ-সম্পাতে তুষার শৃঙ্গের কিরূপ শোভা হয় দেখিবার জন্য, যথেষ্ট শীতবস্ত্রে আবৃত হইয়া সন্ধ্যার পর এই টিলায় উঠিলাম। অদ্য শুক্লা চতুর্দ্দশী, আকাশও খুব নির্ম্মল। অনেকক্ষণ টিলার উপর বসিয়া তুষার শৃঙ্গের শোভা দেখিয়া ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি নিম্নতলে এক হিন্দুস্থানী সাধুর সহিত এক নেপালী কুলীর বিষম বিবাদ উপস্থিত। কুলী সাধুকে প্রহার করিতে উদ্যত। ব্রহ্মচারীজী সেখানে উপস্থিত এবং বিবাদ মীমাংসায় ব্যস্ত, কিন্তু কুলী একটু মাতাল ছিল, সে নেশার ঝোঁকে কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেছিল না। যাহা হউক শেষে মুখামুখিতেই বিবাদ শেষ হইয়া গেল, "হাতাহাতি" পর্য্যন্ত গড়াইল না।

মধ্য রাত্রে আমাদের কোঠায় এক উপদ্রব। কেহ কোঠায় প্রবেশ করিয়াছে টের পাইয়া দেশলাই জ্বালাইয়া দেখি যে এক নেপালী বালক আমাদের কোঠার মধ্যে। সে বলিল অন্ধকারে ভুল করিয়া আমাদের কোঠায় ঢুকিয়াছে। সে চলিয়া গেল এবং বাকী রাত্রটুকু নিরুপদ্রবেই অতিবাহিত হইল।

১৩ই মার্চ্চ ভোর ৬টায় রওয়ানা হইলাম। আজ দোল পূর্ণিমা; এদেশেও অষ্টমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আবির খেলা চলে। আবির খেলার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বে রাজপথে অশ্লীল গান ও স্ত্রীলোক দেখিলে তাহার প্রতি কুৎসিৎ রসিকতা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু মন্ত্রী জং বাহাদুর বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া (১৭৫১ খ্রীঃ) রাজবিধিদ্বারা হোলির এই সমস্ত অশ্লীল ব্যাপার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

হোলি শ্রীকৃষ্ণের উৎসব। তাঁহার উৎসবে যদিও জীবহত্যা নিষেধ, তথাপি দলে দলে পাহাড়ীয়া স্ত্রী পুরুষেরা আবিরলিপ্ত মুখে হাঁস, মুরগী, কবুতর লইয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে দেবীর মন্দিরে যাইতেছে দেখিলাম। সেখানে দেবীর প্রীত্যর্থে এই সমস্ত পক্ষী বধ করা হইবে।

বেলা ৯টার সময় দারমদী নদী পার হইয়া নয়া সাকু নামক স্থানে পৌছিলাম। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সন্ন্যাসীদ্বয় ও ভৈরবী পাঁচ জনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা ভিক্ষার জন্য বস্তির মধ্যে গেলেন, আমরা নদী তীরে বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাইড ও ভারিয়া আসিয়া পৌছিল। নদীতে স্নান করিয়া চিঁড়ে ফলার করা গেল। চাউল কি অন্য কিছু এখানে মিলিল না।

ফলারের সময় দেখা গেল যে ব্রহ্মচারীজীর পিতলের

গ্রাসটী নাই। অনুমান হইল যে বালক গত রাত্রে কোঠায় প্রবেশ করিয়াছিল সেই চুরি করিয়াছে। অনুমান পর্য্যন্তই সার হইল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম অন্তে বেলা সাড়ে বারোটার সময় নয়াসাকু হইতে যাত্রা করিলাম। কিছু দূর নদীর কূলে কূলে যাইয়া আবার পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম।

বেলা আড়াইটার সময় খুবলাঙ্গ অধিত্যকায় পৌছিলাম। খুবলাঙ্গ একটী পার্ব্বত্য সহর, ত্রিশূলী অথবা আরুঘাট হইতে অনেক অনেক উচ্চে। কাঠমুণ্ড হইতে "দৌড়া হাকিম" (Circuit Judge) এখানে আসিয়া কয়েক দিন যাবৎ কাছারী করিতেছেন। একখণ্ড পরিষ্কার স্থানে এক সামিয়ানার নীচে সতরঞ্চ বিছান, আমাদের দেশে যেমন যাত্রা গানের আসর। সতরঞ্চের উপর মাঝখানে একখানা ইজি চেয়ারে হাকিম বাবু গঙ্গাবাহাদুর উপবিষ্ট। কেহ কেহ সতরঞ্চের উপর বসিয়াছে, অধিকাংশই সতরঞ্চের কিনারায় দণ্ডায়মান। অনেক লোক আবার দলবদ্ধ হইয়া কাছারী হইতে দূরে বসিয়া কি দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মোকর্দ্দমা অরম্ভ হইলে আসিবে।

আমরা একটু দূর হইতে কাছারী দেখিয়া সহরের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। দুই একজন আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। একজন পরিচয় শুনিয়া রহস্য করিয়া বলিল, "বাঙ্গালীবাবু পাহাড়ীয়া বন্‌গিয়া"।

এখনও যথেষ্ট বেলা আছে, আমরা অগ্রসর হইতে পারি, বিশেষতঃ হাকিম উপস্থিত থাকাতে অর্থী প্রত্যর্থী এবং সাক্ষীতে অনেক লোক খুবলাঙ্গে একত্রী হইয়াছে, সুবিধা মত আশ্রয় স্থান নাও জুটিতে পারে—এই আশঙ্কায় খুবলাঙ্গ ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম। কাছারী হইতে এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গী হইল।

খুবলাঙ্গ হইতে "উৎরাই"এর পর বাম দিকের পাহাড়ে "চড়াই" না করিয়া, আমাদের নূতন সঙ্গী এক ক্ষীণ জলস্রোতের তীর দিয়া চলিল। কিছু দূর যাইয়া দেখি ডান দিক হইতে অপর একটি পর্ব্বত প্রথমোক্ত পর্ব্বতের সহিত মিলিত হওয়ায় একটি স্বাভাবিক তলাবর্ত্মের সৃষ্টি হইয়াছে। এই তলাবর্ত্মের মধ্যদিয়া জলস্রোত প্রবাহিত। পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। বেলা ৩টায় সেখানে অন্ধকার, তারপর দুইদিকে এবং মাথার উপর পর্ব্বত থাকাতে ক্ষীণ জলস্রোতও এক ভীষণ গর্জ্জনের সৃষ্টি করিয়াছে। মনে যে অকারণ ভয়ের উদ্রেক ও না হইয়াছিল এমন নহে। ভগবানের নাম মনে মনে স্মরণ করিয়া, সঙ্গীর পশ্চাতে চলিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে এই অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া সূর্য্যালোক দর্শন ও মুক্ত বায়ু সেবন করিলাম। সঙ্গী বলিল যে বাম দিকের পর্ব্বতের উপর দিয়া আসিলে যে সময় লাগিত, তাহা অপেক্ষা আমরা প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়াছি এবং "চড়াই উৎরাই" করিতে হয় নাই। বর্ষাকালে এই পথে যাওয়া যায় না, তখন প্রত্যেককেই পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে হয়। যে পথে আমরা আসিলাম এই জাতীয় পথের নাম "পাকদণ্ডী।"

এক পর্ব্বতের "চড়াই উৎরাই" হইতে অব্যাহতি পাইলে কি হইবে? সম্মুখে দ্বিতীয় পর্ব্বত। সঙ্গী আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিকটবর্ত্তী অন্য পর্ব্বতে তাহার বাড়ী গেল, আমি ও ব্রহ্মচারীজী আমাদের সম্মুখস্থ পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম।

পর্ব্বতের অধিত্যকায় সুইটেল ভঞ্জন বস্তিতে বেলা সাড়ে চারিটার সময় পৌছিলাম। এখানে একটী ধর্ম্মশালা আছে, তাহার দ্বিতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ব্রহ্মচারীজী আজ আবার একটু অসুস্থ বোধ করিতেছিলেন। এক ঘণ্টা পরে গাইড্ ও ভারিয়া আসিয়া পৌছিল। চা প্রস্তুত হইল, কুইনিন পিল ও চা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারীজী সুস্থ হইলেন। যদিও আজ পূর্ণিমার নিশি, বিশেষতঃ দোল পূর্ণিমা, এবং ব্রহ্মচারীজীও পরমবৈষ্ণব, তথাপি নিশিপালনের উপযুক্ত উপকরণের অভাবে ভাত ও তরকারী দ্বারাই উভয় নিশিপালন করিলাম।

১৪ই মার্চ্চ অতি প্রত্যুষে যাত্রার উদ্যোগ করিলাম, কিন্তু যাত্রায় এক বিঘ্ন ঘটিল। গত রাত্রে যে গৃহস্থের নিকট হইতে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করা হইয়াছিল তাহাকে হিসাব বুঝানই এই বিঘ্ন। আমাদের দেশে আট আনার জিনিষ ক্রয় করিয়া এক টাকা দিলে দোকানদার তাহার প্রাপ্য আট আনা রাখিয়া বাকী আট আনা ফিরাইয়া দেয়। এদেশে নেওয়ার দোকানদারেরা এ হিসাব বেশ বোঝে, কিন্তু পাহাড়ীয়ারা বোঝে না। তাহার আট আনা পাওনা হইলে তাহাকে আট আনা দিতে হইবে। এক টাকা দিয়া প্রথমে তাহার নিকট হইতে ষোল আনা লইতে হইবে, পরে তাহার প্রাপ্য তাহাকে দিতে হইবে। টাকা রাখিয়া আট আনা প্রত্যর্পণ করিলেও যে চলে এ হিসাব বোধ তাহার নাই। সকলেই যে এইরূপ তাহা নহে, তবে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এইরূপ একজন "অবুঝ"এর সহিত গত রাত্রে আমাদের কারবার করিতে হইয়াছিল। তাহার নিকট ষোল আনা নাই, কিন্তু আমাদের যাহা অবশিষ্ট প্রাপ্য তাহা আছে। দোকানদারকে হিসাব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, সমস্ত দিনেও বুঝান যাইবে না। তখন আমার অবশিষ্ট প্রাপ্য প্রথমে লইয়া তাহাকে দুই মোহর দিলাম। সে কিছুতেই হিসাব বুঝিল না, তখন ব্রহ্মচারীজী বলিলেন যে আমরা তীর্থ করিতে মুক্তিনাথ যাইতেছি তাহাকে ঠকাইবার জন্য এত দূরদেশ হইতে এখানে আসি নাই। ব্রহ্মচারীজীর বাক্যে তাহার আপত্তি নিরস হইল এবং "ঠিকছুয়া বাবাজী" বলিয়া মোহর দুইটী গ্রহণ করিল।

৫,৩৫ মিঃ সুইটেল ভঞ্জন ত্যাগ করিলাম। ৯,৪৫ মিঃ মারছানডী নদী তীরে উপস্থিত হইলাম। নদীতীরস্থ বাজারটী আজ আঠার দিন পুড়িয়া গিয়াছে। দোকান দারেরা এখনও ঘর দরজা নির্ম্মাণ কি দোকানের দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করিতে পারে নাই। আমরা নদীর কূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম এবং স্নান সমাপনান্তে গাইড্ ও ভারিয়ার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

ত্রিশূলীর পশ্চিম তীর হইতে মারছানডীর পূর্ব্ব তীর পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত প্রদেশের নাম গোর্খা প্রদেশ (Province of Gorkha)

বেলা সাড়ে ১২টার গাইড্ ও ভারিয়া আসিয়া পৌঁছিল। নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে পাকের উদ্যোগ ছিল। ভোজন ও বিশ্রাম অন্তে ৪ঘটিকার সময় মারছানডীর পূর্ব্ব তীর ত্যাগ করিলাম।

মারছানডীর উপর একটী লৌহ সেতু আছে। পুল পার হইয়া নদীর পশ্চিম তীর দিয়া উত্তর দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইলাম। এখন আমাদের সম্মুখে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে প্রবাহিতা একটী বিস্তীর্ণ কিন্তু স্বল্পতোয়া নদী। পাহাড়ীয়ারা প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করিয়া নদীর স্থানে স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া মাছ ধরিতেছিল। গাইডের কথামত দুইজন পাহাড়ীয়া একটী বাঁধের দুই ধারে জলের মধ্যে ধীরে ধীরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল, আমি উহাদের কাঁধে হাত রাখিয়া অতি সন্তর্পণে বাঁধের উপর দিয়া নদী উত্তীর্ণ হইলাম।

নদীর উত্তর পারে আমাদের সম্মুখে একটী খাড়া অনুচ্চ পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের উপর দিয়া পথ। পর্ব্বত গাত্র হইতে জল চোয়াইয়া নদীতে পড়িতেছে এবং সেই চোয়ান জলে পর্ব্বতে উঠিবার পথটী অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে।

অতি সাবধানে পর্ব্বতে উঠিলাম। নদী পার হইতে যেমন পাহাড়ীয়াদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র পর্ব্বতে আরোহণ করিতেও গাইডের হস্তধারণ করিতে হইয়াছিল।

পর্ব্বতের উপর দুইটি পথ, একটী উত্তর দিকে লামযুঙ্গ গিয়াছে, অপরটী পশ্চিম দিকে মানচৌকা বাজারে গিয়াছে। মানচৌকা সমতলে নদীর কূলে। একটু অগ্রসর হইলেই মানচৌকা দূরে দেখা গেল। যে নদীটী পার হইয়া পর্ব্বতে উঠিয়াছিলাম, আবার সেই নদীটী পার হইয়া বেলা ৫-৪৫ মিঃ মানচৌকা বাজারে আসিলাম।

মানচৌকা বাজারটী ছোট। পথের উভয় পার্শ্বে কিছু ফাঁকা জায়গা, তাহার পর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কয়েক

খানা দোকান। স্থানটী খুব নির্জ্জন বলিয়া মনে হইল।

বাজারে প্রবেশ করিতে করিতে দুইটী বালক সারিন্দা বাজাইয়া এক অবোধ্য ভাষায় গান গাইতে গাইতে আমাদের অনুসরণ করিল। আমরা এক নেওয়ারের দোকানের বারান্দায় রাত্রিবাসের আয়োজন করিলাম। বালকদ্বয় বারান্দার নীচে বসিয়া গান করিতে লাগিল।

খাঞ্চোকে মাতাল নেপালী কুলি দেখিয়াছিলাম, আর মান্‌চৌকায় মাতাল নেপালী ভদ্রলোক দেখিলাম। পোষাকে ও চেহারায় এব্যক্তিকে ভদ্রলোক বলিয়াই অনুমান করিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ মত্তাবস্থা। আমাদের নিকটে আসিয়া বালক দুইটাকে কিছু দিতে বলিল। আমি তামাসা দেখিবার জন্য সেই কার্য্যটী তাহাকেই করিতে বলিলাম। সে তৎক্ষণাৎ দুই বালককে দুইটী পয়সা দিল। বালকেরা কিন্তু আমাকে কিছুতেই অব্যাহতি দিল না, যৎকিঞ্চিৎ আদায় করিয়া স্থান ত্যাগ করিল। আমরাও কিছু জলযোগান্তে রাত্রের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম।

১৫ই মার্চ্চ ভোর ৫-৩০ মিঃ যাত্রা করিলাম এবং বেলা ১১টায় নদীতীরে সীসাঘাট নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। মান্‌চৌকা হইতে সীসাঘাট পর্য্যন্ত পথ অনেকটা আমাদের দেশের "মেঠো" পথের ন্যায়।

পথের দুইদিকেই বিস্তীর্ণ মাঠ এবং মাঠের শেষে উচ্চ পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে লোকালয়। সমতলে কুঞ্জা-ভঞ্জন ও সতী পসল নামে দুইটি বস্তির মধ্য দিয়া আমা-দিগকে আসিতে হইয়াছিল।

সীসাঘাট স্থানটী আমাদের দেশের নদীকূলে চড়ার উপরে বাজারের ন্যায়। এখানে লোকের বাড়ী নাই, মাত্র কয়েকখানা দোকান। ব্রহ্মচারীজী ও আমি নদী-কূলে এক গাছের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম এবং স্নানান্তে কিছু দধি ও চিড়া জলপান করিলাম।

নেপালে আসিয়া এখানে প্রথম মিঃ গান্ধীর নাম শুনিলাম। প্রয়াগদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ আমাদের নিকট আসিয়া মিঃ গান্ধীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে—যেখানে পোষ্টাফিস টেলিগ্রাফ নাই, কোন রকম সংবাদ পত্রের প্রচলন নাই, সেখানকার লোকে ভারতবর্ষের নন্‌কোঅপারেশন-এর বিষয় কি প্রকারে জানিতে পারিল জিজ্ঞাসা করায় প্রয়াগদত্ত উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদের পর্ব্বতের একজন লোক সংপ্রতি বেনারস হইতে আসিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট তাঁহারা গান্ধী মহারাজের কথা শুনিয়াছেন।

বেলা ২টায় গাইড ও ভারিয়া আসিয়া পৌঁছিল। অদ্য আর এখান হইতে অগ্রসর হইব না স্থির করিয়া নদীতীর ত্যাগ করিলাম এবং এক দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

বৈকালে কয়েকজন থাকালিয়া সওদাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। থাকালিয়ারা পোষাকে ও চেহারায় ভুটিয়া কিন্তু জাতি হিসাবে ভুটিয়া নহে। পোখরার উত্তর হইতেই এই থাকালিয়াদের বাসভূমি। তিব্বতীয় ও নেপালী রক্ত সংমিশ্রণে এই থাকালিয়াদের উৎপত্তি। কাহারও মতে উপত্যকার হিন্দুগণ তিব্বতের নিকটবর্ত্তী হইয়া আপনাদের সমাজ ও সমধর্ম্মী হইতে দূরে পড়িয়া গেল এবং কালে তিব্বতীয়দের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। আবার কাহারও মতে তিব্বতীয়েরাই নেপালে নামিয়া আসিয়া নেপালীদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

থাকালিয়া সওদাগরদের সঙ্গে চৌদ্দটী ঘোড়া ও লোকজন ছিল। তাহারা চাউল ক্রয় করিবার জন্য নেপালে যাইতেছিল।

সওদাগরেরা রাত্রে কিছু গোলআলু উপঢৌকন দিল। ইহারাও মিঃ গান্ধীর প্রসঙ্গ করিল।

রাত্রে আহারান্তে শয়নের উদ্যোগ করিতেছি, এই সময় আর একজন যাত্রী আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল। আমরা চারিজনেই দোকানের বারান্দা পূর্ণ করিয়াছিলাম, তাহার উপর পঞ্চম ব্যক্তির স্থান করা অসম্ভব না হইলেও যে অসুবিধাজনক তাহার আর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এ বেচারাই বা যায় কোথায়? কোনও প্রকারে

তাহাকে একটু স্থান দেওয়া গেল। এ ব্যক্তি মান্দ্রাজী, নাম শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার, গন্তব্য স্থান মুক্তিনাথ।

১৬ই মার্চ্চ—প্রাতঃকাল ৬ ঘটিকায় সময় সীসাঘাট ত্যাগ করিলাম। নদী পার হইলেই একটা ছোট পাহাড়, পাহাড়ের উপর দিয়া পথ। এই পাহাড়ের উপর দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা এক অতি উচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম।

মায়ছান্‌ডীর পশ্চিম তীরে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আমরা যে উপত্যকায় আসিয়াছিলাম, আমাদের সম্মুখস্থ পর্ব্বত সেই উপত্যকার পশ্চিম সীমা। পর্ব্বতটীর নাম শুনিলাম "দেওরালী"। নেপালী ভাষায় যে কোন উচ্চ পর্ব্বতের নামই দেওরালী। এই পর্ব্বতটীর বিশেষ কোন নাম আছে কি না জানিতে পারিলাম না।

পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে পশ্চিম দিকে অতি উচ্চ এক তুষারশৃঙ্গ দৃষ্ট হইল। যেমন যে কোন উচ্চ পর্ব্বতের নাম "দেওরালী" সেইরূপ যে কোন তুষারশৃঙ্গের নামই "হিমাল"।

পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আমরা এক অতি বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরে প্রবেশ করিলাম। এই স্থান হইতেই পোখরা উপত্যকা আরম্ভ হইল।

এখান হইতে দৃষ্টি চতুর্দ্দিকেই প্রায় অব্যাহত। পথের উভয় পার্শ্বে অতি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এবং তাহার শেষে অতি উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

বে । ১১-৩০মিঃ সময় সাতম্যানে নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানেও একটা বাজার আছে। বাজারের পশ্চিম দিকে একটা নদী। নদীটা প্রায় শুষ্ক—স্থানে স্থানে জল আছে। এই নদীতেই কোনরূপে স্নান সমাপন করিয়া এক বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতে থাকিলাম।

আমরা যখন নদীকূলে ছিলাম তখন গতরাত্রের পরিচিত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জানাইল যে গাইড ও ভারিয়া পশ্চাতে আসিতেছে। শ্রীনিবাস আর অপেক্ষা না করিয়া পোখরা অভিমুখে যাত্রা করিল।

১-৪০ মিঃ গাইড ও ভারিয়া আসিয়া পৌঁছিল। আমরা তখন নদীকূল ত্যাগ করিয়া বাজারে আসিলাম এবং ধর্ম্মশালার দ্বিতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

ব্রহ্মচারীজী তাঁহার নিজের ছায়া মাপিয়া সময় নির্ণয় করিলেন তদনুসারে আমি ঘড়ী ঠিক করিলাম।

বৈকালে নিকটবর্ত্তী হ্রদ রূপাতাল দেখিতে গেলাম। গাইড আমার সঙ্গে গেল।

পোখরা উপত্যকায় অনেক গুলি হ্রদ আছে। নেপালী ভাষায় পোখরা বা পোখরী শব্দের অর্থ পুষ্করিণী। এই নৈসর্গিক পুষ্করিণী-বহুল বলিয়াই উপত্যকাটীর নাম পোখরা হইয়াছে।

(The valley of Pokhra contains several large lakes, from which circumstance it derives it's name—the term pokhra or pokhri meaning a tank or piece of standing water.—Oldfield.)

রূপাতালের তীরভূমি কর্দ্দমাক্ত, কাযেই তীরে যাইতে পারিলাম না। হ্রদের অপর পারে উচ্চ পর্ব্বত। পর্ব্বতে ঘর বাড়ী এবং লোকজন এপার হইতে দেখা যায়। হ্রদে পদ্মফুল দেখিলাম। নেপালে বোধ হয়, পদ্ম শব্দ প্রচলিত নাই—আমার গাইড পদ্মকে "কমল" বলিল।

সন্ধ্যার পরে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমরা বিশ্রাম করিতেছিলাম সেই সময় সারিন্দা হস্তে এক কিন্নর আমাদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। এ ব্যক্তি জাতিতে এবং ব্যবসায়ে কিন্নর কিন্তু আকৃতিতে নয়। সে আসিয়াই অনুমতির কোন প্রতীক্ষা না করিয়া সারিন্দা বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল।

সুপারিটারে নাইডুর তামিল গান বা মান্ চৌকার বালকদ্বয়ের গানের ন্যায় এ গানটী সম্পূর্ণ অবোধ্য নহে। প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিলেও ভাব বেশ বুঝা গেল।

বোম্ বোম্ মহাদেও সদাশিব নাথা
রজ বিরজ অভিজলে মাতা।

গায়ত্রীকা পুত্রা বৃখ বাহন চড়ি
তৃখ চলে সংসাথ।
ব্রহ্মণ্য করি ত্রিখণ্ডলে আই
তাহা দেখি তিন ভাই প্রকট উদাই
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনেই জাত
তিন গুণকে শাস্ত্র বনায়ে।
রজঃ সত্তঃ তমগুণ ঘন ঘটা লিয়ে
এক পরগম, গমপর সৃষ্টি,,
এতি চারি যুগ্‌কা জ্ঞান, জ্ঞাতু পরব্রহ্ম ভগবান
চারি যুগে চারি বর্ণ ছায়ে।
ঘর ঘর যাই অলখ্‌ যোগাই
দশ দিন হুক্ক সৃষ্টি জগৎলাই
ধরম্‌ রচে মনামা সব বাপ ভাই
পত্তনকা ঝোলি ভরাই।
অরনি বসুন্ধরা ধুম্ম মচায়া
বিভূতি গোলা মাথা চড়াই।
জ্ঞান জ্ঞাতুকা পরংব্রহ্ম ভগবান
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগে
চারিবর্ণ ছায়ে।
মহাদেওকা ধ্যানা ধরমকো জ্ঞানা
তুমি রচে ভগবান সৃষ্টি নর নামা
নমখণ্ড পৃথিবী, চৌদ্দ ভুবন পালন করে ভগবান
শ্বেতবর্ণ পীতবর্ণ রক্ত বাঘাম্বর ভস্‌ম মাথা,
ঝুলি বাহুলি মে, লিয়ে বজর ঠিহা বাণা
বিষ্ণুকো চোকামে গিয়া, অলখ্‌ যোগায়া
সব দেওতা গর্জ্জন তত্র নাম।
বাব্‌ বাহাদুরকো কুল লিয়া জন্ম
কর্ম্মকো ফলিতলি, সদাশিব ভাগ।
গুরু বাবা সম্‌ গিয়া মাথা মুড়াওনা
গুরু বাবা দিয়া গেরুয়া বরণ।
যমকো জ্বালা মায়েকা বন্ধন
তুরি দেওনা ভগবান
ধ্যান্‌ করচু অলখ্‌মে যানা।

সঙ্গীতান্তে কিছু পারিশ্রমিক লইয়া কিন্নর বিদায় গ্রহণ করিল। আমরাও আহারান্তে বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম।

১৭ই মার্চ্চ প্রাতে ৭টায় সাতমুনে ত্যাগ করিয়া ৯.৩০ মিঃ পোখ্‌রায় পৌছিলাম। সাতমুনে হইতে পোখরা পর্য্যন্ত "চড়াই উৎরাই" মাত্র নাই, তবে পার্ব্বত্য দেশ, ঠিক আমাদের বঙ্গদেশের মত সমতলভূমি নহে।

শ্বেতী গণ্ডকী পার হইয়া পোখ্‌রা বাজারে আসিলাম এবং এক দোকানের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উপবিষ্ট অবস্থাতেই একটু তন্দ্রাবেশ হইল। কে যেন আমার দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিতেছে টের পাইয়া চাহিয়া দেখি এক নেপালী "দখ্‌সিনা" "দখ্‌সিনা" বলিয়া আমার হাতের মধ্যে একটী মোহর গুজিয়া দিয়া গেল। ব্রহ্মচারীজীকেও ঠিক্‌ ঐ ভাবে দক্ষিণা দিয়া সে ব্যক্তি দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল।

আমাদের সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া মিছিল (procession)-করিয়া একখানা পাল্কী যাইতেছে এবং অনেক লোক পাল্কীর অনুসরণ করিতেছে। এক ব্যক্তি এক খানা প্রকাণ্ড থালা হইতে পশ্চাৎ দিকে পয়সা ছড়াইতেছে এবং ভিখারীর দল কাড়াকাড়ি করিয়া পয়সা সংগ্রহ করিতেছে।

অনুসন্ধানে জানিলাম এক ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার শবদেহ পাল্কীতে করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতেছে এবং আত্মার সদ্গতির জন্য দান করিতেছে।

মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রীত্যর্থে দান গ্রহণ করিতে হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মচারীজী একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু নিরুপায়। দাতা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন এখন আর প্রতিদানের উপায় নাই। "যো আপ্‌সে আতা হায় উস্‌কো আনে দি জিয়ে" এই মহাজন বাক্য উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মচারীজীকে সান্ত্বনা দিলাম।

বেলা ১১-৩০ মিঃ গাইড্‌ ও ভারিয়া আসিয়া পৌছিল। গাইড্‌ তখন "সনদ" (অনুজ্ঞাপত্র দুই খানিকে গাইড সনদ বলিত) লইয়া আড্ডাতে গেল। (আড্ডা শব্দের অর্থ আফিস, যেমন "মুল্‌কী আড্ডা" (Home office,) "জঙ্গী আড্ডা" (Military office)। কিছুক্ষণ পরে

"আইটন্" (Assistant অথবা Adjutant—ইনি সৈনিক কর্ম্মচারী) "মুখিয়া" (Headman) এবং আর একজন কর্ম্মচারী আসিলেন। এই তৃতীয় কর্ম্মচারীটীর নাম ডম্বর জঙ্গ্। ইনি নেপাল দরবারি স্কুল হইতে মেট্রিকুলেশন পাশ করিয়া এখন রাজকার্য্যে শিক্ষানবীশ অবস্থায় পোখরায় আছেন। ইনি ইংরাজীতে আলাপ করিলেন, আমারও তাহাতে আলাপের অনেকটা সুবিধা হইল।

বাজারের মধ্যে একখানা দ্বিতল গৃহ পরিষ্কার করিয়া আমাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল এবং আমাদের পরিচর্য্যার জন্ম সরকার হইতে একজন লোক নিযুক্ত হইল। ব্রহ্মচারীজী ও আমি নিকটবর্ত্তী শ্বেত গণ্ডকীতে স্নান করিয়া মধ্যাহ্নে জলযোগ করিলাম। আমার গাইড্ চারিদিনের ছুটী লইয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে তাহার বাড়ীতে গেল। আমরা পোখ্রায় চারিদিন বিশ্রাম করিব বলিয়া স্থির করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

বিবাহের যৌতুক

(গল্প)

"মহা মুস্কিলে পড়েছি হে—"

প্রতরাশ সমাপন করিয়া সবে মাত্র "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে মনোনিবেশ করিতেছি, এমন সময় বাল্যবন্ধু অমর ঝড়ের মত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চলতার সহিত বলিয়া উঠিল— "মহা মুস্কিলে পড়েছি হে।" আমি অমরের স্বভাব জানিতাম। দিনের মধ্যে সে অন্ততঃ বিশবার "মহা মুস্কিলে" পড়িয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহার বিবাহের দিন যতই নিকটস্থ হইতেছে, ততই তাহার মুস্কিলে পড়াও বাড়িতেছে। এই সকল মুস্কিলের আসান করিতে সে আমাকেই অদ্বিতীয় উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়াছিল। যদিও একবার ব্যতীত দুইবার বিবাহ করি নাই, এমন কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিব না পত্নীর নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ আছি, তথাপি অমরের বিবাহসংক্রান্ত যাবতীয় জটিল সমস্যার সমাধানে আমি তাহার প্রধান এবং বোধ হয় একমাত্র উপদেষ্টার আসনে বৃত হইয়াছিলাম। আমি হাসিতে হাসিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,"অমর, কি মুস্কিলে পড়্লে ?"

অমর গম্ভীরভাবে বলিল, "হাসির কথা নয় হে, এবার সত্যি সত্যিই মহা বিপদে পড়েছি।"

আমি পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "কোন্ বারেই বা সত্যিকার মহাবিপদে পড়নি ?"

"না হে না, এবারে ভারি—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ভাল করে আরাম কেদারাটায় বস — তোমার বিপদের কথাটা শুন্ছি। একটু চা দিয়ে যাক কি ?"

অমর সম্মতি জানাইল। আমি ভৃত্যকে চা আনিতে আদেশ দিয়া একটি চুরুট ধরাইয়া অমরের মুখের দিকে চাহিলাম।

চা পান করিতে করিতে অমর বলিল "আমার বিবাহ সম্বন্ধে আমার মাতামহের মতামত তুমি ত' জান ?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ।"

"সম্প্রতি তিনি তাঁর আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন এবং একটি অপূর্ব্ব যৌতুক পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন কোনও অনিবার্য্য কারণবশতঃ

আমার বিবাহের দিন তিনি উপস্থিত হতে পারবেন না।"

"অপূর্ব্ব যৌতুক ?"

"হাঁ, অপূর্ব্বই বলতে হবে, এরকম যৌতুক কেউ কখনও পেয়েছে বলে' শুনি নি।"

"জিনিষটা কি ?"

"তিনহাজার টাকায় ইন্‌সিওর করা একটি নেক্‌লেসের বাক্স।"

"মন্দ কি ?"

"কিন্তু বাক্সটির মধ্যে নেক্‌লেসটি নেই!"

"বল কি ? তা হলে নিশ্চয়ই নেক্‌লেসটি চুরি গিয়েছে। পুলিসে খবর দিয়েছ কি ?"

"পুলিসে খবর দিয়ে কি করব ? তুমি মনে কর দাদামশায় সত্যিসত্যিই তিনহাজার টাকা দামের একটি নেক্‌লেস পাঠিয়েছেন ? তা হলে তুমি আমার দাদা-মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছুই জান না। তিনি খামখা এত খরচ করবার পাত্রই নন।"

"তা হলে অত টাকা ইন্‌সিয়রেন্স ফী দেবার অর্থ কি ?"

"ঐ ত মজা! দেখান হল যে তিনহাজার টাকার একটি গহনা তিনি পাঠিয়েছেন, চোরে চুরি করে' নিয়েছে।"

"আমার ত' সত্যি সত্যি মনে হয় চুরিই গিয়েছে।"

"না হে না, শীল মোহর প্রভৃতি ঠিক ছিল, আমি কি না দেখেই ডাকঘরের কর্ত্তাদের ছেড়ে দিয়েছি ?"

"তা, কি করলে তুমি ?"

"আমি দাদামশায়কে তাঁর বহুমূল্য যৌতুকের জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে' দিন দুই হ'ল পত্র লিখেছি। তুমি ত জান তাঁর পছন্দসই জিনিষ অতি চমৎকার না বল্লে তাঁহার মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়।"

"তা বেশ। এখন বিপদটা কি ?"

"আজ বাবুগঞ্জ থেকে একটি লোক এসেছে, তার হাতে দাদামশায় আর একখানি চিঠি দিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন নেক্‌লেসটির মাঝখানে হীরা আর চারিদিকে পান্না বসিয়ে দেখতে ভাল হয়েছে কি না ?"

"তুমি কি করলে ?"

"আমি লিখেছি অতি চমৎকার মানিয়েছে। এমন নেক্‌লেস আমি দেখিনি।"

"আমার বোধ হয় তোমার দাদামশায় ভুলক্রমে নেক্‌লেসটি পাঠান নি। তোমার তাঁকে জানান উচিত ছিল।"

"না হে না। তিনি কি রকম কৃপণ তা ত জান না। তিনি ঐ বাক্সটি দিয়েই নেক্‌লেস দানের পুণ্য করতে চান। তুমি জানো আমাদের নীরদ বাবু কি করেছিলেন ?"

"কি করেছিলেন ?"

"তাঁর ভাগিনেয় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ গোপাল বাবুর বিবাহের সময় সকলেই বল্লেন তোমার অগাধ বিষয়, আর একটিমাত্র ভাগিনেয়, একটা দামী কিছু জিনিষ উপহার দেওয়া উচিত। নীরদ বাবু বল্লেন 'তা ত' বটেই।' তারপর গোপাল বাবুর বিবাহের সময় পাটনা থেকে নীরদবাবুর ইন্‌সিওরকরা একটি প্যাকেট এসে উপস্থিত হ'ল। সকলে দেখ্‌বার জন্য ব্যগ্র হলেন। মোমজামার ভিতর কাঠের ছোট বাক্স। তার ভিতর কাঠের গুঁড়ো। তার ভিতর ব্রাউনকাগজে সযত্নে মোড়া একটি ভাঙ্গা পাথরবাটী। তৎসঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র কাগজে নীরদবাবু লিখেছেন 'বাবা গোপাল, তুমি বিধাতার অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া যে রত্ন আহরণ করিতেছ তাহার নিকট পার্থিব ধনরত্ন কিছুই নহে। এই ভাঙ্গা পাথরবাটীটি অযত্নে মাটীর নীচে পড়িয়া ছিল, হয়ত উহা চন্দ্রগুপ্ত কিংবা অশোকের সময়ের। আমরা উহার মূল্য জানি না, কিন্তু তুমি উহার মূল্য কত নিশ্চয়ই জান। সুতরাং অকুণ্ঠিত চিত্তে তোমাকে আমার আশীর্ব্বাদী স্বরূপ উহা পাঠাইলাম।' বলা বাহুল্য পাথর বাটীটি মাস কয়েক মাত্র পূর্ব্বে নীরদ বাবুর ঝি বাজার থেকে কিনে

এনেছিল এবং তা ভেঙ্গে ফেলবার জন্তে জরিমানাও দিয়েছিল।"

"গোপালবাবু কি করলেন ?"

"গোপাল বাবু কিন্তু মামার উপহারটি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তার উপর এমন একটি গবেষণা-পূর্ণ প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ লিখে বাগবাজার এন্টিকোয়েরিয়ান সোসাইটীর এক সভায় পাঠ করেছিলেন যে সভায় ধন্ত ধন্ত পড়ে' গিয়েছিল।"

"যাই হোক্, এখন তুমি যথার্থই মনে কর যে অগাধ সম্পত্তির মালিক তোমার মাতামহ তাঁর একমাত্র নাতির বিবাহে শূন্য হস্তে আশীর্ব্বাদ করেছেন ?"

'আমার ত কোন সন্দেহই নেই। তুমি জান তিনি টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমার প্রতি কি রকম ব্যবহার করে এসেছেন। এখন এমন বুদ্ধি খেলেছেন যে হয়ত নেক্‌লেস হারাণোর জন্তে আমাকেই সম্পূর্ণ দায়ী করবেন। আমি কেবল ভাব্‌ছি তখন আমি কি রকম করে তাঁর এই প্রতারণা বরদাস্ত করব।"

"আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। বিপদ যখন আস্‌বে তা হতে উদ্ধারের উপায়ও তখন নিশ্চয় আস্‌বে।"

২

পাঠক পাঠিকাগণকে অমর ও তাহার মাতামহের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অমরের মাতামহ ঘনশ্যাম বাবু বাবুগঞ্জের প্রসিদ্ধ জমিদার। তাঁহার অগাধ বিষয়সম্পত্তি। অল্পবয়সেই ঘনশ্যাম বাবু বিপত্নীক হন, একমাত্র কন্যার মুখ চাহিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। যথাসময়ে একটী সুশ্রী ও সুস্থকায় দরিদ্র যুবকের সহিত কন্যাটির বিবাহ দিয়া জামাতাকে নিজগৃহে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেন। ঘনশ্যাম বাবুর জামাতা যতীন্দ্রনাথ বি-এ পাশ করিয়া বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ঘনশ্যাম বাবু অজস্র অর্থব্যয় করিয়া জামাতাকে ইংলণ্ডে বিদ্যা-শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। তখন তাঁহার দৌহিত্র অমর একমাসের শিশু। যতীন্দ্র বিলাত গিয়া কুসংসর্গে পড়িয়া চরিত্র হারান; তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা অমরের মাতার মৃত্যুর কারণ হয়। কিছুকাল পরে যতীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া আসেন এবং অত্যধিক পানদোষ ও অন্যান্য অনাচারের জন্য অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঘনশ্যাম বাবু সেই অবধি অমরকে মানুষ করিয়া আসিতেছেন। তিনি তাহাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাতে সে কোনও রকমে বিলাসী না হইয়া পড়ে সেই দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বাস্তবিক যখন অমর মেসে থাকিয়া আমাদের সঙ্গে পড়িত, তখন আমরা তাহাকে নিতান্ত দরিদ্র বলিয়াই জানিতাম। সে যে ঘনশ্যাম বাবুর অগাধ বিষয়ের উত্তরাধিকারী তাহা কেহই আমরা জানিতাম না। অমর সেজন্যই তাহার দাদামহাশয়কে অতিশয় কৃপণ বলিয়া জানিত। তাঁহার স্নেহের একমাত্র অমরকে তিনি যে ভাবে রাখিয়াছিলেন তাহাতে সকলেই তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া মনে করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই।

যখন অমর এম-এ পাশ করিয়া বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল তখন ঘনশ্যাম বাবু প্রবল আপত্তি করিলেন। অবশেষে অমর তাহার কোনও বন্ধুর সহিত গোপনে বিলাত যাত্রা করে। সেখান হইতে তাহার অর্থাভাব জানাইলে ঘনশ্যাম বাবু টাকা পাঠাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনি এরূপভাবে টাকা পাঠাইতেন যাহাতে একটি দরিদ্র ছাত্র ইংলণ্ডে কোনও ক্রমে দিন গুজরাণ করিতে পারে।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিষ্টার রায়ের কন্যার সহিত অমরের বিবাহের কথা উঠে। পাত্রী অমরের মনোমত হইল কিন্তু এবারেও ঘনশ্যাম বাবু প্রবল আপত্তি তুলিলেন। তিনি বিলাত-ফেরৎ সমাজের উপরেই খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সমাজে যে ভাল ভাল লোক থাকিতে পারে কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতেন না।

কিন্তু ব্যাপার এরূপ গড়াইয়া গেল যে মিস্ রায়ের সহিত অমরের বিবাহ স্থির না করিলে উভয় পক্ষেরই দারুণ মনঃকষ্ট হয়। সুতরাং বিবাহের দিন স্থির করিয়া

অমর তাহার দাদামহাশয়কে পত্র লিখিল। দাদামহাশয় বোধ হয় তাঁহার ক্রোধ গোপন করিয়া লিখিলেন, "অনিবার্য্য কারণ বশতঃ" তিনি বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি যে নববধূকে শূন্যহস্তে আশীর্ব্বাদ করিবেন তাহা আমার বিশ্বাস হইতেছিল না।

৩

অমরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ প্রীতি-ভোজনের নিমন্ত্রণ। আমি অমরের বাসায় উপস্থিত হইবামাত্র অমর আমাকে হলের এক কোণে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "ভারি বিপদ হে—"

আমি বলিলাম, "কি হয়েছে?"

"দাদামশায় এসেছেন।"

"বেশ ত!"

"তিনি নেক্‌লেসটা দেখ্‌তে চাইছেন। তিনি বল্‌ছেন নেক্‌লেসের দোলকটা জহুরীদের যে রকম বলে দিয়েছিলেন সেইরকম করেছে কি না নিজে দেখ্‌তে চান।"

"উপায়?"

"নিরুপায়। আমি বলেছি আল্‌মারীর চাবিটা কোথায় ফেলেছি, খুঁজে দেখ্‌ছি। তিনি ত ভারি বক্‌ছেন। বল্‌ছেন আজকের দিনে নববধূকে তাঁর আশীর্ব্বাদী নেক্‌লেসটা কেন পরান হয়নি?"

"আচ্ছা আমি দেখ্‌ছি, কি কর্‌তে পারি।"

৪

হলের মাঝখানেএকটি কৌচে মিষ্টার রায় ও ঘনশ্যাম বাবু বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। ঘনশ্যাম বাবু বলিলেন, "আপনার সঙ্গে কথা কয়ে আমি ভারী খুসী হলেম। বিলেত ফেরত সমাজে যে এরকম লোক আছে আমার ধারণাই ছিল না। বিবাহের রাত্রে না আস্‌তে পারায় ভারি দুঃখিত আছি। আমার প্রতিবেশী ও বান্ধব মথুরা বাবুর শেষ অবস্থা। তাঁর এরকম বাড়াবাড়ি হল যে আমার আসা হয়ে উঠ্‌ল না। এখন একটু সুস্থ দেখে এসেছি।"

মিষ্টার রায় বলিলেন, "আপনি এই বয়সে যে বাবুগঞ্জ থেকে কল্‌কাতায় এসেছেন এই যথেষ্ট।"

আমি কৌচের পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলাম। বুক-ঠুকিয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলাম, "এখানে ঘনশ্যাম বাবু আছেন?"

ঘনশ্যাম বাবু বলিলেন, "কেন? আমি ঘনশ্যাম বাবু।"

"টেলিফোনে একজন বল্লেন বিবিগঞ্জের বৃন্দাবন বাবুর শ্বাস হয়েছে। বাড়ীর লোকেরা আপনাকে খবর দিতে বল্লেন।"

"বাবুগঞ্জের মথুরা বাবু কি?"

"হাঁ হাঁ ঐ নামই বটে।"

"তাই ত! কি করা যায়?"

মিষ্টার রায় বলিলেন, "আপনি কি এখনই যেতে চান?"

ঘনশ্যাম বাবু বলিলেন, "যেতে ত চাই, কিন্তু এখন ট্রেণ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ, আমি বিপদে পড়লাম।"

মিষ্টার রায় বলিলেন "তার আর কি? আমার মোটরে আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

আমি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য, টেলিফোনে এজাতীয় কোনও সংবাদই আসে নাই! বুড়াকে তাড়াইবার এই ফিকির ছাড়া অন্য কিছু আমার মাথায় আসে নাই।

৫

ইহার পর কয়েকদিন চলিয়া গিয়াছে। আজ আবার আমার অমরের বাসায় তাহার নবপরিণীতা-বধূর গান শুনিবার নিমন্ত্রণ। আমি গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র অমর আমাকে আলিঙ্গন করিল। বলিল, "ভারি বিপদে পড়েছিলাম হে—"

আমি বলিলাম, "যাক্‌, বিপদটা এখন কেটে গিয়েছে ত?"

অমর নববধূর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ।" বধূও মৃদু হাসিতে লাগিল। আমি নব বধূর কণ্ঠে একটি বহুমূল্য নেক্‌লেস্ লক্ষ্য করিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ নেক্‌লেস্‌টী কোথা থেকে এল? তোমাকে ক্ষতিপূরণ করতে হল না কি?"

অমর বলিল, "ঐটে নিয়েই ত বিপদ ঘটেছিল।"

"ব্যাপারটা কি হয়েছিল হে?"

"ব্যাপারটা খুব সোজা। ঠাকুরলাল হীরালাল কোম্পানীর দোকানে দাদামশায় একটী নেক্‌লেস পছন্দ করেন এবং ইন্‌সিওর করে' আমার ঠিকানায় পাঠাতে বলেন। জহুরী তখনই এক কর্ম্মচারীকে সেটি প্যাক করে' পাঠাতে আদেশ দেয়। কর্ম্মচারীটী প্যাক্ করবার সরঞ্জামাদি আনতে গিয়েছে ইতাবসরে দাদমহাশয় আর একবার নেক্‌লেস্‌টি দেখে দোলকটি পরিবর্ত্তন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জহুরী নেক্‌লেস্‌টি নিয়ে কারিকরকে ডেকে যথা বিধি আদেশ দিয়েছে; দাদামহাশয়ও ঘরে ফিরে এসেছেন। এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারিটি এসে নেক্‌লেসের বাক্সটি পূর্ব্বস্থানে দেখতে পেয়ে প্যাক করে' পূর্ব্ব আদেশমত আমার ঠিকানায় ইন্‌সিওর করে' পাঠিয়ে দিয়েছে। সেদিন জহুরী নেক্‌লেসটী পরিবর্ত্তিত করে' পাঠাবার সময় সমস্ত ঘটনা জানতে পারে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে' পত্র লিখে নেক্‌লেসটী দাদামহাশয়কেই পাঠিয়ে দেয়। আমরা সেদিন দাদামহাশয়কে প্রণাম করতে গিয়ে ত ভারি ভারি অপ্রস্তুত হয়েছিলাম। দাদামহাশয় একজন ভদ্রমহিলার সম্মুখে আমার যে কাণ মলে' দিয়েছিলেন তা—"

অমর বিকৃতমুখভঙ্গী করিয়া কাণে হাত বুলাইতে লাগিল, নববধূ হাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "যাক্, সব ভাল যার শেষ ভাল।"

শ্রীবিভাবতী ঘোষ।

ইজিপ্টে নব আবিষ্কার

বিগত ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্ণারভন্ (Lord Carnarvon) কর্ত্তৃক ইজিপ্টের লাক্সর Luxor) নগরে সম্রাট্ তুতাঙ্খেমেনের (Tut-ankh Amen) সমাধি মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। লাক্সর আজ লোকে লোকারণ্য। দেশ বিদেশ হইতে, এমন কি সুদূর আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ সমূহ হইতে দলে দলে দর্শক লাক্সরে সমাগত হইতেছেন। মোটরে মোটরে এবং এরোপ্লেনে এই নগর আজ প্লাবিত। ঔৎসুক্যের চাঞ্চল্য নিবাণ হেতু সরকার হইতে বিশেষ রক্ষী বা স্পেশাল গার্ডের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

লাক্সরের সন্নিকটে ইজিপ্টের প্রাচীন রাজবংশের সমাধিক্ষেত্র রাজ উপত্যকা (Valley of the Kings) নামে পরিচিত। এই স্থানটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা সমাকীর্ণ; পর্ব্বতের ভিতর দিয়া অপ্রশস্ত পথ এবং পথিপার্শ্বে মাঝে মাঝে গুপ্ত প্রকোষ্ঠ সমূহ বিদ্যমান। এই সকল প্রকোষ্ঠ যে কতকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বলা দুঃসাধ্য হইলেও পুরাতাত্ত্বিকদিগের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে ইহাদের অনেকগুলির ঐতিহাসিক বিবরণ ইতিমধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে মিশরীদিগের মধ্যে মৃতদেহ রক্ষার বিশিষ্ট ব্যবস্থা ছিল। এই বিশিষ্ট ব্যবস্থাকে "মামিফিকেশন্" (mummification) এবং এই উপায়ে রক্ষিত দেহকে "মামী" (mummy) কহে। "মামী"র দুই চারিটি নমুনা অনেকে কলিকাতার "এশিয়াটিক্ মিউজিয়মে" বা যাদুঘরে ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া থাকিবেন। মিশরীদের "মামিফিকেশন" ব্যাপার একটি ছোট খাট যজ্ঞবিশেষ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অনুষ্ঠানে কত প্রকার আয়োজন উদ্‌যোগ ও মন্ত্রতন্ত্রাদি প্রক্রিয়া আবশ্যক হইত, এই প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজের

লোক বিশেষ বিশেষ উপায়ে "মামী" প্রস্তুত করিত। মিশরীরা পরোক্ষভাবে মানবের কর্ম্মফলে বিশ্বাসপরায়ণ ছিল। তাহারা ইহাও মনে করিত যে, মানবের, এমন কি পশুপক্ষীরও দুইটি করিয়া আত্মা আছে। মৃত্যুর পর "কা" (ka) নামক দ্বিতীয় আত্মা কিছু কালের জন্য দেহে আবদ্ধ থাকিয়া যথাসময়ে নবদেহ লাভ করে। এই ধারণার ফলে সুদীর্ঘকালের জন্য দেহরক্ষার উপায় উদ্ভাবিত হয় এবং এই জন্যই তাহারা "মামী"র সহিত মৃত আত্মীয়ের জীবিকা ও প্রিয় ভোগ্যের নিদর্শন স্বরূপ নানাবিধ দ্রব্য সঞ্চিত রাখিত। * অতীত জীবনে যে ব্যক্তি যে বস্তুর প্রতি আসক্ত ছিল বা যে উপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, ভাবী জীবনেও সে ব্যক্তি সেই বস্তুর প্রতি আসক্ত হইবে এবং সেই উপায়ে জীবন যাপন করিবে, অশনভূষণের সরঞ্জাম রক্ষার ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। ধনীব্যক্তির আত্মীয়েরা তদীয় সম্মানোপযোগী বহুমূল্যবান অলঙ্কারাদিও সঞ্চিত রাখিতেন এবং তস্করের ভয়ে তাঁহাদিগকে অতি সাবধানে এবং সংগোপনে "মামী" রক্ষা করিতে হইত। লোক-চক্ষুর অন্তরালে গিরিগর্ভে "মামী" করার ইহাই একমাত্র কারণ। বড় লোকের দেহের সহিত যে কেবল ভোগ্য-বস্তুই থাকিত, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহার জীবনেতিহাস এবং তৎসাময়িক অবস্থাও কাষ্ঠ বা প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ থাকিত, অথবা প্যাপিরাস্ ত্বকে লিপিবদ্ধ থাকিত। এই সকল কারণ বশতঃ গত অর্দ্ধ শতাব্দীর চেষ্টার ফলে মিশর হইতে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস অপেক্ষাকৃত সহজে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং হইতেছে। যে বিদ্যা বলে এই ইতিহাস সঙ্কলিত হয়, তাহাকে "ইজিপ্টলজি" (Egyptology) কহে।

মেসার্স উইলকিন্সন্ (Wilkinson), সল্ট (Salt), বেল্‌জোনি (Belzoni), মাস্‌পেরো (Maspero), গ্রেবো (Grebaut) প্রভৃতি অনেকেই ইতিপূর্ব্বে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। মিঃ থিওডোর ডেভিস্ (Mr. Theodore Davis) যখন কয়েকটি রাজকীয় সমাধিমন্দির এবং তন্মধ্যে রাজা তৃতীয় এমেনহেটেপের এক প্রিয়া মহিষীর পিতা ও মাতার "মামী"র আবিষ্কার করেন, তখন অনেকেই মনে করিয়াছিল যে, রাজ সমাধিক্ষেত্রে আর কোনও বিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষিত বস্তু থাকা সম্ভব নয়। সম্প্রতি লর্ড কার্ণারভন্ এবং তাঁহার সহযোগী মিঃ হাওয়ার্ড কার্টার (Mr. Howard Carter) এই অভিমত খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম যে কেবল সফল হইয়াছে, তাহা নয়, তদ্দ্বারা আজ এক যুগান্তর উপস্থিত। ইঁহারা কয়েক বৎসর যাবৎ ইজিপ্টে কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তির "মামী"র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন এবং কয়েকটি সমাধিমন্দির আবিষ্কারও করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান আবিষ্কারের কিছু পূর্ব্বে মিঃ কার্টার একটি ত্রিকোণাকার ভূমি খনন করিতে করিতে প্রায় সত্তর হাজার টন্ পরিমিত রাবিশ বাহির করিবার পর ষষ্ঠ রামেসিসের (Rameses VI) সমাধির প্রায় দশগজ ব্যবধানে পৌছেন। তখন তাঁহার হঠাৎ মনে হয় যেন তিনি একটি নূতন সমাধি মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত মাত্র তিনটি রাজ সমাধির অভাব ছিল; রাজা তুতাঙ্খেমেন, রাজা স্মেঙ্খেরা Smenkhara) এবং রাজা তথমেস্ (Thothmes II) এর সমাধি। কার্ণারভনও তাঁহার সহিত যোগ দেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাঁহারা প্রথমে একটি সিঁড়ি দেখিতে

* "The Ka, or Double, lived with the body in the tomb (a chamber of which being especially set apart for it) and appropriated the incense and offerings made by descendants and friends The form of the Ka was that of the man to whom it belonged but it seemed to have been an immaterial shadowy being, who was, nevertheless, strange to say, supposed to be gratified with material food."—Egypt and the Egyptians by Rev. J.C. Bevan, p. 42.

"× × the Egyptians originally took trouble to preserve the bodies of the dead because they believed that after a series of terrible combats in the under world, the soul (triumphant and pure) would once more return to the clay in which it had formerly lived."—Ibid, p. 47.

পাইলেন, তৎপরে শিল্‌মোহর করা একটি প্রাচীরের কিয়দংশ নয়নগোচর হইল। উহা যে একটি সমাধি মন্দিরের প্রবেশ দ্বার, তাহাতে তাঁহাদের সন্দেহ রহিল না; তবে তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, হয়ত উহা তৃতীয় তথমেসের উজির বা কোন উচ্চ রাজবংশের কর্ম্মচারীর সমাধি হইবে। কিন্তু অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা প্রাচীরের একপার্শ্বে তুতাঙ্‌ক্ষেমেনের "কার্ত্তুস্" বা পরিচয় পত্রের কবচ বিলম্বিত দেখিতে পান। এইরূপ কবচ দুই দিকেই বিলম্বিত থাকা নিয়ম, কিন্তু তাঁহারা কেবল একটি "কার্ত্তুস্"ই পাইলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে যে স্থলে "কার্ত্তুস" থাকা উচিত, সে স্থলে তুতাঙক্ষেমেনের নিজ নামাঙ্কিত মোহরের পরিবর্ত্তে রাজকীয় সমাধির সাধারণ মোহরের (Seal of the Royal Necropolis) ছাপ দেখা গেল। এই শিলমোহর গুলির মধ্যস্থলে একটি মানুষের প্রবেশোপযোগী পথ আছে এবং সেই পথ দিয়া তস্করেরা স্বর্ণ রৌপ্যাদি মূল্যবান দ্রব্য অপহরণ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে মিষ্টার কার্টার ও লর্ড কার্ণারভন্ সমাধির প্রথম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান যে, সেই কক্ষে শ্লেট প্রস্তরে নির্ম্মিত তিনটি সুবৃহৎ পালঙ্ক, তাহার প্রত্যেক খানিতে দুইজন লোক এককালে পাশাপাশি শয়ন করিতে পারে, কয়েকটি আশ্চর্য্য কৃত্রিম মস্তক এবং অদ্ভুত রকমের অন্যান্য দ্রব্য রহিয়াছে। পালঙ্ক গুলি দেখিয়া তাঁহাদের মনে হয় যে, উৎসবাদি উপলক্ষে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী উহাতে উপবিষ্ট হইয়া কর্ম্মচারীদিগের নিকট রাজসম্মান গ্রহণ করিতেন। একখানি পালঙ্কের নীচে প্রাচীর গাত্রে একটী ছিদ্রপথ দৃষ্ট হয়। পথটি এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহাতে একজন লোক কোন ক্রমে গমনাগমন করিতে পারে। রন্ধ্র পথে, প্রচীরের অপরপার্শ্বে, আর একটি প্রকোষ্ঠ দেখা গেল। ঐ প্রকোষ্ঠে মূল্যবান পালঙ্ক, কৌচ, চেয়ার, টেবিল, আলাবাষ্টার প্রভৃতি, এক কোণে স্বর্ণমণ্ডিত চারিখানি রথচক্র, এবং আরও কত কি রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। এই সকল বস্তুর নামের তালিকা এবং বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। যাহা হউক, এই কক্ষের পরে আরও একটি কক্ষের দ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং লর্ড কার্ণারভনের বিশ্বাস যে, উহার মধ্যেই রাজা তুতাঙক্ষেমেনের "মামী" পাওয়া যাইবে। তিন হাজার বৎসরের মৃত দেহ! পর্ব্বত কন্দরের তিমিরাবৃত নিভৃত কক্ষে চিরশান্তিতে নিমজ্জিত সম্রাট্ দেহ! জীবিত কালে যাহা নিতান্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি ভিন্ন অপরের দর্শনের উপায় ছিল না, তাহা আর কয়েক দিন পরেই সর্ব্বসাধারণে বিনা উপঢৌকনে যদৃচ্ছা দর্শন করিবে। আর যে সকল দ্রব্যের কথা বলা হইল, তিন হাজার বৎসরের ব্যবধানেও আজ সভ্যজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি ইংরাজ ও মার্কিন, উহাদের শিল্পকৌশলে ও চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছেন। কে বলিবে সভ্যতার চরমাদর্শ কোথায়!

এই আবিষ্কার উপলক্ষে ঐতিহাসিক মহলে ইতোমধ্যেই বেশ একটু সাড়া পড়িয়াছে। ফ্যারাও তুতাঙ্‌ক্ষেমেনের ইতিহাস অনেকেই অল্প বিস্তর অবগত আছেন। ইনি মাত্র সাত বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে ইজিপ্টে এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে যে ঘোর সামাজিক আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; সে সম্বন্ধে ঐদেশীয় ঐতিহাসিক জোজেফাস্ (Josephus) কৃত "Contra Apion" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত মানেথোর (Manetho) একটি সুদীর্ঘ রচনা হইতে যে সকল ঘটনা অবগত হওয়া যায়, ঐতিহাসিকেরা তৎসমুদয়কে কিংবদন্তী বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্যর আর্ণেষ্ট ওয়ালিস্ বাজ্ (Sir Ernest Wallis Budge), অধ্যাপক ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি (Prof. Flinders Petre), মিঃ ই, এফ্, ওটেন্ (Mr. E. F. Oaten), মিঃ আর্থার উইগ্‌হল্ (Mr. Arthur Weighall) প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ তুতাঙ্‌ক্ষেমনের সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও কাহারও মতে তুতাঙ্‌ক্ষেমেনই, প্রাচীন ইতিহাস এবং বাইবেলের

Exodus বা ইস্রেলাইট্ ইহুদীদিগের ইজিপ্ট পরিত্যাগ বিভাগে বর্ণিত "অত্যাচারী ফ্যারাও" (Pharaoh of the oppression)। ইহাঁর সমাধিতে অপরাপর দ্রব্যের সহিত একতাড়া প্যাপিরী লিপিও পাওয়া গিয়াছে এবং উহাতে সমসাময়িক ইজিপ্ট, প্যালেষ্টান্, আরব, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্বন্ধ পরিস্ফুটভাবে লিখিত আছে বলিয়া সকলেই মনে করিতেছেন। প্যাপিরীর লিপি পাঠের পূর্ব্বেই বিলাতের "ডেলি-মেল্" পত্রে মহামতি উইগ্‌ল্ যে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, খ্রীঃ পূঃ ১৩১৫ অব্দে ইজিপ্টের রাজা তৃতীয় এমেনোফিসের (Amenophis III) মৃত্যু হয়। এই রাজার রাজত্বের শেষভাগে মিশরদেশে থিবিসে প্রতিষ্ঠিত আমনদেবের (Amon) পুরোহিত সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। আমনের উপাসকেরা পৌত্তলিক ছিলেন এবং তাঁহাদের বিরোধী দল এটনের (Aton) উপাসনা করিতেন। এটনধর্ম্ম অনেকটা একেশ্বরবাদের অনুরূপ। এই ধর্ম্ম তৎকালে বর্ত্তমান কায়রোর নিকটবর্ত্তী হেলিওপোলিসে (Heliopolis) প্রচলিত ছিল। ফ্যারাও চতুর্থ এমেনোফিসের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে আমন্ এবং এটন্ উপাসকদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম সীমায় পৌছিয়াছিল। রাজা এমেনোফিস্ আখ্‌নাটন্ (Akhnaton) নাম ধারণ পূর্ব্বক স্বরাজ্যে এটনের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন এবং খ্রীঃ পূঃ ১৩১৭ অব্দে স্বীয় রাজধানী মধ্য ইজিপ্টের টেল্-এল্-অমর্ণায় (Tell-el-Amorna) লইয়া যান। *

উক্ত ঘটনার পর রাজা আখ্‌নাটন্ আরও ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজত্বের শেষভাগে তিনি আমনের পুরোহিতবর্গ ও পুরাতন দেবদেবীর বিদ্বেষী হন। মৃত্যুকালে ইঁহার পুত্রসন্তান না থাকায় কন্যা মেক্তেন্ন পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। মেক্তেন্ন রাজ্ঞী হইলে তুতাঙ্কেমেন তাঁহার চেম্বার্লেনের অথবা তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যে নিযুক্ত হন। মেক্তেন্নারও সন্তান ছিল না; এজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকৃত উত্তরাধিকারী অভাবে এবং সম্ভবতঃ বুদ্ধি কৌশলে, তুতাঙ্কেমেনই শূন্য সিংহাসন প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। ইনি আমন ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সিংহাসন প্রাপ্তির পর উক্ত ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তবে প্রজাবিদ্রোহের ভয়ে এটনের উপাসনা এক কালে পরিত্যাগ করিতেও পারেন নাই। তাঁহার পর ফ্যারাও আই (Ay) সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ১৩৪৫ অব্দে তাঁহারও মৃত্যু হয়। আই-এর পরে হোরেম্‌হব (Horemheb) রাজা হন। ইনি পৌত্তলিকতার অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন এবং একেশ্বরবাদী এটন উপাসকদিগের বিশেষতঃ ইহুদীদিগের উপর প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করেন। এটন উপাসকেরা অপবিত্র ও বিধর্ম্মী বলিয়া ঘোষিত এবং পরিশেষে ইজিপ্ট হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। হোরেম্‌হেব প্রায় ত্রিশবৎসর রাজত্ব করেন কিন্তু ঐতিহাসিকগণ তৃতীয় এমেনোফিসের মৃত্যুকাল অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৩৪৫ অব্দ হইতেই তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উইগ্‌ল বলেন যে এই জন্যই চতুর্থ এমেনোফিস (আখনাটন) ও হোরেম্‌হেবের মধ্যবর্ত্তী এটন ধর্ম্ম সম্পর্কিত ফ্যারাওগণের বিশেষ কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এটন ধর্ম্ম প্রচলনের সময় ইজিপ্টে বৈদেশিক বা এশিয়ার লোকদিগের এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহারের প্রতি উদারতা দেখান হইত, কিন্তু ইহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তুতাঙ্কেমেন ও আইএর সময় হইতেই এটন-হিংসা এবং বিদেশীয়দিগের প্রতি বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হয়। ইজরেলাইটদিগের দাসত্ব বিবরণ, কিরূপে তাহাদিগকে ফ্যারাওএর আদেশে ইষ্টক প্রস্তুত করিতে এবং অট্টালিকা নির্ম্মাণকার্য্যে মজুরী করিতে হইত,

---

* The strife reached such proportions that this early Broad Churchman (Amenophis IV) was compelled to leave Thebes and to found a new capital near the site of that Tell el Amarna, which so recently yeilded up its spoils to the archaeologists.—Egypt and the Egyptians by Rev J. O. Bevan. p. 39

বাইবেলের Exodus অধ্যায়ে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইজরেলাইটদিগকে অত্যাচার ও দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্যই মোজেসের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছিল। মোজেস ঈশ্বরের আদেশ লইয়া ফ্যারাওএর দরবারে বহুবার গমন করেন এবং অবশেষে তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ইহাই Exodus বৃত্তান্ত। উইগল্‌ সাহেবের মতে ইহা খ্রীঃ পূঃ ১৩৪৫ অব্দের ঘটনা।

তুতাঙ্খেমেন ইহাদিগের প্রতি কেন অত্যাচার করিয়াছিলেন, মানেথোর বিবরণে তাহার একটি কিংবদন্তী আছে। একদা রাজা এমেনোফিস (মানেথোর মতে) এপিসপুত্র এমেনোপিস নামে এক বিজ্ঞব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "কি করিলে দেবতাদিগের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়?" উত্তরে এমেনোপিস বলেন যে, দেশকে অস্পৃশ্য বর্জ্জিত করিতে না পারিলে দেবতারা দেখা দিবেন না। কর্ণাকে প্রাপ্ত তুতাঙ্খেমেনের যে ষ্টীলা (stela) বা প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তুতাঙ্খেমন স্বয়ংই লিখিয়াছিলেন যে, তিনি আমনের মন্দিরগুলির সংস্কার করিতে বাধ্য হন, যেহেতু সেরূপ না করিলে দেবতারা দেখা দিবেন না। মানেথো আরও লিখিয়াছেন যে আশী হাজার অস্পৃশ্য ব্যক্তিকে (unclean people) একত্র করিয়া নীল নদের পূর্ব্বতীরে প্রস্তর কাটিতে পাঠান হইয়াছিল। তথায় তাহারা হেলিওপোলিসের এক পুরোহিতকে সহায় রূপে প্রাপ্ত হয়। এই পুরোহিতকে মোজেস্‌ বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে; কেন না, মোজেস হেলিওপোলিসেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং তিনিই যে ঈশ্বরকে প্রেমময় পিতা বলিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। এই দুইটী বিষয়ে এবং আরও কয়েক স্থলে ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত মানথোর বিবরণের ঐক্য আছে। মহামতি উইগহল সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানেথোর বিবরণকে প্রলাপ বাক্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না, বস্তুতঃ এই বিবরণই Exodus কালীন ফ্যারাও দিগের প্রকৃত ইতিহাস, কেবল মাঝে মাঝে সামান্য পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তাহাই যদি হয়, তবে তুতাঙ্খেমেনই যে নির্য্যাতনের ফারাও (Pharao of the oppression) তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ইতিহাসের এই অংশ আজিও অস্ফুট রহিয়াছে এবং তুতাঙ্খেমনের সমাধি মন্দিরে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি হইতে এই অংশেরই উদ্ধার হইবে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করিতেছেন।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

---

* Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.—10 Exodus 4.

And afterwards Moses and Aron went in, and told Pharaoh—Thus saith the Lord God of Israel, Let my people go, that they my hold a feast to me in the wilderness.—1, Exodus 5.

And the Lord God spake unto Moses, saying,

Go in, speak unto Pharaoh King of Egypt, that he let the children of Israel go out of his land. —10, 11, Exodus 6.

অপূর্ণ

(উপন্যাস)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুসঙ্গিনীর দুঃখ।

সন্ধ্যার পর অনুপ্রভা মাসীমাকে রামায়ণের সীতার পাতাল প্রবেশের অংশটি পড়িয়া শুনাইতেছে, আর এক একবার আসিতে মাসীমার অশ্রুপ্লাবিত মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "মা ঠাকরুণ, দুয়োরটা একবার খুলে দিন।"

অনুপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?" উত্তর আসিল, "আমি ঝি!"

যোগমায়ার অনুমতি লইয়া অনুপ্রভা তখন উঠিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। ঝির সহিত একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

যোগমায়া তখন উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় অবগুণ্ঠনবতী ঘরের ভিতর আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। যোগমায়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, শুভ্র বসন পরিহিতা তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ—সজল নয়নে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

"বৌমা! এস মা আমার! লক্ষ্মী আমার! তোর এমন বেশ আমায় দেখ্‌তে হ'ল মা!"

বলিয়া যোগমায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুত্রবধূকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সুসঙ্গিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা, আমার কোনও দোষ নেই মা! এমন যে বাবা করবেন তা আমি কখনও ভাবিনি। মা কত বারণ করেছিলেন। আপনি যেন ভাববেন না মা, টাকা পয়সার লোভে আমিও এ সবে মত দিয়েছি। কতদিন থেকে আস্‌ব আস্‌ব বলে হাঁফাচ্ছি, বাবার ভয়ে আসতে পারিনি। আজ তিনি কলকাতা গেছেন কাল ফির্‌বেন—তাই আজ মাকে বলে এলাম।"

যোগমায়া সস্নেহে বধূর অশ্রু মুছাইয়া বলিলেন, "তোমার এর জন্যে কোন দোষ নেই বৌমা। কেন তুমি লজ্জা পাচ্ছ মা? জীবনের কোনও সাধ মিট্‌ল না; এই বয়সেই দুঃখের বোঝা মাথায় করতে হল তোমায়। তোমার কথা ভেবে যে আমার মনটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর উপর আবার তোমার উপর রাগ করব?"

এই স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বধূ অভিভূত হইয়া পড়িল। শাশুড়ীর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া সুসঙ্গিনী বলিল, 'আমায় কেন মা আপনারা এতদিন আপনাদের কাছে আনিয়ে রাখেন নি? বাবা রাজী নেই বা হলেন? কেন মা আপনারা জোর করে আন্‌লেন না? তাইতে মা অভিমানে আমার জ্ঞান থাকৃত না। নিজে জ্বলে পুড়ে মর্‌তাম, আপনাদেরও জ্বালাতাম। আমায় যত খারাপ ভাবতেন, মা, আমি তত খারাপ ছিলাম না।"

সুসঙ্গিনী মনের আবেগে এতকালকার হৃদয় রুদ্ধ যে কথাগুলি বলিয়া ফেলিল, তাহা শুনিয়া যোগমায়া যেন এতদিনকার অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইলেন। এই তীব্র অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল যে, তাঁহার বুদ্ধির দোষে কতদিন ধরিয়া এই হতভাগিনী অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কি দুঃখ ও মর্ম্মবেদনায় অভাগিনীর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কাটাইয়াছে!

যোগমায়া অশ্রুসজল চক্ষে বধূর অশ্রু মুছাইয়া স্নেহভরে পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বৌমা, তোমার কোনও দোষ নেই মা। যা কিছু দোষ আমারই, আর কেঁদনা মা। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুমি শান্তি পাও মা। আর, আসছে জন্মে তুমি সর্ব্বসুখে সুখী হবে এ আমি তোমাকে সর্ব্বান্তকরণে বল্‌ছি।"

তারপর শাশুড়ী পুত্রবধূতে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক

কথাই হইল। যোগমায়া বুঝিলেন দুজনে পরস্পরের প্রতি প্রচুর অনুরাগ সত্বেও এক বিপুল অভিমানে দিন কাটাইয়াছে। একজন অভিমানের সেই বিরাট পাষাণ ভার ফেলিয়া চলিয়া গেল, আর একজন কতকাল ধরিয়া সেই আগুনে পুড়িতে থাকিবে তাহা ভগবানই জানেন। তখন একটি একটি করিয়া পুত্রের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা হইতে বৃহৎ ও স্মরণীয় ঘটনাগুলি,যাহাতে মৃত্যুশয্যা-শায়ী যুবকের স্ত্রীর প্রতি কত না ভালবাসাই মর্ম্মান্তিক ভাবে লুকান ছিল, সে সমস্ত যোগমায়া যখন সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, তখন, আহত স্থান হইতে বিদ্ধ বাণ উঠাইয়া লইলে যেমন সেখান হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিতে থাকে, তেমনি সেই অভাগিনী ঐহিক সুখ বঞ্চিতা নারীর হৃদয়ের শত মুখ দিয়া যেন রক্ত ঝরিতে লাগিল।

তারপর যোগমায়া বুঝাইয়া বলিলেন, "শরৎও তোমার মন বুঝত মা, কিন্তু সে যে কেন তোমাকে জোর করে আনবার কথা বলত না সেইটি তুমি জানতে না। তাকে যে ঐ কাল রোগে ধরেছিল তা আমাদের বোঝবার আগে সে বুঝেছিল। বাবা আমার যাবার ক'দিন আগে বলেছিলেন—এ রোগটায় মা তিল তিল করে মরতে হয়। বুকের ভিতর কি যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয় তা আর তোমাকে কি বলব মা। তাই আমি যাদের ভালবাসি তাদের কাউকে আমার কাছে আসতে দিতে বা বেশী-ক্ষণ বসতে বলতে ইচ্ছা করেনা। এ যন্ত্রণা যদি তোমার ঝ'বৌয়ের হয়, সে কি ভয়ানক হবে!"

স্বামী ও শাশুড়ীর প্রতি সুসঙ্গিনীর মন দিন দিন যে কঠিন হইয়াছিল অশ্রুবর্ষণে তাহা সিক্ত হইয়া আসিতে হৃদয়নিহিত প্রেমের বীজ আজ যেন মুহূর্ত্তে অঙ্কুরিত হইয়া তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে শাশুড়ীর পা দুটী ধরিয়া বলিল, "মা আমি আপনার কাছে আজ থেকে থাকব। আমাকে থাকতে দেবেন মা?"

ব্যথিতকণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "ছি মা, অমন কথা কি বলতে আছে! তোমাকে নিয়ে ঘর করব এবে আমার কত আশা ছিল তা আর কি বলব তোমায় মা।

ভগবান তা থেকে একেবারে বঞ্চিত করলেন, তার কি করব। কিন্তু এখন তোমার বাবার কাছেই তুমি থাক মা। আমার শরীর তো দেখছ, আজ আছি কাল নেই। এখন যদি তোমার বাবার অমতে চলে আস, তাহলে ভবিষ্যতে তিনি তোমার উপর হয়ত রাগ করে থাকবেন। তাতে তোমার ক্ষতি হবে মা! আমার যে তুমি এতখানি ভালবাস, এই জন্যে আমি খুব সুখী হয়েছি। শরৎ যাওয়ার পরে তোমাকে যে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরবার উপায় দিলে, এতেই আমি কৃতার্থ। যদি পার মা, মাঝে মাঝে এক একটিবার আমাকে একটু-খানির জন্য দেখা দিয়ে যেও। তাহলেই আমি অনেক শান্তি পাব।"

বলিয়া যোগমায়া সুসঙ্গিনীর চোখের কোণে যে জল-টুকু লাগিয়াছিল তাহা মুছাইয়া দিয়া, তাহার চিবুকে হাত দিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন।

সুসঙ্গিনী তখন উঠিয়া বলিল, "মা একবার এদিকে আসুন।"

পাশেই রান্নাঘর। সেখানে আসিলে সুসঙ্গিনী অঞ্চল হইতে খুলিয়া একশত টাকা করিয়া দশ খানি নোট হাজার টাকা শাশুড়ীর পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল, "মা, এই নোট কখানা জ্যাঠামশায় আপনাকে দেবার জন্য দিয়েছেন। বাবার এই রকম ব্যবহারে তিনি বড়ই লজ্জিত হয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন, আমার ভাই যে অন্যায় করেছেন আমি তার কথঞ্চিত প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা করছি মাত্র।"

যোগমায়া নোট কয়খানার দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, "তোমার জ্যাঠামশায় একজন সাধুপুরুষ। তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো মা, তিনি যেন শুধু আমায় আশীর্ব্বাদ করেন আর কষ্ট না পাই। এ টাকা তাঁকে ফেরৎ দিও। অশোক আমার ছেলের মত। আর কারও কাছে সাহায্য নিলে সে মনে দুঃখ করবে। তিনি যেন না ভাবেন যা হয়ে গিয়েছে তার জন্য আমি কাউকে গালিমন্দ দেবো। আমার অদৃষ্টে ছিল বলে এ সব হ'ল, কারও কোন দোষ নেই মা।"

সুসঙ্গিনী নোটগুলি সেইমত রাখিয়াই বলিল, "জ্যাঠামশায় তাহলে বড় ক্ষুণ্ণ হবেন মা।"

"তুমি বুঝিয়ে বোলো মা, যেন মনে কিছু না করেন। তোমার শ্বশুর একটা ব্যবস্থা করে গেছেন। হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফণ্ড থেকে মাসে মাসে ১০ টাকা করে পাই, তাতে দুজনের একরকম চলে যায়। বেশী লোভ ত ভাল নয় মা।"

বলিয়া নোটকয়খানি পুনরায় পুত্রবধূর অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন।

যোগমায়া তখন উঠিয়া, সামান্য কিছু খাবার করিয়া সুসঙ্গিনী ও ঝিটিকে খাওয়াইয়া দিলেন।

তারপর যোগমায়া নিজেই বলিলেন, "রাত হ'ল আর দেরী কোরোনা, এসো মা।"

বাহিরে আসিয়া ঝিকে বলিলেন, "তুমি মা বেয়ানকে বোলো, আজ যেমন দয়া করে বৌমাকে একবার পাঠিয়েছিলেন এমন দয়া যেন মাঝে মাঝে করেন।"

অনুপ্রভা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সুসঙ্গিনী বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে অনুপ্রভা তাহাকে একটি প্রণাম করিয়া বলিল, "বৌদি, তোমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকবার কপাল তো করে আসনি। তবু এমনি করে মাঝে মাঝে এসো ভাই।"

সুসঙ্গিনী অনুপ্রভাকে হস্তে ধরিয়া তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "আস্‌ব বৈ কি ঠাকুরঝি। তুমিও মাঝে মাঝে যেও ভাই।"

বৌদি ও ঠাকুরঝি এই দুটি নূতন সম্বোধন শুনিয়া ও বলিয়া এক নূতন ভাবে সুসঙ্গিনীর সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সামান্য দুটি কথায় কেন যে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, কেনই বা তাহার দুটি চক্ষে এমন করিয়া জল ভরিয়া উঠিল তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

সুসঙ্গিনী এককোঁটা চোখের জল ফেলিয়া রোয়াকে শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া ঝিয়ের সঙ্গে বাটীর বাহিরে আসিল। বাড়ী যাইবার পথে এক কথাই বারবার তাহার মনে হইতে লাগিল—আজ যদি তিনি থাকিতেন তাঁর পায়ে ধরিয়া বলিতাম—ওগো আমি তোমাকে বুঝতে পারি নাই, তাই কত ব্যথা দিয়াছি, আমায় ক্ষমা করিও।

ঝিয়ের অলক্ষিতে সুসঙ্গিনী বারবার চক্ষু মুছিতে মুছিতে-মুছিতে পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভৈরব বাবু।

সুসঙ্গিনী শাশুড়ীর সহিত দেখা করিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে একদিন অপরাহ্নে হেরম্ববাবুর জ্ঞাতি-বর্গীয় পুত্র সুধীর আসিয়া যোগমায়াকে প্রণাম করিয়া কহিল; "জ্যাঠামশায় বাইরে এসেছেন। আপনাদের বাইরের ঘরে বোসে, আপনাকে গোটাকতক কথা বলে যাবেন। আসতে পারেন তিনি?"

"হ্যাঁ, আস্‌বেন বৈ কি বাবা। নিয়ে এস তাঁকে।" বলিয়া যোগমায়া তাড়াতাড়ি বাহিরের দুয়ার খুলিয়া দিয়া সুধীরকে তাহার জ্যোঠামহাশয়কে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জ্যাঠামহাশয়কে ডাকিয়া সুধীর তাঁহাকে বাহিরের ঘরে বসাইল।

জ্যোঠামহাশয়ের গেরুয়া বসন পরিহিত দীর্ঘ গৌর দেহ ও প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যোগমায়া কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"আমাকে কি বলবেন, বলুন।"

ভৈরববাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,"মা, আমি তোমার চেয়ে বয়সে ঢের বড়, সেজন্যে তুমি বলেই কথা আরম্ভ করলাম কিছু মনে করো না। আমি যে দুটী কারণে তোমার কাছে এসেছি মা, তা এক এক করে বলছি।"

বলিয়া সুধীরকে একবার ডাকিলেন। সুধীর জ্যাঠামহাশয়কে বসাইয়া দিয়া বাড়ীর ভিতরকার একটা পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল যে, তাঁহাদের বাড়ী তাঁহাদের কিছুই না বলিয়া, গাছে উঠিয়া পড়াটা উচিত হইবে কি না। এমন সময় জ্যাঠামহাশয়ের

আহ্বান শুনিয়া আপাততঃ সে চিন্তা ত্যাগ করিয়া ঘরের প্রবেশ করিল।

সুধীরকে দেখিয়া ভৈরব বলিলেন, "সুধীর এঁকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নাও।" তারপর যোগমায়ার সামনে যাইয়া বলিলেন, "মা, আমার প্রথম অনুরোধ, তুমি এই বালককে আশীর্ব্বাদ কর।"

যোগমায়া বালককে সস্নেহে দীর্ঘজীবন ও বিদ্যা-সমৃদ্ধির আশীর্ব্বাদ করিয়া উঠাইলেন।

সুধীর তখন আবার পেয়ারার অভিযানে বাহির হইয়া পড়িল।

একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া ভৈরব বাবু বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার ভাই যে ব্যবহার করেছে, তাতে আমার তোমার কাছে আসতে লজ্জা পাওয়া উচিত। কিন্তু আমি এসেছি তার হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে। সে নিজের জিনিস নিজের স্বার্থ এতবড় করে দেখছে যে আর কারো একান্ত স্বার্থ তার নজরেই পড়ছে না। এতে তো তার কল্যাণ হবেনা মা। সে যা করেছে তার মার্জ্জনা নেই। তবু মা তোমাকে আমি চিনি, তাই তার এতবড় অপরাধের জন্যেও ক্ষমা চাইতে সাহস করছি। তাকে তুমি যদি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা না করো মা তাহলে তার সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত।"

যোগমায়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি আপনাকে সত্যি বলছি তাঁর উপরে আমার কোন আক্রোশ নেই। তিনি যা করেছেন, তাঁর মেয়ের ভাল ভেবেই। এতে করে তিনি আমার ভালও করেছেন। স্বামী পুত্র হারিয়ে তাঁদের সম্পত্তি নিয়েই মত্ত হয়ে ছিলাম। এটা তো ভাল হচ্ছিল না। তাই ভগবানই ওঁর হাত দিয়ে সে সব কেড়ে নিলেন। তিনি আঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন এতে আমার মঙ্গল নেই। বৌমার বাপের এতে কোন দোষ নেই।"

ভৈরব বাবুর মুখমণ্ডল একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "তুমি যে এ দুঃখটাকে এমন সহজ করে নিতে পেরেছ এতে বড় সুখী হলাম মা। ওই তো চাই। এর চেয়ে বড় সাধনা তো খুব কমই আছে। তিনি যা দেবেন সবই আমার মঙ্গলের জন্যে, এটুকু মান গ্রহণ করতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকবে না।"

যোগমায়া আপনার প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিলেন।

ভৈরব বাবু আবার বলিলে, "কিন্তু মা একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া করবার আছে। সুনুর হাত দিয়ে যে কাগজ কল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, তা নেওনি কেন মা? কেন মনে করতে পারছ না যে ভগবান আমার হাত দিয়ে তোমাকে ওই জিনিষটা পাঠিয়ে দিলেন?"

যোগমায়া নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "তা যদি দেবেন তাহলে যেগুলি আমি আমার বলতাম, সেগুলি হাত থেকে সরিয়ে নিলেন কেন? বোধ হয় ভগবান আমাকে অভাবেই রাখতে চান। সে অবস্থাতে আপনার টাকা নেওয়াটা তাঁর ইচ্ছার বিপরীত হবে না কি? আর যতই পাব, ততই তো লোভ বেড়ে যাবে।"

ভৈরব বাবু বলিলেন, "কিন্তু মা তোমার যে এখন টাকারও দরকার। তোমার কাছে যে মেয়েটি রয়েছে তারও যে বিয়ে দিতে হবে।"

যোগমায়া। আমার বাবার ভাগলপুরে যে বাড়ী আছে তা ওই পাবে, খান দুয়েক গহনাও ওর গায়ে আছে। এই থেকে তাঁর দয়া হলে একরকম চলে যাবে।

ভৈরব বাবু এবার একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "তা'হলে মা আমাকে এমনিই ফিরিয়ে দেবে?"

যোগমায়াও একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমার উপর রাগ করবেন না বাবা। আমার স্বামী একটা ব্যবস্থা করে গেছেন, তার থেকে আমি মাসে দশ টাকা করে পাই। মোটামুটি ভাবে চলতে পারলে এতেই কুলোনো উচিত। বেশী লোভ করাটা গর্হিত, তাই আমি আপনার অর্থ সাহায্য নিচ্ছি না। তবে যদি আমার কখনো দরকার হয়, তাহলে আমি নিঃসংকোচে আপনাকে জানাব একথা বলে রাখছি।"

"তাহলে মা, তোমার কখনও যদি দরকার হয়

আমাকে বৃন্দাবন ধাম হরিদাস বাবাজীর আশ্রম এই ঠিকানায় জানিও। তাহলে যেখানেই আমি থাকিনা কেন খবর পাব। এখন তবে উঠি মা।"

বলিয়া ভৈরব বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যোগমায়া ভৈরব বাবুকে আর একবার প্রণাম করিলেন। ভৈরব বাবু আশীর্ব্বাদ করিলেন, "শ্রীভগবানের চরণে তোমার অচলা মতি হোক মা। তোমার চরিত্র লোকের আদর্শ হোক।"

হাঁ মায়ের মত মা বটে! মণির দুর্ভাগ্য যে এঁর সঙ্গে তার বিবাদ করতে হ'ল। এমন শাশুড়ীর কাছে মেয়েকে রাখতে পারলে না সে!

ভাবিতে ভাবিতে ভৈরব বাবু বাসায় আসিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অশোক ও অনুপ্রভা।

প্রভাতে অশোক যোগমায়ার নূতন বাড়ীতে আসিয়া ডাকিল, "খুড়িমা।"

অনুপ্রভা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন "অশোক দা, আসুন।" তার পর ঘরের ভিতর হইতে একখানি আসন আনিয়া বসিতে দিয়া কহিল, "মাসীমা গঙ্গায় নাইতে গেছেন, এলেন বলে।"

অনুপ্রভার সহিত কথা কওয়া আজ তার প্রথম, তাই কিসের একটা আনন্দ ও ভয়ে অশোকের বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল।

অশোক কহিল, "এত সকালে এই শীতে নাইতে গেছেন!"

অনুপ্রভা মাসীমা তো বারমাস সকালেই নান; আর উনি শরীরকে কত কষ্টই যে সওয়াচ্ছেন, বাইরে থেকে কেউ তা বুঝতে পারে না। মাসীমার মত মানুষ আমি আর কখনও দেখিনি। একি, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।

অশোক আসনে বসিয়া কহিল, "খুড়িমার মত মানুষ পাওয়া সত্যিই দুর্লভ। আমার মনে হয় খুড়িমার স্নেহ পাওয়া একটা সৌভাগ্য। অথচ এ স্নেহ পেয়ে মনে হয় না যে আমি একাই এ ভোগ করি। আর কাউকে ভাগ দিতে পারলে যেন আরও ভাল লাগে। যেমন তোমাকেও তো খুড়িমা ভালবাসেন, কিন্তু তার জন্যে কোন ঈর্ষা হয় না। বলিয়া অশোক অনুপ্রভার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

অনুপ্রভাও নত মস্তকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি তো কাল এলেন না। মাসীমা সন্ধ্যার সময় বল্‌ছিলেন আপনি বোধ হয় আস্‌বেন।"

অশোক এই কথাটাতেও একটা কি রকম আনন্দ অনুভব করিল। কয়েক মাস হইল অনুপ্রভা এখানে আসিয়াছে এবং এই কয়মাস সে এই পিতৃমাতৃহীনা কিশোরীর সংকোচহীন ব্যবহার, সংযত ও স্নিগ্ধ কথাবার্ত্তা, সুনিপুণ ও সস্নেহ পরিচর্য্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। আজিকার এই কথাটায় তাহার মনে হইল বোধ হয় অনুপ্রভাও খুড়িমার সহিত তাহার প্রতীক্ষায় ছিল।

এই কথাটুকুতে মনে মনে আনন্দ অনুভব করিয়া অশোক বলিল, "আমাদের তো সে রকম কলেজ নয় যে শনিবার কলেজ হলেই ছুটি হবে আবার সোমবারে খুলবে। আমাদের রবিবারেও কায করতে হয়।"

অনুপ্রভা অশোকের পানে তাহার শান্ত সরল চোখ দুটি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা তাহলে আপনি কি করে বাড়ী আসেন?"

অশোক উত্তর দিল, "দরকার পড়লেই আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিতে হয়। তাও একটা দিন বা একটা রাত্তিরের বেশী আজকাল ছুটি মেলে না।"

দুজনেই খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা তোমার আর সে দেশের জন্য মন কেমন করে না?"

কথাটা একটু অতর্কিত হওয়ায় অনুপ্রভা একবার চমকিত হইয়া একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সেখানে আর কে আছে যে মন কেমন করবে। মা

বাবার আর দাদামশায়ের কথা মনে হ'লে বড় কষ্ট হয়।"

বলিতে বলিতে অনুপ্রভার চক্ষু হইতে বড় বড় কয় ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

অনুপ্রভাকে কাঁদিতে দেখিয়া অশোক বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল। সে ভাবিল ঐরূপ প্রশ্নে যে অনুপ্রভার কষ্ট হইবে তাহা পূর্ব্বেই তাহার ভাবা উচিত ছিল।

অশোক কুণ্ঠিত হইয়া কহিল "আমার একথাটা তোলা বড় অন্যায় হইয়া গেছে অনু। তুমি কিছু মনে কোরো না।"

তারপর একটু সান্ত্বনা দিয়া শান্তভাবে কহিল, "এদুঃখ তো সবারি জন্য সঞ্চিত আছে। একদিন না একদিন পেতেই হবে।"

অনুপ্রভা চোখের জল মুছিয়া কহিল, "প্রায় এক সঙ্গেই আমার সব দুঃখগুলি পেতে হ'ল তাই বড় কষ্ট হয়। বাবা মাকে বলতেন অনুকে বেশ ভাল করে লেখপড়া শেখাব, ওকে যেন খুব গুচ্ছির খানি সংসারের কায দিয়ে ঘিরে ফেলোনা। কায তো বড় হলে করবেই কিন্তু তখন হয়ত লেখপড়া করবার সময় আর পাবে না। মা আমার বাবার কথা এমন মানতেন যে পারতপক্ষে আমাকে তিনি কোন কায করতে দিতেন না। শেষে বাবাকে আবার বলতে হ'ত কাযটাও তো শেখা দরকার, একটু একটু কাযও শিখিও।"

বলিয়া অনুপ্রভা স্বর্গগত জনক জননীর অসীম স্নেহের কথা ভাবিয়া আর একবার অশ্রু মুছিল।

অনুপ্রভার অশ্রুবিন্দুগুলি যেন তীক্ষ্ণকণ্টকের মত অশোকের বক্ষে বিঁধিতে লাগিল। স্নেহের সহিত একটা বিরাট সহানুভূতির ঢেউ তাহার হৃদয়ের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। সান্ত্বনার দুটি মিষ্ট কথা বলিবার জন্য তাহার সমস্ত মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু লজ্জায় সেভাবের কোন কথা সে বলিতে পারিল না।

কথাটা অন্যদিকে উলটাইয়া লইবার জন্য শেষে অশোক কহিল, "তোমার কাকাদের কাছে থাকার চেয়ে এখানে ভাল আছ তো?"

অনুপ্রভা আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "তা খুব আছি। মাসীমার কাছে মায়ের মতই স্নেহ পাচ্ছি। আর বাবা মারা গেলে সেখানে যে কটা দিন মা ছিলেন, কি কষ্টই তিনি পেয়েছিলেন। তবে মাসীমার মতই তিনি কোন কষ্ট পেয়ে বলতেন না, তাই এক রকমে কেটে যেত। কিন্তু সেই অবস্থাতেও বাবার ইচ্ছা বলে আমাকে ঠিক ভাবে পড়াশুনো করতে দিতেন। না পড়লে দুঃখ করতেন। কাকারা কত সেই জন্যে নিন্দা করতেন, দুর্ব্বাক্য বলতেন, তিনি গ্রাহ্য করতেন না; কোন উত্তরও দিতেন না। আমি যদি বলতাম মা, এখন এই দুর্দ্দশা হল, আর ওসব কেন? মার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠতো, আর আমার পানে চেয়ে বলতেন তাঁর ইচ্ছা ছিল তুমি ভাল করে লেখা-পড়া শেখ; আমার যতদুর সাধ্য তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করতেই হবে, নইলে যে আমি শান্তি পাব না মা।"

অশোক মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা মারা যাবার কত পরে তোমার মা মারা গেছেন?"

অনুপ্রভা মৃদুস্বরে বলিল, "ছমাস পরে। ডাক্তার বলেছিলেন বাবার কথা ভেবে ভেবেই মা মারা গেলেন। মা যাবার সময় বলে যান, এখানে আর থেকো না মা, তোমার মাসীমার কাছে গিয়ে থেকো; তা'হলে আর ভাবনা থাকবে না।"

অশোক অনুপ্রভার মায়ের সম্বন্ধে আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, এমন সময় যোগমায়া গঙ্গাস্নান করিয়া আর্দ্রবসনে ফিরিয়া অশোককে দেখিয়া বলিলেন, "অশোক যে! কতক্ষণ এসেছিস্ বাবা?"

অশোক বলিল, "প্রায় আধঘণ্টা হ'ল এসেছি খুড়িমা! আচ্ছা খুড়ীমা, এত শীতে তুমি একখানা শুকনো কাপড় কেন নিয়ে যাওনা? হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যে অসুখ করবে।"

যোগমায়া একঘটি জল লইয়া পা ধুইতে ধুইতে

বলিলেন, "এখনও ডাক্তার হসনি, এরি মধ্যেই আরম্ভ করলি বাবা! কিন্তু অভ্যাসে সব সহ্য হয় এটা তো মানিস্?"

অশোক। কিছু কিছু হয় তা মানি। তা বলে শীতের সকালে একেবারে আধক্রোশ হেঁটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে, তার পর খালি গায়ে থাকলে শরীর বেশী দিন সহ্য করবে না, তাও মানতে হবে।

যোগমায়া। দেখ্ অশোক, ডাক্তার হয়ে শুধু রোগ হলে তার চিকিৎসা কি করতে হবে এটা শিখিস্‌নে। কি হলে রোগ বেশী হবে না সেটাও দেখা দরকার। আমার মনে হয় ঠাণ্ডা, জল বা বাতাসকে অত ভয় না করে সব যদি একটু সইয়ে নেওয়া যায় তো তার ফল খুব ভাল হয়। অত সহজে সর্দ্দি লাগে না, অসুখও করে না। তুই বাবা, সবাই যা বলে, অন্ধের মত তা শুনে যাসনে, নিজে একটু ভেবে নতুন নতুন বিষয় সন্ধান করে আমাদের দেশের চিকিৎশাস্ত্রের সঙ্গে তাদের চিকিৎসাশাস্ত্র মিলিয়ে একটা নতুন সত্যিকার সুস্থ থাকবার উপায় বার কর।

অশোক যোগমায়ার কথাগুলি শুনিয়া শ্রদ্ধা না করিয়া করিয়া থাকিতে পারিল না। একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার কথা সব সত্য খুড়িমা। তবু তুমি কাপড় ছেড়ে এসে কথা কও তুমি এই শীতে তোমার ভিজে কাপড়ে কথা কইছ, আর আমার বুকের ভিতর যেন কাঁপুনি হচ্ছে।"

যোগমায়া ঘরের ভিতর গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিলেন। অশোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে অশোক, তুই তো তাহলে এই আস্‌ছিস সবে কল্‌কাতা থেকে। একটু চা করে এনে দিক।"

অশোক একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়িমা আমি তো তোমাকে বলিনি যে আমি এখ্‌খুনি আসছি, কেমন করে তুমি জানলে?"

যোগমায়া বলিলেন, "শরৎ যাবার পর থেকে তুই যে আগে আমাকে দেখে তবে বাড়ীতে যাস। কাল রাতে এলে অবশ্যই আসতিস।"

অনুপ্রভা ততক্ষণ উঠিয়া গিয়াছিল। সে মনে মনে এই ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, চায়ের কথাটা তাহার আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল।

অশোক বলিল, "খুড়িমা তোমার যে এখন আহ্নিকের সময়। আহ্নিকটা সেরে এস, আমি ততক্ষণ বসি।"

যোগমায়া বলিলেন, "সে পরে হবে'খন বাবা। তোর সঙ্গে দুটো কথা কই আগে। এখন আহ্নিকে গেলে ত তোরই কথা মনে হবে, ভগবানের দিকে ত মন যাবে না।"

এই কথাতে অশোকের প্রতি যোগমায়ার যে স্নেহ প্রকাশিত হইয়া পড়িল তাহা অশোক মনে মনে বুঝিয়া বড় আনন্দ লাভ করিল।

যোগমায়া যেন একটু ভাবিয়া বলিলেন, "দেখ্ বাবা এবার থেকে একটা কথা বলব ভেবে রেখেছি। অনুর বয়স ত ১৫ হল। এবার একটা সম্বন্ধের চেষ্টা ভাল করে কর, আর দেরী করা ভাল নয়।"

কি কারণে তাহা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু কথাটা শুনিবামাত্র তাহা যেন একটা আঘাতের মতই অশোকের কাণে বেদনা দিল। একটু সামলাইয়া দেরীতে বলিল, "হাঁ দেখব খুড়িমা। কিন্তু তাড়াতাড়ি অনুর বিয়ে হয়ে গেলে তোমার যে একলা থাকতে হবে।"

যোগমায়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা বলে আর উপায় কি বাবা? আর দেরী করা ঠিক নয়। আমি চোখ বুজলেই তখন যে আরও মুস্কিল হবে।"

আর একটু পরে অনুপ্রভা চা লইয়া আসিল।

"বাঃ সুন্দর রং হয়েছে তো!" বলিয়া অশোক চা লইয়া ধীরে ধীরে পান করিল।

তারপর উঠিয়া যোগমায়াকে প্রণাম করিয়া কহিল, "তা হলে এখন উঠি খুড়িমা, আবার বিকালের দিকে আসবো'খন"

পথে বাহির হইয়া অশোক ভাবিতে লাগিল—অনুর বিবাহের কথায় তাহার মনটার ভিতরটা কেন ঐরকম বেদনা বাজিল। সে যে অনুকে নিজে বিবাহ করিবে

এমন কথা কোন দিন মনে করে না। কিন্তু তাহাকেও বিবাহ ত একদিন করিতে হইবে। হাঁ, বিবাহ করিবার যোগ্য পাত্রী বটে।

তারপর সে মনে মনে কহিল—যাহার সহিত অমুর বিবাহ হউক না কেন, সে যেন যোগ্যপাত্রে পড়ে; কখনও কষ্ট যেন না পায়। ভগবান অমুপ্রভাকে যেন সর্ব্বসুখে সুখিনী করেন। নিজের অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

তারার বেদন

গগনের তারা ভুবনের পানে
　　কেন অপলকে চাহিয়া রয়?
নিদ্রা-বিহীন দীর্ঘরজনী
　　জাগে যুগ-যুগ ধেয়ানময়!
খুঁজে মরে সে কি সাধ অমরায়
কোথা বাঞ্ছিত দয়িত কোথায়;—
জনম তাহার যাবে কি বৃথায়,
　　লভিবে না কভু কামনা জয়?
নিরাশা-আঁধার হৃদাকাশে তার
　　কবে হবে ওগো অরুণোদয়?

সে কি হয়ে কভু মরণের দূত
　　গভীর নিশীথে প্রবেশি ঘরে—
নিয়েছিল হরি' পরাণ-পুতুল
　　জননীর বুক শূন্য করে?
বিলাপ রোদন শোকাতুরা মা'র
আকাশে-বাতাসে তোলে হাহাকার,
কম্পিত করি দিগ্‌দিগন্ত
　　বেদনার সুরে ফেলিল ভরে;
তারি জ্বালা দিয়ে জ্বলে কি তারকা
　　শত অভিশাপ বক্ষে ধরে?

করুণ কোমল প্রেম-বিহ্বল
　　সে কি ছিল কোন গেহের রাণী,
আশা সুমোহন-স্বপন বুনিয়া
　　রচেছিল তার কুটীর খানি?
কোথা হতে এল তুষারের ধার—
মুকুল-বাসনা ফুটিল না আর,
লুকানো যে র'ল মনের কোণায়
　　সোহাগের কত ললিত-বাণী;
সুখ-জীবনের স্মৃতিটীরে আজ
　　নিতে চায় সে কি বুকেতে টানি?

সে কি ছিল ওগো কামিনী কুসুম
　　প্রসারিত বন-অলক 'পরে;
এল উন্মাদ উত্তর-বায়ু,—
　　নিশি না পোহাতে পড়িল ঝরে?
আজো বুঝি তাই তৃষিত নয়নে
চেয়ে আছে প্রিয় কাননের পানে,
ফুলের মধুর সঙ্গ হারায়ে
　　নীরবে আপনি গুমরি মরে;
আঁখিজল তার শিশিরের রূপে
　　সারা বসুধায় পড়িছে ঝরে।

সে কি ছিল কোন স্বাধীন দেশের
　　যশোমণ্ডিত মুকুট' পরি
বিজয়ের মহা গৌরব ভাতি—
　　পরাধীনতার কালিমা হরি'?
আজি আর হায় নাহিক সুদিন—
অধীনতা-পাপে সে দেশ মলিন,
তাই কি উজল পুণ্যের শিখা
　　গেছে চলি তারে আঁধার করি—
ওই সে সুদূর মুক্ত গগনে,
　　স্বাধীনতা যারে রেখেছে' বরি।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

স্বাস্থ্যরক্ষায় আপত্তি *

কাহার আপত্তি ?—"বীরবলের।"

কিরূপে জানিলে ?—গত পৌষমাসের "ভারতবর্ষে" উদ্ধৃত, "বিজলী" পত্রে প্রকাশিত, "গুরুশিষ্য-সংবাদ" পড়িয়া।

কিন্তু কিসের স্বাস্থ্যরক্ষা ?—সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা।

"বীরবল" কি বলেন ?—শ্রবণ করুন :—

শিষ্য।—"বাংলা সাহিত্যসমালোচনা পড়ে দেখুন, তার ভিতর সুধু একই বিষয়ের বিচার আছে। লেখাটা শিব কি অশিব, এই হচ্ছে সমালোচকদের একমাত্র ভাবনা। এই কারণেই বাংলায় "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" বেরিয়েছে।"

গুরু।—"এর কারণ জানো ? সাহিত্যে যারা শিব গড়তে বাঁদর গড়ে, তারাই হচ্ছে সব সাহিত্যরাজ্যের মহা শিবভক্ত।"

বীরবল স্বাস্থ্যরক্ষা চান না কে বলিল ?—অবশ্য চান, কিন্তু সে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষাতেই তাঁহার যত আপত্তি।

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা মানে কি ?—মানে সেই বইটা পড়িলেই জানিতে পারিবেন।

কিন্তু বই না পড়িলে কি জানিতে পারিব না ? —সমালোচক হইলে পারিবেন। কারণ সমালোচক হইলে, বিশেষতঃ গালি দিতে হইলে, বই না পড়িলেও চলে।

বীরবল তবে সে বই পড়েন নাই ?—না পড়াই সম্ভব।

তাহার প্রমাণ ?—তিনি নিজেই বলিতেছেন,—উক্ত পুস্তকে কেবল একই বিষয় আছে—লেখাটা শিব কি অশিব। বইটা পড়িলে এরূপ ভ্রম হইত না।

কিন্তু তিনি যে উক্ত গ্রন্থের উৎপত্তির কারণ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন ?—তাহাও বই না পড়ার ফল।

সে কেমন ?—"সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা"র গ্রন্থকার আর যে সব বই লিখিয়াছেন তাহাতে কেবল বাঁদরই গড়িয়াছেন। তাঁহার "উড়িষ্যারচিত্র," "ধ্রুবতারা," "অনুপমা" কেবল কিষ্কিন্ধ্যার ইতিহাস। সুতরাং গ্রন্থকার একজন মহা শিবভক্ত।

বীরবল বই না পড়িয়া সমালোচনা করেন কেন ?—তাহার কারণ তিনি সাহিত্যরাজ্যে একজন বীর এবং তাঁহার গায়ের বলও খুব বেশী।

শ্রীনন্দী।

* এই লেখাটি দুইমাস পূর্ব্বে প্রকাশার্থ 'ভারতবর্ষ' সম্পাদকের নিকট পাঠান হইয়াছিল। দুইমাস পরে তিনি জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে ইহার স্থান হইবে না। অথচ "গুরুশিষ্য সংবাদ" ভারতবর্ষে উদ্ধৃত করা হইয়াছিল। Journalistic fairness আমরা কবে শিখিব ?—লেখক।

অভাগী

কেমন করে বলব সখি কি ব্যথা মোর হৃদয় মাঝে
থেকে থেকে উথ্‌লে উঠে আজ,
কি যেন কি ঝড়ো হাওয়ার মাতন আমার বক্ষে বাজে
টুটিয়ে দিয়ে সকল বাঁধন-লাজ!
যতই কঠিন দেহের বেদন, সহ্য করা অনেক সোজা,
মনের বেদন সহ্য করা ভার ;
ব্যথার ব্যথী না হ'লে সই, বেদন-দাহ যায়না বোঝা
ছলকে ওঠা জোয়ার জলের ধার!
মিথ্যা সবই, মিথ্যা সখি জগৎ মাঝে মায়ার খেলা
সুখ কোথা সই তপ্ত মরুর গায় ?
এক নিমেষে ভেঙ্গে গেছে স্বপ্নে গড়া সুখের মেলা
ডুবলো খেয়া ঘাটের কিনারায়!

কেমন করে সইগো সখি, কেমন করে সইগো আমি
　　অবশ হৃদে রুধি নয়ন ধার ?
নামিয়ে এমু সুখের ভরা বিভল প্রাণে, দিবস যামী
　　দিন যে এখন সহ্য করা ভার।
দুখ-সায়রে ডুব দিয়েছি ঠিক থাকি তাই দুখের মাঝে,
　　সুখের পরশ কেমন করে সই ?
সুখের মাঝে বুঝতে পারি কোন খানে মোর দুঃখ বাজে
　　তাই যে বেদন-বিভল হয়ে রই।
বাপের আমি বড় মেয়ে কত সুখে ছিলাম সেথা
　　শ্বশুর বাড়ীর আমিই বড়বধূ,
চারিদিকের আদর আমার ভুলিয়েছিল সকল ব্যথা
　　ভেবেছিলাম জীবন বুঝি মধু।
সুখ সোহাগে ডুবে ছিলাম, সুপ্ত ছিলাম প্রেমের ডোরে
　　ভাবতে যে আজ কেমন হ'য়ে যাই!
সুখের নিশা ফুরিয়ে গেল অভাগিনীর স্বপ্নঘোরে
　　কেমন করে জানব বল তাই ?
হঠাৎ হিয়ার কুঞ্জবনে চিতার আগুন উঠ্‌ল জ্বলে
　　পোড়া বুকে পড়ল বুঝি বাজ;
প্রভাত আলোর ক্ষণিক হাসি মিলিয়ে গেল কমলদলে
　　ফুটিয়ে তুলে পুড়িয়ে গেল আজ!

এমনদিনে বরণ ডালার ভার ছিলতো আমার' পরে,
　　আজ যে হোথা যেতে আমার নাই!
অলক্ষুণে, কপালপোড়া আজকে আমি, বাসরঘরে
　　একটুখানি নাই তো সখি ঠাঁই।
আমার ঘরে আমার দোরে পারব নাকো যেতে আমি
　　আমাতে মোর নাইকো অধিকার।
তাই বলি সই কেমন করে অমন দিনে দিবসযামী
　　অবশ হৃদে রুধি নয়ন-ধার।
ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকি মুখটি ঢেকে আপনমনে
　　কখন পাছে দেখতে কেহ পায়!
লজ্জা ভরে সঙ্কুচিতা, শিউরে উঠি ক্ষণে ক্ষণে,
　　অশ্রু মুছি কোণের নিরালায়।
কে জানে গো সুখের দিনে কোন অভাগীর চক্ষে ধারা,
　　উৎসবে হায় নাইক কাহার ঠাঁই ?
কি ব্যথা আজ বক্ষ চেপে, প্রাণ করে মোর পাগল-পারা,
　　কেমন করে সইব বল তাই!

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

একজন অতিবড় ধনীর কথা

জগতের ঐশ্বর্য্যশালী লোকেদের মধ্যে রথস্চাইল্ড, কার্নেগী, রকফেলার প্রভৃতির নামই এদেশে অনেকের কাছে পরিচিত। তাঁহারা ভিন্ন তাঁহাদের সদৃশ বা তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর ধনবান ব্যক্তির কথাও শুনা যায়। পিয়ারপণ্ট মরগ্যান (J. Perpont Morgan) এর নাম এখানে অনেকেই জানেন না, কিন্তু তাঁহার ন্যায় অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ তাঁহার সময়ে বা পূর্ব্বেও আর কেহ ছিলেন না। ইনিও আমেরিকার লোক ছিলেন।

এই অদ্ভুত ধনসম্পন্ন ব্যক্তি একদিনে ১৫০০০০০০০৲ টাকা কোনও এক বিষয়ে চাঁদা স্বরূপ দান করিলেও কাহাকেও তাঁহার কৈফিয়ৎ দিবার ছিল না। যে সম্পত্তির উপর তাঁহার আধিপত্য ছিল তাহার পরিমাণ ১৯১৬২৫০০০০০৲ টাকা। ইহার পূর্ব্বে কোন এক ব্যক্তির আয়ত্তাধীনে এত অধিক ধন কখনও ছিল না। তাঁহার চরিত্র লেখক বলেন, তেতাল্লিসটী প্রধান প্রধান জাতির বার্ষিক আদায়ী রাজস্বের অপেক্ষা মিষ্টার' মরগ্যানের সম্পত্তি প্রায় ৩০০০০০০০০০৲ টাকা অধিক এবং পৃথিবীর

সমস্ত সুবর্ণের মূল্যের অপেক্ষা প্রায় ৬০০০০০০০০০৲ টাকা অধিক।

তিনি ১৬টী ষ্টীমার লাইন ও ৪৪টী রে লাইনের অধিকারী ছিলেন। উহাতে ৩০০ বৃহদায়তন বাষ্পীয় পোত এবং ৩০০০০ যাত্রীগাড়ী ও মালগাড়ী চলাচল করিত। তাঁহার রেল লাইনের বিস্তৃতি প্রায় ১০৮৫০০ মাইল এবং ১২০০০০০ মালবহনের উপযোগী তাঁহার ষ্টীমার ছিল।

এই মহা ধনাঢ্যের চরিত্রগত বিশিষ্টতা, দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যাবলী, ক্ষমতার গূঢ়সূত্র কি, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অসাধারণ সাফল্যের কারণ জানিবার জন্য সকলেরই ঔৎসুক্য হয়।

তিনি সূক্ষ্মশিল্পের একজন বিশেষ অনুরাগী ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ অতিশয় প্রবল ছিল এবং দানও পর্য্যাপ্ত ছিল।

তাঁহার দৈহিক গঠনের মধ্যে কোনও বিশেষত্ব না থাকিলেও এমন একটা কিছু ছিল, যাহাতে একবার তাঁহাকে যে ব্যক্তি দেখিত সে কখনও ভুলিতে পারিত না। তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিশুদ্ধ শক্তির প্রভাবে তিনি লোক-সাধারণকে বশতাপন্ন করিতে পারিতেন। তাঁহার দৈহিক উচ্চতা ছয় ফুট এবং ওজন প্রায় আড়াই মণ ছিল। তাঁহার উৎসাহপূর্ণ দীর্ঘ অবয়ব, লোমশ ভ্রূযুগল ও বলিষ্ঠ মুখমণ্ডল দেখিলেই তাঁহাকে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বলিয়া মনে হইত। সহস্রের মধ্যে একজনেও তাঁহার মত শারীরিক ও মানসিক শক্তির একত্র সমাবেশ দেখা যায় না। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তিনি সর্ব্বদাই পৃথিবীর প্রবল ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে সজ্জিত থাকিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছেন।

তাঁহার ক্ষমতাপূর্ণ গঠন দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে পরুষ-ভাবাপন্ন মনে করিতেন। কিন্তু এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের হৃদয় সৌজন্য এবং দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি অন্যত্র তিনি সর্ব্বত্রই অত্যন্ত তৎপরতার সহিত সকল কার্য্য করিতেন। কোনরূপে বিলম্ব না হইয়া যায় এই দিকেই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। যে কোন দিন প্রাতে ১১টার সময় তাঁহার অফিস দ্বারের পানে চাহিলেই দেখা যাইত যে, একখানি একঘোড়ার গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল উহা সম্পূর্ণ থামিবার পূর্ব্বেই একটি ভদ্রলোক গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সজোরে গাড়ির কাটা দরজা বন্ধ করিলেন। তিনিই মিঃ মরগ্যান। এক মিনিট পরেই তাঁহাকে একেবারে উপরিতলে দেখা যাইত।

তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি নিত্যকর্ম্মের দাস ছিলেন না। মোটামুটী প্রত্যহ প্রাতে ৮টার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন। ১১টার সময় তাঁহার কর্ম্মস্থানে যাইতেন এবং বৈকাল ৪॥০টার সময় একখানি গাড়ী করিয়া অফিস ত্যাগ করিতেন।

তিনি তাঁহার অংশীদার, সেক্রেটারি, প্রভৃতির সহিত সংক্ষেপে বাছা বাছা কথাগুলি মাত্র কহিতেন। একের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তর শেষ হইবার পূর্ব্বেই অন্যের দিকে ফিরিয়া কথা কওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল। তিনি যখনই কোন গুরুতর বিষয় লইয়া চিন্তাযুক্ত থাকিতেন, তখনই দেখা যাইত নিজ পাজামার দুই পার্শ্বের পকেট বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া অফিসের চারিদিকে পাইচারি করিতেছেন।

তিনি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে অপরের সহিত অধিক বাক্যব্যয় করিতেন না এবং দরকারি কথা হইলেও, ঠিক কাযের কথা ছাড়া অবান্তর কথা কাহাকেও কহিতে দিতেন না। ঐরূপ কথা কওয়া স্বভাব বিশিষ্ট লোককে প্রায়ই তিনি ভর্ৎসনা করিতেন। অনাবশ্যক দর্শক বা আগন্তুকের নিকট হইতে রেহাই পাইবার জন্য তাঁহার নিজস্ব একজন দ্বাররক্ষক ভিন্ন কুড়িজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত। তিনি সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের আদৌ দেখা করিতে দিতেন না। ঐরূপ কেহ বা কোন ফটোগ্রাফার হঠাৎ তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তথা হইতে সরিয়া যাইতেন।

তিনি যতক্ষণ অফিসে থাকিতেন তন্মধ্যে আট দশটী বড় হাভানা চুরুট পোড়াইতেন। দেড়টার সময় তিনি যে জলযোগ করিতেন তাহা অতি সামান্য

রকমের, তন্মধ্যে চা ই তাঁহার প্রিয় পানীয় ছিল। তিনি কোনরূপ মদ্যপান ভালবাসিতেন না। সর্ব্বদাই বলিতেন, "ওগুলা না খাওয়াই ভাল, তবে শিকারে গিয়া ঠাণ্ডা লাগিলে একটু পানে ক্ষতি করে না।"

অবসর বিনোদনের জন্য তিনি গল্প ও মাছধরা ভালবাসিলেও, নৌকা করিয়া বেড়ান তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সমুদ্র ভ্রমণ যে বিশেষ উপকারী, ইহা তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং বৎসরে প্রায় দুইবার করিয়া আটলান্টিক মহাসাগর পার হইতেন।

মিঃ জে, পেয়ারপণ্ট মরগ্যান

কর্ম্মস্থলে মিঃ মরগ্যানের গাম্ভীর্য্য, স্বল্পভাষিতা প্রভৃতি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইলেও, তাঁহার বাসগৃহে, ভ্রমণ সহচররূপে এবং অন্য যে কোন স্থানে দেখিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিয়া তাঁহাকে একজন অতি বিনয়ী, ধার্ম্মিক ভাবাপন্ন, শিল্পানুরাগী, কুকুর ও ঘোটকপ্রিয় সাধারণ ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হইত। সকল প্রকার শিল্পের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অত্যন্ত অধিক ছিল। চিত্র, প্রস্তরাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রভৃতির কদর তিনি যেরূপ বুঝিতেন, তাহা দেখিয়া ঐ সকলের দোকানদারগণ বিস্মিত হইত। ইহা ছাড়া তিনি গান-বাজনা, উদ্যান পালন, উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ে একজন পারদর্শী লোক ছিলেন।

তাঁহার উন্নতি ও সৌভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপালাভের গুহ্যকারণ প্রধানতঃ—

(১) তাঁহার সরলতা ও স্পষ্টবাদিতা।

(২) পরিশ্রমপ্রিয়তা।

(৩) প্রতিভার পবিত্র শক্তি।

তাঁহার এই সকল গুণাবলীর সহিত আশ্চর্য্য উচ্চভাবাপন্ন মন, কার্য্যকরণেচ্ছা, গড়িবার ক্ষমতা এবং আর্থিক প্রবলতা তাঁহার জন্মগত। তাঁহার মাতার নিকট হইতেই তিনি এ সব অমূল্য গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা নবইংলণ্ডের প্রথম অভ্যুদয় সময়ের কোনও বংশের কন্যা ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ গুণসম্পন্না অসাধারণ প্রতিভাবতী মহিলা ছিলেন।

শ্রীহরিহর শেঠ।

কার্য্য পরিদর্শনের জন্য আসিতেন। ইহা ব্যতীত আমাদের হাসপাতাল খোলার পর প্রায় দুইমাস যাবৎ আমাদিগকে সিভিল হাসপিটালের কার্য্য করিতে হইত। আউট ডোর রোগীই মাত্র ছিল। লেফটেনেন্ট গুপ্ত আমারায় সিভিল সার্জ্জনের কার্য্য করিতেন, এজন্য তাঁহার অতিরিক্ত ভাতা ও ডাক আসিলে ভিজিটের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আউট ডোর রোগীর মধ্যে সহরের ইহুদী ও আরবী রমণীর সংখ্যাই বেশী। তাহাদের অধিকাংশেরই চক্ষুর পীড়ার চিকিৎসা হইত। অতিরিক্ত গরম ও ধূলার জন্য চক্ষুরোগের প্রাদুর্ভাব এদেশে এত বেশী।

বাঙ্গালী ডাক্তারের সুনাম আছে বলিয়া মধ্যে মধ্যে ইংরাজ কর্ম্মচারী ও সৈন্যেরা তাহাদের ডাক্তার পৃথক থাকা সত্ত্বেও আমাদের ডাক্তারদের নিকট চিকিৎসার জন্য আসিত। ডাক্তার বাগচীর দাঁত তোলায় পাকাহাত জানিয়া প্রায়ই দন্তবেদনায় কাতর ইংরাজ সৈন্যেরা ডাক্তার "বাগ্‌সা"র খোঁজ লইতে আসিত।

আউটডোর রোগীদের দেখিতেন কর্ণেল নট্ট নিজে। সে সময় গোলাপী, বেগুনি, নীল সবুজ প্রভৃতি রেশমী কাপড়ের বাহার লাগিয়া যাইত বলিয়া আমাদের দলের অনেকেই রোমান্সের সন্ধানে সেদিকে ঘেঁসিত, কিন্তু একদিন একটি ইহুদি যুবক যখন বলিল যে তোমরা সকলেই কালো (তাহার ইংরাজিতে you all black) তখন অনেকেই সরিয়া পড়িলেন।

আমাদের কার্য ছিল প্রতিদিন ৪ঘণ্টা করিয়া ওয়ার্ডে সকলের টেম্পারেচার লওয়া, ঔষধ খাওয়ান ও ডাক্তারদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার সময় সাহায্য করা। একটী Sanitation Squad বা স্বাস্থ্যরক্ষকের দল হইয়াছিল। তাহারা সমস্ত হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য দায়ী ছিল। প্রতিদিন নিজেদের ও রোগীদের ব্যবহারের জন্য তাজা তরকারি ডিম প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য একটী দল ছিল এবং নিজেদের ও রোগীদের রসুই করিবার জন্য কিচেন ডিউটীরও একটী দল ছিল। ইহা ব্যতীত তাম্বু খাটান, মাল টানা, পানীয় জল ক্লোরোজিন দ্বারা বিশুদ্ধ করা, জাহাজ হইতে রোগী নামান ও জাহাজে

সহরে আরব ছুতার মিস্ত্রী

রোগী উঠাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যের জন্য মধ্যে মধ্যে প্রায় সকলকেই ফেটিগ ডিউটি বা শ্রমের কায করিতে হইত।

পাছে আমাদের পূর্ব্ব শিক্ষিত ড্রিল ভুলিয়া যাই সেজন্য ওস্তাদ বাঘ সিং মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে লইয়া প্যারেড করিতে যাইত।

সম্ভ্রান্ত আরব স্বামী স্ত্রী

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমরা সহর।

বসোরা হইতে প্রায় ১০০ শত মাইল পশ্চিমে টাইগ্রীস নদীর বামপার্শ্বে আমারা সহর অবস্থিত। সহরের উত্তর ও পশ্চিম দিক বেষ্টন করিয়া আর একটি ছোট পার্ব্বত্য নদী আসিয়া সহরের পশ্চিম প্রান্তে মিশিয়াছে। প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে পারস্যের নীল পর্ব্বতরাজি দৃষ্টিগোচর হয়। এই গিরিশ্রেণীর নাম পুস্ত-ই-কুহ। এইটি বসরা ভিলায়েতের দ্বিতীয় সহর। এখানে প্রায় ২০ হাজার অধিবাসীর বাস। অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। প্রায় এক সহস্র ইহুদী ও কয়েক ঘর নসরাণী বা খৃষ্টানও সেই সহরে বাস করে। আরব মুসলমানেরা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত সহরের স্থায়ী আরব মুসলমান ও গ্রামবাসী বেদুইন। ব্যবসা বানিজ্য, চাকুরি প্রভৃতি আরবদের পেশা। সহরের বেদুইনেরা অধিকাংশ মজুর ও ভৃত্যের কায করে। ইহুদীরা প্রায় সকলেই দোকানদার। খৃষ্টানেরা চাকুরীজীবী। পারস্যের সীমান্ত আমারা হইতে বেশী দূর নয় বলিয়া এখানে শ্রমজীবীদের ভিতর ইরাণী কুলির সংখ্যাও বড় কম নয়। ইরাণীদের অসাধারণ শারীরিক শক্তি। আমাদের যে রঞ্জন আলোকের যন্ত্রটি ছিল, তাহার মোট বহিতে কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে চারিজন করিয়া কুলির প্রয়োজন হইত। কিন্তু এখানে একজন ইরাণী কুলি অনায়াসে তাহা বহন করিয়া লইয়া গেল।

বেদুইনরা গ্রামবাসী আদিম আরব। পশুপালন ও তাহার দুগ্ধ, লোম ও মাংস বিক্রয়ই তাহাদের প্রধান ব্যবসা; কৃষিকার্য্য অধিকাংশই সহরের অধিবাসীরাই করে। খর্জ্জুরের চাষ ও রপ্তানীও ভদ্র বা জমিদার শ্রেণীর হাতে। বেদুইনেরা ইহাদের অধীনে জন মজুর খাটিয়া থাকে মাত্র। নির্দ্দিষ্ট ভূমি চাষ করিয়া

বেদুইনগণ

আমাদের দেশীয় মুসলমানদের প্রিয় ফেজ এবং স্ত্রীলোকের বোরকা এদেশে নাই। ইহুদীরা ফেজ ব্যবহার করে এবং ইহুদী রমণীরা বাহিরে আসিবার সময় একখণ্ড শক্ত রেশমের কাপড় কপাল হইতে বুক পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেয়।

বেদুইনরা সকলেই পাজামা ও আলখাল্লা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার লম্বা সেমিজ ও মাথার ক্লোক ব্যবহার করে। ভদ্র বা বেদুইন রমণী মাত্রেই উল্কির আদর করিয়া থাকে; দুই বাহু, চিবুক, নাসিকার অগ্রভাগ, কপালের মধ্য ভাগে সকলের উল্কি দেখা যায়। বর্ষীয়সী ইহুদী রমণীদেরও উল্কি দেখিয়াছি, কিন্তু অল্পবয়স্কা যুবতীরা এখন আর উল্কি পছন্দ করেন না। ইহুদী রমণীরা হাল ফ্যাসনের উচু গোড়ালীর জুতা ও মোজা এবং আরব রমণীরা উঁচু গোড়ালীর চটী ও মোজা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহুদী ও খৃষ্টান পুরুষেরা এক ফেজ ব্যতীত অন্য সব ইউরোপীয় পোষাক এবং নেকটাই ব্যবহার করে; বৃদ্ধেরা কেহ কেহ জাতীয় আরব পোষাকই পছন্দ করে। আমাদের দেশে বাবুদের হাতে যেরূপ ছড়ি, আরব দেশীয় সৌখীন পুরুষেরা তাহার স্থলে সকলেই অ্যাম্বারের বড় বড় দানাদার জপের মালা হাতে করিয়া বেড়ায়। প্রথম দেখিয়া ইহাদের সকলকেই জপপরায়ণ ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিতাম; শেষে শুনিলাম ওটা একটা ফ্যাসান। বোগদাদে শিক্ষিত লোকেরা অবশ্য এখন ছড়িই ব্যবহার করেন।

সহরের অধিকাংশ বাড়ীই ইষ্টক নির্ম্মিত। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই একটী করিয়া পাতাল গৃহ বা তয়-

ফসল উৎপন্ন করে এরূপ বেদুইন নাই বলিলেও হয়।

ভদ্র আরবদের বেশভূষা অনেকটা বাইবেলের ছবির মত। পাজামা, তাহার উপর একটা লম্বা আলখাল্লা, পৃষ্ঠে আগুলফ লম্বিত একটী ক্লোক বা চোগা; আলখাল্লার উপর আঙ্গরাখা বা বড় চৌকা রুমাল। মাথায় তাহা ঠিক হইয়া থাকিবে বলিয়া একটা পশুলোমের দড়ীর বেষ্টনী। ভদ্র স্ত্রীলোকরাও পাজামা, আলখাল্লা ও ক্লোক ব্যবহার করে। তবে পুরুষেরা ক্লোকটী কাঁধের উপর রাখে, স্ত্রীলোকের তাহা মাথায় দিয়া থাকে।

থানা। গ্রীষ্মের সময় বাড়ীর কর্ত্তা এখানে আশ্রয় লয়েন। সহরের প্রান্তভাগে দরিদ্র বেদুইনদের পর্ণকুটীর—উপরে খেজুর পাতার আচ্ছাদনী এবং খেজুর ডালের বেড়ার উপর মাটীর প্রলেপ।

সহরের প্রায় মধ্যস্থলে বাজার। একটা প্রকাণ্ড লম্বা খিলানের কোঠা, তাহার ভিতর ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে এক একটী দোকান। নব বিজীত সহর বলিয়া বাজারে যাইতে হইলে আমাদের অফিসারের সহিযুক্ত পাশের বন্দোবস্ত ছিল কেহ নিরস্ত্র হইয়া বাজারে যাইতে পারিত না। কিন্তু এ নিয়মটীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল বোধ হইল না, কারণ আরবীয়েরা অতি আহ্লাদের সহিত বৃটিশ বাহিনীর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। বাজারের প্রবেশ পথে ও রাস্তায় মিলিটারি পুলিস পাহারা দিতেছে, পাছে সহরের অধিবাসীদের উপর কোনও জুলুম হয়। কাহারও বাটীতে প্রবেশ বা স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ আমাদের নিষিদ্ধ ছিল। বিনা প্রয়োজনে কেহ সিভিল পপুলেসন বা সহরের অধিবাসীদের সহিত কথা বলিতে পারিত না।

বাজারে ফলের মধ্যে তরমুজ, ফুটী, ও টক ডালিম ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। বাদাম জাতীয় ফল মেসোপটেমিয়ায় জন্মে না, বাদামের অভাব ইরাকবাসিগণ কুমড়ার বিচি দিয়া পূরণ করিয়া থাকে।

নাপিতের দোকানগুলি বেশ মনোরম। চার পয়সায় কামান ও দুই আনায় চুল ছাঁটা হইত। বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বন্দোবস্ত। দোকানে যাইয়া চেয়ারে বসিলেই একজন গলাকাটা আবরণ লইয়া গলায় লাগাইয়া দেয় ও তাহার পর বেশ যত্নের সহিত শীতল জল দিয়া মাথা ধুইয়া চুল কাটিতে থাকে।
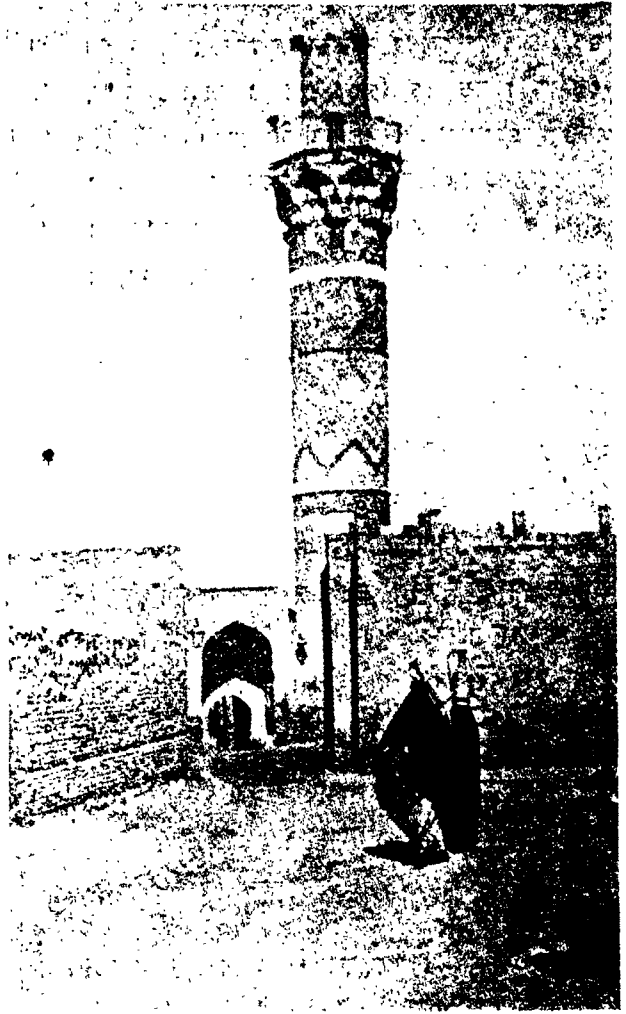
আমারার মিনারেট

মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের বহির্ব্বাণিজ্য বেশীর ভাগই ভারতবর্ষ হইতে চলিত, কাযেই ব্যবসায়ীরা ইংরাজের অধিকারে বোম্বাই বা বোম্বাইএর পথ পরিস্কার হইল বলিয়া আহ্লাদিত। রেশমের কাপড় এদেশে খুব প্রচলিত কিন্তু সেখানে কোথাও রেশমের ব্যবসায় আছে কি না তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় ইউরোপ হইতে চালান আসিত।

প্রতি জিনিষে ভারতবর্ষের ন্যায় ইংরাজি নামের বা বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তে ফরাসী ভাষায় লেখা। এদেশে

যে চিনির ব্যবসায় হয় তাহাও ইউরোপ হইতে আসে। গুড়, চিনি সে দেশের বাজারে কখনও দেখি নাই। এক প্রকার বড় বড় চিনির গোলার ব্যবহার আছে, সেগুলি ওজনে প্রায় দুই সের আড়াই সের।

সেনাবিভাগ হইতে সহরের পশ্চিমপ্রান্তে কসাইখানা স্থাপন করা হইয়াছিল। যাহার প্রয়োজন সেখানে যাইয়া ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি কাটাইয়া আনিত। সহরের মধ্যে স্বাস্থ্যের জন্য পশুহত্যা নিষিদ্ধ ছিল।

বাজারের নিকটেই সহরের ঠিক মধ্য ভাগে আমারার মিনারেট বা স্তম্ভ। মেসোপটেমিয়ার প্রতি সহরেই মনুমেণ্ট আকৃতি এই মিনারেটগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। মিনারেটের নিচেই মসজিদ। মিনারেটগুলি ইটের তৈয়ারী ও ফাঁপা। ব্যাস প্রায় ১৫ পনর হাত। উপরিভাগে একটি সবুজ বা এনামেলের কায করা গুম্বজ।

আমারা সহরের আর একটী উল্লেখযোগ্য জিনিষ সেখানকার হামাম বা স্নানাগার। আমরা মধ্যে মধ্যে সেখানে স্নান করিতে যাইতাম। পুস্তকে পঠিত ইস্তাম্বুল বা দিল্লীর স্নানাগারের ন্যায় এগুলি স্ত্রীলোক-ঘটিত নয়। পুরুষেই স্নান করাইয়া দেয়। স্নানাগারটি মাটীর নীচে গরম জলের বাষ্পেপরিপূর্ণ, মাঝখানে একটী প্রকাণ্ড পাথরের বেদী. প্রায় উলঙ্গ হইয়া তাহাতে শুইতে হয়। একজন জোয়ান আরবী ঝিঙের খোসা ও সাবানের সাহায্যে গা ডলিয়া দেয়। যতক্ষণ এ ব্যাপার চলে ততক্ষণ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সহ্য করিতে হয়; বাহিরে আসিলে শরীর এত হাল্কা বোধ হয় যেন পাখা বাহির হইয়াছে, ইচ্ছা করিলেই উড়িতে পারি। স্নানাগারটী কিন্তু বড়ই অপরিস্কার; উল্লেখ করিলে মালিক বলিল যে বোগদাদে ইহা অপেক্ষা ভাল আছে। এক এক জনের স্নান করিতে মাত্র চারি আনা লাগে।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

অমরকণ্টক ও নেমাওয়ার

১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত "Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle" নামক বার্ষিক বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী সংগৃহীত হইল।

অমর কণ্টক মধ্য-ভারতবর্ষের একটী প্রধান তীর্থস্থান অনেকের ধারণা যে, নর্ম্মদা ও শোণ এই দুই নদীর উৎপত্তি অমরকণ্টকে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের পেন্ড্রা রোড ষ্টেশনে নামিয়া ঐ স্থলে যাইতে হয়, পেন্ড্রারোড হইতে অমরকণ্টক পাহাড় পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, ইংরাজ শাসনকালে তাহার মেরামত হইত। এখন রেওয়া ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহা অগম্য হইয়াছে। পাহাড়ের অপর পারে একটী ক্ষুদ্র নদী। ঐ নদীর ধার হইতে পার্শ্ববর্ত্তী মালভূমি প্রায় দুই সহস্র ফুট উচ্চ। অমরকণ্টকে খান কয়েক কুঁড়ে ঘর আছে। তথায় ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা বাস করে। ঐ তীর্থস্থ মন্দির-গুলির নির্ম্মাণ প্রণালী দুই প্রকারের। নর্ম্মদা মাইএর মন্দিরের চতুর্দ্দিকের দেবগৃহগুলি অনেকটা আধুনিক। আর যে কুণ্ডটী নর্ম্মদা ও শোনের উৎপত্তিস্থল বলিয়া লোকের ধারণা, তাহার আশে পাশের মন্দিরগুলি পুরাতন পদ্ধতিতে তৈয়ারি। অমরকণ্টকের ব্রাহ্মণেরা পুরাতন মন্দিরস্থ দেবদেবীর পূজা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহারা নর্ম্মদা মাইএর ভবনের নিকটে এক নূতন কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাকে নর্ম্মদা ও শোনের উৎপত্তিস্থল বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অমরকণ্টকে কর্ণ-রাজের আমলে নির্ম্মিত ত্রি-মন্দিরের এবং ঐ অঞ্চলের

(ক) সম্মুখ

নেমাওয়ারের সিদ্ধনাথের মন্দির

(খ) পশ্চাৎ
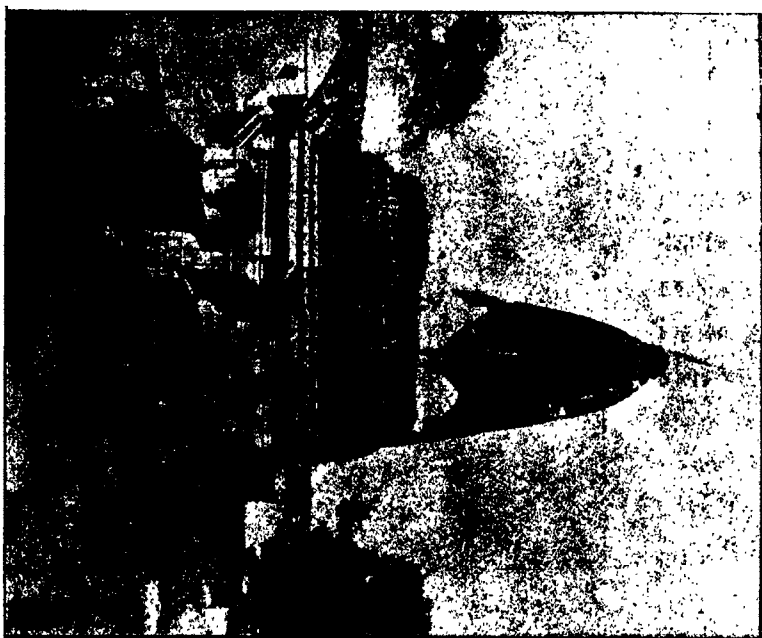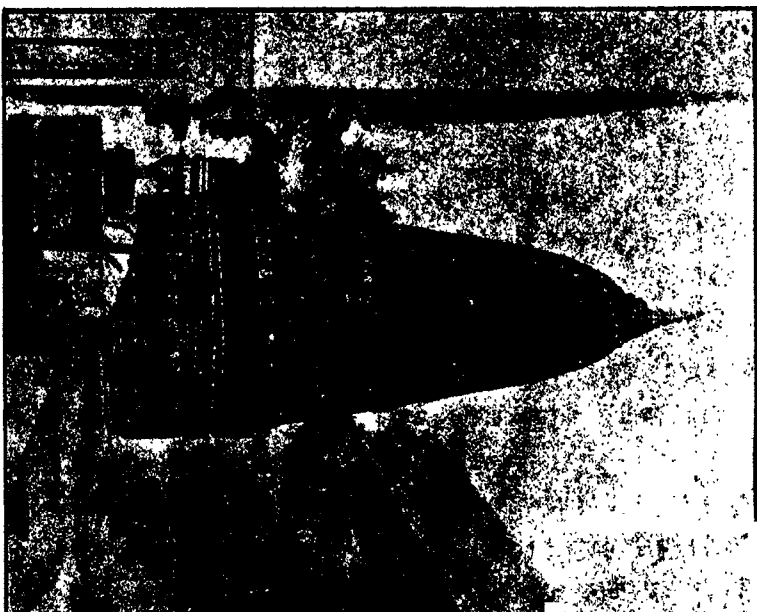
অন্যান্য মন্দিরের নির্ম্মাণ প্রণালীতে অনেক তফাৎ। পশ্চিম ভারতবর্ষে যুদ্ধ-কালে, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে কয়েকস্থলে চালুক্য পদ্ধতিতে গঠিত মন্দির দেখিয়া, কর্ণরাজের হয় ত ঐ খেয়াল জাগিয়াছিল। ত্রি-মন্দিরের মাঝেরটী হইতে, দেবতার পূজা ও স্নানের জল বাহির হইবার জন্য এক প্রকার অদ্ভুত বন্দোবস্ত আছে। ঐ জল গর্ভগৃহ হইতে বাহির হইয়া, একটী ফাঁপা দেওয়ালের মধ্যে পড়িয়া নর্দ্দমায় যায়। ঐ নর্দ্দমার শেষ-ভাগে অবস্থিত সিংহমুখ দিয়া ক্রমে জল বাহির হয়।
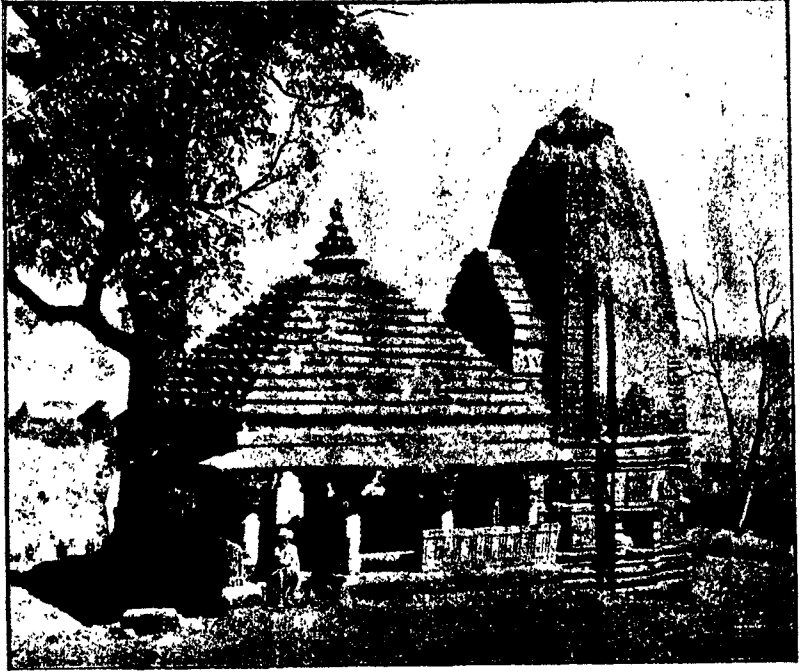
পাতালেশ্বরের মন্দির—অমরকণ্টক

উক্ত ত্রি-মন্দিরের উত্তর দিকে কেশব নারায়ণের মন্দির। ইহার কিয়দংশ নাগপুরের ভোঁসলা রাজাদের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ঐ মন্দিরে শঙ্খ চক্র গদা-পদ্ম ধারী এক বিষ্ণুমূর্ত্তি পদ্মের উপরে দণ্ডায়মান। পদ্মের নীচে উড্ডীয়মান গরুড়ের মূর্ত্তি। মন্দিরের দুই কোণে বামন ও বুদ্ধ অবতারের বিগ্রহ। আর দুই কোণে পরশুরাম ও কল্কী। বুদ্ধের পিছনে তীরধনুক হাতে শ্রীরামচন্দ্র। কল্কীর পিছনে লাঙ্গলধারী বলরাম। মন্দিরের থামের মাথায় বরাহ, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারের মূর্ত্তি।

উক্ত মন্দিরের উত্তরে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির। আটটী থামের মাথায় উহার মণ্ডপ। মন্দিরের ছাদ নয়টী চতুর্ভুজে বিভক্ত।

নর্ম্মদা মাইএর মন্দিরের চারিদিকে যে সকল মন্দির আছে, উহার একটীর মূর্ত্তি নূতন রকমের। একটী পদ্মের কুঁড়ি হাতে করিয়া উনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দুই ধারে দুই রমণী মূর্ত্তি। মস্তকের উপরে ছত্র এবং মস্তকের দুই ধারে ফুলের মালা হাতে দুইটী গন্ধর্ব।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ের হার্দা ষ্টেশন হইতে বার মাইল দূরে, নর্ম্মদা তীরস্থ নেমাওয়ার নামক স্থানের মন্দির, পুরাতত্ত্ববিদের অবশ্য দর্শনীয়। উহা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। মূর্ত্তির নাম সিদ্ধনাথ। মণ্ডপের উত্তর পূর্ব্ব ধারে মাথার পিছনে চুল বাঁধা ভৈরব মূর্ত্তি। ভৈরবের দুই ধারে দুইটী প্রেত। মন্দিরের দেওয়ালে নিরানব্বইটী নানাপ্রকারের পুরুষ ও স্ত্রী মূর্ত্তি। ইহাদের কাহারও দুইটী কাহারও চারটী হাত। হাতে হরেক রকমের জিনিস—কমণ্ডলু, ভৃঙ্গার, ত্রিশূল, সর্প, পদ্ম প্রভৃতি। এক কোণে মহিষ-মর্দ্দিনীর সুন্দর প্রতিমা। তাঁহার ষোলটী হাত—ত্রিশূল দিয়া তিনি মহিষাসুর বধ করিতেছেন।

এতৎ সঙ্গে অমরকণ্টকের পাতালেশ্বর মন্দিরের এবং নেমাওয়ারের সিদ্ধনাথ মন্দিরের চিত্র দেওয়া হইল।

শ্রীগৌরহরি সেন।

সিদ্ধম্ ও স্বস্তিক

প্রাকৃত ভাষায় লিখিত অনুশাসনগুলির প্রারম্ভে একটা চিহ্ন থাকিত তাহার নাম সিদ্ধম্। কখনও কখনও বা সিদ্ধম্ কথাটাই লেখা থাকিত। * ইহার অর্থ—সিদ্ধি হউক। আর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনুশাসনগুলির প্রারম্ভে "ওং" লিখিয়া, তৎপরে কোন দেবতার নামের পরে "নমো" লেখা থাকিত। সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষার মধ্যে প্রাকৃতভাষাই অনুশাসনগুলিতে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সংস্কৃতভাষার ব্যবহার পরে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা হইতে একটা মতবাদ খাড়া করা যাইতে পারে যে, বেদের ছান্দস্ভাষা বা সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্ব হইতেই প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ভাষা অনুশাসনগুলিতে ক্রমশঃ স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রাকৃতভাষার ব্যবহার লোপ করিয়া দিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের ভাষা সংস্কৃত, জৈনধর্ম্মের ভাষা প্রাকৃত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ভাষা পালি। যখন ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই হিন্দুমতাবলম্বী হইয়া পড়িল এবং সমস্ত অনুশাসনগুলিতেই প্রাকৃতের স্থানে সংস্কৃতভাষা প্রচলিত হইল, তখন শুধু হিন্দু বলিয়া নহে, জৈন এবং মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণও সংস্কৃতভাষায় তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম্মের পণ্ডিত-গণকে স্বীয় ধর্ম্মমত বুঝাইবার জন্যই সম্ভবতঃ জৈন ও বৌদ্ধগণ এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু জন-সাধারণ লেখাপড়া করিবার প্রারম্ভে কখনই "ওম্" শব্দ ব্যবহার করিতেন না, তাঁহারা "সিদ্ধম্" কথাটাই নানারূপে ব্যবহার করিতেন। তাই বাঙ্গলাদেশে বর্ণমালা আরম্ভ করিবার সময়ে "সিদ্ধিরস্তু অ আ" ইত্যাদি বলা হইত। পূর্ব্বে পত্রের শিরোদেশে ৮৭ লিখিয়া পরে শ্রীদুর্গা বা শ্রীহরি লেখা হইত। এখনও হিন্দী পত্রের প্রারম্ভে লেখা হয়, স্বস্তি শ্রী। হিন্দুর কাজকর্ম্মের জন্য জিনিষের ফর্দ্দের গোড়ায় সিদ্ধি ৫ পয়সার লিখিবার রীতি ও বিজয়া দশমীর দিনে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র সিদ্ধি খাইবার রীতি (বাঁকুড়ায় নাম কুসুম্ভা) এই সিদ্ধম্ কথা হইতেই জন্মিয়াছে।

ষ্টীন সাহেব পূর্ব্ব বা চীনতাতারের অন্তর্গত খোতানে যে সকল কাগজপত্র বাহির করিয়া-ছেন, তাহার মধ্যে "সিদ্ধম্ চাঙ্" নামে কোষ্ঠীর মত গুটান কাগজ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বর্ণমালা ও ফলা প্রাচীন হস্তাক্ষরে লিখিত আছে। ইহার বর্ণমালা ও প্রত্যেক ফলার প্রারম্ভে "সিদ্ধম্" এর চিহ্ন আছে। এই সিদ্ধম্ চিহ্ন ১ম চিত্রে দেওয়া হইল। ইহা দেখিতে অনেকটা সিদ্ধিদাতা গণেশের শুঁড়ের মত। ২য় চিত্রে যাহা দেওয়া হইয়াছে, মুর্শিদাবাদের উত্তরাংশে তাহার নাম গণশাকুড়ি এবং বাঁকুড়ায় তাহার নাম গণেশ-আঁখুড়ি। ১ম চিত্রে একটি বিন্দু বসাইয়াই যে দ্বিতীয় চিত্র করা হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রথমচিত্রের রেখাটি একপাশ হইতে অন্য পাশ পর্য্যন্ত টানা হইয়াছে। উপর হইতে নীচের দিকে এইরূপ দুটি পৃথক্ পৃথক্ রেখা টানিয়া প্রত্যেক রেখার উপরের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটি রেখা টানিলে ৩য় চিত্র হইবে। বাঁকুড়া জেলায় (সম্ভবতঃ পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলায়ও) লক্ষ্মীপূজার দিন আলিপনায় এইরূপ চিত্র আঁকা হয়। ইহাকে লক্ষ্মীর পা বলে। বক্ররেখা দুইটির মুখ ঠিক একই দিকে না রাখিয়া একটির মুখ বিপরীত দিকে রাখিলেই ৪র্থ চিত্র হইবে। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে যে কোন শুভকাজে আলিপনার নানা চিত্রের মধ্যে এই চতুর্থ চিত্র আঁকা হয়। ইহার নাম লক্ষ্মীর পাছুঁটা। এই চিহ্ন অন্যত্রও দেখা যায়।

১ম চিত্রের সিদ্ধম্ রেখাটীর উপরে, উপর হইতে

* চণ্ডের প্রাকৃতলক্ষণ সংস্কৃতে লিখিত হইলেও প্রারম্ভে সিদ্ধম্ কথা আছে। একটা মজার কথা, টীকাকার এই সিদ্ধম্ কথার অর্থ করিয়াছেন, প্রসিদ্ধম্।
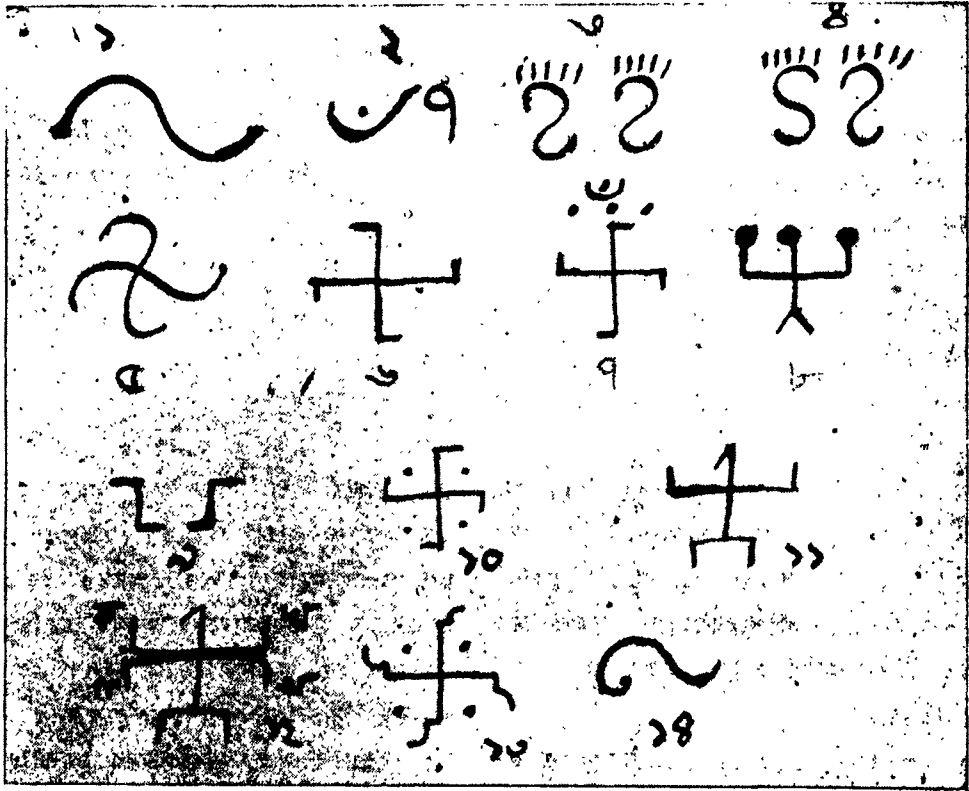
নীচের দিকে সেইরূপ একটী রেখা টানিলে ৫ম চিত্র হইবে। ঠিক এইরূপ চিত্র এসিয়া মাইনরে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অশোক অনুশাসনেও এইরূপ চিত্র আছে। ৫ম চিত্রের রেখাদুইটীর মাঝের অংশ ও মুখ দুইটী সরল রেখা করিলে ষষ্ঠ চিত্র হইবে। ইহা বৌদ্ধদিগের স্বস্তিক। মুখগুলি বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিলে জৈনস্বস্তিকের প্রধান অংশ হয়। তিব্বতের অবৌদ্ধ বন-পা সম্প্রদায়ের স্বস্তিকও এইরূপ। এই দুই প্রকার স্বস্তিক গ্রীস, ইটালি, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। তবে ভারতবর্ষ ও ফিন্‌ল্যাণ্ডে স্বস্তিক চিহ্নের যেমন শুভকার্য্যেই ব্যবহার ছিল, গ্রীস ইটালি প্রভৃতি অঞ্চলে সেরূপ দেখা যায় না। সেখানে যেন শোভার জন্যই মৃৎপাত্রের গায়ে অন্যান্য চিত্রের সঙ্গে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকিত। *

বৌদ্ধস্বস্তিকের মুখগুলি ঘুরাইয়া বিপরীত দিকে দিলেই জৈনস্বস্তিকের প্রধান অংশ হয়। তাহার মাথার দিকে তিনটী বিন্দু ও তাহার উপরে একটী চন্দ্রবিন্দু দিলেই পূর্ণ জৈন স্বস্তিক হয় (৭ম চিত্র)। এই তিনটী বিন্দু দুই পাশের দুই বিপরীত মুখের উপরে ও উপরে-নীচে-অঙ্কিত রেখার উপরে দিলে এবং নীচের মুখটীর বদলে দুটী তির্য্যক রেখা টানিলে দোকানদারের খাতার স্বস্তিক হয় (৮ম চিত্র)। এইরূপ চিত্র বাঁকুড়া জেলায় দেখিয়াছি। ১১শ ও ১২শ চিত্র হুগলী ও মুর্শিদাবাদ জেলায় দোকানদারের খাতায় সিন্দুরে আঁকা দেখিয়াছি। এরূপ চিত্র দোকানের দেওয়ালেও আঁকা থাকে। ৯ম চিত্রের রেখা দুইটী তাহাদের মধ্যস্থলে রাখিলে ১২শ চিত্রের ক খ ও গ ঘ রেখা হইবে। এই রেখা দুইটী যে "সিদ্ধম্" চিহ্ন হইতেই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১২শ চিত্রের উপর হইতে নীচের রেখাটীও এই 'সিদ্ধম্'

* The svastika and the omkara by Hari krisna Deva. (J, A, S, B, vol xvii, 3, New series)

চিহ্ন হইতে হইয়াছে, কেবল নীচের মুখ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই চিত্রটি হইতেই চতুর্ভুজ সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। ঠিক এইরূপ বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ এই ত্রিরত্নের চিহ্ন হইতে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামের মুর্ত্তির কল্পনা হইয়াছে অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন। ৮ম, ১১শ ও ১২শ এই তিনটী চিত্র সিদ্ধির চিহ্ন বা সিদ্ধিদাতা গণেশের চিহ্ন রূপে নূতনখাতার সময়ে ব্যবহৃত হয়।

বর্দ্ধমানে কোন মাড়োয়ারির দোকানে এবং বিষ্ণুপুরে কোন বাঙ্গালীর দোকানে ১০ম চিত্র আঁকা দেখিয়াছি। ১৩শ চিত্র ১০মের প্রকারভেদ। বিষ্ণুপুরে কোন বাঙ্গালীর দোকানের বাহিরে এই চিহ্ন আঁকা আছে।

সিদ্ধম্ কথাটার অর্থ যেমন সিদ্ধি হউক, স্বস্তিক কথাটার অর্থ তেমনই শুভ হউক। সুতরাং এই দুইটী কথাই প্রায় এক অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

স্বস্তিক চিহ্ন এসিয়া ও ইয়ুরোপের অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে দেখিলে স্বতঃই মনে হয় ইহার উৎপত্তিস্থল এক। সে স্থান কোথায়? শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ওঙ্কার হইতেই স্বস্তিকের উৎপত্তি। ইহা ঠিক হইলে আর্য্যদের আদিম নিবাসেই এই চিহ্নের জন্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

তিনি বলেন—ওম্ কথাটির ও'র দীর্ঘ উচ্চারণ প্রকাশ করিবার জন্ম সম্ভবতঃ একটীর উপরে আর একটি 'ও' বসাইয়া ৬ষ্ঠ চিত্রের স্বস্তিক চিহ্ন করা হইয়াছে। ব্রাহ্মী অক্ষরের ও'র দুই প্রকার রূপ ৯ম চিত্রে দেখান হইয়াছে। ৬ষ্ঠ চিত্রের সরল রেখাগুলিকে বৃত্তের রেখার ন্যায় বক্র করিলেই ৫ম চিত্রের রূপ হইবে। এইরূপ স্বস্তিকই অশোক অনুশাসনে দেখা যায়।

ইহাতে কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে। ওম্ কথাটিরই যখন প্রাকৃত, পালি এবং ইয়ুরোপীয় ভাষায় প্রয়োগ নাই, তখন ওম্ এর চিহ্নের কিরূপে ব্যবহার থাকিতে পারে? ওম্ কথাটির মূলে যে অর্থই থাকুক শেষে, দাঁড়াইয়াছিল ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধগণ, স্বস্তিক ওম্ এর চিহ্ন হইলে তাহা কখনই ব্যবহার করিতেন না। আর স্বস্তিক চিহ্ন যদি ওম্ কথারই সমার্থক হইত, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার অনুশাসনে বা কোন গ্রন্থে ইহার কোথাও না কোথাও প্রয়োগ থাকিত। তদ্ভিন্ন যখন ব্রাহ্মণগণ ওম্ কথাটিকে এত সাবধানে ব্যবহার করিতেন যে, অন্য কাহাকেও শুনিতে পর্য্যন্ত দিতেন না, তখন ওম্ এর সমার্থক চিহ্নটিও তাঁহারা অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে নিশ্চয়ই দিতেন না। অথচ দেখা যাইতেছে যে, স্বস্তিক চিহ্ন সিদ্ধম্ চিহ্ন এবং সিদ্ধম্ ও স্বস্তি কথা দুটি নানা আকারে ও নানা স্থানে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত।

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে অধিকাংশের মত এই যে প্রথমে বেদের ছান্দস্ ভাষা, পরে লৌকিক সংস্কৃত ভাষা এবং সর্ব্বশেষে সংস্কৃতের বিকারে প্রাকৃত ভাষার জন্ম হইয়াছে। বৈদিক ছান্দস্ ভাষার সহিত গ্রীক, লাতিন, গথিক, শ্লাভোনিক প্রভৃতি ভাষার সাদৃশ্য দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই সকল ভাষার উৎপত্তি কোন একটা সাধারণ ভাষা হইতে হইয়াছে এবং এই সকল ভাষার লোকের পূর্ব্বপুরুষদের আদি বাসস্থান মধ্য এসিয়া। এজন্য দেব মহাশয়ের একটু সুবিধা হইয়াছে যে তিনি স্বস্তিকের ব্যবহার বিভিন্ন আর্য্যভাষীদের মধ্যে দেখিয়া সংস্কৃতের 'ওম্' শব্দ হইতে স্বস্তিকের উৎপত্তি অনুমান করিতেছেন। কিন্তু যে কারণে ইয়ুরোপের আর্য্যভাষার উৎপত্তি বৈদিক ছান্দস্ ভাষা হইতে অনুমান না করিয়া একটা সাধারণ ভাষা হইতে ইয়ুরোপীয় ও ইরাণীয়, ভারতীয় ভাষাগুলির উৎপত্তি অনুমিত হইতেছে, ঠিক সেই কারণেই প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত হইতে নহে, ঐ সাধারণ ভাষা হইতেই প্রাকৃতেরও জন্ম এমন অনুমান করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত ভৌগোলিক বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের উত্তর সম্ভবতঃ চীন তাতার ও নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বহু জাতি বৈদিক ঋষিগণের ভারতে আগমনের পূর্ব্বে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদেরই ভাষা ছিল প্রাকৃত এবং তাহারাই

সিদ্ধম ও স্বস্তিক চিহ্ন ব্যবহার করিত। শকজাতি ভারতের বিখ্যাত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ এবং নাগবংশ এই সকল জাতির মধ্যে প্রধান। সম্ভবতঃ মধ্য এসিয়ার এই অংশেই ফিন্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সহিত ভারতের প্রাকৃত-ভাষী জাতিদের একটা সম্বন্ধ ছিল।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের ভাষার সহিত যে সকল জাতির সাদৃশ্য আছে ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া "ফিনো-উগ্রিয়ান' আখ্যা দিয়াছেন। এই সকল জাতির সহিত ভারতের পৌরাণিক জাতির আচার ব্যবহারে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। মূর্ত্তি-পূজা বেদে ছিল না, পৌরাণিক জাতির মধ্যে তাহা দেখা যায়। সেই মূর্ত্তি পূজা এই ফিনো-উগ্রিয়ান জাতিদের মধ্যে দেখা যায়। বজ্রধারী (ইন্দ্র) দেবতা ও জীব-রুধির-রঞ্জিত-বদনা দেবতার (কালী) পূজা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে এবং পিতৃপুরুষদের পূজা (শ্রাদ্ধ তর্পণ) তাহারা করিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বেশ অনুমান করা চলে যে, ভারতের প্রাকৃতভাষী পৌরাণিক জাতি ও ফিন্‌গণ এক সময়ে মধ্য এসিয়ায় একত্রে বাস করিত।

আধুনিক ইয়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে যে সকল জাতি, ভাষার প্রধান প্রধান ধাতু, সর্ব্বনাম অত্যন্ত পরিচিত বস্তু বা আত্মীয় স্বজনের নাম ও সংখ্যা গণনায় প্রায় একই শব্দ ব্যবহার করে তাহারা ভাষায় এক জাতীয় লোক। কিন্তু ভারতের কোন জাতিই সংস্কৃত পিতর্‌ মাতর্‌ স্বসর্‌, ভ্রাতর্‌ দুহিতর্‌, মাতুল, পিতামহ, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে না। বাপ বাবা, মা, আজ্জা, আই, ভাই, বহিন (বোন) মামা, দাদা, কাকা, নানা, দাদা প্রভৃতি যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সহিত সাদৃশ্য আছে এমন বহুশব্দ তিব্বতী, তুর্কি, মাগ্যার, ফিন, মঙ্গল প্রভৃতি ভাষায় পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত ভাষা-গুলির মধ্যে অনেকের উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনামে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। সুতরাং ভারতের প্রাকৃতভাষীদের সহিত এই সকল জাতির সম্বন্ধ একটা কিছু ছিল।

সুতরাং সংস্কৃতের ওম্‌ হইতেই স্বস্তিক চিহ্ন এসিয়া ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে একথা বলা চলে না। আমি যে সিদ্ধম্‌ চিহ্ন হইতে (প্রথম চিত্র) স্বস্তিকের উৎপত্তি দেখাইয়াছি, সেই চিহ্নটী ব্রাহ্মী অক্ষরের 'ও' হইতে যে হয় নাই তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব মহাশয় ১৪শ চিত্রে অঙ্কিত যে চিহ্নটীকে আলবেরুণী লিখিত ওম্‌ বলিয়াছেন, তাহা ওম্‌ নহে, সিদ্ধম্‌। ইহা যদি ওম্‌ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও ইহা ব্রাহ্মীর দুই প্রকারের 'ও' হইতে জন্মিতে পারে না।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

রামকৃষ্ণ সংঘ

(দক্ষিণেশ্বর আদ্যপীঠে পঠিত)

প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে, বর্দ্ধমান জেলার কামারপুর গ্রামে অবতীর্ণ হইয়া যিনি বর্ত্তমানযুগে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিধারার সম্মিলনে এক নবস্রোত প্রবাহিত করেন, সেই পরমহংসদেবের স্বপ্নাদেশে তাঁহারই পবিত্র নামে স্থাপিত, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আজ তৃতীয় বার্ষিক উৎসব। এই উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সফলতামণ্ডিত করিবার জন্য আপনারা সকলে সানন্দে এই আদ্যপীঠে শুভাগমন করিয়াছেন। আপনাদের ন্যায় সজ্জনবর্গের সমাগম ও সহানুভূতিতে উৎসবক্ষেত্র অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে, এবং আদ্য পীঠের গৌরবও সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আজ এক বৎসর পরে, আমরা আবার জাহ্নবীতীরস্থ এই পুণ্যময় স্থানে মিলিত হইয়াছি। এই শুভক্ষণে আমি আপনাদের নিকটে 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, তিনি ভক্ত অন্নদা ঠাকুর। ৯ বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনি এক প্রস্তরময়ী আদ্যামূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। মূর্ত্তি প্রাপ্তির কিছু পরে, দেবীর স্বপ্নাদেশে তিনি মূর্ত্তিটীকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেন। মূর্ত্তি দর্শন সকলের ভাগ্যে না ঘটিলেও মূর্ত্তির আলোকচিত্র সকলে দেখিয়াছেন। ঐ আলোকচিত্র পরিবর্দ্ধিত আকারে, এই সঙ্ঘের মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গঙ্গায় মূর্ত্তি বিসর্জ্জনের পর, অন্নদাঠাকুরের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না। ইহার কয়েকটী ঘটনা রামকৃষ্ণপুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই পুস্তক পাঠে জানিতে পারি, স্বপ্নে দর্শন দিয়া পরমহংসদেব অন্নদাঠাকুরকে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। কি ভাবে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এবং এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহাও তিনি বলিয়া দেন। এই ঘটনার কিছু পরে পরমহংসদেব, স্বপ্নাবস্থায় তাঁহার মধ্য দিয়া কতকগুলি মনঃশিক্ষামুলক উপদেশ প্রচার করেন। এই মনঃশিক্ষা প্রচারের কিছু পরে "রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ" গঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান মন্দিরটিও স্থাপিত। এই উপলক্ষে, ১৩২৭ সালের পৌষ সংক্রান্তির দিন, দীন-দরিদ্রের সেবার সহিত প্রথম উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ, আমি বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। উত্তরপাড়ার পরলোকগত বিদ্যোৎসাহী ও মহাপ্রাণ জমিদার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় "রামকৃষ্ণ" মনঃশিক্ষা" গ্রন্থ-প্রকাশে ও "রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠাকার্য্যে, বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রাসবিহারী বাবুর পরলোকগমনের পর, এই বার্ষিক উৎসব ব্যতীত, আরও দুইটি উৎসব হইতে থাকে—একটি ঝুলন পূর্ণিমায়, এবং অপরটি রামনবমীর দিনে। নামকীর্ত্তন ও দীনদরিদ্রের সেবা, এই উৎসবগুলির প্রধান কার্য্যরূপে অঙ্গীভূত ছিল।
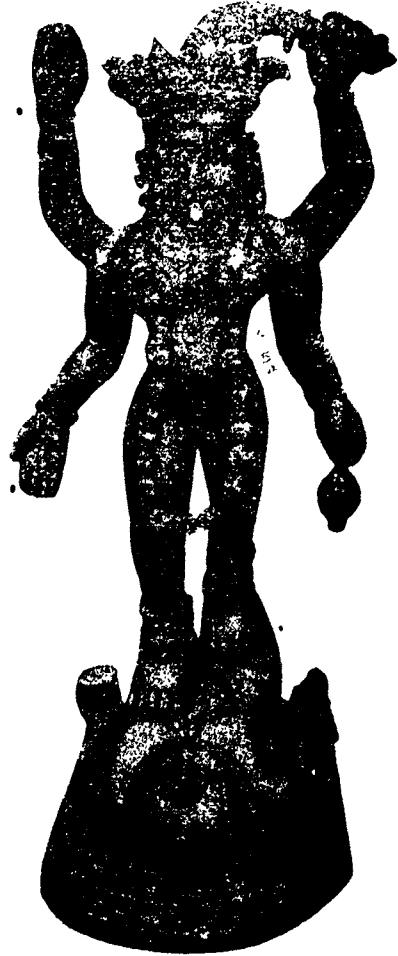
স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত আদ্যামূর্ত্তি

পরমহংসদেব, একটি সুন্দর ও উদার বাণী আমাদের শুনাইয়া যান, সেটি হইতেছে—"যত মত তত পথ"। হিন্দুত্ব ও উদারতা এই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সঙ্ঘ সাধ্যমত পরমহংসদেবের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেছে।

মন্দিরে যে তিনখানি প্রতিকৃতি আছে, তাহাতে প্রথমে গুরু পরমহংস দেব, উহার উপরে জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতীক আদ্যামূর্ত্তি, এবং সর্ব্বোপরি ভক্তি ও প্রেমের মোহন মূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণের যুগল চিত্র সন্নিবিষ্ট আছে। এই

ভাবে মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি—এই তিনেরই সমন্বয় সূচিত করা হইয়াছে। সংকল্পিত উদ্দেশ্য লইয়া শিশুসজ্ঘ ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। দেশে বহু প্রবীণ প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান; আমরা ভরসা ও প্রার্থনা করি, তাঁহারা ইহাকে তাঁহাদের সহোদর মনে করিয়া স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিবেন। তাঁহাদের কার্য্যকারিতায় দেশের সামাজিক ও নৈতিক বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও কেন এই নব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইল, তাহা এখানে ব া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমতঃ পরমহংসদেবের আদেশ, এবং ঐশী শক্তির পরিচালনায় এই সজ্যের উৎপত্তি। দ্বিতীয়তঃ বঙ্গদেশে অধুনাতন এই প্রকারের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কার্য্য করিতেছে, সেগুলি এই বিপুল জনপূর্ণ দেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। এই নব প্রতিষ্ঠান, এখন যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সাফল্যের জন্য বহু ত্যাগী কর্ম্মীর প্রয়োজন। সেই ত্যাগী ও কর্ম্মিগণ যাহাতে সন্ধান পাইয়া এই নব গঠিত সজ্যে যোগদান পূর্ব্বক, ইহার আরব্ধ কার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন, তাহার জন্যই উৎসবাদির ভিতর দিয়া এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন।

ধর্ম্ম বিশ্বাসের দিক দিয়া যাহারা না দেখিবেন, অলৌকিকত্বে যাঁহাদের আস্থা না হইবে, তাঁহারা আমাদের সামাজিক ইষ্টানিষ্টের দিক দিয়া দেখিলেও, লৌকিক উন্নতির পরিপোষক কার্য্যাবলীর দ্বারা, বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারেন। এই সজ্য যদি সমাজ-সেবার কার্য্যে কিছু মাত্রও সাহায্য করিতে পারেন, অল্প পরিমাণেও নৈতিক শিক্ষার উদ্দীপনা প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মচর্য্য পালনে দেশের দুই চারি জন লোকও সবল ও দীর্ঘজীবী হন, দেশের আর্ত্ত ও দৈবদুর্বিপাকে বিপন্ন নরনারী, কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য লাভ করেন, সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত দুইচারি জন ব্যক্তিও সেবা ও শুশ্রূষা পান, এবং অন্নক্লিষ্ট, ক্ষুধাতুর ব্যক্তি, বৎসরের মধ্যে ২।১ দিনও পর্য্যাপ্ত আহার প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিলাভ করেন, তাহা হইলেও সমাজ যে এই অনুষ্ঠানের দ্বারা কতকটা উপকার পাইবে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকায় কোন লাভ নাই। কর্ম্মের আহ্বান প্রতি নিয়তই আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে; কিন্তু নিরুৎসাহ ও জড়তা আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। সেই জড়তাকে দূরীভূত করিয়া উৎসাহের সহিত এই সাধু প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করিতে হইবে; তাহাতে যোগদান করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। মহৎ ও কল্যাণকর উদ্দেশ্য লইয়া, যে নব প্রতিষ্ঠান সহানুভূতির আশায়, আপনাদের মুখ পানে চাহিয়া আছে, নিজের যথাশক্তি সাহায্য ও সহানুভূতি দানে, তাহাকে উৎসাহ দিতে হইবে। পূর্ব্বজাত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গুলির কথা মনে করিয়া, নবজাত ক্ষুদ্রটিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কারণ, এই ক্ষুদ্রটিও একদিন বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া জনসমাজের বহু কল্যাণ সাধন করিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য আপাততঃ বিস্তৃত না হইলেও বর্ত্তমানে ইহা যে অবস্থায় আছে, তাহারই ভিতরে আমরা পূর্ব্ব-কথিত ত্রিধারার সন্ধান ও পরিচয় পাই। শিক্ষা প্রচার ও ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা জ্ঞানধারা, দরিদ্র সেবা ও সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতি উপশম করিবার চেষ্টা দ্বারা কর্ম্মধারা, নামকীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ ও দেবদর্শনাদি দ্বারা ভক্তিধারা রামকৃষ্ণ সজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যিনি জ্ঞানী, তিনি এখানে আসিয়া জ্ঞানের সাধনা করুন; যিনি কর্ম্মী, তিনি এখানে আসিয়া কর্ম্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করুন, আর যিনি ভক্ত তিনিও জাহ্নবীতীরস্থ এই পুণ্যময় স্থানে আসিয়া ভক্তিসাধনায় ধন্য হউন। তাঁহাদের শুভাগমনের জন্য রামকৃষ্ণ সজ্য উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে, এবং তাঁহাদের শুভাগমন কামনা করিয়াই রামকৃষ্ণ সজ্য এই প্রকার উৎসবাদির ভিতর দিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছে।

পৌষ সংক্রান্তি
১৩২৯

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

"প্রতাপসিংহ"-এর গান *

(দশম গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

অপ্সরা কণ্ঠে গীত।

মিশ্র কর্ণাট——চৌতাল।

এস,——এস দেব ! এস আজি, পরিহরি দুঃখ শোক !
দেখ;——তোমার কারণে আজি মুক্তদ্বার স্বর্গ লোক।
তুমি,——সাধিয়াছ নিজ কাজ ;
ঐ,——বিজয় দুন্দুভি বাজে,
আজি,——এই ত্রিভুবন মাঝ ;
ও কীর্ত্তি অমর হোক ॥

[স্বরলিপি———শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

বিলম্বিত লয়ে।

স্থায়ী।

	১´	০	২	০	৩	৪	
‖{	প্‌া	ন্‌া । -সা	সা । রা	-গা । -রা	রপা । -া	মা । -গা	গরা I
	এ	স ০	এ স	০ ০	দে০ ব্	এ ০	স০
I	রা	-গা । সা	রা । মা	গরগা । সা	সন্‌া । -রা	সা । ন্‌ধা	ন্‌সা I
	আ	০ জি	প রি	হ০০ রি	দুঃ ০	খ শো০	ক০
I	ন্‌া	প্‌া । -ন্‌া	ন্‌া । সা	-ন্‌া । সা	রা । -গা	রগা । সা	-ন্‌সা I
	দে	খ ০	তো মা	০ র	কা ০	র০ ণে	০০

* এ গানখানি অন্ততঃ আমি কোনও থিয়েটার বা যাত্রাতে গীত হইতে শুনি নাই। যতদূর জানি, গাওয়া হয় না। অনেকের ওস্তাদের মুখে যে সুরে ও তালে গীত হইতে শুনিয়াছি, অবিকল সেই সুরের ও তালেরই অনুকরণ করিয়াই স্বরলিপি করিলাম—লেখিকা।

I ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
রা মা । -গরা মপা । পা ধা । -মা -পা । পধা -মগা । রগা সন্া } II
আ জি ০০ মুক্ ত া ০ র্ স্ব০ র্গ লো০ ক০

অন্তরা ।

II { ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা পা । মা পা । নসা র্সা । র্রা -না । র্রা না । -র্সা -া I
তু মি সা ধি য়া০ ছ নি ০ জ কা ০ জ্

I ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্রর্গা র্রা । -র্পা র্মা । র্গা র্রর্রা । -র্গা র্সা । -র্রা না । -র্সা র্সা I
ও ই বি ০ জ য় তু ন্ তু ভি ০ বা ০ জে

I ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা পা । ধা মা । গা -মা । গা -রা । মপা পা । নর্সা র্সা I
আ জি এ ই ত্রি ০ ভু ০ ব০ ন মা০ ঝে

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা -না । র্রা -ণণা । ধা -পা । ধা -মা । গা -রা । -গা সন্া
ও ০ কী র্তি অ ম র ০ হো ০ ০ ক০

বাঁ।উ্রওয়ারা।

১। স্থায়ী—দূন্।

II { ১´ ০ ২
প্া ন্া -সা সা । রা -গা -রা রপা । -া মা -গা গর ।
এ স ০ এ স ০ ০ দে০ ব্ এ ০ স০

০ ৩ ৪
। রা -গা সা রা । মা গরগা সা সন্া । -রা সা ন্ধ্া ন্সা I
আ ০ জি প রি হ০০ রি দু ঃ ০ খ শো০ ক০

I ১ ০ ২
ন্া প্া -ন্া ন্া । সা -ন্া সা রা । -গা রগা -সা ন্সা ।
দে খ ০ হো মা ০ র কা ০ র০ ০ পে০

০ ৩ ৪
। রা মা -গরা মপা । পা ধা -মা -পা । পধা -মগা রগা সন্া } II
আ জি ০০ মুক্ ত া ০ র্ স্ব০ র্গ লো০ ক০

২। অন্তরা—দূন্।

II{ ১´ মা প· মা পা । নর্সা র্সা র্রা -না । র্রা না -র্সা র্সা ।
তু মি সা ধি য়া০ ছ নি ০ জ কা ০ জ

০ ৩ ৪
। র্রগা র্রা -র্পা র্মা । র্গা র্রর্রা র্গা র্সা । -র্রা না -র্সা র্সা I
ওই বি জ য় দুন্ দু ভি ০ বা জে

১´ ০ ২
I পা পা ধা মা । গা -মা গা -রা । মপা পা নর্সা র্সা ।
আ জি এ ই ত্রি ০ ভু ০ ব০ ন মা০ ঝে

। র্সা -না র্রণা ণা । ধা পা ধা -মা । গা -রা -গা সন্না }II
ও ০ কীর্ তি অ ম র ০ হো ০ ০ ক০

৩। স্থায়ী—চৌদুন্।

II{ ১´ ০
পা না -সা সা রা -গা -রা রপা । -া মা -গা গরা রা -গা সা রা ।
এ স এ স ০ ০ দে০ ব্ এ স০ আ জি প

২ ০
। মা গরগা সা সন্না -রা সা ন্ধা নসা । ন্না পা -না না সা -ন্না সা রা ।
রি হ০০ রি দু: ০ খ শো০ক০ দে খ ০ তো মা ০ র কা

৩ ৪
। -গা রগা -সা নসা রা মা -গরা মপা । পা ধা -মা পা পধা -মগা রগা সন্না }II
০ র০ ০ ণে০ আ জি ০০ মুক্ ত দ্বা ০ র স্ব০ র্গ লো০ ক০

৪। অন্তরা—চৌদুন্।

II{ ১´ ০
মা পা মা পা নর্সা র্সা র্রা -না । র্রা না -র্সা র্সা র্রগা র্রা -র্পা র্মা ।
তু মি সা ধি য়া০ ছ নি ০ জ কা ০ জ ওই বি ০ জ

২ ০
। র্গা র্রর্রা র্গা র্সা -র্রা না -র্সা র্সা । পা পা ধা মা গা -মা গা -রা ।
য় দু দু ভি ০ বা ০ জে আ জি এ ই ত্রি ০ ভু ০

৩ ৪
। মপা পা নর্সা র্সা র্সা -না রণা ণা । ধা পা ধা -মা গা -রা -গা সন্‌া } II
ব০ ন মা০ ঝে ও ০ কীর্, তি অ ম র ০ হো ০ ০ ক০

৫। স্থায়ী—দেড়ী।

II { ১´ ০ ১ ০ ৩ ৪
প্‌া ন্‌সা । সা রা । -গরা রপা । -া মগা । গরা রগা । সা রমা I
এ স০ এ স ০০ দে০ ব্ এ০ স০ আ০ জি পরি

I ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
গরা -গসা । সন্‌া -রসা । ন্‌ধ্‌া ন্‌সা । ন্‌া প্‌ন্‌া । ন্‌া সন্‌া । সা রগা I
হ০ ০রি দুঃ ০খ শো ক০ দে থ০ তো মা০ র কা০

I ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
রগা সন্‌া । -সরা মগরা । মপা পা । ধমা -পা । পধা -মগা । রগা সন্‌া } II
র০ দে০ ০আ জি০০ মুক্ ত ধা০ র্ স্ব০ র্গ লো০ ক০

৬। অন্তরা—দেড়ী।

II { ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা পমা । পা নর্সা । র্সর্রা -না । র্রা নর্সা । া র্রগর্রা । -র্পা র্মগা I
তু মিসা ধি রা০ ছনি ০ জ কা০ জ্ ওই বি ০ জয়

I ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্রা -র্রগা । র্সা -র্রনা । -র্সা র্সা । পা পধা । মা গমা । গা -রমপা I
তু ন্ তু ভি ০বা ০ জে আ জিএ ই ত্রি০ ভু ০ব০

I ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা নর্সা । র্সা র্সনর্রা । -ণধা ধা । পধা -মা । গা -রা । -গা সন্‌া } II
ন মা০ ঝে ও০কী র্তি অ মর ০ হো ০ ০ ক০

৭। স্থায়ী—অনাগত গ্রহ।

প্‌া II { ১´ ২ ০ ৩ ৪
ন্‌া -সা । সা রা । -গা -রা । রপা -া । মা -গা । গরা রা I
এ স ০ এ স ০ ০ দে০ ব্ এ ০ স০ আ

I ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
-গা সা । রা মা । গরগা সা । সন্‌া -রা । সা ন্‌ধ্‌া । (ন্‌সা প্‌া) } I
০ জি প রি হ০০ রি দুঃ ০ খ শো০ ক০ 'এ'

৪　　　　১´　　　　　০　　　২　　　০　　　৩
। ন্‌সা, ন্‌া I {প্‌া -ন্‌া । ন্‌া সা । ন্‌া সা । রা -গা । রগা -সা ।
ক০ দে থ ০ হো মা ০ র কা ০ র০ ০

৪　　　　১´　　　　০　　　২　　　০　　　৩
। ন্‌সা রা I মা -গরা । মপা পা । ধা -মা । পা পধা । -মগা রগা ।
ণে০ আ জি ০০ মুক্ ত স্বা ০ র স্ব০ র্গ লো০

৪　　　　৪
। (সন্‌া ন্‌া) } I সন্‌া II
ক০ 'দে' ক০

৮। অন্তরা—দূন্ অনাগত গ্রহ !

　　১´　　　　　০　　　　　　২
মা II {পা মা পা নর্সা । র্সা র্রা -ন্‌া র্রা । না -র্সা র্সা র্গর্গা ।
তু মি সা ধি য়া০ ছ নি ০ জ কা ০ জ ও ই

　　　　　　৩　　　৪
। রা -র্পা র্মা র্গা । র্গর্রা র্গা র্সা -রা । (না -র্সা র্সা মা) } I
বি ০ জ য় দুন্ দু ভি ০ বা ০ জে 'তু'

৪　　　　　১´　　　　　০
I না -র্সা র্সা পা I {পা ধা মা গা । -মা গা -রা মপা ।
বা ০ জে আ জি এ ই ত্রি ০ ভু ০ ব০

২　　　　০　　　　৩
। পা নর্সা র্সা র্সা । -না র্রণা ণা ধা । পা ধা -মা গা ।
ন মা০ ঝে ও ০ কীর্ তি অ ম র ০ হো

৪　　　　　৪
। (-রা গা সন্‌া পা) } I -রা গা সন্‌া II
০ উ ক০ 'আ' ০ হো ক০

৯। স্থায়ী—অতীত গ্রহ

　　০　　২　　০　　৩　　৪
প্‌া II {ন্‌া -সা । সা রা । -গা -রা । রপা -া । মা -গা I
এ স ০ এ স ০ ০ দে০ ব্ এ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I গরা রা। -গা সা। রা মা। গরা -গসা। সনা -রা। সা ন্ধা I
স০ আ ০ জ প রি হ০ ০রি দুঃ খ শো০

১ ১´ ০ ২ ০ ৩
I (ন্সা প্া) I ন্সা ন্া। প্া -ন্া। ন্া সা। -ন্া সা। রা -গা।
ক০ 'এ' ক০ দে শ ০ তো মা ০ র কা ০

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
। রগা সা I -ন্সা রা। মা -গরা। মপা পা। ধা মা। -পা পধা।
র০ ণে ০০ আ জি ০০ মুক্ ত দ্বা ০ র্ স্ব০

৪ ১´ ১´
। -মগা রগা I (সন্া ন্া) । সন্া II
র্গ লো০ ক০ 'দে' ক০

১০। অন্তরা—অতীত গ্রহ।

০ ২ ০ ৩ ৪
মা { পা মা। পা নর্সা। র্সা র্রা। -না র্রা। না -র্সা I
তু মি সা ধি ম০ ছ নি ০ জ বা ০

১´ ১´ ০ ২ ০ ৩
I (া মা) া র্রগা। র্রা পা। র্মা গা। -র্রা গা। -র্সা -র্রা।
জ্ 'তু' জ্ ওই বি জ য় ধ ন্ তু ভি ০ ০

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
। না -র্সা I র্সা পা। পা ধা। মা গা। -মা গা। -রা মপা।
বা ০ জে আ জি এ ই ত্রি ০ ভু ০ ব০

৪ ১´ ১´ ০ ২ ০
। পা নর্সা I (র্সা র্রগা) । সা র্সা। -না র্রণা। ণা ধা। পা ধা।
ন মা০ ঝে 'ওই' ঝে ও ০ কীর্ তি অ ম র

৩ ৪ ১´
। -মা গা। -রগা সন্া I প্া II II
০ হো ০০ ক০ 'এ'

'প্রতাপ সিংহ' নামক নাটকান্তর্গত গানগুলির স্বরলিপি এইখানেই শেষ করা হইল। দুইটীমাত্র গানের স্বরলিপি কোনও এক বিশেষ কারণ বশতঃ অপ্রকাশিত রাখিতে বাধ্য হইলাম। সে গান দুইটী অভিনয়কালেও খুব সম্ভব ঐ বিশেষ কারণ বশতঃই গাওয়া হয় না।

——লেখিকা।

সতীত্ব—আসল ও মেকী

ফাল্গুন মাসের "মানসী"তে ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত "সতীত্বের কথা" ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের লিখিত "প্রতিবাদের উত্তর" আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। ডাঃ সেনের লেখাটী পড়িলে অনেক প্রশ্ন আপনা হইতে মনে উঠে। কয়েকটী প্রশ্ন নিম্নে লিখিতেছি।

তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা আসল সতীত্ব চাই, মেকীটা চাই না।" কি প্রকারে এই আসল সতীত্ব চেনা যাইতে পারে? আসল সতীত্ব অর্থাৎ অন্তরের শুচিতা কি প্রকারে সম্ভবপর হয় ও কি প্রকারে ইহা রক্ষা করা যাইতে পারে? রায়বাহাদুর সতীত্ব—আসল ও নকল,—রক্ষার একটি সহজ ও সর্ব্বজনবিদিত পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন—প্রলোভন হইতে দূরে থাকা। ডাঃ সেন হয়ত, প্রলোভন জয় করিয়া আসল সতীত্বের পরিচয় দিতে বলিবেন। অন্তরের শুচিতা রক্ষা করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। মানব কেহই নিষ্পাপ নহে, আজ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচরিত্র, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে কাল সেই ব্যক্তি পাপী হইতে পারে। সময় সময় মনে পাপচিন্তা আপনা হইতেই আসে যায়, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। মনে মনে শত্রুকে হত্যা করিলে ডাঃ সেন কি তাহার বিরুদ্ধে murderএর charge আনিতে পরামর্শ দিবেন? এইরূপ স্থলে মনে মনে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া যাইতে পারে। নরেশবাবুর মতে মন অপবিত্র হইলেই চরিত্র কলুষিত হইয়া থাকে, "মেকী" সতীত্বের কোন মূল্য নাই, উহা খোলসমাত্র। এইভাবে দেখিলে জগতে কয় জন সাধু ও সাধ্বী পাওয়া যাইবে? কাহার মনে শয়তান মধ্যে মধ্যে উঁকি না মারে? "The old beast is in us." নরেশবাবু আদর্শ সতী চান, তাঁহার আদর্শের চেয়ে ছোট হইলে তাহার কোন মূল্য নাই, মেকী, খোলসমাত্র। যাঁহারা এই বাস্তব জগতে আদর্শ পাইতে চান তাঁহারা প্রতারিত হন, "Ideal belongs to idea only." "মেকী" সতীত্ব কি কুসংস্কার? যাঁহারা আদর্শচরিত্র তাঁহাদের জন্য কোন বিধি নিষেধ প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যাঁহারা সাধারণ মানব তাঁহাদের জন্য নরেশবাবু কি ব্যবস্থা করেন? ইন্দ্রিয় ভোগলালসা স্বভাবতঃই মনুষ্যের মধ্যে প্রবল, এই প্রবল রিপুকে দমন করিবার জন্যই সমাজে এত বিধি নিষেধ, এত কঠোর শাসন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মন্দ হইলে সর্ব্বপ্রথমে অন্তর কলুষিত হয় অর্থাৎ "আসল" সতীত্ব নষ্ট হইয়া থাকে। "Chara. ter is a product of heredity and environment" স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশা কি এই আসল সতীত্বের পক্ষে হানিকর নহে? ডাঃ সেনের "ঠানদিদি" নামক উপন্যাসে দেখিতে পাই, একটী পতিপরায়ণা সতী তাঁহার স্বামীর দূর সম্পর্কে মামাত ভাইয়ের প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া পত্নীপরায়ণ সচ্চরিত্র স্বামী মনঃকষ্টে ও দুশ্চিন্তায় মারা গেলেন। কার্য্যের ফল দেখিয়াই, পাপ পুণ্য স্থির করিতে হয়, যে কার্য্যের ফল দুঃখ, তাহাই পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়। বাস্তব জগতে শুধু মনের দিক দিয়া পাপ বিচার করিলে চলে না, তাহা অবিচার হয়। এই প্রকারের পাপের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা ঝোঁক আছে। সাধারণতঃ মানুষ পাপ হইতে বিরত থাকে সমাজ শাসনের ভয়ে, আইনের ভয়ে, লোকনিন্দার ভয়ে, হয়ত পরকালের ভয়েও। এই সকল পরিণাম চিন্তা সুচরিত্রের পরিচায়ক নহে? পশুচরিত্র মানবই পরিণাম চিন্তা করে না, রিপুর ক্ষণিক উত্তেজনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পাপ কার্য্য করে। বিবেকের ভয়ে অতি অল্পসংখ্যক লোকই সংযত থাকে, মানুষের বিবেক অতি দুর্ব্বল বলিয়াই এত কঠোর আইনের শাসন প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রকারের পাপ প্রকাশ হইয়া পড়িলেই বিবেকের তাড়না আরম্ভ

হয়, পাপকার্য্য করিবার পূর্ব্বে বিবেকের শক্তি বিশেষ অনুভব করা যায় না। বিবেকের ভয়ও ভয়। ডাঃ সেন বলিতেছেন, "সতীত্ব ঠুনকো জিনিষ নহে, সহজে নষ্ট হয় না।" তাঁহার নভেল পড়িলে ত মনে হয় ইহাকে ঠুনকো বলিয়াই তিনি মনে করেন। তাহা না হইলে আমাদের সমাজে "এত গুপ্তা অসতীর" অস্তিত্ব সম্ভবপর হইল কি প্রকারে? তিনি "পল্লীসমাজে"র ও কাশীর লোকমুখে শোনা কথার উল্লেখ করি। আমাদের সমাজে সতীত্বের পরিমাণ বুঝিয়া লইয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি কিরূপে বলিতে পারেন "বাঙ্গালী নারী দলে দলে ছুটিয়া সতীত্বের খোলস ফেলিয়া দিবেন এরকম আমি মনে করিতে পারি না।" অন্ততঃ পুরুষের চরিত্রবল ত তিনি জানেন। কামিনী-কাঞ্চনের প্রবল আকর্ষণের কথা মহাপুরুষেরাও এক বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। কি রূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পতিত হইলে স্ত্রীলোক "গুপ্তা অসতী" হয় তাহা মনস্তত্ত্ববিৎ সর্ব্বজনপরিচিত ঔপন্যাসিক ডাঃ সেন আমাদের চেয়ে ভালই জানেন। ডাঃ সেন বলিবেন ইহা কড়া শাসনের ফল -"বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো"।

যাঁহারা অন্ধভাবে সর্ব্ববিষয়ে বিলাতীর অনুকরণ করিতে ভালবাসেন Lloyd's Magazine (June. 1920) হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশগুলি আশা করি তাঁহাদের চিন্তা উদ্রেক করিবে।

THE MODERN MARRIAGE PROBLEM

Undoubtedly in nine cases out of ten the mad restlessness of the modern woman, discontent with her home, with her lot, with herself, and with her husband most of all, so that although man's unfaithfulness to woman has made countless women mourn in the past, today it is the woman who is bearing off the unworthy palm of infidelity! "Marry in haste and get divorced at pleasure" seems to be the motto that the average modern bride has adopted."

"There is scarcely a single one of man's vices of which she has left him the monopoly. And if to all others she is going to add that last crowning one of infidelity, it will be a poor look-out for the race."

"It would be safe to wager that if divorce could only be forbidden altogether for a decade, not only would the standard of morality in both sexes go up with leaps and bounds, but the number of happy marriages would increase, and the number of unhappy marriages decrease in proportion."

"There are at this moment hundreds of unhappy men and women who would give all they posess to find themselves unyoked again." "There are men and women to whom, even given every inducement and opportunity in the world, faithlessness is simply impossible, either owing to the greatness of their love or their personal pride and sense of self-respect and duty. But these are in the minority; and if an aristocracy of love exists in these modern times, it is I fear, a very limited one. At the same time, it must be conceded that a very great part, if not the greater part, of the breaking of the marriage vow, so far it included faithfulness, by which of course is meant chastity, is due to the wife's neglect, often unintentional no doubt, but still neglect." "She lives for social duties, or for some hobby or other. And the other woman or girl—it is mostly a girl—comes along. Remember that in every marriage there is always the Other woman waiting, just round the corner; sometimes the Other

man, but always, always, Always, "The other woman." And this is a fact which most wives would do well to bear in mind. Actually nine-tenths of them either forget or ignore her existence until she materialises, and then it is usually too late."

"And we have to remember we must not lose sight of the terrible temptations to which all our men, young and old, married and unmarried, have been and are being subjected on all sides. Women young and old, plain and pretty are nowadays, alas, continually flinging themselves at men's heads asking only be allowed to sacrifice themselves."

"I want to be happy. Never mind whether my husband (or wife) is happy or not, so long as I am happy, that is all that matters. I must and I will have happiness, or what at the present moment seems happiness to me. I claim the right to live my own life."

"What is the remedy here? That one side or the other shall give in? That again is unthinkable The man cannot give up his independence, the woman will not give up hers Her soul has grown and expanded. She is brighter, happier, more alert, more alive to the meaning of life."

"The absolute callousness with which the modern woman has come to regard her marriage vows and her marital obligations, are largely due to the lax moral tone, not only of the last few years, but of the last twenty years."

Mrs Alfred Praga.

ভাবার্থ—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে শতকরা নব্বই জন চঞ্চল প্রকৃতি নব্যা নারী তাহাদের সংসারের প্রতি, অদৃষ্টের প্রতি, সব চেয়ে বেশী তাহাদের স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বে অসংখ্য স্ত্রী, স্বামীর চরিত্রহীনতায় মনঃকষ্ট পাইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে স্ত্রীগণই সে বিষয়ে স্বামীদের পরাজিত করিতেছে। "তাড়াতাড়ি বিবাহ কর আর যখন খুশি বিবাহ বন্ধন ছেদন কর," নব্যা নারীর পক্ষে উহা যেন একটা আদর্শ নিয়ম হইয়াছে। পুরুষরা যত রকম পাপে লিপ্ত হয়, সেগুলি সমস্তই এখন নারীদেরও আচরণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোনটাই বাদ নাই। তাহার উপর যদি আবার স্ত্রী ব্যভিচার পাপটিও যোগ করিয়া বসেন তবে এই জাতির পরিণাম শোচনীয় হইবে। নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়, দীর্ঘকাল যদি বিবাহ বন্ধন ছেদন একেবারে নিষিদ্ধ থাকে তবে স্ত্রী ও স্বামী উভয় পক্ষেরই যে অশেষ নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে তাহা নহে, ইহাতে প্রীতিপদ বিবাহ সংখ্যার অনেক বৃদ্ধি হইবে এবং অপ্রীতিকর বিবাহ সেই তুলনায় কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে শত শত অসুখী স্বামী স্ত্রী আছে যাহারা বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। পৃথিবীতে এমন নারী ও পুরুষ আছেন, যাঁহারা শত প্রলোভন ও সুযোগ সত্ত্বেও চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট করিবেন না, পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম, আত্মমর্য্যাদা বা কর্ত্তব্য জ্ঞান ইত্যাদি যে কারণেই হউক। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কম। বর্ত্তমান কালে একনিষ্ঠ প্রেম অতায় লোকেরই ভিতরেই আবদ্ধ। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীর অবহেলার দরুণ (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) স্বামী অসচ্চরিত্র হয়। স্ত্রী হয় ত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বা কোন একটা সখ বা একটা না একটা কিছু লইয়া মত্ত হইয়া দিন কাটায়, সেই সুযোগে অপর একটী স্ত্রীলোক—অধিকাংশ স্থলেই একটী অল্পবয়স্কা যুবতী (girl স্বামীর কাছে আসিয়া জোটে। মনে রাখা উচিত যে অধিকাংশ স্থলেই অপর একটি স্ত্রীলোক স্বামীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অদূরেই অপেক্ষা করিতেছে, কখনও বা স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অপর একটি পুরুষও ঐরূপ লুকাইয়া থাকে বটে—কিন্তু সর্ব্বদাই "অপর একটী স্ত্রীলোক"

থাকিবেই থাকিবে। এই কথাটা প্রত্যেক স্ত্রীর মনে রাখা ভাল। প্রকৃতই শতকরা নব্বই জন স্ত্রী ইহা ভুলিয়া যান বা জানিয়াও ইহা গ্রাহ্য করেন না। অবশেষে যখন বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তখন আর প্রতিকারের সময় থাকে না। যুবক বা বৃদ্ধ, বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলেরই চারিদিকে ভীষণ প্রলোভন জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা, সুন্দরী বা অসুন্দরী যুবতী সকলেই আজকাল ক্রমাগত পুরুষদের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, সতীত্ব রত্ন বিলাইয়া দিবার জন্ম তাহারা উদ্‌গ্রীব।" আমি সুখ চাই, আমার স্বামীর (বা স্ত্রীর) সুখের কথা ভাবিবার দরকার নাই, আমি সুখে থাকিলেই হইল, যাহা আপাত মধুর, আমার নিকট যাহা সুখ, তাহা আমি নিশ্চয়ই চাই। আমি স্বাধীনভাবে আমার জীবন উপভোগ করিব, ইহাতে আমার অধিকার আছে।" এই সবের প্রতীকার কি? দুজনের মধ্যে একজন হার মানিবে? ইহা কল্পনাতীত। পুরুষ তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে পারে না। নারীর তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিবে না। নারীর আত্মা যে জাগিয়াছে,—"এখন নারী ফুটিয়াছে আপন গৌরবে, আপন মহিমায়।" নারী এখন জীবনের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে। নব্যানারী সতীত্ব ও বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে তাহার প্রধান কারণ নৈতিক শিথিলতা। ইহা যে গত কয়েক বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নহে, গত বিশবৎসর হইতে এইরূপ হইয়াছে।"

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিবাহের বিজ্ঞাপন

(গল্প)

তখন আমার বয়স বছর সাতাশ-আটাশ, সংসারের ভাবনা কোনদিনই বড়বেশী ভাবিতে হয় নাই। সুতরাং কিশোর বয়সে নির্ম্মল হাস্যকৌতুকের অভ্যাসটাকে এ বয়সেও প্রায় সমানভাবেই বজায় রাখিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত রকমে ধাক্কা খাইয়া রীতিমত শিক্ষা পাইলাম। সেই কাহিনীই বলিতে বসিয়াছি।

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ভিতর সকলেরই বিবাহ হইয়াছিল; হয় নাই শুধু একজনের, তাহার নাম শচীনাথ। শচীনাথকে আমরা সকলেই ভালবাসিতাম। কিন্তু এই লোকটীর প্রকৃতি ছিল ঠিক যেন আমারই বিপরীত। আমাদের মজলিসে বসিয়াও সে খুব কমই কথা কহিত। কিন্তু সেই সামান্য কথা এবং তাহার ব্যবহার হইতেই আমরা তাহার হৃদয়ের সন্ধান পাইয়াছিলাম। এতটা বয়স পর্য্যন্ত 'আইবড়' থাকার জন্য আমরা প্রায়ই তাহাকে ঠাট্টা করিতাম। কেহ-কেহ তাহাকে একদল হংসের মধ্যে একটী বকের সহিত তুলনা করিতেও ছাড়িত না। সে শুধু মুখ টিপিয়া হাসিত। তাহার মধ্যে বিরক্তির সামান্য একটু ছায়াও আমরা দেখিতে পাইতাম না।

একদিন হঠাৎ কোথা হইতে আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি আসিয়া জুটিল। 'ভারতমাতা' নামে একখানি নামজাদা সংবাদপত্রের আফিসে গিয়া, ম্যানেজার বাবুর টেবিল হইতে একটুকরা কাটা কাগজ টানিয়া লইয়া একটা বিজ্ঞাপন লিখিলাম। লিখিতে লিখিতে আমার নিজেরই বড় হাসি আসিতেছিল। কিন্তু পাছে অপর কেহ দেখিয়া ফেলিলে বিজ্ঞাপনটার গুরুত্ব নষ্ট হইয়া যায়, সেই ভয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া লেখা শেষ করিলাম।

পরের দিন সকালে উঠিয়াই আগে খোঁজ লইলাম, 'ভারতমাতা' কাগজখানা তখনও আমার বাড়ীতে

আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি না। চাকর দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কাগজ তখনও আসে নাই। আমি উৎসুক হৃদয়ে মুখ হাত ধুইয়া চা ও মিষ্টান্নের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

নিবিষ্ট মনে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছি, এমন সময় চাকর সম্মুখে আসিয়া হাজির, তাহার হাতে 'ভারতমাতা'। আমি ব্যস্তভাবে চায়ের বাটী নামাইয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিলাম,—"এসেচে? কৈ, দে দে।" বলিতে বলিতে তাহার হাত হইতে কাগজখানা একরকম ছিনাইয়া লইয়া চোখের সাম্‌নে বিজ্ঞাপনের স্তম্ভগুলা মেলিয়া ধরিলাম। সামনের একটা স্তম্ভের ঠিক উপরেই বড় বড় হরফে লেখা—

পাত্রী চাই

'গৌতম গোত্রধারী একটি সুকুমার সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবকের জন্য একটী বয়স্থা সুন্দরী পাত্রী আবশ্যক। দেনা পাওনা লইয়া কোন গোলযোগ হইবার আশঙ্কা নাই। মেয়েটি শিক্ষিতা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ১২নং নন্দ চাটুয্যের লেনে শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন করুন।

এই আবেদনের ঠিকানা আমি নিজের নামেই দিয়াছিলাম। শচীনাথের গোত্র আমি কৌশলে তাহারই নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। আর এ কথা আমি আগে হইতেই জানিতাম যে, তাহাদের সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। সুতরাং বিনা দ্বিধায় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, তাহার বিবাহে দেনা পাওনা লইয়া গোলযোগ না হওয়াই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞাপনটার পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার এম্‌নি হাসি পাইতেছিল! উঃ, আজ সন্ধ্যার সময় শচীর সঙ্গে দেখা হইলে কি মজাই না হইবে! শচী আমার এই দুষ্ট বুদ্ধিটুকু উপভোগ করিবে, না, ইহার বিরুদ্ধে অনুযোগ করিবে, এবং কি রকমে কথাটা পাড়িলে বন্ধুমহলকে খুব বেশী চমকিত করিয়া দিতে পারা যাইবে, এই সব ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছি, হঠাৎ স্ত্রীর কথায় চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

"ওমা, চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল! ভাবছ কি?"

অমলার মৃদু ভর্ৎসনামাখা মুখের উপর চোখ তুলিলাম। কিন্তু চায়ের দিকে আমার খেয়াল ছিল না। খপ করিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিলাম, "এই দেখ কি ভাবচি।"

অমলা বিজ্ঞাপন পড়িয়া কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, "পাত্রী চাই? কার জন্যে গো?"

"আমার নিজের জন্যে।"

মুহূর্ত্তকাল আমার মুখের উপর তাহার স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া, পরে তখনি গম্ভীরভাবে ফিরাইয়া নিয়া অমলা বলিল, "তা জানি, কিন্তু আগে আমি মরি দাঁড়াও। তখন কি আর এইটুকু অক্ষরে বেরুবে গো? এই কাগজের আধ পিঠ জুড়ে এত বড় লাল অক্ষরে -"

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "আচ্ছা এই সকালেই ঝগড়া করলে কি হয় জান ত? শোন, শোন ভারি মজা কিন্তু—"

"আঃ কি কর! ছেড়ে দাও, এসে শুন্‌চি"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অমলা ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

২

সেই দিন সন্ধ্যার পর বন্ধুমহলে কথাটা লইয়া নানা রকম টীকাটিপ্পনী চলিতে লাগিল। অনেকে আমায় বলিল, "সাবধান! এবার কিন্তু তোমার বাড়ী আবেদনের চিঠিতে চিঠিতে ছেয়ে যাবে।"

এই সতর্কতার কথায় আমার বেশী করিয়া হাসি পাইতে লাগিল। শচীকে দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, "আরে তার আর ভাবনা কি? সে সব চিঠির জবাব দেবার ভার ত স্বয়ং পাত্রেরই।"

শচী কিন্তু এত হাসি তামাসার ভিতর ঠিক তেম্‌নি চুপচাপ বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। তাহাকে লইয়া চারিপাশে এই যে রঙ্গব্যঙ্গের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে,

তাহার একটাও যেন তাহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছিল না। আমাদের দলের অপর সকলে একে একে উঠিয়া গেলে আমি হঠাৎ গম্ভীর হইয়াই শচীকে বলিলাম, "আচ্ছা সত্যি শচী তুই কি বিয়েই কর্ব্বিনে?"

শচী অন্যমনস্কের মত জবাব দিল, "বোধ হয় না।"

আমার কাছে কিন্তু এটা যেন নিতান্তই বিস্ময়জনক বলিয়া ঠেকিল। বলিলাম, "কেন বল্ ত? বিয়ে কর্ব্বি না—এ কি রকম গোঁয়ার্ত্তুমি? আমরা সকলেই করেচি—"

কিন্তু এসব যুক্তিতে কোন ফলই হইল না, অল্পভাষী শচী সমস্ত প্রসঙ্গটাই গম্ভীর ভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

বস্তুতঃ এই লোকটী যেন আমাদের সকলের কাছেই আগাগোড়া দুর্ব্বোধ্য রহিয়া যাইতেছে। যতই যাহাকে আমরা হাস্যকৌতুকের ভিতর দিয়া আমাদের একান্ত নিকটে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করি, ততই যেন সে অতি সাবধানে পাশ কাটাইয়া দূরে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। আজ তাই বাড়ী ফিরিবার সময় এই একটা খট্‌কা আমার দাঁড়াইল যে, এই গম্ভীর অন্যমনস্ক যুবকটীর ভিতর হয়ত' এমন কিছু একটা আছে, যাহার পরিচয় সে আমাদের কাছে দিতেও নিতান্ত নারাজ! তাহার অন্তরের এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য যাহাই হউক, তাহার অস্তিত্বটুকু কল্পনা করিয়াই আমি যেন নিজেরই ভিতর অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। যে সহজ কৌতুকের বশে আমি আজিকার কাগজে তাহার বিবাহের বিজ্ঞাপন ছাপিয়া দিয়াছিলাম, সে কৌতুকের সামান্য একটুও যেন আর আমার মনে অবশিষ্ট রহিল না। মনে-মনে ঠিক করিলাম—কালই গিয়া ঐ বিজ্ঞাপনটা তুলিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু ঠিক তার পরের দিনেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আপিস হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে বাড়ী হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময় একজন অপরিচিত আগন্তুক আসিয়া একেবারে আমার নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। লোকটার বয়স আন্দাজ বছর ৪০।৪৫ হইবে। তাহার গায়ে সাদা পাঞ্জাবীর উপর একখানি আধময়লা চাদর, পরণের ধুতি মলিন, কাপড়খানা বড়জোর হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত নামিয়াছে। নমস্কার করিয়াই সে তার মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে নরেশ বাবু কি বাড়ীতে আছেন?"

স্বীয় পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, কি দরকার আপনার? কোত্থেকে আস্‌চেন?"

সে বলিল, "আজ্ঞে, একটু বিশেষ কথা আছে আপনার সঙ্গে, তা এখানে—"

আমি তাহাকে লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় বসাইলাম। লোকটা একপাশে কতকটা জড়সড়ের মত বসিয়া নিজের দুটি হাতে মোচড় দিতে দিতে কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "আজ্ঞে আপনি 'ভারতমাতা' কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়াচেন যে—" বলিয়া বোধ করি নিজের বক্তব্য আর শেষ করিবার প্রয়োজন নাই মনে করিয়াই সে আমার মুখের পানে চক্ষু তুলিল।

আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। কিন্তু এই দারুণ বিস্ময়ের প্রথম ধাকাটা সাম্‌লাইতে না সামলাইতেই একটা প্রচণ্ড হাস্যতরঙ্গ আমার বুকের নীচে তোলপাড় করিয়া উঠিল। সে হাসি চাপিতে যে আমার কি কষ্টই হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কোন ক্রমে বাহিরের পানে চাহিয়া থাকিয়া চিন্তার ভাণ দেখাইয়া বলিলাম, "ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েচে, একটি পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল বটে!"

লোকটার মুখে উৎসাহের দীপ্তি দেখিলাম। সে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই জন্যেই আমার আসা। আমার একটি অনূঢ়া মেয়ে আছে। বয়স বছর ১৪।১৫ হবে। লেখাপড়াও একটু—"

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া কোনরূপে গাম্ভীর্য্যের ভাবটুকু বজায় রাখিয়া আমি তাহার এই আবেদনের উত্তরে মাথা নাড়িলাম বটে, কিন্তু ভিতরে আমার তখন কি হইতেছিল, তাহা শুধু আমার অন্তর্য্যামীই জানেন। শেষে কিনা সত্য সত্যই ঘটকালির দায়িত্বে পড়িতে হইল! কি অঘটন!

কিন্তু আমার কৌতুকপ্রিয় প্রকৃতি তখন রীতিমত মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য অক্ষুন্ন রাখিয়া আমি আগন্তুকের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া একটা কাগজে লিখিয়া লইলাম। তিনি সেওড়াফুলি হইতে আসিতেছেন, নাম শ্রীনিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে, বাপের মুখে মেয়ের রূপের বর্ণনাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু যদি অনুমতি করেন, তাহলে বরং একদিন আপনার এইখানেই মৃণালকে নিয়ে আসি। দেখলেই বুঝতে পারবেন, মা আমার বড়লোকের ঘরেও বেমানান হবে না।"

আমার অন্তরাত্মা তখনও হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছি। বলিলাম, "আজ্ঞে তা বেশ ত! যদি কিছু অসুবিধে না হয়, তা হলে একদিন তাই নিয়ে আসবেন। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন উঠি, একটু বেরুতে হবে এখুনি!"

লোকটি যেন কৃতার্থ হইয়া হাত উঠাইয়া নমস্কার করিয়া, জীর্ণ চটিযোড়াটী পায়ে দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তখনি আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে তাহলে আসচে রবিবারেই না হয়—"

হঠাৎ একটু মুস্কিলে পড়িয়া গেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিজের মনে ভাবিয়া লইলাম, তাই বা মন্দ কি? বাড়ীতে আমার স্নেহময়ী মা, আর হাস্যময়ী অমলা—তাঁহাদের মাঝে একটি অপরিচিতা তরুণীর আগমনে বিব্রত হইবার কারণই বা কি থাকিতে পারে?

আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলাম। কিন্তু লোকটা বাহির হইয়া যাইবামাত্র আমার মনে যেন কিসের একটা দ্বিধা খচ করিয়া বিঁধিয়া উঠিল। কিছু অন্যায় করিলাম কি? কিন্তু তখনি আবার কতকগুলা অখণ্ড যুক্তির দ্বারা সে দ্বিধাটুকু ঝাড়িয়া ফেলিয়া প্রসন্নমনে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

৩

এই ঘটনার দিনতিনেক পরের শচীনাথের সঙ্গে আমার দেখা; ইহার আগে সে কলিকাতার বাহিরে কোন কাযে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার পর যখন তাহার সহিত আমার দেখা হইল, তখন আমি পরম উৎসাহে সর্ব্বপ্রথম এই কথাটারই অবতারণা করিলাম। কিন্তু আমার হাসির উত্তরে তাহার হাসি না দেখিয়া কিঞ্চিৎ দমিয়া গেলাম। তাবার গম্ভীর মুখ যেন হঠাৎ আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এবং তাহার পরে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে সব কথা হইল, তাহাতে আমার রহস্যামোদী হাল্কা মনখানা যেন হঠাৎ কোথাকার কতকগুলা জলভরা কালো মেঘে ঝাপ্‌সা এবং ভারি হইয়া আসিল। আজ বুঝিলাম, কেনই বা এই মাত্র ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর বয়সের মধ্যেই শচী সর্ব্বদা এমন বৃদ্ধের মত গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া বসিয়া থাকে। যে কথা সে ইতিপূর্ব্বে বোধ করি কাহারও কাছে কখনও বলে নাই, আজ সে সমস্তই, আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিল,—এ সংসারে বিবাহ করিয়া গৃহী সাজিবার অধিকার ভগবান তাহাকে দেন নাই। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, সে পিতৃমাতৃহারা। কিন্তু আজ প্রথম শুনিলাম, তাহার পিতার সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইতে সে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। তাহার ভ্রাতৃজায়া-শাসিত অগ্রজদের সংসারে সে এখন থাকে—নিতান্ত কোন অপরিচিত অতিথির মত; সেখানে কাহারও উপর তাহার এতটুকু দাবী পর্য্যন্ত খাটে না। নিজের এই নিদারুণ দুর্দ্দশার উপর আবার একটা পরের মেয়েকে গলায় বাঁধিয়া সে কি করিবে?

ইহার উত্তরে আমার বলিবার কিছুই ছিল না। আমার নিজের সাংসারিক অবস্থার সহিত শচীনাথের তুলনা করিতে গিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কথায়-কথায় সেই কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গটাও চাপা পড়িয়া গেল। যখন বিদায় লইলাম, তখনও কেবল শচীর সেই কথাগুলি আমার কাণে বেদনার করুণ সুরে ঝঙ্কৃত হইতেছিল,—"ভাই এ সংসারে হাস্‌বার অধিকার তো সকল মানুষের থাকে না! আমারও তাই।"

দুইদিন ধরিয়া মনের এই অবসাদটা কিছুতেই যেন কাটিতেছিল না। হঠাৎ আজ সকালে চা খাইতে

খাইতে বিদ্যুতের মত মনে পড়িয়া গেল—আজই ত' রবিবার! আজ সেই ব্রাহ্মণের অনূঢ়া মেয়েটাকে লইয়া আমার বাড়ীতে হাজীর হইবার দিন! কিন্তু কথাটা এত সহজে বিশ্বাসও হইল না। ভদ্রলোক কি সত্য-সত্যই সেই সেওড়াফুলি হইতে মেয়ে লইয়া এখানে ছুটিয়া আসিবে? কিন্তু হায়, তখন ত' বুঝিতে পারি নাই, অনূঢ়া কন্যার পিতামাতার কতখানি দায়!

তাই, বেলা প্রায় দুইটার সময় অমলা যখন আমার তন্দ্রাকাতর দেহখানায় ঠেলা দিয়া কহিল, "ওগো, দেখ দিকিন্, সদর দরজায় গাড়ী করে' কে একজন লোক এসে নাম্‌ল," তখন আমি বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিলাম। নীচে আসিয়াই দেখি, ফটকে সেই ব্রাহ্মণ, আর তাঁহার পিছনে একটি তন্বী কিশোরী। মেয়েটীর দুটী চোখ লজ্জায় মাটীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, কিন্তু, তাহা সত্বেও যাহা দেখা গেল, তাহাতে মনে হইল —তাই ত, এমন মেয়ের বিবাহের জন্যও পিতাকে এইরূপ দৌড়ঝাঁপ করিয়া বেড়াইতে হয়! হা রে সমাজ!

রীতিমত অভ্যর্থনা করিয়া ব্রাহ্মণকে বৈঠকখানায় বসাইলাম এবং দাসীকে দিয়া তাঁহার কন্যাকে উপরে মা ও অমলার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। চাকর নিরঞ্জন বাবুকে পাণ ও তামাকু আনিয়া দিল। কিন্তু আমার মাথার ভিতর তখন এক বিরাট গণ্ডগোল পাকাইয়া উঠিতেছিল। তাইত, আজিকার এই অভিনয়টা আমি কেমন করিয়া শেষ করিব? এই মেয়ে আনিবার কথা ত শচীকে কিছুই জানান হয় নাই! আর, সে যখন বিবাহ করিবেই না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প, তখন সে কি অনর্থক মেয়ে দেখিতে আসিতে রাজী হইবে? অথচ, অন্ততঃ ভদ্রলোকের মানরক্ষা করিতেও ত' একবার তাঁহার কন্যাকে দেখানো প্রয়োজন! পছন্দ-অপছন্দ—সে স্বতন্ত্র কথা!—মনে-মনে এম্‌নি আলোচনায় কত কথাই না ভাবিতে-ভাবিতে আমি একরকম ছুটিতে-ছুটিতেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একেবারে বৌবাজারের দিকে যাত্রা করিলাম।

৪

শচীর বাড়ী গিয়া প্রায় ঘণ্টখানেক ধরিয়া তাহার সহিত কথা কাটাকাটি করিতে হইল। শেষে অগত্যা সে আজিকার এই অভিনয়ের নায়ক সাজিয়া আমায় উদ্ধার করিয়া দিতে রাজী হইল। আমার তখন রহস্যের খেয়াল হৃদয় হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। শুধু মনে তখন কেবল ভাবিতেছি, এ বোঝাটা আমার ঘাড় হইতে কোন রকমে নামিয়া গেলেই বাঁচিয়া যাই।

ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া শচী আমার সহিত বাহির হইয়া পড়িল। যখন আমার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রথমে বৈঠকখানায় ঢুকিতে গিয়াই বিস্মিত হইলাম। কৈ, ব্রাহ্মণ কোথায় গেল? ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর নিজের মনে খুঁজিয়া না পাইয়া, শচীকে চেয়ারে বসিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতর যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় মায়ের আহ্বান শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। অন্দরের দিকের দরজার পর্দ্দার আড়ালে মা দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি বলিলাম, "কি হ'ল মা, এ ভদ্রলোক গেলেন কোথায়?"

আমার বন্ধুবান্ধবদের সম্মুখে মা এই অবস্থায় কথা কহিতেন। তিনি বলিলেন, "কি জানি বাছা, বোধ হয় বাড়ী ফিরে গেছেন।"

অধিকতর বিস্মিত হইলাম, "সে কি? আর মেয়েটী?"

মা বলিলেন, "সব বলচি শোন। ঝি যে তখন মেয়েটীকে ওপরে নিয়ে গেল, তারপর থেকে সে আমাদের কাছেই বসে ছিল। আমি কেবল বাবা হাস্‌তে হাস্‌তে বৌমাকে বল্‌ছিলুম ঐ তোদের কথাই, কোথাও কিছু নেই, তুই কিনা মিছামিছি কাগজে একটা ছাপিয়ে দিয়ে বসে রইলি! তোদের এই রং তামাসার কথায় আমরা দুজনেই হাস্‌ছিলুম; বৌমা বল্লে, মা, যার বিয়ে তাদের কাউকে না জানিয়েই একটা মিথ্যে যা-তা ছাপিয়ে দিয়ে কি রঙ্গই করচে দেখ না! মেয়েটী এতক্ষণ একপাশে চুপ করেই বসে ছিল। খানিক পরে

যখন আমি অন্য ঘরে উঠে গিয়ে একটু চোখ বুজেচি, তখন নাকি বৌমা এসে দেখে, মেয়েটীর দুটী চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়চে। বৌমা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসা করে কেন কাঁদচে, তাতে সে কোন কথাই বলে নি। শেষে অনেক পীড়াপীড়ি করায় সে কাঁদতে কাঁদতে শুধু এইটুকু বলেচে,—হাঁ৷ দিদি, তুমিও তো মেয়েমানুষ, তুমিই বলতো আমরা কি এতই নীচ যে, লোকের কাছে এম্‌নি করে শেষটা—সে আর বলতে পারে নি।"

এইখানে মা চুপ করিলেন। হঠাৎ ঘরের ভিতরকার এই নিস্তব্ধতাটুকু আমার কাছে বড়ই বিকট বলিয়া মনে হইল। উৎসুক নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মা বলিলেন, "তারপর সে চুপ করলে। কিন্তু আর কোন কথাই সে বলে নি। একটু পরে বৌমাকে বলে সে নীচে বাপের কাছে চলে আসে। আমি তখন ঘুমুচ্ছি। তাই বৌমা আমায় এসব কিছুই বলে নি। ঘুম থেকে উঠে শুন্‌লুম তারা বাপ বেটীতে কখন বাড়ী থেকে চলে' গিয়েচে। বৌমা তো বসে বসে' হাপুশুটি কাঁদ্‌চে তুই এসে কত বক্‌বি! তা বাবা আমরা যা দোষ করেচি সব তো বল্‌লুম—"

মায়ের কথা শেষ হইল কি না ঠিক কাণে গেল না। সেখানে তখন শুধু সেই অপরিচিতা কিশোরীর বাষ্পাকুল কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনিটাই ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া বাজিতেছিল—"আমরা কি দোষ করেচি?"

আমার চোখের উপর হইতে সহসা যেন একখানা মোটা পর্দা সরিয়া গেল। দুই চোখের সম্মুখে হঠাৎ আমার কার্য্যটা একটা বিরাট অন্যায়ের মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া উঠিল। নিজের অসংযত খেয়ালের বশে আজ আমি দুইটি কাতর প্রাণে যে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়াছি, তাহার জন্য জবাবদিহি করিবার আমার কি আছে? আর শুধু ত তাহাই নহে, গরীবের ঘরের সেই তেজস্বিনী কিশোরী মেয়েটী যে এই কথাটাই আমায় নীরব ইঙ্গিতে সুস্পষ্ট জানাইয়া দিয়া গেল, আর যাহাই হোক, সে নারী, এমন করিয়া মিথ্যার আড়াল দিয়া সেই নারীত্বের অপমান করিবার আমাদের কোন অধিকারই ছিল না। হঠাৎ এক নিদারুণ মনস্তাপের জ্বালায় আমার সর্ব্বশরীর অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল।

শচী ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "তাহ'লে আমি এখন চল্‌লুম।" আমি প্রত্যুত্তরে কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে নতমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তারপর দুইদিন ধরিয়া আর তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। এই দুইদিন সেই অপরিচিতা ব্রাহ্মণকন্যার কথাটা নিদারুণ অভিশাপের মত ছাপাইয়া এই কথাটাই বারবার স্মরণ হইতেছিল সেদিন প্রথমেই মেয়েটীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি মনে মনে আমাদের সমাজকে গালি পাড়িয়া বলিয়াছিলাম যে এমন মেয়ের বিবাহের জন্যও পিতা-মাতাকে এম্‌নি করিয়া বিব্রত হইতে হয়! কিন্তু আমি নিজে কি করিলাম! কন্যাদায়গ্রস্ত এম্‌নি শত শত পিতা মাতা যে বাঙ্গলা জুড়িয়া নিত্যনিয়ত তাহাদের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজল ফেলিতেছে, অন্ধের মত এই কঠিন সত্যটাকে আমি কেমন করিয়া উপেক্ষা করিলাম? অনুতাপক্ষুব্ধ জীর্ণ হৃদয়ে থাকিয়া থাকিয়া আমার মনে হইতেছিল, একবার ছুটিয়া যাই, সেওড়াফুলিতে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া তাহাদের নিকট হইতে আমার এই অন্যায়ের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া আসি!

৫

হঠাৎ সেদিন দুপুরবেলা শচীনাথকে আমার আপিসে হাজীর হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাহার মুখে আজ এক শান্ত হাসি উছলিয়া পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে খবর কি? হঠাৎ এখানে যে?"

সে বলিল, "ভাই একেবারে দু-দুটো শুভ সংবাদ। প্রথমতঃ আমার একটি সুবিধামত কায জুটেচে। দ্বিতীয়তঃ আমার বিবাহ।"

আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একটি সুবিধামত কাযের চেষ্টা সে অনেকদিন হইতেই করিতেছিল। কিন্তু তাহার বিবাহের কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরাত্মা অপরাধীর মত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মুখে বলিলাম, "বটে? বেশ বেশ। তা হলে হচ্চে কবে বল?"

শচী আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "দাঁড়াও হে, আজ ত সবে আশীর্ব্বাদ! এখন আসল কথা হচ্চে, তোমাকে আজ একটু সকাল সকাল এখান থেকে উঠে আমার সঙ্গে সেওড়াফুলি যেতে হবে।"

সেওড়াফুলি! বুকের নীচে হৃৎপিণ্ডটা লাফাইয়া উঠিল। কোন রকমে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "কোথায় মেয়ে ঠিক হল?"

সে গম্ভীরভাবে কহিল, "সেওড়াফুলিতে নিরঞ্জন চাটুয্যের মেয়ে—"

তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কাতরভাবে বলিলাম, "কেন ভাই ওকথা নিয়ে আমায় মন্ত্রণা দিচ্চ?"

শচী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন, যন্ত্রণা কিসের, আমি ত সেই মেয়েকেই বিয়ে করবো ঠিক করেছি।"

কিয়ৎক্ষণ দুজনেই নির্ব্বাক। আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, "কিন্তু তুমি যে তাকে মোটেই দেখনি!"

সে অন্যমনস্কের মত কহিল, "না, কিন্তু তার প্রয়োজন ত বিশেষ নেই! সেদিন তোমার মার মুখে যে পরিচয় আমি তার পেয়েছি তাই কি যথেষ্ট নয় নরেশ? যে হৃদয়টুকুর পরিচয় সেদিন সে তোমাদের বাড়ীতে দিয়ে গেছে, তাতেই বুঝেছি আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের ভার বইবার মত শক্তি তার যথেষ্ট হবে।"

আমার মুখে কথা সরিল না। শচী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল। তাহার সেই শান্ত মুখমণ্ডলে একটা দীপ্তি আসিয়া পড়িয়াছিল। আজ আমার হঠাৎ মনে হইল এতদিনে আমি এই দুর্জ্ঞেয় লোকটিকে যথার্থ চিনিতে পারিলাম।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির প্রভাব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রকৃতির যে অপরূপ আবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার কল্পনানয়নে তাহার কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ভাসিয়া আসিয়াছে। কাব্য সাহিত্যে বিশ্ব-প্রকৃতির এ চিত্র বাস্তবিকই অনুপম। কবি বলিতেছেন

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী!
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে,
তুমি চঞ্চল গামিনী!
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী!

এই বিচিত্র অপরূপ প্রকৃতিকে কবি চিনিয়াছেন বলিয়া লোকের মাঝে গর্ব্ব করিয়াছেন, অথচ ইহার পূর্ণ পরিচয় তিনি আজও প্রাপ্ত হন নাই। ইহার 'ধীর গম্ভীর গভীর মৌন মহিমা', নিখিলের চিত্তোন্মাদিনী ইহার ঐ মঞ্জুল রাগিণী চিরদিনের জন্য গানের সুরে কবি ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন,

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে!
চিরকাল তরে গানের সুরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধরে।
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ
বাঁশিতে ভ'রেছি কোমল নিখাদ—
তবুও এই অসীমরহস্যময়ীর চিরচঞ্চল রহস্য সম্পূর্ণ ব্যক্ত

করিতে পারিয়াছেন কি না কবি বলিতে পারেন না —

'তবু সংশয় জাগে ধরা তুমি দিলে কি ?' কিন্তু একেবারে ধরা না দিলেও প্রকৃতির এই গূঢ়তম রহস্য ও অতীন্দ্রিয়ের সৌন্দর্য্যের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পাঠকের হৃদয়ে যেমন সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন একমাত্র Shelley ভিন্ন অন্য কোনো কবির মধ্যে তাহা আমরা পাই নাই।

Mathew Arnold, Wordsworth এর কবিতা সমালোচনা করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন—

Wordsworth's poetry is great because of the extraordinary power with which he feels the joy offered to us in nature and becuse of the extraordinary power with which in case after case he shows us the joy and renders so as to make us show it.

অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের জন্য যে আনন্দ ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহার অসাধারণ অনুভূতি এবং কবিতার পর কবিতায় তাহা ব্যক্ত করিয়া আমাদের প্রাণে জাগাইয়া তুলিবার অসাধারণ শক্তিই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে মহাকবি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এই কবিতাগুলি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা অপেক্ষাও অধিকতর সত্য। তাঁহার নিবিড় অনুভূতির পরিচয় আমরা এতক্ষণ পাইয়াছি। ইহাকে প্রকাশ করিবার শক্তি ও নৈপুণ্যও তাঁহার অসাধারণ।

অনুভূতি কবিতার প্রাণ, কিন্তু ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়াই ইহা রূপ লাভ করে। সুতরাং কবিতার বিচার করিতে গেলে কেবল মাত্র ভাবের উৎকর্ষ দেখিলেই হয় না, তাহার ভাষা ও ছন্দের প্রতিও লক্ষ্য করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ এমনই সুমধুর ও সম্পৎশালী যে, ভাবের সূক্ষ্মতম স্পন্দনও পাঠকের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে এবং কবির প্রাণের যে গভীরতম আনন্দ, তাহা পাঠকের প্রাণে সঞ্চারিত হয়। অন্তর যখন ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ হয়, আগ্নেয় গিরির অগ্নি-নিঃস্রাবের মত ভাষা যে তখন কেমন করিয়া কণ্ঠ হইতে বাহির হয় রবীন্দ্রনাথের রচনা তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁহার ভাষার মধ্যে কোথায়ও দীনতা নাই, কোথায়ও কর্কশতা নাই, কোথায়ও নির্জীবতা নাই। প্রাণের প্রাচুর্য্য, ভাষার অপূর্ব্ব প্রাচুর্য্যের মধ্যদিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শেলির প্রকৃতি বর্ণনাও এ বিষয়ে রবীন্দ্র-নাথের অনুরূপ। প্রকৃতিকে একবার সুন্দর বলিয়া যেন মন কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না। প্রেমিক যেমন যাহাকে ভালবাসে তাহাকে কতভাবে কত আদর করিয়া কত প্রকারে তাহার কাহিনী বলিয়া থাকে, রবীন্দ্র-নাথও সেইরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেন। হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস নব নব উপমা ও শব্দের মধ্য দিয়া বাহিরে ব্যক্ত হয়। প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক বিশেষণ তিনি এমন সুকৌশলে যোজনা করেন যে, চিত্রকরের নিপুণ তুলিকাপাতের মত তাহা এক একটি চিত্র পাঠকের চক্ষের সম্মুখে আঁকিয়া দেয়। কোথায়ও কোনো অস্পষ্টতা তাহার মধ্যে থাকে না। তাঁহার ভাষার আর একটী বিশেষত্ব এই যে প্রকৃতির ফুল ফল আকাশ বাতাস প্রভৃতি দিয়াই তাহা গঠিত। প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ তাঁহার এত গভীর যে প্রকৃতির নাম রূপের প্রভাব অতিক্রম করা ভাষাতেও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।

ভাষার ন্যায় ছন্দ সম্পদও রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয়। এমনই লীলায়িত তাঁহার ছন্দের গতি, এমনই মধুর তাহার ভঙ্গী যে নাচিয়া নাচিয়া ভাব তাহার সহিত অগ্রসর হয়। ভাবের গাম্ভীর্য্য ও তারল্যের সহিত তাঁহার ছন্দের গতিও তাল রাখিয়া চলে। এক একটী কবিতা তাঁহার যেন এক একটী সঙ্গীত, সুর ও ঝঙ্কার মনকে বস্তুজগতের বন্ধন হইতে আনন্দের কনকালোকে মণ্ডিত করিয়া দেয়; বর্ণনীয় বিষয়টীর সহিত পাঠকের প্রাণে পরিপূর্ণ যোগ স্থাপন করে। নববর্ষায় কবির প্রাণ যে আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে তাহা যে ছন্দে

কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যেই ব্যক্ত হইয়াছে।

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে
হৃদয় নাচেরে!
শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ;
আকুল পরাণে আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরে মত নাচেরে।

এই কবিতাটী যদি এই ছন্দে রচিত না হইয়া "বৈশাখ" কবিতার ছন্দে রচিত হইত, তাহা হইলে ইহার ভাবের অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়া যাইত; অথচ বৈশাখের ছন্দ ভিন্ন নিদাঘ-মধ্যাহ্নের বিরাট অম্বরব্যাপী লেলিহান চিতাগ্নি-শিখার চিত্র কখনই এত সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইত না। কবি বর্ষামঙ্গল রচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা!
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে;
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা!

ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়া আমরা মত্ত বরষার ভৈরব হর্ষময় আবির্ভাবকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি।

ছন্দ ও ভাবের এইরূপ সাহচর্য্য রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রকৃতি ব্যাখার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। বিশেষভাবে তাঁহার সোনার তরী, হৃদয় যমুনা, সুদূর, মানস সুন্দরী, বসুন্ধরা, নিরুদ্দেশ যাত্রা ও জ্যোৎস্নারাত্রে এবং বর্ষার কবিতাগুলিই এ বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য। ছন্দ ও ভাষা বাদ দিলে হৃদয় যমুনা, সোনার তরী নিরুদ্দেশ যাত্রা ও সুদূর প্রভৃতি কবিতাগুলির একটী নির্দ্দিষ্ট অর্থ বাহির করা সহজসাধ্য হয় না। সোনার তরীতে কবি কি কথা বলিতেছেন, হৃদয় যমুনায় কাহাকে আহ্বান করিতেছেন, নিরুদ্দেশ যাত্রায় কোন্ বিদেশিনীর সোনার তরীতে লক্ষ্যহীনভাবে কিসের অন্বেষণে চলিয়াছেন, এবং কোন্ বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরী শুনিয়া মন চঞ্চল ও উন্মনা হইয়াছে এই সকল প্রশ্নের সহজ উত্তর না পাইয়া এক শ্রেণীর সমালোচক ইহাদিগকে অর্থহীন ও অকিঞ্চিৎ-কর বলিয়াছেন।

আমার মনে হয় শ্রদ্ধেয় ৺মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় এ বিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই সত্য। সকল কবিতার একটী নির্দ্দিষ্ট পরিষ্কার ব্যাখা করিতে না পারিলেও ইহারা অর্থহীন ও তুচ্ছ নহে। বিশ্বপ্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ও রূপে আমাদের প্রাণে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহার অন্তর্নিহিত গূঢ়তম রহস্য হৃদয়ে যে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে, এক একটী কাল্পনিক চিত্রের মধ্য দিয়া ভাষা ও ছন্দের সাহায্যে তাহাকেই কবি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতির সেই অতীন্দ্রিয় সঙ্গীতের ইহারা যেন এক একটী ক্ষীণ প্রতি-ধ্বনি, বিশ্বের অসীম সৌন্দর্য্য ও রহস্য-পারাবারের উপকূলে দণ্ডায়মান আত্মহারা মানবাত্মার যেন ইহারা এক একটী অস্ফুট আনন্দ ও বিস্ময় নিনাদ। যাঁহারা নিজ জীবনে এই আনন্দ ও বিস্ময় অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল ইহাদের সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ, অন্যের নিকট ইহা অর্থহীন শব্দ মাত্র। কবি নিজেই ইহার অর্থ অনেক সময় ভাবিয়া পান না।

"কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েছে
যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে
কিছু কি?
তখন কি কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি "অর্থ কি জানি?"
তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে
মুচকি
বিশ্বের অপার সমুদ্র তীরে চারিদিকের
এ অসীম জগৎ জনতা

এ নিবিড় আলো অন্ধকারে,
কোটী ছায়াপথ, মায়াপথ
দুর্গম উদয় অস্তাচল

—ইহাদের মাঝখানে নিখিলের অসীম রহস্যের সহিত মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া কেবলই তাঁহার হৃদয় বচন-অতীত ভাবে ভরিয়া উঠে, নয় অশ্রুজলে ভাসিয়া যায় এবং প্রশান্ত গম্ভীর ঐ প্রকৃতি মধ্যে জীবন বিলীন হয়। সেই মিশ্রিত আনন্দ বিষাদ ও বিস্ময়ের প্রবাহে যে সকল কবিতা ও গান ভাসিয়া আসে তাহাকে দুর্বোধ বলিতে পার, তাহাকে অসংলগ্ন বলিতে পার, কিন্তু অর্থহীন বলিও না। ইহার মধ্যে প্রকাশের যে অসম্পূর্ণতা তাহার জন্য কবি দায়ী নহেন, দায়ী মানুষের অসম্পূর্ণ ভাষা। বিশ্বের অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য ও অন্তহীন রহস্য ভাষায় জালে ধরা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ এই অসাধারণ ভাষা ও ছন্দ সম্পদ লইয়া প্রকৃতির যে সকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। তাঁহার বর্ণনা কোথাও ভারাক্রান্ত নহে। ফটোগ্রাফের মত তিনি কোনও দৃশ্যের খুঁটিনাটি অঙ্কিত করেন না, কিন্তু অসামান্য চিত্রকরের মত তাহার অন্তরের রূপটী পাঠকের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলেন। কখনও বা যত্ন-নির্ব্বাচিত দুই চারিটী শব্দের সাহায্যে, আবার কখনও বা কল্পনা ও ভাষার প্রাচুর্য্যে বর্ণনীয় বিষয়টী প্রকাশ করেন; বাহুল্য ভয়ে তাহার দুই একটী উদাহরণ মাত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। নিম্নের কতিপয় ছত্রের মধ্যে কবি মরুভূমির ও উপত্যকার কি মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন:—

সুদুর্গম দূরদেশ,—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহা পিপাসার রঙ্গভূমি; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে;
দিগন্ত বিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে প'ড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস-বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ নির্দ্দয়!

কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে
দূর দূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে। চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিক-নির্ম্মল স্বচ্ছ, খণ্ডমেঘগণ
মাতৃস্তন পানরত শিশুর মতন
প'ড়ে আছে শিখর আঁকড়ি; হিম-রেখা
নীল গিরিশ্রেণীপরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জ্জটীর তপোবন-দ্বারে!

আবার দুইছত্রে সিন্ধুতীরে সূর্য্যাস্তের কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন দেখুন:—

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন
আকাশ সোনার বর্ণ সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন!

বৃষ্টিক্লান্ত ঝঞ্ঝামুখর সন্ধ্যার কি চমৎকার বর্ণনা কবি করিয়াছেন—

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝর ঝর
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার,
অরণ্য উদ্যত বাহু করে হাহাকার!
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরষিয়া।

ভাবকে রূপদান করিয়া মাঝে মাঝে আবার তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কন করেন তাহাও অনুপম। প্রিয়-বিচ্ছেদের যে মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন নিখিলের জলস্থলে অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে, নিম্নের কতিপয় ছত্রে তাহাকে রূপ দিয়াছেন—

"মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশী
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে, জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল

বক্ষে টানি দিয়া, স্থির নয়ন যুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী!"

উর্ব্বসীর মধ্যে কবি যে অসাধারণ কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, দুই একছত্রে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব বলিয়া আমরা তাহা হইতে উদ্ধৃত করিলাম না। 'বিজয়িনী' কবিতাও তাঁহার মনোহর ভাষাচিত্রের আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। Byronএর Childe Haroldএর স্থানে স্থানে, Keatsএর কতিপয় ode এবং Shelleyর কবিতা ভিন্ন ইংরাজী সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী সজীব প্রকৃতিচিত্রের তুলনা বিরল।

বাস্তব হইতেই অবশ্য কবি ইহাদিগকে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ কল্পনার তুলিকাতে বাস্তব অপেক্ষা তাহারা মধুরতর হইয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতি যে এত সুন্দর, তাহার মধ্যে যে এত শোভা, এত সম্পদ্ আছে, তাহা তাঁহার সেই সকল চিত্র দেখিবার পূর্ব্বে আমাদের মনে হয় নাই। তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়াই এই সৌন্দর্য্য আমাদের চোখে পড়িয়া নিবিড় বিস্ময়ে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

'পুরস্কার' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কবির আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন

'অন্তর হ'তে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরস-ধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে!

• •

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্য ছায়,
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।

তাঁহার এ আকাঙ্ক্ষা যে অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছে ইহা তাঁহার কাব্যামোদী পাঠকগণ অসংকোচে স্বীকার করিবেন। তাঁহার কবিতা তাঁহাদের প্রাণে সত্যই আনন্দের এক কল্পলোক সৃজন করে। তাহাদের সেই সুমধুর সুর শুনিয়া

সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা; মধুময় হ'য়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটী ছুটে,
মোদের কুটীর প্রান্তে যে কদম্বফুটে
বরষার দিনে"—

অন্তরের এই যে আনন্দোচ্ছ্বাস যাহা শ্রেষ্ঠ কবিগণ পাঠকের প্রাণে জাগাইয়া দেন, তাহাই প্রকৃত কবিতার প্রাণ। ইংরাজ কবিদের মধ্যে Keats ও Shelleyর মধ্যে ইহা যেমন দেখি আর কোথায় তেমন দেখিতে পাইনা। Wodrsworth প্রকৃতির শান্তি ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন বটে; প্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত ভূমার স্বত্বা উপলব্ধি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দার্শনিকতা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার কবিত্বকে অতিক্রম করিয়া গেছে। তাঁহার কাব্যের মধ্যে স্থানে স্থানে যেন একটী সজ্ঞান চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কোনো কোনো কবিতার মধ্যেও এই দোষ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ কবিতার মধ্যে এই দোষ একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। মোহিত বাবুর ভাষায় বলিতে গেলে—তাঁহার কবিতা তাঁহার মানস সৃষ্ট উর্ব্বসীর মতই "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকসি" উঠিয়াছে। সৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষে উষার কনকবর্ণ বালসূর্য্যের পানে চাহিয়া প্রাচীন ঋষি কবি যেমন আপনার আদিম বিস্ময় বেদগাথায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও সেইরূপ বিস্ময় ও আনন্দ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে।

তবুও মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না রাত্রে দক্ষিণা বাতাসের প্রথম স্পর্শনে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় যখন কবির মন মাতিয়া উঠে, তখন প্রকৃতির এই অসীম রহস্যের অর্থ বুঝিবার জন্য তিনি পাগল হন। ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠেন:—

"আজি মোরে কর দয়া, এস তুমি অয়ি,
অপার রহস্য তব হে রহস্যময়ী
খুলে ফেল; আজি ছিন্ন করি ফেল ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর!

... ...

কোনো মর্ত্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মুরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।"

কবিজনসুলভ কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া তখন কবি প্রকৃতির এই চিত্তাকর্ষণী শক্তির অর্থভেদ করিতে চাহেন। তিনি বলেন, হয়তো পূর্ব্বজন্মে প্রেয়সী নারীরূপে এই প্রকৃতি তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া ছিল।

মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে!

তাই বুঝি নীরব নীল গগনে জোৎস্নালোকে আজ তার বসন লুণ্ঠিত দেখিতে পান! তাই বুঝি কোমল তৃণ শয়নে তার চরণবিক্ষেপ, এবং পুষ্পবাসে তার পরাণ-মন-উল্লাসী পরশ অনুভব করেন।

তাই কবি আজ সেই অশরীরী প্রেয়সীকে বলিতেছেন—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্তভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; ঊষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তল তল ছল ছলে
ললিত যৌবন খানি; বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনা ব্যথা সুগন্ধ নিঃশ্বাসে
করিছ প্রকাশ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জ্জন গগনে একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ কুন্দশুভ্র বিরহ শয়ন!

কবি আশা করিতেছেন তাঁহার এই মানস সুন্দরী পরজন্মে অবার মুর্ত্তিতে তাঁহাকে ধরা দিবে; বিশ্বের অন্তর বাহির শূন্য জলস্থল সবঠাঁই হইতে এই সর্ব্বময়ী আপনাকে হরণ করিয়া, ধরণীর এক প্রান্তে একখানি মধুর মুরতি ধরিয়া তাঁহাকে আবার দেখা দিবে।

কখও বা দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যকে অবলম্বন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতেছেন। প্রকৃতির প্রতি যে আমরা এরূপ নিগূঢ় আকর্ষণ অনুভব করিতেছি তৃণে পুলকিত ধরণী যে আমাদের এমন করিয়া আহ্বান করিতেছে, নিশার আকাশের তারকা যে এমন পরিচিতের মত আমাদের দিকে চাহিয়া আছে, কবি ইহার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন।

কবি বলিতেছেন, সৃজনের আদিম প্রত্যূষে একদিন আমরা এই অনন্ত জীবধাত্রী ধরণীর মধ্যেই বিলীন হইয়া ছিলাম; আমাদিগকে মৃত্তিকার সঙ্গে মিশাইয়া লইয়া পৃথিবী তখন তাহার কক্ষের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিত; আমাদের মধ্যেই তখন পৃথিবীর তৃণপুষ্প অজস্রভাবে ফুটিয়া উঠিত। তার পর কোন্ সুদূর অতীতে মানব-আত্মার গৌরব লইয়া এই পৃথিবী হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছি; কিন্তু তাহার সহিত আমাদের শিরায় শিরায়, অস্থিমজ্জায় অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই আজ চিরপরিচিতের মত সমস্ত ভুবন অব্যক্ত আহ্বানে শতবার করিয়া আমাদিগকে ডাকিতেছে।

কখনও আবার কবি কল্পনা করেন—প্রকৃতি ও মানব একই বিরাট্ আত্মার দুইটী বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রি দিন ধায়;
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে।

প্রকৃতি তাই প্রাণহীন জড়পিণ্ড মাত্র নহে। ইহার মধ্যে আমরা আমাদের অন্তরাত্মারই পরমাত্মীয়ের সন্ধান পাই। তাই বোধ হয় ইহার আকাশ বাতাস, প্রতি ধূলি কণা, তাহার সমস্ত বৈচিত্র্য লইয়া আমাদিগকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে আকর্ষণ করে।

আবার কখনও কবি প্রকৃতির এ আকর্ষণের অর্থ কিছুতেই খুঁজিয়া পান না। কল্পনা হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে; দার্শনিক ব্যাখ্যায় হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। কবি ভগবানকে ব্যাকুলভাবে ডাকিয়া বলেন—

তোমার কাছে আমার
এ মিনতি
যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিল কেন,
আকাশ পানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী ?
কেন নিশার নীরবতা
শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরাণে ঢেউ তুলেছিল
কেন দিয়ে জ্যোতি ?
তোমার কাছে আমার
এ মিনতি !

এইরূপ নানা ভাবে হৃদয় আলোড়িত হইতে হইতে অবশেষে, বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তর্প্রকৃতি যে একই অখণ্ড বিরাট্ প্রাণের দুইটি বিভিন্ন প্রকাশ, এই কল্পনাই কবির জীবনে সত্য বলিয়া উপলব্ধ হইয়াছে। আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্য হইতে চিরদিন যে অসীম রহস্য তাঁহাকে আকুল করিয়াছে তাহার মূলে সেই বিরাট্ পুরুষেরই লীলা—যিনি মানবাত্মার মধ্যে আপনার যে বিশিষ্টরূপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাকেই আবার প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশমান আপনার অন্তরূপের স্পর্শে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছেন।

Wordsworth এবং অনেকাংশে Shelleyও তাঁহার ন্যায় প্রকৃতির মধ্যে এক অনন্ত প্রাণশক্তির লীলা দেখিয়াছেন। Wordsworth প্রকৃতির ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রতি পদার্থের মধ্যেই অখণ্ড প্রাণের স্পর্শ অনুভব করিতেন। তাই বলিয়াছেন—

And I have felt
A Presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime,
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns
And the round ocean and the living air
And the blue sky and in the mind of man.

Shelleyকে গোঁড়া ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মজ্ঞানহীন নাস্তিক বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন—আধ্যাত্মিকতা তাঁহার অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশ্রিত ; জড়বাদিগণের সহিত তাঁহার আকাশ পাতাল প্রভেদ। প্রকৃতি যে অচেতন জড়পদার্থ নহে, এক অদৃশ্য শক্তি, যাহাকে তিনি Spirit of Love বলিয়া বার বার অভিহিত করিয়াছেন তাহা যে প্রকৃতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে ইহা সর্ব্বদাই তিনি অনুভব করিয়াছেন। এই শক্তি—

"Wields the world with never-wearied
love,
Sustains it from beneath and kindles
it above."

ইহারই হাস্যজ্যোতিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত, ইহারই সৌন্দর্য্যে জগতের যাহা কিছু আছে তাহার উদ্ভব।

That light whose smile kindles the
Universe,
That Beauty in which all things work
and move,
That Benediction which the eclipsing curse
Of birth can quench not,

সুতরাং প্রকৃতির সহিত মানুষ যে গভীর আত্মীয়তা অনুভব করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

সমালোচকগণ বলিয়াছেন—জার্ম্মাণ দার্শনিকগণের প্রভাবই ইংরাজী সাহিত্যের এই অদ্বৈতবাদের ভিত্তি। Schellingএর Doctrine of Identity অথবা হেগেলের Absolute Idealism হইতে Wordsworth ও Shelley এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন কি না আমি জানি না। উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছে তাহাও আমি বলিতে পারি না। তবে আমার মনে হয় প্রকৃত যিনি কবি অথচ ভগবদ্ভক্ত ও আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন, আপনার

অন্তরের দিব্য দৃষ্টির বলেই তাঁহাকে একদিন এই সত্যে পৌঁছিতে হয়। কারণ তাঁহার কবি হৃদয় একদিকে যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না, সেইরূপ তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভগবানকে প্রকৃতির রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেও পারে না।

প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাব তাঁহার সুদীর্ঘকাল ব্যাপী রচনার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, ধীরভাবে বিচার করিলে তাহার মধ্যে মোটামুটি দুইটি বিভাগ করিতে পারা যায়। ইহার এক একটী তাঁহার জীবনের এক এক ভাগে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রথম জীবনের কবিতার মধ্যে দেখিতে পাই, প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য্যেই প্রধানত তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রাকৃতিক চিত্র কোনও অপার্থিব সত্য বা সৌন্দর্য্যের আলোকপাতে তাঁহার চক্ষে উজ্জল হয় নাই; প্রকৃতিকে কোনো অতিপ্রাকৃতের সোপান বলিয়া তিনি ভালবাসেন নাই। কবি Keatsএর মত একটী বলিষ্ঠ Naturalism, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপাসনা ও উপভোগ তাঁহার রচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি যে কত সুন্দর তাহা বার বার বলিয়াও যেন কবি তৃপ্ত হইতেছেন না। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই তাঁহাকে এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতেছে। আনন্দের আতিশয্যে কবি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিতে চাহেন। কবি বলিতেছেন—

কতবার মনে করি পূর্ণিমা নিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নিদ্রালস আঁখি সম, ধীরে যদি মুদে আসে
এ শ্রান্ত জীবন।

Nightingaleএর প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে কবি Keatsও এই কথা বলিয়াছিলেন।

Now more than ever seems it rich to die
To cease upon the midnight with no pain
While thou art pouring thy soul abroad
In such an ecstasy,

নিদাঘের সন্ধ্যায় সমাধি মন্দিরের স্তব্ধ গম্ভীর সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইত Shelleyরও একদিন এই কথা মনে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন

Thus solemnised and softened, Death is mild,
And terrorless as the serenest night.

কিন্তু প্রকৃতির উপর এইরূপ মনোভাব রবীন্দ্রনাথের ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে অন্তরের পরম সৌন্দর্য্য লুকাইয়া আছে, তাহার প্রতি কবির দৃষ্টি পতিত হইল। প্রকৃতির সুষমার মধ্য দিয়া তিনি সেই "অসীম সুন্দর ত্রিলোকনন্দন মূর্ত্তি"র চকিত সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার কবিতার মধ্যে এই অসীম সুন্দরের জন্য ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিল। প্রকৃতির পরিপূর্ণতার মধ্যে পূর্ব্বে যখন হৃদয়ের বিরহব্যথা জাগিয়া উঠিত, তখন ধরাতলের প্রণয়িনীই তাহার লক্ষ্য ছিল, তাহারই সজল কাজল আঁখির কথা তখন মনে পড়িয়া প্রাণ ব্যাকুল হইত।

"হেরিয়া শ্যামলঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।"
"ঝিলি মিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো
আমি ভাবিতেছি কার আঁখি দুটি কালো।"
"চকিত আঁখি দুটি তার
মনে আসিছে বারবার
বাহিরের মহা ঝড়
বজ্র কড় কড়
আকাশ করে হাহাকার
মনে পড়িছে আঁখি তার।"

কচিৎ কখনো মেঘোদয়ে সেই অসীম সুন্দরের জন্য যে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত না তাহা নহে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে "আর্দ্র পূর্ব্ব বায়ু" বেগে বহিলে নির্জ্জন গৃহে পার্থিব প্রিয়জনের জন্যই হৃদয়ে হাহাকার উঠিত। এখন নব বর্ষায় "বাঁধন হারা জলধারা"র কলরোলে সেই অজানা চিরসুন্দরের জন্যই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, জ্যোৎস্নারাতে অনন্ত তৃষায় তাহার জন্যই প্রাণ কাতর হয়; ঝড়ের রাতে তাহার সাথেই কবির নিত্য প্রেমাভিনয় হয়। কবি এখন

প্রকৃতিক ভালবাসেন কেবল মাত্র তাহার নিজের সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, তাহার মধ্য দিয়া সেই চিরসুন্দরের স্পর্শলাভ করেন বলিয়া। কবি এখন অনুভব করেন—

"প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

তাই তাঁহার হৃদয় এখন প্রকৃতির সকল পদার্থের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে, সর্ব্বত্রই তাঁহার আভাস প্রাপ্ত হয়। 'শ্রাবণ মেঘের আধেক খোলা দুয়ার' দিয়া কবি আজ দেখিতে পান

ঐযে পূরা গগন জুড়ে,
উত্তরী তার যায়রে উড়ে
সজল হাওয়ার হিন্দোলেতে দেয় দোলা!

শরতের শেফালী ও কাস গুচ্ছের মধ্যে কবি তাঁহারই হাসি দেখিয়া থাকেন, নীল আকাশ ও সবুজ ঘাসের মধ্যে কবি তাঁহারই স্পর্শ লাভ করেন।

"এই সবুজ এই নীলের পরশ,
সকল দেহ করে সরস
রক্ত আমার রাঙিয়ে আছে
তব অরুণ রাগে।"

তিনি আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে বলিতেছেন—

আমার নয়ন ভুলান এলে,
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলি তলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙ্গা চরণ ফেলে,
নয়ন ভুলান এলে।

কবি এখন তাই সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ভগবানের সহিত মানুষের যে গোপন মিলনের আয়োজন চলিয়াছে তাহারই উপলব্ধি করেন। এই মিলনকে মধুময় করিয়া তোলাই এখন তাঁহার নিকট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একমাত্র সার্থকতা।

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
আলোয় আকাশ ভরা!
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ ল'য়ে কোলে
ঊষা এসে পূর্ব্ব দুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা।

'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর', 'রাজা,' 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্যের' প্রায় সমস্ত গানের মধ্য দিয়াই মানুষের সঙ্গে ভগবানের এই যে অনন্তলীলা অশ্রান্তভাবে চলিতেছে তাহারই কাহিনী নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ভগবানের এই নিত্যলীলার মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়াই কবি এখন জীবনের সর্ব্বপ্রধান সার্থকতা বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাই প্রকৃতির নিষ্ঠুর মূর্ত্তি দেখিয়া মানুষকে অন্ধ জড়শক্তির ক্রীড়নক ভাবিয়া একদিন তাঁহার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল—

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম নিগড়ে
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা,

অথবা মানুষের দুঃখকষ্টে প্রাকৃতিক নিয়মের বুকে ব্যথা বাজে না বলিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ভাব মনে আসিয়াছিল—তাহা তাঁহার বর্ত্তমান কালের রচনা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। দুঃখ বেদনা যাহা কিছু জীবনে আঘাত করিতেছে তাহা সেই ভগবানেরই দান, সেই প্রেমময় মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ, ইহা অনুভব করিয়া একটী পরম আনন্দ ও নিঃসংশয় নির্ভরশীলতার ভাব তাঁহার এই সকল রচনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। আজ তাঁহার পরিণত জীবনের সঙ্গীতগুলি পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, 'নৈবেদ্য'র মধ্যে একদিন যে কথা বলিয়াছিলেন সত্যই তিনি জীবনে তাহার অনুভব করিয়াছেন—

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে
যতদূরে আমি ধাই,
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

তাই তাঁহার পরিণত বয়সের এই সকল কবিতার মধ্যে প্রবৃত্তির উত্তেজনা বা ভাবের প্রাবল্য (passion) নাই। প্রকৃতি কবিকে এখন আর হর্ষ বিষাদে চঞ্চল এবং সৌন্দর্য্যে মত্ত করিয়া তুলে না; একটী প্রশান্ত গম্ভীর আনন্দ অনুভূতিতে কবিতাগুলি পরিপূর্ণ।

ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবির ভাষাতেও আমরা এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। পরিণত বয়সের কবিতা ও গান গুলি তাঁহার নিরাভরণ; তাহার মধ্যে শব্দের আড়ম্বর অথবা বর্ণনার উচ্ছ্বাস নাই। প্রথম জীবনের এবং এখনকার বর্ষার কবিতাগুলি পাঠ করিলেই এই পরিবর্ত্তন অনায়াসে আমাদের চক্ষে পড়ে। আজ প্রকৃতির প্রাণকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়া কবি উপমা ও রূপক ছাড়িয়া দিয়া একেবারে সোজাসুজি ভাবে তাঁহার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতাঞ্জলিতে কবি তাই বলিতেছেন—

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলঙ্কার;
তোমার কাছে রাখিনি আর
সাজের অহঙ্কার।
অলঙ্কার যে মাঝে প'ড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথ ঢাকে যে তার
মুখর ঝঙ্কার।

রবীন্দ্রনাথের স্থায় Wordsworthএর প্রথম প্রকৃতি প্রেমেও দুইটী স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম বয়সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কবি এক প্রকার মাদকতার অনুভব করিতেন। তখন

The sounding cataract
Haunted me like a passion, the tall rock,
The mountains and the deep and gloomy wood,
Their colours and their forms, were then to me
An appetite, a feeling and a love,
প্রকৃতির মধ্যে কোনো প্রাণের পরিচয় তখন তিনি তেমন করিয়া পান নাই; প্রকৃতির নিজের বাহ্য সৌন্দর্য্যেই তাঁহাকে মুগ্ধ করিত—

They had no need of a remoter charm
By thought supplied, or any interest
Unborrowed from the eye.

প্রকৃতির ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি পদার্থই যেন তাঁহার চক্ষে "The glory and the freshness of a dream —স্বপ্নরাজ্যের চিরনূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইত।

কিন্তু তার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া যখন মৃত্যুর সহিত পরিচয়লাভ করিলেন এবং the still sad music of Humanity —বিশ্বমানবের দুঃখকাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন এই মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। নিরবচ্ছিন্ন ভোগের আনন্দ অর্থাৎ sensuous joyএর স্থানে একটী স্থির গম্ভীর শান্তি কবি প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করিলেন; প্রকৃতির সহিত মানুষের সুখ দুঃখের গভীর আনন্দ তাঁহার উপলব্ধ হইল; এবং সমস্ত নিখিলের মধ্যে সেই অসীম সুন্দরের স্পর্শ লাভ করিয়া তখন তাঁহার জীবন ধন্য হইল। কবি তাই বলিতেছেন—

And I have felt.
A Presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts, a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns
And the round ocean and the living air,
And the blue sky and in the mind of man.

প্রকৃতি তাই নূতন ভাবে এখন তাঁহার মনকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। তাই তৃণে তৃণে সে ঔজ্জ্বল্য এবং পুষ্পে পুষ্পে সে সৌন্দর্য্য গরিমা এখন আর কবির চক্ষে পড়েনা, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা তাঁহার নিকট সৌন্দর্য্যহীন নহে। তাহাদের সৌন্দর্য্য জীবনের

সুখ দুঃখের বিচিত্র অনুভূতিতে গভীর ও সংযত আকারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়।

The innocent brightness of a new-born day
Is lovely yet ;
The clouds that gather round the setting sun
Do take a sober colouring from an eye
That hath kept watch over man's mortality.

সৌন্দর্য্যের কবি Keats অতি অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। নতুবা আমার বিশ্বাস তাঁহার মধ্যেও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এই পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইত। কারণ প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির দেবতার প্রতি, পার্থিব সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যের যিনি চির প্রস্রবণ তাঁহার প্রতি সত্যদর্শী কবিদের দৃষ্টি একদিন না একদিন আকৃষ্ট হইবেই।

শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধঃপতন

(ভাগলপুর সাহিত্যপরিষৎ শাখায় পঠিত)

মৌর্য্য মগধের ইতিহাস প্রাচীন ভারতের এক গৌরবময় যুগের কাহিনী। ভারতবর্ষ এই সময় উন্নতির চরম শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গৌরব এই উন্নতি বেশীদিন স্থায়ী হইল না। চন্দ্রগুপ্তের বাহুবল ও কৌটিল্যের রাজনীতি যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা তৃতীয় সম্রাট্ মৌর্য্যশ্রেষ্ঠ অশোকের মৃত্যুর অর্দ্ধশতাব্দীকাল মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। এই দ্রুত অধঃপতনের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বহু প্রয়াস ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে সর্ব্ববাদিসম্মত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুসন্ধান ও বিচারের ফলে যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা পশ্চিমে সুধীগণের মনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই এখনও প্রবল বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় যে ভিত্তির উপর স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিতে যাইয়া এই প্রচলিত মতের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হইয়া পড়িতেছে। তবে আমাদের ধারণা যে ইহার আলোচনা হইতেই আমরা যথার্থ সত্যের সন্ধান পাইতে পারি। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, কলিঙ্গ বিজয়ের পর শান্তির আশায় অশোক যে অহিংসামূলক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহারই প্রচারে তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার ব্রাহ্মণদিগের বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যাঘাত ঘটাইয়া তুলিল ; তাঁহার জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে 'দণ্ডসমতা' ও ধর্ম্মমহামাত্য নিযুক্ত করা, সমস্তই ব্রাহ্মণদিগের অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিল। এক কথায় অশোকের পরধর্ম্মাসহিষ্ণুতা ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের নির্য্যাতন সম্রাটের মৃত্যুর পর সভাবতঃই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এক প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিল। অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্রে পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞ এই প্রতিক্রিয়ারই সাফল্যের নিদর্শন এবং ইহারই ফলে ব্রাহ্মণগণ অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই তাৎকালীন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের

প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। অতএব তাঁহার মতে এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিক্রি ইই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের দ্রুত অধঃপতনের প্রধান কারণ। ১

আমরা কিন্তু ইহাতে সায় দিতে পারি না। সত্য বটে অশোক বৌদ্ধ সম্রাট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিলালিপিগুলিতে তাঁহার যে উদার মতের পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয় না যে তিনি কখনও সাম্প্রদায়িক বা মতবাদী ছিলেন। বরং এই ধারণাই জন্মে যে তিনি ধর্ম্ম মাত্রেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। একটি মাত্র শিলালিপির (Minor Rock Edict no. I) পাঠোদ্ধার এই পরস্পর বিরোধী মতের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়, রীস্ ডেভিড্স ২, ভিন্সেণ্ট স্মিথ ৩ সকলেই "যা ইমায়...মিসা কটা" (রূপনাথ লিপি) "এতে...মিসং দেব" (সার নাথ লিপি), "ইমিনা...মিসা দেবেহি" (ব্রহ্মগিরি লিপি) এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যে সকল ব্রাহ্মণগণ ভূদেব অর্থাৎ দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেছিল, তিনি (অশোক) তাহা মিথ্যা প্রমাণ করেন" অথবা "সেই সময় জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) যে সকল দেবতা সত্য বলিয়া উপাসিত হইতেছিল অশোক তাহাদিগকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করেন"। "দেব অর্থে বস্তুতঃ প্রচলিত দেবতাই বুঝায় কিন্তু ব্রাহ্মণও হইতে পারে; হিন্দুরা ব্রাহ্মকে দেবতা বলিয়া গণ্য করে।"

অশোকের স্বলিখিত শিলালিপি হইতে তাঁহার যে উদারতা ও পরধর্ম্মসহিষ্ণুতার পরিচয় পাই, তাহার সহিত এই ব্যাখ্যার কিছুমাত্র মিল নাই। কাযেই যদি এই ভাবার্থই সত্য হয় তাহা হইলে অশোককে সাম্প্রদায়িক ও ধর্ম্মান্ধ ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। এই ব্যাখ্যাই মহামহোপাধ্যায় ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের মতের সুদৃঢ় ভিত্তি। অতএব তাঁহাদের এই ব্যাখ্যা যে অভ্রান্ত নয় তাহা যদি প্রমাণ করা যায় তাহা হইলে তাঁহাদের অন্যান্য যুক্তিগুলির পর্য্যালোচনায় আর বিশেষ আবশ্যকতা থাকে না।

(১) J. and Proc. A. S. B. 1910.
(২) J. & Proc. A. S. B. 19:0
(৩) Rhys David's Buddhist India.
(৪) V. A. Smith—Asoka (Second Edition)

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁহার মতাবলম্বী সুধীগণ উক্ত শিলালিপির "মিশা" ও "অমিশা" এই দুই শব্দ "সত্য ও মিথ্যা" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সিলভ্যাঁ লেভি (৪) (M. S. Levi), ডাঃ ফ্লিট (৫) (Dr I. S. Fleet); টমাস (৬) (Mr F. W. Thomas) অধ্যাপক ভাণ্ডারকার ৭ (Prof D R. Bhandarkar) এবং শ্রীযুক্ত লাড্ডু ৮ (T. K Laddu) প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে শব্দ দুইটি "মিশ্র" ও "অমিশ্র"এর রূপান্তর মাত্র। এই পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাই এখন সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে—"জম্বুদ্বীপে যে সকল লোক এতদিন পর্য্যন্ত 'অমিশ্র' অর্থাৎ স্বতন্ত্র ছিল (এখন) দেবতাদিগের সহিত 'মিশ্র' অর্থাৎ মিলিত হইল।" অধ্যাপক ভাণ্ডারকারের মত পাশ্চাত্য মনীষিগণের অপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধ। তিনি বলেন—"অশোক তাঁহার প্রজাদিগের নিকট ধর্ম্ম কি তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালন করিলে পুণ্য হয় এবং পুণ্য সঞ্চয় করিলে স্বর্গলাভ হয়। পুরাকালে "দেব" ও "নর" পরস্পর পৃথক ছিল না, কেন না তখন কোনও ব্যক্তি এত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে নাই যাহাতে দেবতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। কিন্তু এখন অশোকের ধর্ম্মপ্রচারের ফলে প্রজাগণ এত পুণ্যবান হইয়াছে যে তাহারা দেবতুল্য; অতএব দেব ও নরের মধ্যে সেই পুরাতন অনতিক্রমণীয় ব্যবধান আর ছিল না, এখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাথী।" ৯ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মহামহোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যাও এখন আর টিকিতেছে না। আমাদের মনে হয় যে শ্রীযুক্ত লাড্ডু মহাশয়ের মত আরও যুক্তিসঙ্গত। ১০ সত্য বটে

(৪) J. R. A S—1911
(৫) J. R A. S—1911
(৬) Ibid, 1912
(৭) Indian Antiquary, 1912
(৮) J. R. A. S, 1911
(৯) Prof. D. R. Bhandarkar—Indian Antiquary 1912
(১০) Mr. T. K. Laddu, J. R. A. S, 1911

"মিশা" ও "অমিশা" অর্থে "মিশ্র" ও "অমিশ্র"—"দেব" অর্থে "দেবতা" সম্ভবতঃ "হিন্দুদেবতা", কিন্তু একথা বলা চলে না যে অশোকই প্রথম নর ও দেবতার এই সম্মিলন ঘটাইয়াছিলেন। তাহা হইলে মানিয়া লইতে হয় যে প্রজাদিগের জন্য অশোকই সর্ব্বপ্রথম স্বর্গদ্বার খুলিয়া দেন; কেন না তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে নর ও দেবতার সম্মিলন ছিল না; কাযেই প্রজাদিগের পক্ষে স্বর্গলাভও অসম্ভব ছিল। অশোকের শিলালিপি হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাব যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহার সহিত এই মতের মোটেই সামঞ্জস্য নাই। তিনি বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত যথারীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের ৩২ বৎসর পরে লিখিত 7th Pillar Edict হইতে জানিতে পারি যে শেষ বয়সেও ,অর্থাৎ মৃত্যুর ৩০ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্তও "দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী" অশোক সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সযত্নে প্রজাপালন করিতেছিলেন। সুতরাং "মুনিশা" শব্দের অর্থ ইহলোকের (জম্বুদ্বীপের) লোক নয় শ্রীযুক্ত লাড্‌ডু মহাশয়ের মতই ঠিক—পূর্ব্বতন বুদ্ধ এবং সম্ভবতঃ ভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণও বুঝাইবে।" তাহা হইলে ব্যাখ্যা এইরূপ দাঁড়ায়—"পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় তাহাদের স্ব স্ব দেবতা ও আচার্য্যের উপাসনা করিত, সুতরাং 'অমিশাদেব' ছিল কিন্তু এখন অশোকের অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারের ফলে "পরপাষণ্ড গরহা" এবং "আত্ম পাষণ্ড পূজা" নিবারিত হইয়াছিল এবং তাহারা বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবতা ও আচার্য্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। রূপনাথ লিপিতে কেবলমাত্র লিখিত আছে যে "তাহারা পূর্ব্বে অমিশ্র ছিল এখন মিশ্র হইয়াছে।" এই ব্যাখ্যাই আমাদের মতে ঠিক বলিয়া মনে হয় এবং অশোকের উদার ও পরধর্ম্মসহিষ্ণু চরিত্রের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্যও দেখিতে পাই। সত্য কথা বলিতে গেলে অশোকের নবধর্ম্ম কোনও বিশেষ আনুশাসনিক ধর্ম্মের নামে অভিহিত হইতে পারে না। ইহাতে না আছে বুদ্ধ না আছে কোনও দেবতা বিশেষ; আছে কেবলমাত্র কতকগুলি নৈতিক নিয়মাবলী, যাহা কি ব্রাহ্মণ, কি জৈন, কি বৌদ্ধ সকলেই পালন করিতে পারেন। ইহাতে মতবাদিতার লেশমাত্র গন্ধ নাই। তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ "পিতামাতার শুশ্রূষা, বন্ধু আত্মীয় স্বজন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি বদান্যতা, জীবে দয়া এবং স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সঞ্চয়। ১১ ধর্ম্ম প্রচারক সম্রাটের এই সকল নৈতিক নিয়মাবলী ৪নং Rock Edict বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। Pillar Edict no. 7এ আমরা দেখিতে পাই যে অশোক ধর্ম্মোপদেশ দ্বারাই প্রজাদিগের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র ধর্ম্ম প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, স্বয়ং তাহা পালন করিতেন যাহাতে প্রজাগণও তাঁহাকে আদর্শ মানিয়া অনুকরণ করিতে পারে। তিনি দিগ্বিজয়ের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশ পর্য্যটন করিয়া ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করিতেন এবং প্রজাদিগের এই ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন যে কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই চেষ্টা করিলে ইহলোকের বিপদ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। কাযেই তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের মতাবলম্বিদিগকে সাম্রাজ্য মধ্যে অবাধে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, কেন না তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাহারা সকলেই আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিবে। তিনি স্বয়ং উদার ভাবাপন্ন ছিলেন, তাই প্রজাগণও যাহাতে ধর্ম্মান্ধ না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। "আত্মপাষণ্ডপূজা" ও "পরপাষণ্ডগরহা" নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদারতা ও বদান্যতা কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; ব্রাহ্মণ, জৈন, এমন কি ক্ষুদ্র আজিবিক দিগের প্রতিও সম্প্রসারিত হইয়াছিল। গয়ার বরাবর ও নাগার্জ্জুনী গুম্ফালিপি হইতে জানিতে পারি যে, অশোক ও তাঁহার পৌত্র দশরথ যে "আজিবিক সম্প্রদায় গোঁড়া বৌদ্ধদিগের চক্ষুশূল ছিল" তাহাদের জন্য বহুব্যয় করিয়া বাসোপযোগী গুম্ফাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

(১১) Cf. Rock Edict no I,

কহ্লন প্রণীত "রাজতরঙ্গিণী"তে উল্লেখ আছে যে অশোক ব্রাহ্মণদিগের জন্য নূতন মন্দির স্থাপন ও জীর্ণ মন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙের মতে অশোক যখন পাটলীপুত্রে ফিরিয়া যান, তখন রাজগৃহ (মগধের পুরাতন রাজধানী) ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। অতএব অশোকের ধর্ম্মপ্রচারে যে কোনও গোঁড়ামি ছিল না সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই Rock Edict no. XII. বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছিল। তিনি যে বৌদ্ধধর্ম্মকে জগদ্ধর্ম্মের আসনে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার স্বীয় উদারতা ও পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতা।

মহামহোপাধ্যায়ের মতে অশোক অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকার জীবহত্যা বন্ধ করিয়াছিলেন। ভিন্সেন্ট স্মিথ Rock Edict no. I এর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়—এই খানে (পাটলীপুত্রে) পশুবধ ও সর্ব্বপ্রকার 'সমাজ' নিষিদ্ধ কেননা সম্রাটের চক্ষে এই সকল নিন্দনীয় যদিও অন্যত্র সমাজ প্রকৃষ্ট বলিয়া গণ্য ছিল। ১২ সুতরাং আমাদের বিশ্বাস যে অশোক কেবলমাত্র রাজধানী পাটলীপুত্রেই পশুহত্যা বা 'সমাজ' (অর্থাৎ যে সকল ভোজে মদ্য ও মাংস প্রধান খাদ্য ছিল) নিবারণ করিয়াছিলেন। নতুবা Rock Edict no. V-এ তাঁহার পৃথক ভাবে "এইখানে পাটলীপুত্রে এবং অন্য সকল প্রাদেশিক নগরে" ধর্ম্মমহামাত্য নিযুক্ত করিবার যে উল্লেখ পাই তাহার কোনও সার্থকতা থাকে না। রাজধানীতে প্রচলিত সমাজে খুব সম্ভব নীতিবিরুদ্ধ আমোদ প্রমোদ চলিত, তাই অশোক নিকৃষ্ট বলিয়া এই সকল ভোজ বন্ধ করিয়া থাকিবেন। রাজধানীর বাহিরে ইহাদের প্রচলন ছিল। সুতরাং কেবলমাত্র রাজধানীতেই ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ বন্ধ হইয়াছিল মানিয়া লইলেও, ইহাতেই যে এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা হয় তাহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। উপরন্তু অশোকই সর্ব্বপ্রথম এই অহিংসা মন্ত্র প্রচার করেন নাই। হিন্দুধর্ম্মেও ইহার প্রমাণ আছে এবং আমাদের ধারণা ইহা "অর্থশাস্ত্র" প্রণেতা মৌর্য্যমন্ত্রী ব্রাহ্মণ চাণক্যের শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি। কোন্ কোন্ পশু বা পক্ষী আদৌ হত্যা করা যাইবে না, অথবা কোন্ কোন্ তারিখে হত্যা করা যাইতে পারে তাহার এক সম্পূর্ণ তালিকা অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই। ১৩ সত্যই কি ইহা ভাবিবার বিষয় নয় যে অশোক শৃঙ্গী পশু হত্যা নিবারণ করেন নাই? যদিও বৈদিক যাগ যজ্ঞে সকল প্রকার জীবজন্তু উৎসর্গ করিবার প্রথা ছিল, তথাপি পরবর্ত্তিযুগে শৃঙ্গী পশুই সাধারণতঃ বধ করা হইত। Pillar Edict No Vএ উল্লেখ আছে যে কেবলমাত্র যে সকল চতুষ্পদ জন্তুর মাংস ভোজন করা হইত না, অথবা তাহারা কোনও উপকারে আসিত না তাহাদেরই হত্যা নিবারণ করা হইয়াছে। ১৪ পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ অশোকের কোনও বিধিবহির্ভূত কার্য্য নয়। কোনও লিপিতে অশ্বমেধ নিষিদ্ধ বলিয়া বন্ধ করা হয় নাই। উক্ত নম্বর ৫ পিলার ইডিক্টে কেবল মাত্র নির্দ্দিষ্ট দিবসে অশ্ব দাগী করা বা বলদ পাঁঠা ভেড়া শূকর প্রভৃতি জন্তুর মুস্ক ছেদন করা নিবারিত হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস অশোকের অহিংসাধর্ম্ম প্রচার ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে নাই; অন্ততঃপক্ষে ইহাতে এমন কিছুই ঘটে নাই যাহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এক বিপ্লব সম্ভব হইতে পারে। ভিন্সেন্ট স্মিথ অবশ্য স্বীয় মত রক্ষা করিবার জন্য মনযোগান কথা বলিয়াছেন। তিনি, অশোক যে শৃঙ্গীপশু বধ নিবারণ করেন নাই তাহার কারণ দেখাইয়াছেন তক্ষশিলার আচার ব্যবহারে। আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করিলে তক্ষশিলরাজ আম্ভী গ্রীক সৈন্যের ভোজনার্থ হাজার হাজার পশু উপহার দিয়াছিলেন। যুবরাজ অশোক তক্ষশিলায় কিছু কাল পিতার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। সুতরাং তিনি

(১২) V. A. Smith, Asoka (Second Edition)

(১৩) Arthasastra, Edited by R. Shamasastry

(১৪) V. A. Smith, Asoka (Second Edition)

বলেন যে অশোক, তাঁহার এই পুরাতন প্রজাগণ তাহাদের দেশাচার সহজে পরিত্যাগ করে না বুঝিতে পারিয়া, এই প্রথা বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই। ১৫ কিন্তু আমাদের ধারণা অশোক যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমাদর করিতেন তাহারই ইহা অন্যতম নিদর্শন। তাৎকালীন মৌর্য্য সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ প্রতিষ্ঠা থাকাই স্বাভাবিক। মধ্য যুগে ইউরোপের ইতিহাসে যাজক সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণগণ ধী ও মনীষা প্রভৃতিতে শীর্ষস্থানীয় থাকিয়া শাসন বিভাগের উচ্চ পদগুলি অধিকার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্যের প্রতিভায় মৌর্য্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। মৌর্য সেনাপতি পুষ্যমিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলে, অশোকের ধর্ম্মবিপ্লবের পরও ব্রাহ্মণদিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে বাঙ্গালার বৌদ্ধরাজ পাল সম্রাটগণের মন্ত্রী ব্রহ্মণ ছিলেন, এবং এই সকল ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা সময়ে সময়ে সেনাপতি হইয়া দিগ্বিজয়েও বাহির হইয়াছিলেন। অতএব আমাদের মনে হয় যে মৌর্য্যসাম্রাজ্যেও ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, এবং ইহাই স্বাভাবিক যে অশোক এই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের অবমাননা না করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি স্বীয় অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন। ইহা কি বিস্ময়কর নয় যে অশোক মগধের ও তৎপারিপার্শ্বিক প্রদেশের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমাদর না করিয়া মৌর্য্যসাম্রাজ্যের এক সুদূর প্রান্তে অবস্থিত তক্ষশিল প্রজাদিগের "অদ্ভুত" দেশাচারের সমাদর করিবেন? তর্কের খাতির মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে অশোক যদি তক্ষশিলার এই পশুবধ প্রথা বন্ধ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে না হয় তদ্দেশীয় প্রজারা বিদ্রোহ করিত। কিন্তু কলিঙ্গবিজেতা অশোকের সামরিক বল নিশ্চয়ই তখন এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে নাই যে, তিনি এই তক্ষশিল বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইতেন না। কাযেই অশোক যে মোটেই ধর্ম্মান্ধ ছিলেন না এবং প্রজাদিগের ধর্ম্মে কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না এইরূপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় অন্যায় নহে। এমন কি ভিন্সেন্ট স্মিথ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে মৌর্য্য- স্বেচ্ছাচারিতা (?) ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা প্রশমিত ছিল। ১৬

অশোকের জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে "দণ্ডসমতা" স্থাপন ব্রাহ্মণদিগের অসন্তোষের কারণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণপ্রণীত সকল অর্থশাস্ত্রেই জাতিনির্ব্বিশেষে সমান দণ্ড প্রদান করিবার বিধি আছে। "দণ্ডসমতার" জন্যই রাজা দেবতার ন্যায় গণ্য হইয়া থাকেন। সত্য বটে, ব্রাহ্মণগণ অনেকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা প্রাণদণ্ড হইতে একবারে অব্যাহতি পান নাই। চন্দ্রগুপ্তের শাসন কালে ব্রাহ্মণগণ গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। যদিও মন্ত্রী চাণক্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার "অর্থশাস্ত্রে" ব্রাহ্মণদিগকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, বরং সকল জাতিই যাহাতে ন্যায় ও তুল্যবিচার লাভ করিতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। অবশ্য ব্রাহ্মণদিগকে শাস্তির জন্য উৎপীড়ন করা হইত না, কিন্তু জরিমানার দরুণ তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার বিধান দেখিতে পাই, এমন কি ব্রাহ্মণ-অপরাধীকে জলে ডুবাইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। ১৭ অশোক মৌর্য্যসাম্রাজ্যের এই দণ্ডবিধি আইন সংস্কার করিয়াছিলেন কি না জানিনা, তবে এইটুকু জানা যায় যে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বাহির হইবার পর অপরাধীর ফাঁসী তিন দিন স্থগিত রাখিতেন। ১৮ আমাদের বিশ্বাস অব্রাহ্মণ অপরাধীকে দণ্ডাজ্ঞার অব্যবহিত পরেই শাস্তি ভোগ করিতে হইত, খুব সম্ভব অশোক এই পার্থক্যের

(১৫) V. A. Smith, Oxford History of India.

(১৬) V. A. Smith—Early History of India. (Third Edition)

(১৭) Kautilya's Arthasastra—Edited by R. Shamasastri.

(১৮) Cf. Pillar Edict No. IV

বিরোধী ছিলেন। অধিকন্ত, তাঁহার শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধিগণের হস্তে অনেকগুলি শাসনভার ন্যস্ত থাকিত। এই সকল শাসনকর্ত্তাগণ প্রায়ই অত্যাচারী ছিলেন। [১৯] সুতরাং যদি অনুমান করা যায় যে অশোক এই "দণ্ডসমতা" স্থাপন করিবার সময় প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধিগণের এই কতকটা স্বতন্ত্র শাসনাধিকার খর্ব্ব করিবার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ইংলণ্ডের ইতিহাসে নরম্যান রাজারাও "সামন্ত তন্ত্রানুরাগী" ব্যারণগণের ক্ষমতা এই দণ্ড-সমতা স্থাপন করিয়াই নষ্ট করিয়াছিলেন।

অশোককে পরধর্ম্ম সহিষ্ণু সম্রাট বলিয়া মানিয়া লইলে তাঁহার ধর্ম্মমহামাত্য নিযুক্ত করা ব্রাহ্মণদিগের অসন্তোষের কারণ মোটেই হইতে পারে না, কাজেই এ বিষয়ে আর পৃথক আলোচনার দরকার দেখি না।

পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তিনি যদি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই এই যজ্ঞ সাধা করিতেন, তাহা হইলে না হয় ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয় ঘোষিত হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমরা দেখিতে পাই যে, যখন পুষ্যমিত্র উত্তর ভারতে তাঁহার সার্ব্বভৌমিকতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তখনই এই যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল। স্বয়ং সম্রাটের নিকট গ্রীক মিনান্দার (Menandar) পরাজিত হইয়াছিলেন, যুবরাজ অগ্নিমিত্রের দিগ্বিজয়ের ফলে বিদর্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ শুঙ্গদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই বিদর্ভজয়ের পরেই যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ হিন্দুদিগের বহু পুরাতন প্রথা। পরবর্ত্তী বৈদিকযুগের "ব্রাহ্মণ"এ ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। আমাদের মতে এই যজ্ঞ পুষ্যমিত্রের অধীনে মগধের একচ্ছত্র প্রাধান্য জ্ঞাপক। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় কেন যে যজ্ঞস্থানের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন,—"অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র,"—তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পাটলীপুত্র অহিংসাধর্ম্মপ্রচারক অশোকের স্ব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী নয়, তাঁহার জন্মের বহুপূর্ব্বেই নাগরাজগণের সময় হইতে মগধের রাজধানী হইয়া আসিয়াছে। যে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য মগধের প্রাধান্য স্থাপন করা, তাহা যে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রেই সম্পন্ন হইবে ইহাই স্বাভাবিক। পুষ্যমিত্র যে এই যজ্ঞ কোনও পরদেশীয় রাজার রাজধানীতে করিবেন তাহা আশা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। রামায়ণ ও মহাভারতীয় যুগে অযোধ্যা ও হস্তিনাপুরে অনুষ্ঠিত ও পরবর্ত্তী গুপ্ত সম্রাটগণের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে জানিতে পারি যে রাজধানীতেই এই সকল যজ্ঞ সম্পন্ন হইত। অতএব পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে কোনও প্রকার ধর্ম্মবিদ্বেষ ছিল না। ধর্ম্মবিপ্লবই যে মৌর্য্য সম্রাজ্যের অধঃপতনের প্রধান কারণ তাহার নিদর্শন কি সাহিত্য, কি অনুশাসন, কোথাও দেখিতে পাই না, কেন না ধর্ম্মান্ধতার জন্য "এসিয়ার তীর্থক্ষেত্র" ভারতভূমিতে কখনও কোনও রাষ্ট্রবিপ্লব হয় নাই। জোরোয়াষ্টারের সময় হইতে সকল ধর্ম্মই ভারতের বক্ষে আদরে স্থান পাইয়া আসিতেছে। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্ম শতাব্দীর পর শতাব্দী এইখানে একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিয়াছে; কালক্রমে হয়ত তাহারা বৃহত্তর জাতি বা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন,—
শক হুন দল, পাঠান মোগল,
এক দেহে হল লীন।" [২০]

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ তবে কি? কি হিন্দু, কি মুসলমান, ভারতে প্রতিষ্ঠিত সকল সাম্রাজ্যই এক শিক্ষা প্রদান করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লইয়া এই সকল সাম্রাজ্য গঠিত হইত, কিন্তু যখনই কেন্দ্রস্থিত শক্তির দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইত, তখন এই

(১৯) Cf, Provincials Edict.

(২০) রবীন্দ্রনাথ—গীতাঞ্জলি

সকল রাষ্ট্রগুলি স্বীয় স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা করিত এবং অনেক স্থলে সফলও হইত। ইহাই মৌর্য্য সাম্রাজ্যেরও ধ্বংসের প্রকৃত কারণ। বহু সাম্রাজ্যের চিতাভূমি ভারতবর্ষে যে মৌর্য্যসম্রাজ্য অকালে কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অজাতশত্রুর সময় হইতে অশোক পর্য্যন্ত মগধ যে পররাষ্ট্রহরণ নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহারই ফলে মৌর্য্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষা করা এক চন্দ্রগুপ্ত বা অশোকের ন্যায় শক্তিশালী রাজার পক্ষেই সম্ভব। আমাদের মনে হয় যে অশোক এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন ও রক্ষার অসুবিধা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন যে অশোকের দুই পৌত্র তাঁহার পরে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে দশরথ ও পশ্চিমে কুনালের পুত্র সম্প্রতি। ২১ এই মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে অশোক হয় স্বয়ং মৃত্যুর পূর্ব্বে মোগল সম্রাট্ বাবরের ন্যায় সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর মগধের সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধের ফলে সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস যে মগধের সিংহাসন লইয়া সত্যই অশোকের বংশধরগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং সেই জন্যই এই রাজ্যবিভাগ ঘটে। অশোক স্বয়ং তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। সিংহাসন আরোহণের চারি বৎসর পরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। অনেকেই মনে করেন যে এই চারি বৎসর কাল অশোক ভ্রাতৃঘাতী সমরে নিযুক্ত ছিলেন। সিংহলের বৌদ্ধগ্রন্থের বিবরণ যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে অশোক তাঁহার ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিয়া সিংহাসন আরোহণের পথ সুগম করিয়াছিলেন। অতএব এই প্রসঙ্গে ভারতে প্রতিষ্ঠিত পাঠান ও মোগল সাম্রাজ্যের নজীর লইয়া যদি অনুমান করা যায় যে সত্যই অশোকের বংশধরগণের ভ্রাতৃবিরোধের ফলে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের বিভাগ হইয়াছিল, তাহা হইলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। রাজধানীতে যখন অন্তর্বিরোধ উপস্থিত পরাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে সেই সুযোগে মৌর্যবশ্যতা লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টাও স্বাভাবিক। উপরন্তু অশোকের কলিঙ্গপ্রাপ্ত ২য় শিলালিপি (The Provincials Edict) হইতে জানিতে পারি যে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ, বিশেষতঃ তোশালী, তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীতে প্রতিষ্ঠিত রাজপ্রতিনিধিগণ বড়ই অত্যাচারী ছিলেন। নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগের অনেক সময় বিশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত, এমন কি বিনা বিচারে তাহারা কারাগারেও নিক্ষিপ্ত হইত। এই অত্যাচার প্রাদেশিক রাষ্ট্রের অসন্তোষের কারণ হইয়া থাকিত; সুতরাং মৌর্য্যশ্রেষ্ঠ অশোকের মৃত্যুর পরই যে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা করিবে ইহাই স্বাভাবিক। জৈনরাজ ক্ষারবেলার উদয়গিরি শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই, যে কলিঙ্গ বিজয়ের জন্য সম্রাটের বহু অর্থ ও লোকের ক্ষয় হইয়াছিল, তাহা চেত বা চৈত্র রাজার অধীনে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। "চেত বা চৈত্র রাজবংশ বর্ধনেন··· কলিঙ্গাধিপতিনা শ্রীক্ষারবেলেন···নববর্ষানি যৌবরাজ্যং প্রশাসিতং। সম্পূর্ণচতুর্ব্বিংশতিবর্ষস্তদানীং···কলিঙ্গরাজবংশে পুরুষযুগায় মহারাজ্যাভিষেচনং প্রাপ্নোতি।" ২২ অশোকের মৃত্যুর পর এবং ক্ষারবেলার যুবরাজত্বের পূর্ব্বে এই চেত বা চৈত্র-রাজ রাজত্ব করিয়াছিলেন, মনে করা যায়। ক্ষারবেলা এই চেত বা চৈত্রবংশসম্ভূত; এবং খৃঃ পূঃ ১৮২ অব্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অশোক তাঁহার রাজত্বের ১৩শ বর্ষে কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবিতাবস্থায় কলিঙ্গের স্বাধীনতা লাভ ঘটে নাই। কাযেই চেত বা চৈত্র রাজ খৃঃ পূঃ ২৩২ অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ১৮২ অব্দের মধ্যে কলিঙ্গাধিপতি ছিলেন। ক্ষারবেলার যুবরাজত্বে এবং তাঁহার মহারাজ্যাভিষেক হইতে প্রমাণ হয় যে তাঁহার পিতা

(২১) V. A. Smith—Oxford History of India.

(২২) J. B. & O. R. S.—1916-18. Mr. K. P. Jayswal and Mr. R. D. Banerjee.

অন্ততঃ পক্ষে স্বাধীন রাজা ছিলেন। অতএব যদি অনুমান করা যায় যে অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই চেত বা চৈত্র-রাজের অধীনে কলিঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা হইলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। অশোকের মৃত্যুর পর এবং ক্ষারবেলার যুবরাজত্বের পূর্ব্বে একজন চেত বা চৈত্র বংশীয় রাজা স্বাধীন কলিঙ্গাধিপতি ছিলেন এই আমাদের বিশ্বাস। অশোকের পূর্ব্ববংশধরগণের শাসনকালেই কলিঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

ক্ষারবেলা স্বীয় রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে শাতকর্ণিকে অবহেলা করিয়া পশ্চিমে সৈন্য পাঠাইয়া মুষিকনগর অধিকার করিয়াছিলেন। "দ্বিতীয়েব বর্ষে চিন্তয়িত্বা শাতকর্ণিং পশ্চিমদেশং হয় গজ নর রথ বহুলং দণ্ডং প্রস্থাপয়তি···বিতাপয়তি মুষিক নগরং।" ২৩ নানাঘাট শিলালিপিতে এক শাতকর্ণির প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। ক্ষারবেলার উক্ত উদয়গিরি শিলালিপির সহিত এই নানাঘাট শিলালিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পৌরাণিক বিবরণে তৃতীয় অন্ধ্র রাজ শাতকর্ণি নামে উল্লিখিত আছেন। তাঁহার রাজত্বের ৪৬ বৎসর পরে দ্বিতীয় শাতকর্ণির উল্লেখ পাই। ক্ষারবেলার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ খৃঃ পূর্ব্ব ১৭১ অব্দ। সুতরাং সেই সময় অন্ততঃপক্ষে একজন শাতকর্ণি অন্ধ্রাধিপতি ছিলেন। সমস্ত পুরাণই এক মত যে অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই অন্ধ্রগণ স্বাধীন হইয়াছিল। অন্ধ্ররাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সিমুকের সময় হইতে তৃতীয় অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণির রাজত্বের পূর্ব্বে ৩৩ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। শাতকর্ণি স্বয়ং দশ বৎসর রাজত্ব করেন। কাযেই নানাঘাটে প্রাপ্ত শাতকর্ণির প্রতিমূর্ত্তি তৃতীয় অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণির বলিয়া অনুমান করিয়া যদি খৃঃ পূঃ ১৭১ অব্দ তাঁহার রাজত্বের শেষ বর্ষ গণনা করা যায়, তাহা হইলে সিমুকের অধীনে স্বাধীন অন্ধ্ররাজ্য প্রতিষ্ঠা খৃঃ পূর্ব্ব আনুমানিক ২১৪ অব্দে (১৭১+৩৩+১০=২১৪) হওয়া উচিত। অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে অন্ধ্রগণ স্বাধীনতা লাভ করে তাহা পৌরাণিক বিবরণ হইতেই জানিতে পারি। সুতরাং এই মতের সহিত যখন পৌরাণিক বিবরণের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তখন অন্ধ্রগণ যে খৃঃ পূঃ ২১৪ অব্দে স্বাধীন হয় তাহা অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত নয়। আমরা জানি না কবে অথবা কোন মৌর্য্য সম্রাট অন্ধ্র রাজ্য জয় করেন। অশোকের শিলালিপিতে অন্ধ্ররাজগণ এইরূপ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন যাহাতে মনে হয় তাঁহারা মগধের বশ্যতা স্বীকার করিলেও অনেকখানি স্বায়ত্বশাসনাধিকার ভোগ করিতেন। প্লিনি খুব সম্ভব মেগাস্থিনিসের মতানুসরণ করিয়া বলেন যে সামরিক বল হিসাবে তাৎকালীন সাম্রাজ্য মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পরই স্থান পাইত। কাযেই অন্ধ্রগণ যে অশোকের মৃত্যুর পরই স্বাধীনতা লাভ করে তাহা মোটেই বিস্ময়কর নহে।

এই প্রসঙ্গে যদি ইহা অনুমান করা যায় যে যখন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ও কলিঙ্গ অন্ধ্র রাজ্য মৌর্য্যসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল তখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিও স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছিল, তাহা হইলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। গ্রীক সম্রাট্ সেলুকস যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন কাবুল ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশগুলি মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সিরিয়া অধিপতি অ্যান্টিয়োকাস খ্রীঃ পূঃ ২০৯ অব্দে ভারত আক্রমণ করিলে উক্ত প্রদেশের রাজা সোফাগসেনাস তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। ২৪ কাযেই আমাদের মনে হয় যে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ২০৯ অব্দে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও স্বাধীন হইয়াছিল, নতুবা সেলুকাসের ন্যায় আন্টিয়োকাসের সহিতও মৌর্য্যবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটিত।

মুদ্রাতত্ত্ব হইতে প্রমাণ হয় যে অশোকের রাজত্বকালে খ্রীঃ পূঃ ২৫০ অব্দে ডাইওডোটাস্ ব্যাক্ট্রিয়ায় স্বাধীন

(২৩) Ibid—1917

(২৪) Rapson—Ancient India.

(২৫) Cf, Rock Edict no. VI.

গ্রীকরাজ্য স্থাপন করেন। অশোক এই ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত বহিঃশক্র হইতে স্বীয় সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অন্ততঃপক্ষে যে কারণেই হউক তাঁহার জীবিতকালে ভারত কোনও বৈদেশিক আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাট্গণ এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। মৌর্য্যসাম্রাজ্যভুক্ত প্রদেশগুলি যখন একটী করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছিল, তখন মগধে এমন কোনও ব্যক্তি ছিল না যাহা সাম্রাজ্য রক্ষা এবং সেই সঙ্গে এই গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে। কাযেই আন্টিয়োকাস ডিমিট্রিয়াস ইউক্রাটাইডিস সকলেই ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলি লুটতরাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এমন কি অবশেষে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত ব্যাক্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। "কাবুল ও পাঞ্জাবরাজ" গ্রীক সম্রাট্ মিনান্দার সিন্ধু, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ দখল করিয়া রাজধানী পাটলীপুত্র অবরোধ করেন। এই গ্রীক আক্রমণের বিবরণ কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" এবং গর্গসংহিতা হইতে জানিতে পারি। পতঞ্জলী তাঁহার মহাভাষ্যে সাকেত নগরের গ্রীক অবরোধ এইরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যেন তাঁহার জীবিত কালেই এই অবরোধ ঘটিয়াছিল, এবং তিনি মিনান্দার বিজেতা শুঙ্গ সম্রাট্ পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। মিনান্দারের এই পাটলীপুত্র অবরোধ বিফল হয় কিন্তু "পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রীয়ান সি" নামক গ্রন্থ প্রণেতা খৃষ্টীয় ৮০ বা ৯০ অব্দে Barygaza (ভৃগুকচ্ছ আধুনিক Broach) নগরে মিনান্দারের মুদ্রার প্রচলন দেখিয়াছিলেন। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে যদিও পুষ্যমিত্র গ্রীক আক্রমণ হইতে স্বীয় রাজধানী রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশ গুলির পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই সকল প্রদেশ সম্ভবতঃ গ্রীক সম্রাট্ মিনান্দারের অধিকারভুক্ত ছিল। অতএব ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের চতুঃসীমা গণ্ডী যখন ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছিল, তখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে বন্যার ন্যায় গ্রীক আক্রমণ উপস্থিত। মৌর্য্যসাম্রাজ্যের উপর এই গ্রীক আক্রমণের প্রভাব পাঠান সাম্রাজ্যের উপর তৈমুরলঙ্গ ও বাবরের অথবা মোগল সাম্রাজ্যের উপর নাদীরশা ও আবদালীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

মৌর্য্যশাসনের প্রধান দোষ ছিল এই যে ইহা অতিশয় কেন্দ্রীভূত (centralised) ছিল। অশোক না হয় প্রজাদিগের সুখের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম না করিলে সুখী হইতে পারিতেন না, ২৫ কিন্তু এই ব্যবস্থার ফল সব সময়ে মঙ্গলকর হয় না। সত্য বটে, মন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদের সাহায্যে রাজকার্য্য চলিত, কিন্তু এক ব্যক্তির হস্তে এত অধিক শাসনভার ন্যস্ত ছিল যে যদি কখনও স্বেচ্ছাচারী রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিতেন তাহা হইলে সেই শক্তির অপব্যবহার অনিবার্য্য হইয়া পড়িত। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় তাহাই হইয়াছিল। অশোকের ন্যায় প্রজাপালক সম্রাটের রাজত্বকালে কোনও অসন্তোষের কারণ ঘটিতে পারে না, এবং ঘটেও নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাট্গণ দুর্ব্বল ও অত্যাচারী ছিলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা ও শাসন করিবার পক্ষে তাঁহারা মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। চরমভোগ-বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত সম্রাট্গণের নিকট হইতে অশোকের ন্যায় সুশাসন আশা করাও চলে না। ফলে শেষ মৌর্য্যসম্রাট্ বৃহদ্রথ সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিহত হন। আমাদের বিশ্বাস, এই মৌর্য্যবংশ উচ্ছেদ প্রতিকূল লোকমতের সহায়তায় সম্ভব হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র রাজ-প্রভু হত্যার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই লোকমতের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সৈন্য পরিদর্শনের অছিলায় তিনি যে শিবির স্থাপন করেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বে খুব জনতার সমাবেশ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই হত্যা যদি সর্ব্বজন-সম্মত না হইত তাহা হইলে সেই সঙ্গেই রাজহত্যাকারীও সমুচিত দণ্ডভোগ করিতেন। বৃহদ্রথ নিশ্চয়ই প্রজা-দিগের ভালবাসা হারাইয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে রাজশক্তির

উৎপত্তি সম্বন্ধে সকল হিন্দুশাস্ত্রেরই এক মত (Theory of social contract or Contractual origin of Kingship)। অরাজকতা জনিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রজাগণ রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া লয়, রাজাও প্রজারক্ষারূপ রাজধর্ম্ম পালনের জন্য করস্বরূপ কিছু মাসহারা পাইতেন মাত্র। রাজা যে প্রজাদিগের নির্ব্বাচিত "ভৃত্য" (Servant of the people) কি ব্রাহ্মণ, কি জৈন, কি বৌদ্ধ সকল শাস্ত্রেই ইহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রজা-পালন ও প্রজা রক্ষাই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাঁহার শত অশ্ব-মেধ যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম। কাযেই যদি রাজা এই রাজধর্ম্ম পালন করিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অপর কোনও যোগ্যতর ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার অধিকার প্রজা-পুঞ্জের নিশ্চয়ই থাকে। প্রাচীন ভারতে রাজার এই সিংহাসনচ্যুতির ভয় খুব প্রবল ছিল। সকল সাহিত্যেই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং নাগদশক ও দ্বিতীয় মহী-পালের রাজ্যচ্যুতি হইতে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তেরও নিদর্শন পাই। কাযেই এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে প্রজাগণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া অতিষ্ঠ হইলে পর, এই প্রতীকারের আশ্রয় গ্রহণ করিত। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" উল্লেখ দেখিতে পাই যে ঐন্দ্রমহাভিষেকের সময় প্রত্যেক রাজাকে প্রজাপীড়ক হইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। এই অভিষেককালীন প্রতিজ্ঞা (coronation oath) স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের অন্তরায় ছিল,কেন না প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইলে প্রজাবিদ্রোহ এবং অবশেষে রাজার পদচ্যুতিরও সম্ভাবনা থাকিত। বাণভট্ট শেষ মৌর্য্যসম্রাট্ বৃহদ্রথকে "প্রতিজ্ঞাদুর্ব্বল" বলিয়াছেন "প্রতিজ্ঞাদুর্ব্বলং...মৌর্য্যং বৃহদ্রথং পিপেষ পুষ্পমিত্র...।" অতএব বৃহদ্রথ হয় প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অপারগ ছিলেন, অথবা তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠেন। এই দ্বিতীয় অর্থই ঠিক বলিয়া মনে হয় ; সুতরাং প্রজাগণ যখন তাঁহার অত্যাচারে উত্যক্ত হইতেছিল, মগধের সহিত পুষ্যমিত্র (যিনি পূর্ব্ব হইতেই মৌর্য্য বাহিনীর সাহায্য পাইয়াছিলেন মনে করা যাইতে পারে) প্রজাদের এই অসন্তোষের সুযোগে মৌর্য্যবংশ ধ্বংস করিয়া স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করেন। বিশেষতঃ পুষ্যমিত্রের এই অবৈধ সিংহাসনাধিকার যে লোক মতের অনুমোদিত হইবে তাহার অন্য কারণও বর্ত্তমান। বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রদেশগুলি মগধের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছিল। ঠিক এই সময়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে গ্রীক-দিগের ভারত আক্রমণ এবং অনতিকাল মধ্যেই রাজধানী পাটলীপুত্রের অবরোধ সংঘটিত হয়। এই অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক যে, প্রজাগণ চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের অধীনে মগধের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া এই সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্যই দুর্ব্বল অত্যাচারী বৃহদ্রথের পরিবর্ত্তে তাহাদের শক্তিশালী সেনাপতি পুষ্যমিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আমাদের মনে হয় না যে এই সুপ্রতিষ্ঠিত মৌর্য্য বংশের উচ্ছেদ এত শীঘ্র ও সহজে হইতে পারিত, যদি না পরবর্ত্তী মৌর্য্য সম্রাট্গণ প্রজাদিগের ঘোর অসন্তোষ উৎপাদন করিতেন। প্রজাশক্তির বিরোধিতাই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের দ্রুত অধঃপতনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

শ্রীনীলমণি আচার্য্য।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই রকম।

পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরে দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়া, হেম ও কিশোরীকে বৈকালিক চা পানের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া, ঘোষ গৃহিণী কন্যা দুইটি সহ দুইখানি রিক্‌শায় চড়িয়া জলাপাহাড়ে তাঁহাদের নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। বাড়ীটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঘোষ সাহেব ক্রয় করিয়া তাহার নাম "ঘোষ ভিলা" রাখিয়াছেন। বাড়ী বন্ধই থাকে—চাকর ও মালীরা আছে। প্রতি বৎসর দুই এক মাস মাত্র ইঁহারা আসিয়া ঐ বাড়ীতে বাস করিয়া যান। কিশোরীকে লইয়া হেমচন্দ্র জুবিলি স্যানিটোরিয়মের দিকে নামিয়া গেল।

আহারান্তে দুই বন্ধু নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টা দুই ঘুমাইল। বেলা যখন সাড়ে চারিটা, তখন উভয়ে ফিটফাট হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার উদ্দেশে স্যানিটোরিয়ম হইতে বাহির হইল। মেয়েদের সঙ্গে মেশা সম্বন্ধে পূর্ব্বের সেই আতঙ্ক কিশোরী মনে আর নাই। গত রাত্রে পদ্মা বক্ষে এক ঘণ্টা ব্যাপী ডিনার ভোজনে, অদ্য প্রাতে শিলিগুড়ি ষ্টেশনের হোটেলে চা পানের সময়, মিসেস্ ঘোষ ও তাঁহার মেয়েদুইটির আচার ব্যবহারে সে ভীতিজনক কিছুই দেখিতে পায় নাই। বেশ অমায়িক ভাবে, ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ের মতই মিষ্ট করিয়া, অপরের সম্ভ্রম রাখিয়া বিনয়-শীলতার সহিত তাঁহারা কথা কহিয়া থাকেন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কোনও ভাব তাঁহাদের মনে লুক্কাইত আছে এমন কিছু মাত্র লক্ষণ বুঝা যায় না। সুতরাং জলা-পাহাড়ে যাইবার পথে কিশোরীর মনটি বেশ হাল্কা, বেশ প্রফুল্লই রহিয়াছে।

জলাপাহাড় যাইতে অনেকটা চড়াই ভাঙ্গিতে হয়। চলিতে চলিতে কিশোরী হাঁফাইয়া উঠিতে লাগিল। চড়াই ওঠা হেমচন্দ্রের অভ্যাস ছিল, সে কিশোরীর অবস্থা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। কিশোরী হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "ওহে দার্জ্জিলিঙে এসে যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তার কারণ এখানকার জলও নয় হাওয়াও নয়, এই মেহনৎ।"

হেম বলিল, "এবং এখানকার ভাল মাংস আর খাঁটি ঘি।"

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট মেয়েটির নাম ত শুনলাম বীণা। বড়টির নাম কি?"

হেম হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? বড়টির বড় বড় চোখ দুটি তোমার ভিতরে কিছু ভাঙ্গচুর আরম্ভ করেছে না কি?"

কিশোরী বলিল, "বিশেষ রকম। নইলে আর মানুষে মানুষের নাম জানতে চায়?"

হেম বলিল, "বড়টির নাম সত্য—সত্যবালা। পছন্দ হয়েছে? সুবিধে হবে?"

"কিসের সুবিধে?"

"ঐ নামে কবিতা লেখবার?"

"তিন অক্ষরে হলেই ভাল হত। চার অক্ষরের নাম পয়ারে চলে ভাল। আজকালকার নূতন ছন্দে "

হেম বাধা দিয়া বলিল, "কেন?

রতি কহে আহা তুমি ইন্দুবালা
দানব কুলের মণি।

—হেম বাঁড়ুয্যে লিখে গেছে।"

কিশোরী বলিল, "তা হলেও, সত্যবালা নামটা বেশ কাব্যগন্ধী নয়।"

হেম বলিল, "একটু ধর্ম্মগন্ধী। ঘোষ সাহেব বিলেত

থেকে ফিরে এসে, বিবাহের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে ঢুকলেন; বিবাহের পর ঐটি প্রথম মেয়ে হল, কাযেই নামটি একটু ধর্ম্মগন্ধী হয়ে গেল। ঐ সময় ছেলে হলে খুব সম্ভব তার নাম হত জ্যোতিঃস্বরূপ।"

"তার পর?"

"তার পর, ক্রমে সেই ভাবটুকু উবে গেল, তাই ছোট মেয়েটির নাম হল বীণা।"

"জ্যোতি টোতি নিবে গেল? এখন, ঘোষ সাহেব কি? হিন্দু, না ব্রাহ্ম, না নাস্তিক, না অজ্ঞেয় বাদী, না কি?"

হেম বলিল, "ডোণ্টকেয়ার বাদী।"

কিশোরী হাসিতে লাগিল। হেম বলিল, "তবে সেন্সাস্ অনুসারে হিন্দু। তুমি যদি বিবাহে শালগ্রাম শিলা রাখতে চাও, তাতেও আপত্তি হবে না।"

কিশোরী বলিল, "তুমি এমনি ভাবে কথা বলছ, যেন বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেছে।"

"মতি স্থির করে ফেল শীগ্‌গির। এক মাস আমার ছুটী আছে, তারই মধ্যে শুভকার্য্যটা এই দার্জ্জিলিঙেই হয়ে যাক না।"

এইরূপ হাস্য পরিহাস করিতে করিতে উভয় বন্ধু "ঘোষ ভিলা"র সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাড়ীটি বাংলো ধরনের। চারিধারে বাগান—মালীরা বাগানে কায করিতেছে। বাড়ীটির সম্মুখভাগে প্রশস্ত বারান্দা—তথায় একটি বেতের চেয়ারে বীণা একখানি বহি হাতে বসিয়া ছিল। পরিধানে একখানি লেসপাড় রেশমী শাড়ী। চুলগুলি ফিরিঙ্গি খোঁপায় বাধা, তাহাতে একটি পলনীরো গোলাপ গোঁজা রহিয়াছে। ইহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া সহাস্য-বদনে অভ্যর্থনা করিল।

বন্ধুদ্বয়কে লইয়া গিয়া বীণা ড্রয়িংরুমে বসাইল। বলিল, "মা আর দিদি, এসে পৌঁছে চারটি খেয়ে নিয়েই, ঘরদোর গোছাতে লেগে গিয়েছিলেন। ধুলোয় ধুলোয় দুজনের মূর্ত্তি যা হয়েছিল, দেখে আমি ত হেসে বাঁচিনে! এখন তাঁরা সাফসুতেরো হবার জন্যে গোসল খানায় ঢুকেছেন—এলেন বলে।"

হেম বলিল, "আপনার গায়ে ধুলো লাগেনি ত?"

বীণা, এই কথায় ভিতরকার শ্লেষটুকু বুঝিল - কিন্তু তাহা গায়ে না মাখিয়া বলিল, "ধুলোকে আমি সত্যি বড় ডরাই। যদিও ধুলার শরীর একদিন ধুলায় মিশিয়ে যাবে জানি, তবু যতদিন পারি, ধুলো থেকে তফাৎ থাকতে চাই। আপনারা বসুন—সিগারেট ত আমাদের নেই, খাবেন কি?"

হেম বলিল, "সিগারেট আমাদের সঙ্গেই আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঘোষজায়া আসিয়া দর্শন দিলেন। বেহারাকে ডাকিয়া তিনি চা প্রভৃতি আনিতে আদেশ দিলেন।

অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পরেই চায়ের সরঞ্জাম আসিয়া পৌঁছিল। ঘোষজায়া বলিলেন, "এক এক পেয়ালা চা ততক্ষণ খান আপনারা। সত্য লুচি ভাজছে—লুচি এলে আবার চা খাবেন। নতুন ঘরকন্না বলেই দেরী হল।"

কিয়ৎ পরে লুচি এবং সত্যবালা উভয়েই টেবিলে আসিয়া হাজির হইল। সত্য একখানি কালাপেড়ে দেশী শাড়ী পরিয়াছে. গায়ে একটি শাদা ব্লাউজ, পায়ে জাপানী ঘাসের চটিজুতা। বীণার রেশমী শাড়ী অপেক্ষা সত্য-বালার শাদা শাড়ীই কিশোরীর চক্ষে মিষ্টতর লাগিল।

নানা গল্প গুজবের সহিত চা পান চলিতে লাগিল। সত্য মাসিক পত্রে প্রকাশিত কিশোরীর কয়েকটি কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মিষ্টার নাগ, আপনার আরও বোধ হয় অনেক কবিতা লেখা আছে যা এখনও ছাপা হয়নি?"

"আছে বৈকি।"

"ছাপা হবার আগে সেগুলি কাউকে আপনি দেখান না বোধ হয়?"

হেম বলিল, "সমঝদার লোক পেলে দেখান বৈ কি। আপনি যদি দেখতে চান, আপনাকে নিশ্চয়ই দেখাবে। কি বল কিশোরী?"—বলিয়া হেম হাস্য করিতে লাগিল।

কিশোরী একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "নিশ্চয়।"

স্থির হইয়া গেল, আগামী কল্য বিকালে কিশোরী তাহার কবিতার খাতাখানি আনিয়া সত্যবালাকে দেখাইবে।

বীণা এই সময়ে চোখে দুষ্ট হাসি মাখিয়া বলি, "দিদি, বলে দিই ?"

সত্যবালা রাগিয়া বলিল, "খবরদার।"

কিশোরী উৎসাহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিও কবিতা লেখেন নাকি ?"

বীণা বলিল, "খুব লেখে, ঝুড়ি ঝুড়ি লেখে। দু তিন খানা খাতা আছে।"

শুনিয়া কিশোরীর মনটি সত্যবালার প্রতি সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "আপনি কবিতা লেখেন ? কোথাও ছাপান না ত!"

সত্যবালা লজ্জিত হইয়া বলিল, "ছাপাবার উপযুক্ত হয়েছে কি না তা ত জানিনে।"

কিশোরী আগ্রহের সহিত বলিল, "আমাকে দেখাবেন আপনার কবিতা ?"

"সে দেখাবার উপযুক্ত নয়। সে আমার ভারি লজ্জা করবে"—ইত্যাদি কথায় সত্যবালা তাহার আন্তরিক আপত্তি জানাইতে লাগিল ; লজ্জায় তাহার গাল দুখানি লাল হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্কোচ দেখিয়া কিশোরী সেদিন আর বেশী পীড়াপীড়ি করিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর, পরদিন সন্ধ্যার ডিনারের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া উভয় বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় সত্যবালা কিশোরীকে স্মরণ করাইয়া দিল, "আপনার খাতাখানি কাল নিয়ে আসবেন কিন্তু।" —রসিক লোকে অনায়াসে বুঝিবেন, এ তাগাদার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

স্যানিটেরিয়মে ফিরিবার পথে হেম জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, বোন দুটিকে কেমন লাগলো ?"

কিশোরী বলিল, "আমার একটা মস্ত ভুল ধারণা দূর হল। আমি ভাবতাম, এ সব মেয়েরা কেবল সাজগোজ করে, নভেল পড়ে, আর আমোদ করে বেড়ায়। এরা যে আবার গৃহকর্ম্ম করে, আসবাবের ধুলো ঝাড়ে, লুচি ভাজে, তা আমার ধারণাই ছিল না।"

হেম বলিল, "সবাই কি আর তাই করে ? দুরকমই আছে হে, দুরকমই আছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ওসমান অবতার।

দুই সপ্তাহ কাটিয়াছে। আজ শনিবার, ঘোষসাহেব আজ কলিকাতা মেলে আসিয়া পৌঁছিবেন গত কল্য টেলিগ্রাম আসিয়াছিল।

এই দুই সপ্তাহে কিন্তু একটি কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। দুইটি নবীন যুবক যুবতী, দিনের পর দিন নিভৃতে কাব্যালোচনা করিতে থাকিলে তাহার পরিণাম যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। কিশোরী ও সত্যবালা পরস্পরের প্রণয়ে মসগুল হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহাদের প্রেমনিবেদন একটু নূতন ধরণের—মুখে কেহ কাহাকেও কিছু বলে না—নূতন নূতন কবিতায় আপন আপন মনের ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকে।

ভিতরে ভিতরে এই দুই জনের মধ্যে যে এই যে কাণ্ডটি হইতেছে, তাহা সত্যবালার মা বোন কাহারও অবিদিত নাই। তবে স্পষ্ট কথা এ সম্বন্ধে কিছুই হয় নাই। ঘোষ-গৃহিণী ইতিমধ্যে একদিন হেমকে একাকী পাইয়া কিশোরীর স্বভাবচরিত্র ও সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ লইয়াছেন। সেদিনও কোনও স্পষ্টকথা হয় নাই, কিন্তু কিশোরীর সহিত সত্যবালার বিবাহে ঘোষ-গৃহিণীর যে নিতান্ত আপত্তি হইবে না, ইহা তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে হেম বুঝিতে পারিয়াছে। সে কিন্তু কিশোরীর নিকট এ সকল কোনও কথাই প্রকাশ করে নাই। তবে মাঝে মাঝে কিশোরীকে ঠাট্টা সে খুবই করে ; বলে, "ওহে আর দেরী কেন, প্রোপোজ করে ফেল ! আমার ছুটি যে ফুরিয়ে এল,—শুভসংবাদটা শুনে যাই—কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের কাছে খবরটা দিই !" এসকল

ঠাট্টায় কিশোরী আজকাল আর কৌতুক বোধ করে না, বিষম গম্ভীর হইয়া থাকে।

হেম ও কিশোরী স্যানিটেরিয়মে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়াছে। টেবিল হেমের শয়নঘরেই পাতা হইয়াছে। আজ ঘোষ সাহেব আসিবেন। ঘোষগৃহিণী কন্যাদ্বয় সহ ষ্টেশনে আসিবেন—ইহারা দুইজনেও ষ্টেশনে যাইবে গতকল্য হইতে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়া আছে।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোষ সাহেব কতদিন থাকবেন শুনেছ কিছু?"

"এক হপ্তা থাকবেন। তাঁর সঙ্গে একটি বন্ধুও অতিথিস্বরূপ আসছেন যে!"

"কে?"

"মিষ্টার মল্লিক—মেদিনীপুরেরর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, রঙ্গপুরে বদলি হয়েছেন। জয়েনিং টাইম-এক হপ্তা তিনি এখানেই নাকি কাটিয়ে যাবেন।"

কিশোরী বলিল, "কখন শুনলে? কৈ, এ সব কথা আমি ত কিছু শুনিনি।"

"তোমরা দুজনে যে তখন বারান্দায় বসে কাব্যা-লোচনায়—আর কি আলোচনায় তোমারই জান—ব্যস্ত ছিলে।"—বলিয়া হেম হাসিল।

কিশোরী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ওসমান জুটলো নাকি হে? জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, অল্প বয়স বোধ হয়? অবিবাহিত? তোমার সঙ্গে আলাপ আছে?"

"আলাপ নেই, তবে ঘোষেদের একজন বন্ধু, মাঝে মাঝে তাঁর কথা শুনেছি। অবিবাহিত, তাও শুনেছি।"—বলিয়া হেম কিশোরীর পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "কিন্তু তোমার ভয় কি? তুমি ত কেল্লা আগে থাকতেই ফতে করে' রেখেছ হে!"

কিন্তু কিশোরীর মন তাহাতে প্রবোধ মানিল না। সে মুখ খানি ম্লান করিয়া ভোজন শেষ করিল। ভোজনান্তে, পোষাক পরিয়া দুইজনে ষ্টেশনে গিয়া প্লাটফর্মে পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই কন্যাদ্বয়সহ ঘোষগৃহিণী আসিয়া পৌছিলেন।

ট্রেণ আসিলে, প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা হইতে ঘোষ ও মল্লিক অবতরণ করিলেন। মল্লিক সাহেবের বয়স ২৫।২৬ বৎসর। তিনি অত্যন্ত কালো এবং অত্যুগ্র সাহেব। বাঙ্গলা কথা মোটেই বলেন না। ঘোষ-গৃহিণী প্রথমে হেমকে, পরে কিশোরীকে মল্লিক সাহেবের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। হেমের বেলায় বলিলেন, "তুমি এঁর কাজিনকে জান বোধ হয়, পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট জজ।" মল্লিক বলিলেন, "ও ইয়েস্—ষ্যার—এ ষ্যাটলিং গুড্ ফেলো।" করমর্দ্দন করিয়া হেমকে বলিলেন, "গ্লাড্ টু মিট হউ স্যঃ।" কিশোরীর বেলায় ঘোষজায়া বলিলেন, "ইনি একজন বেঙ্গলি পোয়েট্।" মল্লিক, তাচ্ছিল্য ভাবে কিশোরীর করমর্দ্দন করিয়া কেবলমাত্র বলিলেন, "ওঃ।"—বলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন; বীণা ও সত্যবালার সহিত আলাপ জমাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরদিন হেমের নামে মিসেস্ ঘোষের একখানি পত্র আসিল। হেম পত্রখানি পড়িয়া, ভৃত্যকে বলিল, "বৈঠো বাহর, জবাব মিলেগা।" বলিয়া পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া সিগারেট ধরাইল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর হে? দেখ্‌ব?"—বলিয়া চিঠিখানি তুলিয়া লইল।

হেম তখন অগত্যা বলিল, "দেখ।"

কিশোরী পত্র পড়িল; ঘোষজায়া অদ্য অপরাহ্ণকালে হেমকে টেনিস খেলিতে ও চা পান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। স্বাক্ষরের নিম্নে পুনশ্চ দিয়া লিখিয়াছেন, "আশা করি মিষ্টার কারও আসিয়া আমাদের সহিত যোগদান করিতে পারিবেন।"

পত্র পড়িয়া কিশোরী একটু হাসিল।

হেম বলিল, "যাচ্ছ ত? লিখে দিই?"

কিশোরী বলিল, "পুনশ্চ হয়ে নাই বা গেলাম।"

একে গতকল্য হইতেই কিশোরীর মনটা তেমন ভাল নাই, তাহার উপর এই পুনশ্চ-কেলেঙ্কারি হেমের মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু মনের ভাব মনেই গোপন করিয়া সে বলিল, "ওটা কিছু নয়। যদি লাঞ্চের কি ডিনারের নিমন্ত্রণ হত তাহলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। তুমি টেনিস খেলনা

তা তাঁরা জানেন কিনা, নইলে তোমার নামে আলাদা চিঠিই আস্‌তো।"

কিশোরী একটু ভাবিয়া বলিল, "থাক্‌গে আর কি হবে গিয়ে!"

হেম বলিল, "অ্যাঃ—এই তুমি প্রণয়ী? ছীছিঃ। যাকে ভালবাস,তাকে দেখ্‌তে পাবে, সেটা কি একটা কম লাভ?"

কিশোরী আবার একটু বিষাদপূর্ণ হাসি হাসিল। বলিল, "আচ্ছা, লিখে দাও আমিও যাব।"

হেমচন্দ্র পত্রোত্তর লিখিয়া ভৃত্যকে বিদায় দিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভোটান রাজ্য

(গান)

আমাদের ভোটান রাজ্যে বাস।
(তাই) ভাবনা চিন্তা নাইক কিছু সুখে আছি বারমাস।
যখন কোন কথা ওঠে,
(আমরা) মিটিং করতে যাইগো ছুটে,
(সেথায়) হাত পা তুলে ভোটের চোটে
রেজোলুশন করি পাশ॥
করব কি না বাপের শ্রাদ্ধ,
যদি করি, তবে কি বরাদ্দ,
এ সব কথা সত্ত সত্ত ভোটে তুলে হই খালাস।
তাই, শ্রাদ্ধ কেমন গড়ায় হেথা পাচ্ছ না কি তার
আভাস?
ঈশ্বর আছেন কিংবা নাই;—
মান্ধাতার আমল থেকে কেবল তর্কই শুনতে পাই।
এখন ভোটেতে সিদ্ধান্ত হচ্চে সাবাস সাবাস॥
কোথাকার ন্যায়ের পঞ্চানন,
আর আমাদের তেলী কৃষ্ণধন;
এরা ভোটান রাজ্যে তুল্যমূল্য,
তাই, আমরা ভোটের চিরদাস॥
আমাদের ভোটান বাজারে,—
মুড়ি মিছরীর একই দর, (আহা) কেমন মজারে!
হেথা রাজা প্রজা সবই সমান,ঠিক যেন গো শ্মশানবাস॥
ভাল মন্দ কর্ত্তে বিচার,—
ঘটে কিছু থাকা সেকালে হত গো দরকার;
এখন আর নাই সে কুসংস্কার।
এখন ভোটের ঠেলায় দিবানিশি
সুবিচারের নাভিশ্বাস॥
হেথা নাইক কোন ভেদ,
সবাই সমান, সবাই সমান এই আমাদের বেদ।
বসে চণ্ডালেতে ডাইনে ঘেঁসে,
বামে মেথর মুদ্দফরাশ॥
কেহই মোদের নয়কো আপন
কেহই নয়কো পর;
সবাই আমরা সমান স্বার্থপর।
করি পরের ধনে পোদ্দারি গিরি,
পারি ত পরের করি সর্ব্বনাশ॥
(কোরাস গান ও নৃত্য)
ভোট বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
বল মাধাই মধুর স্বরে
(ও ভাই) ভোটের গুণে, গহন বনে
শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।
এ ভোট কোথায় ছিল, কি আনিল,
একবার বল মাধাই মধুর স্বরে।
জয় ভোটান রাজের জয়,
এমন রাজ্য কোথাও খুঁজে পাবে নাক ভাই।
ভোটান রাজ্যের মতন রাজ্য এ বিশ্বেতে নাই,
এ বিশ্বেতে নাই।
ওহো—এ বিশ্বেতে নাই॥

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

ইহুদী যুবতী

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ ১ম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৩০ | ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা

মনোরূপ

আমরা দেখিয়াছি যোগ ও সাংখ্যবিদ্যা, প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও ব্যবহারযোগ্য এই জগৎ সত্তাকে, সেই স্বরূপেই চরম সত্য বলিয়া মানিয়াছিল। জগতের দর্শন-ইতিহাসে ইহা অবশ্যই এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। কেন না, আমরা সকলেই জানি, জগতের অনেক নবীন ও প্রাচীন দর্শনবাদ এই প্রত্যক্ষ জগৎ-রূপকে সত্য বলিয়া মানিতে সমর্থ হয় নাই। এবং জগতের চরম সত্যরূপ কি হইতে পারে এই তত্ত্বের অবধারণা করিতে গিয়া ঐ সকল দর্শনবাদ এই সাক্ষাৎ জগৎ প্রতিমাকে অন্তর্দ্ধান বা অবিদ্যার অতল গর্ভে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এক মাত্র জগৎ-সত্যবাদী সাংখ্যই, এই প্রত্যক্ষ বিশ্বরূপকে নিজের রূপের দ্বারাই তাহার চরম অস্তিত্বকে জ্ঞাপন করিবার সহজ অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

যুক্তি ও বিচারের ঘন ঘোর কুহেলিকার মধ্যে জগৎ সত্তাকে আত্মহারা করিয়া দেন নাই বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন যে, সেই জন্যই সাংখ্য বিচারের উদগ্র প্রবাহ কোথাও কদাপি ব্যাহত বা কুণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার বিচার তুচ্ছ ঘট পটকেও সত্য বলিয়া মানিয়াছিল, সেই ঘট পটের সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় মানস কারণ, নিশ্চয়ই তাহার বিচারের অসাধ্য হয় নাই। স্থূলের অস্তিত্বকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল বলিয়া সূক্ষ্মের মর্য্যাদা তাহাতে কখনই কুণ্ঠিত হয় নাই। শুধু তাহাই নহে। আমরা দেখিতে পাই, তাহা স্থূলতত্ত্বের পর্য্যালোচনার দ্বারা এমন এক সূক্ষ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছিল যে সেই তত্ত্বের অমোঘ ও অপ্রতিহত যুক্তিকে শুধু প্রাচীন দর্শন নহে, নবীনতম বিজ্ঞান পর্য্যন্তও অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

জগৎ-রূপের সত্য অস্তিত্বকে সাংখ্য যে জাতীয় যুক্তি-বাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা অনুধাবন করিয়াছি। তাহাতে আলোচ্য মোক্ষ তত্ত্বকে এই সত্য জগতের সহিত সঙ্গত করিয়া পাঠ করিবার পক্ষে আমাদের পথ পরিষ্কার হইয়াছে

মাত্র। অতঃপর আমরা দেখিতে চাহি, সেই সত্য জগতের কার্য্যকারণ বিচার দ্বারা আমরা সেই মোক্ষ পথে কতদূর অগ্রসর হইয়া থাকি। কিন্তু হায়, এখানেও অগ্রসর হইবার সমস্ত পথকে রোধ করিয়া দুরন্ত দৈত্য পাহারায় বসিয়া আছে। এবং সে বলিতেছে, হে পথিক্! আগে মীমাংসা কর, এ জগতে কার্য্য কারণ বলিয়াও বাস্তবিক কিছু আছে, এবং পরে তোমার কার্য্যকারণ বিচারে অগ্রসর হইও।

১। অসৎ-কার্য্য-বাদ।

বাজিকরের ঝুলির মধ্যে বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি দৃষ্ট হইলেও, এই বিশ্বসংসারের যিনি বাজিকর তাঁহার সৃষ্টির ঝুলির মধ্যে বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তির প্রথা দৃষ্ট হয় না। এখানে এমন কোনই ভানুমতীর খেলা নাই, যাহাতে বীজ বিনাও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে পারে, দুগ্ধ ব্যতিরেকেও দধির উৎপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে। সেই জন্য প্রাকৃত জন আমাদের মনের মধ্যে কেমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে এখানে যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি ও শুনিতেছি তাহার অবশ্যই কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণ আছে। এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, আমরা এমন আশা কথনই করিতে পারি না যে, রাত্রে আমার দধিভাণ্ডটি প্রচুর শূন্যের দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিলেও, প্রভাতে উঠিয়া দেখিব যে তাহা, "কালিদাসের কবিতাতুল্য সরস মাহিষ-দধিতে" পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তর্ক জগতের বাজিকরগণকে ধন্যবাদ! তাঁহারা আমাদিগকে সে আশা হইতেও বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে দুগ্ধ ব্যতিরেকেও দধির উৎপত্তি কোনই অসম্ভব "idea" নহে। অতএব তাঁহাদের তর্কের মর্ম্মটী ভাল করিয়া অনুধাবন করা আবশ্যক।

ইহা পৌরাণিক-তর্ক কথা নহে, কিন্তু অধুনাতন যুগের দর্শনবাদের অন্যতম মহারথ David Hume বলিতেছেন—

"As the ideas of cause and effect are evidently distinct, it will be easy for us to conceive any object non-existent this moment, and existent the next moment without conjoining to it distinct casual principle." *

—অর্থাৎ হিয়ুম বলিতেছেন, দধি ও দুগ্ধ হইতেছে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বিভাবনা (idea) এবং দুগ্ধকে না জানিলেও দধিকে জানিতে কোনই বাধা হয় না। অতএব দুগ্ধরূপ এক বিভিন্ন "idea" হইতে দধিরূপ অন্য এক বিভিন্ন idea যে কোনও পূর্ব্ব-অবধারিত অপরিহার্য্য (a-priori) নিয়মে উৎপন্ন হইতে অবশ্যই বাধ্য ইহা বলা যাইতে পারে না। অতএব হিয়ুমের মতে বিভিন্ন idea-গত পদার্থ সকল হইতেছে সম্পূর্ণরূপে পরস্পর হইতে বিভিন্ন এবং প্রত্যেক পদার্থ হইতেছে এক সম্পূর্ণ অভিনব "idea"। যাহাকে আমরা কার্য্য-সত্তা বলি তাহা তাহার কারণ-সত্তা হইতে সর্ব্বথা পৃথক্ ও বিভিন্ন সত্তা, উহাদের মধ্যে কোনই স্বতঃসিদ্ধ কার্য্যকারণ ভাব নাই। এবং—

"As every effect is a distinct event from its cause, it therefore could not be discovered in the cause" †

—প্রত্যেক কার্য্যই যখন তাহার কারণ হইতে এক পৃথক ও স্বতন্ত্র "ঘটনা" (event) তখন কারণের মধ্যে কার্য্যের অন্তর্ভাব জানিবার কোনই উপায় নাই। এই জন্য হিয়ুমের মতে, আমাদের যে কার্য্যকারণ-জ্ঞান, তাহা কোনই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নহে, পূর্ব্বাপর দৃষ্টে তাহা আমাদের মনের কল্পনা (Imagination) মাত্র!

বোধ করি হিয়ুম সাহেব জানিতেন না যে তাঁহার

* Hume's Treatise on Human Nature, Bk. I, pt. iii, para 3.

† Hume's Human Understanding, p. 28.

অভ্যুদয়ের বহুকাল পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে তাঁহার এক কৃষ্ণাঙ্গ অগ্রজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। হিয়ুমের সেই পূর্ব্বাধিকারীর বংশ পরিচয়ে আমরা পাইয়া থাকি যে, বুদ্ধপূর্ব্ব যুগে তিনি "আন্বিক্ষিকী পরায়ণ," "বৈনাশিক বাদী" প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন—এবং বৌদ্ধযুগে, মুণ্ডিতশীর্ষতা ও মুক্তকচ্ছত্বই তাঁহার: পরিচায়ক চিহ্ন ছিল। সেই মুক্তকচ্ছ দার্শনিক অবিকল হিয়ুমের তান লয়ে তর্ক ধরিয়াছিলেন—"ন সতঃ কারণাপেক্ষা ব্যোমাদেরিব যুজ্যতে"—অর্থাৎ বৌদ্ধ দার্শনিক বলিয়াছিলেন,—কোন বিষয়কে সৎ বলিয়া জানিতে হইলে, তাহার কারণকেও জানার অপেক্ষা থাকে না। এবং যাহার কোনই কারণ নাই তাহাকেও সৎ বলিয়া জানিতে বাধা হয় না। যেমন আকাশ শূন্যময়, এবং শূন্যের কোনই কারণ থাকিতে পারে না। তত্রাচ আকাশকে 'সৎ' বলিয়া জানিতে কোনই বাধা হয় না। বৌদ্ধ এই বলিয়াই থামিয়া যান নাই। কার্য্যের লোক-প্রসিদ্ধ কারণ অবশ্যম্ভাবী (a prioi) কারণ না হইলেও কার্য্যের অন্য কোন অবশ্যম্ভাবী কারণ থাকিতে পারে কি না, ইহা হিয়ুম প্রণিধান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অগ্রজ পক্ষ, অনুজের সেই ক্রটীও পরিহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন অভাবই হইতেছে ভাবোৎপত্তির অবশ্যম্ভূত কারণ। পূর্ব্বকালে যদি ঘটের অভাব না থাকে তবে উত্তরকালে কখনই ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব অভাব হইতে ভাবের এবং অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পাঠক এইখানেই শূন্যবাদের গোড়া পত্তন দেখিতে পাইবেন, এবং শূন্য-বাদই হইতেছে হিয়ুম-বাদের যুক্তি-অনুগত (logical) ও সঙ্গত (legitimate) পরিণাম। হিয়ুম কিন্তু শূন্য-বাদের অর্দ্ধপথে আসিয়া থামিয়া গিয়াছেন।

আমাদের টোলের আরম্ভবাদী ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন তাঁহার "প্রাক্ অভাবের প্রতিযোগী সত্তার" অনু-সন্ধানে ফিরিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে "নাস্তিক পণ্ডিতের" কুটীরের সন্নিকটতম প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া গিয়া-ছিল। কিন্তু সে কথা তুলিবার আর প্রয়োজন নাই।

এই হইল কার্য্যকারণ বাদের বিরুদ্ধ পক্ষের কথা।

২। সৎ-কার্য্য-বাদ।

আরম্ভবাদ ও অসৎ কার্য্যবাদের বিরুদ্ধে, সাংখ্য ও বেদান্ত শিবিরে অতি প্রত্যূষেই রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল। এবং ঐ যুগল শিবিরের ধনুর্দ্ধরগণের কোদণ্ড টঙ্কারে কিরূপে বৈনাশিক বাদ বিপর্য্যস্ত হইয়া-ছিল ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা অন্যত্র পাঠ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমান কালের Evolution জ্ঞানীর ন্যায় তাঁহারাও বলিয়াছেন যে কার্য্যকারণই হইতেছে এ জগতের অবধারিত ও অব্যভিচারী বিধান। Kant-তত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই বিদিত আছেন যে হিয়ুমের আরম্ভ-বাদের বিরুদ্ধে ক্যাণ্টের প্রধান যুক্তি এই ছিল—"Experience possible only through the consciousness of necessary connection (e. g. the casual connection) of percepts."*

অর্থাৎ ক্যাণ্ট দেখাইয়াছেন, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ব্যবহারিক জ্ঞান (experience) হইয়া থাকে, তাহা কোনই পরস্পর-অসম্বন্ধ, যদৃচ্ছাকল্পিত ও যথেচ্ছ-অব-স্থিত বিষয় সকলের জ্ঞান নহে; কিন্তু সেই জ্ঞানে বিষয় সকল, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, আগু পিছু ভাবে অবস্থিত, এবং কার্য্যকারণ ক্রমে সমন্বয়যুক্ত বলিয়াই অনুভূত হইয়া থাকে। সেই জন্য ক্যাণ্টের মতে সম্বন্ধ জ্ঞান ও কার্য্যকারণ জ্ঞান আমাদের বাস্তবিক বিষয় জ্ঞানের অন্তর্নিবিষ্ট ও মূলীভূত (priori) জ্ঞান। প্রাচ্য আরম্ভবাদের বিরুদ্ধে পুরাতন ভারতবর্ষীয় আচার্য্যগণও অবিকল এই যুক্তিই প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর-কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বত্র সম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যম্।

অর্থাৎ বাস্তবিক জগৎ-জ্ঞান (Experience) অনুসারে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এ জগতে অসৎ

* Kritic of Pure Reason, p 218.

বস্তুর উৎপত্তি হয় না। বালিকে পিষিয়া তাহার মধ্য হইতে কেহই অসৎ তৈলকে বাহির করিতে পারে না। এখানে উপাদেয়কে পাইতে হইলে তাহার জন্য উপাদানকে গ্রহণ করিতে হয়। এবং বিনা উপাদানে কোনই উপাদেয় উৎপন্ন হয় না। জগৎ বিধানে সর্ব্বত্রই সকল জিনিস উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না, এবং গরুর শিঙ ভুলিয়াও কখনো মানুষের কপালে উৎপন্ন হয় না, এবং কল্পনাতে না বাধিলেও বাস্তবিক পক্ষে আকাশে কখনই ফুলের আবাদ হয় না। এখানে যাহার যতদূর শক্তি তাহা সেই পর্য্যন্তই করিতে পারে, তাহার অধিক পারে না। কোন কুমারই মাটী পিটিয়া সোণার ঘড়া তৈয়ারি করিতে সমর্থ হইবে না। এখানে এতই কড়াকড়ি ও বাঁধাবাঁধি নিয়ম যে আমের বীজ পুঁতিলে তাহা হইতে আম গাছই গজাইয়া থাকে, ভুলিয়াও আমড়া গাছ জন্মায় না। এই সব প্রণিধান পূর্ব্বক ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্য্যসত্তা উৎপত্তি ও জন্মলাভের পূর্ব্বে কোন না কোন আকারে, কারণের মধ্যেই সৎভাবে লুকাইয়া থাকে। ইহারই নাম সৎ কার্য্যবাদ।

উৎপত্তির পূর্ব্বে, কারণের মধ্যে কার্য্যের সেই সৎ অস্তিত্বকে কিরূপে বুঝিতে হইবে তৎসম্বন্ধে বেদান্ত দর্শন উপদেশ করিয়াছেন "পটবচ্চ"—অর্থাৎ পটকে ভাঁজ করিয়া গুটাইয়া রাখিলে সেই ভাঁজের মধ্যে পট যেমন অবস্থিত হয়, তেমনি কারণের মধ্যে কার্য্যেরও অবস্থিতি হইয়া থাকে। সাংখ্য বলিয়াছেন তাহা কার্য্যের "অবিভাগতঃ (undifferentedly) অবস্থিতি। যোগ বলিয়াছেন তখন কার্য্যের "অনাগত পথে" অবস্থান।

বলা বাহুল্য যে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদেরও তাহাই মর্ম্ম কথা।

৩। ব্যক্তের অব্যক্ত কারণ।

যে দিন হইতে প্রাচীন অভিব্যক্তিবাদী জগৎ-কার্য্য ও জগদুৎপত্তিকে এই অভিনব চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই সৎকার্য্য-বাদের সিদ্ধ মন্ত্র প্রভাবে, এই বিশ্বরূপের রহস্য-পর্দ্দা, পর্দ্দায় পর্দ্দায় খুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই দিন হইতেই এই বিশ্বরঙ্গের সমস্ত অভিনয়, তাহার নেপথ্য প্রদেশের সাজ-সজ্জা ব্যাপারের দ্বারা মীমাংসা লাভের প্রত্যাশা করিতে পারিয়াছিল। এবং সেই দিন হইতেই, কার্য্য-কারণ অন্বসন্ধানে পরিশ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানীকে আর ত্রিজগৎ হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় নাই, তিনি আসন্নতম কার্য্যের মধ্যেই তাহার কারণকে দেখিতে পাইতেছিলেন, প্রত্যুপস্থিত ঘটের মধ্যেই তাহার মৃত্তিকাকে চিনিয়া বাহির করিতে পারিয়াছিলেন। কার্য্যাৎ কারণানুমানং, তৎসাহিত্যাৎ" (সাং দঃ-১।১৩৫) কার্য্য হইতেই কারণের অনুমান করা যাইতে পারে,কেননা কারণ কার্য্যের সহিতই সহ অবস্থিত। কার্য্যের সহিত কারণের সহ-অবস্থিতি কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছে,ইহা নূতন ও পুরাতন অভিব্যক্তিবাদ (Evolution theory) অনুসারে হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন নহে। কারণ, কপিল এবং Darwin —প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অভিব্যক্তিবাদের দুইজন "আদি-বিদ্বান্," এই অভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা জীব ও জগৎ-রহস্য ভেদ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে ডারুইন বলিয়াছিলেন জীবের উৎপত্তি রহস্য হইতেছে—A change from indefinite incoherent homogeneity to definite coherent heterogeniety through continuous differentiation and integration" * এবং কপিলের মন্ত্র ছিল—

ভেদানাং পরিমাণাৎ, সমন্বয়াৎ, শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ কার্য্যবিভাগাদবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য॥
কারণমস্ত্যি অব্যক্তম্— †

—অর্থাৎ, "জগতে যাহাকে আমরা ভেদ (heterogeniety) বলিয়া জানিতেছি, সেই সকল ভেদ হইতেছে এক এক বিশেষ আকারাদি "পরিমাণ" বিশিষ্ট ভেদ। এবং সেই "পরিমাণ" না থাকিলে তাহারা অভেদ (homogenuos) হইয়া যায়। কিন্তু ভেদরূপ সকল

* Spencer's Data of Ethics, p. 65.

† সাংখ্যকারিকা—২০।২৬

বিভিন্ন পরিমাণ বিশিষ্ট হইলেও, তাহারা অত্যন্ত বিভিন্ন ভেদ নহে। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের মধ্যে কদাচিৎ সাদৃশ্য ও সমন্বয়ও লক্ষিত হয়। যেমন ঘট কলসাদির বিভিন্ন পরিমাণ মৃত্তিকা ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার ইহাও আমরা দেখিতে পাই যে অমূর্ত্ত শক্তি হইতেই মূর্ত্তিমান্ কার্য্য সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুম্ভকার অমূর্ত্ত মৃৎ-শক্তিকেই ঘট কলসের মধ্যে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলে। বীজগত অদৃশ্য বৃক্ষশক্তি হইতেই, অঙ্কুরাদি ক্রমে মূর্ত্তিমান বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্বরূপের এই কার্য্য কারণাত্মক ভাবকে প্রণিধান করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে কারণ সত্তা হইতেছে তাহাই, যাহার মধ্যে কার্য্যের পরিমাণ সকল নিষ্পরিমাণ হইয়াছে, ব্যক্তরূপ অব্যক্ত সম্ভাবনায় বিলীন রহিয়াছে, এবং বিভক্ত (differented) কার্য্য অবিভাগতঃ (undifferentedly) অবস্থিত হইয়াছে।"

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (experience) পরিধির মধ্যে সাংখ্য এইরূপে যে কার্য্যকারণ-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই "সামান্যতঃ দৃষ্ট" ন্যায়ানুসারে, এই ব্যক্ত জগতের অতীন্দ্রিয় ও অব্যক্ত কারণে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যে বিচার অবলম্বনে মৃত্তিকাকেই ঘটের কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, বীজকেই বৃক্ষের কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই বিচার অবলম্বন করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন এই ব্যক্ত বিশ্বজগতের কারণ হইতেছে অব্যক্ত প্রধান বা প্রকৃতি। এবং সেই অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বরূপের বিভিন্ন ও বিচিত্র পরিমাণ সকল নিষ্পরিমাণে অবস্থিত হইয়াছিল, সমন্বিত ভেদ সকল একাকারতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং দৃশ্যমান মূর্ত্তি সকল অমূর্ত্ত সম্ভাবনায় বিলীন হইয়াছিল।

শাস্ত্র বলিয়াছিলেন এই রূপ কার্য্য-কারণ ক্রমে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে প্রথমে মনোজগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। "মহদাখ্যাং আদ্য কার্য্যং, তৎ মনঃ।" (সাং দঃ ১।৭১)— অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম কার্য্য হইতেছে প্রধান,—সেই প্রধান 'মনস্'। এবং সেই 'মনস্' হইতেই কার্য্যকারণ-ক্রমে এই স্থূল ও পাঞ্চভৌতিক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা শুধুই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত নহে। ইহা প্রায় সকল উপনিষৎ ও দর্শনেরও সিদ্ধান্ত। তাহার প্রমাণ যথা— উপনিষৎ বলিয়াছেন—"তদ্বা ইদং মনস্যেব পরমং প্রতিষ্ঠং যদিদং কিঞ্চ"—এখানে যাহা কিছু আছে তাহা মনের মধ্যেই পরম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মনের মধ্যেই সমস্ত কিছু কিরূপে পরম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা স্মৃতি সন্দেহাতীত ভাষায় পরিস্কার ভাবে বলিয়াছেন। ভরদ্বাজ ভৃগুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

স-সাগরঃ স-গগনঃ স-শৈলঃ স-বলাহকঃ।
সভূমিঃ সাগ্নিপবনে লোকোঽয়ং কেন নির্ম্মিতঃ॥

অর্থাৎ সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, ভূমি, অগ্নি ও পবন সমন্বিত এই লোক কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল? ভৃগু উত্তর করিলেন—

মানসো নাম যো পূর্ব্বো বিশ্রুতো বৈ মহর্ষিভিঃ।
অব্যক্ত ইতি বিখ্যাতঃ শাশ্বতোঽক্ষরোঽব্যয়ঃ॥
অতঃ সৃষ্টানি ভূতানি—[১]

—যাহা মানস নামে মহর্ষিগণ দ্বারা বিশ্রুত হইয়াছে এবং যাহা অব্যক্ত শাশ্বত, অব্যয়, অক্ষর প্রভৃতি নামেও বিখ্যাত, তাহা হইতেই এই ভূত সকল সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিস্মৃতির মধ্যে খুঁজিলে এই মর্ম্মের আরও অনেক প্রমাণ মিলিবে।

তাহার পর, এসম্বন্ধে দর্শন শাস্ত্রের কি মীমাংসা দেখা যাউক। বেদান্তসার গ্রন্থে প্রথিতনামা সদানন্দ বলিয়াছেন, বেদান্ত মতে, "তমঃ প্রধান, বিক্ষেপশক্তিমৎ, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতেই আকাশ সম্ভূত হইয়াছিল। এবং আকাশ হইতে অগ্নি, জল প্রভৃতি ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছিল।" ইহা অনেকটা সাংখ্যেরই মত, প্রভেদ এই যে, সাংখ্য সেই "তমঃ প্রধান বিক্ষেপশক্তিমৎ অজ্ঞানোপহিত" তত্ত্বকে "চৈতন্য" না বলিয়া, চৈতন্যের ক্ষেত্র চিত্ত ও অহংকার

(১) মহাভারত ১৪.১৮২

বলিয়াছেন। এবং বোধ করি ইহা কোনই মায়াত্মক প্রভেদ নহে।

অতএব আমাদের সকল শাস্ত্রের মতেই দেখা যাইতেছে যে, মনঃসত্তা হইতেই এই জগৎসত্তা, কার্য্য কারণ ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা যদি শুধু পৌরাণিক তত্ত্ব মাত্রই হইত, তবে সে জন্য আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই উৎপত্তি তত্ত্ব, কার্যকারণ-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই ইহা লইয়া আমাদের বিচার করাও প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ মনঃসত্তাই যদি জগৎ-সত্তার কারণ হয়, তবে জগৎ সত্তার স্বরূপকে আমাদের মনের স্বরূপের মধ্যে সমাধান করাও আবশ্যক হয়। এইং ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে আমরা "Mind and Matter"এর মধ্যে কোনই দুরারোহ প্রাচীর তুলিয়া দিয়া, দুইটিকে দুই পৃথক্ কোঠায় আবদ্ধ করি নাই। বরং তাহার উল্টাই করিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম মনের মাল মসলা দ্বারাই Matter তৈয়ারি হইয়াছিল।

পাঠক জানেন, বর্ত্তমান যুগের ইউরোপীয় দর্শনের কাণ্ডারী মহামনা Hegelএরও সেই মত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে হেগেলের হেতুবাদ অবলম্বনে আমাদের হেতুবাদ বুঝিবার কোন সাহায্য হয় না। ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে, ইহার কারণ হইতেছে এই। হেগেল যাহাকে "Idee" কিংবা "Wesens" বলিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক আমাদের "মনস্" নহে। এবং এই মৌলিক প্রভেদ বশতঃ, আমাদের দর্শনের পন্থা বিভক্ত ও বিভিন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছে।

অতএব আমাদের দর্শনের দিক হইতে মনঃসত্তার স্বরূপ ও স্বভাব অগ্রে পরিচিন্তা না করিলে, কেহই আমাদের জগদভিব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। এবং তাহা না করিয়াও সমালোচনা করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কখনই সম্ভব হয় না। সেই জন্য জগদভিব্যক্তি নিরূপণ-কল্পে আমরা সর্ব্বাগ্রে চিত্ত-সত্তা বা মনের শাস্ত্রীয় স্বরূপ প্রণিধান করিবার চেষ্টা করিতেছি।

৪। মনঃসত্তা ত্রিগুণাত্মক।

মনঃসত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে প্রথম কথা হইতেছে তাহা ত্রিগুণাত্মক।

কিন্তু ত্রিগুণ বলিতে কি বুঝায়, ইহা লইয়া বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ দাঁড়াইয়াছে। অনেকেই আবার, ত্রিগুণের প্রাচীন ও সহজ অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার শ্রম স্বীকার না করিয়া, নিজেদের দার্শনিক প্রতিভা বলে, "ত্রিগুণতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য" উদ্ঘাটন করিতে গিয়া, এই শঙ্কিত বিষয়ের শঙ্কাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। তাহাতে, সম্প্রতি একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত, ত্রিগুণ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য অভিনব তথ্য আবিষ্কার করিয়া, দীন হীন তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে বিষয়টিকে একেবারেই পৌরাণিক ও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছেন। Oltramere সাহেব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে মূল সাংখ্যের সহিত ত্রিগুণের কোনই সম্বন্ধ ছিল না, পরবর্ত্তী যুগে সাংখ্যের সঙ্গে ত্রিগুণবাদকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। * এ কথা শুনা সত্ত্বেও, এই ত্রিগুণের "আপদ" হইতে কিছুতেই অব্যাহতি লাভের আশা করা যাইতেছে না। কারণ, সেকস্‌পীয়রের দুরদৃষ্ট বশতঃ, যদি তাঁহার Hamlet নাটকের মুখপাত্র Hamletই ঐ নাটকের প্রধান "আপদ" হইয়া দাঁড়ান, তবে সে আপদকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া ঐ নাটকের অভিনয় যতদূর শক্ত হইয়া দাঁড়ায়, ত্রিগুণকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিয়া সাংখ্য আলোচনাও তদপেক্ষা কম কঠিন হয় না।

ফলকথা ত্রিগুণ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা বিভ্রাট ও গবেষণা-বিপর্য্যয়ের কারণ সহজেই অনুমিত হয়। এবং সেই কারণ হইতেছে এই। আমাদের দেশের দিক্ হইতে ত্রিগুণ তত্ত্ব অবধারণ করা যতটা সহজ, অন্য দেশের দর্শনের দিক্ হইতে ইহার মর্ম্মগ্রহণ করা ঠিক সেই পরিমাণে শক্ত। এই জন্য ত্রিগুণ নিরূপণ করিতে হইলে অগ্রে আমাদের দর্শনের পূর্ব্বোত্তর দিক্ নিরূপণ করিয়া লওয়া প্রয়োজন হয়। এবং সেই দিঙ্‌নিরূপণ প্রসঙ্গে

* P. Oltramere's Theosophique's, 1, 234.

প্রথমে মনে রাখিতে হইবে আমাদের দর্শন হইতেছে পৃথক্ আত্মবাদী এবং পাশ্চাত্য দর্শন হইতেছে বুদ্ধ্যাত্মবাদী। এবং সেই জন্য আমাদের মতে জ্ঞাতা, বুদ্ধি বা মন নহে, জ্ঞাতা হইতেছে, বুদ্ধি ও মন হইতে ভিন্ন চৈতন্য পুরুষ। এবং সেই জ্ঞাতৃ চৈতন্যের জ্ঞেয় হইতেছে বুদ্ধি বা মন। চিত্ত কেন যে চৈতন্য পুরুষের জ্ঞেয় হইয়াছে, ইহার অন্য কোনই কারণ নাই, ইহাই বিধাতার চরম বিধান। পাতঞ্জল ভাষ্যে (১।৪) ব্যাস বলিয়াছেন— "চিত্তবৃত্তি বোধে পুরষস্য অনাদি সম্বন্ধঃ হেতু"—চিত্তবৃত্তির বোধ বিষয়ে পুরুষের সহিত চিত্তের অনাদি বোধ্য-বোধয়িতা সম্বন্ধই কারণ।

অতএব চিত্তবৃত্তি বোধ বিষয়ে আমরা দুইটী তত্ত্ব পাইতেছি, তাহার একটি হইতেছে চিত্ত (mind) এবং অন্যটি হইতেছে চৈতন্য (consciousness)। এবং উভয় তত্ত্বের মধ্যে বোদ্ধা হইতেছেন চৈতন্য এবং বোধিতব্য বা বুদ্ধি হইতেছে "মনস্।" এই চৈতন্য ও বুদ্ধি যখন পৃথক তত্ত্ব, তখন তাহাদের স্বরূপও অবশ্য পৃথক্। অতএব সহজেই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল চৈতন্যেরই বা স্বরূপ কি, এবং বুদ্ধিরই বা স্বরূপ কি ?

চৈতন্যের স্বরূপ সম্বন্ধে একদল বলিয়াছিলেন, চৈতন্য অলৌকিক স্বরূপ। অর্থাৎ চৈতন্য যে কি, লৌকিক ধারণায় তাহার কোনই "ইদৃক্-তা বা ইয়ৎ-তা" হয় না। আবার কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, চৈতন্য আনন্দস্বরূপ। বলা বাহুল্য এবম্বিধ চৈতন্যবাদের বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে আপত্তির অসি উত্থিত হইয়াছিল। অনির্ব্বচনীয়-চৈতন্যবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিকারী বলিয়াছিলেন— "তত্র ব্যাপ্তিগ্রহণাভাবাৎ দৃষ্টান্তাভাবঃ" * অর্থাৎ চৈতন্য যে অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ তাহার কোনই প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমন কি যে সকল মহাযোগিগণ সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি" লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও কোন অলৌকিক চৈতন্যের অনুভব হয় না। এবং চৈতন্যের আনন্দ স্বরূপ সম্বন্ধে সাংখ্য আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন "ন একস্য আনন্দ চিদ্রূপত্বে, দ্বয়োর্ভেদাৎ" (৫।৬৬)—একই সত্তার যুগপৎ চৈতন্যরূপ ও আনন্দরূপ হইতে পারে না, কারণ, আনন্দ হইতেছে চৈতন্যের বিষয় এবং চৈতন্য হইতে ভিন্ন। অতএব তিনি চৈতন্যের স্বরূপ অবধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন তাহা "জড়ব্যাবৃত্তঃ, জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ" (৬।৫০)—তাহা জড় বা অচেতন চিত্ত হইতে ভিন্ন ও ব্যাবৃত্ত (Counter-related) তাহা অচেতন চিত্তরূপকে প্রকাশ করিতেছে। অর্থাৎ চিত্তরূপ ও চৈতন্যরূপ একাকার হইলেও, চৈতন্যরূপ প্রকাশরূপ এবং চিত্তরূপ অপ্রকাশ রূপ। এবং সেই জন্য চৈতন্য শক্তি হইতেছে চিত্তপ্রকাশক শক্তি, এবং চিত্তশক্তি হইতেছে চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশযোগ্য শক্তি। ইহা ব্যতিরেকে চৈতন্যের অন্য কোন স্বরূপই বিচারসহ স্বরূপ হয় না। এবং সেই স্বরূপের দ্বারা চিত্ত ও চৈতন্যের মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যমাত্র সম্বন্ধ সিদ্ধ।

কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানে (experience) চিত্ত ও চৈতন্য বিষয়ে দ্রষ্টা ও দৃশ্য সম্বন্ধ হইতেও অনেক বেশী অবধারণা হইয়া থাকে। আমরা অবশ্যই চিত্তবৃত্তি সকলকে জ্ঞেয় বলিয়া অনুভব করি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও অনুভব করিয়া থাকি যে, চিত্ত জ্ঞেয় হইলেও জ্ঞাতা বটে, দৃশ্য হইয়াও দ্রষ্টা বটে। শুধু তাহাই নহে। চিত্তবৃত্তি সকলকে আমরা কোনই অন্যত্র অবস্থিত চিত্তের বৃত্তি বলিয়া অনুভব করি না, তাহাকে জ্ঞাতা ও চেতনেরই নিজস্ব বৃত্তি বলিয়া অনুভব করি। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবক্রমে চিত্তই চৈতন্যরূপে অনুভূত হয়, এবং সুখ দুঃখাদি চিত্তধর্ম্ম জ্ঞাতারই আপন ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়।

এখন চিত্ত চৈতন্য যদি তথ্যতঃ পৃথক সত্তা হয়, তবে আমাদের এইরূপ বিকৃত অনুভবের দুইটি কারণ হইতে পারে। হয় আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে চৈতন্যই কোন অজ্ঞাত সহানুভূতি বশে বুদ্ধির সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া বিকৃত হইয়াছে; নতুবা আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, চৈতন্য শুদ্ধ স্বচ্ছ নির্ব্বিকার দ্রষ্টা চৈতন্যরূপেই থাকিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দৃশ্য

* অনিরুদ্ধ কৃত সাংখ্যসূত্রবৃত্তি (৬।৫০)

ও জ্ঞেয় স্থানীয় বুদ্ধির এমন কোন বিকার ও পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে যাহার দ্বারা তাহা জ্ঞাতার সহিত একাত্ম-রূপে প্রতীয়মান হইবার যোগ্য হইয়াছে। আমরা পুরুষের স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে শাস্ত্র বিচারতঃ চৈতন্যকে নির্ব্বিকার জ্ঞান স্বরূপেই অবধারণ করিয়াছিলেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত দুইটি সর্ত্তের মধ্যে চৈতন্যের বিকৃত হওয়ার সর্ত্ত টিকে না। এবং অবশিষ্ট সর্ত্ত (alternative) অনুসারে হয়।

বুদ্ধির এই বিকার ও পরিণামের পারিভাষিক নাম "অহংকার" বা জ্ঞাতৃ চৈতন্যের সহিত অভিন্নভাবে অহং বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার যোগ্যতা। এই অহংকার হইতেই আমাদের তাবৎ ব্যবহারিক সংসার জ্ঞান নিষ্পন্ন হইতেছে। এবং অহংকারমাত্রা-প্রাপ্ত বুদ্ধিকেই লৌকিক দর্শন Mind, self, ego, spirit, 'সংসারী পুরুষ,' অহং প্রভৃতি নাম দিয়া থাকেন। এই অহংকারের দ্বারাই চিত্তের আঘাত ও উপঘাত, তাহার রূপ-রচনা ও ভাব রচনাকে চেতন পুরুষ নিজের আঘাত ও উপঘাত, নিজের রূপ রচনা ও ভাব প্রবৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার নাম সংসারী পুরুষের "ভোগ।"

এখন অহংকার মাত্রা-প্রাপ্ত-চিত্ত সত্তার স্বরূপকে আমরা সহজেই নির্দ্ধারণ করিতে পারি। এবং তাহাকে সংসারী পুরুষের ভোগ নির্ব্বাহক মূর্ত্তিমান প্রয়োজন বলিয়াও অক্লেশেই বিবেচনা করিতে পারি। কেননা তাহা বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উপরঞ্জনায় উপরঞ্জিত হইয়া যত না বর্ণেই আপনাকে রঞ্জিত করুক, কিংবা যত না আকারেই আপনাকে আকারিত করুক, তাহার সমস্ত রঞ্জনা ও সমস্ত আকারই তাহার জ্ঞাতৃ পুরুষে আরোপ-যোগ্য হইবে, এবং ঐ সমস্ত বর্ণ ও আকার তাহার নিজের পক্ষে যতটা অনুকূল ও প্রতিকূল হইবে, তাহার জ্ঞাতার পক্ষেও ঠিক ততটাই অনুকূলও প্রতিকূল হইবে। অথাৎ তাহার দ্বারা, তাহার পুরুষের সুখ দুঃখাদি ভোগও সিদ্ধ হইবে।

এই ভোগ নির্ব্বাহক অর্থে, চিত্তভাব সকলের সাংখ্য এক পারিভাষিক নামকরণ করিয়া ছেন "গুণ"। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যে এক স্থানে (১৪।৫) গুণ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"গুণা ইতি পারিভাষিকো শব্দঃ, ন রূপাদিবৎ দ্রব্যাশ্রিতাঃ। ন চ গুণ-গুণিনোঃ অন্যত্বম্ অত্র বিবক্ষিতম্। তস্মাৎ, গুণা ইব (গুণাঃ) নিত্য-পরতন্ত্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং প্রতি।"

অর্থাৎ "গুণ" হইতেছে পারিভাষিক শব্দ। আমরা সচরাচর যাহাকে রূপ রসাদিবৎ দ্রব্যের গুণ বলি, সেই অর্থে সত্ব প্রভৃতিকে গুণ বলা হয় না। কিংবা গুণের অতিরিক্ত কোন গুণী আছে ইহাও গুণ শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত হয় না। এই জন্য গুণ শব্দের অর্থ হইতেছে এই। সচরাচর কথিত গুণ যেমন দ্রব্যের নিত্য পরতন্ত্র, তাহা সর্ব্বদা যেমন দ্রব্যনিষ্ঠ ও দ্রব্যের অর্থকেই পোষণ করিতেছে, তেমনি পারিভাষিক গুণও নিত্য ক্ষেত্রজ্ঞ-নিষ্ঠ ক্ষেত্রজ্ঞ পরতন্ত্র, তাহা নিত্যই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের অর্থ ও প্রয়োজনকে সিদ্ধ করিতেছে।"

বাচস্পতি মিশ্র, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রমুখ পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ শঙ্করের প্রদত্ত গুণ শব্দের অর্থকেই সর্ব্বত্র প্রতি-ধ্বনিত করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন যে যাহার দ্বারা ভোক্তা সংসারী পুরুষের, ভোগরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহার নামই গুণ। এবং এই অর্থে চিত্তভাব সকল হইতেছে ত্রিগুণ অর্থাৎ তিন জাতীয় ভোগ বিধায়ক উপাদানের দ্বারা চিত্ত সত্বার ভাব নিচয়কে বিভাগ (classify) করা যাইতে পারে। সেই ত্রিগুণ হইতেছে সত্ব, রজঃ ও তমঃ।

বিজ্ঞানভিক্ষু সত্ব শব্দের অর্থ করিয়াছেন এইরূপ। "সতো ভাবঃ সত্বম্ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা হি ধর্ম্মপ্রাধান্যেন উত্তমং পুরুষোপকরণং"—অর্থাৎ সত্ব শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেছে সতের ভাব সত্ব। এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা ধর্ম্ম-প্রধান চিত্তভাব সকলই উপলক্ষিত হয়। সেই সকল চিত্তভাব পুরুষের উত্তম উপকরণ বা ভোগবিধায়ক। —এখানে বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিপ্রায় হইতেছে যে ধর্ম্মাদি "বুদ্ধিভাব" সকল হইতেছে সংসারী পুরুষের উৎকৃষ্টতম ভোগ বিধায়ক, কেন না সাংখ্য বলিয়াছেন "ধর্ম্মেণ গমন মূর্দ্ধং"—ধর্ম্মরূপ বুদ্ধিভাবের দ্বারা জীবাত্মার স্বর্গাদি উর্দ্ধ

লোকে গতি হয়। এবং স্বর্গ ভোগের ন্যায় উৎকৃষ্ট ভোগ সংসারী পুরুষের পক্ষে অন্য কিছুই হইতে পারে না। এই জন্য 'সত্ত্ব' পুরুষার্থ ভোগকে নির্ব্বাহের পক্ষে উত্তম বা বড় ভাগ। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সত্ত্বের ইহা অপেক্ষা আর বেশী কিছু "নিগূঢ় রহস্য" নাই। এই সত্ত্বের লক্ষণ হইতেছে, তাহা সুখাত্মক, লঘু ও প্রকাশক। চিত্তস্থিত সুখ, লঘুতা ও চিত্তের বিশদ প্রকাশতা সংসারী পুরুষের দ্বারা যে পরম অনুকূলভাবে গৃহীত হয়, ইহাও আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাসিদ্ধ। অতএব সে দিক দিয়াও সত্ত্বভাব সকল চিত্তবৃত্তির ভোক্তা পুরুষের পক্ষে বাস্তবিক "সত্ত্ব" অতি উত্তম।

"রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভবম্"

রজোগুণকে রাগাত্মক বলিয়া জানিবে। তাহা তৃষ্ণা (অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ) এবং আসঙ্গ (প্রাপ্ত বিষয়ে মনের প্রীতি লক্ষণ আসক্তি) হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যোগদর্শন এই তৃষ্ণা ও আসঙ্গকে রাগ দ্বেষ এবং সাংখ্য মহামোহ ও তামিস্র পারিভাষিক নাম দিয়াছিলেন। রাগ দ্বেষ বশেই চিত্ত হইতে প্রচেষ্টা সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং সেই জন্য রজঃ গুণের একটি লক্ষণ হইতেছে তাহা "চলধর্ম্মী ও উদ্যোতক।" আবার রজোগুণ দুঃখাত্মকও বটে। কেন না সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টার মূলে স্বল্প বা সুবৃহৎ দুঃখ নিত্যই বিদ্যমান থাকে। যেমন মনে করুন, আমার ইচ্ছা হইতেছে অদ্য পায়স ভোজন করিব। এই ইচ্ছা হইতেছে অংশুই মনের এক চলধর্ম্মী প্রচেষ্টা বা রজোগুণ এবং এই ইচ্ছা দুঃখাত্মক ও অসন্তোষমূলক। কারণ পায়স ব্যতিরেকেও আমার যে প্রাত্যহিক ভোজন সমাধা হইয়া থাকে, তাহাতে আমি মনে মনে যদি অসন্তুষ্ট না হইয়া থাকি, তবে অদ্য পায়স ভোজনের ইচ্ছা কখনই উদ্ভূত হইতে পারে না। কিংবা পায়স ভোজন জনিত সুখের অভাবে আমার অন্তরাত্মা অন্তরে অন্তরে যদি ক্লিষ্ট না হইয়া থাকে, তবে কখনই অদ্য আমার পরমান্ন ভোজনে স্পৃহা জন্মিতে পারে না।

"গুরু বরণকমেব তমঃ" তমোগুণ, গুরু এবং চিত্তের আবরণকারী। ইহা মোহাত্মক। তমোগুণ প্রভাবেই চিত্ত প্রকাশ আবৃত হয়, জ্ঞান গতিরুদ্ধ হয়। ইহাই আমাদের অজ্ঞানান্ধকার।

এই ত্রিবিধ চিত্তভাবই কিরূপে বাহ্য জগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা বারান্তরে আলোচ্য।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

ম্যাক্সিম্ গর্কি

(নব্য রুষিয়ার চিন্তানায়ক)

১

রুষিয়ার অপ্রতিহত রাজশক্তি ও সামাজিক দুর্নীতির নিষ্ঠুর পীড়নে নিষ্পিষ্ট হইয়া যে কোটি কোটি নরনারী বহু শতাব্দী হইতে আর্ত্তনাদ করিয়া আসিতেছিল, সেই আর্ত্ত মানব সন্তানের ভিতর নব আশা ও চেতনার তড়িৎপ্রবাহস্পর্শ দিয়া যে কয়েকটি মহাপ্রাণ মনীষী রুষিয়া দেশে এই যুগান্তরকারী জাগরণের বন্যা আনিয়া দিয়াছেন, জগদ্বরেণ্য প্রলয়ঙ্কর ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গর্কি (Maxim Gorky) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ম্যাক্সিম গর্কি সাহিত্য জগতে তাঁহার এই ছদ্মনামেই পরিচিত। তাঁহার প্রকৃত নাম 'এলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশকফ্' (Alexcie Maximo-vitch Peshkoff)। রুষীয় ভাষায় "গর্কি" শব্দের অর্থ বিদ্বিষ্ট বা নিষ্করুণ। রুষিয়ার চিরাগত সামাজিক কুসংস্কারে পাশবিক কদর্য্যতা

ও রাষ্ট্রীয় শক্তির অমানুষিক অত্যাচার যে তাঁহার অন্তরকে কি নিবিড় ভাবে ব্যথিত করিয়াছিল তাহা তাঁহার এই উপনাম গ্রহণ হইতেই কতকটা বুঝিতে পারা যায়। গর্কি ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ রুষিয়ার অন্তর্গত নিঝ্নি নোভগোরদে জন্মগ্রহণ করেন।

২

সাধারণ লেখক বা ঔপন্যাসিকদিগের গ্রন্থাবলী এবং লেখা হইতে যেমন লেখকদের প্রতিভা, মহত্ব এবং হৃদয়ের প্রসারতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়, গর্কি সম্বন্ধেও তাহা কতকটা যায় বটে, কিন্তু তাঁহার লেখার পুরাপুরি রস গ্রহণ করিতে হইলে, তাঁহার বাল্যকাল হইতে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত সমুদয় জীবনের ঘটনা এবং কি ভাবে তিনি প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের ভিতর দিয়া তাঁহার সেই দুর্দ্দমনীয় সহজ অবস্থার সংস্কার ও স্বায়ত্ত বুদ্ধি লইয়া প্রকৃতির সহিত দুরন্ত সংগ্রাম করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এ সমুদয় বিষয় সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, নতুবা তাঁহার কাব্যরসাস্বাদন অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ডষ্টয়ভ্স্কি, ভিক্টর হুগো, আনাতোল ফ্রাঁস প্রভৃতি মনীষীদিগের ন্যায় গর্কির জীবনের ঘটনা পরম্পরা তাঁহার সাহিত্য সৃজন ব্যাপারের সহিত এরূপ অবিচ্ছিন্ন ভাব সম্পৃক্ত যে, তৎসম্বন্ধে সম্যক্ অভিজ্ঞতা না থাকিলে তাঁহার সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও রস গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাঁহার জীবন যেন কথা-সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল উপাদান—একটী জীবন্ত প্রতিচ্ছবি!

৩

"The child is the father of the man" এই মহাজন বাক্যটি গর্কির জীবনে যেমন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হইয়াছে দেখা যায়, এমন অতি অল্প লেখকের জীবনেই দেখা যায়। সপ্তম বর্ষীয় পিতৃমাতৃহীন বালক যখন পাঁচ মাস মাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করিয়াই নিতান্ত অসহায় ভাবে সংসার সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন হইতেই তাহার ভিতর যে একটা দুর্দ্দমনীয় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও একটা অজ্ঞাত প্রতিভার উদ্দাম প্রেরণা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই সামান্য বালকের অন্তরে কবি-প্রতিভার কি অফুরন্ত উৎস ও নবচেতনার কি তড়িৎ প্রবাহ লুক্কায়িত ছিল। পিতামাতা তাহাকে দাক্ষিণ্যের দুয়ারে ভিক্ষুক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু গর্কির অদম্য হৃদয় তাহাতেও দমিবার নহে। তিনি দারিদ্র্যের সহস্র বাধাকে দলিত করিয়া আপনার সৌভাগ্য আপনি স্বহস্তে গঠন করিয়া লইয়াছিলেন। সাত বছরের বালক যখন উদরান্নের সংস্থানের জন্য একজন সামান্য চর্ম্মকারের দোকানে শিক্ষানবিশী করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন কে জানিত যে উত্তরকালে ইহারই মুখে নবজাগরণের অমৃত বাণী শুনিবার জন্য কোটি কোটি উৎপীড়িত আর্ত্ত রুষিয়াবাসী উৎকর্ণ হইয়া রহিবে?

৪

চর্ম্মকারের দোকানে সামান্য বেতনে কয়েকদিন মাত্র কায করিবার পর চঞ্চলমতি বালক পেশকফের মন আবার অস্থির হইয়া উঠিল। সেখান হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া পেশকফ্ এক ভাস্করের দোকানে কার্য্য গ্রহণ করিলেন; কিন্তু সেখানেও তাঁহার উদ্দাম চিত্ত অধিকদিন স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন কর্ম্মকর্ত্তার অজ্ঞাতসারেই পেশকফ সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার পিতা মাতা পুত্রের উদরান্নের সংস্থান হইতে পারে এমন কিছু রাখিয়া যান নাই; কাযেই অভাবের তাড়নায় পুনরায় তাঁহাকে পরের দ্বারস্থ হইতে হইল। তিনি এক আফিসে নকলনবিশীর কার্য্য গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সে কয়দিনের জন্য! দুদিন পরে আবার তাঁহার সেই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি তাঁহাকে ছুটাইয়া লইয়া চলিল। নকলনবিশীর কলমপেষা ছাড়িয়া পেশকফ্ ফেরিওয়ালা সাজিলেন। তাহাতেই বা তাঁহার চিরচঞ্চল চিত্ত বেশীদিন স্থির থাকিবে কেন? তাঁহার জীবন

তরী আবার একদিকে ছুটল। এইভাবে বালক পেশকফ ১৫ বৎসর হইতে না হইতেই অন্যূন দশ বারটী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে দেখিলে সত্যই যেন একটি মূর্ত্তিমান উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া বোধ হইত।

৫

যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনা গর্কির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, রুষিয়ার চিরপরিচিত ভল্‌গা (Volga) নদী তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ভল্‌গার শুভ্র-সলিল-বিধৌত শিশিরসিক্ত সৈকতের উপর প্রভাত-সূর্য্যের কনকরশ্মিলীলা, আর রক্তরাগরঞ্জিত সান্ধ্য-গগনের বিলীয়মান সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্বগরিমা, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার যে কি নিবিড় আত্মীয়তার সৃজন করিয়া দিয়াছিল তাহা না বুঝিলে গর্কি-সাহিত্যের মূল সূত্রটিই হারাইয়া যাইবে। তাঁহার উদ্দাম উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত তাঁহাকে যেখানেই লইয়া যাউক, ভল্‌গার চিত্তোন্মাদকারী মধুরস্মৃতি তাঁহাকে সর্ব্বত্র স্বর্ণসূত্রের মত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। যখন গর্কির বেদনা-বিধুর চিত্ত মানুষের উপর মানুষের ব্যবহারে নিতান্ত ব্যথিত ও কাতর হইয়া পড়িত, তখন তাঁহার একমাত্র শান্তির নিদান ছিল সেই ধীর প্রবাহিনী স্বচ্ছ সলিলা ভল্‌গা। এই ভল্‌গার বক্ষেই তাঁহার বাণী-পূজার প্রথম মঙ্গল দীপ জ্বলিয়া উঠে—জীবনের এক অভিনব পর্য্যায়ের মঙ্গলাচরণের সূচনা হয়।

৬

কৈশর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে গর্কি একদিন অভাবের তাড়নায় ভল্‌গাবক্ষসঞ্চারী এক অর্ণবযানের রন্ধন-শালায় ভৃত্যের কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইখানেই তাঁহার উন্মুখচিত্ত সাহিত্যের অমৃত স্বাদ লাভ করিল। এই ষ্টীমারে অবস্থানকালে তিনি স্মুর নামক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের সাহায্যে নানা উপন্যাস ও নাটকাদি পাঠ করিবার সুযোগ পান। এইরূপে তাঁহার অন্তরে সাহিত্যানুরাগ এত প্রবল হয় যে, উচ্চ বিদ্যালাভের অভিলাষে তিনি কাজান (Kazan) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন; কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, মানুষের গড়া বিদ্যালয় তাঁহার জন্য নহে;—প্রকৃতির যে বিরাট পাঠাগার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে তাহা হইতেই তাঁহাকে তাঁহার জ্ঞানরস সঞ্চয় করিতে হইবে। তাহার চলচ্চিত্ত আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—তিনি আবার ছুটিলেন। এইবারে পেশকফের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তাঁহাকে এতদূর লইয়া গেল যে, সাহিত্য ও সমাজ যেখানে সুরুচি ও কুরুচির গণ্ডীরেখা টানিয়া রাখিয়াছে তিনি তাহাও ছাড়াইয়া গেলেন।

৭

পেশকফ যখন পনের বৎসরের বালকমাত্র, তখনই যে সমস্ত সামাজিক কদর্য্যতা ও দুষ্ক্রিয়ার ভিতর তিনি আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে সত্য সত্যই বিস্ময়ান্বিত হইতে হয় যে, কি করিয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব বজায় রাখিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। তাৎকালীন রুষীয় সমাজের নিম্ন স্তরের জনসাধারণের ভিতর প্রতি রবিবারে ও পর্ব্বদিনে যে সমস্ত পাপাচার ও দুর্নীতির বীভৎস লীলা সম্পাদিত হইত, তিনি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। সমাজের সেই কুৎসিত ক্ষত ঢাকিবার জন্য সমাজ ও লোকাচার কত না পারিভাষিক চতুরতাই অবলম্বন করিয়াছিল! এই দুর্নীতির হলাহল পেশকফ স্বয়ং আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। এই সময়ে বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক দিন তিনি এই সকল উৎসব উপলক্ষে এক নিভৃত জীর্ণ বাড়ীতে একদল কুক্রিয়াসক্ত পলাতক অপরাধীর আড্ডায় কাটাইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পাপাচারের নিত্য লীলার মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও তেজ বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই। তিনি যেরূপে সমাজের আবর্জ্জনাস্বরূপ এই দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদের মুখ দিয়া রুষিয়াবাসী জনসাধারণের চিরাচরিত বীভৎসতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া সমাজে প্রচার করিতেন, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বাভাবিক গতি বা আন্তরিক প্রবণতা হেতু তিনি এই হীন সংসর্গে

মিলিত হন নাই, পরন্তু কেবল একটা তীব্র স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা একটা অদম্য দুঃসাহসিক কর্ম্মপ্রিয়তা তাঁহাকে এই দুষ্কৃতদের গুপ্ত আড্ডায় আকৃষ্ট করিয়াছিল। এইখানেই তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের দুঃখপাত্র পরিপূর্ণ হইল। অবশেষে একদিন তাঁহার এই দুর্বৃত্ত সহচরবর্গের সহিত তিনিও রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন এবং বিচারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

৮

কারামুক্তির পর গর্কির জীবনের আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। কি এক প্রচণ্ড বিদ্রোহী প্রবৃত্তি, মানবজীবনের নব নব অভিজ্ঞতা লাভের কি এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা যেন তাঁহাকে কক্ষচ্যুত উল্কাপিণ্ডের মত অন্ধ গতিতে ছুটাইয়া লইয়া চলিল। কোথাও বিরাম নাই, কোথাও বিশ্রাম নাই—কে যেন ভিতর হইতে নিরন্তর কশাঘাত করিয়া তাঁহাকে ঝঞ্ঝার মত ছুটাইয়া লইয়া চলিল। এই সময় ভল্‌গা তীরবর্ত্তী নগর সমূহে এমন কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এমন কোন সঙ্ঘ সমিতি ছিল না যাহাতে তিনি যোগ না দিয়াছিলেন। কি রাজনীতিক গুপ্ত সমিতি, কি ষড়যন্ত্রকারী রাজদ্রোহীদের দল, কি ছাত্রসঙ্ঘ, কি যুবক সম্মিলনী—সমস্ত বিভাগেই তিনি একবার প্রবেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে ছিন্নসূত্র ঘুড়ির মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে দুঃখ দারিদ্র্য অনাহার ও অবস্থা বিপর্য্যয়ের তাড়নায় তিনি এরূপ নিষ্পিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে, তাঁহার সেই দুর্দ্দমনীয় তেজ ও সেই পাষাণ হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। উপর্য্যুপরি ব্যর্থতা ও অনুশোচনায় নিজের জীবনে এরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন যে, একদিন তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা তাঁহাকে চিরকালের মত ভগ্নস্বাস্থ্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

অনেকে মনে করিতে পারেন, এইবার গর্কির জীবনে একটা সাম্য ও বিরতির ভাব আসিতে পারে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহার সেই উদ্দাম প্রকৃতি ও সেই দুঃসাহসিক কর্ম্মপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র সংযত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না, পূর্ব্ববৎই রহিল। তিনি পুনরায় পদব্রজে ভয়শঙ্কুল ককেশস শৈলমালা অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণসাগরের কূলে বিশ্বপ্রকৃতির অজ্ঞাত রহস্যোদ্ঘাটন মানসে নবীন উৎসাহে যাত্রা করিলেন। কে জানে এই যাত্রার উদ্দেশ্য কি, এর পরিণামই বা কি, আর পরিসমাপ্তি বা কোথায়? কিন্তু তিনি চলিলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যমদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া কল্পনার রথে চড়িয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত গর্কি ছুটিয়া চলিলেন। এই যাত্রায় দেখা গিয়াছে কখনও তিনি আপেলের ঝুড়ি মাথায় করিয়া ফেরিওয়ালা সাজিয়াছেন, কখনও দ্বাররক্ষক সাজিয়া পাহারা দিতেছেন, কখনও খনিতে নামিয়া মাথায় মোট বহিতেছেন। আবার কখনও পোত নির্ম্মাণ কারখানায় মজুরী করিতেছেন, কখনও ক্ষেপণী ধরিয়া নৌচালনা করিতেছেন, আবার কখনও বা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কুলি সাজিয়া জাহাজ হইতে মালপত্র নামাইতেছেন। মানবের বাস্তব জীবনে যে এমন সকল বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা ঘটিতে পারে, একমাত্র গর্কির জীবনেই বোধ হয় তাহা দেখা যায়। তাঁহার জীবনের বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ্য করিলে তাঁহার জীবন যেন সত্য সত্যই একটি জীবন্ত চলচ্চিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৯

গর্কির জীবনে যদি কোন কিছু চিরদিন সমভাবে তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে ত সে তাঁহার সেই চির-অভিলষিত স্থান ভল্‌গা সৈকত। গর্কি যখন সৈনিক বিভাগে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু প্রত্যাখ্যাত হইলেন, তখন তিনি চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া ভল্‌গা তীরে অবস্থিত স্বীয় জন্মভূমি নিঝনি নোভ্‌গরদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়েই গর্কি সর্ব্ব প্রথম অনন্যমনা হইয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিবেন স্থির করিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে তদ্দেশীয় সংবাদপত্র ও মাসিকে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সূত্রে স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী জে, লেনিনের সহিত

তাঁহার পরিচয় ঘটে। তিনি তাঁহাকে বহু বিষয়ে বহু প্রকারের সাহায্য করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি গর্কির অসাধারণ মনীষার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে? তাঁহার অস্থির প্রকৃতি ত এখনও পূর্ব্ব সংস্কার ভুলিতে পারে নাই। কয়েক মাস কায করিবার পরই তিনি লেনিনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় পদব্রজে "বেসারেবিয়া" হইতে তিফ্লিশ যাত্রা করিলেন। এই সময় রুষিয়ার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কোরোলেঙ্কোর (Korolenko) সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই কোরোলেঙ্কোর সহিত পরিচয় তাঁহার জীবনে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহাকেই গর্কির সাহিত্য জীবনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান সহায় বলিতে পারা যায়। তাঁহার সাহায্য ও চেষ্টাতেই তিনি সাহিত্য-জগতে এত অল্প সময়ের মধ্যে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন।

১০

কোরোলেঙ্কোর সহিত পরিচয় হইবার পর হইতেই তিনি ক্রমে ক্রমে ভল্গাতীরস্থ সহরগুলির প্রায় সমুদয় সংবাদ পত্রিকা ও মাসিকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট হইয়া পড়েন। তাঁহার 'Chelkash' নামক একখানি অভিনব আখ্যায়িকাই সর্ব্ব প্রথম তাৎকালীন সাহিত্য-রথিবৃন্দ ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার এই গ্রন্থখানি রুষীয় সাহিত্যে একটি অমূল্য রত্ন। তাহার পর তাঁহার The Voice of the Outcasts প্রকাশিত হয়। তাঁহার এই গ্রন্থ শুধু রুষিয়ায় কেন, বর্ত্তমান কালের সমগ্র সভ্যজগতেই একটি নূতন সুর একটি নূতন বার্ত্তা আনিয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের স্বীয় জীবনের যে বিপুল অভিজ্ঞতার, সামাজিক কুসংস্কার ও প্রকৃতির সহিত তাহার এই দুরন্ত সংগ্রামের যে নগ্ন চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে দেখা যায়, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার সেই মানব-দুঃখক্লিষ্ট মহান হৃদয়ের নিকট শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে। বিশ্ববরেণ্য ঋষি টলষ্টয় যে মহাজাগরণের বীজ রুষিয়াবাসীর অন্তরে বপন করিয়া গিয়াছিলেন, গর্কি তাঁহার হৃদয়শোণিত ঢালিয়া তাহাকে নবপল্লবিত বৃক্ষে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার সেই মর্ম্মগ্রন্থিছিন্ন শোণিত-ধারাপাতে রুষিয়াবাসীর অন্তরাত্মা যে কি নিবিড়ভাবে রাঙিয়া উঠিয়াছে তাহা এই সামান্য প্রবন্ধে সম্যক্‌রূপে আলোচনা করা সম্ভব নহে। আগামী বারে পুনরায় চেষ্টা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

মুক্তিনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমগ্র নেপাল রাজ্য তিনটী স্বাভাবিক বিভাগে বিভক্ত। পোখ্‌রা উপত্যকা মধ্য বিভাগের (Central Division) অন্তর্গত। ধবলাগিরির পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে গোঁসাইথানের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত একটী কাল্পনিক রেখা অঙ্কিত করিলে, রেখা যে চিরতুষারাবৃত পর্ব্বত-শ্রেণীর উপর পতিত হয় সেই পর্ব্বত-শ্রেণী মধ্যবিভাগের উত্তর সীমা। পশ্চিম সীমা কর্ণালী নদী প্রবাহিত প্রদেশ, দক্ষিণ সীমা বৃটিশ ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্বসমা ত্রিশূলী নদী।

স্মরণাতীত কাল হইতে এই ভূভাগ "সপ্ত গণ্ডকী" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। যে সাতটী নদী সপ্ত গণ্ডকী নামে পরিচিত তাঁহাদের নাম (১) ত্রিশূলী (২) বুড়ী গণ্ডকী (৩) দারামদী (৪) মারছান্‌ডী (৫) শ্বেতী গণ্ডকী (৬) কৃষ্ণা বা কালী গণ্ডকী বা নারায়ণী বা শালগ্রামী (৭) ভারিগর। প্রত্যেক নদীই তুষার শৃঙ্গ অথবা তাহার নিকবর্ত্তী স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া একে অন্যের সহিত মিলিতা হইয়াছে এবং শেষে

দেওঘাটের নিকট হইতে "গণ্ডকী" নামে সারণ জিলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে।

গোর্‌খাদের আদিম বাসভূমিও এই সপ্ত গণ্ডকী প্রদেশের অন্তর্গত। গোরখা-রাজ কর্ত্তৃক নেপাল উপত্যকা অধিকৃত হওয়ার পরেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত মধ্যবিভাগ চব্বিশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গোর্খাদের আদি বাসভূমি এই চব্বিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই চব্বিশটী ক্ষুদ্র রাজ্য একত্রে "চৌবিশিয়া রাজ" নামে অভিহিত হইত এবং ইহার রাজগণ "জুম্লা" রাজের করদ ছিলেন।

ফলে জুম্লারাজ নেপাল রাজের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সামন্ত নৃপতিরূপে পরিগণিত হয়েন। করদ রাজ্য চব্বিশটী নেপাল রাজ্যভুক্ত হয়। চব্বিশটী স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে পোখরা অন্যতম এবং উহা অপর তেইশটীর সহিত নেপাল রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

সপ্তগণ্ডকী প্রদেশে প্রাচীন চৌবিশিয়া রাজ্যের অন্তর্গত (১) কাস্কি, (২) লামজুঙ্গ (৩) পাল্‌পা (৪) তানহিন্ ও (৫) বটোল প্রভৃতি আরও কয়েকটী রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। কাস্কি এবং লামজুঙ্গ এখন প্রধান সচিবের নিজস্ব সম্পত্তি।

১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে প্রধান সচিব জঙ্গ বাহাদুর সহসা পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা বম্ বাহাদুর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েন। ইহার কিছুদিন পরে নেপালরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম সাহ, জঙ্গ বাহাদুরকে বংশানুক্রমিক মহারাজ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং মন্ত্রিত্ব পদও তাঁহার বংশগত করেন। নেপালরাজ সেই সনদে জঙ্গবাহাদুরকে কাস্কি ও লামজুঙ্গ রাজ্য দুইটী দান করেন।

পোখ্‌রা উপত্যকা নেপাল উপত্যকা হইতে আয়তনে অনেক বৃহৎ এবং ইহার লোক সংখ্যাও নেপালের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক। ইহার ভূপৃষ্ঠ নেপাল হইতে অধিকতর সমতল এবং যত্রতত্র পর্ব্বত ও গিরিগুহা বর্জ্জিত হওয়ায় কৃষিকার্য্যের অধিক উপযোগী। পোখ্‌রা যদিও হ্রদবহুল, তথাপি হ্রদজল ভূপৃষ্ঠ হইতে একশত কি দেড়শত ফিট নিম্নে থাকাতে কৃষিকার্য্যের কোন উপকারে আইসে না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে হ্রদের জলকে কৃষিকার্য্যের ব্যবহারোপযোগী করিতে পারিলে এবং সমগ্র উপত্যকাটীতে রীতিমত চাষ আবাদের ব্যবস্থা হইলে এই উপত্যকা হইতে বাৎসরিক পাঁচ ছয় লক্ষ মুদ্রা আয় হইতে পারে; কিন্তু ইহা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ।

মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুরের সময়ে সমস্ত উপত্যকাটী জরিপ করিবার এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে জলোত্তলন করিয়া উপত্যকাটীকে ব্যাপক ভাবে কৃষি কার্য্যের উপযোগী করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল এবং তজ্জন্য যে অর্থ ব্যয় প্রয়োজন, মন্ত্রিবর তাহা ব্যয়েও সম্মত ছিলেন। কিন্তু তৎকালে উক্তরূপ কার্য্য বিদেশীয় সার্ভেয়ার ও ইঞ্জিনিয়ারের পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন সম্পন্ন করিবার উপায় ছিল না। নেপালের ধন সম্পদের অস্তিত্ব ও অর্থাগমের কৌশল-বিদেশীয়ের জ্ঞানগোচর হইবে এই আশঙ্কায় সেই সময় প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। বর্ত্তমানে এক জন নেপালী ইঞ্জিনিয়ারের কর্ত্তৃত্বাধীনে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে ফেওয়াতালের (পোখ্‌রার বৃহত্তম হ্রদ) জল উত্তোলনের চেষ্টা হইতেছে।

পোখ্‌রা উপত্যকার প্রধান সহরের নামও পোখরা। সহরটী শ্বেতী গণ্ডকীর উভয় তীরে বিস্তৃত।

শ্বেতী গণ্ডকী মস্তাংএর পূর্ব্বদিকে "মছিয়া পুছা"র (মীনপুচ্ছ) নামক এক তুষার শৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া পোখরা উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দেওঘাটের নিকট ত্রিশূলীর সহিত মিলিত হইয়াছে। শ্বেতী গণ্ডকীর জলের বর্ণ চুণের জলের ন্যায় শ্বেত। বোধ হয় জলের বর্ণ অনুসারেই নদীতে "শ্বেতী" বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্বেতী গণ্ডকীর পূর্ব্বতীরস্থ সহরের অংশে কুচ কাওয়াজের বিস্তীর্ণ মাঠ, সৈন্যাবাস এবং দুই একটী সরকারী আফিস। পশ্চিম তীরে বাজার, পোষ্ট আফিস, ভূতপূর্ব্ব স্বাধীন রাজাদের বাড়ী, বিন্দুবাসিনী দেবীর মন্দির এবং অন্যান্য সরকারী আফিস স্থাপিত।

কাঠমণ্ডু সহরের ন্যায় পোখরা সহরেও নলের জল (pipe water) সরবরাহ করা হয়। কাঠমণ্ডুতে উচ্চ

পর্ব্বত হইতে নিম্ন ভূমিতে জল আনয়ন করিতে অধিক আয়াস স্বীকার বা অর্থব্যয় করিতে হয় না, কিন্তু পোখরাতে নিম্ন হ্রদ হইতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে জল উত্তোলন করিতে যথেষ্ট কষ্ট ও অর্থব্যয় করিতে হইতেছে।

পোখ্‌রা সহরে তামা ও পিতলের জিনিষ প্রস্তুত হয়। এখানে প্রতি বৎসর একটী শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী হইয়া থাকে।

১৮ই মার্চ্চ। প্রত্যূষে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। গত রাত্রে সহরে অনেকগুলি গৃহদাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে এই দুর্ঘটনার স্থানটী দেখিয়া, সহরের অন্যান্য অংশ বেড়াইয়া দেখিলাম।

এক দোকানের বারান্দায় গেরুয়াধারী একজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরিচয়ে তিনি বলিলেন তাঁহার নাম ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান জেলায় তাঁহার বাড়ী। তাঁহার এক খুল্লতাত বাবু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেহার গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করেন। ভুবনমোহন গির্ণার পাহাড়ে "শিখা সূত্র" ত্যাগ করিয়া অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন এবং এগার বৎসর নেপালে আছেন।

বৈকাল তিনটায় পণ্ডিত ত্রিভুবন নামক একজন নেপালী পণ্ডিত দেখা করিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী বঙ্গদেশের কলিকাতা, যুক্ত প্রদেশের বারাণসী ও গান্ধারের হুসিয়ারপুর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রমণের অনেক গল্প বলিলেন।

সুধীর বাবুকে একখানি চিঠি লিখিয়া ডাকে দিলাম। এখানে চিঠির বাক্স (letter box) নাই। চিঠি পোষ্ট মাষ্টারের হাতে দিতে হয়।

প্রায় চারি ঘটিকার সময় ব্রহ্মচারীজী ও আমি বিন্দুবাসিনী দেবীকে দর্শন করিতে গেলাম। সহরের উত্তর প্রান্তে একটি টিলার উপর দেবীর মন্দির স্থাপিত। চতুর্ভুজা দেবী মূর্ত্তি। এই দেবীর সম্মুখেও হিন্দু বৌদ্ধ অভেদে হাঁস কবুতর মুরগী ভেড়া ছাগল শূকর প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে।

পোখরাতে একটী সরকারী বিদ্যালয় আছে। বিন্দুবাসিনী টিলার নিম্নে বিদ্যালয়টী স্থাপিত। অপরাহ্নে বালক ও শিক্ষকগণ "আলয়" ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত আকাশতলে দুর্ব্বার উপরে বসিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন। পরিধানে পায়জামা, গায়ে আংরাখা, মাথায় রেশমের কায করা গোলটুপী, কপালে আতপ চাউল সংযুক্ত চন্দনের ফোঁটা—বালকগণ লঘু কৌমুদীর সূত্র সমস্বরে আবৃত্তি করিতেছে। সরকারী বিদ্যালয় ভিন্ন পোখরা সহরে দুই একটি চতুষ্পাঠীও আছে এবং এক চতুষ্পাঠীতে "বৈদান্ত" শাস্ত্র অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা হয়।

বিন্দুবাসিনী দেবী দেখিয়া ও বিদ্যালয়ের পণ্ডিতজীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে একজন মান্দ্রাজী সাধুর সহিত দেখা হইল। ইনি উদাসীন সম্প্রদায়ভুক্ত। অদ্যই পোখরা আসিয়াছেন এবং আশ্রয়স্থানের সন্ধানে ঘুরিতেছেন। অদ্য রাত্রের জন্য আশ্রয় দানে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে বাসায় আনিলাম। সাধুজীর বয়স ৩৪।৩৫, বর্ত্তমান আশ্রমের নাম মোহন দাস। পরিচয়ে বলিলেন ইহার গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম স্বামীনাথম্। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে ত্রিচিনাপলী সেণ্টজোসেফ কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া কিছুদিন রেলওয়েতে কার্য্য করিয়াছিলেন। শেষে নানাবিধ পারিবারিক ও আর্থিক দুর্ঘটনায় দেশত্যাগ করিয়া গত বৎসর (১৯২১) শিবরাত্রির সময় নেপালে আসিয়াছিলেন এবং এক বৎসর নেপালেই ছিলেন। এবার মুক্তিনাথ, মানস সরোবর প্রভৃতি দর্শনে বাহির হইয়াছেন।

যাঁহারা পারিবারিক দুর্ঘটনায় সংসার ত্যাগ করেন তাঁহাদের উদ্দেশে ব্রহ্মচারীজী একটি কবিতা বলিতেন—

ঘর্‌মে ঘড়বর
চলো বাবাজীকা মঠপর।
বাবাজী কহে কাম্‌,
মর তু রণতা রাম্‌॥

অর্থাৎ কোনও কারণে গৃহবাস অসম্ভব হওয়ায় এক শ্রেণীর লোক মঠে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখানেও মঠধারীর উপদেশমত চলিতে না পারায় লক্ষ্যহীন ভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

১৯শে মার্চ্চ—পোখরা হইতে চৌদ্দমাইল দূরে বেলালহরী নামক স্থানে একটী জলপ্রপাত আছে। তাহার বিশেষত্ব এই যে প্রপাত হইতে সর্ব্বদা জল পতিত হয় না। দুই এক ঘণ্টা অতি বেগে জল পতিত হইয়া তিন চারি ঘণ্টা বন্ধ থাকে।

কাঠমণ্ডুতে অবস্থানকালে এই স্থানে গমন সম্বন্ধে পথ ঘাটের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া জানিতে পারিলাম তাহা খুব ঠিক নয়। মুখিয়া ও পূর্ব্ব পরিচিত ডম্বর জঙ্গ দেখা করিতে আসিলে, তাঁহাদের নিকট বেলালহরী গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। তাঁহারা বলিলেন তথায় যাওয়া আসায় তিন দিন সময় লাগিবে এবং সেখানে দর্শনযোগ্যও বিশেষ কিছু নাই।

বেলালহরী গমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। বৈকালে ফেওয়াতাল হ্রদ দর্শন করিতে গেলাম।

ভূপৃষ্ঠ হইতে হ্রদের জল প্রায় দেড়শত ফিট নিম্নে। এই দেড়শত ফিট নীচে নামিয়া হ্রদের তীরে আসিলাম। উচ্চ ভূমির পাদদেশ হইতে হ্রদের জলসীমা পর্য্যন্ত স্থান বালুকাময়, রূপাতালের তীরের ন্যায় কর্দ্দমময় নহে। ফেওয়াতাল পরিক্রমণ করিতে প্রায় দুই দিবস সময় লাগে। হ্রদের জল ভূপৃষ্ঠে উত্তোলন জন্য একস্থানে যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে। এখনও ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য্যে ব্যবহার-উপযোগী জল উত্তোলন করা হইতেছে না, কেবল পোখরা সহরের অধিবাসীদের ব্যবহারের জন্য জল সরবরাহ হইতেছে। লোহা লক্কড়, দড়ি কাছি, পাথর, কয়লার ধূম, জলীয় বাষ্প, যন্ত্রের ফোঁস ফোঁস শব্দ, কুলী মজুরদের হাঁক ডাক, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ও গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যেন একটা উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

এস্থান পরিত্যাগ করিয়া হ্রদের কূলে কূলে অনেক দূর উত্তরে গেলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর তীরভূমির আবেষ্টনে কলকারখানা অদৃশ্য হইয়া পড়িল স্থানের স্বাভাবিক নীরবতা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ হ্রদতীরে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

কাঠমণ্ডু হইতে বাবু বটকৃষ্ণ মৈত্রের তাহার একজন অনুগত লোক ছবিলালের নামে একখানা চিঠি আমার সঙ্গে দিয়াছিলেন। পোখরায় আসিয়া জানিতে পারিলাম, ছবিলাল তখন পোখরায় উপস্থিত নাই। একজন বিদেশী লোক ছবিলালের অনুসন্ধান করিতেছে জানিতে পারিয়া তাঁহার একজন "কারিন্দা" (কর্ম্মচারী) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং আমার ও ব্রহ্মচারীজীর প্রায় দুই দিনের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী উপহার দিয়া গেলেন। বৈকালে গাইড বীরবল তাহার বাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ গৃহজাত ক্ষীর দিয়া গেল।

খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত হওয়ায় আমরা সঞ্চয় নীতি অবলম্বন করিলাম এবং বীরবলের প্রদত্ত ক্ষীর আগামী কল্যের জন্য রাখিয়া দিলাম। "না খেয়ে রাখে ধন তারে খান নারায়ণ"—পরদিন দেখিতে পাইলাম যে রাত্রে ইন্দুরে সমস্ত ক্ষীর নিঃশেষ করিয়া গিয়াছে, আমাদের ভোগে কিছুই জুটিল না।

২০শে মার্চ্চ। বৈকালে ছবিলালের দোকানে বেড়াইতে গেলাম। বিলাতী সিগারেট, দেশী এবং বিলাতী কাপড়, নানা রকমের মসলা ও অন্যান্য দ্রব্যে দোকানখানি সজ্জিত। ছবিলালের অনুপস্থিতিতে তাহার এক শ্যালক ও পূর্ব্ববর্ণিত কর্ম্মচারটী দোকানের তত্ত্বাবধান করিতেতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিলাম। যদিও ইঁহারা কোনদিন জাপান দেখেন নাই এবং জাপান কোথায় তাহাও বোধ হয় জানেন না, তথাপি বিশ্বাসের সহিত বলিলেন যে বর্ত্তমান প্রধান সচিব আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে তিনি নেপালকে জাপানের "বরাবর" (সমতুল্য) করিয়া গড়িয়া তুলিবেন।

ছবিলালের দোকান হইতে বিন্দুবাসিনীর মন্দির হইয়া বাসায় আসিলাম।

২১শে মার্চ্চ—আগামী কল্য এখান হইতে মুক্তিনাথ যাত্রা করিব। আমার ভারিয়া জিৎ বাহাদুর নামা কাঠ-মণ্ডু সহর হইতে দশদিনের পথ পোখরা আসিয়া খেতী গণ্ডকীতে একদিন স্নান করিয়াছে। তাতপানি যাইয়া একদিন এবং মুক্তিনাথ পৌঁছিয়া আর একদিন স্নান করিবে "প্রোগ্রাম" করিয়া রাখিল। পোখরায় অবস্থান কালে তাহার পায়জামা, আগুলফ লম্বিত আংরাখা ও আরও দুই একখানা অতিরিক্ত বস্ত্রখণ্ড সাবানজলে সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইল।

বৈকালে মোহনদাস ও আমি "দৌড়াহাকিম" শ্রীযুক্ত গঙ্গাবাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

খুবলাঙ্গ হইতে তিনি দুই তিন দিন হইল এখানে আসিয়া কাছারী করিতেছেন। খেতী গণ্ডকীর পূর্ব্ব-তীরে কুচ কাওয়াজের বিস্তীর্ণ মাঠের এক প্রান্তে তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছে। বেলা ৪-৩০ মিনিটের সময় আমরা তাঁহার তাম্বুতে পৌঁছিলাম। কাছারীর কার্য্য অন্তে তখন তিনি একাকী বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমার কার্ড পাঠাইলে তিনি আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, মোহনদাসও আমার সঙ্গে গেলেন।

গঙ্গাবাহাদুর ঠাকুরী বংশীয় শিক্ষিত যুবক। সুন্দর ইংরাজী বলিতে পারেন। আমরা মুক্তিনাথ তীর্থযাত্রা করিয়াছি শুনিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং আমাদের যাত্রা নিশ্চয়ই সফল হইবে এরূপ শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

আমার মাসব্যাপী নেপাল পর্য্যটনে আমি নেপাল ও নেপালীদের সম্বন্ধে কি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি জানিতে চাহিলেন, এবং নেপালী প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতিকল্পে আমার কোন প্রস্তাব থাকিলে তিনি আগ্রহের সহিত শুনিবেন, আমাকে জানাইলেন। আমার বক্তব্য তাঁহাকে বলিলাম এবং পাঁচমুণ্ডে পর্ব্বতে সংগৃহীত অভ্রখণ্ডগুলি তাঁহাকে দিলাম। অনেকক্ষণ আলাপের পর বিদায় গ্রহণ করিলাম এবং আগামী কল্য প্রত্যূষে যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকিলাম। বীরবলও যথা-সময়ে তাহার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল।

যে কনেষ্টবল মুক্তিনাথ এবং তথা হইতে প্রত্যা-বর্ত্তনের পথে তাতপানি পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছে, সে আসিয়া জানাইল তাহার বাড়ী এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে, মুক্তিনাথ যাইবার পথে। অনুমতি হইলে সে এখন বাড়ী যাইবে এবং আগামী কল্য তাহার বাড়ী হইতে আমাদের সঙ্গী হইবে। আমাদের কোন আপত্তি না থাকায় সে ব্যক্তি বাড়ী চলিয়া গেল।

২১শে মার্চ্চ। অতি প্রত্যূষে যাত্রার উদ্যোগ করি-লাম। এখান হইতে মুক্তিনাথ সোজা উত্তর দিকে এবং সোজা পথ থাকিলে দুই তিন দিনে পৌঁছান যাইত। আমাদিগকে প্রায় চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া আট দিনে পৌঁছিতে হইবে।

ভোর ৫-৩০ মিঃ সময় পোখরা ত্যাগ করিলাম। যাত্রাকালেই ব্রহ্মচারীজী একটু অসুস্থ বোধ করিতে-ছিলেন, কিন্তু ততটা গ্রাহ্য না করিয়া রওয়ানা হইলেন। ঘণ্টাখানেক পথ চলার পর তিনি পেটের বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন এবং আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না বলিলেন। অতি কষ্টে আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা পথ চলিয়া আমরা খাসিপানি নামক এক বস্তিতে উপস্থিত হইলাম।

এক গৃহস্থের ঘরে ব্রহ্মচারীজী শয্যার আশ্রয় নিলেন এবং বিশ্রামের পর প্রায় দুপ্রহরের সময় সুস্থ হইলেন। আজ আমি "স্বয়ং পক্বা"—বীরবল সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলে ভাত পাক করিয়া লইয়া এবং কিঞ্চিৎ দধি সংগৃ-হীত হইলে দধিমঙ্গল করিলাম।

বেলা ১২-৩০ মিঃ সময় খাসিপানি ত্যাগ করিলাম। অনেকদূর পর্য্যন্ত সমতল ভূমির উপর দিয়া পথ, বিশেষ "চড়াই উৎরাই" নাই। দুই দিকে লোকালয়, মধ্য দিয়া পথ। পথিপার্শ্বস্থ এক পল্লী হইতে আমাদের সঙ্গে যাইতে আদিষ্ট কনেষ্টবল আমাদের সঙ্গী হইল। ক্রমে চড়াই আরম্ভ হইল। অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিঃ সময় আমরা নওডেরা নামক অধিত্যকায় উপস্থিত হইলাম এবং এক নেওয়ারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ব্রহ্ম-

চারীজী সমস্ত দিন অভুক্ত, সুতরাং সত্বর পাকের উদ্যোগ করিতে বলিয়া আমি বাহিরে আসিলাম।

নওডেরা স্থানটী বড়ই সুন্দর। অধিত্যকার পূর্ব্ব দিকে বহু নিম্নে ফেওয়াতাল হ্রদ। হ্রদের অপর পারে পোখরার সমতল ভূমি। উত্তরে ধূম্রবর্ণ বিশাল "কাস্কি" শৈলশ্রেণী। পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতশিখর। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গগুলি আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গ উভয় পার্শ্বে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে চিরহিমানী-রেখা পর্য্যন্ত পর্ব্বতের বর্ণ ধূসর। শীর্ষস্থ তুষাররাশি দ্রবীভূত হইয়া রজতধারাকারে ধূসর পর্ব্বতের উপর পড়িতেছে। অস্তাচলগামী সূর্য্যকিরণ সম্পাতে রজতগিরি এক মধুর শোভায় সজ্জিত হইয়াছে। আমি এক উপলখণ্ডের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পশ্চিম গগনের শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম।

সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিলেন। সান্ধ্যগগনের নিম্নে এক অপূর্ব্ব রক্তিমচ্ছটা প্রকটিত হইল এবং গিরিশিখর সমূহকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। সমস্ত পশ্চিমদিগন্ত যেন কুঙ্কুমরাগলিপ্ত হইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধীরে নিবাতনিষ্কম্পা নক্ষত্রমাল্যভূষিতা যামিনী আগমন করিলেন। সে অতি সুন্দর! দিগ্‌দেশের এক প্রান্তে তুষারকিরীটী গিরি অন্তহীনভাবে অবস্থিত। তরঙ্গায়িত অনুচ্চ শৃঙ্গগুলি এক মহাকায় শিখরের পাদদীপ-পংক্তিবৎ শোভা পাইতেছিল। দূর হইতে তাহাদিগকে আকাশগাত্রে পীতালোকে উদ্ভাসিত লম্বমান শুভ্ররেখাবৎ দেখা যাইতেছিল। অপর প্রান্তে অতলস্পর্শ হ্রদ-জলরাশি। চারিদিকেই নয়নানন্দ দৃশ্য—ঊর্দ্ধে দেদীপ্যমান নক্ষত্ররাজিখচিত নীলাকাশ, অধোভাগে নক্ষত্র-বিম্ব প্রতিফলিত স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ হ্রদজলরাশি, পার্শ্বে নক্ষত্রালোক চর্চ্চিত অলস রজতগিরিশিখর। প্রকৃতি দেবী যেন আপন সৌন্দর্য্যাতিশয্যে আনন্দবিহ্বলা, কিন্তু স্থিরা, শান্তা, সমাহিতা।

২৩শে মার্চ্চ। প্রাতঃকাল ৫—৩০ মিনিটের সময় যাত্রা করিলাম। আমরা এখন সোজা দক্ষিণ দিকে যাইতেছি এবং ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছি। একটী পর্ব্বতের অধিত্যকায় আসিলে একদল ভুটিয়া সদাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা অধিত্যকায় বিশ্রাম করিতেছিল। সদাগরগণ মনাংএর অধিবাসী, চৌদ্দটী গর্দ্দভ এবং একটী অশ্বের পৃষ্ঠে চাউল বোঝাই করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতেছে। মনাং মুক্তিনাথ হইতে আট দিবসের পথ পূর্ব্বে এবং মুক্তিনাথ হইয়া যাইতে হয়।

অধিত্যকার পর হইতেই উৎরাই আরম্ভ। উৎরাই আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে পর্ব্বতদেবতার প্রীতিকামনায় "ধ্বজা" দান করিতে হয়। পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষশাখায় বস্ত্রখণ্ড অথবা কাগজের টুক্‌রা ঝুলাইয়া দেওয়াই ধ্বজাদান। বিবিধ বর্ণের অসংখ্য বস্ত্রখণ্ড, সাদা অথবা নেপালী কি তিব্বতীয় ভাষায় লেখা অসংখ্য কাগজের টুক্‌রা গাছে ঝুলিতেছে দেখিলাম।

ধ্বজা দান সম্বন্ধে নেপালে একটী গল্প আছে। নেপালের প্রথম পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্ত মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর পর্ব্বত দেবতাকে ধ্বজা দান না করিয়া উৎরাই আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদূর গমনান্তর অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি তখন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধ্বজাদান করিলেন এবং নষ্ট দৃষ্টি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

ধ্বজা দানের জন্য বীরবল পোখরা হইতে পাঁচ টুক্‌রা কাপড় কিনিয়া আনিয়াছিল। আমাদের পাঁচ জনের পক্ষ হইতে সেই পাঁচ টুক্‌রা কাপড় বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া দিল। ব্রহ্মচারীজী একটী দগ্ধাবশিষ্ট মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বৃক্ষমূলে দীপদান এবং সংগৃহীত শুষ্ক পত্রে অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহাতে ধূপদান করিলেন।

ভুটিয়া সদাগরগণও ধ্বজা দান করিল। ধ্বজা দান অন্তে আমরা উৎরাই আরম্ভ করিলাম। যাত্রার একটু পূর্ব্বে একটী সদাগর বালক নিকটে আসিয়া "শলি" (দেশালাই) প্রার্থনা করিল, তাহাকে একটী দেশা-শালাইর বাক্‌স দিয়া আমরা গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম।

৮-৩৫ মিঃ আমরা লুংলে নামক একটী বস্তিতে পৌঁছিলে এক ব্যক্তি আমাদিগকে সদাব্রত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। এখনও বেলা অধিক হয় নাই, আমরা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইতে পারি, কিন্তু এখন যাত্রা করিলে দ্বিতীয় আশ্রয় স্থানে পৌঁছিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইবে; দ্বিতীয়তঃ এখানে মধ্যাহ্ন ভোজন জন্ম বিশ্রাম করিলে গাইড বীরবল তাহার এক আত্মীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে—নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতে তাহার শ্যালিকার বাড়ী। আমরা সদাব্রত গ্রহণে সম্মত হইয়া এক নেওয়ারের দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম; বীরবল তাহার আত্মীয়ার বাড়ীতে গেল।

যে বস্তিতে সদাব্রত দেওয়ার প্রথা আছে সেখানে অতিথিদের পাক করিবার জন্ম একখানা পৃথক ঘর থাকে, তাহা অন্য কোন কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। এখানেও অতিথিদের পাকের জন্ম একখানা ঘর আছে এবং সেই ঘরে আমাদের পাকের আয়োজন হইল।

গাইড বীরবলের কৌলিক উপাধি গুরুঙ্গ, ভারিয়া জিৎবাহাদুরের কৌলিক উপাধি লামা। উভয়ের মধ্যে বর্ণ (caste) হিসাবে কি পার্থক্য জানি না, কিন্তু ব্রহ্মচারীজী প্রথম কিছুদিন জিৎ বাহাদুরের আনীত জল রন্ধনে কি পানে ব্যবহার করিতেন না। তাহার পর তাহাকে "জল আচরণীয়" শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া লইয়াছিলেন। অন্য বীরবলের অনুপস্থিতিতে জিৎবাহাদুরকেই বীরবলের কার্য্য করিতে হইতেছিল।

চুল্লি হইতে তপ্ত কটাহ কিংবা তদ্রূপ কোনও একটা পাত্র নামাইবার প্রয়োজন হওয়ায় ব্রহ্মচারীজী জিৎবাহাদুরকে কয়েকটা পাতা আনিয়া দিতে বলিলেন। জিৎ বাহাদুর কিছুই বুঝিতে না পারায় আমি নিকটবর্ত্তী এক গাছ হইতে কয়েকটা পাতা লইয়া আসিলাম। পাতা দেখিয়া জিৎবাহাদুর বলিয়া উঠিল "পত্র ?"

পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক জেলাতে "শৃঙ্গ" শব্দের অপভ্রংশে "শিং" শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া "ছেরেঙ্গো" (অপ) শব্দ ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাসী আমাদের এক বন্ধুর গর্ব্ব ছিল যে তিনি আমাদের গ্রাম্য কথা বেশ বুঝিতে পারেন। বন্ধুবরের বিদ্যা পরীক্ষা করিবার জন্ম এক দিবস "ছেরেঙ্গো" শব্দ সম্বলিত একটী বাক্য রচনা করিয়া তাঁহাকে অর্থ করিতে বলা হইল। তিনি কোনও প্রকারে অন্যান্য শব্দের অর্থ করিতে পারিলেও "ছেরেঙ্গো" শব্দের অর্থ কিছুতেই বলিতে পারিলেন না। পরে শব্দটীর অর্থ তাঁহাকে বলা হইলে তিনি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন "বাঙ্গাল যে সাধুভাষা খাটিয়েছে তা টের পাব কেমন করে ?"

নেপালের আদিম অধিবাসী মঙ্গোলীয় বংশধর জিৎ বাহাদুর লামা যে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে "পত্র" না বলিয়া পাতা বলিলে বুঝিতে পারিবে না তা আমরা "টের পাবো কেমন করে ?"

কিণ্ডারগার্টেন সিষ্টেমে জিৎ বাহাদুর ও বীরবলের নিকট হইতে দুই চারিটী নেপালী শব্দ শিক্ষা করিয়া অনেক সময় আমরা কায চালাইয়াছি।

আহারান্তে যথেষ্ট বিশ্রাম করিলাম। বীরবল আসিয়া পৌঁছিলে ১২—৩০ মিঃ সময় লুংলে ত্যাগ করিলাম।

বেলা ৩ ঘটিকার সময় আমরা এক নদীতীরে উপনীত হইলাম। নদীর নাম মোদি এবং তীরস্থ বস্তির নাম ভুরুণ্ডি। নদী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে প্রবাহিতা। নদীর অপর তীরে ভুরুণ্ডি হইতে অল্প দূরে পূর্ব্বদিকে আর একটী নদী দক্ষিণ হইতে আসিয়া মোদিতে পড়িয়াছে। এই নদীসঙ্গম হইতে দুই ক্রোশ কি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প দূর দক্ষিণে একটী জলপ্রপাত। শেষোক্ত নদীটী সেই প্রপাতের জলরাশি বহিয়া আনিয়া মোদিতে ঢালিতেছে। প্রপাতের জলরাশি যে কি ভীষণ বেগে আসিয়া পড়িতেছে তাহা না দেখিলে ধারণা করা যায় না। সঙ্গমস্থলে যেন উভয় নদীর জলে একটী ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে।

মোদি নদীর উপর একটী সেতু আছে। সেতু পার হইয়া আমরা নদীসঙ্গমে আসিলাম এবং সেখান হইতে নদীর কূলে কূলে দক্ষিণ দিকে চলিলাম। অপরাহ্ন

৫-৩০ মিঃ সময় সুধামে নামক এক বস্তিতে উপস্থিত হইলাম।

বস্তিটী পথের পশ্চিম পার্শ্বে, অনেক উচ্চে। এক থাকালিয়ার বাড়ীতে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

পোখরার পর হইতে মুক্তিনাথের পথে নেওয়ারদের বসতি বিরল এবং মোদীর দক্ষিণ তীর হইতে আর নেওয়ার বসতি পাই নাই।

আমাদের আশ্রয়দাত্রীর অবস্থা বেশ সচ্ছল। এক খানা গৃহের দ্বিতলে আমাদের আশ্রয়স্থান নির্দ্দেশ করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী অন্ত গৃহে পাকের আয়োজন করিয়া দিলেন। শয়নগৃহে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন এবং পাক ঘরে পিতলের পিলসুজের উপর একটী পিতলের প্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন। নেপালীদিগকে তামা কি পিতলের কলসী ঘড়া ও ধাতু নির্ম্মিত অন্যান্ত পাত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি কিন্তু পিতলের পিলসুজ ও প্রদীপ এই বাড়ীতেই দেখিলাম। বাড়ীর একটী যুবক (গৃহকর্ত্রীর পুত্র) ভারতীয় সৈন্তবিভাগে চাকুরী করে এখন ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। হ্যারিকেন লণ্ঠনটী তাহার সম্পত্তি। আমাদের শয়নগৃহে শীত ও বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্ত সৈনিক যুবক তাহার ওয়াটার প্রুফ ও গ্রেটকোট বারান্দায় টানাইয়া দিল।

আগামী কল্য আমরা কত দূর যাইতে পারিব, কোথায় আমাদিগকে রাত্রিবাস করিতে হইবে সে সম্বন্ধে সৈনিক যুবক ও তাহার বৃদ্ধা মাতার সহিত আলোচনা করিলাম।

কাঠমণ্ডু ও পোখরা হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছি তাহাতে আগামী কল্য আমাদের সিকাঘারা (সিকা ও ঘারা দুইটী স্বতন্ত্র বস্তি একত্র এক নামে পরিচিত) বস্তিতে রাত্রিযাপনের কথা। যুবক বলিল সিকাঘারা :আমরা যাইতে পারিব না. চিত্রা বস্তিতে আমাদিগকে অবস্থান করিতে হইবে। সুধামে হইতে চিত্রা মাত্র দেড় ক্রোশ।

বৃদ্ধা বলিলেন আগামী কল্য আমাদিগকে উল্লারী পর্ব্বতের শীর্ষস্থ বস্তিতে রাত্রিবাস করিতে হইবে, ঐ স্থান হইতে দূরে যাইতে সমর্থ হইব না। উল্লারী পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চ এবং দুরারোহ, উল্লারী লঙ্ঘন করিতেই আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িব আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিব না।

নেপালী ভারিয়া ও অন্যান্ত পথগামী ব্যক্তিগণ প্রত্যূষে পাক ও আহার করিয়া যাত্রা করে এবং সমস্ত দিন পথ চলে। সন্ধ্যায় আশ্রয় স্থানে পৌছিয়া দ্বিতীয় বার পাক এবং আহার করে। পথে জলখাবার খায়। আমরা সমস্ত দিন পথ চলিতাম না, আমাদের সঙ্গের নেপালীত্রয়ও আমাদের ন্যায় অভুক্ত অবস্থায়ই প্রাতে যাত্রা করিত এবং কোন কোন দিন দিবসে দুইবার কোন কোন দিন বা একবার পাক করিয়া খাইত। আগামী কল্য উল্লারীর অত্যুচ্চ পর্ব্বত আরোহণ করিতে হইবে, স্থির হইল যে গাইড, কনেষ্টবল ও ভারিয়া প্রত্যূষে আহার করিয়া যাত্রা করিবে। ব্রহ্মচারীজী দিবাভাগে কিছুই আহার করিবেন না, কারণ একাদশী। আমিও পাক কার্য্যের "নাস্তরীয়ক" দুঃখ ভোগ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক সুতরাং আমারও একাদশী। আমরা প্রত্যূষে রওয়ানা হইব, গাইড প্রভৃতি আহারান্তে আমাদের পশ্চাতে আসিবে।

২৪শে মার্চ্চ। সকাল ৬-৩০ মিঃ সুধামে ত্যাগ করিলাম। বীরবল জানাইল অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উল্লারী পাদদেশস্থ বস্তিতে আমরা পৌছিতে পারিব এবং তাহারা সেখানে পাক আহার শেষ করিয়া "চড়াই" করিবে। আমরা পূর্ব্বদিকে চলিতে লাগিলাম এবং ৭ ঘটিকায় সময় পূর্ব্ব কথিত জলপ্রপাতের নিকট পৌছিলাম। জল প্রপাত আমাদের অতি অল্প দূরে—দক্ষিণে। প্রপাত নির্গত জলপ্রবাহ আমাদের সম্মুখে, তাহার পরপারে উল্লারী পর্ব্বত। জল প্রবাহ উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে যাইবার জন্ম কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ সংস্থাপিত। মুক্তিনাথের পথের দুর্গমতা * অদ্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলাম।

---

* ২। গণ্ডকী নেপালের মধ্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গাতে পতিত হইয়াছে। ইহার তীরে নেপালের অন্যতম

সম্মুখে আকাশস্পর্শী দুর্লঙ্ঘ্য উল্লারী পর্ব্বত, দক্ষিণে অদূরে জলপ্রপাত। প্রপাত হইতে পতিত জলরাশির ভীষণ গর্জ্জন চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইয়া আরও ভীষণতর হইয়াছে। অতি ক্ষিপ্রগামী জলরাশি পার হইয়া পরপারে যাইতে হইবে, তাহাতে পারাপারের সেতুটীও মাত্র কয়েক খণ্ড অসংযুক্ত কাষ্ঠ। মনে হয় যেন কাষ্ঠখণ্ডের উপর উঠিলেই প্রপাতের জলরাশি স্থানচ্যুত হইয়া আসিয়া যাত্রীকে ধাক্কা দিয়া নিম্নস্থ জল প্রবাহে ফেলিয়া দিবে।

অতি সন্তর্পণে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে পুল (?) পার হইতে আরম্ভ করিলাম। অধোদেশে জলরাশির উপর দৃষ্টিপাত করিলে মস্তক বিঘূর্ণিত হয়, প্রতিপদক্ষেপেই মনে হয় এই বুঝি পড়িলাম। একজন যে অপরের হস্ত ধারণ করিয়া পারাপারের সাহায্য করিবে তাহাও অসম্ভব।

ভগবানের কৃপায় উল্লারীর পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। ব্রহ্মচারীজী, গাইড, কনেষ্টবল এবং ভারিয়া সকলেই নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌছিল।

গাইড কনেষ্টবল ভারিয়া এখানে পাকের উদ্যোগ না করিয়া কিছু জলযোগ করিল এবং উল্লারীর শীর্ষস্থ বস্তিতে যাইয়া আহার করিবে স্থির করিল।

৭-৩০ মিঃ সময় আমরা "চড়াই" আরম্ভ করিলাম। শেষাগিরি হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ও অতিক্রম করিয়াছি, কিন্তু এরূপ দুরারোহ পর্ব্বত এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। পর্ব্বতটী যেন ঠিক একটী প্রাচীর; পাদদেশ হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। পর্ব্বতগাত্রস্থ পথ যেন প্রাচীর গাত্রে একগাছি বিলম্বিত রজ্জু। পর্ব্বতের ঢালুদেশ (slope) পূর্ব্বদিকে, আমরা বিপরীত দিক হইতে আরোহণ করিতেছি।

কিছুদূর অগ্রগমনের পর পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষশাখা সংলগ্ন হইয়া ব্রহ্মচারীজীর মস্তকাবরণটী ভূমিতে পড়িয়া গেল। সেইটি তুলিয়া লইবার জন্য আমাদিগকে আবার কয়েকপদ পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইল। পর্ব্বতের অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিম্নে পতিত হইবার একটী আশঙ্কা অকারণ মনে উদিত হয়। তবু একবার চাহিয়া দেখিলাম। গাইড প্রভৃতি আমাদের অনেক নিম্নে, তাহাদিগকে বালকের ন্যায় দেখা যাইতেছিল।

বেলা দশ ঘটিকার সময় ব্রহ্মচারীজী ও আমি উল্লারীর শীর্ষস্থ বস্তিতে পৌছিলাম। নিম্নদেশ হইতে উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ সময় প্রতি পদবিক্ষেপই যেন চক্ষুর সম্মুখে নূতন দৃশ্য আনয়ন করে। উল্লারীর শীর্ষদেশে আসিয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, সমস্ত ক্লান্তি সমস্ত অবসাদ দূর হইল। কি যে শোভা দর্শন করিলাম তাহা অবর্ণনীয়, অননুমেয় — কেবল প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয়ীভূত।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাইড প্রভৃতি আসিয়া পৌছিল। তাহারাও অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

পথের কঠিন অংশ আমরা অতিক্রম করিয়াছি। বেলা মাত্র সাড়ে দশটা, ব্রহ্মচারীজী ও আমি দিবাভাগে আহার করিব না সুতরাং আমরা আরও কিছুদূরে অগ্রসর হইতে পারিব। আমরা পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম, গাইড প্রভৃতি উল্লারীতে আহার শেষ করিয়া পরে আসিবে স্থির হইল।

উল্লারী পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য উত্তর হইতে দক্ষিণে। আমরা পর্ব্বতের দক্ষিণ প্রান্তে শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছি। পর্ব্বতটীর ক্রমোচ্চ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে উত্তর প্রান্তে সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসিতে হইবে।

উল্লারী পর্ব্বতের নৈসর্গিক শোভা বড়ই মনোরম—

"স্নিগ্ধশ্যামাঃ কচিদপরতো ভীষণা ভোগরুক্ষাঃ
"স্থানে স্থানে মুখর ককুভো ঝঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম"।

অনাহারে প্রায় সমস্তদিন "চড়াই" করিতে করিতে কবিত্ব অন্তর্হিত হইল। পথশ্রমে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন

প্রসিদ্ধ তীর্থ মুক্তিনাথ অবস্থিত ... ... মুক্তিনাথ তীর্থ বড়ই কঠিন। চির হিমানী মণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে এই তীর্থ। প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া অতি অল্প যাত্রীই এই তীর্থে আসিয়া থাকে।'

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫, ৩৪৫ পৃঃ)

হইয়া পড়িলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম গতরাত্রে বৃদ্ধা কেন বলিয়াছিলেন যে অদ্য আমরা উল্লারী হইতে অধিকদূর যাইতে পারিব না। আরও কতকদূর অগ্রগমনের পর সম্মুখে পথিপার্শ্বে নানাবর্ণের বস্ত্র খণ্ডে শোভিত বৃক্ষ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম চড়াই শেষ হইয়া আসিয়াছে।

অল্প বিশ্রামান্তে "উৎরাই" আরম্ভ করিলাম এবং অপরাহ্ণ তিনঘটিকার সময় চিত্রা নামক বস্তিতে উপস্থিত হইলাম।

চিত্রা বস্তিতে মাত্র দুইখানা বাড়ী। প্রথম বাড়ী খানি দেখিলাম লোকশূন্য। দ্বিতীয় বাড়ীতেও কর্ত্তা কর্ত্রী অনুপস্থিত, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একজন লোক ও বাড়ীর কয়েকটী বালক বালিকা বাড়ীতে আছে। উপস্থিত লোকটী বলিল যে গৃহস্বামী একজন মগর জাতীয় লোক। সে ও তাহার স্ত্রী তাতপানি গিয়াছে, অদ্য অপরাহ্ণে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। বাড়ীর কর্ত্তার অনুপস্থিতিতেই তাহার ঘরের বারান্দায় আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আজ এত ক্লান্ত হইয়াছি যে আর একপদ অগ্রসর হইবার ক্ষমতাও আমাদের নাই।

বাড়ী খানির সংস্থান বড়ই সুন্দর স্থানে। সম্মুখে অনেক নিম্নে মুক্তিনাথগামী পথ দক্ষিণ হইতে উত্তরে গিয়াছে। পথের পূর্ব্বদিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত অনুচ্চ উষর পর্ব্বত। সর্ব্বশেষে তুষার কিরীটী শৈলশ্রেণী দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

অদ্য সকাল সাড়েছয়টা হইতে বৈকাল তিনটা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া (একঘণ্টা বিশ্রাম করিয়াছিলাম) মাত্র দেড় ক্রোশ (আমাদের দেশের সাড়ে তিন মাইল অপেক্ষা কিছু কম) অতিক্রম করিয়াছি, পথের দুর্গমতা ইহা হইতেই অনুমেয়।

প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময় গাইড ভারিয়া প্রভৃতি আসিয়া পৌছিল। কিছু পরে বিপরীত দিক হইতে গৃহকর্ত্রী ও তাঁহার স্বামী আসিয়া পৌছিল।

গৃহস্থের বাড়ী হইতে একটুকরা "ফার্সী" (মিষ্ট কুমড়া) ক্রয় করা হইল। ব্রহ্মচারীজী তাহাই সিদ্ধ করিয়া খাইলেন। কুমড়ার পরিমাণ এত অল্প ছিল যে তাহাতে আমাদের দুই জনের কিছুই হইত না। ব্রহ্মচারীজী আমাকে ভাত খাইতে পাঁতি দিলেন এবং কলিকাতা হইতে সঙ্গে আনীত চাউলের যাহা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল তাহাই আমার জন্য পাক করিলেন।

অদ্য রাত্রে শীত যেন আমাদের অস্থিভেদ করিয়া মজ্জায় প্রবেশ করিল। যদিও গৃহস্থের গৃহাভ্যন্তরে এবং আমাদের পায়ের নিকট বারান্দায় সমস্ত রাত্র অগ্নি ছিল, তথাপি শীত নিবারিত হয় নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

স্ত্রী-শিক্ষা

সেদিন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভাতে স্থির হইয়া গিয়াছে যে দেশীয় মহিলাগণ কলিকাতা মিউনিসিপালিটির নির্ব্বাচনে যোগদান করিতে পারিবেন এবং করদাত্রীর অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। মহিলাগণ যাহাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারেন তজ্জন্য ইতঃপূর্ব্বে চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সম্প্রতি মহিলাগণ তাঁহাদের যে ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই অধিকার প্রাপ্তিতে একদল লোক যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই দলভুক্ত তাঁহারা মনে করেন যে জাতির এক অর্দ্ধেক অংশকে পশ্চাতে রাখিয়া অপর অর্দ্ধেক অংশ কখনও বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে না এবং যথার্থ জাতীয়

উন্নতি করিতে হইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই তুল্যভাবে উন্নত হইতে হইবে। সেদিন কলিকাতাতে মহিলাদিগকে যে অধিকার দেওয়া হইল, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ইতঃপূর্ব্বে মহিলাদিগকে সেই ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে; সুতরাং এই দুই প্রদেশের মহিলাদের সঙ্গে তুলনাতে আমাদের দেশের মহিলাগণের নাগরিক ব্যাপারে যে নিম্ন স্থান ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্থান হইতে উপরে উঠাইয়া দিয়া ও অপর দুই প্রদেশের মহিলাদের সমকক্ষ করিয়া ব্যবস্থাপক সভা এই প্রদেশের এক কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছেন এবং ইহা আশা করা যাইতে পারে যে কলিকাতার বাহিরে যে সমস্ত মিউনিসিপালিটি, জেলা-বোর্ড বা নির্ব্বাচনপ্রথাতে গঠিত অপরাপর যে সমস্ত সমিতি আছে সেই সমস্ত সমিতিতে নির্ব্বাচনকালে যাহাতে মহিলাগণ তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন সে জন্ম অবিলম্বে চেষ্টা করা হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে মহিলা-দিগকে কেবলমাত্র এই সমস্ত অধিকার দিলেই আমাদের কর্ত্তব্য সাধিত হইবে না। যাহাতে তাঁহারা উপযুক্ত হইয়া এই সমস্ত অধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন সেজন্যও আমাদের যথোচিত চেষ্টা করা উচিত। নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারগুলি অত্যন্ত দায়ীত্ব পূর্ণ। শিক্ষা ব্যতিরেকে দায়ীত্ব বোধ জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষার পথে অনেক অন্তরায় বিদ্যমান। এই সমস্ত বিঘ্ন সত্ত্বেও কি ভাবে আমাদের সমাজে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে তাহার আলোচনাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমাদের প্রদেশে পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন যে প্রকারই থাকুক না কেন ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের সহিত তুলনায় আমাদের প্রদেশে শিক্ষিত হিন্দু মহিলার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বিবাহ ও অবরোধ প্রথাই যে এই অবস্থার প্রধান কারণ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সত্য বটে যে শিক্ষা সমাজের নিম্ন স্তরে সম্যক্‌ভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত যে সমাজের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীভুক্ত সমস্ত পরিবারেই বালকদের শিক্ষার জন্ম সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা হইয়া থাকে। বালিকাদের শিক্ষার জন্ম এইরূপ চেষ্টা করা হয় না এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে শিক্ষার ব্যবস্থা কালে পিতা বা অভিভাবক বালক ও বালিকার মধ্যে যে পার্থক্য প্রদর্শন করেন তাহা পরিবারের ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে অন্তরায়ের সৃজন করে। যাহা হউক ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে উচ্চ ও মধ্য-শ্রেণীর বালিকাদের শিক্ষার জন্ম আজকাল পিতা বা অভিভাবক কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ে সমাজে যত ঔদাসীন্য দেখা যাইত আজকাল তত দেখা যায় না। বালিকা বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ও বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা যে অত্যন্ত আশাপ্রদ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ৮ বৎসর বয়সে কন্যাকে অপরের হস্তে সমর্পন করিয়া গৌরীদানের ফল লাভের কামনা যদিও আজকাল অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকে তথাপি সাধারণতঃ ১৩।১৪ বৎসর বয়সেই বালিকাদের বিবাহ হয়। এই বিবাহের সঙ্গেই নিয়মিতভাবে লেখাপড়ার বিরতি ঘটিয়া থাকে এবং ১৩.১৪ বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইলেও ১২ বৎসরের বেশী বয়সে সাধারণতঃ বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে যাইতে দেখা যায় না। কলিকাতাতে ও অন্য দুই এক স্থানের বিদ্যালয়ে যাতায়তের জন্ম যানের ব্যবস্থা থাকাতে অপেক্ষা-কৃত অধিক বয়স্ক বালিকারা সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে যাইতে পারে বটে, কিন্তু এদেশের অধিকাংশ স্থানেই এইরূপ কোনও বন্দোবস্ত নাই সুতরাং ১২ বৎসর বয়সের সঙ্গেই সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের বালিকাদের নিয়মিত ও প্রণালী-বদ্ধ শিক্ষার শেষ হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ১২ বৎসর বয়ক্রমের সময় বালক যতখানি শিক্ষা পাইয়া থাকে বালিকা তাহা পায় না। সুতরাং আজ কাল বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারে সাধারণতঃ বালিকারা ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে কিছু শিক্ষা পাইয়া

থাকে এবং তৎপরে অধিকাংশ স্থানেই তাহাদের শিক্ষার ভার আর কেহ গ্রহণ করেন না। এই সমস্ত বালিকা কালে সন্তানের জননী হন ও গৃহকর্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এইরূপ অবস্থা যে সমাজের ও দেশের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিবাহের পরে আমাদের দেশে যে পর্দ্দার ব্যবস্থা আছে প্রধানতঃ সেই হেতু আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা উপযুক্ত ভাবে প্রসারিত হইতেছে না। সময়ের ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে এই অবরোধ প্রথা ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে কিন্তু এই প্রথা ভবিষ্যতে কখনও সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের সমাজ হইতে তিরোহিত হইবে কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং যদি কখনও এই প্রথা বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সমাজ হইতে দূরে সরিয়া যায় তাহা হইলেও এই দূরাপসারণ যে কতকাল পরে সংঘটিত হইতে পারে তাহা কল্পনাতীত। সুতরাং কি প্রণালী অবলম্বন করিলে অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও আমাদের দেশের মহিলাগণ এবম্বিধ শিক্ষা পাইতে পারেন যাহাতে তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহ সম্যক্ বিকশিত হইতে পারে এবং তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সময় উপনীত হইয়াছে।

আমাদের দেশে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার প্রচলন হয় তজ্জন্য কতিপয় সম্মিলনী অনেকদিন হইল কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এই সমস্ত সম্মিলনী স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারকল্পে বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তীর্ণা মহিলাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় যে এই সমস্ত সম্মিলনী যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল দেশের ও সমাজের তদানীন্তন অবস্থা বিবেচনাতে পূর্ব্ববর্ণিত কার্য্যপ্রণালী যথার্থরূপেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে নিরক্ষর অবস্থাতে বিবাহিতা অনেক ভদ্র-মহিলা এই সমস্ত সম্মিলনী দ্বারা উৎসাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে লেখা পড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে সম্মিলনীগুলির স্থাপনের উদ্দেশ্য এখন অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছে অর্থাৎ ভদ্র হিন্দু পরিবারে নিরক্ষর স্ত্রীলোকের সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং যাহাতে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য অনেক স্থানে চেষ্টা হইতেছে। কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ, ও পুরস্কার বিতরণ দ্বারা যথার্থ শিক্ষার প্রচলন হইতে পারে না। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সমস্ত ছোট বড় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহারা যতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ না করিবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কার বিতরণ ব্যতীত এই সম্মিলনীগুলি আর কিছুই করিতে পারেন না। শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থবলের ও লোকবলের আবশ্যক কোনও সম্মিলনীরই বোধ হয় তাহা নাই। বেতন দিয়া শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এই সমস্ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে হইলে যত অর্থের প্রয়োজন তত অর্থ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে, এবং অবরোধপ্রথাও অনেক স্থলে অপরিচিত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীদ্বারা মৌখিক শিক্ষা দানের পথে অন্তরায় আনয়ন করিবে। সুতরাং অন্য কোনও উপায়ে এই অতি আবশ্যক কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

কলেজের ছাত্রাবস্থা হইতে আমি নিজে এক সম্মিলনীর সহিত যুক্ত আছি। কলেজে পাঠকালে বন্ধু-বান্ধবের সহিত স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইত এবং আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা বিবেচনাতে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় পত্রব্যবহার প্রণালী (Correspondence system) অবলম্বন করিলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আমরা অনেক পরিমাণে সফল মনোরথ হইতে পারি। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই আলোচনা

হইয়াছিল কিন্তু সেই সময়ে আমি তাঁহার সহিত এক মত হইতে পারি নাই, কারণ পত্রব্যবহার করিতে হইলে যে পরিমাণ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন সে সময়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ বিবাহিতা মহিলার তাহাও ছিল না। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং যে পরিমাণ শিক্ষা থাকিলে পত্রব্যবহার দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন সম্ভবপর সে পরিমাণ শিক্ষা আমাদের প্রদেশের অনেক অন্তঃপুরবাসিনীর এখন আছে এবং অনেকে বিবাহিতা হইয়াও লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে অভিলাষিণী হন, কিন্তু ইচ্ছা সত্বেও উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারেন না। এই সমস্ত মহিলার মধ্যে শিক্ষা প্রচলনের জন্ম যদি পত্রব্যবহার প্রণালীর সহায়তা গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান এই উভয়েরই বন্দোবস্ত হইতে পারে এবং স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে আমরা অনেক পরিমাণে সফল মনোরথ হইতে পারি। যে সমস্ত সমিতি অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের শিক্ষাদানে ব্যাপৃত আছেন বা স্ত্রীশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে এই পত্রব্যবহার প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে কি না তাহা তাঁহাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। এই প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইলে লোকবল ও অর্থবলের দরকার কিন্তু শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে হইলে যত অর্থের আবশ্যক এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে তত অর্থের প্রয়োজন হইবে না। বিশেষতঃ প্রথমেই সমস্ত বিষয়ের শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করার আবশ্যকতা নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা, ইতিহাস প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় সন্তানের জননীর ও দেশহিতৈষিণীর জানা প্রথম কর্ত্তব্য, সেই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান প্রথমে আরম্ভ করা যাইতে পারে এবং এই ভাবে আরব্ধ কার্য্যপ্রণালী যতই সফল হইবে কার্য্যের প্রসার ক্রমশঃ তত বিস্তৃতিলাভ করিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

অপূর্ণ

(উপন্যাস)

বিংশ পরিচ্ছেদ

পুরাতন বন্ধু সম্মিলন।

বৈশাখের অপরাহ্ণ। অতুলকৃষ্ণ অন্তঃপুরে বসিয়া জলযোগ করিতেছেন, সম্মুখে বসিয়া সরস্বতী দেবী পাখা করিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধ ভৃত্য সনম আসিয়া সংবাদ দিল—"কে একজন বাবু এসে আপনার খোঁজ করছেন। বল্লেন, বাবুকে এখনি পাঠিয়ে দাও। বলগে গিরিশ বাবু এসেছেন।"

আহার বন্ধ করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত অতুলকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিশ? কোন গিরিশ? কি রকম চেহারা বল দেখি?"

সনম বলিল, "আমি আর কিছুতে জিজ্ঞাসা করিনি তিনিও বলেন নি। খুব জোয়ান চেহারা, দাড়ী আছে। সঙ্গে করে একটা কুকুর এনেছেন।"

"কুকুর সঙ্গে আছে ত? তবে ঠিক গিরিশ বটে! ঠিক বিশ বছর পরে এসেছে।"

বলিয়া জলযোগ এক প্রকার অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

পত্নীর ঈষৎ অনুযোগের সুর কাণে পৌছিতে না

পৌঁছিতেই অতুলকৃষ্ণ হাত মুখ ধুইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

বৈঠকখানার বারান্দায় একটি দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ প্রৌঢ় ভদ্রলোক পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন এমন সময় অতুলকৃষ্ণ ব্যস্তভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগন্তুক পদশব্দে চকিত হইয়া অতুলকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র "অতুল" বলিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। অতুলকৃষ্ণও 'গিরিশ' বলিয়া সেই দিকে গেলেন।

দুই বন্ধু আপনাদের বয়স স্থান কাল ভুলিয়া পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

তারপর দুইজনের অফুরন্ত কথা। সে যেন নির্ঝরের মত। তাহার কলনাদ আর জলোচ্ছ্বাস যেন ফুরায় না।

দুইজন সিটিকলেজে একসঙ্গে দুইবৎসর পড়িয়াছিলেন। যৌবনের প্রথম উন্মেষে কোন্ মুহূর্ত্তে যে সেই দুটি যুবকের হৃদয়ে বন্ধুত্বের শতদল প্রথম বিকসিত হইয়াছিল, এই দীর্ঘ বিশ বৎসরের অদর্শনেও হৃদয়ের মধ্যে তাহা তেমনি অম্লান রহিয়াছে।

বি-এ পাশের পর অতুলকৃষ্ণ কলেজপাঠ সাঙ্গ করিয়া দেশে আসিয়া পৈতৃক জমিদারীতে মনোনিবেশ করিলেন। গিরিশচন্দ্রের তখন ইঞ্জিনীয়ারিং শিখিবার আগ্রহ জন্মিল। পঠদ্দশাতেই অতুলকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল। সহসা বিবাহ করিয়া ফেলা গিরিশের মত নহে। সেজন্য গিরিশ অনেক আপত্তি করিয়া তবে বন্ধুর বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তাহার বৎসর দুই পরে গিরিশের বিবাহের সম্বন্ধ হয়। বিবাহের ভয়ে গিরিশ ঠিক করিয়াছিল যে সে ইঞ্জিনীয়ারিং ফেলিয়া আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিবে। শেষে অতুলকৃষ্ণের কথায় সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিয়াছিল। সেই সময়ে দুই বন্ধুতে কথা হইয়াছিল যে তাঁহাদের পুত্র ও কন্যা হইলে পরস্পরের সহিত বিবাহ দেওয়া যাইবে।

তারপর ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি সরকারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু উপরিওয়ালারা মনস্তুষ্টি করিতে না পারায় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বনিবনাও হইল না। শেষে একদিন উৎপাত সহিতে না পারিয়া চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে গিয়া বসিলেন। কিছুদিন পরে গিরিশের পিতার মৃত্যু হইল। মাতার মৃত্যু পূর্ব্বেই হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুখ ফুটিয়া পৃথক হইবার কথা না বলিতে পারিয়া তিনি তাঁহার সহিত এমন খুটনাটি আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, গিরিশ শেষে বিরক্ত হইয়া বাড়ী ঘর বিষয় আশয় পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে একেবারে ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে এক একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ারকে কার্য্যে সন্তুষ্ট করিয়া কন্ট্রাক্টারি আরম্ভ করিয়া অর্থ ও সুনাম ও ক্রমে গুটী কয়েক কন্যা লাভ করেন। বড় মেয়েটীর বয়স যখন ১৪ বৎসরে গিয়া পড়িল, তখন মেয়ের বিবাহের জন্য তিনি তিন মাসের ছুটী লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া প্রথমেই দেখা করিতে আসিয়াছেন বন্ধু অতুলকৃষ্ণের সহিত। অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিল কর্ত্তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু আসিয়াছেন। খুব ঘটা করিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করা হইল। গিরিশ নিজহস্তে তাঁহার প্রিয় কুকুরটীকে খাওয়াইয়া তাহার পর বন্ধুর সহিত আহারে বসিলেন।

দুই বন্ধু রাত্রে এক শয্যায় শয়ন করিলেন। অনেক কথার পর গিরিশ অতুলকৃষ্ণের কাঁধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতুল, মনে আছে? মত বদ্‌লায় নি তো?"

অতুলকৃষ্ণের মনেও সেই বিবাহের প্রতিজ্ঞা বন্ধুকে দেখিবামাত্র জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গিরিশ কথাটা তোলেন নাই বলিয়া তিনিও সাহস করিয়া তুলিতে পারেন নাই। এতক্ষণ পরে বন্ধুর মুখে কথাটা শুনিবামাত্র সোৎসাহে বলিলেন, "খুব মনে আছে। সে মত কি বদ্‌লায়?"

গিরিশ। সুরলতার বয়স এখন ১৫ বৎসর। এখন কেমন হয়েছে একবার দেখবে?

অতুল। উঁহু। তোমার মেয়ে এই এই যথেষ্ট। অশোকের বয়স কুড়ি একুশ। আসতে লিখব?

গিরিশ। কিছু দরকার নেই। সুরো দেখতে অবিকল তার মায়ের মত হয়েছে এখন।

অতুল। অশোকের ভাগ্য প্রসন্ন। সে হচ্ছে ঠিক আমার মত।

গিরিশ। মেয়েটীর ভাগ্য।

তাহার পর দুই বন্ধু হাতে হাত দিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

তারপর গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় আড়াই মাস পরেই বর্ম্মা রওনা হতে হবে। কবে বিয়ে দেবে?"

অতুলকৃষ্ণ কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই কহিলেন, "তোমার যেদিন ইচ্ছা।"

তারপর দুই বন্ধু সেই পুরাতন দিনের কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যোগমায়ার মৃত্যু।

"অনু, জানালাটা খুলে দেতো মা; আর একটু বাতাস আসুক।"

অনুপ্রভা মাসীমার কথা শুনিয়া উচ্ছলিত রোদন সম্বরণ করিতে করিতে জানালা খুলিয়া দিল।

অশোক শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়িমা, কি কষ্ট হচ্ছে এখন?"

যোগমায়ার মুখ দিয়া সহসা উত্তর বাহির হইল না একটু চেষ্টা করিয়া কিসের আবেগ দমন করিয়া লইলেন। পরে অনুপ্রভা ও অশোকের দিকে চাহিয়া অতিমৃদু স্বরে বলিলেন, "কষ্ট সবই ত কমে আসছে, আসবেও। শুধু অনুর কথা ভেবে সোয়াস্তি পাচ্ছিনে।"

যোগমায়া হঠাৎ এতদিন পরে স্বামীপুত্রের সহিত মিলনের পথ ধরিয়াছেন। তিনি একদিন সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন। অনুপ্রভা অশোকের মাকে সংবাদ দিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এক সপ্তাহ যোগমায়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার কবিরাজ লক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছেন, উহা একজাতীয় থাইসিস্ যাহাতে সপ্তাহমধ্যেই মৃত্যু হইতে পারে। উহার কার্য্য ভিতরে ভিতরে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ একদিন প্রকাশলাভ করে। মাতার নিকট সংবাদ পাইয়া গত কল্য অশোক কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে।

এই দুই দিন ও দুই রাত্রি অশোক ও অনুপ্রভা একত্র রহিয়া যোগমায়াকে শুশ্রূষা করিয়াছে ও প্রতিক্ষণ আশঙ্কা করিয়াছে এখনি বুঝি এই ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু, সীতার মত সাধ্বী ও দুঃখভাগিনী, ঈশ্বরে নির্ভরশীলা নারীর ইহজীবন সমাপ্ত হইয়া যায়। আজ সমস্ত রাত্রি অভিভূতার মত থাকিয়া, রাত্রি তৃতীয় সময় যোগমায়া উক্ত কথা কয়টা কহিলেন।

যোগমায়া কি ভাবিয়া এই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও শান্তি পাইতেছেন না, তাহা কিছু কিছু বুঝিলেও, সম্পূর্ণরূপে জানিবার জন্য অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়িমা, কি ভেবে আপনি সোয়াস্তি পাচ্ছেন না আমাকে বলুন।"

যোগমায়া ইঙ্গিতে অশোককে আরও কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি তো আর বাঁচব অশোক! কিন্তু মেয়েটার কি হবে বাবা? আমি ভাবতাম মরণ যখন আসবে তখন কোন আপশোষ হইবে না। কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যোগমায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বলিতে যেটুকু বাকি ছিল, চোখে যে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল সেই অশ্রুবর্ষণে তাহা সম্পূর্ণ হইল।

অশোক যোগমায়াকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, "খুড়িমা, আপনি এখন ও চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে সত্যি করে বলছি, অনুর জন্য আপনি কিছু ভাববেন না। আজ থেকে ওর সব ভার আমার।"

শয্যার এক পার্শ্বে অনুপ্রভা বসিয়া ছিল। অশোকের কথা শেষ হইবামাত্র কি ভাবিয়া তাহার কণ্ঠমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

যোগমায়া অশোকের ভরসার কথা শুনিয়া ও অনুপ্রভার আনত মুখের পানে চাহিয়া উৎফুল্ল ও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "বাবা অশোক, মরবার সময় আজ

আমাকে যে কি আনন্দ দিলি তা আর তোকে কি বলব! তুই যখন ওর ভার নিলি, ওর আর ভাবনা নেই—আমি নিশ্চিন্ত। তোর পায়ে যে ওর ঠাঁই হবে এ আমি ভাবতেও পারি নি। আশীর্ব্বাদ করি ও যেন সর্ব্বাংশে তোর যোগ্য হয়।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে অশোকের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে এমন কি কথা বলিয়া ফেলিল যাহাতে যোগমায়া স্থির করিয়া লইলেন যে সে অনুপ্রভাকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল? অনুপ্রভার লজ্জানত আরক্ত মুখ দেখিয়া অশোক বুঝিল, সেও কথাটা ওই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে।

একবার অশোক বলিতে চাহিল,—খুড়িমা আমি অনুকে নিজে বিবাহ করিব এমন কথা ত বলি নাই, তাহার ভাল একটি বিবাহ দিবার, অবিবাহিত অবস্থায় উহাকে রক্ষা করিবার ভার আমার এই কথাই আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম।—কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শায়িতা যোগমায়ার অবসন্ন ও পাণ্ডুর মুখে ঐ কথার ভ্রান্ত অর্থে যে শান্তি ও নিশ্চিন্ততার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং অনুপ্রভার লজ্জারক্ত মুখে যে আনন্দের আভাস জাগিয়াছিল, তাহা একটা সত্যের আঘাতে চূর্ণ করিতে গিয়া তাহাকে থামিয়া পড়িতে হইল। হয়ত এই রাত্রিটার পরেই যে বক্ষ স্তব্ধ হইয়া যাইবে, তাহাতে মৃত্যুর অধিক আঘাত দিয়া ফল কি? আর অনুপ্রভার সম্মুখে এই অসঙ্গত কথাটা বলা কি নিতান্তই বর্ব্বরতা হইবে না?

অশোক নতমুখে যখন এই কথাগুলি ভাবিতেছিল, যোগমায়া ভাবিলেন বিবাহের কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অশোক ঈষৎ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দের আতিশয্যে যোগমায়ার দুর্ব্বল বক্ষ বার বার স্পন্দিত হইতেছিল। অনুপ্রভাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া তাঁহার ডান হাতখানি দুজনের মাথায় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে হাতখানি লুটাইয়া পড়িল। অশোক ও অনুপ্রভা দুইজনে "কি হ'ল" বলিয়া যোগমায়ার মুখের পানে ঝুঁকিয়া পড়িল। অশোক যোগমায়াকে ডাকিতে গিয়া দেখিল এতদিন পরে তিনি স্বামী ও পুত্র শোকের বেদনা এবং আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের নির্য্যাতন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন।

বিদ্যুতের মত এই কথাটা অশোকের মনের মধ্যে খেলিয়া গেল—যে কথাটার আশ্বাসবাণী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ইনি সংসার হইতে চলিয়া গেলেন তাহার কি হইবে? তখন অনুপ্রভা যোগমায়ার সদ্যোমৃত দেহের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কহিল,—"মাসীমা আমার কি হবে?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বাল্য প্রতিজ্ঞা।

শরৎ অশোকের অতি নিকটতম বন্ধু, তাই শরতের মায়ের মৃত্যুর পর অশোকের মাতা সরস্বতী দেবী নিজে যাইয়া শোকাতুরা অনুপ্রভাকে আপনার বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন এবং তিন দিন পরে শাস্ত্রানুমোদিত তাহার চতুর্থীর শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিয়া দিলেন।

যোগমায়ার মৃত্যুর এক দিবস পরেই অশোককে চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইয়াছিল। যোগমায়ার মৃত্যুশয্যায় তাহাকে প্রকারান্তরে যে প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল, তাহার পরিণাম যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া সে কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই।

যেদিন চতুর্থীর শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, সেইদিন অতুলকৃষ্ণ বাহির হইতে একখানা চিঠি লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীর সহিত অনুপ্রভাকে মলিন মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অতুলকৃষ্ণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "তুমি কিছু সঙ্কোচ কোরো না মা। এ তোমার নিজের বাড়ী মনে করে থেকো।"

তার পর পত্নীকে বলিলেন, "দেখ, গিরিশ চিঠি লিখেছে যে আষাঢ়ের প্রথমেই সে বিবাহ দিয়ে ফেলতে চায়, কারণ তাকে আষাঢ়ের শেষেই বর্ম্মা রওনা হতে হবে। অশোক জ্যেষ্ঠ ছেলে বলে জ্যৈষ্ঠ মাসে

তোমরা ত বিবাহ দিতে চাও নি। তাহলে এই আষাঢ় মাসেই ঠিক বলে লিখে দেওয়া যাক্‌?

গৃহিণী। শুধু অনুমোদনসূচক একবার ঘাড় নাড়িলেন। স্বামীর ইচ্ছা হইতে যে তাঁহার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিতে পারে ইহা তিনি কখনও সম্ভব মনে করিতেন না।

তখন দুইজনে অশোকের বিবাহ, ভাবী বধূ ও গিরিশ সম্বন্ধে অনেক কথাই হইল।

অনুপ্রভা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে অশোকদের বাড়ীতে যখন আসিয়াছিল, তখন সে মাতৃসমা মাসীমার বিয়োগদুঃখের মধ্যেও এই আনন্দটুকু পাইয়াছিল যে, যিনি স্নেহচক্ষে অনুকম্পা ভরে তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারই সমীপে আজ সে চলিয়াছে।

মাসীমার কাছে আসিয়া অবধি সে অশোককে দেখিয়া আসিতেছে। অশোকের অন্যায়-অসহিষ্ণুতা, তাহার ন্যায়নিষ্ঠা, মাসীমার প্রতি তাহার ভক্তি ও মাসীমাকে সেবা করিতে তাহার প্রাণপণ চেষ্টা—এ সমস্ত দেখিয়া অশোকের প্রতি তাহার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। কিন্তু সেই যে মাসীমার মৃত্যুশয্যায় তাহাকে অশোকের কাছে বসাইয়া তাহাদের দুইজনের ভবিষ্যমিলনের কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, তাহার পর হইতে সবই যেন প্রথম অরুণোদয়ের রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সেই ক্ষণে তাহার সেই নবোদ্ভিন্ন হৃদয় যে অশোকের চরণে প্রণত হইয়া পড়িয়াছিল এখনও পর্য্যন্ত সে হৃদয় সেই ভাবেই রহিয়াছে। এবং সেই প্রিয়দর্শন উদার যুবক স্নেহভরে তাহাকে হৃদয়ের কাছে যে তুলিয়া ধরিবে তাহাতে আর অনুপ্রভার কোনও সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু আজ এইখানে বসিয়া সস্নেহ সান্ত্বনার অব্যবহিত পরেই সে এ কি কথা শুনিল? তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে! কৈ তিনি তো মাসীমাকে এসম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। সে কি, মাসীমা দুঃখ পাইবেন বলিয়া? তাহা হইলে আমার সম্মুখে তিনি ও কথাটা অমন করিয়া কেন বলিলেন?

লজ্জায় অনুপ্রভার মুখখানি মলিন হইয়া উঠিল। তবে সে এখানে কিসের জোরে আর থাকিবে?

এমন সময় সরস্বতী স্বামীকে বলিলেন, "তাহলে অশোককে একটা খবর দাও সে একবার আসুক। সে তো কিছু জানে না।"

অতুলকৃষ্ণ মৃদুস্বরে হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার যখন বিবাহ হয়, তার দুদিন আগে তো আমি খবর পেয়েছিলেম, তাতে কি আর কোন ক্ষতি হয়েছিল?"

সরস্বতী বলিলেন, "আমাদের সময় তো প্রায় কেটে গেল। এখন এরা সব নতুন, এদের নিয়মও নতুন হবে।"

একটু গম্ভীর হইয়া অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি কি মনে কর অশোককে আগে থাক্‌তে না বল্লে সে কোন আপত্তি করতে পারে?"

সরস্বতী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না, তা কেন করবে? সে তেমন ছেলে নয়। তবে খবরটা দেওয়া ভাল তাই বলছিলাম।"

অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "আচ্ছা তাকে আসছে রবিবারে বাড়ী আসতে লিখি।"

গৃহিণী মনে মনে কিন্তু একটা আশঙ্কা করিতেছিলেন। পুত্রের মনে যে একটা ভাবান্তর ঘটিয়াছে তাহা স্বামী না বুঝিলেও তিনি জানিয়াছিলেন এবং সে আশঙ্কার স্থান যে কোথায় তাহাও তাঁহার বুঝিতে বাকী ছিল না। অনুপ্রভা এখানে আসিবার পর অশোক যে একটা দিন বাড়ী ছিল, তাহার মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে অশোক নিকটে আসিলেই অনুপ্রভার মুখভাবে বেশ একটু পরিবর্ত্তন হইতেছিল। এবং মাসখানেক হইতে পুত্রের যে ভাবান্তর কিছু ঘটিয়াছিল ইহাও তিনি অনুমান করিয়াছিলেন।

আজ অনুপ্রভাকে দেখিয়া তাঁহার একটিবার মনে হইয়াছিল—এমন একটি পুত্রবধূ পাইলে বেশ হয়। প্রায় একই সময়ে গিরিশের কন্যার সহিত সম্বন্ধ ও অনুপ্রভার কথা মনে হওয়ায় তাঁহার মন একটু বিরস হইয়া পড়িয়া

ছিল। একটা শঙ্কাও জাগিতেছিল শেষটা কি ইহার সহিত একটা অমঙ্গলের উৎপত্তি ঘটিবে?

ইহার পরদিন সন্ধ্যাকালে অনুপ্রভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া সরস্বতীকে বলিল, "মা, আমাকে একবার কাকাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।"

প্রশ্নের মধ্যে একটা দুঃখ ও হতাশার সুরে চমকিত হইয়া সরস্বতী বলিলেন, "কেন মা, তোমার এখানে কষ্ট হচ্চে?"

অনুপ্রভা বলিল, "মা গেলেন, মাসীর কাছে এলাম। মাসীমাও চলে গেলেন! এবার আর কার কাছে যাব?"—বলিতে বলিতে অনুপ্রভা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সরস্বতী দেবীর মনে হইল অশোকের বিবাহের সম্বন্ধের সহিত এই যাওয়ায় বোধ হয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাঁহার মনে হইল যদি এই নম্র কার্য্যকুশল শান্ত সুন্দর বাপ মা হারা মেয়েটিকে ছেলেটির জন্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহা হইল আজ তাঁহার আর কোন ক্ষোভ রহিত না। আগে এ ব্যাপার হইলে তিনি স্বামীকে বলিয়া এবিষয়ে তাঁহার মত করাইতে পারিতেন, কিন্তু স্বামীর বন্ধু ও পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা মাঝখানে আসিয়া পড়াতে সে ভরসা ত আর নাই।

অনুপ্রভাকে কোলের কাছে টানিয়া অতি স্নেহভরে গৃহিণী কহিলেন, "কেন মা আমাকে পর ভাবছ? আমার কাছে থাক মা। আমার তো মেয়ে নেই, তোমায় আমি মেয়ের মত করে রাখব।"

ইহার উত্তরে সে ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া কহিল, "না মা আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে এসময়ে একবার সেখানে পাঠিয়ে দিন।"

সরস্বতী আর কিছু কহিতে পারিলেন না। শুধু দুঃখে তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রবিবারে অশোক বাড়ী ফিরিয়া যখন পিতার বন্ধু-কন্সার সহিত তাহার বিবাহের কথা শুনিল, তখন তাহার মাথায় একেবারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অনুপ্রভাকে সে যে বিবাহ করিবে এ সংকল্প সে তখনও করিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাকে বিবাহ না করিয়া অপর একজনকে বিবাহ করিতে হইবে ইহার জন্তও অশোক প্রস্তুত ছিল না।

অনুপ্রভা একথা শুনিয়া কি ভাবিয়াছে ইহাও সে একবার ভাবিল। কিন্তু অনুপ্রভাকে বা বাড়ীর আর কাহাকেও একথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। অপরাহ্নে অতুলকৃষ্ণ অশোককে ডাকিয়া বলিলেন, "মেয়েটি একবার তার কাকাদের কাছে যাওয়ার জন্যে বড় ঝুঁকেছে। বড় শোক পেয়েছে, একবার আপনার লোক-দের কাছে গেলে মন কিছু ভাল হবে। কাল সকালের ট্রেণে তুমি ওকে গয়ায় রেখে, আবার কলকাতায় ফিরো। সোমবারে বাড়ী আসবে, বিশেষ দরকার। আমার ছেলে-বেলাকার বন্ধু গিরিশ তোমাকে ঐদিন আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন।"

অনুপ্রভা আপনা হইতে সেই কাকাদের কাছে যাইতে চাহিয়াছে, যেখানে যাইবার জন্য কয়দিন আগেও তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না, ইহাতে অশোক অনু-প্রভার হৃদয়ের খানিকটা অংশ যেন দেখিতে পাইল। খুড়ীমার মৃত্যুশয্যায় সেই কথাগুলি যে বালিকা হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়াছিল তাহা বুঝা গেল।

সন্ধ্যাকালে পিতা বহির্ব্বাটিতে এবং মাতা গৃহকর্ম্মে যাইলে অশোক অনুপ্রভাকে একাকী পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অনু তোমার এখানে কষ্ট হচ্চে?" অনুপ্রভা মুখ না তুলিয়াই মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

অশোক পুনরায় প্রশ্ন করিল, "তবে কেন এখান থেকে চলে যেতে চাচ্চ?"

ইহার উত্তরে অনুপ্রভা সহসা কিছু বলিতে পারিল না।

অশোক তখন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বল তাহলে, কেন চলে যাবে?"

অনুপ্রভা ধীরে ধীরে বলিল, "এখন ত কাকারাই আমার অভিভাবক। নইলে আর কোথায় যাব? এখন না গেলে শেষে তাঁরা আরও অসন্তুষ্ট হবেন।"

অনুপ্রভার আর থাকিবার স্থান নাই তাই সে চলিয়া যাইতেছে, এ কথাটা অশোকের মনে বড়ই আঘাত করিল। একটু কাতর হইয়া বলিল, "আমাদের এখানে কেন থাকবে না? আমরা যে কত আনন্দে তোমার ভার নিয়েছি।"

একটা ক্রন্দনের বেগ অতি কষ্টে দমন করিয়া অনুপ্রভা কহিল, "আপনার যে আমার ভার নেবার আর সুবিধে হবে না। আপনার পায়ে পড়ি, আমার ভারের জন্যে আপনি আর ভাববেন না। আমায় শুধু দয়া করে সেখানে একটিবার পৌঁছে দিন।"

—বলিয়া আর সে আপনাকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া, মুখে আঁচল দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

অশোক তাহাকে আর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সে যে সেই রাত্রের কথাগুলি এমন দৃঢ় ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহা তো অশোক কল্পনা করিতে পারে নাই।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রাত্রে অশোক মাকে সকলের অসাক্ষাতে যোগমায়ার মৃত্যুশয্যাসংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া, এখন তাহার কি করা কর্ত্তব্য এবং তাহার পিতা সে কথা জানিতে পারিলে কি ভাবিবেন ইত্যাদি সমস্ত কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। ইহাতে তাহার নিজের কতখানি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা তাহা কিছুই না বলিয়া শুধু মায়ের কাছে কোনও একটা উপায় শুনিবার জন্য চাহিয়া রহিল। কিন্তু প্রিয় পুত্রের কাতর ও সলজ্জ মুখের পানে চাহিয়া তাহার অকথিত বাণী মাতার অগোচর রহিল না। তাহাকে একটা মুখের কথায় ভরসা দিবারও উপায় না পাইয়া মায়ের প্রাণ বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। সস্নেহে পুত্রের বিষণ্ণ মুখমণ্ডলের স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "দিন কতক আগে কেন বলিসনি বাবা? এখন যে উনি বন্ধুকে একরকম কথাই দিয়েছেন।"

নিতান্ত হতাশ হইয়া পুত্র কহিল, "তবে মা কোন উপায় নেই? তুমি বল্লেও হবে না?"

পুত্রের সেই হতাশার স্বর তীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্রের মত মায়ের বুকে বিঁধিল। কষ্টে তিনি বলিলেন, "তিনি যে কথা দেন তা তো কিছুতে নড়চড় করেন না তাতো জানিস বাবা! আর তুই যে কথা বলেছিলি তা তো ওভেবে বলিসনি—তোর পাপ হবে না। তুই বলেছিলি যে তুই ভার নিবি, তা সে তো তোর হয়ে আমরা নিতে বাধ্য রয়েছি। আপনার মেয়ের মত যত্নে আমরা মেয়েটিকে পাত্রস্থ করবো।"

"কিন্তু ও যে প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছিল। আমি ত খুড়িমাকে ঐ রকম বুঝতে অবসর দিয়েছিলাম।"

অশোক নিজের প্রকৃত মনের কথাটা বুঝাইয়া বলিতে পারিল না।

মা বলিলেন, "তুই যে শরতের মাকে সব কথা পরিস্কার করে বল্‌তে পারিস্ নি, সে তো তিনি পাছে বেশী দুঃখ পান এই বলে। মেয়েটি যখন যেতে চাইছে, তখন তুই এক মাসের জন্যে ওকে কাকাদের কাছে রেখে আয়। তারা তেমন ভাল লোক নয় শুনেছি। তা হ'ক, তাঁদের তুই বলে আয় যে মেয়েটির দরুণ মাসে দশ টাকা করে পাঠাবি, আর বিয়ের সব খরচ তাও করবি। তাঁরা যেন এঁকে ভার মনে না করেন। তাহলে বোধ হয় এর কোন অসুবিধা হবে না। তার পর একমাস পর কাষ মিটলে মেয়েটিকে নিয়ে এসে সৎপাত্রে দিস্, তা হলেই হবে। মেয়েটি সৎ পাত্রে পড়ে সুখী হোক, তোরও যেন মনে তার জন্যে কোন আপশোষ না থাকে।"

মায়ের কথার ভিতর এমন একটি স্নেহ ও কর্ত্তব্য মিলনের ইঙ্গিত ছিল যাহা বুঝিয়া পুত্রের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। ভক্তিভরে মার পায়ে মাথা রাখিয়া অশোক বলিল, "মা তোমার কথামত যেন আমি চলতে পারি। আমার জন্যে কেউ যেন কোন কষ্ট না পান।"

কত কথা কত আশঙ্কাই আজ তাহার মনে উদয় হইতেছিল। আর বেশী কিছু না বলিয়া, সে পরদিন প্রভাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য-সাধনার আদর্শ

বীরভূম জেলার সাহিত্য সেবকগণকে একত্র সম্মিলিত হইবার এই সুযোগের যাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি ও প্রার্থনা করি, আমাদের এই মিলন যেন একটি বাহ্য ও সাময়িক ব্যাপারে নিঃশেষিত না হয় এবং এই বার্ষিক সম্মেলনী যেন একটি হুজগ্-মাত্রে পর্য্যবসিত না হয়। আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে সত্যরূপে চিনিতে এবং হৃদয়ে হৃদয়ে একটি ভাব-গত যোগসূত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টান্বিত হই।

মানুষ মানুষের সহিত মিলিবে ও মিত্রতা করিবে—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের উপলক্ষ্য নানারূপ। একবর্ণের লোক, একব্যবসায়ের লোক, এক প্রকারের সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বার্থ-সম্পন্ন লোক—নিজেদের মধ্যে, প্রীতির অনুশীলন জন্য, বা সমবেতভাবে স্বার্থরক্ষার জন্য একত্র হইয়া থাকে। এই সব সম্মেলনে, প্রীতির অনুশীলন অপেক্ষা, সমবেতভাবে স্বার্থরক্ষায় চেষ্টা অধিকতর প্রবল। কিন্তু আমাদের এই যে মিলন, ইহার উপলক্ষ্য, সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা এখানে, যাঁহারা একত্র হইয়াছি, সকলেই বাঙ্গলা-সাহিত্যের অনুশীলন করিতে ভালবাসি। অনেকেই কিছু কিছু লেখেন, বা লিখিয়াছেন, বা লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন—আর সকলেই ইচ্ছা করি যে, বাঙ্গলাভাষার যে উন্নতিমুখী গতি, সেই গতির সহিত সংস্পৃষ্ট রহিয়া, নিজের ও স্বদেশের কল্যাণ সাধন করি।

ইহাই আমাদের সকলের সাধারণ ভাব। এই সাধারণ ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া, আমরা সকলেই মিলিত হইয়াছি। মিলনের যত প্রকার উপলক্ষ্য হইতে পারে, এই উপলক্ষ্যটি সর্ব্বাপেক্ষা উদার ও সাত্ত্বিক। আমরা যদি ধর্ম্মের নামে একত্র হইতাম, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে নানারূপ সঙ্কোচ থাকিত—অর্থাৎ, আমাদের সভা, হিন্দুসভা হইলে, মুসলমানকে ভ্রাতার ন্যায় বুকে টানিয়া লইতে পারিতাম না—বৈষ্ণব-সভা হইলে, শাক্তকে তেমন করিয়া আপনার করিবার সুযোগ পাইতাম না—আবার, ব্রাহ্মণ-সভা হইলে কায়স্থকে এবং কায়স্থ-সভা হইলে ব্রাহ্মণকে, হয়ত আপনার করিতে পারিতাম না। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে, এ সব বালাই নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে দলাদলি আছে, কারণ উহা পার্থিব স্থূল স্বার্থের সহিত জড়িত। কিন্তু সাহিত্যের ভূমি, মহা মিলনের ভূমি। আবার, এই সাহিত্যের মিলন-মন্দিরে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, সমাজতত্ত্ববিৎ, রাজনীতিবিৎ, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা,—সকলেরই অধিকার আছে। সুতরাং আমাদের এই মিলন স্থায়িত্ব লাভ করুক—ভগবানের কৃপায় ইহা সফল হউক, আমরা প্রত্যেকেই, সাহিত্যের মিলনভূমির এই অতুলনীয় গৌরব উপলব্ধি করিয়া, দেশের আপামর সাধারণকে ইহা বুঝাইতে সমর্থ হই ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

একটি খরস্রোতা, বিপুলকায়া, আবর্ত্ত ও কল্লোলময়ী নদী, প্রচণ্ডবেগে তরঙ্গ তুলিয়া যেমন সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যায়, মানবজাতির মানস নদীও সেইরূপ, কালের বুকে বহিয়া যাইতেছে—ইহাই বিশ্ব মানবের সাহিত্য-সাধনা। কবে কোথায় এই নদীর জন্ম, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন—তবে, নির্দ্দেশ করার চেষ্টায় আনন্দ আছে, লাভও আছে। কোথায় বা এই নদীর পরিণতি, কোন মহাসিন্ধুর বুকে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য এই নদী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাই বা কে বলিবে? কিন্তু সেই মহা-সিন্ধুর কল্পনায় আনন্দ আছে, লাভও আছে। ইহাই মানব জাতির সাহিত্য-সাধনা।

নদীর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। মানবের মানস-ক্ষেত্র উর্ব্বর হয়—সন্তপ্ত-হৃদয় শীতল হয়, মানবাত্মার পিপাসা নিবারিত হয়। সাহিত্যের গতি, নদীরই গতির মত। নানাদেশ—নানাভাষা—নানাসাহিত্য। কিন্তু বাহিরের ভেদ থাকিলেও, ভিতরে মহা মিলন। এখন-

কার দিনে, বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত পরিচিত না হইলে, প্রকৃত সাহিত্যিক হওয়া যায় না, গভীররূপে সাহিত্যের আস্বাদনও করা যায় না। বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে, আমাদের ভারতীয় সাহিত্য—তাহার ভিতর বঙ্গসাহিত্য।

বিগত দেড়শত বৎসর মধ্যে, এই বঙ্গ-সাহিত্য এক অভিনব পুষ্টি, গভীরতা ও গতিশীলতা লাভ করিয়াছে। ইহার বৈচিত্র্যও, প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী জাতির উন্নতিমুখী সাধনা, বাঙ্গালী জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা এই সাহিত্যে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। আমরা বাঙ্গালী—শরীরের দ্বারা, বাঙ্গলা দেশে জন্মিয়া বাঙ্গালী হইয়াছি। কিন্তু মনের দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা বাঙ্গালী হইতে হইলে, সাহিত্যের অনুশীলন করা আবশ্যক। কারণ, আমাদের দেশের মানস-জীবন, এই সাহিত্যের মধ্যেই বিম্বিত ও স্পন্দিত। দেশীয় সাহিত্যের আলোচনার ইহাই হেতু।

আমরা প্রত্যেক যেমন, এই সাহিত্য-সাধনায় যোগদান করিয়া, ইহার সহিত মিলিয়া, দিনের পর দিন অগ্রসর হইব, তেমনি নিজের সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে, সাহিত্য-প্রচারক হইয়া, আমাদের চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, এই প্রবাহের সহিত অগ্রসর হইতে সাহায্য করিব। সাহিত্যের জন্য এইটুকু করিতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই বাধ্য।

সাহিত্য-সৃষ্টি অবশ্য সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে এবং গ্রন্থ রচনা করিয়া তাড়াতাড়ি তাহা জন-সমাজে প্রচার করা ভাল কাযও নহে। অনধিকারচর্চ্চা, সকল ক্ষেত্রেই পাপ। আত্মজ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি। আমি কতটুকু জানি, যাহা জানি বা জানি বলিয়া মনে করি, তাহার কতটুকুই বা আমার নিজের, আর কতটুকুই বা ধারকরা পোষাকী জিনিষ, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ইহাই অন্তর্দৃষ্টি। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই অন্তর্দৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের শিখিবার বিষয় যতখানি, লিখিবার বা বলিবার বিষয় ততখানি নাই। এই সুলভ ছাপাখানার দিনে, এই লিখিবার বা বই ছাপাইবার প্রলোভনের একটা বিকট উন্মাদনা, চারিদিকেই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা প্রকৃত স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে।

আমরা, বীরভূমের এই মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক একত্র হইয়া, স্থানে স্থানে পাঠাগার ও বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যদি জেলার মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিতে পারি, তাহা হইলেই, আমাদের এই মিলন সফল হইবে। আর যদি, সাহিত্যের যাহা সুবৃহৎ আদর্শ, তাহার সহিত সকলের যাহাতে পরিচয় হয়, তাহার কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যে যে ব্যাধি দেখা দিয়াছে, সেই ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা-দেশে, কোন জেলাই এই আবশ্যক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। আসুন, আমরা চিন্তা করিয়া দেখি, ইহা সম্ভব কি না।

বার বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে যখন সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমগ্র বাঙ্গলা দেশের নিকট একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার স্বাধীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার এই প্রস্তাব। এ কথা বেশ জোরের সহিত বলিতে পারা যায় যে, বীরভূম হইতে এই প্রস্তাব, দেশকে একদিন গ্রহণ করিতেই হইবে। গত বার বৎসরে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ সহরে, আমাদের জীবন ও সাধনা কেন্দ্রীভূত হওয়া হিতকর নহে—বরং বিশেষরূপে অহিতকর। ইহা সম্ভবতঃ আপনারা চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছেন। পেটেন্ট ঔষধ যেমন বিজ্ঞাপনের দ্বারা দেশের মধ্যে কাটতি হয়, কলিকাতা হইতে সেইরূপ অনেক জিনিষ, বিজ্ঞাপনের দ্বারা চলিয়া যায়। খবরের কাগজ এই বিজ্ঞাপনের বাহন। খবরের কাগজে কোন্‌টি বিজ্ঞাপন আর কোনটি সম্পাদকীয় মন্তব্য, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

মানুষ মানুষকে ঠকাইবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এই উপায়গুলি প্রধানতঃ বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানী করা হইয়াছে। বিদেশী মাল, কলিকাতার ন্যায় সহর হইতেই গ্রামে আসিয়া থাকে। কলিকাতা হইতে সাহিত্য, যদি গ্রামের দিকে

আসে, তাহা হইলে ঐ মালের সহিত, আমাদের বিবিধরূপ বিড়ম্বনাও আসিবে—একথা দেশের সকলেই বোঝেন। কিন্তু, এই কথা অনুসারে কায হয় না। তাহার কারণ, আমাদের দেশে মফঃস্বলে সকল বিভাগেই, কতকগুলি দালালশ্রেণীর লোক আছে। কলিকাতার ব্যবসায়িগণকে সাহায্য করিয়া, অনায়াসে নিজের নিজের উন্নতি করাই, এই দালালদিগের ব্যবসায়। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এইরূপ দালাল আছে। তাহারা নিজেরা সাহিত্য রসিক নহে—তাহাদের প্রভাবে নিকটবর্ত্তী লোকেরা প্রভাবান্বিত হয় না—তাহারা যে বিশেষ লেখাপড়া জানে বা অতি সাধারণ লোক অপেক্ষা কোন বিষয়ে উচ্চ, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। অথচ, খবরের কাগজে দেখিতে পাই, তাহারা কৃতবিদ্য ও যশস্বী। এই শ্রেণীর লোক, মফঃস্বলে বসিয়া, বড় বড় ব্যাপার লইয়া ব্যবসায় করে। তাহারা যদি সাহিত্যসেবা করে, তাহা হইলে দেশের মধ্যে সাহিত্য প্রচার হউক, সে জন্য চেষ্টা করে না, কোন প্রকারে কিছু টাকা কড়ি তুলিয়া, একটা হুজুক করিয়া, কলিকাতা হইতে কতকগুলি লোক আনিয়া একটি আড়ম্বরের দ্বারা দেশের লোকের চক্ষে ধূলি দিতে চায়। ইহাতে ঐ দালালদিগের লাভ হয়—তাহারা ঐ উপলক্ষ্যে কতকগুলি নামজাদা লোকের সহিত পরিচিত হয়, খবরের কাগজে তাহাদের নাম জাহির হয়—এই প্রকারের একটা ফাঁকি, আমাদের দেশে চলিতেছে।

বড় বড় সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল—বহরমপুরে হইয়াছে, বর্দ্ধমানে হইয়াছে—সম্প্রতি মেদিনীপুরে হইয়া গেল। আপনারা কেহ ঐ সব স্থানে যাইয়া, নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন, বারইয়ারী আমোদ ছাড়া, ঐ সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা, কিছুই লাভ হয় নাই। অতিশয় ক্ষুদ্রচিত্ত লোক, নামের কাঙ্গাল, প্রশংসার জন্য লালায়িত, এতই তরল যে, নিজকে চাপিয়া চলিতে জানে না—তাহারা আসিয়া বড় বড় সাহিত্যসম্মেলনে অযথা বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াছে—ইহাই ত দেশের অবস্থা!

এই কারণে মফঃস্বলের লোকের উচিত, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা। কলিকাতার সহিত বিরোধ করিতে বলি না। কিন্তু সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি ব্যাপারে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, বহু বহু বড় লোকের নামের জয়পতাকা উড়াইয়া যে সমুদয় আন্দোলন হয়, তাহা ছাড়া প্রকৃত কায খুব কমই হইয়া থাকে। খবরের কাগজে মিথ্যাকথা প্রচার করা হয়—কতকগুলি চতুর ও অযোগ্য লোক, ঐ সকল প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সহায়তায়, নিজেরা প্রতিষ্ঠালাভ করে। স্বরূপে নগণ্য হইয়াও, বিজ্ঞাপনের ডঙ্কানিনাদে গণ্যমান্য হইয়া উঠে।

এই সমুদয় কারণে, বীরভূম সাহিত্য-পরিষৎ মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার স্বাধীনকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে মফঃস্বলে কায করিবে কে? সেরূপ স্বাধীনচিন্তা দেশে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। কোনরূপে যে চৌদ্দ অক্ষর মিল করিতে পারে, সে কলিকাতার সাহিত্যিক মণ্ডলে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য, মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিতেছে। যাহার সে শক্তি নাই, সে লোক ভাড়া করিয়া, সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশোলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতা দোকানদেরে সহর—নালন্দা বা নবদ্বীপ নহে। সেখানকার জলবায়ুর গুণেই মানুষ ব্যবসাদার হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই সব লোকের আনুকূল্যে মেকী চালাইয়া লওয়া বেশী কঠিন কায নহে। এই প্রকারের ফাঁকীও সাহিত্য-রাজ্যে চলিতেছে! সাহিত্যের আন্দোলন করিয়া মফঃস্বল হইতে যদি এই ফাঁকি ও ব্যবসাদারী নিবারণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থাপনের কোনই প্রয়োজন নাই।

আপনারা জানেন বীরভূম সাহিত্য পরিষৎ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা হইতে চাহে নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখা সভার নিয়মাবলীতে লিখিত আছে যে, মফঃস্বলে সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপিত

হইতে পারিবে। আমরা নিয়মাবলীর এই ভাষা সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতেছি যে—'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সফল করিতে হইলে, মফঃস্বলে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত ভাবে আবশ্যক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন।' আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, দেশের মনোযোগ ও সামর্থ্য কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—সুতরাং কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ তাহা বলেন না। তাঁহারা বলেন—'আমরা কলিকাতায় যখন সভা করিয়াছি তখন বাঙ্গলা সাহিত্যের আমরাই নিয়ামক; তোমরা মফঃস্বলের লোক,—আমরা দয়া করিয়া তোমাদিগকে অধিকার দিতেছি—তোমরাও সাহিত্য পরিষৎ কর। অবশ্য, আমাদের অধীন হইয়া থাকিবে—আমাদের কথা শুনিয়া চলিবে—এবং আমাদিগকে খাজনা দিবে।' ইহা যে একটা অত্যাচার! জানিনা, দেশের লোক, ইহারা বিপক্ষে কেন কিছু বলেন না!

সাহিত্য পরিষদের উচিত ছিল, নিয়মিত ভাবে সাহিত্য প্রচারক পাঠাইয়া মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থাপন করা। গাছ যেমন নিজের রস ও প্রাণ-শক্তি দিয়া প্রথমাবস্থায় শাখা বিস্তার করে, চিরদিন সেই শাখাকে রস যোগায় এবং নিজের প্রাণশক্তির দ্বারা ধারণ করে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে সেইরূপ শাখা বিস্তার করিতে হইত। শাখা অবশ্য, বাহিরের আলো ও অঙ্গারক বাষ্প দিয়া বৃক্ষের পুষ্টিসাধনে অবহেলা করিত না। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাহা করেন নাই। মফঃস্বলে স্বাধীনচিন্তা জাগরিত হইলেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায়, অনেক প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনকেই হয়ত, সংশোধিত বা নিঃশেষিত হইতে হইবে। আজিকার সম্মেলনে, আপনারা এই বিষয়টি চিন্তা করুন।

আজকাল আত্মনির্দ্ধারণ বলিয়া একটা খুব বড় কথা বিদ্বৎ সমাজে জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক মহা-জাতি বা Raceকে আত্মনির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার নিজস্ব সভ্যতার ও সাধনার বিশিষ্টতাটুকু বজায় রাখিয়া অন্যান্য মহাজাতির সহিত আদান প্রদানের মধ্যে পুষ্টিলাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক মহাজাতির পক্ষে যাহা সত্য, প্রত্যেক ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষেও তাহা সত্য। আমাদের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকেও নিজের বিশিষ্টতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এতদিন সে বিষয়ে আমরা মনোযোগী হই নাই। আমাদের রচনা-রীতি ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সকল রচনা-রীতি চলিতেছে, তাহা আমাদের বিশিষ্টতার কতখানি পরিচায়ক তাহা বলা যায় না।

আত্মনির্দ্ধারণ

বর্ত্তমান বাঙ্গলায়, অনেক সুপ্রসিদ্ধ লেখকের লেখা, ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকে একেবারেই বুঝিতে পারে না। অথচ লেখক ও তাঁহার ভক্তেরা মনে করেন এবং প্রচারও করেন যে, ইহা সুবোধ্য "কথ্য" ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভাল ইংরাজী জানা লোক ছাড়া সে ভাষা কেহই বুঝিতে পারে না। ইহা কি একটি বিসদৃশ ব্যাপার নহে? দেশের জনসাধারণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পায় নাই। তাহারা ঠিক কিরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, গ্রামে বাসিয়া, গ্রাম্যলোকের সহিত মিশিয়া ইহা যদি নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত সাধারণ জনশ্রেণীর যে বিষম ব্যবধান ঘটিয়াছে, তাহা দূর করিতে পারা যায়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই কঠিন সাধন-পথ পড়িয়া রহিয়াছে। মফঃস্বল হইতে, এই সাধনা আরব্ধ হওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির (Race) সাহিত্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রত্যেক জাতির অনুভব করিবার, চিন্তা করিবার এবং সেই অনুভূতি ও চিন্তা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিবার পদ্ধতি জাতির বৈশিষ্ট্য ঠিক একরূপ নহে। একটি বাক্যে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া, কে কোথায় বসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, বক্তার মনে কোনটির চিন্তা বেশী জোরে সর্ব্বপ্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধরিতে পারা

অনুভবপদ্ধতি

যায়। যেমন, আমি ভাল করিয়া দেখিয়াছি—এই একটি বাক্য। আবার নাট্যসাহিত্যে (in dramatic mood) বলা হইল—দেখেছি গো দেখেছি বেশ ভাল করে দেখেছি আমি নিজে দেখেছি। এই দুই প্রকারের বাক্য প্রয়োগের পশ্চাতে বক্তার হৃদয়ের বৃত্তির ক্রিয়ার বিশেষরূপ পার্থক্য রহিয়াছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে কোন জাতির চিত্ত, ক্রিয়াকেই প্রধান রূপে দেখে, আবার কোন জাতির চিত্ত স্বভাবতঃ কর্ত্তাকে প্রধানরূপে দেখে। কোনও জাতির ভাবনিষ্ঠতা (subjectivism) অধিক, কোনও জাতির বস্তুনিষ্ঠতা (objectivism) বেশী। জাতীয় প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য নানাবিধ কারণ-সমবায়ে গড়িয়া উঠে। সেই সমুদয় কারণের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই প্রকারের বৈশিষ্ট্য যে আছে, তাহা সাহিত্যের আলোচনায় বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখা দরকার। বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে ঐ বৈশিষ্ট্যের পরিচয়লাভ একান্ত আবশ্যক।

ভারতবর্ষে উহা একান্ত ভাবে আবশ্যক কেন, তাহা আলোচনার বিষয়। ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের ভারতবর্ষের যে কোনও সাহিত্যের তুলনা করুন। অবশ্য সাহিত্যের আলোচনা, সমগ্র জাতির জীবনেরই আলোচনা। ইংরাজ জাতির বা ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস আমরা যতদূর জানি, তাহাতে দেখিতে পাই

ইংরাজী সাহিত্য বনাম ভারতীয় সাহিত্য

ইংরাজ ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। নানাদেশের নানা জাতি, তাহাদের সাহিত্য ধর্ম্ম ও আচার লইয়া ইংলণ্ডে আসিয়াছে, যুদ্ধ করিয়াছে এবং ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাহার পর ভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান ও শোণিত সংমিশ্রণের দ্বারা একটি জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। রোমান্, কেল্ট, ডেন, এংগেল, নরম্যান, ফরাসী প্রভৃতি এই প্রকারে সংমিশ্রিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের সাহিত্যও ঠিক তাহাই। এই গঠন কার্য্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার পর ইংরাজের সম্প্রসারণ আরম্ভ হইল। এই সম্প্রসারণে ইংরাজের জাতীয় জীবন ও সাহিত্য পৃথিবীর অতীতের ও বর্ত্তমানের, নিকটবর্ত্তী ও সুদূরবর্ত্তী যাবতীয় জাতির সাধনা ও চিন্তাদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। গ্রীস, রোম, মিসর, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, ব্যাবিলন ও চীন প্রভৃতি অতীতের সুসভ্য জাতিসমূহ ব্যতীত, ফিজি প্রভৃতি অসভ্য দেশও এই সম্প্রসারণে সহায়তা করিয়াছে। ইংরাজ জাতির এই যে ইতিহাসের ধারা, এই ধারার মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে আসিয়া ইংরাজকে দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইয়াছিল কিছু হারাইয়া ফেলিয়াছি, অতএব আর অগ্রবর্ত্তী না হইয়া সেই হারানিধির অন্বেষণ করা প্রথম প্রয়োজন। এ প্রকার আন্দোলন যে ইংরাজী সাহিত্যে নাই তাহা বলিতেছি না; কিন্তু এই প্রকারের আন্দোলন কখনও প্রয়োজনও হয় নাই, স্থায়িত্ব লাভও করে নাই।

এইবার আমাদের সমস্যা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা অর্থাৎ পূর্ব্ব দেশের যাবতীয় প্রাচীন জাতিরা যাহারা এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছি এবং আত্মপ্রকৃতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আবার গৌরব শিখরে আরোহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, সেই সমুদয় জাতির বর্ত্তমান সময়ের প্রধান চিন্তাই এই যে, আমরা একটা বড় জিনিষ হারাইয়াছি—সেই হারানিধি সর্ব্বাগ্রে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামাজিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের ইহাই প্রথম কথা। পূর্ব্বদেশগুলি কিছু কাল, পশ্চিমের তাড়নায় বাহিত হইয়াছে ইহা সত্য কথা। স্ব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও কিয়ৎ পরিমাণে হারাইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন এই সমুদয় দেশ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আত্মনির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্যে এই চেষ্টা আবশ্যক। আমরা ইংরাজী লেখাপড়া বেশ ভাল রূপে শিখিয়া মাতৃভাষার অনুশীলন করিতেছি। ইংরাজী শব্দ ও বর্ণনা প্রণালী প্রভৃতি আমাদের ভিতর অতিরিক্ত পরিমাণে রহিয়াছে। বিনা চেষ্টায় সেই সমুদয় জিনিষ বাঙ্গলা

হারানিধির অন্বেষণ

হরফে ও বাঙ্গলা কথায় বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু হরফ ও কথা বাঙ্গলা হইলেই তাহার প্রাণটা যে বাঙ্গলা তাহা নহে। এখন সাহিত্যে বাঙ্গলার যাহা প্রাণ তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই আত্ম-নির্ণয় উন্নতিমুখী গতির বিরোধী নহে—ঐকান্তিক স্থিতিশীলতাও নহে। গতি চাই, অগ্রবর্ত্তিতা চাই, পুষ্টি চাই, সমগ্র বহির্জ্জগৎকে আয়ত্ত করিয়া আত্মসাৎ করা চাই। কিন্তু প্রাণশক্তির জোর না থাকিলে এই সমুদয় ব্যাপারগুলি একটি অসম্ভব বিড়ম্বনায় পরিণত হইবে। সুতরাং আমাদের বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে একান্ত ভাবে আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে এই বৈশিষ্ট্য অবধারণ করিয়া হারানিধির অন্বেষণ করিতে হইবে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সাধন করিতে হইলে মফঃস্বলেই করিতে হইবে।

রচনা-রীতি

রচনারীতি বা style যে কত বড় জিনিষ তাহা আমরা এখনও বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করি না। সম্প্রতি গত মাঘ ও ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী' পত্রে "রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গ-সাহিত্য" প্রবন্ধে এবং আমার 'সাগর-সুধা' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এ বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রবন্ধগুলিতে যাহা বলিয়াছি তাহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন নাই। আপনারা দয়া করিয়া যদি এ বিষয়ে আলোচনা করেন তাহা হইলে আমরা বিশেষরূপ উপকৃত ও বাধিত হইব।

এই প্রকার রচনা-রীতি নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্যটী বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ আবশ্যক। আত্মনির্দ্ধারণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গলা দেশের বা বাঙ্গলা ভাষার আত্মনির্দ্ধারণ যেরূপ আবশ্যক, তেমনি বাঙ্গলা-দেশের এক একটি বিভাগেরও আত্মনির্দ্ধারণ প্রয়োজন।

বিভাগীয় আত্ম-নির্দ্ধারণ

বীরভূমে যখন সাহিত্য-পরিষৎ হয়, তখন আর একটি কথা খুব জোরে বলা হইয়াছিল, বোধ হয় আপনাদের কাহারও কাহারও স্মরণ থাকিতে পারে। এই বীরভূম জেলার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ছোটনাগপুরের লৌহ ও প্রস্তরময় ভূখণ্ড এবং গঙ্গার অধিত্যকা এই দুই প্রকারের ভূমি এই বীরভূমে সম্মিলিত হইয়াছে। আর্য্য সভ্যতার সম্প্রসারণের দিক হইতে দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গলা দেশে আর্য্য সভ্যতার সম্প্রসারণে, বীরভূমই আদি কেন্দ্র। হণ্টার সাহেবও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

বীরভূমের আত্মনির্দ্ধারণ

বাঙ্গলা ভাষার আদি কবিগণ বীরভূমের লোক। বীরভূমি তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সাধনার আদি লীলাস্থল। রাঢ়ের সভ্যতা এই বীরভূম হইতেই তাহার বিশিষ্ট মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই বীরভূমের আত্মনির্দ্ধারণ প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক বিভাগের আত্মনির্দ্ধারণ প্রয়োজন। ইহা অবশ্য সাধনসাপেক্ষ এবং অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য এবং হয়ত এই কার্য্যের একটা চরম মীমাংসা নাই। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা বীরভূম সাহিত্য পরিষদ হইতে এই কার্য্যের কথা বহুবার বহুভাবে বলিয়াছি, আপনাদের তাহাও স্মরণ থাকিতে পারে।

বাঙ্গলা দেশের সমুদয় স্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি যদি কেহ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে এক এক অংশের প্রকৃতি-গত বিশিষ্টতা তাঁহার মানসপটে জাগিয়া উঠিবে। আত্ম-নির্দ্ধারণের জন্য এই প্রকারের পর্য্যবেক্ষণ অত্যন্ত আবশ্যক। পূর্ব্ববঙ্গের নদীপ্রধান স্থানের গ্রামসমূহ, আর বীরভূম জেলার গ্রামসমূহ এক রকমের নহে। ভিন্ন জাতির মধ্যে সম্বন্ধও একরূপ নহে। এমন কি পল্লীবাসীর গ্রাম্য সঙ্গীতের সুরও পৃথক; পোষাক পরিচ্ছদের ত কথাই নাই। এই সবগুলি বেশ প্রণিধান করিয়া দেখিবার বিষয়। পর্য্যবেক্ষণ সাহিত্য সাধনায় অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু সে বিষয়ে আমরা অধিক অগ্রসর হই নাই।

আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনী সংবাদ দেখিয়া বঞ্চিত হইবেন না। বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য জেলায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি কার্য্য হয় বা

হইতেছে, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের উপায়ও আমাদের আছে। আপনারা ভাবিবেন না যে, বীরভূম হইতে বর্ত্তমান যুগে, সাহিত্য ক্ষেত্রে কোনও কায হয় না। প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি বীরভূম হইতে যত সংগৃহীত হইয়াছে, বাঁকুড়া ছাড়া অন্য কোনও জেলা হইতে তত হয় নাই। আমাদের রতন লাইব্রেরীতে, ন্যূনাধিক চারি সহস্র হস্ত-লিখিত প্রাচীন বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এই পুঁথির বিবরণ-মূলক বিস্তৃত সূচিপত্র একখণ্ড ছাপাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অনেকে বলেন—পুথিগুলি তাড়াতাড়ি ছাপাইয়া ফেলা আবশ্যক। আমরা ছাপাইবার পক্ষপাতী, কিন্তু তাড়াতাড়ি করিবার পক্ষপাতী নহি। এত প্রাচীন পুঁথি রহিয়াছে—কিন্তু তাহা পড়েই বা কে, এবং পড়িতে চায়ই বা কে? আমরা মনে করি সাহিত্যক্ষেত্রে মানুষ প্রস্তুত করা প্রধান কার্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বহু অর্থব্যয় করিয়া, বহু প্রাচীন গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন—সেগুলির দ্বারা উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমুদয় গ্রন্থ-প্রচারে, আর্থিক হিসাবে সাহিত্য-পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। প্রাচীন গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের লোকের এই সমুদয় গ্রন্থ আস্বাদন করিবার শক্তিও যদি বাড়িয়া উঠিত, এই সমুদয় গ্রন্থের অনুশীলনের আবশ্যকতা যদি দেশের লোক বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে, এই সমুদয় গ্রন্থ প্রচারে, আর্থিক হিসাবে ক্ষতি হইবে কেন? অবশ্য এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যাহা অল্প লোকেই পড়িবার অধিকারী। সে সমুদয় গ্রন্থ প্রচারে আর্থিক ক্ষতি স্বাভাবিক। কিন্তু সমুদয় গ্রন্থ সম্বন্ধে ইহা সত্য নহে। আমাদের এই গ্রন্থগুলি, আশা করি অচিরেই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, এই সমুদয় গ্রন্থের প্রতি, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যাহাতে অনুরাগ জন্মে, সেজন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। আমি আশা করি, এই সম্মেলনের দ্বারা ক্রমশঃ অনুরাগ বাড়িয়া যাইবে। তখন এই সমস্ত গ্রন্থ প্রচার অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। সমুদয় কার্য্যই ভিতর হইতে, বা ভাবের দিক্ হইতে হওয়া আবশ্যক। আমরা সাহিত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি যে জীবনের উন্নতির একটি অবশ্যম্ভাবী ফল, সে কথা অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। আমাদের সাহিত্যিক জীবনের উন্নতি হউক—আমাদের মানস-জীবন সম্প্রসারিত হউক—উন্নততর চিন্তারাজ্যে প্রবেশলাভ করিয়া, আমরা প্রকৃত আত্মোন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করি—ইহাই আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত। নতুবা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যবসায়-বুদ্ধি ও নানারূপ কৃত্রিম চাতুরী প্রবেশ করিয়া দেশের উপকার না করিয়া, অপকার করিবে।

আমাদের কার্য্য
প্রাচীন পুথি

বীরভূম সাহিত্য পরিষৎ সম্বন্ধে যাহা বলিবার, সংক্ষেপে তাহা বলিলাম। এখন, আধুনিক নাগরিক সাহিত্য বা ঔপন্যাসিক সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিতে চাই।

যাঁহারা বর্ত্তমান সাময়িক সাহিত্যের বাদানুবাদের সহিত পরিচিত, তাঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন যে, কিছুদিন হইতে আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। নারীচরিত্রই এই বাদানুবাদের বিষয়। বিলাতী স্বাধীন-প্রেম যেদিন হইতে আমাদের সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেইদিন হইতে বাদানুবাদের সৃষ্টি। যাঁহারা কলিকাতা সহরে থাকেন, প্রাচীন সমাজের বিধিব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নূতন রকম করিয়া নিজেদের সমাজ গড়িয়াছেন, অথবা যাঁহারা ঐ প্রকারের নব্য-সমাজের সংসর্গে আসিয়া, ঐ প্রকারের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি লুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা যাহাই বলুন,—আমরা গ্রামের লোক, গ্রাম্য-সমাজ ও গ্রাম্য-জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, আমাদিগকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল যুগে

উপন্যাস

গ্রামের লোকেরাই উচ্চতর চিন্তা করিয়া থাকে। নাগরিক জীবন, উন্নততর ও গভীরতর চিন্তার অনুকূল নহে—বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভারতবর্ষে, তপোবনেই জ্ঞানের জন্ম হইয়াছে, আর সভ্যতা গ্রামকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

আধুনিক উপন্যাসের প্রেমচিত্র সম্বন্ধে আমাদের গ্রাম্য-বুদ্ধিতে যাহা মনে হয়, তাহা নিবেদন করিতেছি। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ, মানব-জীবনে একটি অতি প্রধান ব্যাপার। এই সম্বন্ধের সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়া, মানুষ দেবত্বে আরোহণ করে; আর অপব্যাহার হইলে, মানুষ ক্রমে অসুর, রাক্ষস, পিশাচ ও পশু হইয়া যায়। ভারতবর্ষ এই অভিজ্ঞতা বহুযুগ পূর্ব্বে লাভ করিয়াছে। ইউরোপের জাতি-সমূহ নিতান্তই আধুনিক। তাহারা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে দল বাঁধিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত। গৃহহীন ও অন্নহীন—সুতরাং সুসম্বদ্ধ গার্হস্থ্য-জীবন তাহাদের ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমুদয় চঞ্চলমতি ও জীবিকান্বষণে পশুর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান নরনারীকে, সুসম্বদ্ধ গার্হস্থ্যজীবনে ও সুশৃঙ্খলিত সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক ছিল।

পুরুষের নারীর প্রতি আকর্ষণ হয়—নারীরও পুরুষের প্রতি আকর্ষণ হয়। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। এই আকর্ষণ, নিম্নতম স্তরে সাময়িক সম্ভোগে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; ইহা কোনও স্থায়ী ফল উৎপাদন করেনা। তাহার পর এই সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে স্থায়িত্ব লাভ করে। তখন পুরুষ বা নারীর, সাময়িক দেহগত বা ইন্দ্রিয়গত সুখ সম্ভোগই এই মিলনের ফল বলিয়া মনে হয় না—পুত্রকন্যা প্রতিপালন প্রভৃতি স্থায়ী কার্য্য অবলম্বন করিয়া এই মিলন বা সম্বন্ধ মার্জ্জিত ও দৃঢ়ীভূত হয়। ইংরাজীতে ইহাকে Gradual Idealisation বলে। ক্রমশঃ এমন দিন আসিতে পারে যখন দৈহিক লালসা একেবারেই থাকে না, অথচ, উভয়ের মিলন অতিশয় মধুর ও গভীর হইয়া থাকে। সহধর্ম্মিণীত্ব এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ইংরাজীর Transmutation। আমরা পুরাণাদির সাহায্যে আমাদের ভারতীয় সামাজিক অভিব্যক্তির বিবরণ যদি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, একদিন আমাদের দেশে পৈশাচিক, রাক্ষস, ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল। তখনও আমাদের সমাজ হয়ত সুব্যবস্থিত হয় নাই, অথবা অন্যান্য সমাজকে আত্মসাৎ করিবার জন্য, এই প্রকারের কতকগুলি অব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু, সে বহু বহু অতীতের কথা। এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন প্রজাপতির আদেশেই হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারী, সংযম অভ্যাস করিবে। যে সংযত নহে, সে ভদ্রলোকই নহে, অধিকন্তু সে মানুষই নহে। সংযত পুরুষ ও নারী, পরস্পর মিলিত হইবে; কিন্তু নিজেদের দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখসাধনের জন্য নহে—বংশ রক্ষার জন্য, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার ধারা রক্ষা করিবার জন্য।

ভারতবর্ষ বহুযুগের বহু প্রকারের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, মানব-জীবনের এই চরম ও পরম শিক্ষা পাইয়াছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার হস্তেই বিবাহের ভার থাকিবে, মনোভবের উপর এ ভার থাকিবে না, ইহাই, ভারতবর্ষের সাধনার শেষ কথা। ভারতের ও প্রতীচ্য জগতের ইতিহাস ও সমাজ তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব।

এইবার চিন্তা করুন, আমরা, আমাদের সাহিত্য সাধনায় কোন দিকে অবসর হইব? তরলমতি যুবক যুবতী, যাহারা শৈশব হইতে কোনরূপ সুশিক্ষা পায় নাই তাহারা ইন্দ্রিয়ভোগের যথেচ্ছাচার স্বভাবতঃ ভালবাসে। কিন্তু ইহা, কে ভালবাসে? ভারতবর্ষের শাস্ত্র বলিবেন যিনি প্রকৃত মানুষ, তিনি ইহা ভালবাসিতে পারেন না। মানুষের মধ্যে যে পশু রহিয়াছে, সেই পশু ইহা ভালবাসে। আমরা, আমাদের সাহিত্যদ্বারা, মানবপ্রকৃতির অন্তর্ভূত এই পশুগুলিকেই কি বলবান করিয়া যথেচ্ছাচারের পথে ছাড়িয়া দিব? না, এই গুলিকে শাসন করিয়া, সংযত করিয়া, আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করিয়া, ত্যাগ ও

অহিংসার পথে অগ্রসর হইব ? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই প্রকৃত মীমাংসা রহিয়াছে।

আমাদের দেশে এখন ভোগবাদীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। তাঁহারা বলিবেন—তোমরা ভোগের পথ বন্ধ করিয়া, মনুষ্যকে মারিয়া ফেলিতেছ। সেই কারণেই তোমাদের এই দুর্গতি। এতদিন ভোগবাদীরা নির্ভয়ে একথা বলিতে পারিতেন। কিন্তু, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে,—এই বুদ্ধ চৈতন্যের দেশে, আবার নূতন আদর্শের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই আলোকের বিমল-জ্যোতিঃ, পৃথিবীর অন্যান্য ভোগ-সর্ব্বস্ব দেশেও আজ উপস্থিত। সুতরাং ভারতের এই তপস্যা, বৈরাগ্য ও আত্ম-শক্তির বার্ত্তা নষ্ট হইবার নহে।

ঔপন্যাসিকগণ এই কথা মনে রাখিলেই, সাহিত্যের আবর্জ্জনা দূরীভূত হইবে। কিন্তু দূরীভূত হওয়া কঠিন। কারণ, যাঁহারা গ্রন্থরচনা করেন, তাঁহারা সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা করেন কয়জন ? তাঁহারা নাম চাহেন, অর্থ চাহেন। কাযেই মানবের কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিয়া, তাঁহারা খ্যাতি ও অর্থ অন্বেষণ করেন। ইহাই এখন সাহিত্যের অবস্থা। সুতরাং এই আবর্জ্জনা দূর করা বড়ই কঠিন।

আর এক কথা। এখন সাহিত্যে মূলধনের প্রভাব (Capitalism in Literature) দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। যাহাদের টাকা আছে, তাহারা নিছক্‌ ব্যবসায় করিবার জন্য, ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য, সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। মূলধনীর সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটিয়া লেখকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। বাজে ছবি, বাজে গল্প লিখিয়া সাধারণ তরলমতি পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। ইহারা দেশও জানেনা, সমাজও জানে না, ধর্ম্ম, মানবতা, বা ঈশ্বরও জানেও না—বা মানে না!

সাহিত্যে মূলধনের প্রভাব

কলিকাতা সাহিত্য সাধনার কেন্দ্র হওয়ায়, ও ক্রমে ক্রমে সাহিত্যক্ষেত্রে মূলধনের বিনিয়োগ হওয়ায়, আমাদের এই সর্ব্বনাশ হইল। পূর্ব্বে যাঁহারা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র চালাইয়াছেন, তাঁহারা একটা বিশেষ রকমের আদর্শ বা প্রেরণা লইয়াই এইকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু এখন যে কেহ, পয়সার জোরে কাগজ করিতেছেন। উৎকৃষ্ট লেখকের সংখ্যা বাড়িতেছে না, নবীন লেখকগণকে ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিবার কোন ব্যবস্থা নাই। একেবারে দায়িত্ববুদ্ধিহীন লোক, অর্থের জন্য বা নামের জন্য, সাহিত্যের মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছে!

সাহিত্য ও ধর্ম্ম—ইহার মধ্যে প্রভেদ খুব কম; —প্রভেদ নাই বলিলেই ভাল নয়। যেমন, ধর্ম্মের নামে মঠ মন্দির করিয়া লোক ঠকাইয়া পয়সা রোজগার করা একটা পাপ, সেইরূপ সাহিত্যের নামে, মানুষের কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন বা উত্তেজনা বিধান করিয়া, অর্থ ও খ্যাতি উপার্জ্জন করাও একটি পাপ; এবং এই দ্বিতীয় প্রকারের পাপকেই আমি গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করি। মফঃস্বলে যে সকল সাহিত্য সম্মেলন হইবে, সেখানে সাহিত্যিকগণ শান্তভাবে এই সমস্যার আলোচনা করিবেন—ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

এখন আমি যাহা বলিলাম তাহার সারমর্ম্ম এই—

সাহিত্য সাধনা মানবজীবনের পবিত্রতম সাধনা। ধর্ম্মসাধনার সহিত ইহার প্রভেদ নাই। সুতরাং এই সাহিত্য সাধনাকে উদ্দেশ্য বলিয়াই গ্রহণ করিব অন্য কোন কিছুর উপায় বলিয়া নহে। সাহিত্যসেবীর চরিত্রই প্রথম ও প্রধান জিনিষ। ঋষি জীবনের আদর্শ ভারতবর্ষীয় সাহিত্যসেবী মাত্রেরই পুরোদেশে অবিচলিত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক।

ধর্ম্মরাজ্যে যেমন আত্মশক্তির ভূমিতে দাঁড়াইয়া সাধন পথে চলিতে হইবে, সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনি প্রত্যেক পদক্ষেপে ও প্রত্যেক উদ্যমে আত্মশক্তির ভূমি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সুতরাং একালে যাহাকে ফ্যাশন বলে, অন্ধভাবে তাহার দ্বারা বাহিত হইলে চলিবে না। কলিকাতার লোকে কি বলে, কোন খবরের কাগজ কি বলে, বা নামজাদা লোকে কি বলে এদিকে চাহিলে চলিবে না। Idolaকে সযত্নে পরিহার করিতে হইবে।

আমাদের প্রত্যেকেরই ভিতর গুরুরূপী ভগবান্ অন্তর্য্যামী-রূপে বিরাজমান্। তাঁহার প্রতি চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া সাহিত্য সাধনার অগ্রসর হইতে হইবে। এই আদর্শ নূতন নহে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সাহিত্য-সাধনার এই আদর্শ বহু বহু যুগ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে।

সুতরাং সাহিত্যের ব্যবসাদারী, চাতুরী, কাপট্য ও হুজুগ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যারূপিণী ব্রহ্মময়ী সরস্বতী দেবীর যাঁহারা উপাসক তাঁহাদের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা বাণীর উপাসক, তাঁহাদের গোষ্ঠী যাহাতে বৃদ্ধি লাভ করে সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মফঃস্বলে সাহিত্যানুশীলনের কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া এই শুভকার্য্য সাধন করিতে হইবে।

সাহিত্য সাধনার পথে যাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে চাহেন তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হউন। Lord Macaulay বলিতেন আমি যে লিখি, তাহার কারণ আমার মাথা বোঝাই হইয়া রহিয়াছে, পকেট খালি বলিয়া লিখিনা। ("I write not because my pocket is empty, but because my brain is full.") অতএব যশের জন্য অর্থের জন্য লিখিব না। যিনি সত্য শিব ও সুন্দর তাঁহাকে উপলব্ধি করিব এবং বাহিরে অন্যান্য সকলের হৃদয়ে, মনে ও বাক্যে, তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্যের সাধনা করিব। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রও বহুকাল পূর্ব্বে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষকে জানিতে হইবে—বেশ ভাল করিয়া, ধ্যানযুক্ত হইয়া তাহার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য জানিতে হইবে। এই বহুজাতির মিলনের দিন, বহুপ্রকারের আদর্শ ও সাধনার ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের দিন ভারতবর্ষের সেই সনাতনী বাণী, ধ্যানযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শুনিতে হইবে। নিজেদের বৈশিষ্ট্য যথাযথ রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া অন্ধ হইব না। অন্যান্য দেশ ও অন্যান্য জাতির অতীতে ও বর্ত্তমানে যাহাকিছু স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণপ্রদ, বিচার পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিব ও আয়ত্ত করিব। ইহাই সাহিত্য সেবকের সাধনাদর্শ হইবে।

এই আদর্শ জয়যুক্ত হউক—বিশ্বমানবের উপাস্য পরমদেবতা যিনি শব্দ মূর্ত্তিতে শাস্ত্ররূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া মানবজাতিকে পরিচালনা করিতেছেন, সেই বেদপুরুষ ব্রহ্মণ্যদেব আমাদের সহায় হউন। আমরা সকলে সমবেত ভাবে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতেছি। *

শ্রীশিবরতন মিত্র।

* বিগত ১৩ই ফাল্গুন ১৩২৯ তারিখে, বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে হেতিয়া গ্রামে সভাপতির অভিভাষণরূপে পঠিত।

পল্লীর বসন্তোৎসব

বিজনপুর গ্রামে বসন্ত আসিয়াছে। শীতের কুয়াসা-চ্ছন্ন ধরণীর মলিন বদনে গোলাপের আরক্তবর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। নব প্রস্ফুটিত আম্রমুকুল ও বকুল-সৌরভে অঞ্চল ভরিয়া শ্যামল বনচ্ছায়ায় ফাল্গুন আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। ঘনপল্লবিত অশোক কুঞ্জে পুষ্পিত পলাশ ও শিমুল বৃক্ষশ্রেণীতে বসন্তের আগমন চিহ্ন দেদীপ্যমান; ঘুঘুর কণ্ঠে সুধার উৎস খুলিয়া গিয়াছে। বসন্তের চাটু-কার পাখীটিও নীরবে নাই, কিসলয়-সজ্জিত রক্তিম গাবগাছের শাখায় আপনার কালো শরীর লুকাইয়া ঝঙ্কার তুলিয়াছে—কুহু কুহু কুহু! মৌমাছির গুঞ্জন ধ্বনির বিরাম নাহি, ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে মন মাতানো গুণ গুণ রবে নিভৃত তরুতল মুখরিত। মৃদু

মৃদু পবন স্পর্শে মুকুলিত আম্রমুকুলগুলি ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ধরণীতল একটি স্নিগ্ধ মধুর সুবাসে পরিব্যাপ্ত।

পল্লীর প্রাণস্বরূপিণী উচ্ছ্বাসময়ী ক্ষুদ্র নদীটী এতদিন সুদীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত ছিল, বসন্তের আগমনে অকস্মাৎ তাহার বক্ষে জোয়ার উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে; মৃদুনাদিনী তটিনী দুই পারের তটভূমি সজাগ করিয়া তরঙ্গভঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর তীরে তীরে হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র, বসন্তের ধীর সমীরে আন্দোলিত। পরপারে সীমাহীন বিস্তৃত বালির চর, তাহারই শেষ প্রান্তে বনের শ্যামল কান্তি অস্তমান সূর্য্যের সোণালী আভায় মণ্ডিত। প্রভাতে অতি রমণীয়; নিশার নীহার এখনও বিদায় লয় নাই; নবীন দূর্ব্বাদলে সূত্রচ্ছিন্ন মুক্তার ন্যায় প্রতীয়মান। গাছে গাছে কুল পাকিয়া উঠিয়াছে, প্রভাতের চির পরিচিত হাস্যময় রৌদ্র অঙ্গনে লুটাইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই কুল গাছের নীচে বালক বালিকার ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। তাহাদের উৎসুক দৃষ্টি সদ্য পক্ব কুলের ডালে নিবদ্ধ—সবিরাম রসনায় ধ্বনিত হইতেছে "বুল বুলিরে ভাই,একটা কুল ফেলে দে,বাড়ী চলে যাই।" বুল বুলিদের কুল ঠোকরাইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছিল না। বৃক্ষের সুউচ্চ ডালে বসিয়া বুলবুল দম্পতী তাহাদের পরস্পরকে যাহা বলিবার আছে তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল।

ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরটী নীরব নিস্তব্ধ উন্মাদনা ভরা বাতাসে বড় অলস বড় মন্থর। সর সর করিয়া শুষ্ক পত্র উড়িতেছে। বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে ব্যথিতের চাপা কান্নার অস্ফুট শব্দ হইতেছে। বহু দূরে তরুতল হইতে রাখালের বাঁশীর স্বর শ্রবণে প্রবেশ করিয়া মনটাকে অকারণ ব্যথিত করিয়া তোলে। তরুশাখার নিভৃত নীড়ে পাখীরা বিশ্রাম সুখের মধ্যে এক একবার মৃদুকাকলী করিতেছিল। এই মধুর বসন্তের স্তব্ধ নীরবতায় বিরহীর চিত্তে বিপুল বেদনা ঘনাইয়া আসিতেছিল। দোলের ছুটিতে যাহাদের মিলন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল—তাহাদের "আশায় রয়েছে চারিজন—মন, প্রাণ, নয়ন, শ্রবণ।" যাহাদের মধুর বসন্ত মধুর মিলনে পরিণত হইবার আশা নাই, তাহারা বিরহের অশ্রু নয়নে লুকাইয়া মনে মনে ভাবিতেছিল—

"নয়নের বারি নয়নে রেখেছি
হৃদয়ে রেখেছি জ্বালা,
শুকায়ে গিয়েছে প্রাণের হরষ
শুকায়ে গিয়েছে মালা।"

মধ্যাহ্ন অবসানে অপরাহ্ন আসিল, প্রখর রৌদ্র ম্লান আভা ধারণ করিল। অলস সমীরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। গৃহস্থ বধূ ও চাষী রমণীগণ চুল বাঁধিয়া সিন্দুর পরি়া সঙ্গিনীদের সহিত হাসি গল্পে নিস্তব্ধ পথ মুখর করিয়া কলসী কক্ষে জল আনিতে চলিল। ক্রমে হাস্যময়ী ধরণীর বক্ষে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। দুটী একটী করিয়া নক্ষত্রগুলি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, বেণুবনের মাথার উপর বসন্তের পরিপূর্ণ চন্দ্র উদিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। বৃক্ষ বল্লরী জ্যোৎস্না ধারায় স্নাত হইয়া অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিল। শৃগালেরা সমস্বরে ডাকিয়া সন্ধ্যা ঘোষণা করিল। ঝোপের মধ্য হইতে ঝিল্লি তান ধরিল। ক্ষেতের কায সারিয়া কৃষকেরা গান গাহিতে গাহিতে গৃহে ফিরিল। গভীর রজনীতে বিনিদ্রের কর্ণে কৃষকের ডুগডুগীর সুরের সহিত ভাসিয়া আসিল

লাল যমুনা জল, লাল তমাল তল
লালে লাল আজ প্যারী।

কয়েক দিনের মধ্যেই দোলের উৎসব আরম্ভ হইল। রাধাশ্যামের দোলে বিজনপুরে মহাধুম। গোঁসাই বাড়ীর সম্মুখে দোকানীরা দোলের মেলায় দোকানের জন্য চালা বাঁধা আরম্ভ করিল। এক বছর পর বৃহৎ দোলমঞ্চ সংস্কার করিয়া আবার তাহাকে নূতন করিয়া তোলা হইল। পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাগুলি ঘাটে আসিয়া লাগিল। কোনও নৌকায় বোঝাই হইয়া আসিল মাটীর হাঁড়ি, কলসী, কোনটায় ধামা কুলা, কোনখানিতে বা মনোহারী দ্রব্য। দোলের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় আসিল

নাগরদোলা এবং পিঞ্জরাবদ্ধ চিতা বাঘ। ঝুড়ীভাজা, মুড়ি মুড়কি, ছাঁচ, বাতাসা। ছেলেমহলে আনন্দ ও উদ্দীপনার সীমা রহিল না। প্রতি নৌকার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত তাহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া গোঁসাই বাড়ী দোলের অধিবাস দেখিতে আসিল।

গোঁসাইদের রাধাশ্যাম বড় জাগ্রত দেবতা। বিগ্রহের উপর গ্রামবাসীদের অচলা ভক্তি। ছেলে মেয়েদের সহিত ঠাকুর মা, মা, পিসি মাসীরাও ঘরের কায ফেলিয়া অধিবাস দেখিতে আসিলেন। উচ্চরবে ঢোল বাজিতে লাগিল। ব্যথিতের সুপ্ত বেদনা জাগাইয়া দিয়া বিরহী হৃদয়ে আঘাত করিয়া সানাই তান ধরিল। মণ্ডপের পশ্চাতে অধিবাসের নিমিত্ত খড়ের কুঁড়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণছায়া মিলাইবার সঙ্গেই অধিবাস আরম্ভ হইল। পূজা শেষে কুঁড়ে ঘরে আগুন নিক্ষেপ করিয়া, পুরোহিত ঠাকুর লইয়া প্রস্থান করিলেন। বালকগণ সমবেত হইয়া সেই প্রজ্জ্বলিত কুঁড়েতে ঢিল ছুড়িতে লাগিল। ঢিলগুলি পূর্ব্বেই ঝোপের পাশে সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। কুঁড়ে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবার পর, কুঁড়ের কঞ্চি লইয়া বালকেরা কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল। অধিবাসের অর্দ্ধদগ্ধ কঞ্চি গৃহে রাখিলে মশা ছারপোকার উপদ্রব থাকে না এই বিশ্বাসের জন্য কঞ্চির বড় আদর।

পর দিন প্রভাতে গোঁসাইবাড়ী দোলের সাড়া পরিয়া গেল। পলাশফুলে রঞ্জিত কাপড় পরিয়া বকুলফুলের মালা গলায় দোলাইয়া ছেলেমেয়েরা বাড়ী বাড়ী হইতে পূজার ফুল সংগ্রহ করিয়া সাজি হস্তে গোঁসাই বাড়ী ছুটিল। তাহাদের সরল নেত্রগুলি আশার আবেশে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

একটু বেলা হইলে পূজোপকরণ লইয়া পুরোহিত পূজায় বসিলেন। সন্ধ্যার ন্যায় প্রভাতেও সানাই রাগিণী ধরিল। বাড়ীর মেয়েরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কেহ তুলসী পাতা সাজাইতে বসিলেন, কেহ বা দুর্ব্বা বাছিতে লাগিলেন। ভোগের ঘরে মহাকলরব। আজ গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, অন্যান্য লোকের সংখ্যাও কম নহে। কাযেই আয়োজন বিপুল বেগেই চলিতেছিল। পাড়ার গৃহিণীরা ঝাঁকা ভরিয়া ভরিয়া তরকারী কুটিতেছিল, কলসী ভরিয়া ভরিয়া জল তুলিতেছিল। লাহিড়ীদের বড় বধূর রান্নার খুব খ্যাতি। অতি প্রত্যুষে স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করিয়া ছয়টা উনুন জ্বালাইয়া তিনি ভোগ রাঁধিতেছিলেন। চক্রবর্ত্তীদের দুই বধূ তাঁহার রান্নার যোগাড় দিতেছিল।

কিশোর কিশোরী ও বালক বালিকারা রং আবির লইয়াই ব্যস্ত,—কাযকর্ম্মে হাত দিতে তাহাদের অবসর কম। বড় বড় বালতি ভরিয়া রং গোলা আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই টিনের পিচকারী সংগৃহীত হইয়াছিল। যাহাদের রং কিনিবার পয়সা নাই, তাহারা হাঁড়ি ভরিয়া হলুদচূণ গুলিয়া রঙের অভাব পূরণ করিল। তরুণ তরুণীরা ও বালক বালিকারা, পিতা মাতা ও অন্যান্য পূজনীয়দের পায়ে আবির দিয়া প্রণাম করিল। তাঁহারাও স্নেহাস্পদের মস্তকে ঠাকুরের নিবেদিত আবির দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দাদামহাশয়ের পাকা দাড়ী, দিদিমার সাদা চুল রাঙা হইয়া গেল। সকলের পরণের শুভ্রবস্ত্র রক্তবর্ণ ধারণ করিল। রঙে ও আবিরে মানুষের মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তেই চিত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষক ও কৃষক রমণীর কালো দেহে স্বাস্থ্যপূর্ণ নিটোল মুখে আবির একটী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিল। গৃহে গৃহে হাসি গান পিচকারীর শব্দ, রং আবির লইয়া কাড়াকাড়ির ধুম পড়িয়া গেল। নিস্তব্ধ নিরানন্দ পল্লী কাহার মায়ামন্ত্রে প্রেম আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল।

দ্বিপ্রহরে রাধাশ্যামের ভোগের পর দলে দলে লোক গোঁসাইবাড়ীর দিকে ছুটীল। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত লোকে অঙ্গন ভরিয়া গেল। গ্রামের ব্রাহ্মণ যুবকগণ অনাবৃত গায়ে কোমরে গামছা বাঁধিয়া থালা হস্তে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণে ছেলেমেয়ের হৃদয়-নদীতে চঞ্চলতার তরঙ্গ তুলিয়া মেলার বাজনা বাজিয়া উঠিল। দলে দলে বালক বালিকা রঙীন বসন পরিয়া সাজগোজ করিয়া দাদা ও

ঝি চাকরদের সহিত মেলা দেখিতে চলিল। সকলেরই অঞ্চলে পয়সা বাঁধা, মুখে খেলনা কিনিবার জল্পনা কল্পনা।

সন্ধ্যার পর ফাল্গুনের ভরা জ্যোৎস্না জলে স্থলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী শস্যক্ষেত্র স্বর্ণবর্ণে প্রতিভাত হইল। বনফুলের মিষ্টগন্ধে বাতাস উতলা হইয়া উঠিল। গ্রামের যুবকবৃন্দ হোলির গান গাহিতে গাহিতে রাধাশ্যামের চতুর্দ্দোলা স্কন্ধে লইয়া পল্লী প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। যাঁহাদের বাড়ী ঠাকুর 'গন্তে' যাইবেন, অপরাহ্ণেই তাঁহারা অঙ্গন লেপিয়া আলপনায় চিত্রিত করিয়া ধান দূর্ব্বা আবির ও দুগ্ধ মিষ্টান্ন সজাইয়া রাখিয়া ছিলেন। গোঁসাইবাড়ী হইতে বাহির হইয়া চিরকালের নিয়মানুসারে প্রথমেই রাধাশ্যামকে চৌধুরী বাড়ী আনা হইল। চৌধুরী-গৃহিণী পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রসন্ন স্মিতবদনে ধান দূর্ব্বা ও ঘৃতের প্রদীপ দিয়া ঠাকুরকে বরণ করিলেন। পরে ঠাকুরের পায়ে আবির দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। তরুণী বধূরা শ্বাশুড়ীর অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহারই আদেশ মত বরণ সমাধা করিল। ফল মূল দুগ্ধ মিষ্টান্ন ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দেওয়া হইল। যুবকেরা পরস্পরের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া দুগ্ধ জলপানী ভক্ষণ করিলেন। উচ্চ নিনাদে বাদ্য বাজিতে লাগিল। একালের যুবকেরা সেকালের বৈষ্ণব পদাবলীর পরিবর্ত্তে হোলির গান গাহিলেন

বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
আজ মধু সমীরণে, নিশীথে কুসুম বনে
তাহারে পড়েছে মনে বকুল তলে!

চৌধুরীদের বিধবা সেজবধূ বাতায়নে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে রাধাশ্যামের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। কি একটি অনির্দ্দেশ্যের আকুলতায় তাহার বক্ষ উদ্বেলিত হইল। চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ঠাকুর লইয়া গান গাহিতে গাহিতে যুবকেরা চলিয়া গেলে বাদ্যধ্বনি ও সঙ্গীতের শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল কিন্তু সেজ বৌয়ের অন্তর হইতে সঙ্গীত থামিল না। স্বপ্নশ্রুত বংশীরবের ন্যায় দূর দূরান্ত হইতে তাহার কর্ণে ভাসিয়া আসিতেছিল—

মধুরাতি—পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফিরে না আর যে গেছে চলে।
ছিল তিথি অনুকূল শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

দোলের পরদিন মেটে হোলি। রঙ্গের পরিবর্ত্তে কালী ও মাটি গোলা জলই আজিকার বিশেষত্ব। আচার্য্যদের মাধনা বড় নির্ব্বোধ, প্রতিবছর দোল যাত্রার পর তাহারই মেটে হোলির রাজা সাজিবার পালা। প্রভাতে তাহার রাজবেশের যোগাড় হইতেছিল। যথা সময় মাধনা ধুচনী মাথায় দিয়া, জুতার মালা গলায় পরিয়া সমস্ত গায়ে চুণকালী মাখিয়া অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিল। তাহাকে গাধার পিঠে চড়াইয়া যুবকেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া আনিল।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। ধরণী উত্তপ্ত হইল। একটা দমকা বাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া বেণুবনের শীর্ষ কাঁপাইয়া বহিতে লাগিল। পক্ষিকুল শান্তির নীড়ে ফিরিল। গ্রামের বধূরা স্নান শেষে গৃহে ফিরিয়া গেল। হোলির রাজা ও প্রজা সৈন্য সামন্তবর্গ পাড়া প্রদক্ষিণ করিল। সাঁতারে ডুবে মুহূর্ত্তে নদীর স্বচ্ছ জল ঘোলা হইয়া উঠিল। এবছরের মত বিজনপুরের বসন্তোৎসব সমাপ্ত হইল।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

গোপীভাব *

(গল্প)

আফিসের বাহিরে বড় সাহেবের বুট জুতার মস্ মস্ ধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া সম্পূর্ণরূপেই যখন বাতাসে মিলাইয়া গেল, তখন আফিসের নীরব গৃহ মুখর করিয়া মধুর সুউচ্চ কণ্ঠে নরেন গান ধরিল—

সখী, আমার দুয়ারে কেন আসিল,
নিশিভোরে যোগী ভিখারী,
কেন মধুর সুরে বীণা বাজিল।

কেরাণী বাবুরা সেই বেলা নয়টার সময় দুটি ভাত তরকারী নাকে মুখে গুঁজিয়া সাড়ে নয়টার সময় হাজিরা বহি সই করিয়া মাথা হেঁট করিয়া কলম পিষিতে ব্যস্ত ছিলেন, এইবার কিছুক্ষণের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া গল্পগুজব করিতে মনোযোগী হইলেন।

নীরদ ও ভুজঙ্গ নিজেদের টেবিল ছাড়িয়া, যে ঘরে নগেন গান ধরিয়াছিল সেই ঘরে আসিয়া গায়কের পার্শ্বোপবিষ্ট প্রৌঢ় ঠাকুদ্দাকে তখনো নিবিষ্ট চিত্তে কলম চালাইতে দেখিয়া, পিছন হইতে ক্ষিপ্রহস্তে ঠাকুদ্দার হাত হইতে কলমটি কাড়িয়া লইয়া তরল কণ্ঠে কহিল, "ঠাকুদ্দা, অত একমনে কি মাথামুণ্ড লিখে যাচ্ছেন? শুনচেন না কাণের কাছে রাধারাণী বিরহ সঙ্গীত গাইচেন।"

ঠাকুদ্দা একটু বিব্রত ভাবে কহিলেন, "একটা হিসেব মিলুচ্ছি হে, ভারী জরুরী এটা, আজই সাহেবকে না দিলে নয়, তোমরা একটু—"

নীরদ কহিল, "রেখে দিন্ আপনার শুক্নো হিসেব। নেহাৎ জরুরী হয়, টিফিন আওয়ারের পর মিলুবেন, এখন ঝাঁ ক'রে ঠান্‌দিকে একখানা চিঠি লিখে ফেলুন দেখি। আজ পনেরো দিন হলো তিনি বাপের বাড়ী গেছেন, আপনি তাঁকে একখানি চিঠি লিখলেন না, তিনি আপনাকে কি ভাব্‌বেন বলুন দেখি? এ আপনার ভারী অন্যায় ঠাকুদ্দা। আপনার রাধা, কৃষ্ণ-বিরহে কি রকম উতলা হ'তেন তা তো আমাদের চাইতে আপনিই ভালো রকম জানেন।"

ঠাকুদ্দা একটি ছোটরকম নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "রাধাকৃষ্ণের বিরহ কি সম্ভব ভাই? দুজনে দুজনার প্রাণে সর্ব্বদাই মিলে আছেন, যেমন কায়া আর ছায়া।"

ভুজঙ্গ কহিল, "তা হ'লে বিরহ হত কি করে ঠাকুদ্দা? এতো যে সব বিরহের ব্যাপার শুনি—"

ঠাকুদ্দা কহিলেন, "সে সব হচ্ছে লীলা। এ লীলা শুধু মর্ত্ত্যের মানুষকে মধুর ভাবের মাধুর্য্য আস্বাদন করাবার জন্যে।"

ভুজঙ্গ কহিল, "তা আপনিও না হয় লীলার জন্যেই ঠান্‌দিদিকে একখানা প্রেমপত্র লিখুন। দোহাই ঠাকুদ্দা, নেহাৎ আমাদের শাপ শাপান্ত খাওয়াবেন না। ঠান্‌দিদি বিয়ের কনে হয়ে এসেই সব জেনে গেছেন—আমরাই যে ধরে আপনার মতো 'ওল্‌ড ব্যাচিলর'কে তাঁর মাথার মণি করে দিয়েছি এ রহস্য সব তাঁর কাছে ফাঁস হয়েছে। এখন যদি তিনি আপনার কাছে তাঁর পাওনা আদর যত্ন না পান্ তা হলে তিনি এই সব কটাকেই গাল মন্দ করবেন। ষষ্ঠীর বাছা আমরা কেন তাঁর শাপ কুড়িয়ে মরি?"

ঠাকুদ্দা অসহায় ভাবে ভুজঙ্গের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহা তোমরা কেন শাপ কুড়ুতে যাবে, তাই তো!"

নগেন তখন আর একটি গান ধরিয়াছে—

"দরশন বিনে মম প্রাণ যে যায়,
কোথা গেলে পাব তারে বলে দে আমায়!"

নীরদ কহিল, "শুনচেন ঠাকুদ্দা, একেবারে ঠান্‌দির প্রাণের কথা! আপনার মত প্রেমিক লোক এ গান

* সত্য ঘটনা

শুনেও যদি পাষাণের মত ধৈর্য্য ধরে থাকেন্ তা হলে—"

ঠাকুদ্দা কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে যুবকদের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি চাও তোমরা আমার কাছে? এই বুঝেচ কি না, আমার এখন কি করা উচিত?"

ভুজঙ্গ খুসী হইয়া কহিল, "এই আপনি ঠিক বলেচেন ঠাকুদ্দা। আপনাকে বেশী কিছু কর্‌তে হবে না, শুধু ঠান্‌দিদিকে গুছিয়ে একখানি প্রেমপত্র লিখে আমাদের হাতে দিন্, ব্যস্ আর কিচ্ছু না, খাম ঠিকানা সে সব আমরা ঠিক্ করে দেবো।"

অগত্যা ঠাকুদ্দা কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন। ওদিকে তিনবন্ধু নিজেদের টিফিন বাক্স খুলিয়া জলখাবার খাইতে বসিল। আহার সারিয়া ঠাকুদ্দার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই ঠাকুদ্দা নীরবে চিঠি খানি যুবকদের হাতে তুলিয়া দিলেন, মুখের ভাব—শিক্ষকের হাতে প্রবন্ধ লিখিয়া পরীক্ষার জন্ম দিয়া ফলাফল জ্ঞাতার্থী ছাত্রের ন্যায়। যুবকগণ মনে মনেই পড়িতে লাগিল—

চিরায়ুষ্মতীষু—

সাবিত্রী, আশীর্ব্বাদ করি তোমার সাবিত্রী নাম সার্থক হউক্। আশা করি, পিতা-মাতার নিকট ফিরিয়া গিয়া ভাই বোন্‌দের লইয়া তুমি সুখেই আছ। অবসর সময়ে ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ সুখী হইব জানিবে। উক্ত গ্রন্থে অভিজ্ঞতা জন্মিলে বুঝিতে পারিবে, জ্ঞানীভক্ত গ্রন্থকার সংসারতাপ-দগ্ধ নরনারীর জন্য কি অমৃতের সমুদ্র রাখিয়া গিয়াছেন। আমি ভাল আছি, তোমাদের কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। শ্রীমতী আশালতা তোমাকে শীঘ্র শীঘ্রই এ মোকামে আনিবার জন্য ব্যস্ত, এ বিষয়ে তোমার কি মত জানিতে ইচ্ছা করি।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীসিদ্ধেশ্বর শর্ম্মণঃ।

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতেই যুগপৎ তিনবন্ধুর চোখে মুখে হাসির আঁভা খেলিয়া গেল। নীরদ পরক্ষণে স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল, "এ চিঠি যে নেহাৎ গুরুমশায়ের চিঠি হয়ে পড়্‌লো ঠাকুদ্দা! ঐ ছেলেমানুষ ঠান্‌দি মোটেই খুসী হবেন না। বিশেষ তাঁর সই, কি ডালিমফুল এঁরা যদি এ চিঠি দেখেন—"

ঠাকুদ্দা বিবর্ণমুখে কহিলেন, "তা হ'লে ভাই তোমরাই যা পার অদল বদল করে দাও গে, আমার দ্বারা ওর বেশী আজ আর হবে না।"

ভুজঙ্গ রহস্যোচ্ছল কণ্ঠে কহিল, "সাবধান ঠাকুদ্দা! সব জায়গায় প্রতিনিধি চালাবেনা, এই জায়গাটিতে কিন্তু বাদ দিয়ে।" যাহা হউক ইহারা অগত্যা পক্ষে সেই চিঠিই ঠাকুদ্দার সাম্‌নে খামের মধ্যে ভরিয়া, ঠিকানা লিখিয়া, তখনই ডাকে দিবার জন্ম চাপরাশীকে ডাকিয়া পাঠাইল।

২

সকাল তখন সাতটা। ফাল্গুনের শেষে গাছে গাছে নূতন কচি কচি পাতা বাহির হইয়া সমস্বরে বসন্তের আবির্ভাব ঘোষণা করিতে প্রয়াসী। আমগাছগুলি মুকুল-ভারে যেন নুইয়া পড়িয়াছে। পলাশ, অশোক যেন রাঙা চেলী পরিয়া নববধূবেশে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ব্যগ্র। শিরীষ ফুলের গন্ধে রাজপথ পরিপূর্ণ। অদূরে ধূসর-বর্ণ পাহাড়ের শ্রেণী আকাশের গায়ে মাথা তুলিয়া চারি-দিককার এই নূতন শোভা দেখিবার জন্য যেন উন্মুখ। নগেন ও ভুজঙ্গ সেই সময় একতাড়া আফিসের কাগজ বগলে লইয়া হেডক্লার্কের বাসার দিকে চলিয়াছে; সেখানে গিয়া প্রয়োজনীয় কোনও কাগজ দেখিয়া নিজেদের লেখা পড়ার কায সারিতে হইবে। ভুজঙ্গ বাড়ী হইতে আসি-বার পথে নগেনকে ডাকিয়া লইয়াছে। নগেন কিন্তু বড় গম্ভীর, সঙ্গীর আহ্বানে বাহির হইয়া আসিলেও নিতান্ত চুপচাপ করিয়াই পথে চলিতেছে। ভুজঙ্গ তাহা সহিতে পারিল না, দু তিনবার কথা কহিয়া নেহাৎ হাঁ হুঁ গোছ উত্তর পাইয়া কহিল, "বলি হল কি? নেহাৎ গম্ভীর হয়ে পড়েচ যে!" এবার নগেন যেন গা ঝাড়া দিয়া জবাব দিল, "হাঁ কি বল্‌ছিলে?"

"বলছিলাম আজ দিনটি কেমন সুন্দর, এটা যে বসন্ত-কাল তা একবার চারিদিকে চেয়েই সুস্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে। এমন দিনে তোমার মতন রসগ্রাহী লোকের মুখ গোম্‌ড়া ক'রে থাকা মোটেই উচিত হয় না বা শোভা পায় না।"

নগেন কহিল, "অর্থাৎ বসন্তকালে মনটা আপনা হতেই হাল্‌কা হ'য়ে মধুর উদ্দেশে প্রজাপতির মতন উড়ে যেতে যায়—অতএব ?"

ভুজঙ্গ নগেনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ঠিক কথা বলেছ দাদা! কবি না হলেও কাব্যের মর্ম্ম কিছু কিছু বুঝি। অতএব তোমার মতন লোকের মধুর কণ্ঠে এই শুভ সময়ে কিছু সঙ্গীতের চর্চ্চা হোক্‌।"

নগেন স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয় হইলেও, গম্ভীর মুখেই কহিল, "দেখ ভাই, বসন্তকালের মাধুর্য্য হয় তোমার মতন অবিবাহিত লোকরাই অনুভব করে, নয় তো গৃহিণী যদি ছেলেমেয়েগুলি নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকেন তবেই বোঝা যায়। কিন্তু আমার ও দুটির একটি অবস্থাও নয়। সকাল না হ'তেই বড় বাবুর বাড়ী খাতা বগলে কলম পিষ্‌তে ছুটছি, ছোট মেয়েটা বড় সাধ ক'রে কোলে এসেছিল, তুমি ডাক্‌ দিতেই কাযের তাড়ায় তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতেই যে কান্না! গিন্নী আপিসের ভাত দেবার তাড়ায় রান্না ঘরে ঢুকেচেন, মেয়েকে কোলে নিলেন না, মেয়েটা বাবা বাবা ক'রে সে কি ডাক্‌! আমি চেয়েও দেখতে পারলাম না। সত্যি ভাই, মনটা ভারী খারাপ লাগ্‌চে, এ মনে বসন্তর বাবারও সাধ্যি নেই যে উকি মারে।"

ভুজঙ্গ মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসিয়া কহিল, "ঐ জন্যেই তো বিয়ে কর্ত্তে ঘাড় পাতিনা দাদা! এ বেশ খেয়ে খেলে বেড়াচ্ছি, কে সাধ ক'রে গলায় ফাঁসি লাগাতে যায়? সত্যিই আমার এখন গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে। দুঃখের বিষয় সুরবোধ নেই, নইলে তোমার মতন অমন সাধা গলা থাক্‌লে এতক্ষণ—"

নগেন হাসিয়া কহিল, "তুমি কিন্তু ভাই সেই কবিতাটা একেবারেই ভুলে যাচ্ছ, গলা নেই গান গায় মনের আনন্দে—যাই হোক্‌ তোমার এই ফুর্ত্তির ফোয়ারা দেখে বাস্তবিকই সময় সময় হিংসে হয়। সত্যি কথা বলতে কি ভাই, ঠাকুদ্দাকে জোর ক'রে এই বয়সে ফাঁসীকাঠে না ঝুলিয়ে তোমাকে ঝোলালেই ভালো ছিল।"

ভুজঙ্গ কহিল, "বটে? দাঁড়াও আজই আফিসের ফেরৎ বউদিদিকে গিয়ে বল্‌চি যে তাঁকে তুমি ফাসীকাঠ বল্‌চ।"

নগেন উত্তর দিল না, গুন গুন করিয়া গান ধরিল—

"বেঁধেছ হৃদয় মন নয়ন ফাঁসে,
বেঁধেছ এ দেহখানি বাহুর পাশে।
এতো যে গো বাঁধাবাঁধি,
তবু তো গো নাহি কাঁদি,
এ বাঁধন তারি তরে ভালো যে বাসে
সাধেরই বাঁধন এযে প্রেমেরি ফাঁসে॥

ভুজঙ্গ নগেনের পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে কহিল, "বাঃ দাদা -বাঃ—যেমন গান তেমন সুর,—ওহে দেখ দেখ এ এক নূতন দৃশ্য যে! কাঠখোট্টার দেশে বাঙ্গালিনী বৈষ্ণবীর আমদানী হল কোত্থেকে?"

অদূরে একটি মুদীর দোকানের সম্মুখে খঞ্জনী বাজাইয়া জনৈক বৈষ্ণবী তখন গান ধরিয়াছে—

লো সখি তোর পায়ে ধরি সেই পথ আমারে দেখা
যে পথে মথুরা গেছে আমার পরাণ সখা।
যে ছিল প্রাণের প্রাণ,
যে ছিল মোর ধ্যান জ্ঞান,
সেই শ্যাম হারা হব এ ছিল কপালে লেখা,
লেখা মুছে দেব আমি দেখা তুই পথ দেখা।"

দুই বন্ধুতে ততক্ষণে বৈষ্ণবীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈষ্ণবীর আশেপাশে অনেকগুলি শ্রোতা জমিয়া গিয়াছিল। নগেন বন্ধুর কাণে কাণে কহিল, "বৈষ্ণবী একেবারে নবীনা, চেহারাটি মন্দ না, গলাও ভারী মিঠা"

ভুজঙ্গ কহিল, "হঠাৎ কোন্‌ দেশ থেকে এখানে আমদানী হল? সঙ্গে নিশ্চয়ই বাবাজীর অনুচর আছে।"

নগেন কহিল, "তা থাক না থাক আমার সে খোঁজে কোন দরকার নেই। তবে হ্যাঁ তোমার কণ্ঠি বদলের কাযে যদি লেগে যায়।"

ভুজঙ্গ বন্ধুর হাতের আঙুল মটকাইয়া দিয়া কহিল, "দাদা বলে মান্য করি কি না।"

"আচ্ছা সত্যি বল তো ঠাকুদ্দার কাছে এই বৈষ্ণবীকে নিয়ে গিয়ে যদি রসতত্ত্ব শোনানো যায়, নিশ্চয়ই উনি মেতে উঠবেন ত না?

নগেন কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! ঠানদিদির কাছে আমার গালাগালি খাবার ব্যবস্থা? না ভাই, ওসব নিমকহারামী কাযে আমি নেই।"

ভুজঙ্গ কহিল, "সবেতেই আঁৎকে ওঠা তোমার এক স্বভাব। একটা কথার কথা বইতো না। এসো না আগে বৈষ্ণবীর পরিচয়টা নেওয়া যাক্।"

বৈষ্ণবী দোকান হইতে মুদীর দাল চাল ও পয়সা লইয়া তখন চলিয়া যাইতেছে। ভুজঙ্গ পরিচয় জানিবার জন্য উন্মুখ হইলেও কার্য্যকালে কণ্ঠে তার সে প্রশ্ন মোটেই জোগাইল না, বরং নগেন আগু হইয়া আসিয়া কহিল, "তুমি কোত্থেকে এসেচ গা?"

বৈষ্ণবী নম্রস্বরে কহিল, "নবদ্বীপ থেকে আসচি বাবু।"

"কোথা যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে শ্রীবৃন্দাবন যাবার মানস করেছি, এখন প্রভুর ইচ্ছা।"

এইবার ভুজঙ্গের কণ্ঠে কথা ফুটিল। সে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কে আছে গা?"

বৈষ্ণবী উত্তর দিল, "কেউ নেই—শ্রীনন্দের নন্দন আমার সাথী।"

বৈষ্ণবী উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া, নগেন রাস্তার অপর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ওগো বাছা, এই পথের মোড়ে অই বাঁ হাতী লাল খাপরার ছাউনী বাড়ীতে একবার যাও দেখি, মেয়েরা গান শুনে ভারী খুশী হবেন।"

বৈষ্ণবী নগেনের নির্দ্দেশ মত নিজের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবামাত্র ব্যগ্রকণ্ঠে ভুজঙ্গ বন্ধুকে প্রশ্ন করিল, "আমরা ফেরা পর্য্যন্ত কি আর বৈষ্ণবীর গান চলবে? বউদিদি হয় ত সঙ্গে সঙ্গেই এক মুঠো চাল দিয়ে বৈষ্ণবীকে বিদায় করে দেবেন।"

নগেন বন্ধুর দিকে কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "ব্যাপার তো ভাল বোধ হচ্চে না হে! রসকলিতে নজর পড়ল নাকি?"

ভুজঙ্গ হাসিয়া কহিল, "স্মরণ রেখো দাদা সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।"

৩

চশমাটি পাশে খুলিয়া রাখিয়া ঠাকুদ্দা তখন নিভৃতে বাহিরের ঘরে বসিয়া খুব মনোযোগের সহিত কৃষ্ণলীলা পড়িতেছিলেন। জানালার সম্মুখ দিয়া বৈষ্ণবী চলিয়া গেল লক্ষ্য করিলেন না। বৈষ্ণব সাধু সজ্জনের প্রতি ঠাকুদ্দার একটি আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, এজন্য কেহ কটাক্ষ করিলে তিনি বলিতেন—"মেকী নাড়াচাড়া করিতে করিতে আসলের সন্ধান মিলিতে পারে।"

বৈষ্ণবী আঙিনার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া খঞ্জনীতে ঘা মারিয়া বলিয়া উঠিল—"জয় রাধে শ্রীকৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও মা জননী!" তার পর সে মধুর স্বরে গান ধরিল—

"মেঘ দেখে যে পড়ে মনে সে মেঘবরণে
পদ্ম দেখে মনে পড়ে কমল চরণে।
সেই শিখীপুচ্ছ চূড়া,
সে মোহন পীতধড়া,
আখি পালটিতে সদা জাগে নয়নে.
দে সখি দে কৃষ্ণ এনে বাঁচি কেমনে,
বাঁচি কেমনে প্রাণ গোবিন্দ বিনে॥"

ঠাকুদ্দা সত্যই সরল রসগ্রাহী ভক্ত ছিলেন, সুতরাং সঙ্গীতের মাধুর্য্য সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চিত্তকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। দৃষ্টি পুস্তকে তখনও নিবদ্ধ রহিল বটে, মন-ভ্রমর কিন্তু গীতমধু পানলোভে পাখা মেলিয়া উড়িয়া চলিল। ও দিকে নগেনের চার বছরের মেয়ে তুলু—"ওমা বোষ্টুমী

এসেচে, গান করচে, শুনে যাও।" বলিয়া একবার দ্বারের কাছে আর একবার রান্নাঘরের সম্মুখে ছুটাছুটি সুরু করিল। ছোট খুকী ইতিপূর্ব্বে পিতৃক্রোড়-ত্যক্ত অবস্থায় মাটীতে বসিয়া কান্না জুড়িয়াছিল; আফিসের ভাত রাঁধিতে ব্যস্ত জননী "মরণ হলে বাঁচি" বলিয়া খুকীর দুরবস্থার প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেছিল। খুকীর ইচ্ছা মার কোলে উঠিয়া খাওয়া হয়, মার কিন্তু সময় নাই। যাহা হউক বৈষ্ণবীর গান শুনিয়া খুকীও কান্না ভুলিয়া জলভরা চোখে নবাগতার দিকে চাহিয়া রহিল।

নগেনের স্ত্রী আশা তখন রান্নাঘরে ডালের হাঁড়ীতে ঘন ঘন হাতা চালাইতেছিল, সম্প্রতি সে কায বন্ধ করিয়া বৈষ্ণবীকে দেখিতে আসিল। বৈষ্ণবী গান বন্ধ করিয়া কহিল, "ভিক্ষা দাও মা রাধারাণী।"

এইবার ঠাকুদ্দাও বাহির হইয়া আসিলেন। বৈষ্ণবীর গলা বড় মিঠা, তার উপর ভাবের সহিত তন্ময় হইয়া উচ্চ কণ্ঠে সে গান ধরিয়াছিল, এ ধরণের গান সাধারণ ভিখারী শ্রেণীর কণ্ঠে প্রায়ই শোনা যায় না, বিশেষ বাঙ্গলা গান এই কাঠখোট্টার দেশে—সুতরাং আশাও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এইবার সে বৈষ্ণবীকে প্রশ্ন করিল, "কোত্থেকে আসচ গা?"

বৈষ্ণবী উত্তর দিল, "নবদ্বীপ থেকে আসচি মা।"

আশা কহিল, "ওমা সেই নবদ্বীপ থেকে এই সাহেবগঞ্জে ভিক্ষে করতে এসেছ? কেন গো, সেদেশে কি ভিক্ষের অভাব?"

বৈষ্ণবী কহিল, "অভাব নয় রাধারাণী। যাচ্ছি শ্রীবৃন্দাবন পথে, কত দেশই ত ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করতে করতে যাব।"

আশা কহিল, "ওমা—এই কাঁচা বয়স, এমন ছিরি, তুমি কি করে একলাটি এত পথ ঘুরে সেই বৃন্দাবনে যাবে? সঙ্গে কেউ আছে তো, না একাই?"

বৈষ্ণবী কহিল, "একা কেন মা, শ্রীনন্দের নন্দন আমার দোসর। তিনি যখন সঙ্গের সাথী তখন ভয় কাকে জননী?"

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে নির্ভরতা ফুটিয়া উঠিতেছিল। ঠাকুদ্দা তাহা অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা ওর ভক্তি আছে বটে। ভক্তি না হলে নির্ভরতা আসে না।"

আশা কিন্তু নাক সিটকাইয়া কহিল, "কপালখানা আমার ভক্তির! এই কাঁচা বয়সে, এই রূপ একলা চলেচে তীর্থ করতে! সত্যিযুগ পেয়েচে আর কি,. সাবাস বলি বুকের পাটা।"

বৈষ্ণবী এই তীব্র মন্তব্যের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া, মৃদু মৃদু খঞ্জনীতে ঘা দিতে লাগিল। আশা আবার প্রশ্ন করিল, "এখানে ক'দিন এসেছ বাছা?"

বৈষ্ণবী কহিল "আজই এসেছি। শুনেছি এখানে অনেক ঘর বাঙালী বাবুর বাস, তিন চারদিন তাঁদের দুয়োরে ভিক্ষে সেধে ভাগলপুরের দিকে চলে যাব।"

ঠাকুদ্দা প্রশ্ন করিলেন, "রাত্রে কোথায় থাকবে? স্ত্রীলোকের যেখানে সেখানে একা বাস ত নিরাপদ নয়।"

বৈষ্ণবী নতমুখে কহিল, "দয়া করে কোন ভদ্রলোক কি তাঁর বাড়ীতে রাত্রে আশ্রয় দেবেন না? না দেন, গাছতলা আছে।"

ঠিক এই সময় নগেন ও ভুজঙ্গ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই ঘোমটা টানিয়া আশা সরিয়া পড়িল। বৈষ্ণবীর উত্তর শুনিয়া ঠাকুদ্দা চিন্তিত হইলেন। দেশ কাল এমন যুবতী রূপসী রমণীর একা রাজপথে রাত্রিযাপন পক্ষে মোটেই যে অনুকূল নয় তাহা তিনি খুব জানিতেন। সুতরাং যাচিয়া এই অসহায়া নারীর রাত্রিবাসের আশ্রয় দিবার জন্য তিনি উৎসুক হইলেন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে প্রস্তাব করিতে তাঁর সাহসে কুলাইল না, যেহেতু বয়সে প্রবীণ হইলেও, নবীনদের কটাক্ষ ইঙ্গিত প্রভৃতিকে তাঁহার বিশেষ ভয় ছিল—সেই নবীনদের অগ্রগণ্য ভুজঙ্গ এখন তাঁহার সম্মুখে।

ঠাকুদ্দার দিকে চাহিয়া নগেন জিজ্ঞাসা করিল "গান শুনলেন ঠাকুদ্দা?"

ঠাকুদ্দা কহিলেন, "হ্যাঁ ভাই। মেয়েটি গায় ভাল, দুঃখের বিষয় এবেলা আর শোনবার সময় নেই। দু'তিনদিন থাকবে বলচে, তা হ'লে আর একদিন শোনা যাবে।"

এই সময় তুলু একটি কাঁসার বাটিতে করিয়া চাল ও কয়েকটি আলু পটল লইয়া আসিয়া বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা দিল। নগেনও তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়াইয়া চারিটা পয়সা বাহির করিয়া বৈষ্ণবীর হাতে দিয়া ভুজঙ্গকে কহিল, "তোমার ঠাকুরমা ভারি গান্ শুনতে ভালবাসেন, তাঁর কাছে বৈষ্ণবীকে নিয়ে যাও হে। রাত্রের আশ্রও তিনিই দিতে পারবেন।"

"তা যাচ্ছি, কিন্তু তোমার বাড়ীতে গানের যেমন সমঝদার আছেন তেমনটি আর কোথাও নেই, কি বলুন ঠাকুদ্দা?"

বলিয়া মৃদু হাসিয়া ভুজঙ্গ বৈষ্ণবীকে সঙ্গে লইয়া নিজের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল।

৪

"বউদি, বউদি, দাদা কোথায়?"

বউদিদি নিভাননী কুটনা কুটিতেছিল, দেবরের প্রশ্নে চাহিয়া দেখিয়াই প্রশ্ন করিল, "ওমা এ আবার কে গো?"

"মানুষই গো, দেখ্‌তে পাচ্ছনা না কি? বলি যা জিজ্ঞেস করলেম তার উত্তর কৈ, দাদা কোথায়?"

"ছেলে পড়াতে গেছেন। আচ্ছা ঠাকুরপো, এ মেয়েটি কে, বোষ্টমের মেয়ে বুঝি?"

ভুজঙ্গ কহিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ঠাকুরমা কৈ, অ—ঠাকুর মা, পুজো আহ্নিক সারা হল তোমায়? দেখ্‌বে এস, বোষ্টুমী এনেছি তোমার জন্যে।"

"ভুল্ বল্‌লি দাদা, বোষ্টুমী এনেছিস নিজেরি জন্যে। —আমার কণ্ঠীবদলের বোষ্টম এখন স্বয়ং যমরাজ। জানিনে কদ্দিনে তাঁর দেখা পাব।" বলিতে বলিতে ঠাকুরমা পুজার ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া বৈষ্ণবীকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বাঙ্গলা দেশের বোষ্টুমী সত্যিই যে দেখ্‌চি কাঠখোট্টার মুল্লুকে এসে হাজির! কোথায় একে জোগাড় করলি ভুজঙ্গ?"

ভুজঙ্গ ততক্ষণে নিজের ঘরে ঢুকিয়া জামাজোড়া খুলিয়া স্নানের উদ্যোগে মন দিয়াছে। সেইখান হইতেই উত্তর দিল, "নগেনদার বাড়ীতে গান গাইছিল, নগেনদা বল্‌লে নিয়ে যাও একে, ঠাকুরমা গান শুনতে ভালবাসেন গান শুনবেন।"

নিভা তখনি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "তা বেশ তো, এখুনি একটা গান গেয়ে শোনাক্ না কেন?"

ভুজঙ্গ হাকিল, "নটা বেজে দশ মিনিট, শীগ্‌গির ভাত দাও বউদি, ও তোমার ঠাকুরের পিত্যেশে থেকো না, ভাতে ভাত যা হয় ছটো বেড়ে দাও।"

ঠাকুরমাও সশব্যস্তে কহিলেন, "গান টান দুপুরবেলা শুনিস্ দিদি, শীগ্‌গির ঠাঁই করে ভাত দিয়ে দে. অনঙ্গও ছেলে পড়িয়ে এল বলে,—"

অগত্যা কুট্‌না ফেলিয়া নিভা আফিসযাত্রীদের ভাতের ব্যবস্থা করিতে গেল, ঠাকুরমা বৈষ্ণবীকে আহ্বান করিয়া কাছে বসাইলেন।

৫

বেলা তখন প্রায় দুইটা। ভুজঙ্গদের বাড়ী বাঙ্গালিনী বৈষ্ণবীর আগমন সংবাদ পাড়ার সব বাঙ্গালী বাবুদের ঘরে ঘরে টেলিফোনের তারের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এবাড়ী ওবাড়ীর মেয়েরা তাই অনেকেই এখন ভুজঙ্গের ঠাকুরমার দরবারে বৈষ্ণবীর গান শুনিবার জন্য সমাগত। নিভা ডিবাভরা পাণ ও জর্দ্দার কৌটা লইয়া মহিলাদের মান রাখিতে ব্যস্ত। ঠাকুরমা আশে পাশে সকলকে বসাইয়া, নিজে মধ্যস্থলে সভাপতিরূপে আসন লইয়া পা মেলিয়া দিয়া গান শুনিতেছেন। বৈষ্ণবীর গান সত্যই তাঁহারও খুব ভাল লাগিয়াছে, সকাল হইতে গান গাহিয়া গাহিয়া পেশাদার বৈষ্ণবীর গলাটাও এইবার জখম হইবার উপক্রম। কিন্তু ভালমানুষ বেচারী সেকথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। উপর্য্যুপরি তিনটি গান গাহিয়া যেমন দম লইতে সুরু করিয়াছে, পাড়ার একটি নব বিবাহিতা কিশোরী অমনি ফরমাস করিল, "ওগো বোষ্টুমী, এইবার একটা মানভঞ্জন গাও না গা।"

ঠাকুরমা কহিলেন, "ক্যানলো মাধু, মানভঞ্জনের খোঁজ ক্যান্ লো? নাতজামাই কি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যে মানময়ী সেজে বসেছিস্?"

বেচারী অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "না বাপু, মানভঞ্জনের দরকার নেই, তুমি গোষ্ঠ গাও।"

কিন্তু অন্যান্য যুবতীদের ভোটে মানভঞ্জনই বাহাল রহিল, সুতরাং বৈষ্ণবী মধুর কণ্ঠে গান ধরিল—

মান ত্যজ রাই কমলিনী,
মান রাহুগ্রাসে মিছে হয়ে আছ বিমলিনী।
তোমারি শরণাগত,
রাঙা পায়ে দাসখত
লিখে দিচ্ছি চিরতরে জাননা কি ওগো ধনী,
রাধার দুয়ারে বাঁধা শ্যামের নয়নমণি॥

গান শুনিয়া সকলেই মহা খুসী। বৈষ্ণবীকে এইবার বিশেষ শ্রান্তক্লান্ত দেখিয়া ঠাকুরমা মত প্রকাশ করিলেন, অতঃপর বৈষ্ণবীর গান আজিকার মত বন্ধ হউক। যাহাদের শুনিবার ইচ্ছা, তাহারা আগামী কল্য আসিতে পারে। এ রায়, যাহারা শেষের দিকে আসিয়াছিল তাহারা মঞ্জুর করিল না, যেহেতু বৈষ্ণবী সকাল হইতে গান গাহিয়া গলা ফাটাইলেও তাহারা তো কাযকর্ম্মের ক্ষতি করিয়া এইমাত্র আসিয়া এ বাড়ীতে পা দিয়াছে; যদি কয়েকটা গানই না শুনিল ত এ ক্ষতির পূরণ হয় কোথা হইতে? ঠাকুরমার কথার কিন্তু নড়চড় হইল না। অগত্যা তাহারা আর কিছুকাল সময় কাটাইবার জন্য বৈষ্ণবীর পরিচয় লইতে মনোযোগী হইল।

একজন কহিল, "হ্যাঁগা বোষ্টমী তোমার নাম কি?"

উত্তর—"তুলসী।"

প্রশ্ন। তোমার বোষ্টম কোথা?

তুলসী নতমুখ, নিরুত্তর। আবার প্রশ্ন হইল, এবার সমস্বরে তুলসী উত্তর দিল, বিবাহ হয় নাই।

সভামধ্যে একটা বিস্ময়ের ঢেউ খেলিয়া গেল, এবং একজনের কণ্ঠে তাহা প্রশ্নের আকার ধারণ করিল—"ওমা কি আশ্চর্য্য, এতবড় সোমত্ত মেয়ের কণ্ঠীবদল হয় নি সে কি কথা? চেহারা তো মন্দ না, তবে কেন বোষ্টম জোটে নি?"

প্রশ্নের পীড়াপীড়িতে বৈষ্ণবী স্বীকার করিল সত্যই তাহার অদৃষ্টে বৈষ্ণব জোটে নাই। তখন কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল—"তা না জোটবারই কথা বটে। রঙ থাকলে কি হয়, নাক মুখের গড়ন থাকলেই বা কি হয়, মুখে চোখে যেন মন্দা মন্দা ভাব, মেয়েলী মেয়েলী গড়ন পেটন তো মোটেই নয়।"

সঙ্কেতের তর্জ্জনী নির্দ্দেশে দুর্জ্ঞেয়ও সহজবোধ্য হইয়া উঠে, সুতরাং অনেকেই তখন বৈষ্ণবীর চেহারার মনঃসংযোগ করিয়া রূপের সমালোচনা সুরু করিল। ঠাকুরমা বিব্রত নতনয়না বৈষ্ণবীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া রাগিয়া গেলেন, তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন—"ওগো রূপসীর দল, বাড়ী গিয়ে সব নিজের নিজের বৈষ্ণব সেবার উদ্যোগ আয়োজনে মন দাও গে, বোষ্টমীর কণ্ঠীবদলের দুর্ভাবনায় তোমাদের মাথা ব্যথার কোনও দরকার দেখি না।"

৬

সন্ধ্যার পর ভুজঙ্গ নগেনের আঙিনায় ঢুকিয়া হাঁক দিল, "নগেন দা, পেসাদ পাই?"

নগেন খুকীকে কোলে করিয়া রান্না ঘরেই পিঁড়ী পাতিয়া বসিয়া রন্ধননিরতা আশার সহিত গল্প জুড়িয়াছিল। ভুজঙ্গের ডাক শুনিয়া বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—"কি খবর?"

ভুজঙ্গ কহিল, "বৈষ্ণবীর সন্ধানে এসেচি দাদা।"

নগেন হাসিয়া কহিল, "নেহাৎ কণ্ঠীবদলের জোগাড় না কি? অফিস থেকে এসেই পাছু নিয়েছ যে!

ইতিমধ্যে একটি বাটীতে কয়েকটি গরম কচুরী লইয়া দুলু ভুজঙ্গের কাছে আসিয়া কহিল, "কাকাবাবু খাও, মা বললে।"

"সত্যিই যে দাদার প্রসাদ, সে তবে খাই।" বলিয়া ভুজঙ্গ বাটিটি হাতে লইয়া কহিল—"আমার সঙ্গে না হোক্ ঠাকুরমার সঙ্গে কণ্ঠী বদলেরই জোগাড় দেখছি, একদিনেই বৈষ্ণবীর প্রতি তাঁর মহা আকর্ষণ। আমি আফিস থেকে আসতেই বলচেন, মেয়েটির সকালে মোটেই খাওয়া হয় নি, মাছের ছোঁয়া খায় না, কাযেই চিঁড়ে ভিজিয়ে খেয়ে আছে। এ বেলা ভাত তরকারী রেঁধে খাক। নগেনের বাসায় গ্যাছে একটু ডেকে আন—অগত্যে আসতে বাধ্য হলাম।"

নগেন কহিল, "ঠাকুদ্দা তার সঙ্গে ভাগবত আলোচনা করচেন, দাঁড়াও গিয়ে ডেকে আনি।"

নগেন ঠাকুদ্দার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঠাকুদ্দা ভাগবতের একটি অধ্যায় পড়িয়া শুনাইতেছেন, বৈষ্ণবী অদূরে বসিয়া আগ্রহের সহিত তাঁহার সেই কথামৃত পান করিতেছে। নগেন ঠাকুরমার আহ্বান শোনাইবামাত্র বৈষ্ণবী উঠিয়া গেল। ঠাকুদ্দা বই বন্ধ করিয়া একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আহা বুঝেছ নগেন, মেয়েটি ভক্তিমতী। ভাগবতে যে কৃষ্ণপ্রেমের কয়েকটি লক্ষণ লেখা আছে তা যেন স্পষ্টই ওর মধ্যে দেখতে পাচ্চি।"

নগেন এ সবের তত্ত্ব বুঝিত না, সে উত্তর না দিয়া আপনার মনে গুন গুন করিয়া কোনও গানের একটি ছত্র গাহিতে গাহিতে আবার রান্না ঘরের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল।

৭

বেলা তখন সাড়ে ন'টা। ঠাকুর্দ্দা আহারে বসিয়াছেন। আশা গরম ভাত থালায় বাড়িয়া তাহার উপর সদ্য উনান হইতে নামানো মাছের ঝোল ঢালিয়া দিয়া সজোরে পাখা চালাইতে চালাইতে বলিতেছে, "দেখ্‌ছ দাদাবাবু, বেলা দশটা বাজ্‌তে চল্‌ল এখনও দেখা নেই, সেই সকাল বেলা একতাড়া কাগজ বগলে যে বেরিয়েছে আর কি। এসে নাইতেও তর্ সইবে না, কোনো রকমে হাতে ভাতে করেই অফিসে ছুটবে,—"

ঠাকুদ্দা একগ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়া উত্তর দিলেন, "আজকাল যে কাযের তাড়া পড়েচে, ও ছোক্‌রা যতই খাটে ততই সাহেব ওর ঘাড়ে বোঝা চাপায়।"

আশা প্রতিবাদের সুরে কহিল, "না দাদামশাই, শুধু তাই না। গানের বাতিকেই ওর সব জায়গাতেই এক ঘণ্টার জায়গায় দুঘণ্টা কাটে। কেউ গান একবার গাইতে বল্‌লেই হয়, অম্‌নি—"

ঠিক এই সময় নগেন আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। আশা মন্তব্য বন্ধ করিয়া মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া পাখা চালাইতে লাগিল। ঠাকুদ্দা বলিলেন, "এই যে ভায়া, এখনি তোমারি কথা হচ্ছিল। সাড়ে নটা বেজে গেল একটু চটপট্ খেয়ে নাও, বড্ড দেরী করে ফেলেচ আজ।"

নগেন কহিল, "অার ঠাকুদ্দা, এদিকে এক মহা হাঙ্গামা! কালকের সেই বোষ্টমী এক মহা জোচ্চোর। আসলে সে মেয়ে নয়। পুরুষ, ধরা পড়ে গেছে।"

আশার হাত হইতে ঠক্ করিয়া পাখাখানি মাটীতে আছাড় খাইয়া পড়িল, সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "ও মা কি সর্ব্বনাশ!"

ঠাকুর্দ্দা কিন্তু একটিও প্রশ্ন বা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না, নীরবে নত মুখে খাইয়া যাইতে লাগিলেন। নগেন বলিতে লাগিল—"রাত্রে ঠাকুরমা তাকে নিজের ঘরে নিয়ে শুতে চেয়েছিলেন। সে কিছুতেই কিন্তু রাজী হয় নি, বল্‌লে—রান্নাঘরে খাটিয়া পেতে শুয়ে থাক্‌বে। ওদের দাইটা ভারী চালাক, তার সন্দেহ হয় নিশ্চয় চুরীর মতলব আছে, তাতেই রান্না ঘরে শুতে চাইচে। সে গিয়ে আনন্দকে বলে দোর, আনন্দর তখন সন্দেহ হয়, সে গিয়ে তাকে দু চারটে ধমক দিতেই ধরা পড়ে যায়। চোর সন্দেহে পুলিশে হাওলাৎ করে দিয়েচে।"

আশা অস্ফুটস্বরে কহিল, "বেশ করেচে! কোথাকার জোচ্চোর বদ্‌মাস, মেয়ে সেজে গান গেয়ে বাড়ীর মেয়েদের কাছে উঠছিল বস্‌ছিল, আচ্ছা বদ্‌মাস তো! তাতেই চেহারাটা যেন কাঠখোট্টার মত মনে হচ্ছিল।"

অতঃপর নগেন তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া কোনোরকমে দুটি ভাত তরকারী নাকে মুখে গুঁজিয়া যখন আফিস যাত্রা করিতেছে, তখনও নিজের ঘরে নিশ্চিন্ত মনে ঠাকুদ্দা ভুড়ুর ভুড়ুর করিয়া তামাক টানিতেছেন দেখিয়া বলিয়া গেল—"কি সর্ব্বনাশ, আমার আধঘণ্টা আগে নেয়ে খেয়েও আপনি পিছিয়ে রইলেন—শীগ্‌গির উঠে আসুন, দশটা বেজে দশ মিনিট।"

৮

অফিসে টিফিনের ঘণ্টা পড়িবামাত্র কেরাণী বাবুরা

বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশ লইয়া তুমুল আলোচনা জুড়িয়া দিলেন। এ বিষয়ে সকলেরই একমত হইল যে লোকটা পাকা বদ্মাস এবং কোনও গুণ্ডার দলের গুপ্তচর। দেশে তখন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ছিল না, তাহা হইলে গোয়েন্দা বলিয়াও সন্দেহ হইতে পারিত। তবে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়িয়া গিয়া খুবই রক্ষা হইয়াছে এবং আনন্দ যে বুদ্ধি করিয়া তাহাকে পুলিশে হাণ্ডোভার করিয়াছে ইহার জন্য অনেকেই তাহার প্রশংসা করিল। তবে সর্ব্বেশ্বর কহিল, "একবার আমায় খবর দিলেই হোতো, একচোট্ মেরে হাতের সুখ করে নিতাম। ওহে ভুজঙ্গ খবরটা একবার দিতে পারলে না হে।"

ভুজঙ্গ কহিল, "হাতের সুখ দাদা খুব করে নিয়েচেন, ঠাকুরমা না থাক্‌লে রক্তগঙ্গা করে দিতেন। তোমাকে ডাকবার দরকার হয় নি।"

নীরদ কহিল, "ইঃ, কথা বল্‌তে ব্যথা ঝরে পড়চে যে হে!" অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে বৈষ্ণবীকে লইয়া নগেন ভুজঙ্গকে দুই একটা হাস্য পরিহাস করিয়াছিল সুতরাং নীরদ তাহারই ইঙ্গিত করিল। ভুজঙ্গ কহিল, "তা যাই বল, একটা লোক চুপ চাপ মাথা হেঁট করে মার খেয়ে যাচ্ছে, তুমি তারে গায়ের জোরে মেরেই চলেচ—এটা ভারী বীরত্ব কি না! আমি বাড়ী থাক্‌লে কখ্‌খনো অত মারধোর করতে দিতাম না। আমি রাত্রের ট্রেণে তিনপাহার গিয়েছিলাম, সকালে এসে শুনি এইসব ব্যাপার।"

নীরদ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেই যোগানন্দ কহিল, "ভারী যে গদ্ গদ ভাব ভুজঙ্গ! তবে সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, ঠাকুদ্দা তো একেবারে মাতোয়ারা! জিজ্ঞেস করতেই বল্‌চেন "আহা সাধিকা বটে, কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর।"

হঠাৎ সকলেরই হুঁস হইল, ঠাকুদ্দা আজ অফিসে অনুপস্থিত, অথচ এটি ঠাকুদ্দার কোষ্ঠীতে লেখা নাই। ঈশ্বর ইচ্ছায় শরীর তাঁর নীরোগ, এবং যথাসময়ে অফিসে হাজরী দিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই নিয়মিত আগন্তুক।

নীরদ কহিল, "ঠাকুদ্দা নিশ্চয়ই বিরহ জরাক্রান্ত। বৈষ্ণবীর প্রতি তাঁর যে ভাবের উদয় হয়েছিল দেখেচি, তা থেকে নিশ্চয়ই এই জ্বরের আবির্ভাব। চল ভুজঙ্গ একবার খবর নিয়ে আসি।"

"চল নগেন দা, একবার বাড়ী বেড়িয়ে আস্‌বে?" ভুজঙ্গ এই কথা বলিতে নগেন কোনও আপত্তি করিল না। বাড়ী অফিস হইতে দশমিনিটের পথ। নগেন বাড়ী আসিয়া দেখিল, গৃহলক্ষ্মী পলাতকা, দাই শূন্য গৃহ পূর্ণ করিয়া বাসন মাজিতে মাজিতে গান ধরিয়াছে—

গলেমে হাঁস্‌লী হাঁথমে কাঁকনিয়া,
গোরী গোরী বহুরিয়া কাঁথমে গাগরিয়া,
নজর লাগা মৎ শ্যামলিয়া শ্যামলিয়া।

গৃহস্বামীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে সলজ্জ ভাবে গান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বহুমা তো খোকী লিয়ে ঠাকুরমা বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েচে বাবু।" নগেন বুঝিল বৈষ্ণবী সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্যই আজিকার এ গমন। যাহা হউক ঠাকুদ্দার সংবাদ জানিতেই তাহার এখন আসা। ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু কাঁহা হ্যায়?"

দাই উত্তর দিল, "অফিস গিয়া বাবু, আপনি ভী গিয়েছে দাদাবাবু ভী পিছে গিয়েছে।"

নগেন বুঝিল, ঠাকুদ্দা বাড়ী নাই, কোথাও যাত্রা করিয়াছেন। ভুজঙ্গ কহিল, "কোথায় গেলেন ঠাকুদ্দা, এ সময়ে আফিস কামাই করে' কোথাও যাবার পাত্র তো নন্ তিনি।" নগেন কহিল, "তার জন্য বিশেষ চিন্তা নাই, এখন অফিসে চল ঘণ্টা শেষ হয়ে এল?" দুই বন্ধু তখন অফিস পথের যাত্রী হইল।

সন্ধ্যার সময় বাবুর দল হুড়মুড় করিয়া যখন ঠাকুদ্দার স্বল্পপরিসর ঘরটির মধ্যে ক্ষুদ্র বাহিনীর ন্যায় চড়াও করিল, তখন ঠাকুদ্দা জানালার ধারে বসিয়া গোধূলির শেষ আলোকে তাঁর প্রিয় গ্রন্থ ভাগবত খানির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া ছিলেন। অনঙ্গ এই বাহিনীর সেনাপতি রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, সে সকলের আগে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল-

"ঠাকুদ্দা—আপনার এই কাণ্ড? দারোগাকে ঘুষ দিয়ে

আপনি সেই জোচ্চোর বদমাসটাকে খালাস করে কোথায় এনে লুকিয়ে রেখেচেন শীগ্‌গির বলুন, নইলে ভাল হবে না। আমি ঠাকুরমার তোয়াক্কা রাখলাম না, ব্যাটাকে আচ্ছা ঘা কতক দিয়ে থানার জিম্মা করে এলাম যাতে পাজীটার কিছু শিক্ষা হয়। আর আপনি স্বচ্ছন্দে তাকে খালাস করে দিয়ে এলেন!" সর্ব্বেশ্বর কহিল, "কাযটা ভালো করেন নি ঠাকুদ্দা। সে যখন বাস্তবিক দোষী, তখন তার শাস্তি হওয়াই উচিত ছিল। আমরা অফিসের ফেরৎ থানায় একবার তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, তা দারোগার কাছে শুন্‌লাম আপনি তার জামিন হয়ে তাকে ছাড়িয়ে এনেছেন।"

বিপিন কহিল, "হাঁ ঠাকুদ্দা দারোগা সাহেব ক'টাকা পাণ খেতে নিলেন? মিথ্যে নিজের গাঁটের কড়ি খসিয়ে বাটপাড় জুয়াচোরকে রক্ষা করতে গেলেন।"

আনন্দ কহিল, "দারোগাকে না হয় আমিই কিছু পাণ খেতে দিতাম। দুষ্ট লোকের শাস্তির জন্যে পয়সা খরচ করতে হয় সেও স্বীকার—তাদের দয়া করা মানে অন্যায় আর পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কিছু না।"

ঠাকুদ্দা ধীর ভাবে কহিলেন, "কেন ভাই বৃথা তোমরা দারোগা ভদ্রলোকের দুর্নাম দিচ্ছ? তিনি এক পয়সাও ঘুষ না নিয়েই তুলসীকে ছেড়ে দিয়েচেন। তুলসীকে তোমরা জোচ্চোর বদমাস্‌ বলে মনে করচ বটে, কিন্তু আসলে সে তা নয়। তবে কিছু নির্ব্বোধ আর অতিরিক্ত সরল—"

"অনঙ্গ বাধা দিয়া কহিল, "সরল বইকি, তা না হলে আর সরলা অবলা মেয়ে মানুষ সেজে অন্তঃপুরে ঢুকে বসেছিল?"

ঠাকুদ্দা ঝুলুরী হইতে দেশলাই বাহির করিয়া মাটীর প্রদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে কহিলেন, "দারোগার কাছে সে যা বলেচ তা শুনেচ নিশ্চয়। তবে আর কি শুনতে চাও?"

অনঙ্গ মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "ও সব ন্যাকামী কথা শুনে আমার বিশ্বাস করতে বয়ে গ্যাছে! ব্যাটা বলেচে কি না সে গোপীভাবে কৃষ্ণ প্রেমের সাধনা কর্‌চে—রঙ্গ আর কি? যাক্‌ ও সব বাজে কথা, আমার আসামী আপনি কোথায় রেখেচেন তাই বলে দিন, তার পর আমি দেখে নিচ্ছি।"

ঠাকুদ্দা কহিলেন, "তাকে আমি আড়াইটের ট্রেণে তুলে দিয়েছি, সে বোধ হয় এতক্ষণ সুলতাননগরে গিয়ে পৌছেচে।" "এক্ষুণি আমি তার করে দিচ্ছি, দেখি তাকে কে রাখে!" বলিয়া অনঙ্গ বায়ুবেগে ঘরের বাহির হইয়া গেল। বাবুর দল সকলেই তাহার সঙ্গী হইল, রহিল কেবল ভুজঙ্গ আর নগেন।

নগেন ঠাকুদ্দার নিকটে আসিয়া কহিল, "দারোগা বলে লোকটা বোকা, তাই অন্যের পরামর্শে স্ত্রীলোক সেজেছিল। এ তার প্রথম অপরাধ, সেই জন্যেই আরও তিনি তাকে ছেড়ে দিয়েছেন, বিশেষ অনঙ্গ তাকে যে যে রকম প্রহার দিয়েছিল, তাতে বেচারী খুবই জখম হয়েচে। কিন্তু স্ত্রীলোক সাজবার কারণ যেটা বলেচে তার অর্থ তো পরিষ্কার বোঝা গেল না। শুনলাম, আপনাকে না কি সব কথা খুলে বলেচে?"

ঠাকুদ্দা কহিলেন, "বলেচে বটে, তবে বিশ্বাস হয় তো সকলে তোমরা করতে চাইবে না, কিন্তু আমি করেচি। ছেলেটা ভারী কৃষ্ণভক্ত। কে তাকে বলেচে, গোপীভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করলে কৃষ্ণকে সহজেই পাওয়া যায়, সে তাই নারী বেশে গোপীভাব নিয়ে সাধনা করতে আরম্ভ করেছে। আমি তার ভুল বুঝিয়ে দিতে বললে, ভাগবতে যে লেখা আছে, আত্মবিস্মৃতিতে পুরুষত্ব জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গোপীভাবে মন পূর্ণ হয়, আমারই বা তা হবে না কেন? নারীবেশ ধরে থাকা নিরাপদ নয়, তোমরা তাকে দাগী জোচ্চোর বলে যা ভাবচ বাস্তবিকই সে তা নয়। তার অপরাধের জন্যে আইনের বিচারে এক্ষুণি তার কারাদণ্ড হতো বটে, কিন্তু তাতে কোমল তার মনের মধ্যকার সাধুভাবগুলি নষ্ট হয়ে যেত, কোমল ভাব গুলি শুকিয়ে গিয়ে সত্যি সত্যিই হয় তো সে একজন জেলের ফেরৎ দুষ্টলোক হয়ে দাঁড়াত। এ বরং তার ভালই হল। আমার তো মনে হয়

স্বয়ং শ্রীহরিই তাকে রক্ষা করেছেন, আমি আর দারোগা উপলক্ষ্য মাত্র। আফিস থেকে এসে মুখে জল টপ দাও নি বোধ হয়? যাও শীগ্‌গির। হরি বল হরি বল মন আমার।" ঠাকুমা প্রদীপের সম্মুখে ভাগবত খুলিয়া পাঠে মন দিলেন। নগেন ও ভুজঙ্গ বাহির হইয়া আসিল। তুলসী ছাড়া পাওয়াতে তাহারা কিন্তু বেশ আরাম বোধ করিল। তাহাকে অপরাধী জানিয়াও মন যেন তাহার কঠোর শাস্তির পথে সায় দিতে চায় নাই। এখন সমস্ত শুনিয়া তুলসীর নির্ব্বোধ সরলতার প্রতি আর সন্দেহ রহিল না। ভুজঙ্গ বরং নগেনকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা যে তার ক'তে গেলেন, আবার তুলসী যদি গ্রেপ্তার হয়?"

নগেন কহিল, "ভয় নেই, অত আর সে করতে যাবে না, রাগের মাথায় শাসিয়ে গেল এই পর্য্যন্ত।"

শ্রীসরসীবালা বসু।

রাণী রাসমণির স্বপ্ন

(রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়া কোনো সদ্‌ব্রাহ্মণ পূজারি প্রথমে পান নাই। পরে স্বয়ং পরমহংস রামকৃষ্ণদেব পূজারী হন।)

শুধু সারি সারি মন্দির গড়ি
মিটিবে কি সাধ হরি হে,
অর্থ আমারে দিলে যদি প্রভু,
দাও সার্থক করি হে।
বড় মনোদুঃখে দিবস গুজারি
চাহেনা কেহই হতে যে পূজারি,
দেবতা কি মোর পূজাহীন হয়ে
মন্দিরে রবে পড়ি হে?

২

দিয়াছ জনম শূদ্রের ঘরে,
সেবা যে আমার ধরমই
মরমের ব্যথা জান হে দেবতা
অন্তর্য্যামী মরমী।
হে দরদী জানো হিয়ার দরদ
বুকে যে কমল ফুটালে শরৎ
চরণে দিবার নাহি অধিকার
ফিরে এসু পেয়ে সরমই।

৩

আমার এ পূজা বিশ্বের রাজা
ব্যর্থ হবে হে কি কারণ?
অবলার লাজ নিবার হে আজ
তুমি ত লজ্জা নিবারণ।
দেবতা আমার রবে কি ভুখারী?
মেলেনা পূজারি এদেশ উজাড়ি
ব্রাহ্মণ দিল ব্যর্থ করিয়া
প্রাণপণ মোর আয়োজন।

৪

কেঁদে কেঁদে রাণী ঘুমায়ে পড়িল,—
ভক্তিতে বাঁধা শ্রীহরি,
পরাণ তাহার করিল পরশ
উঠিল রমনী শিহরি।
তন্দ্রা আলসে হেরে হৃদিরাজ
উদয় হয়েছে আজি হৃদি মাঝ,
অমিয় বরষে সে মধু মাধুরী
তিয়াসা মেটে না নেহারি।

৫

সুমধুর বাণী—কহে ওগো রাণি
পূজারি হবে না খুঁজিতে।
তোমার প্রেমেতে দেবতা যেতেছে
তোমারি দেবতা পূজিতে।
আরতির আলো ধূপের গন্ধ
লয়ে কি দেবতা রহিবে অন্ধ ?
এবার সেবার পরমানন্দ
যাবে সে বুঝাতে বুঝিতে।

৬

কনক প্লাবনে প্লাবিল ভুবন,
হেরে রাণী মহা পুলকে
মন্দিরে তার বিশ্ব তীর্থ
ভরা দেয়ালীর আলোকে।
দূর দূর হতে যাত্রীর দল
পূত আঙিনায় আসে অবিরল ;
রচেছে পূজারী ভকতির বলে
অভিনব পুরী ভূলোকে।

৭

জীবে শিবে দেহে করি একাকার
একি প্রেমধারা ঝরে গো!
এক হাতে পূজে দেবতায় সেথা,
দুই হাতে সেবে নরে গো।
নাহি জাতিভেদ, নাহি ঘর পর,
সাদায় কালোয় সেথা হরিহর,
মহাপ্রাণতার কুম্ভমেলায়
আনন্দ নাহি ধরে গো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

জব্বলপুর

মথুরা বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া আসিবার পর হইতে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে দক্ষিণ ভারত একবার ঘুরিয়া আসি। কিন্তু না কারণে সে আশা, সে তৃষ্ণা মিটে নাই। কতবার পূজার ছুটী আসে, ফুরায়, বন্ধুদের নিকট সানুনয় প্রার্থনা, কাতরতা, যুক্তি তর্ক, ঐহিক ও পারমার্থিক লাভের চিত্র প্রদর্শন—সবই বিফল হয়। অতএব নিজেকে বুঝাইলাম সময় না হইলে তীর্থ ভ্রমণের পুণ্যার্জ্জন ঘটিবে না। কিন্তু পূজার ছুটী ঘনাইয়া আসিলে আবার লুপ্ত ভ্রমণ স্পৃহা জাগিয়া উঠে, আবার বন্ধুদের নিকট অনুনয় বিনয়ের পালা সুরু হয়, আবার সেই পুরাতন বিফলতা আসিয়া হতাশ করিয়া দেয়। এবার কিন্তু দেবতার কৃপা হইল—দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণের প্রস্তাব করিবামাত্র আমার সুহৃৎ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায় ও গোকুলচন্দ্র সাধুখাঁ—সাগ্রহে তাহা অনুমোদন করিলেন। আমি আদা জল খাইয়া সর্ব্বভারতব্যাপী লৌহবর্ত্ম সম্বন্ধে সংবাদদাতা ব্রাডশ ও অন্যান্য দুই একখানি গাইড পুস্তক অবলম্বনে পাঁচ সপ্তাহের মত করিয়া দক্ষিণ ভারতে দ্রষ্টব্য স্থানগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। পরদিন রায় মহাশয় জানাইলেন যে যদি উক্ত তালিকায় বম্বে ও কলম্বো না থাকে তাহাহইলে ভ্রমণ করিতে যাইবার সম্বন্ধে 'বিবেচনা' করিবেন।

প্রায়ই দেখা যায়, কোনও ব্যাপারে যদি কাহারও প্রার্থনা বা আবেদন ভবিষ্যৎ 'বিবেচনার' জন্য মুলতুবি থাকে, তবে ভবিষ্যৎ কখনও বর্ত্তমানে পরিণত হয় না।

অগত্যা রায় মহাশয়কে আশ্বাস দিলাম তাঁহারই মনের মত করিয়া তালিকা প্রস্তুত করিব। প্রায় আধ দিস্তা কাগজের অন্ত্যেষ্টি সাধন ও একটী পেন্সিলকে বামনাবতারে পরিণত করিবার পর একটী তালিকা মনোনীত হইল। তাহাতে চারিটা খুঁটা স্থির থাকিবে ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঠিক হইল—যথা কলিকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ ও লক্ষ্ণৌ, কিন্তু আবশ্যক হইলে সেই তালিকার ঈষৎ পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। যখন দেখিলাম মধ্যভারত দিয়া আমাদের গতি নিরূপিত হইতেছে তখন জব্বলপুর, এলোরা, নাসিক ও বম্বের সহিত সাঁচি ও উজ্জয়িনীকেও তালিকাভুক্ত করিলাম। পরে উজ্জয়িনী ও নাসিক বাদ গিয়াছিল, কিন্তু সাতরাজার ধন এক মাণিক—অজন্তার দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। ক্রমে সকলই বিবৃত হইবে।

ছুটী যতই নিকটবর্ত্তী হয় ততই নানা বাধার উৎপত্তি হইতে রহিল, যথা—দীর্ঘ ভ্রমণ স্বাস্থ্যে কুলাইবে তো? খরচ সঙ্কুলান হইয়া উঠিবে তো? দেখিলাম উৎসাহের উত্তাপ, বর্ষার জোলো হাওয়ায় কমিয়া আসিতেছে। অতএব সময় নষ্ট হইলে বড় সাধের মৎলবটা ফাঁসিয়া যাইতে পারে আশঙ্কা করিয়া স্থির করিলাম যে, ২৩শে সেপ্টেম্বর কলেজ বন্ধ হইলেই দাও ছুট। সেই সবে সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, সাতদিন নাকি যাত্রা নাস্তি, তাহার পর ২৩শে শনিবার বারবেলা, তাহাতে ত্র্যহস্পর্শ - যাত্রাদি শুভকর্ম্ম নাস্তি; দিনটাও বড় অনুকূল সকাল হইতে অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টি—একখানি গাড়ী পাইবার যো নাই! কিন্তু উৎসাহের প্রযত্নের সম্মুখে কিছু কি তিষ্ঠিতে পারে? শনিবার বারবেলা কুসংস্কার সাব্যস্ত হইয়া গেল। ত্র্যহস্পর্শ? কিন্তু আমরা তিনজনে মিলিয়া তাহার অপেক্ষা কি কমই বা হইয়াছি? গ্রহণের দরুণ যাত্রা নাস্তি দেবীপক্ষে খাটে না—মা যখন যাত্রা করিয়াছেন, তখন সন্তানের যাত্রায় বাধা কোথায়?

২৩শে যাত্রা করিয়া ২৪শে হুগলী আসিলাম। আরও দুইজন আত্মীয় সঙ্গে যাইবেন কথা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের একজনকে শয্যাশায়ী দেখিলাম, অপরের কোনও সন্ধান মিলিল না যে ত্র্যহস্পর্শ সেই ত্র্যহস্পর্শই রহিয়া গেলাম! সেইদিনই কলিকাতা হইতে বম্বে মেলে সন্ধ্যা
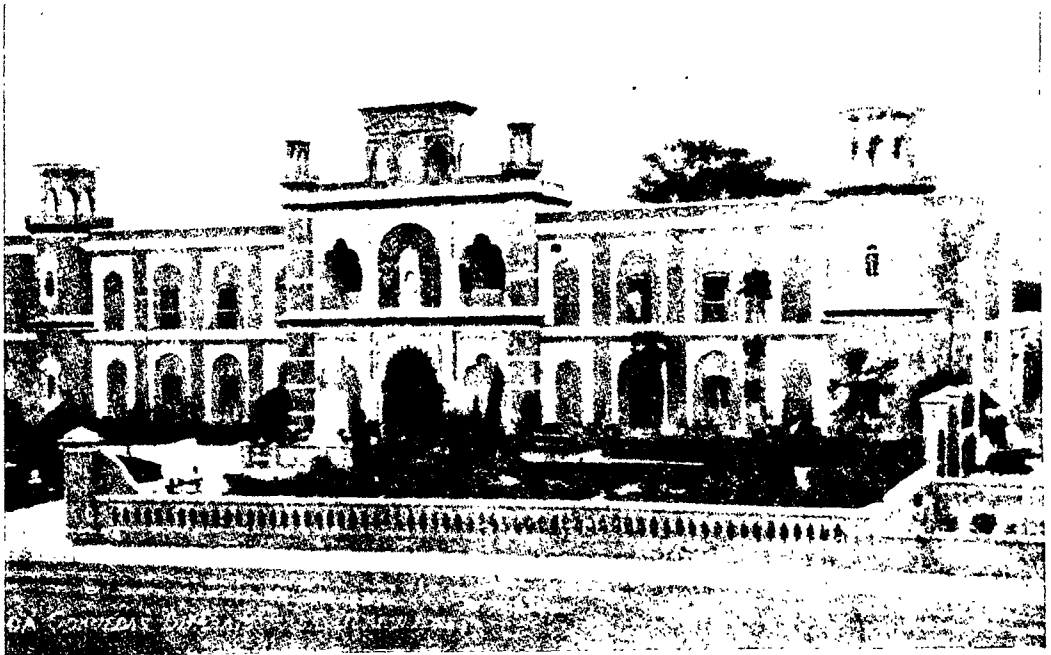
রাজা গোকুলদাসের ধর্ম্মশালা
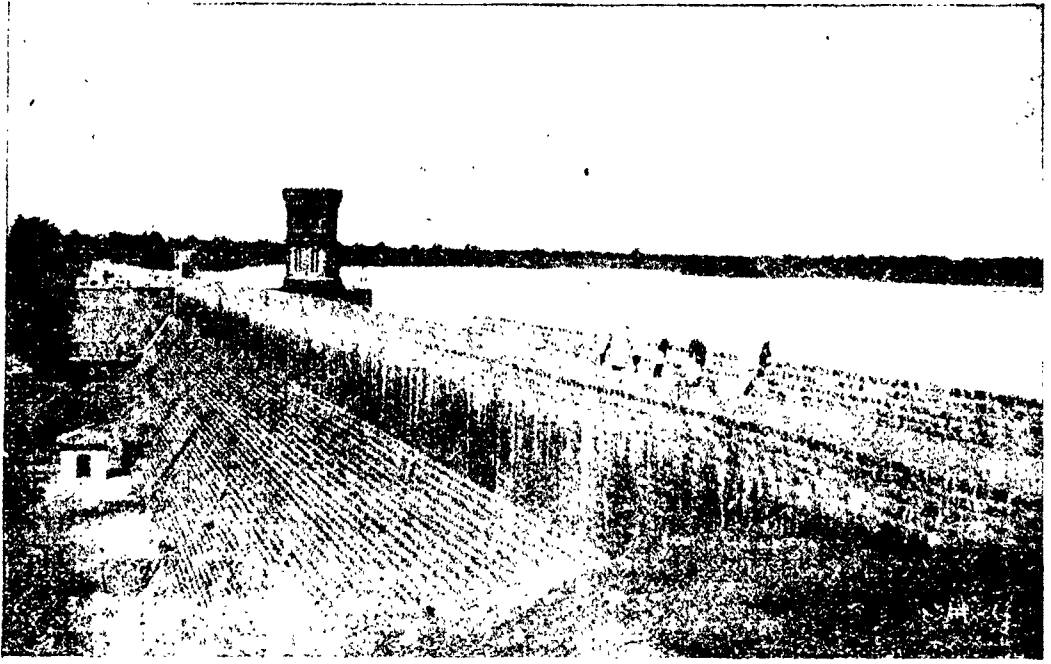
রিজারভয়ার, জব্বলপুর ওয়াটার ওয়ার্কস্

সাতটার সময় দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে ভিড় ছিল না, রসদও ছিল প্রচুর, বর্দ্ধমান ছাড়িতে তাহার সৎকার করিয়া, চুরট সেবনান্তর শয্যা গ্রহণ করিলাম। নিদ্রাদেবী নেত্রপল্লবে অধিষ্ঠিত হইতেই উহা মুদ্রিত হইল। ভোর চারিটার সময় শোণ ইষ্টব্যাঙ্ক ষ্টেশন দেখিলাম—তাহা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া দেখিয়াছিলাম, না ভোরের তরল অন্ধকারের আবরণ জড়িত দেখিয়াছিলাম তাহা হলপ করিয়া বলিতে পারি না। চক্ষু বিস্ফারিত হইল মোগলসরাইয়ে। কতটা ক্ষুধায়, কতটা ভিড় দেখিয়া, আর কতটাই বা গুজরাটগামী সহযাত্রীদের চীৎকার আলাপনে তাহা বলিতে পারি না!

সকল অনুষ্ঠানেরই একটা ধারা, একটা নিয়ম থাকা প্রয়োজন। খাঁটি বৌদ্ধগণের ন্যায় আমরাও ত্রিশরণের আশ্রয় লইয়াছিলাম—নিয়ম সর্ব্বথা পালিত হইয়াছিল। আমাদের ত্রিশরণ এইরূপ—

স্নানের শরণ লইলাম।
আহারের শরণ লইলাম॥
নিদ্রার শরণ লইলাম॥৷

এবং এই ত্রিশরণের অনুকূল যাবতীয় প্রক্রিয়া অক্ষরে অক্ষরে বোধ হয়—কিছু অধিক মাত্রাতেই—অনুসৃত হইয়াছিল। এই নিমিত্তই সাত সহস্র মাইলেরও অধিক এই দীর্ঘ ভ্রমণে কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় নাই।

চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, অতি আরামে অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে সত্যরঞ্জন বাবু দন্তকাষ্ঠ চিবাইতেছেন। গোকুল বাবু কোথায়? জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন তিনি স্নানে গিয়াছেন। তাহাও বেশ ঘটা করিয়া। কেমন করিয়া নিঃশব্দে তাঁহার ব্যাগ (তাহাকে আত্মারাম সরকারের ভোজবাজির থলিয়া বলিলেও বলা যায়) হইতে হরলিক বোতলান্তর্গত সর্ষপ তৈল সম্যক্ (অর্থাৎ অর্দ্ধঘটিকা ব্যাপিয়া) মৃষ্ট হইয়া দৈহিক স্নেহভাবের উৎকর্ষ সাধন করিল, কেমন করিয়া স্নানের কাপড় খানি আস্তে আস্তে গুছাইয়া এক হস্তে কোটা অপর হস্তে সুরাহি (কুঁজা) লইয়া তিনি উর্দ্ধশ্বাসে জনসঙ্ঘ উদ্বিগ্ন ও উদ্বেলিত করিয়া জলের কলের দিকে ছুটিলেন তাহাই ভাবিতেছিলাম। সমস্ত রাস্তাটাই তিনি দশটার পূর্ব্বেই এই শরণটার সম্যক্ পালন করিয়াছিলেন।

কামিনিয়া গেট, জব্বলপুর
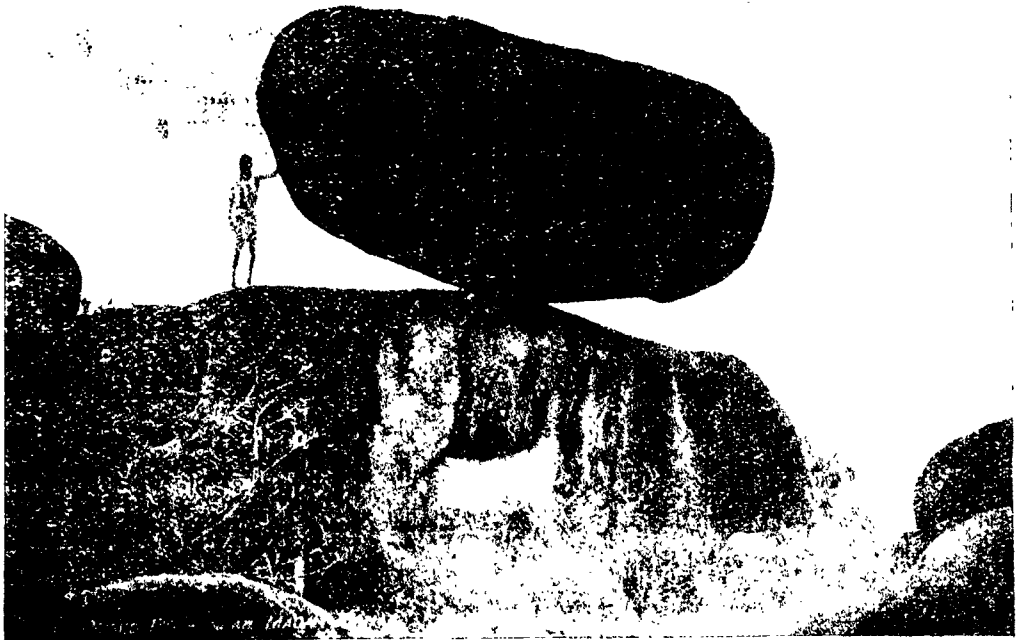
গরহা গ্রামের নিকটস্থ পাহাড়ে নিরালম্ব শৈলখণ্ড

অন্য সময়ে তিনি বড় একটা টাইম টেবল দেখিতেন না, কিন্তু প্রাতঃকাল হইতেই দেখিতেন কোথায় গাড়ী

১৫ মিনিট বা আধ ঘণ্টা থামিবে; এবং যথাসময়ে নির্ব্বিকার চিত্তে তৈল মর্দ্দনান্তর জলের কলের

অপেক্ষা করিতেন। দ্বিতীয় শরণের ব্যবস্থা আমার চার্জ্জে ছিল এবং তদুপলক্ষ্যে আমি ষ্টোভ, কুকার, কড়া খন্তি, সব রকমের ভাজা মশলা, তিনটি কোটা করিয়া জ্যাম (jam) মাখন, কন্‌ডেনস্‌ড মিল্ক—মায় একতরফা চাল ডাল ঘি লবণ এমন কি চা চিনি ও কেটলি—সকল বন্দোবস্তই করিয়াছিলাম। রাস্তায় পাঁউরুটী পেয়ারা আপেল ও লেবু কিনিয়া লইয়াছিলাম। ইহার পরে দিবাভাগে ও রজনীযোগে তৃতীয় শরণের কোনও ব্যাঘাত হইত না।

পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম অনেক স্থলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বিহার অঞ্চলের স্থায়। কোথাও কোথাও বটিকার বিজ্ঞাপন ফলকে লাগিয়া বিষম আহত হইল।

দূরকে নিকট এবং নিকটকে দূর করিয়া আমরা ক্রমে স্থটনা, মৈহার ও কাটনি অতিক্রম করিলাম। এই তিনটা স্থান চুণের জন্য বিখ্যাত। স্থটনা ও কাটনির ফ্যাক্টরী দেখিবার মত। আর পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করিতে পারিলেই জব্বলপুর আসিয়া পৌছি। এই মধ্যবর্ত্তী ভূমিভাগের শোভা বড়ই নয়নপ্রীতিকর। পূর্ব্বরাত্রির বর্ষণে একটা শুচি স্নিগ্ধ ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। শৈল-শৃঙ্খলের আবেষ্টনের মধ্য দিয়া আমরা নীত হইতে লাগিলাম। সেই শোভা
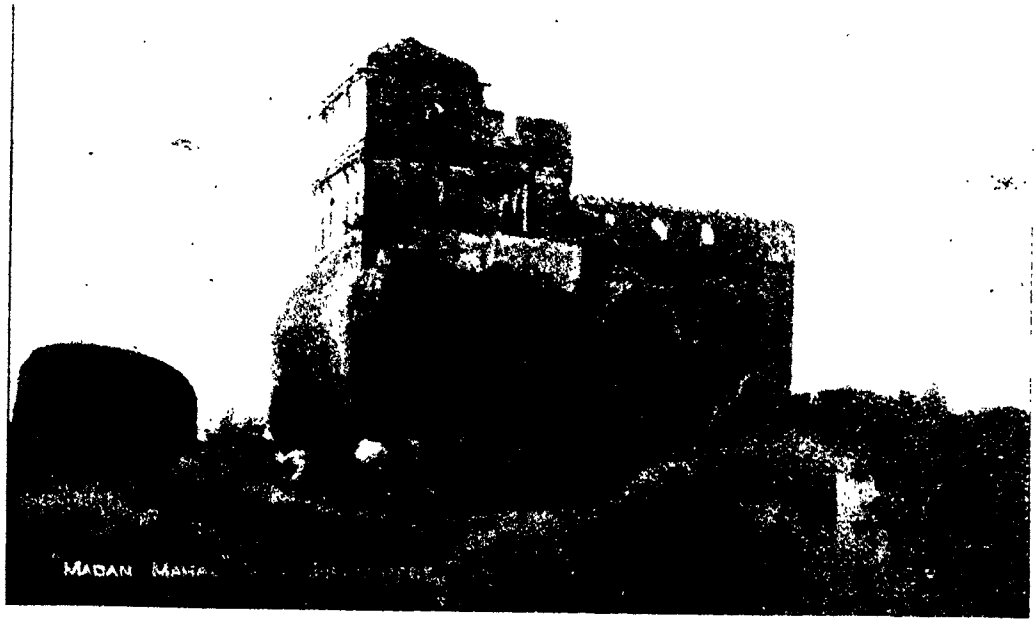
মদন মহল

পর্য্যায়ক্রমে উন্নত ও অনুন্নত ভূমিভাগ তরঙ্গায়িত হইয়া দূরে চক্রবালে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। কোথাও বা দৃষ্টি ক্ষুদ্র বৃহৎ শৈলে প্রতিহত হইয়া নিকটে কুমুদ কহ্লার পঙ্কজে প্রফুল্ল সরোবরের শারদ সৌন্দর্য্যের উপর নিপতিত হইতে না হইতে, দ্রুতধাবমান্ বাষ্পীয় শকটের কল্যাণে কোলাহল মুখরিত ধূলি-মলিন কোনও ষ্টেশনের প্রাচীরলগ্ন আতঙ্কনিগ্রহ পরিপূর্ণ উপভোগের নিমিত্ত আমরা কক্ষের ভিতরে একবার এক পার্শ্বের বাতায়ন একবার অন্য পার্শ্বের বাতায়নে উপস্থিত হইতে লাগিলাম। সহসা সেই উপভোগের বিক্ষোভ জন্মাইয়া, যানস্থিত তাবৎ আরোহীর অস্থিপীড়া উৎপাদন করিয়া অত্যন্ত বেরসিক বেতালের মত ঘড়াঙ্‌ ঘঙ বিকট শব্দে গাড়ী থামিল। ইহার তাৎপর্য্য নিরূপণার্থ অনেকেই নামিয়া পড়িলাম।

গৌরনদীর উপরিস্থ সেতু

নর্ম্মদা জলপ্রপাত

গার্ড ও ড্রাইভারের মিলন হইল—পরে তথ্য অবগত হইলাম। গুমটি রক্ষকের অনবধানতায় ফটক খোলা ছিল, তাহার ফলে একটা বৃহৎ বলীবর্দ্দের অকালে বলি হইয়া গিয়াছে। পরে সুপ্রচুর ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে গাড়ী জব্বলপুরের বৃহৎ প্লাটফরমে আসিয়া উপনীত হইল। এই ষ্টেশনের বহির্ভাগের দৃশ্যটি বেশ মনোরম।

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। আমরা ষ্টেশনের সন্নিহিত (পাঁচ মিনিটের পথ) সুদৃশ্য বৃহদায়তন রাজা গোকুল দাসের ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই উদারচেতা মুক্তহস্ত পুরুষ স্থানীয় জলের কলের নিমিত্ত প্রভূত অর্থদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই দানের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ এই সৌধ স্থানীয় মিউনিসিপালিটি কর্তৃক ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় এবং উহার ব্যবস্থার ভার মিউনিসিপালিটির উপর অর্পিত হয়। পুরোভাগে রাজা গোকুলদাসের মর্ম্মর মুর্ত্তি। ভারতীয় পান্থদিগের উপযোগী সুন্দর বিশ্রামাগার কক্ষের জন্য কোনও ভাড়া দিতে হয় না। আমরা ম্যানেজারের সৌজন্যে দ্বিতলের একটি কক্ষে আশ্রয় পাইলাম। আসবাব একটী চেয়ার, একটী টেবিল, লৌহ নির্ম্মিত একটা খাট ও দেওয়ালে একটা ব্র্যাকেট্ আছে। উপরে জলের কল ও শৌচাগারের সুবন্দোবস্ত আছে।

সত্যবাবু ও আমি কালক্ষেপ না করিয়া স্নান সারিয়া লইলাম—কেন না উভয়েই তখনও পর্য্যন্ত এই শরণের শরণ লই নাই। পরে ষ্টোভ জ্বালিয়া সুগন্ধি গোল্ডেন অরেঞ্জ পিকো চা প্রস্তুত করিলাম—কক্ষ আমোদিত হইল। তিন পেয়ালা গলাধঃকরণ করিবার পর যেন প্রকৃতিস্থ হইলাম। তাহার পর দ্রৌপদীর পালা আরম্ভ হইল। সে পালা শেষ হইতে রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিল। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে পরদিনের ইতিকর্ত্তব্যের আলোচনা হইল। পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলাম যে প্রাতে উঠিয়া মীরগঞ্জ ষ্টেশন হইতে মার্ব্বেল পাহাড় দেখিতে যাইব। উক্ত ষ্টেশন গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের উপর অবস্থিত। সেখান হইতে মার্ব্বেল পাহাড় তিন মাইল দূরে। কিন্তু অসুবিধা এই যে কোন যান পাওয়া যায় না; পদব্রজে যাইতে হয়। অতএব স্থির করিলাম
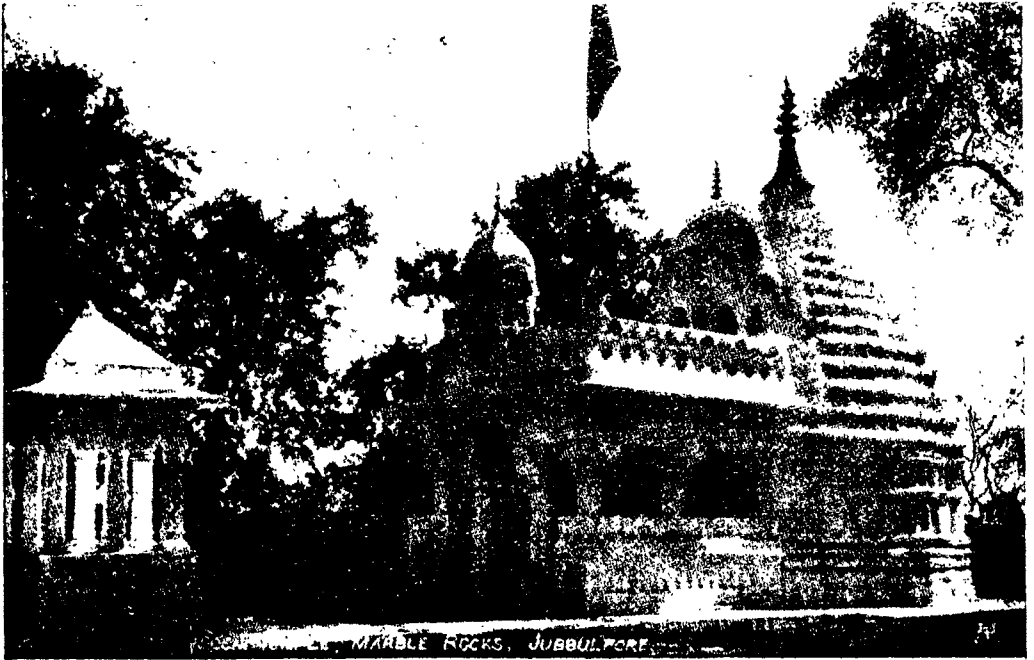
চৌষটযোগিনীর মন্দির

যে পরদিন উষাকালেই টোঙ্গা করিয়া আমরা বরাবর সেইখানে যাইব।

অগ্নির স্ফুরণে রসদ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং গোকুল বাবু ও আমি সেই রাত্রেই রসদ সংগ্রহের নিমিত্ত বাহির হইয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে একজন মিঃ চাটার্জ্জী আমাদের কক্ষে গল্প করিতে আসিলেন, অতএব সত্য বাবু তাঁহার জিম্মায় রহিলেন। বেশ উপভোগ্য ঠাণ্ডার আমেজ পড়িয়াছে। আমরা টোঙ্গা করিয়া সদরবাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটি বাঙ্গালী ময়রার দোকান আছে। সে অনেক দিন বাঙ্গলা ছাড়িয়াছে—প্রায় বিশ বৎসর হইবে—তাহা বোঝা গেল কথারই সুরে। তথা হইতে একটী কৃত্রিম উৎসের নিকটে আসিলাম। এই উৎস (Water Fountain) ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। নূতন জলের কল হইতে তখন সবেমাত্র সহরে জল সরবরাহ হইতে সুরু হইয়াছে। লর্ডগঞ্জ নামক ওয়ার্ডে চৌরাহায় ইহা অবস্থিত—বাজারের সন্নিহিত। কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও ফল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে দশটার সময় ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। ফিরিবার পথে আলোকে ভিক্টোরিয়া টাউনহল ও অন্ধকারে ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল দেখিয়া আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম সত্যবাবু চাটার্জ্জী বর্ণিত নানাবিধ সরস গল্পে সময়টা বেশ কাটাইয়াছেন।

গোকুল বাবু সেই লৌহখট্টায় শয়ন করিয়া নিদ্রাবিভূত হইলেন, আমরা ভূমিতলে শয্যাগ্রহণ করিলাম। নিদ্রাকর্ষণ হইতে না হইতে সূচবিদ্ধ হইলাম। ব্যাপার কি অবধারণের নিমিত্ত মোমবাতি জ্বালিয়া দেখি—কী দৃশ্য! সত্যবাবু শয্যায় উপবিষ্ট! নেত্র গহ্বর হইতে ব্রহ্মরোষ অগ্নিশিখার মুর্ত্তি ধারণ করিয়া বাহির হইতেছে শয্যাতল রক্তকলঙ্কিত অসংখ্য রক্তপ গতাসু হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। তথাপি তাহাদের নিবৃত্তি নাই। আসিতেছে—আসিতেছে—আসিতেছে! আমরা দুইজনেও যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলাম। সেই মৎকুণ সংগ্রামের বিরতি নাই—নয়নের উপরই বিভাবরী কাটিয়া গেল। ডেভিড ও গোলায়থের (David and

জব্বলপুর মর্ম্মর শৈল

Goliath) যুদ্ধ এত ভীষণ হইয়াছিল কি না সন্দেহ—তবে মন্দের ভাল আছেই, আমরা খুব ভোরেই উঠিলাম।

প্রাতে স্নানান্তে জলযোগ করিয়া টোঙ্গায় উঠিয়া বসিলাম। ছয় টাকা যাতায়াতের ভাড়া ঠিক হইল। মার্ব্বেল পাহাড় জব্বলপুর হইতে ১৩ মাইল দূরে, ভেড়াঘাট নামক গ্রামে অবস্থিত। এই ভেড়াঘাট গ্রামে গয়-কর্ণ দেবের মহিষী অল্হণদেবীর মর্ম্মর লিপি পাওয়া যায় (Bheraghat Stone Inscription of Queen Alhana Devi - Chedi year 907) বস্তুতঃ জব্বল প্রদেশটা পূর্ব্বে চেদিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জব্বল-পুরের ছয় মাইল পশ্চিমে তেওয়ার নামক গ্রামে অল্হণ দেবীর পুত্র জয়সিংহদেবের মর্ম্মর লিপি পাওয়া যায় (Tewar Stone Inscription of Jaya Sinha Deva—Chedi year 928)। জব্বলপুরের যশঃ-কর্ণদেবের তাম্রফলকে (Jubbulpur Copper-plate) পাওয়া যায় জব্বলপুরের প্রাচীন নাম ছিল জাবালিপুর।

বেলা ৯॥০ টার সময় আমরা এই ভেড়াঘাট গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। পথে আসিতে আসিতে কয়েকটী সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম—কয়েকটির আলোকচিত্র সন্নিবিষ্ট হইতেছে। প্রথম গরহা নামক গ্রামের নিকটে পাহাড়ের উপর একটা বৃহৎ শৈলখণ্ড কতকটা নিরালম্ব ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কিঞ্চিৎ দূরে সুবৃহৎ শৈলখণ্ডের উপর রচিত একটা সৌধ দৃষ্টিগোচর হইল। উহাই মদন মহল প্রাচীন ইমারত। ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে মদন সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য একান্ত মনোহর। চন্দ্রালোকে আরও সুন্দর দেখায়। তৃতীয়তঃ আর একটা পাহাড়ের উপর অনেক উচ্চে আর একটী বাড়ী দেখিলাম, নীচে হইতে সোপান শ্রেণী উঠিয়া গিয়াছে। নীচে পান্থাশ্রম আছে। টোঙ্গাওয়ালার মুখে শুনিলাম উহা এক বৃদ্ধা জাঁতাওয়ালী তাহার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় দিয়া তৈয়ার করিয়া দিয়াছে। ভেড়াঘাট যাইতে একটী নদীর উপরিস্থিত সেতু দিয়া চলিয়া গেলাম। সেই নদীটি নর্ম্মদায় আসিয়া মিশিয়াছে। নদীর নাম গৌর। এই নদীর উপর আসিবার আগেই একটা বাবলা গাছের ডালে কতকগুলা ন্যাকড়া ঝুলান রহিয়াছে দেখিলাম। কিয়ৎ পূর্ব্বে একজন ছোকরা গাইড আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তাহাকে এবং টোঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার অর্থ কি? তাহারা বলিল

এই প্রবন্ধের লেখক—
অধ্যাপক শ্রীকালীপদ মিত্র এম-এ বি-এল

ঐ বৃক্ষের পূজা হয়, উনি বাবুলাদেবী, অপর নাম চিন্দন দেবী। গাছে ন্যাকড়া ঝুলান আর ও দেখিয়াছি। মুঙ্গেরের নিকট পীর পাহাড়ের উপর পীর সাহেবের কবরের কাছে একটি মেহদি গাছে অনেক ন্যাকড়া ঝুলান রহিয়াছে দেখিয়া পীরের সেবায়েতকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে পীর সাহেবের নিকট মানত করিয়া যাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে তাহারা গাছে ন্যাকড়া বাঁধিয়া যায়। বর্দ্ধমান জেলায় ন্যাকড়াই চণ্ডী আছেন। বোধ হয় (এখন ঠিক স্মরণ হইতেছে না) দার্জ্জিলিঙ প্রদেশে তিনধারিয়া ষ্টেশনের নিকট গাছে এইরূপ ন্যাকড়া ঝুলান দেখিয়াছি। কিন্তু এই ব্যাপারটা এখনও আমার নিকট রহস্য হইয়া আছে।

সাড়ে নটার সময় টোঙ্গা হইতে অবতরণ করিয়া 'গাইড' সমভিব্যাহারে দুইটা কবরের নিকট আসিয়া পৌছিলাম। একটাতে লেখা রহিয়াছে Here lie the remains of Richard Bodlyn, Esq, Civil Engineer G. I P. Raiwlway who was attaced by bees and drwoned int he Nerbudda on the 10th May 1859 Aged 27 years. Erected by his colleagues." যে মক্ষিকার দংশনে ব্যাকুল হইয়া নর্ম্মদায় নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন হয় তাহার হুলকে বলিহারি যাই। এখন হইতে আমার সিগারেট 'কেস' পকেটেই রহিয়া গেল—মৌমাছির 'জুরিস্‌ডিক্‌শন' ছাড়িয়া তবে ধূমপান করি। শুনিলাম এখনও মৌচাক ধ্বংস করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লোক বাহাল আছে।

এখান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া নর্ম্মদার জলপ্রপাত নয়নগোচর হইল। দূর হইতে তাহার শব্দ অনেকটা গাড়ীচলার শব্দের মত শুনাইতে লাগিল। কালিদাস বর্ণিত এই সে নর্ম্মদা—রেবা। মেঘদূতের শ্লোক মনে পড়িয়া গেল—

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূ ভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥

নর্ম্মদাতে তখনও বেশ জল রহিয়াছে বলিয়া প্রপাত মাত্র ১৫।২০ ফুট উচ্চ হইতে নীচে পড়িতেছিল। তাহাতে স্ফটিকচূর্ণের সৃষ্টি হইতেছিল। তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জলকর্ণিকা বাষ্পাকারে উড়িয়া বাতাসে মিশিয়া যাইতেছিল। এই জন্যই সম্ভবতঃ এখানকার লোকেরা এই জল প্রপাতকে 'ধুঁয়াধারা' বলে। দৃশ্য মন্দ নহে, কিন্তু তখন আমরা শিবসমুদ্রের বিখ্যাত কাবেরী প্রপাত ও ভারতের পশ্চিম উপকূলে দুধসাগর প্রপাতের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। ছয়শত ফুট উচ্চ হইতে পতিত জলধারার সহিত কি ইহার তুলনা হয়?

'ধুঁয়াধারা' হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া উচ্চে বক্রকুটিল পথ বাহিয়া 'চৌষট্‌ যোগিনীর" মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটা বাস্তবিক 'গৌরীশঙ্করের'। মন্দিরাভ্যন্তরে গৌরী ও শঙ্করের মূর্ত্তি আছে। সম্মুখে একটা মণ্ডপ আছে; তথায় বৃহদাকার ঘণ্টা বাজাইয়া ভক্তের আগমন ঘোষণা করিয়া দিলাম। অঙ্গনটা বৃত্তাকারে প্রাচীর বেষ্টিত, তথায় দুর্গার অনুচরী যোগিনীদের মূর্ত্তি; সর্ব্বশুদ্ধ ৮২টা মূর্ত্তি আছে। যোগিনীদের সংখ্যা বস্তুতঃ চৌষট্টি, এবং এই নিমিত্তই ইহার নাম 'চৌষট যোগিনী' হইয়াছে। কিন্তু 'গাইড' মহাপ্রভু বলিলেন ১৬৪, অতএব তাহাই সাব্যস্ত হইল! মূর্ত্তিগুলির পাদপীঠে মধ্যযুগের লিপিতে পরিচয় লিখিত ছিল। মন্দিরাঙ্গন ত্যাগ করিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী দিয়া নামিয়া আসিলাম। গোকুল বাবু গণিয়া বলিলেন ১৬৪টা পদবী! কি আশ্চর্য্য মিল!

জঠরাগ্নি তখন খাদ্যের অভাবে অন্ত্র দগ্ধ করিতেছিল। শান্তির প্রয়োজন অনুভব করিয়া স্থানীয় এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের শরণ লইলাম। সাধ হইল ঐ দেশের খিচুড়ী খাইয়া রসনা তৃপ্ত করি। অতএব তদনুরূপ বন্দোবস্ত করা গেল। তরকারী পাওয়া গেল না, আমের আচার সেই স্থান অধিকার করিল। মধ্যাহ্ন ভোজন প্রস্তুত হইবার অবকাশে আমরা 'মর্ম্মর পর্ব্বত' দেখিতে চলিলাম। অনেকেই ভয় দেখাইয়াছিলেন যে এখন নৌকা পাওয়া যাইবে না; কিন্তু আমাদের ভাগ্য বড়ই সুপ্রসন্ন দেখিলাম। এই বৎসরে আমরাই প্রথম যাত্রী এবং ২৬শে সেপ্টেম্বরই নৌকা খুলিবার প্রথম দিন। আমরা ৸৶০ দিয়া 'পাস' সংগ্রহ করিয়া ৭জন মাল্লা লইয়া নর্ম্মদায় নামিয়া পড়িলাম। নদী দ্রুত স্রোতে খাড়াই পাহাড়ের মাঝ দিয়া নিজের রাস্তা কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা উজানে চলিলাম। বড়ই বিপজ্জনক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নদীর স্রোত খরবেগে আসিয়া পাহাড়ে ধাক্কা দিতেছে, তাহা প্রতিহত হইয়া বাঁকিয়া উল্টা চলিয়াছে। এই বেগ সংযমিত করিয়া তাহার উপর দিয়া নৌকা লইয়া যাওয়া বিশেষ কষ্টকর হইতে লাগিল। মাঝিদের বাহুর পেশী, ললাটের শিরা

স্ফীত হইয়া উঠিল, অবিশ্রান্ত স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। 'মোটে'র (mate) ভৎর্সনার বিরাম নাই। ক্রমে আমরা যেখানে আসি য় সেখান হইতে দেখিলাম দুই ধারের মর্ম্মর প্রাচীর দূরে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। অনির্ব্বচনীয় সে দৃশ্য! শুনিলাম সেখানে জলের গভীরতা প্রায় দুইশত ফুট হইবে। জল আরও নামিলে নাকি মর্ম্মরের শ্বেতাভা অধিকতর বিশদ হয়। কোনও স্থলে পীত, কৃষ্ণ, গৈরিক ও সবুজ নানা রঙের প্রস্তর দেখিলাম। যাইতে যাইতে মাঝিরা একটা ধর্ম্মশালা দেখাইয়া বলিল যে এটাও রাজা গোকুল দাসের, নামমাত্র দৈনিক চারি আনা দিয়া পান্থ সপরিবারে সপ্তাহাধিক কাল থাকিতে পারে। সেখানে একটি সরকারী ডাক বাঙ্গলাও আছে। নর্ম্মদা তীরে সাহেবদের একটা ব্যাণ্ডগৃহ রহিয়াছে। এমন সুন্দর স্থানে ভোগের সমস্ত উপাদানই যখন বর্ত্তমান তখন বাণ্ডই বা বাদ যায় কেন?

ফিরিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু ফিরিতে কি মন সরে? ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিলাম। সেখানে মধ্যভারতের খিচুড়ী ঘৃতস্নিগ্ধ হইয়া অমৃতোপম হইয়াছে। ভোজন করিয়া, নিকটেই কিছু মার্ব্বেল পাথরের জিনিষ কিনিয়া ফিরিয়া আসিলাম। তখন প্রায় পোনে চারিটা হইয়াছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বম্বে মেল আসিয়া পড়িল। আমরা সাঁচির উদ্দেশে আবার যাত্রা করিলাম।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

মূকবধির-বন্ধু

৺যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মূকবধির সমাজের পরম বন্ধু, স্বর্গীয় যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত। যামিনীনাথ নীরবকর্ম্মী ছিলেন, মূকবধিরদিগের জন্য তিনি তাঁহার জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা, অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ ত্যাগের ফলে আজ কলিকাতার মূকবধির বিদ্যালয় (Calcutta Deaf and Dumb School) দেশের একটী মহা সামাজিক সমস্যার সমাধান করিয়াছে। যিনি 'মূককে বাচাল' করিয়াছেন, পশুজীবন হইতে স্বাধীন মানব জীবনে উন্নীত করিয়াছেন, তিনি দেশের ও দশের নমস্য। "British Deaf mute" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে মিঃ এব্রাহামস্ বলিয়াছেন—

"We can predict that in the years to come the deaf and dumb and the people of India will revere and love the name of Mr. Banerjea, as the French love that of De L' Epee and the Americans that of Thomas Hopkins Gallaudet :—

অর্থ:—আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে ফরাসীরা যেমন ডিলাপি এবং মার্কিণেরা গ্যালাডিটের নাম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবাসীরা এবং কালা বোবারাও তেমনি মিঃ ব্যানার্জ্জির নাম স্মরণ করিবে।" এব্রাহামসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে; যামিনীনাথের মৃত্যুর পর মূকবধিরদিগের যে আন্তরিক দুঃখের দৃশ্য আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা অবর্ণনীয়। মূকবধিরদিগের সেই বেদনার অশ্রুজলই যামিনীনাথের স্মৃতির শ্রেষ্ঠতর্পণ। দেশবাসীরা এ

পর্য্যন্ত এই মহাপুরুষের স্মৃতিসংরক্ষণের কোনই ব্যবস্থা করেন নাই। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়—আমরা যে এখনও দেশের সুসন্তানদিগকে সম্মান করিতে শিখি নাই ইহা তাহারই নিদর্শন। ফরাসীদেশে যান, দেখিবেন প্যারিসের মূকবধির বিদ্যালয়ের সম্মুখে ডিলাপির প্রতিমূর্ত্তি ফরাসীজাতির গুণগ্রাহিতার সাক্ষ্য দিতেছে; আর আমাদের দুর্ভাগ্যদেশে যামিনীনাথের নামও অনেকে জানেন না।

পরলোকগত যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূকবধির শিক্ষা আমাদের দেশে নূতন জিনিষ। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে "বোবায় কথা বয়" এ কথা বলিলে লোকে বক্তাকে বাতুল মনে করিত। এতাবৎকাল আমাদের ধারণা ছিল যে মূকবধিরেরা শিক্ষাগ্রহণের এবং কথা বলিবার অযোগ্য। মূকবধির শিক্ষা ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সাধনার ফল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে যে মূকবধিরেরাও শিক্ষা পাইলে কথা বলিতে পারে, "মূকবধিরগণের বাগ্‌যন্ত্রগুলি সমস্তই সাধারণ লোকের ন্যায়, তাহারা হাসে, কাঁদে, চীৎকার করে। কাযেই তাহাদের কণ্ঠে স্বর আছে। কিন্তু কাণ নাই বলিয়া এই স্বরকে নিয়মিত ভাবে চালাইবার শক্তি হয় না এবং ফলে তাহারা বোবা হয়।" এই মূলসূত্রটিকে অবলম্বন করিয়া মূকবধির শিক্ষাবিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশৈশব বধিরতাই মূকবধিরগণের বাক্‌স্ফুর্ত্তির অন্তরায়; সেই জন্য পাশ্চাত্য দেশে মূকবধির বিদ্যালয়গুলিকে সাধারণতঃ বধির বিদ্যালয়ই বলা হয়। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। কিন্তু ইহা বেশ সহজেই বোঝা যায় যে এই সব বধিরেরা সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা মেধা ও বিচারশক্তিতে হীন নহে; পরন্তু শিক্ষার অভাবই ইহাদের দুর্গতির কারণ। যামিনীনাথ এই আর্ত্তসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের যথার্থ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষে মূকবধিরদিগের সংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ। আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে প্রায় সত্তর হাজার মূকবধির বাস করে; শিক্ষার অভাবে এই বিরাট জনশক্তি দেশের গলগ্রহ হইয়া সমাজের ভারবৃদ্ধি করিতেছে, অথচ সে দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। অনেক কালাপাহাড় আমাদের দেশে আছেন যাহারা বলেন 'খোদার উপর খোদকারী করা আর বোবাকে কথা কওয়ান" তুল্যরূপে অবাঞ্ছনীয়—তাঁহাদের কথার আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখি না; কিন্তু যাঁহারা দেশের শক্তিক্ষয়ের বিরোধী তাঁহাদের সমক্ষে, আজ এই মূকবধির শিক্ষা উপেক্ষার বস্তু হইতে পারে না—সমাজের একটী অঙ্গকে

এইভাবে পঙ্গু হইতে দেওয়া উচিত নহে। আজ প্রত্যেক দেশবাসীর মূলমন্ত্র হওয়া উচিত যে—

"এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব শ্রান্ত ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

লাইকারগাস্ যে যুগে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে মূক-বধিরেরা বাঁচিয়া থাকার অযোগ্য, রোম যখন টাইবার নদীতে মূকবধিরকে হত্যা করিত, সে যুগ এখন আর নাই আজ সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে আমরা সমাজের প্রত্যেকের জন্য ভাবিব ইহাই দেশমাতা চান; যমিনীনাথ নীরব দেশপ্রেমিক ছিলেন তাই এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিয়াছেন। গ্যালাডট্ কলেজের পরীক্ষার পর অধ্যাপক ডাঃ গর্ডন (Dr. Gordon) যখন যামিনীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি দয়া করিয়া আমেরিকার একটী প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইবেন?" তখন খাঁটি দেশপ্রেমিক যামিনীনাথ, ডাক্তারকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছিলেন—"মাপ করিবেন, আমার দেশের বোবাদের কিছু করিব এই আমার আকাঙ্ক্ষা।" সেকথা শুনিয়া আমেরিকান্ ডাক্তার এই বাঙ্গালীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই ত মানুষের মত কথা।" হায় হতভাগ্য দেশ! এমন নীরব কর্ম্মীকে আমরা অনেকে চিনিও না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের দেশে এই ৭০ হাজার মূক বধিরের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা দুইটীর বেশী নহে। একটী কলিকাতায়, অপরটী ঢাকায় নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুইটী স্কুলে ১৫০ শতের অধিক ছাত্র শিক্ষা পায় না; এই বিরাট মূক সংখ্যার তুলনায় এই প্রতিষ্ঠান দুইটী কিছুমাত্র পর্য্যাপ্ত নহে। আজ দেশের এই নব জাগরণের দিনে দেশের নেতাদের ও ডিষ্ট্রীট বোর্ড ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতির এই প্রকার বিদ্যালয় গঠনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। তৎপূর্ব্বে কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয় এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে যামিনীনাথের কর্ম্মকুশলতার পরিচয়ও আমরা পাইব।

যামিনীনাথ, যখন বি, এ পড়িতেন তখন সমস্ত ভারতবর্ষে কেবল বোম্বাই সহরে একটী মূকবধির বিদ্যালয় ছিল। খৃষ্টান মিশনরিগণ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গভর্ণমেণ্ট এতাবৎ কাল এবিষয়ে আদৌ দৃষ্টি দেন নাই। দারিদ্র্যের তাড়নায় যামিনীনাথ যখন কলিকাতায় বি, এ পড়া ছাড়িয়া আসিলেন, তখন বাংলাদেশে রীতিমত মূকবধির শিক্ষাদানের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না; সিটি কলেজের একটী প্রকোষ্ঠে স্বর্গীয় ৺শ্রীনাথ সিংহ মহাশয় দুইটি বোবা ছেলেকে পড়াইতেন, এইঘটনা ১৮৯৩ সালের কথা। কলিকাতায় যামিনীনাথ পটলডাঙ্গার বিখ্যাত বসু বংশের গিরীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গে১৮৯২ সনে দৈবাৎ পরিচিত হন। গিরীন্দ্রনাথের দুইটী বোবা ছেলে ছিল; যামিনীনাথ উহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। যামিনীনাথ মূকবধির শিক্ষা সম্বন্ধে ইহার পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না; কেবল কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াই একার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। গিরীন্দ্রনাথ টমাস আরনল্ড (Thomas Arnold) লিখিত একখানি মূক-শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক যামিনী বাবুকে পাঠ করিতে দেন। এই পুস্তকের অধিকাংশই দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় যামিনীথের উক্ত বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রগাঢ় ইচ্ছা জন্মে। তাহার ফলে উত্তরকালে তিনি জগন্মান্য মূকশিক্ষক হইতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীনাথবাবুর স্কুল সিটি কলেজ প্রকোষ্ঠে স্থাপিত হইবার অল্পকাল পরেই যামিনীনাথ ও শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন মজুমদার এই সাধুকার্য্যে শ্রীনাথ বাবুর সহকারী হন। এই খানেই কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন হইল একথা বলা যাইতে পারে। কলিকাতা বিদ্যালয়ের ইতিহাসে শ্রীনাথ বাবু, যামিনীনাথ ও মোহিনী বাবুর নাম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকার যোগ্য। সিটী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত ও গিরীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় দিন দিন স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যেই গিরীন্দ্র বাবু যামিনীকে বোম্বাই স্কুলে মূক বধির শিক্ষা বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। বোম্বাই নগরীতে পাঠকালেই যামিনীনাথের উচ্চতর শিক্ষায়

জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়; তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াই দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন মধ্যেই যামিনীনাথের প্রবল চেষ্টায় ও স্কুল কমিটির উদ্যোগে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে তিনি ১৮৯৪খৃঃ আগষ্ট মাসে বিলাত যাত্রা করেন। লণ্ডন নগরের Training College for the teachers of the Deaf বিদ্যালয় হইতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর যামিনীনাথ আয়র্ল'ণ্ড ও আমেরিকায় গমন করেন। তথকার সরকারের ব্যয়ে তত্রত্য যাবতীয় মূকবধির বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া ১৮৯৬ খৃঃ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই দুইবৎর কাল যামিনীনাথ যে অসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত উক্ত শিক্ষাপ্রণালী আয়ত্ত করেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যামিনীনাথ স্কুলের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। যে স্কুল একদিন দুইটী ছাত্র লইয়া সিটী কলেজ প্রকোষ্ঠে স্থাপিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তার ছাত্র সংখ্যা প্রায় একশত এবং ভূসম্পত্তির মূল্য প্রায় ৫লক্ষ টাকা। গভর্ণমেণ্ট, কর্পোরেশন ও দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সকলেই এখন এই স্কুলের পৃষ্ঠপোষক। মূকবধির বিদ্যালয় যামিনীনাথের অক্ষয় কীর্ত্তি—তাঁহার মূকবধির প্রীতির জ্বলন্ত নিদর্শন।

স্কুলে সাধারণ সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, স্বাস্থ্যনীতি ও ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে ও জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী শিল্প বিষয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে চিত্রাঙ্কন ও মাটির কায, সেলাইয়ের কায, সূত্রধরের ও ছাপখানার কায শেখান হয়—এক কথায় যে শিক্ষা পাইলে মূক নিজের জীবিকার জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়, সেই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মূকবধিরেরা শিক্ষা পাইলে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বেশী বিভিন্ন থাকে না। পাশ্চাত্য দেশে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত বধিরেরা প্রভূত শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। মূকবধির শিক্ষক ও সম্পাদক মিঃ ম্যাগিন, প্রসিদ্ধ বধির চিত্রকর মিঃ ট্রুড (Mr. Trood) বিখ্যাত বধির ভাস্কর মিঃ অ্যাগনিউ (Agnew) ও বিখ্যাত মল্লবীর কার্লওয়ার্ণারের ন্যায় প্রতিভাবান ব্যক্তির কার্য্য দেখিলে পাশ্চাত্য মূকবধির বিজ্ঞানের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা হয়। আমাদের দেশেও যামিনীনাথের হাতে গড়া বহুছাত্র সমাজে এখন উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। কেহ বা চিত্রকর, কেহ বা শিক্ষক, আবার কেহ কেহ বা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন। এই মূকবধিরেরা আর সমাজের গলগ্রহ নহেন, তাঁহারাও দশের একজন হইয়াছেন।

এই মহাব্রতে যামিনীনাথ জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন; অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটে, ফলে ৫৩ বৎসর বয়সে, গত ১৯২১ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

যামিনীনাথ কর্ম্মবীর ছিলেন। Carlyle এর কথায় বলিতে গেলে তিনি যথার্থই বীর (hero) ছিলেন। যিনি মূককে বাঙ্ময় করিয়াছেন; জড়কে জীবন্ত মনুষ্য করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহার ন্যায় বীর কে? যিনি ৩০বৎসর নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া, এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, তিনি শুধু মূকবধির-বন্ধু নহেন, তিনি জগতের বন্ধু। তিনি মরিয়াও অমর। যত দিন কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয় বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন যামিনীনাথের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে উজ্জ্বল থাকিবে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী।

হেমচন্দ্র

উপসংহার।

নবম পরিচ্ছেদ

হেমচন্দ্র পাঠাগার। খিদিরপুরের অধিবাসিগণ তাঁহাদের প্রিয় কবি হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত পাঠাগারের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

চরিত্র ও রুচি। আমরা পূর্ব্বেই হেমচন্দ্রের জীবনের বিবিধ ঘটনা ও তাঁহার আচরণাদির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছি। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিব।

হেমচন্দ্র অতিশয় স্বাধীন ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্যর গুরুদাস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় উদার প্রকৃতির ব্যক্তি তিনি অতি অল্পই দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তিও অতি বিরল। তিনি কাহারও অনধিগম্য ছিলেন না। তাঁহার কাব্যে যেমন তিনি মহান্ ও উচ্চ আদর্শ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনেও তিনি সেইরূপ উচ্চ ও মহান্ আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আচরণে কৃত্রিমতার লেশ ছিল না। কি পারিবারিক জীবনে কি সামাজিক জীবনে তিনি সর্ব্বত্রই যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারই হৃদয়পটে তাঁহার মধুর ও উদার চরিত্রের স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বার্থপরতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি কখনও আত্মপর বিচার করেন নাই। স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে একখানি পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "He (Hem Chandra) was a high-minded gentleman and took pleasure in doing good to others" দাস দাসীগণকে তিনি পুত্র কন্যার ন্যায় পালন করিতেন, তাহাদের সুখে আনন্দিত ও বিপদে ব্যথিত হইতেন। তাঁহার প্রিয় ভৃত্য আনন্দ ও মেঘা তাঁহার মৃত্যুর পর বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। তাঁহার এক পরিচারিকা সৌদামিনী তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্রের নিকট বহুদিন কার্য্য করিয়াছিল, সেই

৺মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুত্র অর্থাভাববশতঃ তাহার বেতন দিতে অসমর্থ হইলে সে পূর্ব্ব প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে নাই। অপর এক ভৃত্য হরি,

হেমচন্দ্রের শেষ অবস্থায় তাঁহার এরূপ পরিচর্য্যা করিয়াছিল যে, কবি মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে প্রস্তুত উইলে তাহাকে কিছু অর্থ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের দুঃস্থ আত্মীয় এবং অনেক সময়ে অনাত্মীয় তাঁহার বাটীতে আসিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিত, তাহাদিগকে তিনি নিকটতম আত্মীয়ের ন্যায় আদর যত্ন করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীরা ত তাঁহার প্রাণের অধিক ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রগণের ও ভাগিনেয়ীদিগের বিবাহাদিতে তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে অর্থব্যয় করিতেন। তিনি যে কন্যা জামাতৃগণকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি যে কিরূপ প্রেমময় স্বামী ছিলেন তাহারও পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার অবাধ্য ও অনুপযুক্ত হইলেও তাঁহার হৃদয় পুত্রবাৎসল্যে পূর্ণ ছিল। তাঁহার মধ্যম পুত্র প্রতুলচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ললিতমোহন তাঁহার বিশেষ আদরের পাত্র ছিলেন। পাছে তাঁহার অবর্ত্তমানে অর্থাভাববশতঃ এই বালকের বিদ্যা শিক্ষা না ঘটে এই জন্য হেমচন্দ্র তাঁহার চরমপত্রে ইহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত্যর্থে তাঁহার উইলখান এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

LAST WILL & TESTAMENT

OF late Hem Ch, Banerjee of Kidderpore

লিখি ং শ্রী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--পিতার নাম ৺ কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং নং ১ পদ্মপুকুর স্কোয়ার খিদিরপুর, থানা ওয়াট্‌গঞ্জ সহরতলী কলিকাতা—কস্য চরম উইল পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—

এক্ষণে আমার তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র, মধ্যম শ্রীমান্ প্রতুলচন্দ্র, তৃতীয় শ্রীমান্ অনুকুলচন্দ্র বর্ত্তমান আছেন। এবং আমার পত্নী শ্রীমতী কামিনী দেবী উৎকট বায়ু রোগগ্রস্তা, এবং আমার কনিষ্ঠ পুত্র অকুলচন্দ্রের পত্নী শ্রীমতী চারুশীলা জীবিতা আছেন। এতদ্ভিন্ন আমার পাঁচ পৌত্র—উক্ত শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রের পুত্র শ্রীমান্ মণিমোহন, উক্ত শ্রীমান্ প্রতুলের পুত্র শ্রীমান্ ললিতমোহন, ও উক্ত শ্রীমান্ অনুকুলের তিন পুত্র শ্রীমান জ্যোতিঃমোহন, মধ্যম শ্রীমান্ কিশোরীমোহন ও কনিষ্ঠ অতি শিশু (এখনও নাম হয় নাই) বর্ত্তমান আছে। ইহারা সকলেই আমার সংসারে আমার পূর্ব্বোক্ত খিদিরপুরের বাটীতে আমার সহিত একত্র বাস করিতেছে। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা নিম্নের (ক) তপশীলে লিখিত হইল। এবং অস্থাবর

৺কৃষ্ণমতী দেবী

সম্পত্তি মধ্যে আমার যে সকল Govt Promissory notes আছে তাহা (খ) তপশীলে লিখিত হইল।

আমার অবর্ত্তমানে আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা হইবে নিম্নে দফা ওয়ারিতে প্রকাশ করিতেছি। এই উইল আমার শেষ উইল বলিয়া গণ্য হইবেক।

১ দফা—। আমার জামাতা অর্থাৎ আমার মৃতা জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাসুন্দরীর স্বামী শ্রীমান্ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে Executor নিযুক্ত করিলাম। আমার

লোকান্তে আমার এষ্টেটের খরচে সম্ভবমত আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাইবেন এবং এই উইলের Probate লইবেন।

২ দফা। নিম্নের (ক) তপশীলে লিখিত পদ্মপুকুরের উত্তর পূর্ব্ব কোণস্থিত ২নং পদ্মপুকুর ষ্ট্রীটস্থিত বাটী আমার পূর্ব্বোক্ত বিধবা পুত্রবধূ শ্রীমতী চারুশীলা দেবীকে জীবন সত্বে স্বত্ববতী করিলাম, উক্ত বাটীর উপস্বত্ব হইতে তাঁহার যাবজ্জীবন ভরণ পোষণ হইবে। কিন্তু ঐ বাটী তিনি দান বিক্রয় বা কোন প্রকার হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। উক্ত বাটীর Vested remainder আমার উপরিউক্ত তিন বর্ত্তমান পুত্রকে তুল্যাংশে দিলাম।

শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী

৩ দফা। (খ) তপশীলের লিখিত আমার যে সকল গবর্ণমেণ্ট প্রমিঃ নোট আছে তাহার সুদ আমার উপরিউক্ত একজিকিউটার আমার পত্নীর চিকিৎসা ও

৺প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভরণপোষণে ব্যয় করিবেন এবং যাহা তিনি আবশ্যক ও ভাল বিবেচনা করিবেন তাহাতে ব্যয় করিতে পারিবেন। আমার পত্নীর পরলোক হইলে উক্ত একজিকিউটার ঐ সকল প্রমিঃ নোট সমান অংশে তিন পুত্রকে ভাগ করিয়া দিবেন।

৪ দফা। "ক" তপশীলের লিখিত আমার ভদ্রাসন বাটী ১নং পদ্মপুকুর স্কোয়ার আমার বর্ত্তমান তিন পুত্রকে তুল্যাংশে দিলাম। আমার একজিকিউটার উক্ত বাটী তাহাদিগকে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিবেন; কিম্বা তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য তুল্যাংশে ভাগ করিয়া দিবেন। আমার পত্নী বর্ত্তমানে বাটী বিভাগ বা বিক্রয় হইবে না।

৫ দফা। উল্লিখিত ২ ও ৪ দফার লিখিত সম্পত্তি দেওয়ার অবশিষ্ট সম্পত্তি যাবৎ আমার পৌত্র শ্রীমান্

ললিতমোহন ২১ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হন তাবৎ উক্ত এক্‌জিকিউটার স্বীয় দখলে রাখিয়া আদায় তহসিল করিবেন। এবং ঐ সকল সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার উক্ত পৌত্রের ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য মাসিক ১৫৲ পনর টাকার অনধিক খরচ করিবেন; অবশিষ্ট টাকা আমার বর্ত্তমান তিন পুত্রকে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিবেন। আমার উক্ত পৌত্রের ২১ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে এক্‌জিকিউটার ঐ সকল সম্পত্তি আমার ঐ তিন পুত্রকে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিবেন। কিন্তু আমার পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে কোন বাটী বিক্রয় বা বিভাগ হইবে না, কেবল উপস্বত্ব বিভাগ হইবে মাত্র।

৬ দফা। যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা হইলে উক্ত এক্‌জিকিউটার আমার স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি ও স্থাবর সম্পত্তির অংশ যাহা আমার বর্ত্তে বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৭ দফা। "খ" তপশীলের বিবরিত সম্পত্তি ভিন্ন আমার অন্য যে কিছু অস্থাবর সম্পত্তি থাকিবেক তাহা আমার বর্ত্তমান তিন পুত্র তুল্যাংশে লইবেন।

৮ দফা। "খ" তপশীলের লিখিত প্রমিঃ নোট ভিন্ন আমার নিকট ১৮৫৪-৫৫ সালের এক কেতা ৫০০৲ পাঁচশত টাকার গবর্ণমেণ্ট প্রমিঃ নোট আছে। তাহার নম্বর ০৬২৪৫৭। ঐ প্রমিঃ নোট আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অনুশীলাকে দিলাম। ঐ কাগজ আমার ঐ কন্যার সম্পূর্ণ অধিকারে রহিল, দান বিক্রয় সমুদয় করিতে পারিবেন।

৯ দফা। আমার পরলোক গমনের পর এক্‌জিকিউটার আমার বাটীর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন চট্টোপাধ্যায়কে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ও হরি নামক আমার চাকরকে ১০০৲ একশত টাকা দিবেন।

১০ দফা। আমার পত্নীকে পূর্ব্বে আমি ১০০০৲ এক হাজার টাকা দিয়াছি। ঐ টাকা একণে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আছে ও হাতচিঠায় জমা আছে। ঐ টাকায় উপর আমার স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার রহিল। আমার পুত্রদের তাহাতে কোন অধিকার নাই। আমার পত্নী তাহা ইচ্ছামত সমস্ত দান করিতে পারেন, আমার পুত্রদিগের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

১১ দফা। আমার স্থাবর সম্পত্তি বিভাগাদি করিতে ও অন্যান্য সরঞ্জামি খরচা সমস্ত আমার এষ্টেট হইতে নির্ব্বাহ হইবে।

১২ দফা। আমার এক্‌জিকিউটার শ্রীমান বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্থানে যাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন তিনি তাঁহার অবর্ত্তমানে এক্‌জিকিউটার হইবেন। ইতি তাং ১৩ই চৈত্র ১৩০৯ সাল, ইংরাজী ২৭শে মার্চ্চ ১৯০৩।

(স্বাক্ষর)

বিনোদবিহারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে এই উইল অনুসারে হেমচন্দ্রের বিষয়াদি বিভক্ত হইলে হেমচন্দ্রের প্রত্যেক পুত্র বা পুত্রের ওয়ারিশগণ পাঁচ সহস্র টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং কনিষ্ঠা কন্যা অনুশীলা দেবী পাঁচশত টাকার কাগজ প্রাপ্ত হন। স্থাবর সম্পত্তি এই ভাবে বিভক্ত হয়—

১নং পদ্মপুকুর স্কোয়ার স্থিত ভদ্রাসন বাটী তুল্যাংশে তিন পুত্র (বা পুত্রের অবর্ত্তমানে পৌত্র)

২নং পদ্মপুকুর ষ্ট্রীটস্থ বাটী—হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ চারুশীলা দেবী

১১ পদ্মপুকুর স্কোয়ারস্থিত বাটী মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র)

১৯ পদ্মপুকুর রোডস্থিত বাটী তৃতীয় পুত্র অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫ পদ্মপুকুর রোড স্থিত বাটী শ্রীযুক্ত ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃতীয় পুত্রের পুত্র)

হেমচন্দ্র কিরূপ সত্যপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুইটী কাহিনী লিপিবদ্ধ করিব। হেমচন্দ্রের মধ্যমা কন্যা সুরবালা যখন পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা, সেই সময় তিনি একদিন একতলার ছাদে একটি খটীর

উপর হাত রাখিয়া বসিয়াছিলেন, হঠাৎ দোতলার কার্ণিসের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া তাঁহার হাতের উপর পড়িয়া যায়। ফলে তাঁহার দুইটী অঙ্গুলির দুইটী করিয়া পর্ব্ব কাটিয়া যায়।* সেই কন্যা বিবাহোপযোগী হইলে যখন পাত্রপক্ষ কন্যা দেখিতে আসিতেন তখন হেমচন্দ্র সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদিগকে সেই অঙ্গুলিদ্বয় দেখাইয়া দিতেন, পরে অন্য কথাবার্ত্তা কহিতেন।

হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অতুলচন্দ্রের একমাত্র পুত্র মণিমোহনের একস্থানে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় কিন্তু পাত্রীর পিতা অতুলচন্দ্রের ইচ্ছামত অর্থ ব্যয় করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তখন হেমচন্দ্র অন্ধ। হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ কৃষ্ণমতী দেবী প্রত্যহ তাঁহার অন্ন ব্যঞ্জনের থালা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, গ্রাস প্রস্তুত করিয়া, হেমচন্দ্রের হস্তে তুলিয়া দিতেন, হেমচন্দ্র আহার করিতেন। একদিন ঐরূপ আহার কালে হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণির বিবাহের কি হইল ?"

কৃষ্ণমতী উত্তর দিলেন, "বিবাহ বোধ হয় আপাততঃ স্থগিত রহিল।"

"কেন ? কন্যা কি পছন্দ হয় নাই ?"

"কন্যাটী পছন্দ হইয়াছে, কিন্তু পাত্রীর পিতা অধিক অর্থ ব্যয় করিতে অসম্মত।"

"কন্যাটী পছন্দ হইয়াছে অথচ টাকার জন্য বিবাহ হইবে না ? আমি অন্ধ হইয়াছি, কাহাকেও বল আমাকে কন্যার বাটীতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে, আমি স্বয়ং কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব।"

বলা বাহুল্য, হেমচন্দ্রকে যাইতে হয় নাই, তাঁহার পিতার এই কথা শুনিয়া অতুলচন্দ্র সেই স্থানেই পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়া বৈদ্যবাটী নিবাসী জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী জীবনবালা দেবীর সহিত ১৩০৯ সালে ২৬ বৈশাখ শুভকার্য্য সম্পন্ন করেন।

হেমচন্দ্র বন্ধু বান্ধব আত্মীয় অনাত্মীয় সকলকেই ভাল খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার বাটীতে প্রায়ই তিনি ভোজ দিতেন এবং এই সকল অনুষ্ঠানে প্রভূত পরিমাণে দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইত। বন্ধুগণকে লিখিত নিমন্ত্রণ পত্রগুলিও কম রসাল ছিল না। কবিবরের পৌত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত একখানি পত্রের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"তপ্ত তপ্ত তপ্‌সে মাছ, গরম গরম লুচি,
অজমাংস, ভাজা কপি, আলু কুচি কুচি,
শীতের দিনে তুলে যদি খাবে থাবা থাবা,
এক নম্বর পদ্মপুকুর শীগ্‌গির এস বাবা।"

পানাহারের প্রসঙ্গে সত্যানুরোধে হেমচন্দ্রের একটি দোষেরও উল্লেখ করিতে হয়। তাৎকালীন অধিকাংশ শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় হেমচন্দ্রেরও মদ্যপান দোষ ছিল। স্বর্গীয় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ছাত্রজীবনের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে করিতে একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"একদিন শুনিলাম যে জোড়াঘাটের ঠিক উপরের বাটীতে [হেমচন্দ্র] বঙ্কিমবাবুর বাসায় আসিয়াছেন। দুজনকে ডাকিয়া লইয়া যাইতে পিতৃদেবের আদেশে গিয়া দেখিলাম যে হেমবাবু দাঁড়াইয়া একটা বোতল মুখে ধরিয়া সুরাপান করিতেছেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন "দেখ। তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির কাণ্ড দেখ।" হেমবাবু বোতল নামাইয়া বলিলেন, "তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের অতিথি সৎকার দেখ। Guests cannot be choosers (অতিথি ইচ্ছামত খাইতে পায় না।)।" তাঁহারা দুজনে খুব হাসিলেন এবং বলিলেন একটু পরেই আমরা যাইব।

তখন ইঁহাদের পান ভোজনের দোষ ছিল—সেটা সকলের জানা কথা—সেই জন্য এই বিষয়ের উল্লেখে

* বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার "অঙ্গহীনা" নামক গল্পের নায়িকার সৃষ্টি করিয়াছেন। বলা বাহুল্য সেই গল্পের অন্যান্য ঘটনা তাঁহার কল্পনাপ্রসূত।

সঙ্কোচ করিলাম না। কিন্তু উঁহাদের দুই জনের 'ভারতসঙ্গীত' এবং "বন্দে মাতরং' যে বাঙ্গালীকে 'জন্মভূমি পূজার স্তোত্র' দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল, হেমচন্দ্রের প্রথম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, হেমচন্দ্র মদ্য পান করিতেন বটে কিন্তু অত্যধিক মদ্যপান করিয়া কখনও প্রমত্ত হইতেন না। নূতন কবিতাদি রচিত হইলে হেমচন্দ্র প্রায়ই শ্রীশচন্দ্রকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া কবিতাগুলি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। শ্রীশবাবু লক্ষ্য করিতেন যে পড়িতে পড়িতে হেমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে উঠিয়া যাইতেন এবং অত্যল্প মদ্যপান করিয়া আসিতেন। তিনি যদি পরিমিত ভাবে পান না করিতেন তাহা হইলে প্রমত্ত হইতেন। বয়ঃ কনিষ্ঠের সম্মুখে মদ্য রাখিয়া পান করা যে দোষাবহ তাহাও তাঁহার বেশ বোধগম্য ছিল—এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইত। সেকালে অনেকের ধারণা ছিল যে মদ্যপান করিয়া লিখিতে বসিলে রচনা ভাল হয়। হেমচন্দ্র যৌবনকালাবধি মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকিলেও ইহা যে দোষের তাহা জানিতেন এবং বয়ঃকনিষ্ঠগণ যাহাতে এই দোষে লিপ্ত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। একবার একজন তরুণ কবি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মদ্যপান করিলে কি কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত হয়?" হেমচন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে চিকিৎসকগণের আদেশে তিনি মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিলেন। অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন করিতেন।

হেমচন্দ্রের পাঠানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি পুস্তকের কীট ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি সর্ব্বদাই একখানি না একখানি পুস্তক হস্তে করিয়া থাকিতেন। এমন কি কোনও পুস্তকে মন বসিলে আহার কালেও পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিতে করিতে আহার করিতেন। তাঁহার গার্হস্থ্য পুস্তকাগারে অসংখ্য কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও স্মৃতি সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক ছিল। কত সহস্র মুদ্রাব্যয়ে তাঁহার পুস্তক গুলি সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তিনি বলিতেন তাঁহার পুস্তকগুলির মূল্য চল্লিশ সহস্র মুদ্রার কম নহে। শেষ জীবনে যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার পুস্তকাগারের সদ্ব্যবহার করিবেন না, তখন সমস্ত পুস্তক তিনি তাঁহার কোনও বন্ধুকে প্রদান করেন। এই বহুমূল্য পুস্তকগুলি বিক্রয় করিলে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাইত, কিন্তু হেমচন্দ্র তাঁহার বন্ধুর নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন।

ভ্রমণে হেমচন্দ্রের বিশেষ আনন্দ ছিল। তিনি প্রায় প্রতিবৎসরই নানা স্থানে বন্ধুগণের সহিত বেড়াইতে যাইতেন। তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়া বন্ধুগণের দেশভ্রমণ অতিশয় আনন্দদায়ক হইত। কারণ রহস্যালাপে হেমচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন। অধুনা বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই মহোদয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, একবার তিনি পিতৃবন্ধু হেমচন্দ্রের সহিত লক্ষ্ণৌ নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে হামামে (স্নানাগারে) নবাবেরা কিরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতেন তাহা দেখিবার জন্য হেমচন্দ্র হামাম-রক্ষককে পারিতোষিক প্রদান করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মর্দ্দন করিয়া দিতে বলেন। হামাম-রক্ষক হস্তদ্বারা ও জানুদ্বারা তাঁহাকে সবলে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। হেমচন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "একটু থামো বাবা, আমার ব্রাহ্মণত্বটা আগে রক্ষা করি আমার পৈতাতে চরণস্পর্শ করিও না। এই বলিয়া উঠিয়া উপবীতটা খুলিয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন।"

হেমচন্দ্র দেশীয় পরিচ্ছদাদি পরিধানের পক্ষপাতী ছিলেন। হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে কিছুকাল পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন:—

"হেমচন্দ্র সাহেবী পোষাক পরিচ্ছদ বড় ঘৃণা করিতেন। নিজে ত কখনও তাহা পরেন নাই,

বাটীর কাহাকেও পরিতে দিতেন না। আমি একবার কোট পেণ্টেলুন পরিয়া ফটো তুলিয়াছিলাম। টাই পর্য্যন্ত ব্যবহার করি নাই। ফটোখানি দেখাইয়া আমি হেমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'কেমন হইয়াছে?' তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন 'ঠিক হইয়াছে, তবে ব্যাটারা যেন ফিরিঙ্গি করিয়া দিয়াছে।' আমি বলিলাম 'সে আর তাদের দোষ কি? দোষ হয়ত আমার।' তিনি বলিলেন 'তাই বলিতেছি।' আমি বুঝিলাম।"

এই সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের বন্ধুপুত্র শ্রীযুক্ত সুশীল-কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রুত একটি গল্প উল্লেখযোগ্য।—একদিন হেমচন্দ্র যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের সহিত ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যান। উক্ত উদ্যানের একটি দ্বারে একজন ইংরাজ প্রহরী থাকিত এবং সেই দিক দিয়া পেণ্টেলুন পরিহিত ব্যক্তিগণেরই প্রবেশাধিকার ছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র ও উমাকালী ইংরাজীপোষাক পরিধান করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বিনা বাধায় উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গেলেন। হেমচন্দ্র ধুতি পরিধান করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে হেমচন্দ্র বস্ত্রের কিয়দংশ উত্তোলিত করিয়া তন্মধ্যস্থ ড্রয়ার দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিয়া গেলেন।

হেমচন্দ্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার আবৃত্তি শক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যো পাধ্যায় ও আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলেন তিনি sing song wayতে পাঠ বা আবৃত্তি করিতেন। নট-রাজ অমৃতলাল বসু বলেন যে কাশীধামে অবস্থান কালে হেমচন্দ্রের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে দিয়া হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' প্রভৃতি আবৃত্তি করাইতেন এবং বলিতেন হেমচন্দ্রের পাঠ বা আবৃত্তি তত ভাল লাগেনা। অনেকে আবার হেমচন্দ্রের আবৃত্তিশক্তির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' আবৃত্তির যে সুখ্যাতি করিয়াছেন তাহা 'দশমহাবিদ্যা'র আলোচনা প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী বলেন, এদেশে চণ্ডীর গানে যেমন লয় দিয়া গীতের আবৃত্তি করা হয়, হেমচন্দ্র অনেকটা সেই রকম করিতেন, তাহাতে শ্রোতার কর্ণে একপ্রকার বিশেষ মাধুর্য্য ঝঙ্কৃত হইত। মাননীয়া শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের সহিত কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের এই বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। তিনিও হেমচন্দ্রের আবৃত্তির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। Sing song wayতে পাঠ করা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, লক্ষ্য "করিয়া দেখিবেন রবীন্দ্রনাথও অনেকটা singsong wayতে পাঠ বা আবৃত্তি করেন।" আমাদের যতদূর স্মরণ আছে, তিনি বলেন, আমাদের গান বা গানের সুর বিদেশীদের কাণে ভাল লাগে না, তাহাদেরও গান বা গানের সুর সব সময়ে আমাদের কাণে মধুবর্ষণ করে না। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে কাহারও আবৃত্তি ভাল লাগা বা না লাগা মানুষের শিক্ষা, রুচি ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অনেক সুর সেকালের লোকের যত ভাল লাগিত এ কালের লোকের তত ভাল লাগে না। হেমচন্দ্রের আবৃত্তির একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল যাহা অনেকের নিকট ভাল লাগিত, কাহারও কাহারও ভাল লাগিত না।

ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবৃত্তি শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপ মতদ্বৈধ আছে। সম্প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন —"যেমন কবি বা যেমন কাব্য তাঁহার [মাইকেলের] কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না। সে আবৃত্তিতে কোন প্রকার ভাব-প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না।" অথচ মাইকেলের সমসাময়িক অনেকেই তাঁহার আবৃত্তির প্রশংসাই করিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের পুত্রকন্যাগণের কথা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বংশলতা দৃষ্টে পাঠকগণ তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের উত্তরপুরুষগণের নাম অবগত হইতে পারিবেন।

উপরি উদ্ধৃত বংশলতা হইতে প্রতীত হইবে যে এক্ষণে হেমচন্দ্রের একজন মাত্র পুত্র অনুকুলচন্দ্র এবং অনেকগুলি পৌত্র জীবিত আছেন। হেমচন্দ্রের মধ্যম পুত্র প্রতুলচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী কবিবরের একমাত্র পৌত্রী।

হেমচন্দ্রের কন্যারা সকলেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার দৌহিত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাদেবীর একটি মাত্র পুত্র শ্রীমান সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠা কন্যা অমুশীলা দেবীর একটি মাত্র পুত্র শ্রীমান্ মনোমোহন মুখোপাধ্যায় জীবিত আছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

অকাল বর্ষা

অকালে আজিকে বাদল এসেছে বঙ্গে
তুমুল কলহ তুলিয়া দিয়াছে আজি বসন্ত সঙ্গে।
মধুমাধবের আয়োজন সব
ফল গৌরব, ফুল বৈভব
ধুয়ে মুছে হায় নিয়ে যেতে চায়
আজি ভৈরব রঙ্গে
অকালে আজিকে বাদল এসেছে বঙ্গে।
ফোট ফোট কলি হঠাৎ চমকি
মুদেছে সভয়ে নেত্র
শষ্প বসনে আবরে গাত্র
শিহরি আবার ক্ষেত্র।
বিহগ সহসা থামাল কূজন
কুলায়ে পশেছে হেরি অঘটন
কিসলয়গুলি জেগে উঠে পুনঃ
ঘুমাল তরুর অঙ্গে
অকালে আজিকে বাদল এসেছে বঙ্গে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

জ্যোতি

(গল্প)

ছেলেবেলার অকৃত্রিম ভালবাসায় যে আমাকে বড় কাছে টেনে নিয়েছিল সেই প্রিয়তমা সখী নীহারের মরণশয্যার পাশে আমি তার ছোট শিশুটিকে বুকে তুলে নিলুম। তখন কি জেনেছিলুম যাকে আমার প্রাণভরা নিবিড় স্নেহের অন্তরালে বঞ্চিত ব্যাকুল বন্ধ্যা জীবনের একান্ত আগ্রহ দিয়ে জড়িয়ে রাখবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় আজ বুকে তুলে নিচ্চি সে আমার জীবনের শেষ আলোটুকুও অবহেলায় নিবিয়ে দিয়ে এমনি নির্ম্মম অচিন্তিত ভাবে আমার অজ্ঞাতে অনুতাপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলবে!

সন্ধান তার করতে চাই নি আমি, কিন্তু বিভবেরই একান্ত চেষ্টা—সেও আমারই জন্যে—যদি আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে আমায় রক্ষা করতে পারে। কিন্তু চাইনে তাকে, চাইনে আমি; যে আমার বুকভরা ব্যথার পরে এমন করে অস্ত্রের আঘাত করে চলে গেল তাকে ফিরিয়ে আমি চাইনে। তারই জীবনের ব্যর্থতার ব্যথায় অধীর আকুল হয়ে কত বড় দুঃখে অভিমানে আমি যে তাকে চলে যেতে বলেছিলুম তা বুঝলে না সে, ভুল করে আমার বুকের ব্যথাকে অপমান করে, মুখের কথাটাকেই বড় করে ধরে নিয়ে সে বিদায় হয়ে গেল। জ্যোতি—আমার নয়নের মণি, জীবনের একমাত্র গ্রন্থি ছিল সে—তাকে বুকে নিয়ে বন্ধ্যাজীবনের তৃষিতব্যাকুল উত্তপ্ত মরুহৃদয় আমার উদ্বেলিত মাতৃস্নেহের অমৃতপ্লাবনে কি স্নিগ্ধ আনন্দেই না ভরে উঠেছিল! বড় আদর করে নাম রেখেছিলুম জ্যোতি। আমার শিশুবঞ্চিত অন্ধকার জীবনে শুকতারার স্নিগ্ধ জ্যোতি ছিল সে,—কিন্তু আজ এ কি অন্ধকার, চোখের আলোও নিবে এল বুঝি, কিছুই আর দেখতে পাইনে যে!

মুখে বলি তাকে আমি চাইনে, কিন্তু আহত মাতৃস্নেহের কত বড় অভিমানের কথা এ, বুকফাটা কান্নার মত এ'ব্যথা যে কত খানি করুণ, তা বিভব বুঝেছিল, তাই প্রাণান্ত চেষ্টায় সে তাকে সন্ধান করে বার করতে চেয়েছিল, কিন্তু সব চেষ্টা তার নিষ্ফল হয়েছে। আশা-হত প্রাণ তাই আরো ভেঙ্গে পড়েচে।

বাঁচতে যে চাইনে, তবু ওরা আমায় বাঁচাতে চায়। বিভব বলে, ও কথা তুমি ভুলে যাও ছোট মা; নইলে তোমায় যে বাঁচাতে পারছিনে। কিন্তু সে তো বোঝে ভোলবার আমার পথ কৈ? তার ছবি নিশিদিন সুস্পষ্ট হয়ে আমার মনের সামনে জেগে রয়েছে, তার স্মৃতি অনুক্ষণ অশ্রান্ত অতন্দ্র প্রহরীর মত আমায় প্রহরা দিচ্চে, আমার মুক্তি পাবার পথ যে সে খোলা রেখে যায় নি।

বেঁচেই বা আমার সার্থকতা কোথায়, এ কথা কেউ বুঝেও বোঝে না। তাই আমার এই মৃন্ময় জীবনদীপটাকে কিছুতেই ওরা নিবে যেতে দেবে না পণ করেচে। ওরে সেই যে আমার মুক্তি, মৃত্যুর মধ্যে চিন্ময় হয়ে যেতে চাই, তোরা আমায় বাঁধিসনেরে, বাঁধিস নে।

কত বড় জ্বালা যে আমার বুকে অগ্নিগর্ভ গিরির মত নিশিদিন জ্বলচে সে জানে শুধু একমাত্র বিভব; এ বিশ্ব জগতে ঐ ছেলেটাই আমার একমাত্র সমব্যথী। কিসের ব্যথায় ওর দুটি চোখ থেকে থেকে জলে ভরে ওঠে, কি বেদনা ওর চোখ দুটির করুণ দৃষ্টি থেকে সব সময় ঝরে পড়তে থাকে তা আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে বুঝি, কিন্তু কিছুই বলতে পারিনে। এক ব্যথাই যে দুজনের হৃদয়কে আতুর করে রেখেছে, তাই নীরব হয়ে থাকি।

আমার জ্যোতিকে পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের অনন্ত-সাগরে ডুবিয়ে রাখব কল্পনা করেছিলুম, কিন্তু নিয়তির এত বড় নির্ম্মম পরিহাসের কল্পনা তো কখনো করি নি।

যেদিন পনেরো বছরের বিধবা জ্যোতি আমার

বুকে আবার ফিরে এল, সেদিন ত কৈ তার স্পর্শে তেমন করে আগের মত বুকখানা জুরিয়ে গেল না, সেই দিন থেকেই বুকে আগুন ধরেছিল। জ্যোতি—আমার আনন্দরূপিণী জ্যোতি সর্ব্বহারা নিঃস্ব ভিখারিণীর মত আনন্দের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একান্ত একা ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল হয়ে আমারই ভাঙ্গা বুকের উপর লুটিয়ে পড়লো।

প্রাণপণ চেষ্টায় ভাঙ্গা বুককে বাঁধলাম। কেমন করে কোন পথে ওর একান্ত ব্যর্থ জীবনে এতটুকুও সার্থকতা আনতে পারি তাই হলে আমার সাধনা।

স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলুম বিয়ে দেব বলে, ছটী মাস পূর্ণ না হতে সে পর্ব্বের ত একেবারেই সমাপ্তি হয়ে গেল। আবার পড়তে দিলুম—যদি ঐ নিম্ন হতভাগ্য জীবনের দুর্ভাগ্যকে ভুলে থাকতে পারে। দুঃখের দিনগুলো কাটছিল, এমনি সময়ে এল বিভব।

সে আমার ছোট দেওরের ছেলে। ছেলেবেলায় মা-হারা, এলাহাবাদে বাপের কাছে থেকে পড়তো। হঠাৎ একদিন অকালে তিনিও ওপারের ডাকে চলে গেলেন। অশ্রুসিক্ত চোখে উনিশ বছরের ছেলেটী আমারই স্নেহের অঞ্চলে আশ্রয় নেবার জন্যে কাছে এসে দাঁড়াল। এও ভগবানের অভাবিত দান, ছেলের অভাব আমার বিভব পূর্ণ করলে।

বিভবের স্বভাবটী ছিল শিশুর মতই সরল, কোন সঙ্কোচ কোন জড়তা তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু তার সম্বন্ধে জ্যোতি এমন একটা অস্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখাত যাতে বিভবও ওর সামনে পড়লে কেমন সঙ্কুচিত আড়ষ্ট হয়ে যেত। কোন মতেই জ্যোতি বিভবের সামনে বেরুতে চাইত না; নিজে অন্য কাযে ব্যস্ত থাকলে জ্যোতিকে যদি বলি, জ্যোতি বিভবের চা টা দিয়ে আয় না মা, জ্যোতি অমনি বলে বসে আমি পাচ্ছিনে মা, বড্ড মাথা ধরেচে। কোন দিন পড়াবার মাষ্টার না এলে যদি বলতুম, যা না আজকের পড়াটা বিভবকে দেখিয়ে বুঝে নে, জ্যোতি জবাব দিত, থাকগে আজ, ভাল লাগচে না। বিভবের সঙ্গে চোখে চোখে পড়লে কেমন চমকে লাল হয়ে উঠতো।

জ্যোতির ভাবটা কেমন যেন ভাল করে বুঝে উঠতুম না। এ কি তরুণ যুবকের কাছে যৌবনোন্মুখী কিশোরীর স্বাভাবিক সঙ্কোচ, না আর কিছু? ওর ব্যবহারে মনটা আমার অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো। অন্তরালে ডেকে নিয়ে বলতুম, বিভবকে অত লজ্জা করিস্ কেন জ্যোতি? ও যে তোর দাদা হয়। আমাদের অভাবে ওই যে তোকে চিরদিন ছোট বোনের মত স্নেহ যত্ন ক'রবে।

বড় বড় চোখ দুটি নত ক'রে জ্যোতি চুপটী ক'রে থাক্‌ত, কথা কইতো না। প্রেমের সঞ্জীবনী অমৃতে ওর জীবন-লতিকা ধীরে ধীরে মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, তা তখন বুঝতে পারি নি; সেই আমার অমার্জ্জনীয় ভুল।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মাস দুই আগে জ্যোতি পড়া একেবারে ছেড়ে দিলে। চিরদিন পড়াশোনায় যার অসাধারণ অনুরাগ, তার এ শৈথিল্য দেখে মাষ্টার বিস্মিত ও দুঃখিত হ'য়ে বল্‌লেন, পড়াতে আজকাল তোমার মনোযোগ বড় কম হয়ে গেছে। জ্যোতি তাঁকে জবাব দিয়েচে, আপনি আর কষ্ট ক'রে আস্‌বেন না মাষ্টার মশাই, আমি আর পড়বো না।

আমি অবাক হ'য়ে বল্‌লুম, পরীক্ষাটা দিবি নে জ্যোতি? সে সংক্ষেপে উত্তর দিলে, ইচ্ছে নেই।—বারে বারে পীড়ন ক'রে জিজ্ঞাসা করাতে বল্‌লে, পড়াশোনা ভাল লাগে না মা। একটা সন্দেহের কালো ছায়ায় আমার বুকের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে এলো।

বিভব যখন কলেজে থাক্‌তো জ্যোতি তখন তার বইগুলি গুছিয়ে রাখ্‌তো, বিছানা ঝেড়ে রাখ্‌তো, ফুলদানীর বাসি ফুলগুলো ফেলে দিয়ে টাট্‌কা ফুল সাজিয়ে রাখ্‌তো। নিজের সম্বন্ধে বিভব ছিল অত্যন্ত উদাসীন, জ্যোতিই ইচ্ছে করে তার এই সব খুটিনাটির বিশৃঙ্খলতাকে, সংস্কার ক'রে রাখ্‌বার ভার গোপনে অধিকার করেছিল।

তার সব গোলমালকে সংশোধন ক'রে কে রাখে

এ প্রশ্নও হয়তো কখনো আপনভোলা ছেলেটীর মনে জাগ্‌তো না, কিন্তু এই ছোট ছোট সেবার মধ্যে যে একটি স্বামী-বঞ্চিত তরুণ জীবনের অন্তরের গভীর আকুলতা পরিপূর্ণ হ'য়ে ছিল, অতর্কিতে, এক স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে তা আমার কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়লো। নির্ব্বাক বিস্ময়ে অন্তরাল থেকে দেখ্‌লুম, জ্যোতি বিভবের মাথার বালিশটা দুই হাতের বেষ্টনে বুকে চেপে ধরে যেন তন্ময়ের মত দাঁড়িয়ে আছে!

ওঃ ভগবান! সংশয়ের যবনিকা সরিয়ে দিয়ে বাস্তব লোকের নিষ্ঠুর সত্যের তীব্র আলো আমার চোখের দৃষ্টিকে ঝলসে অন্ধ করে দিলে। সেইদিন বুঝলুম, কি প্রবল উন্মত্ত ঝড় ওর বুকে উঠেচে। তাই ও প্রাণপণে নিজেকে বিভবের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু সে যে তার তৃষ্ণাব্যাকুল অন্তর বিভবকে একান্ত নিকটতম করে' চায় বলেই। একবছর আগে জ্যোতি যেদিন সীঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমার বুকের মধ্যে সেই দিনকার আঘাত পাওয়া ক্ষতস্থানের মুখ দিয়ে আজ আবার রক্ত ধারা ছুটতে লাগ্‌লো। উঃ, নির্ম্মম ভগবান!

দিন কয়েকের মধ্যে জ্যোতি, আমার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও, হাতের সোণার চুড়ি ক'গাছা খুলে ফেললে, চওড়া পা ড়র শাড়ী ছেড়ে একেবারে সাদা থান কাপড় পরতে আরম্ভ করলো। বুঝলুম, না চিনতেই যাকে হারিয়েচে তার সেই স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে, সেই শোককে নিশিদিন অনুভব ক'রে, তৃষ্ণামরুর সামনে যে মরীচিকা তাকে রাত্রিদিন প্রবল ভাবে আকর্ষণ করচে তা থেকে সে আত্মরক্ষা করতে চায়। ওরে অভাগী, আমার সারা বুকখানি এম্‌নি করেই দারুণ হাহাকারে তুই ভরিয়ে দিলিরে, আলোর একটি কণাও যে অবশিষ্ট রাখ্‌লি নে।

সে এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ফাল্গুন পূর্ণিমার রাত্রি। জ্যোৎস্নাধৌত সীমাহীন আকাশ প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে মগ্ন। আমার ঘরের সামনেই বরান্দায় টবের ফুলগাছের সারি পুষ্পিত হয়ে উঠেচে। সদ্য ফোটা ফুলগুলির একটা মিশ্রিত গন্ধ বাতাসের সঙ্গে ভেসে ভেসে আস্‌ছিল। অনেক রাত্রে ঘুমটা ভেঙে গেল, দেখি পাশের বিছানায় জ্যোতি কেমন যেন চঞ্চল অধীর হয়ে উঠেচে। ডাক্‌লুম জ্যোতি, অমন কচ্ছিস যে?

জ্যোতি করুণ কণ্ঠে জবাব দিল, ঘুম পাচ্চে না মা, বড্ড গরম।

তার এ ব্যথা গোপনের চেষ্টা মায়ের কাছে অজ্ঞাত রইলো না, বুকের নিশ্বাস চেপে তবু জিজ্ঞাসা করলুম, পাখা টান্‌তে বল্‌ব?

উত্তর দিলে, না মা, দরকার নেই।

কথাগুলো তার যেন কান্নার ঢেউয়ের মতই আমার বুকে এসে আছড়ে পড়লো। মায়ের প্রাণ আমার কি যে আর্ত্ত ব্যথায় ভরে উঠ্‌লো তা শুধু এম্‌নি সুন্দর স্নিগ্ধ রাত্রিতেও যার বুকে অনির্ব্বাণ জ্বালা জ্বলতে থাকে, সেই জানে।

অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত থেকে কখন যে ক্লান্ত দেহ-মনের উপর ঘুমের আবেশ ছড়িয়ে পড়েছিল জানিনে, হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গিয়ে দেখি পাশের বিছানায় জ্যোতি নেই। চম্‌কে উঠে ছুটে বেরিয়ে এলুম। বারান্দার আর এক প্রান্তে বিভবের শোবার ঘর। সমস্ত রাত তার ঘরের সব দরজা জানালা খোলাই থাক্‌তো। মুক্ত দরজা পথে আলোর রশ্মি বারান্দায় এসে পড়েছিল; কে যেন আমায় প্রবল বেগে সেই দিকে টান্‌তে লাগলো, স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ধীর পদে গিয়ে সেইখানে দাঁড়ালুম।

কি দেখ্‌লুম! জান্‌লার উপর সুঠাম সুন্দর দেহের ভার রেখে, দু'হাতে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে বিভব, যেন স্তব্ধ নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত। আর তারই পায়ের নীচে ধূলিতলে লুটিয়ে পড়ে আমার জ্যোতি —আমারই অভাগিনী জ্যোতি। চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। কান্নার মত বিপুল ব্যাকুলতায় ভরা জ্যোতির কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লো,—চলে যাও, মিনতি করে বলচি তোমায়, আমার চোখের সামনে থেকে দূরে সরে যাও তুমি; আমার দিনরাত্রির শান্তি

তুমি হরণ করেচো; আর আমি পারি নে, আর আমি পারিনে যে!"

বিশ্বের আলো আমার চোখের সামনে নিবে আসছিল, শ্রুতিশক্তি যেন লোপ হয়ে আসছিল, সকল শরীর অবশ হয়ে এসেছিল। কোনও দুরাগত অস্পষ্ট সুরের মত বিভবের আর্ত্ত কণ্ঠ কাণে এসে বাজলো—"আমায় মাপ করো, আমার অজানা অপরাধকে মাপ করো জ্যোতি। আমি চলে যাব এখান থেকে, আর তোমার চোখের সামনে থাকবো না। ভুল করে ভেবে ছিলুম শুধু আমিই বুঝি অন্তরকে শাসন করতে পারছিনে, কিন্তু তুমিও যে—তাতো জানতুম না!"

এবার জ্ঞান হারিয়ে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলুম।

যখন হারানো চেতনাকে ফিরে পেলুম, তখনও পূবের আকাশে উষার আলো দেখা দেয় নি। আমার মাথার কাছে বিভব, পায়ের কাছে জ্যোতি বসে ছিল। রাত্রি শেষের ম্লান চাঁদের আলো তার মুখখানির উপর এসে পড়েচে, সে মুখ যেন জীবনের জ্যোতিহীন, মৃতের মতই পাণ্ডুর। জ্যোতিকে দেখেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম—তোকে যে আর আমি সইতে পারছিনে জ্যোতি, তুই বেঁচে রইলি কেন?

আমার নিবিড় অভিমানে বিপুল বেদনায় ভরা সেই বাণীটকে মাথায় করে নিয়ে, সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে সে অচিন পথে কোথায় চলে গেল আর তাকে খুঁজে পেলুম না।

একটি বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। তাকে ফিরে পাবার যে একটা ধৈর্য্যহীন আকুল আকাঙ্ক্ষা রাত্রিদিন বুক ভরে হাহাকার করে ফিরচে, তার পক্ষে এ একটা বৎসর কত শতযুগের মতই অতি দীর্ঘ। জানি সে নিশ্চয়ই বেঁচে নেই, আমার মরণ আশীর্ব্বাদ সে মাথায় তুলে নিয়েচে, কিন্তু তবু মৃত্যুর কূলে দাঁড়িয়ে আজও দুরাশাতুর হৃদয় উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে—আমার নয়নের আলো জীবনের জ্যোতি যদি ফিরে আসে।

শ্রীঅমিয়া দেবী।

কালাজ্বর

কালাজ্বরের প্রকোপ বাঙ্গালা দেশে ক্রমশঃই যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে তাহাতে আমাদের সকলেরই সে সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিয়া রাখা আবশ্যক। ইহার অন্যান্য নাম Indian Kala-Azar, Kala Jwar (কালজ্বর), Kala Dukh, Sirkari Disease, Saheb's Diseasea Dum Dum Fever, Non malarial remittent fever.

গারো পর্ব্বত বাসীদের ভাষায় আজর মানে রোগ। সুতরাং কালা-আজর মানে কালা রোগ। ডাক্তার ব্রহ্মচারীর মতে ইহা কাল জ্বর (যেমন কাল সর্প)। যেহেতু শুধু জ্বরই এই রোগের একমাত্র লক্ষণ নহে, সেই জন্য কাল জ্বর বলিলে যেন কথাটী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং কালা আজর নামই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

সরকারী Disease বা Sahib's Disease যে কেন নাম হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। মিঠা কুমড়াকে আমরা যেরূপ বিলাতী কুমড়া বলি সেইরূপ কি না তাহা বিচার্য্য।

১৮৬৯ খৃঃ যখন ইংরাজেরা গারো পার্ব্বত্য জেলা অধিকার করিলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে উক্ত প্রদেশে একপ্রকার ভীষণ ম্যালেরিয়া ধরণের রোগ লাগিয়াই আছে। এই রোগকে তৎপ্রদেশবাসিগণ বলিত কালা আজর, কারণ এই পীড়ায় রোগীর বর্ণ কালো হইয়া যায় বা অপেক্ষাকৃত মলিন হইয়া যায়।

১৮৯৭ খৃঃ রজার্স সাহেব District Record দেখিয়া বুঝিলেন যে ১৮৭৫ খ্রীঃ হইতে ঐ জেলায় গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। প্রথম প্রথম কালাজ্বর গারো জেলায় সর্ব্বত্র ছিল না—এখানে কতক ওখানে কতক এইরূপ দেখা যাইত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের কালাজ্বর গারো দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ও মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৮৮১ খ্রীঃ গারো পাহাড়ের সানুদেশস্থিত প্রায় সমস্ত গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইল। ১৮৭১—৭৬ খ্রীঃ এর মধ্যে এই ব্যাধি ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় ভীষণ ভাবে দেখা দিল। উক্ত জেলাদ্বয়ে উপরি উপরি পাঁচবৎসর জলকষ্টে লোকেরা অর্দ্ধমৃত হইয়া ছিল, তাহার পর সুদূর গারো পাহাড় হইতে এই জ্বর আসিয়া সমস্ত উত্তর বঙ্গে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিল।

দিনাজপুর হইতে পূর্ণিয়া, পূর্ণিয়া হইতে ভাগলপুর ও মজঃফরপুর। এইরূপে বাঙ্গালা হইতে বিহারে গিয়া কালাজ্বর স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিল। আজ পর্য্যন্ত বিহারে অনেক স্থানে কালাজ্বর রোগী, আসাম হইতেও সংখ্যায় অধিক।

পশ্চিম বঙ্গে বর্দ্ধমান জেলায় ১৮৫৪ হইতে ৭৩ সাল পর্য্যন্ত যে ভীষণ জ্বরের মহামারী হয় তাহাও রজার্স সাহেবের মতে কালাজ্বর—তবে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। ডাঃ ব্রহ্মচারীর মতে তাহা ম্যালেরিয়া। এত দিন পরে সে এপিডেমিকের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নহে—কারণ সে সকল বিবরণী এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে বর্দ্ধমান যে কালাজ্বরের একটী ছোটখাট আড্ডা তাহাতেও সন্দেহ নাই।

শুধু গারো পাহাড় হইতে কালাজ্বর পশ্চিমদিকেই আসে নাই, ব্রহ্মপুত্র নদ ধরিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকেও চলিতে থাকে। রজার্স সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কালাজ্বরের গতি বেগ বৎসরে ১০ মাইল। আর যে স্থানে একবার প্রবেশ করে সেখানে অবস্থিতি ১০ বৎসর। এই দশ বৎসরে সেই স্থানটীকে শ্মশানে পরিণত করিয়া দেয়।

গভর্ণমেণ্ট যখন দেখিলেন যে রাজস্ব কমিয়া আসিতেছে তখন তাঁহারা এ রোগের কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮৮২ খ্রীঃ ক্লার্ক (Clarke) সাহেব এই রোগের প্রথম বিবরণ প্রকাশ করেন। গারো জেলার তাৎকালীন সিভিল মেডিক্যাল অফিসার Mc. Naught সাহেব ১২০টি রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া ক্লার্ক সাহেবকে দেন ও সেই বিবরণ ক্লার্ক সাহেব নিজমন্তব্য সহ প্রকাশ করেন।

গারো হইতে আসামে এই রোগ প্রবেশ করিলে যে কয়জন চিকিৎসক হইয়া তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জাইলস্ সাহেব অন্যতম। ১৮৮৯ খৃঃ তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে এই কালাজ্বর হুকওয়ার্ম রোগ ছাড়া আর কিছুই নহে। যদি বলেন যে শুধু হুকওয়ার্ম রোগে প্লীহা বড় হয় না, তাহার উত্তর তিনি দিলেন, "আসামে সুস্থ লোকেরও প্লীহা প্রায়ই বড়, সুতরাং ওটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।" একথা সকলের মনঃপূত হইল না। ১৮৯৪ খৃঃ ষ্টিভেন্স সাহেব রিপোর্ট দিলেন, যদিও কালাজ্বর ম্যালেরিয়ার মতই বটে, তবে ঠিক এক রোগ নহে, কিছু পার্থক্য আছে। ১৮৯৬ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট রজার্স সাহেবকে আসামে পাঠান। গল্প শুনা যায় যে I. M. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে কায করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেন Send me to the land of Kala-Azar (আমাকে কালাজ্বরের দেশে পাঠানো হউক)।

যাহা হউক রজার্স সাহেব তখন যুবক। এই অক্লান্তকর্ম্মী যুবক আসাম যাত্রা করিলেন। শুনা যায় যে প্রাতঃকালে উঠিয়া কিছু আহার করিয়া লইয়া, এক পকেটে পাঁউরুটি চিনি ও অন্য পকেটে কাগজ পেন্সিল লইয়া বাইসিক্লে বা পদব্রজে তিনি আসামের গ্রামে গ্রামে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দেড় শত মাইল রাস্তা শুধু পদব্রজেই যাইতে হইয়াছিল। সেখানে বাইসিক্লেও

চলে না। যাহা হউক তিনি ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিলেন যে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া একই রোগ।

১৮৯৯ খৃঃ রস (Ross) সাহেবও উক্ত মতের সমর্থন করিলেন। ১৯০২ খৃঃ বেণ্টলি সাহেব বলিলেন যে, তিনি ইহার জীবাণু আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার নাম Micrococcus Melitensis.। ইহাও টিকিল না। অবশেষে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বনামধন্য Sir William Leishman জীবাণু আবিষ্কার করিলেন। ঐ সময়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি সৈনিকের মৃত্যুর পর পোষ্ট-মর্টেম পরীক্ষা করেন। এই সৈনিকটি দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টে থাকিবার সময় জ্বরে আক্রান্ত হয়। মৃত্যুর পর তাহার প্লীহা হইতে রস লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে লীসম্যান সাহেব একটি নূতন জীবাণু আবিষ্কার করিলেন। ধীর ও বিচক্ষণ সাহেব তখনই ইহা লইয়া হৈ হৈ আরম্ভ না করিয়া নীরবে কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

তিন বৎসর পরে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রচার করিলেন যে, তিনি কালাজ্বরের জীবাণু আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ বৎসরই জুলাই মাসে ডনোভান (Donovan) সাহেব একটি কালাজ্বরের রোগীর প্লীহা হইতে রস লইয়া উক্ত প্রকার জীবাণু দেখিতে পান। এই দুই আবিষ্কর্ত্তার নাম বৈজ্ঞানিক জগতে ও চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য নূতন জীবাণুর নামকরণ হইল Leishman। Donovan Bodies বা সংক্ষেপে L. D Bodies জীবাণু আবিষ্কার হইবার পর তখন সকলে প্লীহা হইতে রস লইয়া ঐ জীবাণু বাহির করিতে লাগিলেন। ১৯০৪ সালে ক্রিষ্টোফার সাহেব কালাজ্বর ও তাহার জীবাণু সম্বন্ধে এক সুগভীর তথ্যপূর্ণ রচনা গভর্ণমেণ্টকে প্রেরণ করিলেন এবং ঐ সময়ে রজার্স সাহেব L. D. Bodies culture করিয়া দেখাইলেন যে ভিন্ন ভিন্ন টেম্পারেচারে ইহার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হইতে পারে। ইহার পর ১৯০৭ খ্রীঃ ডাঃ প্যাটন দেখাইলেন যে প্লীহা রস ব্যতীত আঙুল হইতে রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিলেও কখনও কখনও ঐ জীবাণু পাওয়া যায় (যেমন ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রায়ই পাওয়া যায়)। আর সেই রক্ত যদি ছারপোকায় খায় তাহা হইলে ছারপোকার পেটে গিয়া জীবাণুগুলি রজার্স সাহেব কর্ত্তৃক বর্ণিত ভিন্নাকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হয়। তাহার পর আজ ১৫ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর অনেক স্থানে কালাজ্বরের গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। লেখালেখি অনেক হইলেও আসল কার্য্যে আর বেশীদূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালা দেশে কোন্ জেলায় কালাজ্বরের কিরূপ প্রকোপ তাহা আমি আমাদের Tropical School Car michael Hospital এর কাগজপত্র হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। মার্চ্চ ১৯২১ হইতে মার্চ্চ ১৯২২ পর্য্যন্ত ট্রপিক্যাল স্কুলে নেপিয়ার সাহেব সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০ কালাজ্বর রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন---ইহাদের সকলেরই প্লীহা সূচিবিদ্ধ করিয়া রসে জীবাণু দেখিয়া তবে চিকিৎসা আরম্ভ করা হইয়াছিল। কোন্ জেলা হইতে কয়টি রোগী আসিয়াছে?

বর্দ্ধমান বিভাগ—	
বর্দ্ধমান	১৮
বীরভূম	১
বাঁকুড়া	১
মেদিনীপুর	২
হুগলী	৩১
হাওড়া	১৬
প্রেসিডেন্সি বিভাগ—	
কলিকাতা	১০২
২৪ পরগণা	৪০
নদীয়া	১৪
মুর্শিদাবাদ	১
যশোর	৬
খুলনা	১
ঢাকা বিভাগ—	
ঢাকা	৭
ফরিদপুর	৯

চট্টগ্রাম বিভাগ—

নোয়াখালি	২
ত্রিপুরা	৩

রাজসাহী বিভাগ—

রাজসাহী	১
দিনাজপুর	২
জলপাইগুড়ি	১
রঙ্গপুর	১
পাবনা	৯
মালদহ	২

এখন এই তালিকায় বাদ পড়িতেছে মৈমনসিং, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও দার্জ্জিলিং জেলা, ইহা হইতে আপনারা মনে করিবেন না যে ঐ ঐ জেলায় কালাজ্বর মোটেই হয় না। হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে এপর্য্যন্ত ট্রপিক্যাল স্কুলে চিকিৎসার জন্য আসে নাই বটে। ডাঃ ব্রহ্মচারীর মতে পূর্ব্ববঙ্গে মৈমনসিং, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা কালাজ্বরের আড্ডা। মৈমনসিং ও পাবনা জেলায় অবস্থিত যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী যে যে স্থান আছে সেই স্থানে কালাজ্বর খুব প্রবল।

এখন বেহার ও উড়িষ্যায় কি অবস্থা দেখা যাক। ট্রপিক্যাল স্কুলে চিকিৎসার জন্য বেহারের নিম্নলিখিত জেলা হইতে রোগী আসিয়াছে—

পাটনা	৩
গয়া	৩
সাহাবাদ	২
ছাপরা	১
মজঃফপুর	১
দ্বারভাঙ্গা	৩
ভাগলপুর	২
পূর্ণিয়া	২
সাঁওতাল পরগণা	২
কটক	৩
বালেশ্বর	২
পুরী	২

ইহা ছাড়া—আসাম ১, যুক্তপ্রদেশ ১, গোয়া ১। তাহা হইলে দেখুন আজকাল বাংলা বিহার উড়িষ্যা কোথায় কালা জ্বর নাই? সর্ব্বত্রই আছে।

এই তিন শত রোগীর বয়স হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া কি পাওয়া গিয়াছে দেখুন।

তিন বৎসরের নীচে	২
৩—১০	৩৪
১০—২০	১২০
২০—৩০	৮৬
৩০ এর উপর	৫৮
মোট	৩০০

কাহাদের এ রোগ বেশী হয়?

এদেশে গরীব ফিরিঙ্গী ও আমাদের গরীব দেশী লোকদের মধ্যেই এ রোগ প্রবল। কালাজ্বরের চিকিৎসা হাঁসপাতালের বাহিরে যেরূপ ব্যয়সাধ্য তাহাতে এ রোগ শুধু গরীবের রোগ হওয়া দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। (দুর্ভাগ্য, রোগীর ও আর গরীবদের হওয়ার জন্য চিকিৎসকেরও।) ডায়েবিটিসের মত বড় লোকের ঘরে এ রোগ পোষা থাকিলে অনেক ডাক্তার প্রতিপালিত হইত!

ভারতবর্ষের বাহিরেও যে এ রোগ বর্ত্তমান তাহার প্রমাণ ১৯০৪ খ্রীঃ প্রথম পাওয়া যায়। ইজিপ্ট, আরেবিয়া সুডান, সিংহল, বর্ম্মা, ইণ্ডো চায়না সর্ব্বত্রই কালাজ্বর আছে। তবে আমেরিকা মহাদেশের যে টুকু Tropics এর (গ্রীষ্মমণ্ডলের) অন্তর্গত, সেখানে এবং ওসেনিয়া দ্বীপপুঞ্জে এ রোগ এখনও দেখা দেয় নাই। ভূমধ্যসাগর দ্বীপপুঞ্জে এইরূপই একপ্রকার জ্বর দেখা যায় তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে মেডিটারেনিয়ন্ কালাজ্বর বা ইন্‌ফান্টাইল কালাজ্বর। এই রোগ শিশুদের বেশী হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কালাজ্বরের জীবাণুর নাম L. D. B। এই জীবাণু শিরার ও ধমনীর গাত্রে বাস করে। এবং বিশেষতঃ প্লীহা, যকৃৎ ও মজ্জায় পাওয়া যায়। ফুসফুস ও মুত্রকোষেও পাওয়া গিয়াছে। কালাজ্বর জীবাণু কিরূপে সংক্রামিত হয়, অর্থাৎ

এক রোগীর শরীর হইতে অন্য লোকের শরীরে কিরূপে প্রবিষ্ট হয় তাহা আমরা আজও জানি না। তবে অনুমানে এই মনে হয় যে, কোনও রক্তপিপাসু জীব দ্বারা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়—যথা ছারপোকা দ্বারা।

অনেকেরই ধারণা যে যেমন মশক দ্বারা ম্যালেরিয়া জীবাণু পরিচালিত হয়, সেইরূপ ছারপোকা দ্বারা তাহা সংক্রামিত হয়। তাঁহারা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে ইহার বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

এ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ছারপোকা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটিতেও L, D, B, পাওয়া যায় নাই। কালাজ্বর রোগীর বিছানার ছারপোকায় পাওয়া যায় নাই, ছারপোকাকে কালাজ্বর রোগীর গাত্রে বসাইয়া তাহার পর পরীক্ষা করিয়াও জীবাণু পাওয়া যায় নাই। কালাজ্বর রোগীর গায়ে বসা ছারপোকা বানর ও অন্যান্য জীবের গাত্রে বসাইয়াও সেই জীবের কালাজ্বর রোগ জন্মাইতে পারা যায় নাই।

যেরূপেই কালাজ্বর সংক্রামিত হউক না কেন, ইহা স্থির যে রোগীর সহিত খুব বেশীরূপ মাখামাখি না করিলে কালাজ্বর হয় না। যথা এক শয্যায় শয়ন। রজার্স সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে আসামে চা বাগানে যে কয়টি সাহেবের কালাজ্বর হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই কুলী রমণীগণের নিকট হইতে ঐ রোগ পাইয়াছিলেন। উক্ত কুলীরমণীগণের সাহেবদের বাংলায় রাত্রিবাস করা অভ্যাস ছিল। কালাজ্বর যখন এক দেশ হইতে অন্য দেশে নীত হয়, তখন দেখা যায় যে এই দুই দেশের সংযোজক যে পথ, জলপথই হউক বা স্থলপথই হউক, সে পথ দিয়াই কালাজ্বর অগ্রসর হইতেছে। ইহার প্রমাণ এই, যে আসাম হইতে দিনাজপুর জেলায় যখন কালাজ্বর প্রথম আসে,তখন দেখা গিয়াছে যে আসামের যে ঘাট হইতে নৌকা আসিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া দিনাজপুরের যে ঘাটে লাগিত, দিনাজপুর জেলায় সেই ঘাটেই কালাজ্বর প্রথম দেখা দেয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে যদি মশা বা মাছি দ্বারা এই রোগ সংক্রামিত হইত তাহা হইলে এরূপ লোক চলাচলের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা দিয়া এই রোগ ফিরিত না। এক প্রদেশ যদি স্বাস্থ্যপূর্ণ থাকে, আর সেখানে যদি কোনও কালাজ্বরগ্রস্ত রোগী না আসে, তাহাহইলে সেখানে কালাজ্বর হইবে না। রজার্স সাহেব চা বাগানে সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন নূতন কুলী আসিয়া ভর্ত্তি হইলে, যদি তাহাকে পুরাতন কুলীদের আড্ডায় না থাকিতে দিয়া সেই আড্ডায় অন্ততঃ ২০০ গজ দূরে নূতন আড্ডায় বাস করিতে দেওয়া যায়, তবে তাহার কালাজ্বর হয় না—অথচ ২০০ গজ দূরে পুরাতন আড্ডাটিও রোগীতে পূর্ণ।

আসামে চা বাগানে কালাজ্বরের প্রকোপ কিরূপে কমান হইয়াছে তাহা দেখুন।

গারোবাসিগণ কালাজ্বর ভীষণ ভাব ধারণ করিবার কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝিল, যে বাটীতে কালাজ্বর একবার প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। অতএব যঃ পলায়তি স জীবতি। এই নীতির অনুসরণ করিয়া তাহারা দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল এবং এইরূপে পরিত্রাণ পাইল। যেখানে গারোগণ পলাইবার সুযোগ না পাইল, সেখানে তাহারা রোগীর ঘরের চালায় আগুন ধরাইয়া রোগ ও রোগী দুই বিনষ্ট করিয়া তবে পরিত্রাণ পাইয়াছে। রজার্স সাহেব আসামে যাইবার পূর্ব্ব বৎসরে সেখানকার চা বাগানের বিচক্ষণ চিকিৎসক ডভস্ প্রাইস-সাহেব এক চা-বাগানে নূতন নিযুক্ত ২০০ কুলীদের মধ্যে ১৫০ টিকে নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এই নূতন ও পুরাতন বাসস্থানের ব্যবধান প্রায় ৩০০ গজ। অবশিষ্ট ৫০ জন পুরাতন দলেই বাস করিতে লাগিল। দুই বৎসর পরে দেখা গেল যে, যে ১৫০ জনকে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহারা সকলেই সুস্থ আছে—আর যে ৫০ জনকে পুরাতন দলে রাখা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ৮টীর কালাজ্বর রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

অন্য একটি কুলীদের আড্ডায় ২৪০ জনের মধ্যে ১৪৪টি কালাজ্বরে শয্যাশায়ী ছিল। বাকী ৯৬ জনকে

নূতন স্থানে লইয়া যাওয়া হইল, ইহাদের মধ্যে আবার ৫ জনের জ্বর দেখা দেওয়াতে পুরাতন স্থানে ফিরাইয়া আনা হইল। অন্যান্য নূতন কুলী যাহারা ভর্ত্তি হইতে লাগিল তাহাদের নূতন স্থানে রাখা হইতে লাগিল। এই রূপে ১০ বৎসর পরে দেখা গেল যে, নূতন ও পূর্ব্বেকার ৯১ জন মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৪১৬ জনের মধ্যে একজনেরও কালাজ্বর হয় নাই, সকলেই সুস্থ আছে।

আর একটি লাইনেও এইরূপ বন্দোবস্ত করিবার সময় ৬০জন কুলী নূতন স্থানে যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহারা সেখানেই রহিয়া গেল, দেড় বৎসরের মধ্যে এই ৬০ জনের ২০ জনের মৃত্যু হইল, অথচ ৪০০ গজ দূরে নূতন লাইনে যাহারা ছিল তাহাদের কিছুই হইল না।

কালাজ্বরের লক্ষণ—

আমরা সচরাচর কালাজ্বর রোগীর নিকট যেরূপ ইতিহাস পাই তাহা এই—

আরম্ভ :—

হঠাৎ শীত করিয়া কম্প দিয়া জ্বর আরম্ভ হইয়া, হয় সেই জ্বর টাইফয়েডের মত রেমিটেন্ট লক্ষণযুক্ত হয়, নতুবা ম্যালেরিয়ার মত রোজই শীত করিয়া জ্বর আসিয়া ছাড়িয়া যায়। যদি টাইফয়েডের মত হয় তবে দেখা যায় যে রোজ দুইবার জ্বর বাড়িতেছে, অর্থাৎ সকালে ধরুণ ১০১, দুপুরে ১০৩, বিকালে ১০০ ও সন্ধ্যায় আবার ১০৩ এই যে দোকালীন জ্বর বাড়া ইহা রজার্স সাহেবের মতে কালাজ্বরে একটি প্রধান রোগনির্ণায়ক লক্ষণ। ২৮ হইতে ৪১ দিনের মধ্যে এই জ্বর ক্রমশঃ কমিয়া নর্ম্মালে দাঁড়ায় এবং কালাজ্বরের সম্ভাবনা মনে না থাকিলেও সচরাচর ইহাকে আমরা টাইফয়েড বলিয়াই চিকিৎসা করি। আর একটি লক্ষণ—রোগীর জ্বর ধরুন ১০৪, তখন এই উত্তাপের আনুসঙ্গিক উদ্বেগ—মাথাধরা, গা বমি বমি করা, ময়লা জিহ্বা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, বা থাকিলেও তাহা জ্বরের তুলনায় অনেক কম। প্রায়ই দেখা যায় রোগীর জ্বর ১০৩, সে অবস্থায় সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সচ্ছন্দে ভাত ডাল খাইতেছে ও তাহা পরিপাক করিতেছে।

প্রথম দফা জ্বর ত ভাল হইল এবং রোগী, আত্মীয় স্বজন ও চিকিৎসক সকলেই মনে করিলেন যে যাক্ এযাত্রা খুব রক্ষা পাইয়া গেল। চিকিৎসকেরও সুনাম বজায় রহিল। ইতিমধ্যে কালাজ্বর তাহার যেটুকু কায তাহা করিয়া গিয়াছে! অর্থাৎ প্লীহা ও যকৃৎ দুইটিই একটু বড় ও বেদনাযুক্ত হইয়াছে।

আর এক রকমে কালাজ্বর আরম্ভ হইতে পারে। হঠাৎ জ্বর হইয়া নিউমোনিয়ার মত একটানা জ্বর, এক ডিগ্রীর বেশী রেমিশন হয় না, কিন্তু তাহাও দিনে দুইবার। যথা সকালে ১০৩, দুপুরে ১০৪, বিকালে ১০৩, রাত্রে ১০৪। ইহাও রজার্স সাহেবের মতে কালাজ্বরের বিশেষত্ব।

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়, জ্বর না হইয়া কালাজ্বর। একটু পেটের অসুখ বা আমাশয় বা রক্ত-আমাশয়—কিছুতেই আরাম হয় না। ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, রক্তহীনতা ও দৌর্ব্বল্য। জ্বর না হইয়া কালাজ্বর।

প্রথম দফা জ্বরের পর দিন কতক বিশ্রাম—এসময়েও কাহারও কাহারও একটু একটু জ্বরবোধ হয়, বড় জোর ১০০। এইরূপ অবস্থায় কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া আবার আর এক দফা টাইফয়েডের মত জ্বর, বা ম্যালেরিয়ার মতন দৈনিক জ্বর। এই রূপে জ্বরে বিজ্বরে সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা এবং কখন কখনও যকৃৎ বাড়িয়া চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তহীনতা, আর দৌর্ব্বল্য—এরূপ অবস্থায় রোগী উপস্থিত হয় যে চিকিৎসকগণ শুধু আকৃতি দেখিয়াই অনুমান করেন যে এটি নিশ্চয়ই কালাজ্বর। রোগী চিকিৎসকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া জামা খুলিল, বুকের পাঁজরার অস্থি কয়খানি গণিয়া লইতে পারেন সে এত রোগা, পেটটী উঁচু, সরু সরু হাত পা, গাল বসা, গলার হাড় বাহির হইয়াছে, পায়ের পাতা ফোলা আর গায়ের রং ও জিভের রং বেশ কালো, গায়ে খড়ি উড়িতেছে, মাথার চুল ঝরিয়া পড়িতেছে। তিন মাসের মধ্যেই প্লীহা নাভিদেশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু যকৃৎ প্রায়ই ৬ মাসের পূর্ব্বে বাড়ে না। অনেক দিন পর্য্যন্ত ভুগিলে কালাজ্বরের রোগীর পেটটি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যেন পেটে

প্লীহা ও যকৃৎ ছাড়া আর কিছুই নাই। রোগীকে জিজ্ঞাসা করুন যে তাহার আর কি কি অসুখ? সে বলিবে পেটের অসুখ লাগিয়া আছে, হয় আমাশয়, বা রক্তামাশয়। পরিপাক ভাল হয় না অথচ ক্ষুধা বেশ আছে। আর রক্তস্রাব হয়, নাক হইতে দাঁতের গোড়া হইতে। কিংবা বমন। আর চামড়ার নীচে মশার কামড়ের মত ছোট ছোট লাল লাল ফুস্কুড়িও হইতে পারে। যদি এই অবস্থায় চিকিৎসকের সাহায্য না পায় তাহা হইলে রোগী হয়ত এমনই ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া মরে বা সুযোগ পাইয়া আর কোন ব্যাধি—নিউমোনিয়া, প্লুরিশি, রক্তামাশয় বা যক্ষ্মা আসিয়া দুর্ভাগার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়। যদি নিউমোনিয়া হয় এবং রোগী যদি এইরূপ নিউমোনিয়ার টাল সামলাইয়া উঠিতে পারে তাহা হইলে দেখা গিয়াছে তাহার কালাজ্বর সম্পূর্ণ ভাল হইয়া যায় বা অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।

এখন দেখা যাউক কিরূপভাবে আমরা কালাজ্বরের রোগ নির্ণয় করিয়া থাকি।

(১) রক্ত পরীক্ষা—যদি ম্যালেরিয়ার বীজ না পাওয়া যায় বা টাইফয়েডের Widal Reaction না পাওয়া যায় তাহা হইলে আমরা কালাজ্বর বলিয়া সন্দেহ করি। ম্যালেরিয়ার মত জ্বর অথচ কুইনাইনে বন্ধ হয় না।

(২) দিনে দুইবার জ্বরত্যাগ—ইহাও কালাজ্বরের একটী বিশেষ লক্ষণ।

(৩) জ্বরের অনুপাতে আনুসঙ্গিক উদ্বেগের অভাব—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(৪) Napier সাহেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত Aldehyde test—এই পরীক্ষা দ্বারা শতকরা ৯০টী কালাজ্বর রোগ প্লীহা সূচিবিদ্ধ না করিয়া নির্ণয় করা যায়। রোগীর শিরা হইতে কিছু রক্ত লইয়া তাহার জলীয় অংশ (serum) পৃথক করিয়া তাহাতে ফর্ম্মালিন ২।১ ফোটা দিলে, তাহা ডিম সিদ্ধের মত শক্ত হইয়া যায়।

(৫) প্লীহা সূচিবিদ্ধ করিয়া জীবাণু দেখা—ইহা অবশ্য অকাট্য প্রমাণ।

(৬) রোগের প্রথমাবস্থায় যেখানে সূচিবিদ্ধ করিবার মত প্লীহা তখনও বড় হয় না, তখন শিরা হইতে রক্ত লইয়া তাহা culture করিলে জীবাণু পাওয়া যায়।

যখন রক্তহীনতায় রোগী শাদা হইয়া যায় তখন Hookworm রোগ বলিয়া মনে হইতে পারে। তাহা মল পরীক্ষা করিলেই ধরা যাইবে। তবে কালাজ্বরের সঙ্গে হুকওয়ার্ম ট্রপিক্যাল স্কুলে প্রায়ই দেখা যায়। কার্ম্মাইকেল হাঁসপাতালে যেসব কালাজ্বর রোগী এপর্য্যন্ত ভর্ত্তি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৮টীর হুক্‌ওয়ার্ম্ম রোগও দেখা গিয়াছে।

এইবার চিকিৎসার কথা।

কালাজ্বর চিকিৎসায়—antimony আজ কাল সর্ব্ববাদী সম্মত। কালাজ্বর চিকিৎসায় antimonyর নাম আপনারা সকলেই জানেন। Tartar Emetic ঔষধটী Basil Valentine ষোড়শ শতাব্দীতে আবিষ্কার করেন। আবিষ্কার করিবার পর তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার জন্ম তিনি এই ঔষধ কয়েকটী নিরীহ সন্ন্যাসী দিগকে (Monk) প্রয়োগ করেন। তাহার ফলে এই কয়টী দুর্ভাগ্য সন্ন্যাসী মানবলীল সম্বরণ করে। সেই হইতেই ইহার নাম হইল অ্যান্টিমনি অর্থাৎ anti (against) moine (the monk)। ১৯১৩ খৃঃ গ্যাস্পার ভিয়ান্না নামক জনৈক ডাক্তার কালাজ্বর জাতীয় এক প্রকার চর্ম্মরোগে ইহার ইঞ্জেক্‌সন প্রথা প্রচলন করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সিংহলে কাষ্টালিনি সাহেব আসল কালাজ্বর রোগে ইঞ্জেক্‌সন ও বড়ি খাওয়াইতে আরম্ভ করেন। ১৯১৫ খৃঃ ভারতবর্ষে রজার্স সাহেব এই চিকিৎসার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। ক্রিষ্টোফারসন ইজিপ্টে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন এবং এইরূপে অ্যান্টমনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে কালাজ্বরের প্রধান চিকিৎসা দাঁড়াইয়াছে। যে অ্যান্টিমনি এককালে অপযশের টীকা ললাটে ধারণ করিয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুণে কালাজ্বরে অমৃতরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।

এই চিকিৎসা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে কালাজ্বরে মৃত্যুহার শতকরা ৯৮ ছিল। অর্থাৎ নেহাৎ "রাখে কৃষ্ণ" না হইলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। এখন অ্যান্টিমনি চিকিৎসায় কালাজ্বরের ভীষণত্ব দূর হইয়াছে। চিকিৎসক রোগীকে বলিতে পারেন যে হাঁ ভাল হইবে, ভয় নাই। Intravenous এবং intra muscular এই দুই প্রকার ইঞ্জেক্‌সন আজকাল প্রচলিত। ইনট্রাভীনস্ ইঞ্জেক্‌সনে পারদর্শী চিকিৎসককে দিযাই এ ইঞ্জেক্‌সন করান উচিত, কারণ অ্যান্টিমনি যদি ঠিক শিরার ভিতর না পড়ে তবে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। সেই কারণে ইন্ট্রামস্কুলার ইঞ্জেক্‌সনের প্রচলন কম। যদি ভবিষ্যতে এমন কোনও ঔষধ বাহির হয় যে যাহা হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকশনে বা খাইতে দিলে কালাজ্বর ভাল হয়, তাহা হইলে কালাজ্বরের চিকিৎসা সরল ও স্বল্পব্যয়সাধ্য হইবে। সচরাচর সপ্তাহে দুই বার বা তিন বার ইঞ্জেক্‌সন দেওয়া হয়। জ্বর বন্ধ হইবার পরও অন্ততঃ দুই মাস ইঞ্জেক্‌সন চালান উচিত। নচেৎ পুনরাক্রমণ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বাড়ীতে কাহারও কালাজ্বর হইলে তাহাকে পৃথক একটী ঘরে রাখিতে হইবে। রোগীর সহিত এক শয্যায় শয়ন বা একই ঘরে ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিলে পরিচর্য্যাকারীরও কালাজ্বর হইবার সম্ভাবনা থাকে।

কালাজ্বর নিবারণ করার উপায়—

যখন কালাজ্বর কিরূপে সংক্রামিত হয় তাহা আমাদের জানা নাই, তখন আমরা এই করিতে পারি যে—

১। রোগীকে পৃথক রাখা ও তাহার মলমূত্রাদি ডিসইন্‌ফেক্ট করা, আর তাহাকে মশা ছারপোকা না কামড়ায় তাহার ব্যবস্থা করা।

২। কোন স্থানে কালাজ্বর দেখা দিলে সমস্ত সুস্থ লোককে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করা ও সেস্থানের সমস্ত বিছানাপত্র, আসবাব এমন কি খড়ের চালা প্রভৃতি সমস্ত ডিসইনফেক্ট করা বা একেবারে অগ্নিসাৎ করা।

৩। ঔষধাদি দ্বারা বা শুধু ফুটাইয়া পানীয় জল ডিসইন্‌ফেক্ট করা।

৪। যদি দেখা যায় যে ম্যালেরিয়ার মত জ্বর অথচ কুইনাইনে বন্ধ হইতেছে না, প্লীহা বৃদ্ধি হইতেছে, রক্তস্রাব হইতেছে ও রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ কালজ্বর সন্দেহ করিয়া রক্ত পরীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা রোগ নির্ণয় করানো ও চিকিৎসা আরম্ভ উচিত। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে যত শীঘ্র এ রোগ ধরা পড়ে ততই রোগীর পক্ষে মঙ্গল।*

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

* কলিকাতা "রেন্‌বো ক্লাব"এর বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

আসন্ন-পরিণয়া

কেমনতর হবে লো সই, কেমনই সেটা হবে
হাসিয়া যবে বলিবে 'বৌ'--থুতনী ছুঁয়ে যাবে।
কোথায় যাবে উচ্চ হাসি বাঁধন-বাধাহীন,
চলতে সদা সাবধানতা চাই যে নিশিদিন।
ঢাকতে হবে ঘোমটা আড়ে সতত মুখখানি
পরতে হবে জড়ায়ে লাজে শেমিজ শাড়ী টানি।
রূপের মোর বিচার হবে মহিলা-সভা মাঝে,
বলিবে কেউ 'বেশ ত খাসা'—মরিয়া যাবো লাজে।
কেউবা কবে "ততটা নয় যতটা কিছু রটে,
আহা মরি না, ছিছিও নয় চলনসই বটে।"
গয়না গায়ে সয়না মোর, পরিতে হবে সবি,
ঘরের কোণে রইতে হবে পটের যেন ছবি।
পূজোর বলি ছাগের মত রইতে হবে বাঁধা,
হয়ত সবে সইবেনাক তোদের তরে কাঁদা।
অনেক জ্বালা সইতে হবে, তবু না সই ডরি,
দিচ্ছে মোর শরীরে কাঁটা সকলি মনে করি।
বাঁ চোখ যেন উঠছে নেচে, হৃদয় দুরু দুরু,
অজানা কোন সুখের লোভে পরাণ উড়ু উড়ু।
পাগলা হাতী আমারে তুলে করবে কিলো রাণী?
পরীর দেশে কে যেন মোরে দিচ্ছে হাতছানি।

শ্রীকালিদাস রায়।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"ছোটা পেগ"

কিশোরীকে লইয়া হেমচন্দ্র যথাসময়ে "ঘোষ ভিলা"য় গিয়া দর্শন দিল। এক দিকে মল্লিক ও সত্যবালা, অপর দিকে হেম ও বীণা খেলিবে ইহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া ছিল। পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরেই খেলা আরম্ভ হইল।

সামনের বারান্দায় চেয়ার পরিবেষ্টিত ছোট ছোট কতকগুলি টেবিল সাজানো ছিল। মিসেস ঘোষ কিশোরীকে বলিলেন, "আপনি ত খেলেন না; আসুন আপনি আর আমি এই বারান্দায় বসে খেলা দেখি।" বলিয়া তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া, নিকটে কিশোরীকে বসাইলেন। কিন্তু পাঁচ মিনিটও নহে।—তৎপূর্ব্বেই "চায়ের কি করছে দেখে আসি।" বলিয়া কিশোরীকে একাকী ফেলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

কিশোরীর মনটা পূর্ব্বেই খারাপ হইয়াছিল, সত্যবালাকে মল্লিকের সঙ্গে খেলিতে দেখিয়া তাহা আরও বিগড়াইয়া গেল। তাহাদের ইংরাজি বুলি এবং মাঝে মাঝে হাস্যধ্বনি কিশোরীর কর্ণে যেন কর্ণশূল উৎপাদন করিতে লাগিল। মল্লিকের উপর রাগ হইল,— সাহেবিয়ানার উপর রাগ হইল, খাইতে শুইতে বসিতে সামাজিক ব্যাপারে যাহারা ইংরাজদের অন্ধ অনুকরণ করে, তাহাদের অপরিসীম মূঢ়তা, অসহনীয় ধৃষ্টতা ও অমার্জ্জনীয় স্বজাতিদ্রোহিতা কিশোরীর মনকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ইংরাজ-বেশধারী তাবৎ বাঙ্গালী সাহেব ও বিবিগণকে নর রাক্ষস ও নারী রাক্ষসী বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। সে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, কলিকাতায় ফিরিয়া নিজের এই ইংরাজি কাপড় চোপড়গুলা পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া গিয়া ধাপার মাঠে বিসর্জ্জন দিয়া, গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিবে।

একবাজি খেলা শেষ হইলে, খেলোয়াড়গণ হাস্য কোলাহল করিতে করিতে বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন। তখন মিসেস্ ঘোষও আসিয়া আবার দর্শন দিলেন। মল্লিক সাহেব সিগারেট কেস খুলিয়া হেমের সম্মুখে ধরিলেন; হেম একটি তুলিয়া লইলে, তিনি নিজে একটি মুখে করিয়া কেসটি খট্ শব্দে বন্ধ করিয়া পকেটে ফেলিলেন; দ্বিতীয় আগন্তুক হতভাগ্য "বেঙ্গলি পোয়েট"এর পানে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। "বয়" একটি ট্রের উপর, কয়েকটি সোডা ও লেমনেডের বোতল এবং গ্লাস ও বরফদানি সজ্জিত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সতী ও বীণা লেমনেড লইল, হেম সোডা লইল; মল্লিক, ঘোষজায়ার পানে চাহিয়া বিনীত হাস্যের সহিত বলিল—"A chota peg, if I may."

গৃহিণীর ইঙ্গিত পাইয়া টেবিলের উপর ট্রেখানি নামাইয়া রাখিয়া বয় সুরা আনিতে ছুটিল। গৃহিণী কিশোরীর প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "আপনি কিছু নিচ্ছেন না, সোডা কি লেমনেড?"

কিশোরী একটু কাষ্ঠহাসি মুখে টানিয়া আনিয়া বলিল, "আমি ত খেলিনি, আমার পিপাসাও পায় নি।"

বয়, হুইস্কিপূর্ণ ডিক্যাণ্টর আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। মল্লিক, একটা গ্লাস লইয়া তাহাতে আউন্স তিনেক ঢালিয়া লইলেন। কিশোরী নিরীহ লোক, ছোট বড়র তারতম্য তাহার জ্ঞানের অতীত—কিন্তু হেম মনে মনে বলিল—"দাদা, ঐ তোমার ছোটা পেগ, না জানি তোমার বড় কেমন!"

সত্যবালা মাঝে মাঝে কিশোরীর পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। বীণা একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "মিষ্টার নাগ, আপনি এমন গম্ভীর যে আজ? কোনও নূতন

কবিতা ভাবছেন বুঝি?" হেম পকেট হইতে নিজ সিগারেট কেস বাহির করিয়া কিশোরীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "ওহে ভাবের গোড়ায় একটু ধোঁয়া দাও, কবিতা খুলবে ভাল।"—কিশোরী সিগারেট লইল, বীণার টিপ্পনীর কোনও উত্তর দিল না।

মিসেস ঘোষ বলিলেন, "তোমরা আর একবার খেলবে ত? খেলে নাও—নইলে শেষে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" সকলে উঠিয়া আবার খেলিতে গেলেন।

খেলা শেষে চা পানান্তে দেখা গেল, বেড়াইতে যাই-বার আর সময় নাই। ঠাণ্ডা পড়িতেছে দেখিয়া ভিতরে গিয়া সকলে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ গল্প গুজবের পর হেম বিদায় চাহিল; যথাযোগ্য অভিবাদনাদি সমাপন করিয়া কিশোরীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

বন্ধুর মনের অবস্থা বুঝিয়া হেম তাহার সহিত পথে বেশী কথাবার্ত্তা কহিল না।

স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া নিজ ঘরে গিয়া, লম্ফমান্ টমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া, তাহাকে খানিক আদর করিয়া, হাত মুখ ধুইয়া কিশোরী বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। পরে হেমের ঘরে গিয়া বসিয়া, একথা সে কথার পর জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাহে, ঘোষেরা মল্লিককে জামাই করবার চেষ্টায় আছেন না কি?"

হেম বলিল, "কিসে বুঝলে?"

"টেনিসে সতীই যে মল্লিকের জুড়ি হল সেটা কি আকস্মিক দৈব ঘটনা, না গভীর অভিসন্ধির ফল?"

হেম একটু হাসিয়া বলিল, "ওঃ—সেটা কিছু নয়। মল্লিক এখন হল ওদের বাড়ীতে মান্য অতিথি, সুতরাং বড় মেয়েটাই ত তার সঙ্গে খেলবে। ওটা সামাজিক শিষ্টাচার ছাড়া অন্য কিছুই নয়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বদেশী পাণ ও জর্দ্দা।

মল্লিক সাহেব যে কয়দিন দার্জ্জিলিঙে রহিলেন, কিশোরী আর জলাপাহাড়ের পথ মাড়াইল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এ কয়দিনে, হেমের বা কিশোরীর চায়ে বা ডিনারে ঘোষ ভিলায় কোনও প্রকার নিমন্ত্রণও হইল না—যদিও প্রথম দুই সপ্তাহ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ লাগিয়াই থাকিত। যাহা হউক আগামী কল্য কলিকাতা মেলে মল্লিক ও ঘোষ উভয়েই দার্জ্জিলিঙ ত্যাগ করিবেন, হেম আজ তাই বৈকালে উঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে।

টমিকে সঙ্গে লইয়া কিশোরী আজ একাকীই বৈকালিক ভ্রমণে বহির্গত হইল। শ্রাবারি অতিক্রম করিয়া ক্রমে বার্চ্চ হিলের নিকট পৌছিল। পাহাড়ে উঠিয়া শ্রান্ত দেহে একটা প্রস্তর খণ্ডের উপরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল। এ কয়দিন ক্রমাগতই সে ভাবিয়াছে। মল্লিক আসিবার পূর্ব্বে, সত্যবালার প্রতি কিশোরী একটা আকর্ষণ অনুভব করিত এবং এই লইয়া হেম তাহাকে নানা সময়ে নানাপ্রকার পরিহাসও করিয়াছে সে সব তাহার মিষ্টই লাগিত—তবে তখন সত্যবালা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাবটা ছিল, 'যদি হয় ত মন্দ কি? অন্তরের মধ্যে বেশ পাকাপাকি ভাবে সতীকে সে আপন জীবনসঙ্গিনী বলিয়া তখন গ্রহণ করে নাই। কিন্তু এ কয়দিনে তাহার মনের ভাব একটা বিশিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সতীকে তাহার চাই—সে নহিলে কিছুতেই তাহার চলিবে না—জীবনটা মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া যাইবে।—তাহাকে পাইলে, আর কিছুরই অভাব থাকিবে না, জীবন তখন শোভাময় সৌরভময় কুসুমোদ্যানে পরিণত হইবে বলিয়া কিশোরীর বিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রথম দুই একদিন শুধু মল্লিকের উপর নহে, সতীর উপরেও তাহার অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, মল্লিককে পাইয়া আমাকে সে ভুলিল? অসার অপদার্থ রমণীহৃদয়!—তাহার পর সে ভাবিয়া দেখিয়াছে, সতীর অপরাধ কি? মল্লিকের জুড়ি হইয়া সে টেনিস খেলিয়াছে, ইহার অধিক ত কিছুই নহে! হেম ঠিকই বলিয়াছে, ইহা একটা সামাজিক শিষ্টতা মাত্র। বাড়ীর বড় মেয়ে তাই সে "মান্য অতিথি"র সহিত খেলিয়াছে, ইহাতে মহাভারত আর

কি এমন অশুদ্ধ হইয়া গেল? ইহা হইতে কেমন করিয়া প্রমাণ হয় যে সতী আমাকে ভুলিয়া মল্লিকের প্রতি ঢলিয়া পড়িয়াছে? বীণাও ত হেমের সঙ্গে খেলিয়াছে, সুতরাং হেম ও বীণা পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ এমন হাস্যজনক সংশয় ত কাহারও মনে আসে নাই!

তবে একটা কথা কিশোরীর মনে হইয়াছে—হয়ত সতীর মা বাপের ইচ্ছা হইয়া থাকিতে পারে যে, মল্লিকের সঙ্গেই মেয়ের বিবাহটি হয়। উভয়কে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা বোধ হয় তাঁহারা করিতেছেন। নচেৎ মল্লিককে সঙ্গে আনিয়া এক সপ্তাহ কাল বাড়ীতে রাখিবারই বা তাৎপর্য্য কি? মনে মনে বলিল, "হতভাগা! তুই মেদিনীপুর থেকে রংপুরে বদলি হয়েছিস, দশ দিন ছুটি পেয়েছিস, বেশ ত—এখানে মরতে এলি কেন? তোর কি মা বাপ, ভাই বোন, খুড়ো জ্যেঠা, মাসি পিসি কোনও চুলোয় কেউ নেই—সেইখানে গিয়ে ছুটি কাটালে কি চলতো না? না, তারা বুঝি ড্যাম নেটিব, তাই তাদের পছন্দ হয় না! তাদের বাড়ীতে টেনিস কোর্টও নেই, 'ছোটা পেগ'ও তারা যোগাতে পারেনা! যমের অরুচি!"

এই সময়ে নিম্নে গিরিপাদমূলস্থ পথের উপর কিশোরীর দৃষ্টি পড়িল। কত সাহেব মেম, কত আয়া, ছেলে মেয়ে, কত বাঙ্গালী বাবু চলিতেছে—তাহার মধ্যে ঐ যুগলে যুগলে চলিয়াছে, উহারা কারা? ঘোষ সাহেবেরা না? তাহারাই ত! আগে আগে সস্ত্রীক ঘোষ সাহেব, তৎপশ্চাৎ হেম ও বীণা, এবং সব শেষে মল্লিক ও সত্যবালা। কিশোরী এক দৃষ্টে মল্লিক ও সত্যবালার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার মনটা তিক্ততায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভাবিল বাঃ বাঃ—যোড়াটি যে দেখছি এখনও ভাঙ্গে নি!—নিজ কন্যাটিকে গতাইবার জন্যই পাষণ্ড ঘোষ সাহেব যে মল্লিককে জুটাইয়া দার্জ্জিলিঙে আনিয়াছেন, এ সম্বন্ধে কিশোরীর আর সন্দেহ মাত্র রহিল না। গভীর অভিমানে সে মনে মনে বলিতে লাগিল—"তা তো হবারই কথা। ও হল একটা সিভিলিয়ন,—আর আমি হলাম কি? না, ন্যাকড়া পরা একটা বেঙ্গলি পোয়েট্! সিভিলিয়ন জামাই পেলে বেঙ্গলি পোয়েট আর কোন্ মা বাপ চায় বল! কিন্তু সে চুলোয় যাক্। সতীর মনের ভাবটা কি? সেও কি ঐ বাঁদরটাকে পছন্দ করেছে?"

অতি অল্পক্ষণেই পথের বাঁকে তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন। কিশোরী অনেকক্ষণ সেখানে ভূতগ্রস্তের মত বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা হইলে সে উঠিল, ধীর পদে স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, হেম তখনও ফেরে নাই।

রাত্রি ৮টা বাজিল। তখনও হেমের দেখা নাই।

৯টার সময় স্যানিটেরিয়মের পরিচারক আসিয়া হেমের ঘর বন্ধ দেখিয়া, কিশোরীর ঘরেই আহারের জন্য টেবিল সাজাইতে লাগিল। কিশোরী একাকী বসিয়া ভোজন সমাধা করিল। টমিকে খাওয়াইয়া, আরাম চেয়ারে পড়িয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ভাবিতে লাগিল, হেম নিশ্চয়ই সেখান হইতে খাইয়া আসিবে। আজ আমি সঙ্গে নাই, কোনও আপদ নাই, 'পুনশ্চ' যুড়িবার বালাই নাই। এ কয়দিন, কেবল আমার ভয়েই হেমকেও তাহারা নিমন্ত্রণ করিতে পারে নাই। আজ উহারা নির্ব্বিঘ্নে হেমকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছে; হেমটাও এমনি পেটুক, লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, তথাপি হেমের দেখা নাই।

"ঘোষভিলা"য় এ সময় কি হইতেছে তাহাই কিশোরী কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। ডিনার শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলে আসিয়া ড্রয়িং রুমে বসিয়াছে, গল্প গুজব হইতেছে। মল্লিক হয়ত এখনও 'ছোটা পেগ' চালাইতেছে, আর সুরারক্তিম লুব্ধনেত্রে সতীর পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। উঃ—অসহ্য! মাঝে মাঝে সতী এবং মাঝে মাঝে বীণা বোধ হয় পিয়ানোয় বসিতেছে। আজ আর রবিবাবু দ্বিজুবাবু সেখানে কল্কে পাইবেন না—"মান্য অতিথি" মল্লিক সাহেব কি বাঙ্গলা গান সহ্য করিতে পারিবেন? ভূতের কাছে রামনাম! আজ সব ইংরাজি গৎ বাজিতেছে—কথাবার্ত্তাও সমস্তই আজ ইংরাজিতে। লজ্জাও নাই এই সব সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভগণের!—হঠাৎ নিজের পোষাকের উপর কিশোরীর নজর পড়িল। ভাবিল, ছি ছি, আমিও ত বাঁদর সাজিয়াছি। কি মোহ! কি

মরীচিকা! হেমের ভুজঙ্গে পড়িয়া, একখানা ধুতিও সঙ্গে আনি নাই যে বাহির করিয়া পরি—পরিয়া ভদ্রলোক সাজি। হাঁ দাঁড়াও এক কায করি—

কিশোরী হাঁকিল—"বেয়ারা!"

"হুজুর"—বলিয়া ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল।

"দেখো, হিঁয়া পাণ হায়? পাণ—পাণ—পাণখিলি?"

বেহারা বলিল, "হাঁ হুজুর, অথোড়াকুমে পাণ হায়। লে আওয়ে?"

"যাও।"

বেহারা চলিয়া গেলে হেম অস্ফুট স্বরে বলিল—"হাঁ, আমি পাণ খাব। খুব করবো পাণ খাব—তোমরা পেগ খাও, আমরা স্বদেশী পাণ খাব—জর্দ্দা দিয়ে পাণ খাব—দেখি কে আমার কি করতে পারে! তোর সাহেবিয়ানার মাথায় মারি ঝাড়ু!" বিদ্যুদ্‌বেগে বারান্দায় বাহির হইয়া কিশোরী আবার ডাকিল—"বেয়ারা!"

বেয়ারা তখনও সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায় নাই, ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কিশোরী বলিল, "পাণ লাও। আওর দেখো, থোড়া জর্দ্দা মিলে তো সো ভি লাও।"

"বহুৎখু"—বলিয়া বেহারা পুনঃ প্রস্থান করিল। পাঁচ মিনিট পরে সে ফিরিয়া আসিল। একটি চায়ের পিরিচে চার খিলি পাণ, তাহার পাশে কতকগুলি কালো গুঁড়া, টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। "ঠিক হায়।"—বলিয়া কিশোরী ভৃত্যকে বিদায় দিয়া, এক খিলি পাণ এবং কিঞ্চিৎ জর্দ্দা মুখে ফেলিয়া দিল।

জর্দ্দা ইতিপূর্ব্বে কিশোরী কোনওদিন সেবন করে নাই। ফলে, অতি শীঘ্রই তাহার গা ঘুরিয়া উঠিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। তখন সে বাথরুমে গিয়া থু থু করিয়া মুখস্থিত সমস্ত পদার্থটা ফেলিয়া দিয়া, কুলকুচু করিয়া, মাথায় ও দুই রগে জল থাবড়া দিয়া শয়ন ঘরে ফিরিয়া আসিল। সোরাই হইতে এক গ্লাস শীতল জল ঢালিয়া ঢকঢক করিয়া পান করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে একটু সুস্থ বোধ করিল। সেই কালো পদার্থটির পানে চাহিয়া বলিলল, "বাবা, তুমি কম নও! তুমি জর্দ্দা নও—স্যানিটেরিয়ম থেকে নিশ্চয়ই জর্দ্দা সরবরাহ হয় না, তুমি উড়িয়া বামুন ঠাকুরের গুণ্ডি। নমস্কার তোমার পায়ে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নূতন সংবাদ

রাত্রি প্রায় ১১টা বাজে। হেম আসিল না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া, কিশোরী শয়নের আয়োজন করিল। পোষাক খুলিয়া, রাত্রিবসন পরিধান করিল। আলো নিবাইতে যাইবে, এমন সময় বাহিরে হেমের পদশব্দ শুনা গেল।

মুহূর্ত্ত পরে হেম প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি হে, এখনও ঘুমাও নি?"

কিশোরী দেখিল, হেমের চক্ষু দুইটি আরক্ত। জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরী যে!"

হেম একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল, "দেরী হয়ে গেল—ওঁদের সঙ্গে দেখা করে ফিরবো, বল্লেন চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বার্চ্চহিল ঘুরে, ম্যালের কাছে এসে বল্লাম আমি তবে নেমে যাই? ঘোষ বল্লেন এস, পটলাক্ (pot luck) খেয়ে বাড়ী যেও।"

কিশোরী বলিল, "পট্‌লাক্ কি? এক ভাঁড় মদ?"

হেম বলিল, "দূর পাগল! পট্ মানে হাঁড়ি! অর্থাৎ আমাদের হাঁড়িতে যা ক্ষুদকুঁড়ো আজ রান্না হয়েছে তাই দুটি খেয়ে যেও। বিনা নিমন্ত্রণে কাউকে খেতে বল্লে ঐ রকম করে বলা হয়—বিনয় আর কি!"

কিশোরী বলিল, "ওঃ, খুব বিনয়ী ওঁরা! বেশ। ভোজনটা কি রকম হল?"

"তা, পরিপাটি রকমেরই হল। ভোজনের পর, হেতুটাও জানতে পারা গেল। খানা কামরা থেকে উঠে সকলে ড্রয়িং রুমে যাচ্ছিলাম, ঘোষ আমার কুনুই ধরে বল্লেন, "হেম, আমার ঘরে এস একটু কথা আছে।"

কিশোরী এতক্ষণ নিতান্ত উদাসীন ভাবেই হেমের কাহিনী শুনিতেছিল, এইবার তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত

হইয়া উঠিল। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া, হেমের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার পরে?"

হেম বলিল, "ঐ বাড়ীতে একটি ছোট কামরা আছে, সেটি ঘোষ সাহেবের ষ্টাডি। সেইখানে আমায় নিয়ে গিয়ে তিনি বসালেন। বেয়ারা, একটা ট্রেতে, একটি হুইস্কির ডিকাণ্টর, একটি সোডাজলের সাইফন্ এবং দুটি গ্লাস রেখে চলে গেল। ঘোষ সাহেব নিজে একটি পেগ ঢেলে নিলেন, আমাকেও একটি ঢেলে দিলেন। তিন চুমুক পান করে গ্লাসটি নামিয়ে রেখে বল্লেন—ইংরেজিতেই সব কথাবার্ত্তা—বল্লেন হেম, তুমি ত জান, আমার দুটি মেয়ে আছে, দুটিই বড় হয়েছে।" বলিয়া হেম কিশোরীর টেবিলস্থিত সিগারেট কেস হইতে একটি সিগারেট লইয়া মুখে দিল।

কিশোরীর বুকটি দুড়্ দুড়্ করিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ঘোষ নিশ্চয় বলিয়াছেন, "বড় মেয়েটির ত কিনারা হয়ে গেল, মল্লিকের সঙ্গে ওর বিয়ে হচ্চে, ছোটটিকে তুমি বিয়ে করলেই আমি কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাই।" কিশোরী উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে হেমের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিয়া হেম বলিতে লাগিল, "দুটি মেয়েই বড় হয়েছে দুটিই বিবাহযোগ্য বয়সে এসে পৌছিছে ঘোষের এই কথা শুনে, বুঝেছ কিশোরী, আমি ভাবলাম, আজ আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, নিশ্চয়ই বুড়ো আমাকে তার জামাই করবার প্রস্তাব করবে।"

কিশোরী বলিল, "করলেও তাই?"

হেম ব্যঙ্গভরে নিজ ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "এ ফাটা কপালে কি অমন সুযোগ ঘটে ভাই? বুড়ো বল্লে—জান ত হেম, সতীর বয়স, এই উনিশে পড়েছে। পিয়ানোই বাজাক, আর রিঙ্কে গিয়ে স্কেটিংই করুক—বাঙ্গালীর মেয়ে। মল্লিক ছোকরা সিভিল সার্ভিসে ঢুকেছে, বেশ বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ, ক্রমে নিজের বেশ উন্নতি করে নিতে পারবে; ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আগেই বুঝেছিলাম, সতীর উপর ওর ঝোঁক আছে। তাই এবার হাইকোর্ট কামাই করে, ব্রিফগুলো একে তাকে বিতরণ করে, মল্লিককে নিয়ে এলাম। এ ক'দিন মল্লিক যথাসাধ্য ওর মনস্তুষ্টি করবার চেষ্টাও করেছে;—কাল 'প্রোপোজ' করেছিল, কিন্তু তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে হেম, সতী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।"

"অ্যাঃ"—বলিয়া চীৎকার করিয়া কিশোরী চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। হেম তাহার দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল। আত্মচাঞ্চল্যে একটু লজ্জিত হইয়া, কিশোরী আবার বসিয়া নিম্নতর স্বরে বলিল, "অ্যাঁ? বল কি হে? একটা সিভিলিয়নকে প্রত্যাখান? আজকালকার বাজারে? এটা যে—এটা যে—কি বলে গিয়ে—আশাতিরিক্ত—কি বল হেম?"

কিশোরীর মুখের ভাবে, কথার ভঙ্গিতে হেম বুঝিল, এই খবরটুকুর উপরেই কিশোরী নিজের আশা-সৌধ নির্ম্মাণ করিতেছে। বলিল, "এইটুকু শুনেই তুমি সপ্ত স্বর্গে চড়ে বোসো না হে। তার পর বুড়া কি বল্লে শোন। বল্লে—আমার বিশ্বাস, তোমার সেই বন্ধু কিশোরীমোহনের দিকে সতীর মন ঝুঁকেছে, তাই সে মল্লিককে প্রত্যাখ্যান করলে। মিসেস ঘোষের কাছে শুনলাম এবার দার্জ্জিলিঙে পৌছে দু' হপ্তা ধরে দুজনে প্রায় প্রতিদিন অনেক খানি করে সময় একত্রে কাটিয়েছে, নিরিবিলিতে বসে' বসে' কাব্যালোচনা করেছে—এই সব করে', এই কাণ্ডটি বাধিয়েছে। গিন্নীকে খুব বকলাম। তিনি ত চুপটী করে রইলেন। সতীকেও ডেকে খুব বকলাম। জিজ্ঞাসা করলাম কিশোরী কি তোকে প্রোপোজ করেছে? সে বল্লে, না। অনেক জেরা টেরা করলাম। বল্লে, সে যাই হোক, মিষ্টার মল্লিককে আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না বাবা!—বলে' কাঁদতে কাঁদতে চলে' গেল।"

খুসীতে কিশোরীর মনটা ভরিয়া উঠিল। মনে মনে সে এই সুসংবাদটি উপভোগ করিতে লাগিল। হেম চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। ক্ষণ পরে

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু কথা হল না কি ?"

হেম ধীরে ধীরে বলিল, "হ্যাঁ, হল বৈকি! ঘোষ বল্লেন, তুমি সতীরও বন্ধু, কিশোরীরও বন্ধু। দুজনকেই বেশ ক'রে বুঝিয়ে বোলো, তারা যেন এ ছেলেমানুষী করুন—এ দুর্ব্বুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করে, কারণ আমি বেঁচে থাকতে কখনও এ বিবাহে মত দেবো না। আর"— বলিয়া হেম চুপ করিল।

কিশোরী বলিল, "আর কি, বলেই ফেল না। আমায় যদি কোনও গালমন্দ দিয়ে থাকেন, তা শুনতে আমি প্রস্তুত আছি; বল।"

হেম বলিল, "ঘোষ তোমায় 'বাড়ী বন্ধ' করেছেন। আমায় বল্লেন, তোমার বন্ধুকে আর যেন কোনও দিন আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এস না; তাকে স্পষ্ট ক'রে বুঝতে দিও, এ বাড়ী তার পক্ষে বন্ধ, সে যেন আর না আসে। দেখাশুনো বন্ধ হলেই ক্রমে সতীর মনটি সুস্থ হতে থাকবে—কিছুদিন পরে ও সব পাগলামী সে ভুলে যাবে। মল্লিক অপেক্ষা করতে রাজি হয়েছে।"

শেষের এই সংবাদ শুনিয়া কিশোরীর মনটি অনেকখানি দমিয়া গেল। ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "যো হুকুম!"

হেম নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "দেখ, আমার মনটা বাস্তবিক বড় বিগড়ে গেছে। দার্জ্জিলিঙ আমার আর ভাল লাগছে না। ঘোষ মল্লিক কাল যাচ্ছেন, কাল আর আমি যাব না; গেলে ওঁদের সঙ্গেই যেতে হবে, সেটা ভাল লাগবে না। পশু আমি এখান থেকে রওয়ানা হচ্চি। তুমিও যাবে ত?"

কিশোরী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "ভেবে দেখি।"

হেম তখন উঠিয়া, "গুড্‌নাইট্" বলিয়া, নিজ শয়ন কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল।

নানাচিন্তায় কিশোরী সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিল না। অবশেষে সে মনে মনে স্থির করিল,—আমি যখন সতীকে ভালবাসি এবং সতী যখন আমাকে ভালবাসে, তখন তাহাকে কিছুতেই আমি ছাড়িব না - তাহাকে আমার করিবই করিব। হেম চলিয়া যাক্, আমি যাইব না। ঘোষ সাহেব আমায় 'বাড়ী বন্ধ' করিয়াছেন, করুন—ভগবানের পৃথিবী খোলাই থাকিবে; এবং তাঁহার মুক্ত আকাশের তলে, যে কোনও স্থানে হউক, আমার প্রণয়িনীকে আমি লাভ করিবই।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিলাপ

দেবতার ফুল ফুটেছিল ঢল ঢল,
 স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিত সারাটী বন;
ঢালিত প্রাণের সৌরভ নিরমল
 সমীরণ তারে দোলাইত অনুখন;
আমি নিষ্ঠুর, নির্ম্মম করে তারে
 ছিঁড়িয়া আনিনু, রাখিনু বুকের পরে,
[illegible]ষের তরে ফুটালো বিধাতা যারে
 গরল পরশে বধিনু আপন করে!

দূরে থেকে যারে পাইতাম চিরদিন
 কাছে পেয়ে তারে হারাইনু শেষে হায়!
মরমের কোণে ধ্বনিত যে মধু বীণ,
 বাহিরে আনিয়া ভাঙিনু কঠিন ঘায়।
দেব মন্দিরে আরতির দীপখানি
 স্নিগ্ধ মধুর উজ্জ্বল তার শিখা;
আমি নির্ব্বোধ ধূ[illegible]য় তাহারে আনি
 ভাঙিনু হেলায়! এ কি মোহ মরীচিকা!

বনের বিহগী আকাশেতে যার বাস,
লোভের নেশায় খাঁচায় পুরিনু তারে ;
দুদিনে তাহার ফুরাল গানের আশ,
জীবন তাহার ভরিল অন্ধকারে।
সুপ্ত তটিনী চির প্রশান্ত গতি
সঙ্গীত তানে মুখরি উভয় তীর
ছুটিত সাগরে, হায়! আমি হীনমতি
কঠিন পাথরে বেড়িনু তাহার নীর!

স্বপন প্রতিমা পোড়াইনু নিজ হাতে,
সোণার কমল দলিনু চরণ তলে,
দেবতার দান এসেছিল যাহা মাথে
ফেলিয়া ধুলায় কাঁদি নয়নের জলে!
ছিন্ন কুসুমে আর কি ফুটিবে হাসি?
ভগ্ন বীণায় আর কি জাগিবে গান?
এবারের মত ফুরায়েছে হাসিরাশি,
চিরদিন তরে সুখদীপ নির্ব্বাণ!

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

পাহাড়ের গল্প। শ্রীমতী মনীবালা দেবী প্রণীত। কলিকাতা ৬৮।৫ রসারোড নর্থ হইতে রায় চৌধুরী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲

পুস্তকখানির বিশেষত্ব ইহা গল্পচ্ছলে পার্ব্বত্য প্রদেশের ভ্রমণকাহিনী এবং একজন বঙ্গমহিলা নিজেই ভ্রমণকারিণী, গিরিচারিণী ও লেখনী-ধারিণী।

পর্ব্বতারোহণে সবল বলিষ্ঠ পুরুষগণের সঙ্গে সহকক্ষতা বঙ্গবালার পক্ষে কতকটা বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই—কিন্তু এ দেশের স্বাস্থ্যহীন, সাহসহীন দুর্ব্বল ব্রীড়াকুণ্ঠিতা মহিলা-সমাজকে এই পুস্তকের উপাখ্যানাংশে অবহিত দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।

শক্তি, স্বাস্থ্য, সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি কি স্ত্রীজনে, কি পুরুষে, কি ভারতে, কি বিলাতে, সর্ব্বত্রই যে স্পৃহনীয় সে বিষয়ে কোন সমাজেই মতভেদ নাই।

গ্রন্থখানির প্রথম গুণ রচনাভঙ্গীর সরসতা। যদিও এটি ভ্রমণ কাহিনী, ইহা উপন্যাসের ন্যায় সরস—পড়িতে পড়িতে কোথাও ক্লান্তি জন্মে না। গ্রন্থের আদ্যোপান্ত একটা কৌতুক রসের প্রবাহ পাঠকের কৌতূহলকে অনবরত অগ্রসর করিয়া লইয়া যায়। রচনায় কলা-কৌশল যথেষ্ট আছে। এ শ্রেণীর রচনায় কলাকৌশলের অভাব থাকিলে দুষ্পাঠ্য হইয়া উঠে। দ্বিতীয় গুণ, লেখিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুভূতি। লেখিকা শুধু পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া নিজেই আনন্দ উপভোগ করেন নাই—শৈলপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আনন্দানুভূতির মাধুর্য্যও আমাদিগকে পরিবেষণ করিয়াছেন। লেখিকা নীরস শিলাসমূহের হইতে যথেষ্ট রস সংগ্রহ করিয়াছেন—গূঢ় গিরিগুহার গাম্ভীর্য্যও তাঁহার মানসদৃষ্টি এড়ায় নাই।

শুষ্ক পর্ব্বত-বন্ধুরতার বর্ণনায় রচনা পাছে ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত, ভারনত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় লেখিকা মাঝে মাঝে তাঁহাদের শৈলপ্রবাস-জীবনের শান্তিময় মাধুর্য্য ও বন্ধুজনের সঙ্গে হাস্য পরিহাসের চাতুর্য্যের দ্বারা রচনাকে উপাদেয় করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে আত্মীয় ও বন্ধুজনের কথায় ও আলাপে প্রলাপে স্থলে স্থলে বাঙ্ময় পর্ব্বতেরও সৃষ্টি হইয়াছে এবং পাহাড় অপেক্ষা অনেক স্থলেই আহারই বড় হইয়া উঠিয়াছে।

পাহাড়ের জল হাওয়ায় ও পাহাড়ে ছুটাছুটিতে ক্ষুধাবৃদ্ধির যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, পাহাড়ের গল্পে এত আহারের বর্ণনা না থাকিলেই ভাল হইত।

পুস্তকখানির ছাপা সুন্দর। কাগজ পুরু, বাঁধাই অতি সুদৃশ্য। সব দিক হইতেই ইহা একটী অপূর্ব্ব সামগ্রী।

কাটার বা পরিচ্ছদ প্রণেতা—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ভবানীপুর হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীবিনয়-

ভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৪৬।৩ রসারোড নর্থ, ভবানীপুর কলিকাতা। ফুলস্ক্যাপ ৮ পেজি ১১৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "স্কুল ছাড়িয়া যখন বেকার বসিয়া ছিলাম, পূজ্যপাদ পিতৃদেব পেটের ভাত করিয়া খাইবার জন্ম একখানি দর্জ্জির দোকান করিয়া দেন এবং পুনঃ পুনঃ স্বহস্তে কায শিখিবার জন্ম উপদেশ দিতেন।...বিলাত হইতে বহি আনাইয়া তাহারই ছায়া অবলম্বনে এবং বিশ বৎসর যাবৎ স্বহস্তে কায চালাইয়া যেটুকু জ্ঞান পাইয়াছি, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া, আমার সব্যবসায়ী ভ্রাতাদিগের কার্য্যে নিয়োজিত করিলাম।"

গ্রন্থকারের পিতাঠাকুরের সৎসাহসের আমরা প্রশংসা করি। আমরা চাকরি আর ডাক্তারী ওকালতী ব্যবসায়কেই জীবনের সার বলিয়া আর কতকাল ধরিয়া রাখিব? ধরিয়া রাখিলেই বা আর চলিতেছে কৈ? কত কত কার্য্যক্ষেত্র এই কলিকাতাতেই পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা একেবারে বাঙ্গালী বর্জ্জিত। সেদিন আমাদের এক বন্ধু দুঃখ করিয়া বাঙ্গালী-অপছন্দ অনেকগুলি কার্য্যের তালিকা দিয়া শেষে বলিলেন "অধিক আর কি বলিব মহাশয়, চোরগুলা পর্য্যন্ত পশ্চিমা। চুরি করিতেও বাঙ্গালীর সাহস নাই!"

এই গ্রন্থে কোট, প্যান্ট্যালুন, ওয়েষ্ট কোট, আলষ্টার, ড্রেসিং গাউন, চোগা, চাপকান, শার্ট, পাঞ্জাবি, বেনিয়ান প্রভৃতি বাঙ্গালী-দের ব্যবহার্য্য যাবতীয় কাটা কাপড়ের প্রস্তুত প্রণালী সহজ ভাষায় চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে এই বহিখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই, বাঙ্গালী যুবকেরা যাঁহারা ২০।২৫ টাকা বেতনের চাকরির জন্ম লালায়িত, তাঁহারা যদি সে মরীচিকার প্রলোভন ভুলিয়া, ধৈর্য্য ধরিয়া মান অপমান ভুলিয়া, কিছুদিন হাতে কলমে কায শিখিয়া এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, তবে সফলকাম হইতে পারেন। এ কার্য্যে হীনতা কিছুই নাই। মেহনৎ করিয়া নিজ হাতে কার্য্য করাটাকে আমরা হীন কায বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি। সেটা আমাদের বিষম ভুল। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যখন প্রথম জীবনে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে একটি ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন, তখন কাগজের দোকান হইতে কাগজ কিনিয়া টানাগাড়ীতে চাপাইয়া কুলীর মত স্বহস্তে উহা রাজপথ দিয়া ঠেলিয়া লইয়া আসিতেন; তথাপি উত্তর কালে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের "মিনিষ্টার প্লেনিপোটেন্সিয়ারি" পদ পাইতেও তাঁহার আটকায় নাই।

মহত্ত্বের পুরস্কার

একটি কণা শস্য যদি মাঠের পরে ছড়িয়ে দাও,
লক্ষ কণায় ফিরিয়া আসে ঘরে;
খোদার দ্বারে মৃত্যু পারে হাজার গুণে পাবিরে তাই
দিবি যা হেথা আর্ত্তজন তরে। (ফার্সী হইতে)

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা
৪এ, রামতনু বসুর লেন "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বেণুবাদক

চিত্রকর—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

১ম খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

জৈনদের প্রাগৈতিহাসিক গুরু বা তীর্থঙ্কর [তীর্থকর]

ভারতে প্রচলিত নানা ধর্ম্মমত মধ্যে জৈন ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহার কনিষ্ঠ। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের নানা সম্প্রদায় যদিও ইহাদের অপেক্ষা প্রাচীনকালে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এখন যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা ইহাদের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন। বঙ্গদেশে আজকাল যে জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা আছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই মরুদেশ [মারবাড়] বাসী প্রবাসী। খাঁটি বাঙ্গালী বোধ হয় জৈন নাই। কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত জৈনধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জৈনদের ২৪ জন গুরু বা তীর্থঙ্কর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ২০ জন "সমেত শিখর" নামক পর্ব্বত শিখরে মোক্ষলাভ করিয়াছেন। জৈনদের ২৩ তম তীর্থঙ্কর, পার্শ্বনাথ স্বামীর নামে এখন সমেত শিখর পার্শ্বনাথ পর্ব্বত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া জম্বুস্বামী ইত্যাদি কয়েকজন স্থবিরের সমাধিস্থান বঙ্গদেশে আছে। বঙ্গদেশে জৈনদের অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে। শেষ তীর্থঙ্কর, সন্ন্যাসের অবস্থার প্রথম বার বৎসর রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত [ভাগবতের মতে] প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ও সেই স্ত্রীর গর্ভে অগ্নীধ্র প্রভৃতি দশ পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের মতে প্রিয়ব্রত, কর্দ্দম ঋষির ঔরসজাতা কন্যার গর্ভে সম্রাট্ ও কুক্ষী নাম্নী দুই কন্যা ও দশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রিয়ব্রতের এই দশ পুত্রের নামও ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেখা যায়। কেবল অগ্নীধ্র, মেধাতিথি, ও সবন এই তিনটি নাম ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, গরুড় পুরাণ ও দেবীভাগবতে মেলে। অন্য নামগুলি, ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন প্রকার। যাহা হউক, প্রিয়ব্রত সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তাঁহার, দশ পুত্র মধ্যে তিন জন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য

সাত পুত্রকে তিনি সমস্ত পৃথিবী ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সাত ভাগের নাম জম্বুদ্বীপ প্লক্ষদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, শাকদ্বীপ ও পুষ্করদ্বীপ। ইএ দ্বীপ বা মহাদেশগুলি লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, ক্ষীর, দধি, ও জল নামক সাতটি সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠপুত্র জম্বুদ্বী'পর শাসনাধিকার পাইয়াছিলেন। অগ্নীধ্র মৃত্যুর সময়ে আপন রাজ্য নয় পুত্রকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এক একটা ভাগ এক একটা বর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রদের নাম নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, কুরু, হিরণ্ময় [হিরণ্বান] ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে নাভি দক্ষিণ হিমবর্ষ অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণের দেশ পাইয়াছিলেন এবং তাহার নাম নাভি বর্ষ রাখিয়াছিলেন। কুলকর (১) নাভির পুত্র ঋষভ ও ঋষভের পুত্র ভরত ছিলেন। এই ভরত হইতেই "ভারতবর্ষ" নাম হইয়াছে। ভারতবর্ষের দ্বাদশজন চক্রবর্ত্তী রাজার মধ্যে এই ভরতই প্রথম চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। নাভি-পুত্র ও ভরত পিতা মহর্ষি ঋষভ দেবই জৈনদের প্রথম গুরু বা "আদিনাথ" স্বামী। তাঁহার রাজধানী বিনতাপুর (বা অযোধ্যা) ছিল।

ভাগবতে ভগবানের লীলাবতার প্রসঙ্গে দ্বাবিংশ অবতারের নাম আছে। তাহার একাদশ অবতার "অগ্নিপুত্র নাভির ভার্য্যা সুদেবীর (২) গর্ভে ঋষভ রূপে অবতীর্ণ হইয়া শান্তেন্দ্রিয় বিষয়াশক্তিহীনতা প্রভাবে তিনি পারমহংস্য পদলাভ করিয়াছিলেন।" [ভাগবত, ২য় স্কন্ধ, ৬ অধ্যায়]

জৈনমতে তীর্থঙ্করদের গর্ভবাস কালে তাঁহাদের মাতা ১৪টি [মতান্তরে ১৬টি] স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। পৃথিবীতে সকল মহাপুরুষের জন্মের পূর্ব্বে কোন না কোন চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে বা হইয়া থাকে। অথবা ঐ চিহ্ন মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস। মহাবীর স্বামীর জন্ম বিবরণে এই স্বপ্নের সবিস্তার কথা বলা হইবে। জৈন শাস্ত্রে বলে যে ঐ ১৪টির মধ্যে কোনও একটী স্বপ্ন দেখিলে প্রসূতির গর্ভে "মাণ্ডলীকের" অস্তিত্ব, চারিটী স্বপ্ন দেখিলে "বলদেবের", সাতটি স্বপ্ন দেখিলে "বাসুদেবের" ও সকলগুলি দেখিলে, "তীর্থঙ্করের" অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। মুনি, ঋষি, জ্ঞানীর মধ্যে তীর্থঙ্করের স্থান অতি উচ্চে। বাসুদেব, বলদেব ও মাণ্ডলীক অনেকটা কর্ম্মবতারের মত। এই স্বপ্নগুলির একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রমও আছে। প্রথম স্বপ্নে প্রসূতি এক মহাকায় উজ্জল শ্বেতবর্ণের চারিটি দন্তযুক্ত হস্তী দেখিয়া থাকে। দ্বিতীয় স্বপ্নে উজ্জল শ্বেতবর্ণের মহাকায় বৃষভ দেখিয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে ঋষভদেবের মাতা ১৪টি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম স্বপ্নে হস্তী না দেখিয়া দ্বিতীয় স্বপ্নটী প্রথমে দেখিয়াছিলেন। তিনি বৃষভ প্রথমে দেখিয়াছিলেন বলিয়া নবজাত শিশুর নাম ঋষভ রাখা হইয়াছিল। তিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়া "জিন" নামে ও প্রথম শিক্ষক বলিয়া "আদিনাথ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

জৈন গ্রন্থ [কল্পসূত্র] মতে মহাত্মা ঋষভদেবই ভারতবাসীকে সর্ব্ব প্রথমে জৈনধর্ম্মজ্ঞান ও নানা বিদ্যা শিক্ষা দিয়া সভ্য করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ লোককে ৭২ প্রকার বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যা মধ্যে লেখন বা লিপিবিদ্যা সর্ব্বপ্রথম, অঙ্ক বিদ্যা বা গণিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও কাকতালীয় বিদ্যা সর্ব্ব নিকৃষ্ট। তিনি রমণীদের ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে নৃত্য ও গীতই সর্ব্ব প্রধান। তিনি পুরুষদের একশত প্রকার কলাবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহার মধ্য নানা প্রকার মৃণ্ময় বস্তু গঠন, লৌহকারের বিদ্যা, চিত্র অঙ্কন, নানা প্রকার বস্ত্র বয়ন ও অঙ্গরাগ বিদ্যাই প্রধান। তিনি সাধারণ পুরুষদের তিন প্রকার ব্যবসায়—কৃষি বাণিজ্য ও যুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল প্রজা পালন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার বৈরাগ্য উদয় হইলে আপন বিশাল রাজ্য আপন শতপুত্রকে ভাগ করিয়া দিলেন। আপনার ব্যবহারের

---

(১) জৈন সাহিত্যে কুলকর—কুলস্থাপক—প্রজাপতি।

(২) জৈনদের কল্পসূত্র মতে মরুদেবী।

ধনরত্ন বহুমূল্য দ্রব্যাদি ভিক্ষুক ও দুঃখীদের দান করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। বহুকাল পরে পুরিমতাল (৩) নামক নগরের উপকণ্ঠে "ন্যায়গ্রোধ" বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিতে করিতে "কেবল" জ্ঞানলাভ করিলেন।

জৈন মতে জ্ঞান পাঁচ প্রকার হয়। মতি, শ্রুতি, অবধি, মনঃ পর্য্যায়, ও কেবল। মনুষ্য "কেবল" জ্ঞান লাভ করিলে তাহাকে "কেবলী" বলে, সে সর্ব্বজ্ঞ হয়। আজকাল এ জ্ঞান আর কেহ লাভ করিতে পারে না। কেবলী না হইলে তীর্থঙ্কর হয় না। তীর্থঙ্করের পদ কেবলী অপেক্ষা অনেক উচ্চে। কেবল জ্ঞান লাভ করিবার পরে তিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। কেবল জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে লোকে যাহা বলে বা শিক্ষা দেয় তাহা তাহার গুরুর মুখে শোনা উপদেশের পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু কেবলী আপনার নিজের জ্ঞান হইতে উপদেশ দেন, এই জন্য তাঁহার উপদেশের মূল্য অনেক বেশী।

কল্পসূত্রে তাঁহার শিষ্যদের সংখ্যা দেওয়া আছে। শিষ্যেরা চারি ভাগে বিভক্ত—সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক [গৃহস্থ ভক্ত] ও শ্রাবিকা। কিন্তু এ সংখ্যাগুলি অত্যুক্তি (৪) বলিয়া বোধ হয়। সূত্রলেখক ঋষভ দেবের সময় "কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে" বলিয়াছেন। সূত্রটী ৪৫২ খৃঃ অব্দে রচিত। অতএব এ সংখ্যা অনুমান বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার শিষ্যেরা বহু গণ বা মণ্ডলীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেক গণ এক এক গণধরের কাছে শিক্ষা পাইত। এই সাধুরা ঋষভসেন নামক এক শিষ্যের শাসনে থাকিয়া তপস্যা বা কৃচ্ছ্রসাধন করিত। সাধ্বীরা ব্রহ্মীসুন্দরীর শাসনাধীনে তপস্যা করিতেন। তাঁহার চিহ্ন ঋষভ। অর্থাৎ যেখানে তীর্থঙ্করের মন্দির আছে, সেখানেই চরণচিহ্ন বা প্রতিমূর্ত্তির কাছে একটী চিহ্ন দেওয়া থাকে, সেই চিহ্ন ঋষভ। এরূপ চিহ্ন দেখিয়াই কোন্ তীর্থঙ্করের চরণচিহ্ন বা মূর্ত্তি চিনিতে পারা যায়। তিনি অষ্টাপদ শিখরে [আধুনিক কৈলাসপর্ব্বতে] মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ ছিল।

২। দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ স্বামী। তিনি ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব, অযোধ্যা বা কোশলের প্রসিদ্ধ রাজা সগরের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তিনি যুবরাজ অবস্থায় সংসার ত্যাগ করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ সগর যুবরাজ হইলেন। গর্ভবাসকালে ইঁহার পিতার সমস্ত শত্রু পরাজিত হইয়াছিল বলিয়া অজিতনাথ নাম রাখা হইয়াছিল। ইঁহার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর সগর ভারতের দ্বিতীয় চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। সগরও বৃদ্ধাবস্থায় সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ পীত স্বর্ণাভ, চিহ্ন হস্তী। সমেত শিখরে তাঁহার মোক্ষ লাভ হইয়াছিল। বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনা কিন্তু ভিন্ন প্রকার। রামায়ণে [আদিপর্ব্ব ৭০ সর্গ] সগরের পিতা বা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার নাম অসিত। জ্যেষ্ঠ সহোদরের কোনও উল্লেখ নাই। সগর একজন বড় রাজা ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞের ঘোটক তাঁহার একশত পুত্র রক্ষা করিতেছিলেন। পরে কপিল মুনির ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হইয়াছিল। সগরের পৌত্র ভগীরথ তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে আনিয়া ভস্মীভূত রাজপুত্রদের উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই জন্য গঙ্গার এক নাম ভাগীরথী হইয়াছে।

৩। তৃতীয় তীর্থঙ্কর সম্ভবনাথ স্বামী শ্রাবস্তীর (আধুনিক বেটমেট) ইক্ষ্বাকু কুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় রাজার পুত্র। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে ও গর্ভবাসকালে দেশে নানাপ্রকার রোগ শোক দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রবেশ করিয়া

---

(৩) সেকালের নগরের স্থান নির্দ্দেশ করিবার এখন কোনও উপায় নাই। কিন্তু জৈনদের বিশ্বাস আধুনিক এলাহাবাদ বা প্রয়াগের নিকটে পুরিমতাল নগর ছিল।

(৪) কল্পসূত্র (২১৪-২২৫ সূত্র) মতে তাঁহার সহিত ৮৪০০০ শ্রমন ছিলেন। ৩০০০০০ সাধ্বী ব্রহ্মীসুন্দরীর শাসনে ছিলেন। ৩০৫০০০ গৃহস্থ ভক্ত বা শ্রাবক ও ৫৫৪০০০ শ্রাবিকা ছিলেন। অর্থাৎ তিরোধানের সময়ে ১২৪০০০০ জৈন ছিলেন। ইহার মধ্যে ৪৭৫ জন চতুর্দ্দশ পূর্ব্ব বিদ্যা জানিতেন, ৯০০০ অবধি জ্ঞান সম্পন্ন, ২০০০০ কেবলী, ২০৩০০ কায়পরিবর্ত্তনকারী, ১২৬৫০ আচার্য্য, ২০০০০ পুরুষ ও ৪০০০০ স্ত্রী ধার্ম্মিক এবং ২২৯০০ এমন লোক ছিলেন যাহাদের জন্ম রহিত হইয়াছিল।

দেশ ছারখার করিতেছিল। ইঁহার জন্মে সুখ ও শান্তি সম্ভব হইল বলিয়া এই প্রকার নামকরণ হইয়াছিল। ইনি বহু সাধু শিষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ, চিহ্ন অশ্ব ও মোক্ষস্থান সমেতশিখর।

৪। চতুর্থ তীর্থঙ্কর অভিনন্দন স্বামী বনিতানগর বা অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা সম্বর ও রাণী সিদ্ধার্থার পুত্র। গর্ভবাসকালে ইন্দ্র আসিয়া ইঁহার অভিনন্দন করিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে তাঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ, চিহ্ন বানর, মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

৫। পঞ্চম তীর্থঙ্কর সুমতিনাথ স্বামী কঙ্কণপুরের (অযোধ্যার অন্যতম নাম) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা মেঘার্গ ও রাণী সুমঙ্গলার পুত্র। গর্ভবাসকালে ইঁহার মাতার সুমতি হইয়াছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে ইঁহার গর্ভবাসকালে কঙ্কণপুরের একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুই স্ত্রী ও একটি দুগ্ধপোষ্য বালক রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিল। দুই বিধবাই শিশুর মাতৃত্ব দাবী করিল। রাজকর্ম্মচারীরা বিচারার্থ রাণীর কাছে আনিলে রাণী শিশুকে কাটিয়া দুইভাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই আজ্ঞা শুনিয়া একজন চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু অন্যা বলিল আমার পুত্রে প্রয়োজন নাই, জীবিত সম্পূর্ণ পুত্র আমার সপত্নীকে দান করুন। আমি পুত্র হারা হইলেও আমার পুত্র ত বাঁচিয়া থাকিবে। রাণী তাহাকেই শিশুর মাতা স্থির করিয়া শিশু দিলেন ও অন্যাকে শাস্তি দিলেন। এই গল্পটী ইহুদার রাজা সলোমনের বিচার কাহিনীতেও বলা হইয়া থাকে। সুমতিনাথ স্বামীর বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ, চিহ্ন রক্তবর্ণ হংস, মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

৬। ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর পদ্ম প্রভু স্বামী, কৌশাম্বীর (আধুনিক পপোসা গ্রাম) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা ধরের পুত্র। গর্ভবাসকালে ইঁহার মাতা রাণী সুষীমা রক্তবর্ণ পদ্মের পাপড়ী পাতিয়া তাহার উপর শুইতে ভালবাসিতেন, সেই জন্য তাঁহার বর্ণ রক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার চিহ্ন রক্তপদ্ম ও মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

৭। সপ্তম তীর্থঙ্কর সুপার্শ্বনাথ স্বামী, কাশীর ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজার পুত্র। গর্ভবাসাবস্থায় ইঁহার মাতার কুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল। জন্মের সময়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ, চিহ্ন স্বস্তিক, মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

৮। অষ্টম তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভু স্বামী চন্দ্রপুরীর (কাশীর উপকণ্ঠে আধুনিক চন্দ্রাবতী) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজার পুত্র। গর্ভবাসকালে তাঁহার মাতার চন্দ্র পান করিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। এই অদ্ভুত ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাতে বসাইয়া একখানি থালাতে এমন ভাবে জলপান করিতে দেওয়া হইয়াছিল যে, জলপানকালে জলমধ্যে পূর্ণ শশধরের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেছিলেন। এইরূপে পিপাসার নিবৃত্তি হইল। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে দেখিলেন তাহার বর্ণ পূর্ণচন্দ্রের মত শ্বেত হইয়াছে। তাঁহার চিহ্ন চন্দ্র, মোক্ষস্থান সমেতশিখর।

৯। নবম তীর্থঙ্কর সুবিধিনাথ স্বামী কাকন্দী নগরে (আধুনিক লক্ষ্মীসরাই হইতে দুই মাইল) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজার পুত্র। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে ও গর্ভবাস কালে রাজবংশীয় আত্মীয়েরা নানাপ্রকারে কাটাকাটি মারামারি করিতেছিলেন। ইহাঁর জন্ম সময় হইতেই সকল বিবাদ দূর হইয়াছিল, সেই জন্য এই প্রকার নামকরণ হইয়াছিল। তাঁহার দন্তগুলি পুষ্পের মত সুন্দর ছিল বলিয়া তাঁহাকে "পুষ্পদন্ত"ও বলিত। তাঁহার বর্ণ শ্বেত ছিল। চিহ্ন সম্বন্ধে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায় মধ্যে মতভেদ আছে। দিগম্বরেরা কাঁকড়া ও শ্বেতাম্বরেরা কুম্ভীর বলেন। মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

১০। দশম তীর্থঙ্কর শীতলনাথ গোস্বামী ভদ্রপুরের (পাটনার উপকণ্ঠে হটবরিয়া নামক গ্রাম) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজার পুত্র। গর্ভবাসকালে ইহার মাতার ও পরে ইঁহার এমন ক্ষমতা ছিল যে, যে কোনও জ্বররোগীর জ্বালাময় শরীরে হাত দিলেই শীতল হইত, তাহার সকল কষ্ট দূর হইত। সেই জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। তাঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ ছিল। চিহ্ন সম্বন্ধে মতভেদ

আছে। শ্বেতাম্বরেরা বলেন চিহ্ন শ্রীবৎস স্বস্তিক, কিন্তু দিগম্বর মতে ডুম্বুর। মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

১১। একাদশ তীর্থঙ্কর শ্রেয়াংশনাথ স্বামী সিংহপুরীর (আধুনিক কাশীর উপকণ্ঠে) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বিষ্ণুদেবের পুত্র। রাজার একটি অতি সুন্দর সিংহাসন ছিল, কিন্তু কেহই তাহাতে বসিতে সাহস করিত না কেন না একটা প্রেত সেই সিংহাসনকে আশ্রয় করিয়াছিল। ইঁহার গর্ভবাসকালে একদিন রাণী সিংহাসনে বসিলেন। প্রেত কিছুই করিতে পারিল না। সেই জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ, চিহ্ন গণ্ডার, মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

১২। দ্বাদশ তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্য স্বামী, অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পাপুরের (ভাগলপুর হইতে দুই মাইল দূরে নাথনগর) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বসুপূজ্যের পুত্র। ইঁহার জন্মের পূর্ব্বে ইন্দ্র ও বসু প্রত্যহ বসুপূজ্যকে ভবিষ্যৎ তীর্থঙ্করের পিতা বলিয়া পূজা করিতেন। ইন্দ্রও তাঁহাকে বসু নামক রত্ন উপহার দিয়াছিলেন, সেই জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। তাঁহার বর্ণ লোহিত, চিহ্ন মহিষ, মোক্ষস্থান চম্পাপুর।

১৩। ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর বিমলনাথ স্বামী, কম্পিল্লপুর (যুক্ত প্রদেশের ফরক্কাবাদ হইতে ১৯ মাইল পশ্চিমে কায়েমগঞ্জের দুই মাইল উত্তরে) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজার পুত্র। গর্ভবাসাবস্থায় মাতার বিমল বুদ্ধির জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। রাজধানীর এক মন্দিরে এক পথিক রাত্রে আপনার পত্নীসহ আশ্রয় লইয়াছিল। এই মন্দিরে এক প্রেতিনী থাকিত। সে, পথিক পুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়া তাহার পত্নীর অবিকল রূপ ধারণ করিয়া সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। পথিক দুই স্ত্রীর মধ্যে কোনটী আসল কোনটী নকল বুঝিতে না পারিয়া রাজার কাছে বিচার প্রার্থনা করিল। রাণী বিচার করিতে বসিলেন। তিনি জানিতেন যে প্রেতিনীরা ইচ্ছা করিলে অনেক দূরের জিনিস হাত বাড়াইয়া ছুঁইতে পারে, অর্থাৎ ইচ্ছামত হাত বেশী লম্বা করিতে পারে। তিনি পথিককে এক স্থানে দাঁড় করাইয়া দুই স্ত্রীকে দূরে [যেখান হইতে হাত আসিতে পারে না] দাঁড়াইতে বলিলেন। পরে স্ত্রীদের বলিলেন আপনার স্বামীকে স্পর্শ কর। প্রেতিনী স্পর্শ করিল, মানবী পারিল না। তাঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ, চিহ্ন বরাহ, মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

১৪। চতুর্দ্দশ তীর্থঙ্কর অনন্ত নাথ স্বামী, অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজার পুত্র। তাঁহার জন্মের বহুপূর্ব্ব কাল হইতে নগরে একটি অনন্ত আকারের সূতা [বোধগম্য সূতা দিয়া প্রস্তুত অনন্ত দেবের মূর্ত্তি] ছিল। ইঁহার জন্মের পর এই অনন্তের রোগনাশ করিবার ক্ষমতা জন্মিল। কোনও রোগী ইহাকে ছুঁইলে নীরোগ হইত গর্ভবাসাবস্থায় ইঁহার মাতা একটি অনন্ত (দীর্ঘ) মুক্তামালা দেখিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। ইঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ। চিহ্ন সম্বন্ধে মতান্তর আছে, শ্বেতাম্বরেরা বলেন বাজ-পক্ষী ও দিগম্বরেরা বলেন বরাহ। মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

১৫। পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর ধর্ম্মনাথ স্বামী রত্নপুরীর [অযোধ্যার ফয়জাবাদ হইতে দশমাইল পশ্চিমে সোহবাল Sohwal Ry stn) হইতে দুই মাইল উত্তরে] ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজার পুত্র। গর্ভবাস কালে মাতার ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ, চিহ্ন বজ্র, মোক্ষ স্থান সমেত শিখর।

১৬। ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ স্বামী, হস্তিনা-পুরের [মীরাট হইতে ১৬ মাইল] ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজার পুত্র। গর্ভবাস কালে দেশে নানা প্রকার রোগ হইয়াছিল, তখন ইঁহার মাতা জল ছিটাইয়া সকল প্রকার রোগ নিবারণ করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে পারিতেন। সেই জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। নবম তীর্থঙ্কর সুবিধিনাথ স্বামীর মোক্ষ লাভের সহিত ভারতভূমি হইতে জৈন ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছিল। আবার দশম তীর্থঙ্কর শীতলনাথ স্বামী ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মোক্ষলাভের পর

আবার ধর্ম্ম লোপ পাইল। এইরূপ প্রত্যেক তীর্থঙ্করের তিরোধানে ধর্ম্মলোপ হইতেছিল, কিন্তু শান্তিনাথ স্বামীর স্থাপিত ধর্ম্ম আর লোপ পায় নাই। এই তীর্থঙ্কর সংসার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী রাজাও ছিলেন। তাঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ, চিহ্ন মৃগ, মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

১৭। সপ্তদশ তীর্থঙ্কর কুন্থুনাথ স্বামী, গজপুরের [হস্তিনাপুর] ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা শিবরাজ ও রাণী শ্রীদেবীর পুত্র। গর্ভবাস কালে রাণী রত্নের কুন্থ অর্থাৎ স্তূপ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন কালে শ্রাবকেরা [জৈন ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থ] পোকা মাকড় [কুন্থু] বেশী রক্ষা করিত ও তাঁহার পিতার শত্রুরা সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকিত, সেই জন্য এরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইনিও সংসার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে রাজ চক্রবর্ত্তী ছিলেন। ইঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ, চিহ্ন ছাগল, মোক্ষস্থান সমেত শিক্ষর।

১৮। অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর অরনাথ স্বামী হস্তিনাপুরের ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা সুদর্শন ও রাণী দেবীর পুত্র। ইনিও সংসার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে রাজ চক্রবর্ত্তী ছিলেন। গর্ভাবাস কালে ইঁহার মাতা একটি রত্নের প্রাচীর দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ ছিল। চিহ্ন নন্দাবর্ত্ত নামক তৃতীয় প্রকার স্বস্তিক ও মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

১৯। উনবিংশ তীর্থঙ্কর মল্লীনাথ স্বামী মিথিলার ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা কুম্বের ও প্রভাবতীর পুত্র। ২৪টি তীর্থঙ্কর মধ্যে ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। শ্বেতাম্বরেরা বলেন ইনি বাস্তবিক স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু দিগম্বরেরা সে কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন স্ত্রীজাতি মোক্ষলাভ করিতে পারেনা; যদি কোনও স্ত্রী তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা মোক্ষের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারেন, তবে পর জন্মে পুরুষ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মোক্ষলাভ করেন। ইঁহার স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিবার কারণ অদ্ভুত ছিল। মল্লীনাথ স্বামী পূর্ব্বজন্মে আরও পাঁচ সাত জন সঙ্গীর সহিত কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন। তিনি গোপনে একটি উপবাস বেশী করিয়া অন্য সঙ্গীগণ অপেক্ষা বেশী ধর্ম্ম লাভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা এই চাতুরী জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন। মল্লীনাথ তপস্যা বা কৃচ্ছ্র সাধন বা উপবাসের প্রভাবে তীর্থঙ্কর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীদের প্রবঞ্চনা করা অপরাধের [এই অপরাধের নাম মায়া] শাস্তিস্বরূপ তিনি স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তীর্থঙ্কর মাত্রেই মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের মোক্ষলাভ হয় না। সেই মোক্ষলাভ করিতে আর একবার পুরুষ রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গর্ভবাস কালে ইঁহার মাতার ফুলের মালা ধারণ করিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। ইঁহার বর্ণ নীল, চিহ্ন জল-কুম্ভ, মোক্ষ স্থান সমেত শিখর।

২০। বিংশ তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রত। রাজগৃহের হরিকুলোদ্ভব [যে কুলে ভগবান হরি-শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন] রাজা সুমিত্রের রাণী সামান্যা শ্রাবিকার মত জৈনধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট সকল ব্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পুত্রের নাম সুব্রত রাখা হইয়াছিল। কালে এই পুত্র তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন। ইঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, চিহ্ন কচ্ছপ, মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

২১। একবিংশ তীর্থঙ্কর নমীনাথ স্বামী মথুরার ইক্ষ্বাকু কুলোদ্ভব রাজা বিজয় ও রাণী বিপ্রার পুত্র। ইঁহার গর্ভবাস কালে শত্রুরা মথুরা বেষ্টন করিয়াছিল। রাজা নগর রক্ষা করিবার কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। জ্যোতিষীরা বলিল যদি রাণী নগর প্রাচীর হইতে শত্রুদের দর্শন দেন তবে নগর রক্ষা হইবে। রাণী ঐরূপে নগর প্রাচীর হইতে মুখ বাড়াইলে শত্রুরা ভীত হইয়া প্রণাম করিয়া পলাইয়া গেল। নগর রক্ষা পাইল। সেই জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইঁহার বর্ণ পীত বা স্বর্ণাভ। চিহ্ন সম্বন্ধে মতভেদ আছে, শ্বেতাম্বরেরা বলেন নীল পদ্ম, কিন্তু দিগম্বরেরা বলেন অশোক বৃক্ষ। মোক্ষস্থান সমেত শিখর।

প্রথম ২১জন তীর্থঙ্করের নাম ও চিহ্ন ছাড়া আর

বড় কিছু জানা নাই। জৈন তীর্থঙ্করদের মন্দিরে তীর্থঙ্করদের কল্পিত মূর্ত্তি অথবা চরণ চিহ্ন স্থাপিত ও পূজিত হয়। মূর্ত্তি বা চরণ চিহ্নের সহিত অন্য কোনও চিহ্ন না থাকিলে কাহার মূর্ত্তি বা চরণ চিহ্ন নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। সেইজন্য প্রত্যেক তীর্থঙ্করের এক এক বিশেষ চিহ্ন করা হইয়াছে। এই চিহ্ন দেখিয়া কাহার মূর্ত্তি বা চরণ চিহ্ন বুঝিতে পারা যায়। জৈন মতে প্রত্যেক যুগে ২৪ জন তীর্থঙ্কর, ১৮ জন চক্রবর্ত্তী রাজা, ৯ জন বলদেব, ৯ জন বাসুদেব ও ৬ জন প্রতিবাসুদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ একযুগে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৩ জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এসংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না। চলিত যুগে ২৪ জন তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান বা মহাবীর স্বামী ছিলেন। এযুগে আর তীর্থঙ্কর হইতে পারে না।

ফর্দ্দ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে ২৪ জন তীর্থঙ্করের সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। ২২ জন সূর্য্য বংশীয় বা ইক্ষ্বাকু কুলোদ্ভব ও দুইজন (২০ ও ২৪) চন্দ্র বংশীয় বা হরিকুলোদ্ভব ছিলেন। ২৪ জনের মধ্যে কেবল প্রথম অষ্টাপদ (কৈলাস) পর্ব্বতে, দ্বাদশ চম্পাপুরীতে, দ্বাবিংশ গিরিনারে ও শেষ তীর্থঙ্কর পাপপুরীতে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। বাকি ২০ জন বঙ্গদেশের সমেতশিখরে [আধুনিক পার্শ্বনাথ পর্ব্বতে] মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। জৈন গ্রন্থে ক্ষত্রিয়কুলই উৎকৃষ্টকুল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণেরা সম্মান পান নাই।

দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমীনাথ বা অরিষ্টনেমী নাথ স্বামী পৌরাণিক যুগের শেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ও সমসাময়িক ছিলেন। যদি কোনও কালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ বা পাণ্ডবদের সময় নির্দ্ধারিত হয়, তবে নেমীনাথ স্বামীর সময়ও জানিতে পারা যাইবে। জৈন গ্রন্থ [কল্পসূত্র] মতে মহাবীর স্বামীর তিরোধানের [৫২৮ খৃঃ পূঃ] ৮৪,০০ বৎসর পূর্ব্বে নেমীনাথ স্বামীর মোক্ষলাভ হইয়াছিল।

২২। দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমীনাথ বা অরিষ্ট নেমীনাথ স্বামী, শৌরীপুরের হরিকুলোদ্ভব [চন্দ্রবংশীয় ও যাদব বংশী] রাজা সমুদ্রবিজয় ও রাণী শিবাদেবীর পুত্র। দ্বারাবতীর নিকট শৌরীপুর নামক এক বড় নগর ছিল। মহাভারত মতে শ্রীকৃষ্ণ মাতুল কংসকে মারিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরার রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। কংসের পত্নী আপনার পিতা, মগধের সম্রাট, জরাসন্ধের কাছে অভিযোগ করিলে জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। জরাসন্ধের অগণিত সৈন্য হইতে অল্পসংখ্যক যাদবদের রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করিয়া গুজরাতে রৈবতক পর্ব্বতের নিকট নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে নগরের নাম দ্বারাবতী কিংবা শৌরীপুর ঠিক জানা যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের পিতামহের নাম শূর ছিল, অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্থাপিত নগরের নাম শৌরীপুর হওয়া সম্ভব। আধুনিক জৈনীরা আগ্রার কাছে শিকোহাবাদ জংশনের কাছে বটেশ্বর নামক স্থানকে শৌরীপুর তীর্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। বটেশ্বর নগরে ঐ নামের শিবের অতি প্রাচীন মন্দির আছে, প্রতি বৎসর সেখানে পশু প্রদর্শনীর মেলা হইয়া থাকে। মেলাতে বহু উৎকৃষ্ট গাভী, বলদ ও ঘোটক বিক্রয় হয়।

জৈনদের পাণ্ডব চরিত নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে শৌরীপুরে অন্ধক-বৃষ্ণি কুলোদ্ভব রাজা সমুদ্র বিজয় রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার আর নয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বসুদেব ও ভগিনীর নাম কুন্তী ছিল। এই কুন্তীই পাণ্ডব-মাতা ছিলেন। সমুদ্র বিজয়ের স্ত্রীর নাম শিবাদেবী। জৈনদের প্রামাণিক গ্রন্থ উত্তরাধ্যায়ন সূত্রে [২২ অধ্যায়] আছে যে এক কালে সমুদ্রবিজয় ও বাসুদেব [উভয়ে অন্ধক-বৃষ্ণি কুলোদ্ভব]—শৌরীপুরে বাস করিতেন। তাঁহারা যে ভাই ভাই ছিলেন এমন কথা নাই। অবিবাহিত বসুদেব অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। সমুদ্র বিজয় তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। বসুদেব প্রায় এক পার্ব্বতীয় নগরে বাস করিতেন।

একবার নাগরিকেরা সমুদ্র বিজয়ের কাছে আসিয়া অভিযোগ করিল—"আপনার অনুজ বসুদেব অতি সুপুরুষ। তাঁহার লম্পটতা দোষ থাকাতে আমাদের যুবতী স্ত্রী কন্যা লইয়া বাস করা কষ্টকর হইয়াছে।" সমুদ্রবিজয় বসুদেবকে ডাকিয়া কতকগুলি নীতি উপদেশ দিলেন ও তাঁহাকে আপনার কাছেই থাকিতে বলিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়া কটুভাবে কিছু বলিতে পারিলেন না। ইহার কয়েক দিবস পরে শিবাদেবী এক দিবস কিছু গন্ধ অনুলেপন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া প্রেমোপহার স্বরূপ সমুদ্র বিজয়ের কাছে এক দাসীর হস্তে পাঠাইয়াছিলেন। পথে দাসীর নিকট হইতে সেই অনুলেপন বসুদেব কৌতুকচ্ছলে কাড়িয়া স্বয়ং মাখিয়া ফেলিলেন। দাসী তাঁহাকে বলিল, "রাজকুমার, যেমন দুরন্ত সিংহকে খাঁচাতে পুরিয়া রাখা হয়, সেইরূপ তোমাকে এখানে রাখা হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি তথাপি লজ্জিত হইতেছ না। তুমি শিবাদেবীর স্বামীর কাছে প্রেরিত প্রেমোপহার স্বচ্ছন্দে কাড়িয়া লইলে!"

বসুদেব বলিলেন "আমাকে দাদা এখানে কেন রাখিয়াছেন যদি জান ত বল।"

দাসী বলিল, "পার্ব্বতীয় নাগরিকরা তোমার নামে লম্পটতা অভিযোগ করিয়াছিল বলিয়া, তোমাকে কোনও স্থানে যাইতে দেওয়া হয় না।"

বসুদেব এই কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। পর দিবস কেহ তাঁহাকে রাজবাটীতে দেখিতে পাইল না। সমুদ্রবিজয় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে নগরের উপকণ্ঠে এক নির্জ্জন স্থানে একটী নির্ব্বাণোন্মুখ চিতা রহিয়াছে ও নিকটে এক বৃক্ষ শাখায় একখানি কাগজ ঝুলিতেছে। কাগজে কাহারও নামোল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র লেখা আছে "দুর্নামগ্রস্ত লম্পটের মৃত্যুই শ্রেয়।" সমুদ্রবিজয় ভাবিলেন বসুদেব আত্মহত্যা করিয়াছে।

এ ঘটনার কিছুকাল পরে অরিষ্টপুরের রাজকন্যা রোহিণী দেবীর স্বয়ম্বর সভাতে দেশ দেশান্তরের রাজারা একত্র হইয়াছিলেন। সভারম্ভে রাজা সকল অতিথিদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার কন্যা রোহিণীকে সভাতে আনিতেছি। আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সে যাহার গলায় মালা দিবে, আমি তাহাকেই কন্যাদান করিব।" পরে রোহিণী মালা হস্তে সভায় প্রবেশ করিলে, ভাটেরা এক এক রাজার বংশাবলী ও গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এ সভাতে সমুদ্রবিজয় ও সেকালের সম্রাট্ মগধরাজ জরাসন্ধও উপস্থিত ছিলেন। রাজকন্যা রাজা ও রাজপুত্রদের ত্যাগ করিয়া এক সুপুরুষ গন্ধর্ব্বের [বাদ্যবাদক বা ঢোলক বাদক] গলায় মালা পরাইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। ইহাতে উপস্থিত রাজারা আপনাদের অপমানিত বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং গন্ধর্ব্বকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অরিষ্টপুরের রাজা অতিথিদের বুঝাইতে লাগিলেন, যে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া একথা বলি নাই যে আমার কন্যা কোনও রাজা বা রাজপুত্রকে মাল্যদান করিলেই তবে কন্যা দান করিব, অন্য জাতীয়কে দিব না। (৫) অতএব ভাল হউক, বা মন্দ হউক, আমি ঐ গন্ধর্ব্বকেই কন্যাদান করিব, আপনারা নিরস্ত হউন। কিন্তু তখন রাজারা ক্রোধে অধীর হইয়াছিলেন, তাঁহারা এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অথচ রাজারা গন্ধর্ব্বকে পরাজিতও করিতে পারিলেন না। সামান্য গন্ধর্ব্ব শিক্ষিত ক্ষত্রিয়ের মত অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। জরাসন্ধ সমুদ্রবিজয়কে অনুরোধ বা আজ্ঞা করিলেন, "এই গন্ধর্ব্বকে বন্দী কর!" সমুদ্রবিজয় যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেই তীরে বাঁধা এক খানি কাগজ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। ঐ কাগজে লেখা ছিল—"অন্যায় কুৎসার লজ্জায় দেহত্যাগকারী তাহার অগ্রজের পাদবন্দনা করিতেছে।" কাগজ দেখিয়াই সমুদ্রবিজয় বসুদেবকে চিনিতে

৫। এই উক্তিদ্বারা প্রমাণিত হয় যে সেকালে ক্ষত্রিয় রাজারা অন্য জাতীয়কে কন্যাদান করিল সমাজে পতিত হইতেন না, অথবা আজকালকার মত জাতি বন্ধন ও বিচার ছিলনা।

পারিলেন। আনন্দাশ্রুপাত করিতে করিতে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। যুদ্ধকারী রাজারাও আনন্দে যোগদান করিল। সমারোহের সহিত বসুদেব ও রোহিণীর বিবাহ হইয়া গেল। কয়েক সপ্তাহ পরে মথুরার রাজা উগ্রসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবকের কন্যা দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইল। রোহিণীর গর্ভে রাম ও দেবকীর গর্ভে কেশবের জন্ম হইল।

শিবা দেবীর অনেক বয়সে দুই পুত্র হইয়াছিল। বড় রথনেমী ও ছোট অরিষ্টনেমী। অরিষ্টনেমীর ঐরূপ নামকরণের কারণ জৈনগ্রন্থে আছে যে, কুমারের গর্ভবাস কালে তাঁহার মাতা তীর্থঙ্করদের মাতার মত ১৪টি স্বপ্ন ত দেখিয়াইছিলেন, ইহা ছাড়া অন্য একদিন একটি রথের চক্রের লোহার বেষ্টনী বা নেমী দেখিয়াছিলেন ও রথচক্র হইতে অরিষ্ট নামক বহুমূল্যবান প্রস্তর খণ্ড ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের নাম রথনেমী, তখন এ গল্পটি পরবর্তী কালের কল্পিত বলিয়া বোধ হয়।

রাম ও কেশব, রথনেমী ও অরিষ্টনেমী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং সমাজে সম্মানিত ছিলেন। অরিষ্টনেমী বিবাহোপযুক্ত হইলে কেশব ভোজরাজের কন্যা রাজিমতীকে তাঁহার জন্য চাহিলেন। ভোজরাজও সম্মত হইলেন। বিবাহ স্থির হইয়া গেল। নিয়ম মত, বিবাহের পূর্ব্ব দিবস বরবেশী অরিষ্টনেমী রথারোহণে ভোজরাজগৃহে যাইতেছিলেন। পথে এক স্থানে দেখিলেন বহু অজা, মৃগ ইত্যাদি বেষ্টনীতে আবদ্ধ রহিয়াছে। অরিষ্টনেমী সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিতে পার, এখানে এত ছাগল, ভেড়া ও হরিণ কেন আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে?" সারথি কতক কৌতুকচ্ছলে বলিল, "রাজকুমার, ঐ জীবগুলি বড় ভাগ্যবান। তোমার বিবাহে যত কুটুম্ব অতিথি আসিয়াছে, সকলের মুখরোচক নানা প্রকার খাদ্য দ্বারা রসনা তৃপ্তির জন্য আগামী কল্য প্রাতে ঐসব জন্তুরা প্রাণ উৎসর্গ করিবে। কত লোকে খাইবে।" সারথির রসনা হইতে আগামী কল্যর মুখরোচক খাদ্যের কল্পনায় বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। কুমারের চক্ষু হইতেও বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। তিনি ভোজরাজগৃহে না গিয়া আপনার প্রমোদ উদ্যানে রথ লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, যাহার বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া এতগুলি মূক নির্দ্দোষ জীবের প্রাণ হনন করা হইবে, তাহার বিবাহে ধিক! তাহার জীবনে ধিক! মানুষ, শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া এরূপ ঘোর পাপ কি করিয়া করিতে পারে? তাহার কঠোর শাস্তি হয়না কেন? রাজকুমার এইরূপে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বৈরাগ্য বাড়িতে লাগিল। ক্রমে অন্য কুটুম্বেরা সংবাদ পাইয়া উদ্যানে আসিলেন। অনেকে তাঁহাকে এসকল চিন্তা ছাড়িয়া সুখে সংসারী হইতেই উপদেশ দিলেন, কিন্তু রাম ও কেশব তাঁহাকে তপস্যা করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। অরিষ্টনেমী সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

তিনি কাঠিয়াবাড় দেশে গিরিনার [রৈবতক] পর্ব্বতে বেতস তরু [মতান্তরে বটবৃক্ষ] মূলে বসিয়া মাত্র ৫৪ দিন কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া "কেবল" জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি "কেবলী" হইবার পর শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছিলেন ও তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ ও চিহ্ন শঙ্খ। ২৪ জন তীর্থঙ্কর মধ্যে কেবলমাত্র (২০) মুনি সুব্রত ও (২২) অরিষ্টনেমী হরিকুলোদ্ভব বা চন্দ্রবংশীয় যাদব। এই বংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে হরিকুল বলা হইয়াছে। কেবলমাত্র এই দুই জনের বর্ণ কৃষ্ণ, অন্যেরা পীত, রক্ত বা নীলবর্ণ ছিলেন। তিনি রৈবতক পর্ব্বতে [গিরিনার] মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

অরিষ্টনেমী রাজিমতীকে ত্যাগ করিলে তাহার মনেও বৈরাগ্যের উদয় হইল। রাজিমতী আপনার ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তল কাটিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তপস্বিনী বা সাধ্বী জীবন যাপন করিতেই উৎসাহিত করিলেন। পরে তপস্যা করিবার জন্য রৈবতক পর্ব্বতে সন্ন্যাসিনী বেশে যাইতেছিলেন। পথে বৃষ্টিতে ভিজিয়া এক নির্জ্জন গুহাতে প্রবেশ করিয়া বস্ত্র খুলিয়া নিংড়াইতেছিলেন,

এমন সময়ে রথনেমীও সেই পথে যাইতেছিলেন। তিনিও সেই গুহাতে আশ্রয় লইলেন। রথনেমী বিবস্ত্রা রাজিমতীকে দেখিয়া কামপীড়িত হইলেন ও তাহাকে ভজনা করিতে অনুনয় করিতে লাগিলেন। রাজিমতী যখন দেখিলেন কুমার তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছেন না, তখন তিনি আপন জলপাত্র তুলিয়া লইলেন। এই জলপাত্রে কতক সুমিষ্ট পানীয় জল ছিল, তাহা পান করিয়া আপনার অঞ্জলিতে বমন করিলেন এবং সেই অপবিত্র বস্তু কুমারকে পান করিতে বলিলেন। কুমার ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তখন রাজিমতী বলিতে লাগিলেন, "এই বস্তু অতি পবিত্র সুস্বাদু পানীয় ছিল, আমি পান করিয়া বমন করিয়াছি এখন আপনি ঘৃণা করিতেছেন। কিন্তু আমিও সেইরূপ পবিত্রা কুমারী ছিলাম, আমাকে অরিষ্টনেমী স্বীকার করিয়া, বমন করার মত ত্যাগ করিয়াছেন, অথচ আমাকে আপনি ঘৃণা করিতেছেন না কেন? আমার এই মলমূত্রময় দেহ, কালে এই আমার অঞ্জলিস্থিত বস্তু অপেক্ষা ঘৃণিত হইয়া যাইবে, তবে আপনি আমাকে কামনা করিতেছেন কেন?" কুমারীর এই প্রকার উক্তিতে কুমারের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি সংসারের অসারতা বুঝিতে পারিলেন। তিনিও সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। কালে উভয়ে "কেবল" জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

তীর্থঙ্করদের নামকরণের কারণগুলি পরবর্ত্তিকালে কল্পিত হইয়াছে বোধ হয়। সকল তীর্থঙ্করই যে দেশপালক রাজার পুত্র ছিলেন তাহাও বোধ হয় না। কয়েকটি ত ছোট ছোট গ্রামবাসী রাজার পুত্র। স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজপুত শব্দের শব্দের অর্থই রাজ পুত্র। অতএব ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম হইলেই রাজপুত্র বা রাজা বলিয়া লোকে সম্বোধন করিত।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

মুক্তিনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৫শে মার্চ্চ—অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিলাম। কি বিষম শীত!

গত কল্য বিকালে পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতের শীর্ষদেশমাত্র তুষারাচ্ছন্ন দেখিয়াছিলাম। অদ্য প্রত্যুষে দেখি, যতদূর দৃষ্টি চলে সমস্ত ভূমি একটী পুরু তুষার আবরণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, উদীয়মান সূর্য্যদেবকে বরণ করিয়া লইবার জন্য কুহেলি এখনও পর্ব্বতগহ্বর ও নিম্নস্থ নদীগর্ভ ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে আরোহণ করে নাই। পূর্ব্ব দিকে দিগন্তব্যাপী রজতশৃঙ্গগুলি উর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া আপনাদের বিরাট মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান। নীলাকাশে দুই চারিটি ম্লান নক্ষত্র তখনও ক্ষীণালোক বিতরণ করিতেছিল। সমস্ত রজনী সুপ্ত জগতে বিনিদ্র প্রহরীর কার্য্য করিয়া তাহারা যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং কতক্ষণে সূর্য্যদেব তাহাদের নিকট হইতে প্রহরীর কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতেছিল।

ক্ষণকাল মধ্যে সর্ব্বোচ্চ তুষারশৃঙ্গটি সিন্দুরলিপ্ত হইয়া প্রতিভাত হইল। ক্রমে অপরাপর শৃঙ্গগুলি একের পরে অন্যে অতি দ্রুত রঞ্জিত হইয়া উঠিল। অন্ধকার ও আলোকের দ্বন্দ্ব তিরোহিত হইল। এক অদৃশ্য মহান্ পুরুষের করধৃত প্রদীপে সমস্ত দৃশ্যজগৎ আলোকিত হইয়া উঠিল।

৬-৩০ মিঃ সময়ে আমরা চিত্রা ত্যাগ করিলাম এবং ৮-১৫ মিঃ সিকা নামক বস্তিতে উপস্থিত হইলাম।

সিকা বস্তির এক অংশ পর্ব্বতের শীর্ষদেশে, অপর অংশ পর্ব্বতের ক্রোড়দেশে অনেক নিম্নে। নিম্নের বস্তিটীই বড় এবং মুখিয়ার বাড়ী সেই বস্তিতে।

বীরবল আমাদের পূর্ব্বেই বস্তিতে গিয়াছিল এবং মুখিয়াও দুই একজন গ্রাম্যলোক সঙ্গে লইয়া আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। যে বাড়ীতে আমাদের জন্য আশ্রয়স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, বস্তিতে পৌছিয়া আমরা সেই বাড়ীতে গেলাম।

এইটিও মগর বস্তি। গৃহস্বামীর নাম ভক্তিপুরা। গৃহস্বামী ও তাহার স্ত্রী উভয়েই প্রাচীন, তাহাদের কোন সন্তানাদি নাই। যাত্রীদিগকে সদাব্রত দিতে পারে তাহার অবস্থা সেইরূপ স্বচ্ছল নহে, কিন্তু তাহাদের সামর্থ্যানুসারে যতটুকু অতিথি সেবা করিতে পারে তাহা তাহারা করিতেছে। যাত্রীদের রন্ধনের জন্য ভক্তিপুরা নিজ ব্যয়ে একখানা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে এবং শারীরিক পরিশ্রমে যথেষ্ট জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে।

সমুদ্রবক্ষ হইতে আমরা কত উচ্চে উঠিয়াছি জানিনা, তবে এইমাত্র জানিলাম এখানে ধান্য জন্মে না। মহার্ঘ দরেই তণ্ডুল ক্রয় করিলাম। টাকায় নয়মন্না, প্রায় তিনসের দেড়পোয়া (এক মন্না আমাদের প্রায় দেড় পোয়া)। ঘৃত এবং নূতন গোলআলু কিনিতে পাওয়া গেল, এবং কিছু "দাহি" "প্রেমসে" সংগৃহীত হইল। একাদশীর পারণ সম্পন্ন করিলাম।

বিশ্রামান্তে ১২-২৫ মিঃ সময় সিকা ত্যাগ করিলাম। চিত্রার কিঞ্চিৎ উত্তর হইতেই পর্ব্বতটী একটু পশ্চিমে বাঁকান। সিকা হইতে কিছুদূর পশ্চিমে যাইয়া পুনরায় উত্তর দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের অনেক নিম্নে পর্ব্বতের পাদমূলে পর্ব্বতের সহিত সমান্তরালভাবে একটী নদী প্রবাহিত। নদীটী উত্তরবাহিনী, নাম ঘারাখোলা (ঘারা বস্তির নিম্নে প্রবাহিত থাণ)।

ঘারা হইতে পথ একটু নূতন ধরণের। আমরা পর্ব্বতের ক্রোড়দেশে ঢালুর উপর দিয়া চলিতেছি। কেহ যদি পর্ব্বতের শীর্ষদেশে উঠিয়া উত্তর দক্ষিণে শায়িত অবস্থায় নিজকে ছাড়িয়া দেয় তবে সে গড়াইতে গড়াইতে আমাদিগকে লইয়া পর্ব্বতের পাদমূলে প্রবাহিত নদীতে পতিত হইবে। দণ্ডায়মান অবস্থায় আমাদের শরীর আমাদের বাম পার্শ্বস্থ ভূমির সহিত ক্ষুদ্রকোণে (acute angle) এবং দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভূমির সহিত স্থূলকোণে (obtuse angle) অবস্থিত। আমাদের উভয় পার্শ্বে (অথবা নদীর দিকে পা রাখিয়া শয়ন করিলে উর্দ্ধে এবং অধোদেশে) শস্যক্ষেত্র। ক্ষেত্রে যব ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় শস্য দৃষ্টিগোচর হইল না।

আমরা উত্তরের দিকে যাইতেছি এবং ক্রমে নদীর দিকে অবতরণ করিতেছি। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আমরা ঘারা খোলার তীরে পৌছিলাম। বর্ষাকালে নদী পার হইবার জন্য নদীতে একটী কাঠের পুল আছে, কিন্তু তাহা একটু দূরে—শীতকালে কেহই সে পুল ব্যবহার করে না। নদীটী অগভীর কিন্তু বিস্তীর্ণ; জুতা মোজা খুলিয়া হাতে লইলাম এবং নদী পার হইলাম।

নদী পার হইয়া নদীর পূর্ব্বকূল ধরিয়া অল্পদূর উত্তরে অগ্রসর হইলেই গণ্ডকীর জলগর্জ্জন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইলাম, কালী গণ্ডকী অতি দ্রুত পশ্চিম দিকে ছুটিয়াছে। বর্ষাকালে বঙ্গদেশে পদ্মা নদীর জল যেরূপ বিবর্ণ ও পলিমিশ্রিত হয়, গণ্ডকীর জল তাহা অপেক্ষাও অধিক বিবর্ণ এবং পলিমিশ্রিত।

আমরা গণ্ডকীর কূলে আসিয়া পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলাম। বামে গণ্ডকী, দক্ষিণে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত। মধ্যবর্ত্তী পথ অল্প পরিসর। কিয়দ্দূর পরেই পর্ব্বত প্রাচীরে পূর্ব্বদিকগামী পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। গণ্ডকীর দক্ষিণ তীর হইতে আমরা উত্তর তীরে আসিলাম। নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য একটী কাঠের পুল আছে। নদী উত্তীর্ণ হইয়া যেখানে উত্তরকূলে অবতরণ করিলাম সেখান হইতে পশ্চিমদিকে একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। নদীজল হইতেই অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত প্রাচীরের ন্যায় আকাশে উঠিয়াছে।

এখান হইতেই মস্তাং গিরিসঙ্কট আরম্ভ। পথটী কেবল যে মুক্তিনাথ দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণের "পবিত্র পদপঙ্কে" পূত হয় তাহা নয়; পশ্চিম তেরাইয়ে উৎপন্ন নেপালী আফিংএর অধিকাংশই এই পথে তিব্বতে এবং তথা হইতে চীনদেশে অবৈধভাবে নীত (smuggled) হয়। নেপালীদের ব্যবহার্য্য তিব্বতীয় লবণ মস্তাং হইতে এই পথে নেপালে আসে। নেপাল দরবার হইতে প্রেরিত রাজদূতের প্রতি চীন সম্রাটের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধকল্পে নেপালরাজ ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে যখন তিব্বত আক্রমণের উদ্যোগ করেন, সেই সময় চীন বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ জন্য এই পথে নেপালী সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

গিরিসঙ্কটের উত্তর প্রান্তে কাকবেণী এবং দক্ষিণ প্রান্তে তাতপানি।

৩-৩০ মিঃ সময় আমরা তাতপানি বস্তিতে পৌছিলাম। গণ্ডকীর উত্তর কূলে এই বস্তির নিকটে একটী উষ্ণ জলের প্রস্রবণ থাকায় স্থানটী তাতপানি নামে পরিচিত হইয়াছে (তাত—উষ্ণ+পানি—জল)।

তাতপানি বস্তিটী যেন প্রস্থহীন দীর্ঘ। পথের উভয় পার্শ্বে লোকালয়। উত্তর দিকের গৃহগুলি পর্ব্বতের গাত্র-সংলগ্ন, দক্ষিণ দিকের বস্তি এবং গণ্ডকীর তীরভূমির মধ্যে অনেকটা খোলা জায়গা আছে।

ব্রহ্মচারীজী ও আমি একসঙ্গে তাতপানি পৌছিয়াছি, গাইড প্রভৃতি এখনও পৌছায় নাই। আমি বস্তিতে না গিয়া গণ্ডকীর তীরে গেলাম, ব্রহ্মচারীজী আশ্রয় অনুসন্ধানে বস্তিতে গেলেন।

গণ্ডকীর কূলে কূলে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমি বিপরীত দিক্ হইতে বস্তিতে প্রবেশ করিলাম। ব্রহ্মচারীজীকে দেখি এক ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন এই স্থানেই আশ্রয় স্থির হইয়াছে।

দ্বিতীয় জনমানবহীন তালাবদ্ধ ঘরে কাহার অনুমতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিব জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মচারীজী বলিলেন, এই বাড়ীর কর্ত্রী তাঁহাকে সদাব্রত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি একা নহেন, সঙ্গে আরও চারিজন আছে জানিয়া গৃহকর্ত্রী আমাদের সকলকেই তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ জন্য ব্রহ্মচারীজীকে অনুরোধ করিয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পরে গাইড্, ভারিয়া প্রভৃতি আসিয়া পৌছিল। গৃহকর্ত্রীও আসিয়া পৌছিলেন। বারান্দায় আমরা আসন গ্রহণ করিলাম। বস্তির অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষ আমাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং আমার ব্যাগের মধ্যে কি কি জিনিষ আছে দেখিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল।

পার্ব্বত্য প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা যদিও "পর্দ্দানশীন" বা অবগুণ্ঠিতা নহে, তথাপি আমাদের পরিচয় জানিবার জন্য এ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা কোথাও এতটা ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে নাই। একমাত্র সীসাঘাটে কয়েকটী থাকালিয়া রমণী আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সুধামে বস্তিতে গৃহকর্ত্রী প্রাচীনা, তিনি আলাপ করিয়াছেন। এখানে স্ত্রীলোকেরাই অগ্রণী হইয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহাদের মধ্যে কেহহ প্রাচীনা বা প্রৌঢ়া ছিল না।

একটী স্ত্রীলোক সিগারেট জ্বালাইবার জন্য "শলি" প্রার্থনা করিল। তাহার পর আমাদের দেশ কোথায়, কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছি ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করিল এবং ব্যাগের মধ্যে কি আছে দেখিতে চাহিল। আমি ব্যাগ খুলিয়া উহার মধ্যের জিনিষ পত্র দেখাইলাম।

কুইনিন পিলের শিশি দেখিয়া অনেকেই "বুখারকা দাওয়াই" প্রার্থনা করিল। আমি কিছু সম্বল রাখিয়া কিছু বিতরণ করিলাম।

ইহারা মশারী দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। পথে যদিও মশারী তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই, তথাপি ইহাকে অন্য ভাবে ব্যবহার করিয়াছি। আমাদিগকে প্রায়ই খোলা বারান্দায়

রাত্রিযাপন করিতে হইত। বাতাস ও হিম হইতে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিবার জন্ম মশারীকে ভাঁজ করিয়া পর্দ্দার ন্যায় ব্যবহার করিতাম। মশারীর চারিটী কোণ ধরিয়া চারিজন স্ত্রীলোক উহাকে বিস্তৃত করিল। উহার ব্যবহার সকলকে বুঝাইলে তাহারা হাসিয়াই অস্থির হইল। পার্ব্বত্য প্রদেশে মশার প্রকোপ নাই সুতরাং তাহারা মশারী চেনে না এবং ব্যবহারও জানেন না। কাঠমুণ্ড সহরে মশারীর প্রচলন আছে এবং তাহার নেপালী আখ্যা "ঝুলি"।

সন্ধ্যা সমাগত হইলে সকলে আপন আপন গৃহে গেল।

অদ্য বীরবল কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের একটী বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক দুইটী রসুন্ থেঁতলাইয়া বীরবলের কপালের দুইদিকের শিরার উপর বাঁধিয়া দিল। অদ্য রাত্রে বীরবলের "লঙ্ঘনং পথ্যং" ব্যবস্থা করিলাম।

আগামী কল্য উষ্ণ প্রস্রবণ ও কালী গণ্ডকীতে স্নান এবং আহারান্তে এখান হইতে যাত্রা করিব স্থির করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম।

কালী গণ্ডকীর অপর দুইটি নাম—(১) নারায়ণী এবং (২) শালগ্রামী। কাকবেণীর নিকট গণ্ডকী গর্ভে অনেক শালগ্রাম পাওয়া যায়, ইহা হইতেই নদীর এই দুইটি নামের উৎপত্তি।

স্বয়ং ভগবানও জড়দেহ ধারণ করিলে গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রভাব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন না। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণকে শনিগ্রহের প্রকোপে বজ্রকীট রূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল এবং বজ্রকীটরূপী ভগবানকে সুদূর হিমালয় বক্ষে গণ্ডকী তীরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি লোকহিতার্থে প্রস্তর কর্ত্তন করিয়া শালগ্রাম শিলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যদিও বহুকাল অতীত হইল ভগবান বজ্রকীটদেহ রক্ষা করিয়াছেন, এখনও তাঁহার অধস্তন পুরুষ বজ্রকীটেরা শালগ্রাম শিলা নির্ম্মাণরূপ জনহিতকর কার্য্য পরিত্যাগ করে নাই। নানা আকৃতির অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড কাকবেণীর নিকট পাওয়া যায়। শাস্ত্রোক্ত শালগ্রাম শিলার লক্ষণের সহিত যে শিলার লক্ষণ মিলিয়া যায়, সেইটাই পূজার্হরূপে গৃহীত হয়।

নানাজাতীয় শালগ্রাম শিলার মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং দুষ্প্রাপ্য। লক্ষ্মীনারায়ণ এবং হিরণ্যগর্ভ চক্রে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ থাকে এবং প্রবাদ যে ভুটীয়ারা সেই শিলা চূর্ণ করিয়া সুবর্ণ সঞ্চয় করে। এক একটী লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রের মূল্য দুই শত হইতে আড়াই শত মুদ্রা। ভুটীয়াদিগকে বন্দুক ও বারুদ দিতে পারিলে মুদ্রার পরিমাণ কিছু কমাইয়া দেয়।

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে বিষ্ণুচক্রে তাঁহার শরীর একান্ন অংশে বিভক্ত হয় এবং গণ্ডকী নদীতে দক্ষিণ গণ্ড পতিত হয়। যে স্থানে গণ্ড পতিত হইয়াছে সে স্থান মহাপীঠ। তথায় দেবী গণ্ডকী চণ্ডী এবং ভৈরব চক্রপাণি। এই গণ্ডকী চণ্ডী এবং চক্রপাণির কোনও সন্ধান পাইলাম না। তদ্রূপ নেপালে জানুদ্বয় পতিত হওয়ায় নেপালও মহাপীঠ। দেবী মহামায়া, ভৈরব কপালী। নেপাল একটী বিস্তৃত দেশ, ইহার কোন্ স্থানে জানুদ্বয় পতিত হইয়াছে এবং মহামায়া ও কপালীর কোনও মন্দির থাকিলে তাহা কোথায়, কিছুই জানিতে পারি নাই। এই দুইটী দেবীর ও দুইটী ভৈরবের নামও নেপালে শুনিতে পাই নাই।

২৬শে মার্চ্চ। ভোর ছয়টায় উষ্ণ প্রস্রবণ ও গণ্ডকীতে স্নান করিলাম। গণ্ডকীর উত্তর তীরভূমি হইতে দুই হাত কি আড়াই হাত দূরে এক খণ্ড অতি বৃহৎ প্রস্তরের অন্তরালে প্রস্রবণ। প্রস্রবণটী অগভীর এবং আয়তনেও ক্ষুদ্র। তিন চার মিনিট প্রস্রবণ মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলাম, তাহার পর গণ্ডকীতে নামিয়া অবগাহন করিলাম।

আহার ও বিশ্রামের পর ৯.৩০ মিঃ সময় তাতপানি ত্যাগ করিলাম। কিছু দূর অগ্রগমনের পর মুক্তিনাথ হইতে প্রত্যাগত একজন সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি "ত্যাগী বাবা" নামে পরিচিত। বয়স প্রায় সত্তর বৎসর, দীর্ঘ কৃশ শরীর, মস্তকে জটাভার, গুম্ফশ্মশ্রু শ্বেত-

বর্ণ। এই অসহ্য শীতে একখানা মাত্র লেঙ্গটী পরিয়া আছেন— সমস্ত শরীর অনাবৃত। একগাছা চিমটা ভিন্ন অন্য কোনও সরঞ্জাম তাঁহার সঙ্গে নাই। এত শীঘ্র কেন তিনি মুক্তিনাথ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিলেন যে, রাজকীয় সদাব্রত আরম্ভ না হওয়ায় সাধু সন্ন্যাসীদের আহার্য্য ও জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যাইতেছে না, কাযেই তিনি মাত্র একরাত্রি মুক্তিনাথে অবস্থান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পথের কথা জিজ্ঞাসায় বলিলেন, টুকুচের পর হইতে পথ এখনও পরিষ্কার হয় নাই, স্থানে স্থানে তুষারস্তূপ বর্ত্তমান আছে। টুকুচে হইতে কাকবেণী পর্য্যন্ত অতি প্রবল বেগে প্রতিকূল শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। বৃদ্ধ তাঁহার হস্তখানা দেখাইয়া বলিলেন "বাবা, হাথীকা চামড়াকা মাফিক হোগিয়া।" দেখিলাম বৃদ্ধের বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম্ম নিতান্ত বন্ধুর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ত্যাগী বাবা তাতপানির দিকে চলিয়া গেলেন, আমরা ১১.৩০ মিঃ ডানা ভান্সারে পৌঁছিলাম।

ডানা একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু পার্ব্বত্য সহর। তিব্বতীয় লবণের একচেটিয়া ব্যবসায়ী গণেশ বাহাদুর সুভার "ভান-সার" (আফিস ও গুদাম) এবং একখানা বাড়ী এখানে আছে।

আমরা গণেশ বাহাদুরের আফিস ঘরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। আফিস ঘরে টেবিল চেয়ার র‍্যাক্ আলমারি ইত্যাদি কিছুই নাই। ঘরের মেঝেতে পুরু কম্বল বিস্তৃত। মর্য্যাদা অনুসারে কর্ম্মচারিগণ কম্বলের উপর একখানা ছোট গদি কি অপর একখানা ছোট কম্বলের আসন বিছাইয়া উপবেশন করে। খোদ গণেশ বাহাদুরকেও কর্ম্মচারীদের সঙ্গে একত্র বসিতে হয়, তবে তাঁহার গদীর উপর দুইটি ক্ষুদ্র তাকিয়া আছে। সাধারণ লোকদের জন্য একটু দূরে আর একখানা কম্বল বিছান।

গণেশ বাহাদুর আমার পরিচয় পাইয়া অদ্য রাত্রির জন্য তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। বেলা অধিক হয় নাই, আমরা আরও অনেকদূর যাইতে পারিব বলিলে তিনি বলিলেন যে, উল্লারীর দেওরালী (Highest peak) হইতে যে উৎরাই আরম্ভ হইয়াছে তাহা ডানা ভান্সারে শেষ হইল। এখান হইতে মুক্তিনাথ পর্য্যন্ত কেবল "চড়াই"; অবশিষ্ট বেলাতে আমরা কোনও আশ্রয়স্থানে পৌছিতে পারিব না। বিশেষতঃ আমি যখন মহারাজের অভ্যাগত তখন প্রত্যেক নেপালীরই অভ্যাগত, আমাদিগকে অদ্য, ডানা ভানসারে থাকিতেই হইবে।

একজন কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে তিনি আমাদিগকে বাজারের মধ্যে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বিতলে আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। টুকুচেতে তাঁহার কর্ম্মচারীর নামে আমার সঙ্গে একখানা চিঠি দিলেন।

বৈকালে সহরটি ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম। মুক্তি-নাথগামী রাস্তার দুই পাশে লোকালয়। অনেক বাড়ীতেই কমলার বাগান দেখিলাম।

২৭শে মার্চ্চ। প্রত্যুষে পাঁচ ঘটিকার সময় যাত্রার উদ্যোগ করিলাম। বীরবল কিছু অধিক অসুস্থ হওয়াতে তাহাকে এখানে রাখিয়া গেলাম। শীঘ্র সুস্থ হইলে মুক্তি-নাথে আমাদের সহিত মিলিত হইবে, আর অধিক অসুস্থ হইলে পোখরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এই উপদেশ তাহাকে দিয়া গেলাম।

ডানা ভানসারের একটু উত্তরেই একটি নদী। নদী পার হইয়াই "চড়াই" আরম্ভ করিলাম। বেলা ৮.৩০ মিঃ সময় আমরা ঘাসা নামে একটি বস্তিতে উপ-স্থিত হইলাম। পোখরায় অবস্থান কালে সুবেদার জগৎ সিং নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাহার বাড়ী এই ঘাসা বস্তিতে। জগৎ সিং পোখরা হইতে বাড়ী পৌছায় নাই। তাহার বাড়ীর নিকটে একটি ঝরণার পারে আমরা পাকের উদ্যোগ করিলাম।

আহার ও বিশ্রামান্তে যখন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছি তখন একজন ভুটিয়া উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিল তাহার নাম "ছ্যাং থান্ডীর"। আমার গাইড বীরবল অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে সংবাদ পাইয়া গণেশ

বাহাদুর সুভা আমার পথপ্রদর্শকরূপে তাহাকে পাঠাইয়াছেন, সে টুক্‌চে পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাইবে এবং সেখান হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাকবেণী পর্য্যন্ত যাইবে।

আমি বিদেশী তীর্থযাত্রী, গণেশ বাহাদুর সুভার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি অযাচিত ভাবে যে সাহায্য করিলেন তজ্জন্য তাহাকে মনে মনে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

বেলা ১১-৩০ মিঃ ঘাসা ত্যাগ করিলাম আমাদিগের বাম দিকে ধবলগিরির বিশাল দেহ অদ্য প্রথমে দৃষ্টিগোচর হইল। এ পর্য্যন্ত তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত কেবল আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল। অদ্য হইতে দক্ষিণে ও বামে হিমগিরির শোভা দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেল। অত্যন্ত শীত বোধ করিতে আরম্ভ করিলাম। গায়ে যে গরম কাপড় ছিল এই বর্দ্ধিত মাত্রার শীত নিবারণের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় ব্যাগ হইতে আর একটি গরম কোট বাহির করিয়া গায়ে দিলাম। যে জুতা বীরগঞ্জ হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম তাহা সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হওয়ায় পরিত্যাগ করিলাম এবং দ্বিতীয় এক জোড়া জুতা বাহির করিয়া পায়ে দিলাম।

অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিঃ আমরা ছয়ে নামক বস্তিতে পৌঁছিলাম।

তাতপানি হইতেই আমাদের পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দিকেই অভ্রভেদী পর্ব্বত-প্রাচীর। প্রাতে বেলা ৯ ঘটিকার পূর্ব্বে সূর্য্যদেবের দর্শনলাভ দুর্লভ এবং অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পরেই তিনি আবার পর্ব্বতের আড়ালে লুক্কায়িত হইয়া পড়েন। আমরা চারি ঘটিকার পূর্ব্বেই ছয়ে বস্তিতে এক ভুটীয়ার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

তাতপানির ন্যায় এখানেও গৃহিণীই গৃহের কর্ত্রী। তিনিই আমাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বাসের জন্য স্বতন্ত্র একখানা গৃহ নির্দ্দেশ করিলেন। আমাদের কি কি জিনিষের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র আনিয়া দিয়া মূল্য গ্রহণ করিলেন। অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইল এবং সমস্ত রাত্রি সেই অগ্নি রক্ষা করা হইয়াছিল।

২৮শে মার্চ্চ। অতি প্রত্যূষে ৫-৩৫ মিঃ ছয়ে ত্যাগ করিলাম। দক্ষিণে বাম উভয় দিকেই তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত। বাতাসও প্রবল এবং বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত। বাতাস যেন তুষারের সমস্ত শৈত্য আনিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। চড়াই করিতে করিতে শীত ক্রমে কম বোধ হইতে লাগিল। ৮-৩০ মিঃ সময় আমরা টুক্‌চে আসিয়া পৌঁছিলাম।

টুক্‌চে ডানা ভানসার অপেক্ষা বড় সহর। এখানকার "ভানসার" ডানার ভানসার অপেক্ষা অনেক বড় এবং এইখানেই গণেশ বাহাদুর সুভার বাড়ী। এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পাইলাম। সহরের প্রধান রাস্তার উভয় পার্শ্বে তাম্র নির্ম্মিত প্রার্থনা চক্রের সারি বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিলাম।

গণেশ বাহাদুর সুভার বাটীতে আমরা পরম সমাদরে গৃহীত হইলাম। আমরা তাঁহাদের অতিথি।

আহার ও বিশ্রাম অন্তে ১২-৩০ মিঃ সময় আমরা টুক্‌চে ত্যাগ করিলাম। ছ্যাং থানডীর এখানে রহিয়া গেল এবং দ্বিতীয় একব্যক্তি আমাদের পথপ্রদর্শক নিযুক্ত হইল।

টুক্‌চে হইতে অর্দ্ধঘণ্টার পথ উত্তরে মারফা গ্রাম। ইহা একটী ভুটীয়া বস্তি। উচ্চ পর্ব্বতের উপর একটী বৌদ্ধমন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। পথে কয়েক জন গ্রামবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। একজন বলিলেন তিনি মঠের পুরোহিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুর শাস্ত্রোক্ত "কৃত্তিঃ কমণ্ডলু-মৌণ্ডং চীবং" তাঁহার দেখিলাম না। অন্যান্য ভুটীয়ার ন্যায় তাঁহার মস্তকে লম্ব চুল এবং উর্ণীয় (পশুলোমজাত) বস্ত্রের পোষাক। পোষাক অনেকটা রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতের পোষাকের ন্যায়। তিনি আমার নোটবুকে তাঁহার নাম লিখিয়া দিলেন। অক্ষরগুলি অনেকটা পারসী অক্ষরের ন্যায়, তিনি বলিলেন ইহা 'তিব্বতীয় হরফ।

টুকুচে হইতে মারফা পর্য্যন্ত ত্যাগী বাবা বর্ণিত প্রবল বাতাস ও শৈত্যের অস্তিত্ব ততটা অনুভব করি নাই। মারফার পর হইতেই প্রবল প্রতিকূল বাতাসের বিরুদ্ধে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাতাস নয় যেন ঝড়। সেই ঝড় হিমালয়ের ভাণ্ডার শেষ করিয়া সমস্ত শৈত্য যেন আমাদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত গরম কাপড়ে আবৃত হইয়াও শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। ত্যাগী বাবা কিপ্রকারে এই-শীত ও বাত সহ্য করিয়া অনাবৃত দেহে মুক্তিনাথ গিয়াছিলেন চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইলাম। শীতল বাতাসে আমার ওষ্ঠাধর ও গালের চামড়া ফাটিয়া গেল।

ত্যাগীবাবা বর্ণিত তুষারস্তূপ এই কয়েকদিনে দ্রবীভূত হইয়াছে এবং পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। নিম্ন ভূমিতে স্থানে স্থানে তুষারস্তূপের উপর দিয়া গমন করিতে হইয়াছিল।

মারফার পর হইতেই পথিপার্শ্বস্থ মাঠে দীর্ঘলোমবহুল চমরী গো দেখিতে পাইলাম। দুই একজন স্থানীয় ব্যবসায়ীর সহিত পথে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাদের ভারবাহী পশুগুলিও চমরী গো দেখিলাম।

সাম্ভু নামক এক বস্তির নিকটে অনেকটা বিস্তীর্ণ স্থান প্রস্তর খণ্ডের প্রাচীরে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে দেখিলাম। প্রাচীরের অন্তরালে কি আছে দেখিতে কৌতূহলী হইয়া প্রাচীর গাত্রে খানিকটা উঠিলাম। শুষ্ক করিবার জন্য পশুমাংস সমস্ত মাঠময় ছড়াইয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাইলাম।

অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিঃ সময় জ্ঞানগুম্বার নামক বস্তিতে আমরা পৌঁছিলাম এবং প্রীতিপ্রসাদ নামক এক থাকালীয়ার সদাব্রত গ্রহণ করিলাম।

আমাদের আগমনের পূর্ব্বে তিনজন নেপালী সাধু প্রীতিপ্রসাদের অতিথি হইয়াছেন এবং একখানা গৃহ অধিকার করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে আমার সুবিধা হইবে না জ্ঞাপন করিলে প্রীতিপ্রসাদ আমাকে ও ব্রহ্মচারীজীকে তাহার নিজের ঘরের এক প্রকোষ্ঠে স্থান দান করিল। এখানেও সমস্ত রাত্রি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হইয়াছিল।

প্রীতিপ্রসাদ একজন সদাগর। পশুলোমজাত বস্ত্র, পশুচর্ম্ম, কস্তুরী এবং অন্যান্য জিনিস তিব্বত হইতে কলিকাতায় লইয়া যাইয়া বিক্রয় করে। দার্জ্জিলিংএ ভুটীয়া চাদর নামে যে কাপড় বিক্রয় হয়, তাহা দেখাইয়া সে বলিল যে তাহারাই "উনী" কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল। অগ্য চারিদিন কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। তাহার নিকট শুনিলাম E I Ry ধর্ম্মঘট এখনও শেষ হয় নাই।

২৯শে মার্চ্চ ভোর ছয়টায় জ্ঞানগুম্বার ত্যাগ করিলাম। টুকুচে হইতে যে পথপ্রদর্শক আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, সে এই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিল এবং এই গ্রাম হইতে অপর এক ব্যক্তি আমাদের পথপ্রদর্শক রূপে চলিল।

এই নবনিযুক্ত পথপ্রদর্শক খুব বলিষ্ঠ এবং দ্রুতগামী। গ্রাম ছাড়িয়া অল্প কিছু দূর গমনান্তর সে পর্ব্বতের উপরিস্থিত পথ ত্যাগ করিয়া গণ্ডকীর কূলে নামিল। ব্রহ্মচারীজী ও আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। এই পথটী বড়ই দুর্গম এবং ভীতিজনক। সাহসে ভর করিয়া আমরা পথপ্রদর্শকের পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমরা পর্ব্বতের আবেষ্টনের মধ্য হইতে গণ্ডকীর চড়ায় পৌঁছিলাম। বুঝিতে পারিলাম প্রসিদ্ধ পথে না আসিয়া আমরা "পাকদণ্ডী" দিয়া আসিয়াছি। পাকদণ্ডীর পথে বোঝা লইয়া ভারিয়া চলিতে পারে না। জিৎবাহাদুর ও কনেষ্টবল পর্ব্বতের চড়াই অতিক্রম করিয়া আমাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

আমরা গণ্ডকীর চরের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। গণ্ডকী এখন খুব প্রশস্ত কিন্তু শুষ্কগর্ভ, পর্ব্বতের পাদদেশ বহিয়া মাত্র একটী ক্ষীণ জলধারা বর্ত্তমান। যেখানে জলধারা উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে, সেখানে পথপ্রদর্শক আমাকে তাহার বাহুর উপর বসাইয়া পার করিতেছে।

কিছুদূর অগ্রসরের পর দেখিতে পাইলাম পূর্ব্ব দিক হইতে একটী শীর্ণকায়া নদী গণ্ডকীতে আসিয়া পড়িতেছে। নদীটীর নাম পদ্মা। বঙ্গদেশের পদ্মার তুলনায়

ইহার পদ্মা নাম "কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন" বলিয়া মনে হইল।

৮-৩০ মিঃ সময় আমরা কাকবেণী পৌঁছিলাম। মস্তাং গিরিসঙ্কটের উত্তর প্রান্তে আসিলাম। এখান হইতে মুক্তিনাথ পূর্ব্বদিকে এক ক্রোশ।

পূর্ব্বদিক হইতে গণ্ডকী ও উত্তর দিক হইতে অপর একটী নদী আসিয়া কাকবেণীতে মিলিত হইয়াছে। দুই নদীর সঙ্গমস্থলের নাম "বেণী।"

কাকবেণী একটি গণ্ডগ্রাম। গত বর্ষায় (১৯২১) গণ্ডকী ও অপর নদীর জলপ্লাবনে অনেক প্রজার শস্য হানি, কাহারও গৃহ পালিত পশু নষ্ট এবং কাহারও বা বাড়ী ঘর চাষের জমী সমুদয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রজাগণ তাহাদের দুঃখকাহিনী মহারাজের কর্ণগোচর করিলে তাহাদের বিবরণের সত্যতা নিরূপণ ও ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মহারাজ কাঠমণ্ডু হইতে একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়াছেন। কর্ম্মচারীর নাম সের বাহাদুর। তাহার কার্য্যগত উপাধি "থাক আদালত দরজা বিচারী"। কার্য্যের প্রকৃতি শুনিয়া আমাদের দেশীয় সবডেপুটী কালেক্টরের সমপর্য্যায় কর্ম্মচারী বলিয়া মনে হইল।

কাকবেণীর প্রজাদের প্রধান উপজীবিকা মস্তাং হইতে লবণ আনিয়া বিক্রয় করা। ভোটে (নেপালীরা তিব্বতকে ভোট নামে অভিহিত করে) ধাপা সাকা নামক স্থানে লবণের খনি আছে। তিব্বতীয়েরা সেখান হইতে লবণ আনিয়া মস্তাংএ বিক্রয় করে। মস্তাং-রাজ নেপালরাজের সামন্ত রাজা। মস্তাং রাজ্যের উত্তর সীমান্তে নেপাল রাজের একটি দুর্গ আছে, নাম করলা দুর্গ। এই সীমার উত্তরে নেপালী প্রজার অগ্রগমনের অধিকার নাই। নেপালী প্রজারা (কাকবেণী, ঝারকোট, পুরাঙ্গ, মুক্তিনাথ প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীরা) মস্তাং হইতে লবণ ক্রয় করিয়া আনিয়া কাকবেণী, টুক্‌চে কি ডানা ভানসারে গণেশ বাহাদুর সুভার নিকট বিক্রয় করে। স্থানের দূরত্ব অনুসারে লবণের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

আমরা কাকবেণীতে গণেশ বাহাদুর সুভার ভানসারে আশ্রয় লইলাম এবং তাঁহার সদাব্রত গ্রহণ করিলাম।

অল্প বিশ্রাম অন্তে সিং বাহাদুর, ব্রহ্মচারীজী ও আমি শালগ্রাম শিলার সন্ধানে বাহির হইলাম। পৃথিবীর কোনও দেশেই যে কোনও কার্য্যের জন্যই হউক না কেন, ভলন্টিয়রের অভাব হয় না। অনেকগুলি ভুটীয়া বালক আমাদের সঙ্গে নারায়ণের অন্বেষণে চলিল। অনেক শিলাখণ্ড সংগৃহীত হইল, কিন্তু ব্রহ্মচারীজীর অভীপ্সিত লক্ষ্মীনারায়ণচক্র পাওয়া গেল না।

বেণীতে স্নান করিলাম এবং আহার ও বিশ্রাম অন্তে দ্বিপ্রহরে কাকবেণী ত্যাগ করিলাম।

ভূগোল হিসাবে ভারতবর্ষ (নেপালও ভারতবর্ষের মধ্যে) ত্যাগ করিয়া এখন আমরা হিমালয়ের উত্তরে আসিয়াছি। মস্তাংরাজ নেপালরাজের করদ হইলেও মস্তাং নেপালের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে। গোসাইথান হইতে পশ্চিমে ধবলগিরি পর্য্যন্ত রেখার উত্তর পার্শ্বেও যে ভৌগোলিক নেপাল বিস্তৃত ইহা নেপালীদের ভুল ধারণা।

ভৌগোলিক বিচার বন্ধ রাখিয়া এখন আমরা পূর্ব্ব দিকে পর্ব্বতের পর পর্ব্বত চড়াই আরম্ভ করিলাম। অদ্যকার "চড়াই"ও বিশেষ কঠিন। অনেক উপরে উঠিয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। কি নয়নাভিরাম দৃশ্য! পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে চতুর্দ্দিকেই চিরহিমানী মণ্ডিত "অভ্রভেদী ভীম আত্মা ভীষণ শরীর" গিরি তাহাও যেন আমাদিগের অধিক দূরে নহে। চতুর্দ্দিকে রজত প্রাচীর বেষ্টিত অতি উচ্চ স্থানে আমরা অবস্থিত।

আমরা ক্রমেই উর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। আমাদের পথের দক্ষিণে ও বামে নিম্ন পর্ব্বতে লোকালয়। দূর হইতে গ্রামগুলিকে গৃহবহুল বাড়ীর ন্যায় দেখা যায়।

মুক্তিনাথ হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে ঝারকোট গ্রামে আমরা পৌঁছিলাম। গ্রামখানি পথের বাম পার্শ্বে। গ্রামে পৌঁছিয়া এখানকার সুভার অনুসন্ধান করিলাম। এক ব্যক্তি সুভার বাড়ী দেখাইয়া দিল।

সুভার বাড়ীর দরজায় একটি ভীষণদর্শন প্রকাণ্ড কুকুর শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছে। এত বড় কুকুর আমি পূর্ব্বে দেখি নাই এবং কুকুরের এরূপ ভীষণ উচ্চ চীৎকারও পূর্ব্বে শুনি নাই। আমাদের অদ্ভুত চেহারা ও পোষাক দেখিয়া সে যখন গর্জ্জন ও আস্ফালন আরম্ভ করিল, তখন মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। যদি সে একবার বন্ধনচ্যুত হইতে পারিত তবে আর আমাদের নিস্তার ছিল না।

কুকুরের চীৎকারে সুভার বাড়ীর মধ্য হইতে এক জন লোক আসিল। সে কুকুরকে শান্ত করিল এবং আমাদিগকে জানাইল যে সুভা বাড়ীতে নাই।

কাকবেণী হইতে আমরা কোনও পথপ্রদর্শক সঙ্গে আনি নাই। জিৎ বাহাদুর ও পোখরার কনেষ্টবলও আমাদের অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে।

ঝারকোট ত্যাগ করিয়া আমরা পথ ভুল করিলাম। মুক্তিনাথের পথে "চড়াই" না করিয়া ভুল পথে "উৎরাই" আরম্ভ করিলাম। পশ্চাৎ হইতে লোকের চীৎকার কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম পর্ব্বতের উচ্চ স্থান হইতে কয়েক ব্যক্তি হস্ত সঙ্কেতে আমাদিগকে জানাইতেছে যে আমাদের পথ দক্ষিণের উচ্চ পাহাড়ের উপর দিয়া পূর্ব্বদিকে। তাহাদের সঙ্কেত অনুসারে আমরা "চড়াই" আরম্ভ করিলাম। মুক্তিনাথের পথে আসিলে পর সোজা পূর্ব্বদিকে যাইবার সঙ্কেত করিয়া তাহারা চলিয়া গেল। এই অনর্থক চড়াই উৎরাইতে আমাদের প্রায় পনের মিনিট সময় নষ্ট হইল।

আরও কিছুদূর অগ্রসরের পর মুক্তিনাথের মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলাম। বাঞ্ছিত স্থান অতি নিকট জানিতে পারিয়া মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল।

আমরা মন্দির লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং ক্রমে মুক্তিনাথ পর্ব্বতশৃঙ্গের পাদদেশ দৃষ্টিগোচর হইল।

মুক্তিনাথের শৃঙ্গের কিছু নিম্নে পথের বামদিকে যাত্রীনিবাস। বর্ত্তমান ধীরাজের মাতামহী এই যাত্রীনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া শুনিলাম। যাত্রীনিবাস "রাণী পাউয়া" নামে পরিচিত।

মুক্তিনাথের মন্দির যে শৈল শৃঙ্গের উপর স্থাপিত সেখানেও একটি যাত্রীনিবাস আছে কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণ রাণী পাউয়াতে বাস করেন এবং ইহারই এক প্রকোষ্ঠে এক ভুটীয়ার একখানা ক্ষুদ্র দোকান আছে। নিকটে অন্য এক ভুটীয়ার বাড়ী। রাণী পাউয়ার নিকটে আসিলে একজন ভুটীয়া স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি মন্দিরের "মূল সুম্বা"—প্রধান পূজারিণী। তিনি আমাদিগকে রাণী পাউয়াতেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন।

অদ্য অমাবস্যা, তদুপরি আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হইয়াছে, এই দুই কারণে ব্রহ্মচারীজী মুক্তিনাথ দর্শনে গেলেন না। আমি পূজারিণীর সহিত মুক্তিনাথ দর্শনে গেলাম, ব্রহ্মচারীজী আশ্রয়স্থান স্থির করিবার জন্য রাণী পাউয়াতে গেলেন।

যখন মন্দিরে পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় অবসান। মন্দিরে ব্রাহ্মণ পূজারী আমাদের সীসাঘাটে পরিচিত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার এবং পূর্ব্বে বর্ণিত পঞ্চ ভৈরবী ও দুই সন্ন্যাসীর মধ্যে চারি ভৈরবী ও সন্ন্যাসী দ্বয়ের সহিত দেখা হইল।

যে স্থানে আসিবার জন্য অষ্টাদশদিন ব্যাপী কষ্ট ও বিপদ স্বীকার করিয়াছিলাম সেই অভীপ্সিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারায় মনে যে কি এক আনন্দ অনুভব করিলাম তাহা বর্ণনাতীত। সমস্ত শ্রম, সমস্ত কষ্ট অদ্য সার্থক বোধ হইল।

মুক্তিনাথের মন্দিরটী অনুচ্চ, সর্ব্বপ্রকার কারুকার্য্যবর্জ্জিত, কাষ্ঠ এবং প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার স্থাপত্য আদর্শ ভাটগাঁওএর দেবী ভবানীর মন্দিরের আদর্শের অনুরূপ মন্দিরটি স্তরে স্তরে উর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং সর্ব্বোচ্চ স্তরের উপর পিত্তল গোলক ও পিত্তল দণ্ড চূড়া রূপে শোভা পাইতেছে।

মন্দিরটি খুব প্রাচীন নহে। মন্দির গাত্রে নেপালী ভাষায় উৎকীর্ণ এক খণ্ড শিলালিপি

আছে, বোধ হয় তাহাতে মন্দিরের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

মন্দিরের সম্মুখে (পশ্চিম দিকে) একটি কুণ্ড। কুণ্ডের উত্তরে দক্ষিণদ্বারী ক্ষুদ্র যাত্রীনিবাস। মন্দিরের পশ্চাতে অত্যুচ্চ পর্ব্বতে প্রবাহিত অন্তঃসলিলা জলধারাকে কৌশলে সহস্রধারায় পরিণত করা হইয়াছে। পর্ব্বতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে এই সকল ধারা নিম্নে পড়িতেছে। এই সমস্ত ধারার নিম্নে বসিয়া স্নান করিবার বন্দোবস্ত আছে। ধারার জল পুনরায় ভূগর্ভ দিয়া মন্দির সম্মুখস্থ কুণ্ডে পতিত হয় এবং তথা হইতে নিম্নে প্রবাহিত হয়। মন্দির, কুণ্ড, যাত্রীনিবাস, স্নানের স্থান সকলই যেন অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে এক খণ্ড বৃহদায়তন সমতল শিলাখণ্ডের উপর স্থাপিত। এই শিলাখণ্ডের নাম মুক্তিক্ষেত্র বা মুক্তিছত্র।

মন্দিরের মধ্যে একখণ্ড নাতি উচ্চ প্রস্তর বেদিকার উপর বিগ্রহ স্থাপিত। দেববিগ্রহ পিত্তল নির্ম্মিত ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি, কিন্তু চতুর্ভুজ। উপরের হস্ত দুইখানি "বরাভয়" দান করিতেছে। বিগ্রহ বিষ্ণুর নাম "মুক্তিনারায়ণ" কিন্তু তিনি মুক্তিনাথ নামেই সমধিক পরিচিত। এই মুক্তিনাথ নাম হইতেই সমগ্র গ্রামটীর নাম মুক্তিনাথ হইয়াছে। বিগ্রহের গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা। মস্তকোপরি পিত্তল নির্ম্মিত অনন্তনাগ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দুই পার্শ্বে তাম্র নির্ম্মিত দুইটী "নায়িকা" (স্ত্রীমূর্ত্তি)। মুক্তিনারায়ণের বিগ্রহ অপেক্ষা স্ত্রীমূর্ত্তি দুইটী অধিকতর প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। ব্রাহ্মণ পূজারী মাত্র একাদশ বৎসর মুক্তিনাথে আছেন। তাঁহার নিকট প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা গেল না। বোধ হয় পুরাকালের "বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘ," কালের বিচিত্র গতিতে মুক্তিনারায়ণ ও তাঁহার পার্শ্বস্থ নায়িকারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একাদশ বৎসর পূর্ব্বে লামাপুরোহিত মুক্তিনারায়ণের পূজা করিতেন। বর্ত্তমানেও ভুটীয়া পরিচ্ছদধারী ব্রাহ্মণ পুরোহিত জুতা (পশুলোমজাত বস্ত্রের জুতা) পায়ে দিয়া বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকেন। ভুটীয়া পূজারিণীরও বিগ্রহ স্পর্শ করিবার অধিকার আছে এবং ভুটীয়ারাই অধিক সংখ্যায় মুক্তিনারায়ণ দর্শন করিয়া থাকে।

সান্ধ্য আরতি শেষ হইলে পূজারী শ্রীনিবাস ও আমি রাণী পাউয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পূজারিণী তাঁহার বাটীতে গেলেন, ভৈরবী ও সন্ন্যাসীগণ মুক্তিক্ষেত্রের যাত্রীনিবাসে রহিয়া গেলেন।

এতক্ষণ শীতের প্রকোপ ততটা অনুভব করি নাই। কিন্তু মন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময় অত্যন্ত শীত বোধ করিতে লাগিলাম।

আমরা রাণী পাউয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কনেষ্টবল ও ভারিয়া আসিয়া পৌছিয়াছিল। কনেষ্টবল ও ভারিয়া ঝারকোটে সুভার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জ্বালানী কাষ্ঠের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিল এবং তদনুসারে সুভা দুইজন ভারবাহী দ্বারা যথেষ্ট জ্বালানী কাষ্ঠ পাঠাইয়াছিলেন। বাহকদিগকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলাম।

আমাদের অবস্থানের জন্য ব্রহ্মচারীজী পূর্ব্বেই একটি প্রকোষ্ঠ মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রকোষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল। পূজারী শ্রীনিবাস, অপর একজন নেপালী সন্ন্যাসী এবং আমরা চারিজনে অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অগ্নিসেবা করিলাম এবং নানারূপ আলাপে সময় কর্ত্তন করিলাম। অপর তিন ব্যক্তি চলিয়া গেলে আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। সমস্ত রাত্রি গৃহে অগ্নি রক্ষা করা হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

অপূর্ণ

(উপন্যাস)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অশোকের পত্র

আজ সন্ধ্যাকালে অশোকের আশীর্ব্বাদ হইবে। গিরিশ বাবু বিকালের গাড়ীতে আসিয়া পৌছিবেন। আহারাদির একটু ভাল রকমই ব্যবস্থা হইবে। পুরোহিত ও গ্রামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় জনকয়েককেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

সরস্বতী সকাল হইতেই তাঁহার আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে কি রকম একটা অশুভ ভাবনা আসিতেছে, চেষ্টা করিয়া মন হইতে তাহাকে তাড়াইতে হইতেছে। একমাত্র পুত্রের বিবাহ হইবে—কেন যে সূচনাতেই এই একটা অচিন্তিত অশান্তি আসিয়া জুটিল ইহা ভাবিয়া তিনি শান্তি পাইতেছেন না।

সকাল সকাল পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিবেন, এমন সময় অতুলকৃষ্ণ একখানি চিঠি হাতে করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর মুখে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামীর সদানন্দ মুখে অমন অসন্তোষের চিহ্ন, বিশেষ কারণ না ঘটিলে দেখা যাইত না। আজ তাহা দেখিয়া সরস্বতীর মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

নিকটে আসিয়া অতুলকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশোক এবার যাবার সময় তোমাকে কিছু বলে গিয়েছিল?"

সরস্বতী শীঘ্র কিছু উত্তর করিতে পারিলেন না।

সরস্বতীকে উত্তর দিতে একটু ইতস্তত করিতে দেখিয়া অতুলকৃষ্ণ অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "তাহলে তোমাকে সে আগেই কিছু বলেছিল। আমাকে আগেই সে কথা তোমার বলা উচিত ছিল।"

সরস্বতী একটু উদ্বেগ ও আশঙ্কার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গা, কি হয়েছে সে জন্যে?"

"পড়ে' দেখ" বলিয়া অতুলকৃষ্ণ হাতের চিঠি রোয়াকের উপর ফেলিয়া দিলেন।

এই সামান্য কার্য্যটায়, স্বামী যে কতখানি বিরক্ত হইয়াছেন তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সরস্বতী সহজেই মনে আঘাত পান, সে জন্য অতুলকৃষ্ণ এমন কোন প্রকার ব্যবহার করিতেন না যাহাতে স্ত্রীর প্রতি অতি সামান্য বিরক্তি বা অসন্তোষও প্রকাশিত হয়। কিন্তু আজ তিনি কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেও স্বামী পত্রখানি রোয়াকে ফেলিয়া দিলেন, ইহাতে সরস্বতী অত্যন্ত আহত হইলেও একটা ভীষণ আশঙ্কার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। নীরবে চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

অশোক প্রথমেই যোগমায়ার মৃত্যুশয্যায় সেই প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়াছে। আদর্শ চরিত্র ও স্নেহ-সুকোমল হৃদয়ের জন্য সে আজীবন যাঁহাকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, তিনি যে বিশ্বাস মনে লইয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন, তাঁহার সেই বিশ্বাস ও আশার ব্যতিক্রম করিয়া অন্যত্র বিবাহ করা যে তাহার পক্ষে কত কঠিন, অথচ যাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতার মত ভক্তি করিয়া আসিয়াছে সেই তাহার পিতৃদেবের ইচ্ছার প্রতিকূলে যাওয়া তাহার যে কত ক্লেশকর হইয়াছে তাহা লিখিয়াছে। তার পর লিখিয়াছে অমুপ্রভার কথা; সেই পিতৃমাতৃ-হীনা মেয়েটির দুঃখের কথা। পিতার আশ্রয় হারাইয়া তাহার মাতামহের আশ্রয়ে আসা, মাতামহের মৃত্যুর পর তাহার মাতার উপর নির্ভর করা, তার পর সেই মাতার মৃত্যুর পর তাহার সেই মাসীর অবস্থা; ভগবান

তাহাকে শেষে মাসীমার যে আশ্রয় দিয়াছিলেন অবশেষে তাহা হইতে তাহার বঞ্চিত হওয়া; মাসীমার মৃত্যু শয্যায় অশোকের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাহার যে মনোভাব, তাহাদের নিজেদের বাড়ীতে আসিয়া কি দুঃখে যে সে আশ্রয় ত্যাগ করিয়া গেল এবং সর্ব্বশেষে যে সংসারে সে ফিরিয়া গেল সেখানে তাহার কি দুরবস্থা হইয়াছে এবং আরও হইতে পারিবে ইহার মোটামুট একটা করুণ চিত্র শব্দের পর শব্দ দিয়া আঁকিয়া সে পিতার চোখের সম্মুখে ধরিয়াছে। পরিশেষে লিখিয়াছে যে এ অবস্থায় এখন অন্য কাহাকেও বিবাহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব এবং এই কথা এখন না বলিয়া আর দেরী করিয়া বলিলে আরও অনিষ্ট ও অনর্থ হইবে, তাই আজ বাড়ী না আসিয়া সে ভয়ে ভয়ে পিতাকে এই সংবাদ দিতে বাধ্য হইল।

উপসংহারে অশোক পিতার নিকট অনেক মিনতি করিয়াছে এবং লিখিয়াছে যে আজিকার এই অবাধ্যতা তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষ অবাধ্যতা হইবে এবং যদি তাহার পিতা তাহাকে ক্ষমা করেন তাহা হইলে অবিলম্বে জীবন পিতৃসেবা ও বাধ্যতার দ্বারা পরিচালিত করিয়া অদ্যকার এই অন্যায় ও অবাধ্যতার সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

সরস্বতীর পত্রপাঠ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অতুলকৃষ্ণ চুপ করিয়া ছিলেন। পাঠ সাঙ্গ করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সরস্বতী চিঠিখানি রাখিলেন।

অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, 'গিরিশ আজ সন্ধ্যায় আসবে, আর সকালে এই পত্রখানা লিখে পাঠালে! সে এলে যে আমার মাথাকাটা যাবে! ছেলের উপর আমার এতটুকু অধিকারও নেই একথা জানা যাবার পর আমি তার মুখের পানে চাইব কি করে আমি শুধু এই তাই ভাবছি!"

স্বামী যে বন্ধুর কাছে কতখানি অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইবেন এবং তাঁহার পিতৃগর্ব্বে কতখানি আঘাত লাগিয়াছে তাহা বুঝিলেও, পুত্রের পত্রের মধ্যে কতখানি কাতরতা ও দুঃখ যে সঞ্চিত ছিল সেই কথাটিই তাঁহার বেশী করিয়া মনে হইতেছিল। ইহার পরে সে আরও কি করিয়া বসে এবং পিতাপুত্রের বিরোধ কোথায় গিয়া দাঁড়ায় ইহা ভাবিয়া তাঁহাদের দেহ অবশ হইয়া আসিতেছিল।

সরস্বতী পুত্রকে পিতৃস্নেহে ও নিরাপদে গৃহে ফিরাইয়া আনার জন্য শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "অশোক আমার যাহোক ছেলেমানুষ, ঝোঁকের বশে তোমাকে এই চিঠিখানা লিখে ফেলে হয়ত শেষে আপশোষ করছে! কল্‌কাতা তো বেশী দূর পথ নয়, তুমি চট করে একবার তার কাছে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তাতে তার লজ্জাও ভাঙ্গবে, আর তোমাকে দেখলে মনের ঝোঁকটাও কমে আসবে। তুমি তাই যাও।"

বলিয়া সরস্বতী অত্যন্ত মিনতি পূর্ণ মুখে স্বামীর পানে চাহিলেন।

কথাটা অতুলকৃষ্ণের সঙ্গত বলিয়া মনে লাগিল। তিনি আর বেশী কিছু না বলিয়া কলিকাতা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন। মিনিট কয়েক পরে সজ্জিত হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন, "গিরিশকে আমি টেলিগ্রাম করে আজ আসতে বারণ করছি। যদি দৈবাৎ সে আজ এসে পড়ে, তাকে বলো সে যেন আমার জন্যে সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে।"

ডাকঘরে প্রথমে অতুলকৃষ্ণ গিরিশকে টেলিগ্রাম করিলেন—"অশোক অনুপস্থিত আশীর্ব্বাদ আজ স্থগিত রাখ। পরে সংবাদ দিতেছি!" ইহার পর ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিলেন।

স্বামীর যাত্রার পর হইতে সরস্বতী মনে মনে দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, স্বামীর সহিত পুত্র যেন অবিলম্বে ফিরিয়া আসে। কিন্তু মনের ভিতর হইতে একটা যেন আশঙ্কার ঢেউ উঠিতে লাগিল। একটা দারুণ অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার অন্তরাত্মা বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যার ট্রেণে অতুলকৃষ্ণ একা বাড়ী ফিরিলেন। বাহির হইতে গিরিশ আসে নাই খবর পাইয়া একটু যেন আশ্বস্ত হইলেন।

বাড়ীর ভিতর তাঁহাকে একা প্রবেশ করিতে দেখিয়া সরস্বতী দেবী ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশোক এল না?"

গম্ভীর মুখে স্ত্রীর পানে চাহিয়া অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "না। তার চাকরের মুখে শুনে এলাম সে তোমাদের সেই অনুপ্রভার কাছে ভাগলপুরে গিয়েছে।" অনুপ্রভা নামটা তিক্ত ঔষধ সেবনের মত করিয়া তিনি উচ্চারণ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আশ্রয় সন্ধানে

অশোক যেদিন অনুপ্রভাকে নিজের গৃহ হইতে পিত্রালয়ে পৌছাইয়া দিতে গিয়াছিল, সেইদিন তাহার ভারাক্রান্ত দুঃখকাতর হৃদয়ের মধ্যে এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, অনুপ্রভা তাহারই সঙ্গে যাইতেছে আর কাহারও সঙ্গে নহ। সে জন্য যখন সোনার গাঁ ষ্টেশন হইতে উভয়ে গরুর গাড়ীতে উঠিয়াছিল, তাহাদের দুইজনের মধ্যে কাহারও মনে পরস্পরের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইবার নিশ্চিন্ত আশঙ্কাটা তেমন করিয়া প্রবল হইতে পারে নাই। চৌবাড়িয়া গ্রামে যাইয়া খোঁজ করিয়া যখন বিরল বসতি গ্রামের মধ্যভাগে হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, পথে লোকজন বড় একটা ছিল না বলিলেই হয়। যাহারা ছিল তাহারা গ্রামান্তরের লোক। গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া অশোক গাড়া হইতে নামিয়া পথের নিকট দুই এক ঘর গৃহস্থের নিকট হইতে সন্ধান জানিয়া যথাস্থানে আসিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর অনুপ্রভার শোকাতুরা মাতা যেদিন অবজ্ঞা ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাহাকে লইয়া পিতার নিকট যাত্রা করিয়াছিলেন, সেদিনকার সেই আর এক অন্ধকার সমাচ্ছন্ন সন্ধ্যার কথা মনে পড়ায় তাহার চক্ষু বার বার সজল হইয়া উঠিতেছিল। গাড়ী হইতে অনুপ্রভাকে নামাইয়া লইয়া অশোক বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া বাঁড়ুয্যে মশায় বাঁড়ুয্যে মশায় করিয়া ডাকিয়া ক্ষুদ্র গ্রামখান প্রায় মাথায় করিবার উদ্যোগ করিবার পর, একটি বারোবছরের মেয়ে ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা? কে ডাকছ?"

অশোক এইবার একটু ভরসা পাইয়া বলিল, "আমরা হরধাম থেকে আসছি! আমার সঙ্গে হরেন বাবুর ভাইঝি অনুপ্রভা আছে।"

"অনু দিদি এসেছে? ওমা শীগ্গির ওঠ, অনুদিদি এসেছে" বলিয়া বালিকা সহর্ষে একেবারে দুয়ারের নিকট আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে কে একজন সরোষে বলিয়া উঠিল, "হ্যালা ইন্দি, জিজ্ঞাসাবাদ নেই দরজা খুলে দিলি যে?"

ততক্ষণ বালিকা দূর হইতে অনুপ্রভার মূর্ত্তি দেখিবা মাত্র একবার ডাকিল, "অনুদিদি ভাই" এবং অনুপ্রভার নিকট হইতে "ইন্দুভাই," বলিয়া উত্তর আসিতেই ছুটিয়া গিয়া সানন্দে অনুপ্রভার হাত ধরিল এবং সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

সূচনায় এতখানি সস্নেহ অভ্যর্থনা শুনিয়া, অনুপ্রভা এখানে কত সুখে থাকিবে তাহার একটা কঠোর কল্পনা অশোকের মনকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিল এবং নিজের জন্য ইহার চেয়ে অনেক কটু কথায় অভ্যর্থনার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া রহিল। মিনিট পনেরো দরজার বাহিরে অপেক্ষা করিবার পর বাহিরের ঘরটা খুলিয়া সেই বারোবছরের মেয়েটি একটি লণ্ঠন হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "আপনি আসুন, এই ঘরে এসে বসুন।"

অশোক দুয়ার খোলা পাইয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল। জুতাযোড়াটা খুলিয়া সম্মুখে যে চৌকিখানা ছিল তাহার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

শরীর ও মন দুইটাই অশোকের সত্যই তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খানিকটা সেই অবস্থায় শয়নের পর সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ঘণ্টাখানেক পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নিম্নের কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে সে নেত্রোন্মীলন করিল।

"হাঁলা অনি, তা মাসীকে পেটে পুরে নিশ্চিন্দি হয়ে এখন বুঝি আমার কাঁধে এলি ? সে হবে না বাছা, ১৭ বছরের ধাড়ী আইবুড়ো মাগী রাখবার ক্ষেমতা আমার নেই। এসেছ, আপনার লোক,খাও দাও, রাত্তিরটা থাক। সকালে উঠে যার সঙ্গে এসেছ তার সঙ্গে ফিরে যাও।"

"হাঁমা তোমার কি আক্কেল ? কদ্দিন পরে অনুদি এল, আর ঐ রকম ঠোকর মারা কথা বলে তাকে কাঁদাতে থাকলে !"

"তুই চুপ করে থাক্ ত ইন্দি ! ছেলেমুখে বুড়ো কথা আমি সইতে পারিনে। তুই আসিস্ আমাকে রীতনীত শেখাতে ! তোর বাবা আমার কাছে রীতনীত শেখে তা জানিস্ ?"

"ছাই শেখেন তোমার কাছে। তোমার জিভের যে বিষ, তাই বাবা কিছু বলেন না।"

"আমার জিভে বিষ, তোর বাবার জিভে বুঝি মধুভরা ? পোড়ারমুখো মিন্‌সে আমায় সাতকাল জ্বালিয়ে খেলে।"

"কেন তুমি বাবাকে মিছেমিছি গাল দেবে ? বাবা তোমার কি করেছেন ?"

তার পর কিয়ৎক্ষণের জন্য একটা ক্রন্দনের শব্দে প্রথম উত্থাপিত প্রশ্নটি হারাইয়া গেল।

কি আরামে অনুপ্রভা এখানে থাকিবে অশোক তাহা মনে মনে বেশ ভাল রকমই কল্পনা করিয়া লইতেছে, এমন সময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অনুপ্রভা একটা রেকাবি হাতে লইয়া সেই ঘরের মধ্যে আসিল। অশোক চক্ষু মুদিয়া যেমন পড়িয়াছিল তেমনি রহিল। অশোক আগেকার লজ্জাজনক কথাবার্ত্তাগুলি শুনিতে পায় নাই ভাবিয়া অনুপ্রভা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

অশোক ইচ্ছা করিয়া নিদ্রার ভান করিয়াছিল, তাই গোটাদুই ডাক শুনিবার পর সে সাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। অনুপ্রভা রেকাবীতে করিয়া যে খাবার আনিয়াছিল তাহা লজ্জিত মুখে রাখিয়া বলিল, "বারান্দায় পা ধোবার জল রেখেছি। হাত পা ধুয়ে এই মিষ্টিটুক মুখে দিয়ে একটু জল খাও।"

অনুপ্রভার লজ্জার কারণ যে তাহার আনীত জলখাবারের মধ্যে জল পুরাপুরি এক গেলাস থাকিলেও, খাদ্য দ্রব্যটুকু ছোট পাত্রখানির দশমাংশের একাংশ মাত্র পূর্ণ করিতেও সমর্থ হয় নাই। আর ৭।৮ ঘণ্টা খাদ্যাভাবের পর সামান্য একটু নারকেল কোড়া ও দুখানি বাতাসা!

অশোক হাত মুখ ধুইয়া সেই খাদ্যটুকুর কণামাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া উদরস্থ করিল এবং পরিপূর্ণ একপাত্র জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। তাহার পর পকেট হইতে রুমাল খানি বাহির করিয়া হাত মুখ মুছিয়া অনুপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাকাকে ত দেখলাম না। তিনি কোথায় ?"

অনুপ্রভা নতমুখে বলিল, "তিনি একটু রাতে প্রায় ১২টায় ফেরেন।"

"অত রাত্রে !" বলিয়া একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া অশোক চুপ করিল।

অনুপ্রভা একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "আপনার ত বড্ড কষ্ট হবে। কাকা এলে তবে রান্না চড়ান হবে।"

কথাটা বিলক্ষণ নূতন বটে। কিন্তু সেদিকটা বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া অশোক বলিল, "তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে আর একা রেখে যেতে যা কষ্ট হচ্ছে, তার চেয়ে এতে ঢের কম কষ্ট হবে অনু ! সে কষ্টটা যখন তুমি দেখলে না, এর জন্য আর দুঃখ করা কেন ?"

অনুপ্রভা একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া আপনাকে সম্বরণ করিতে লাগিল। তাহার বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল—আমি ত তোমার কাছে চিরদিন থাকব বলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু ভগবান থাকতে দিলেন না তাতে আমি কি করবো!

একটু পরে অনুপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাল কখন যাবেন তা হলে ?"

অশোক ধীরে ধীরে বলিল, "কাল সকালে একটা ট্রেণ আছে কলকাতায় যাবার, তাতেই যাব।"

এমন সময় খুব রুক্ষস্বরে ভিতর হইতে শুনা গেল—"সকালে খেতে দিতে হয় অন্নিকে ডাক্। ডেকে ভাত

বাড়তে বল। ধেড়ে মাগীর বুঝি এখন ছোঁড়াটির সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়া হয়েছে।"

অনুপ্রভার মুখ হইতে কাণ পর্য্যন্ত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল এবং লজ্জা ঢাকিবার জন্য সে অশোকের পানে চোখ না তুলিয়াই মুখ নীচু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অশোক স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সত্য সত্যই রাত্রি ১২টার সময়ে অনুপ্রভার কাকা ইন্দু বলিয়া ডাক দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

তিনি আসিবার পর আহারাদি হইল, তাহাতে রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল।

শয়নের পূর্ব্বে হরেন্দ্র যাহা বলিয়া গেলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"আজকাল দিনকাল বড়ই খারাপ পড়িয়াছে এবং সেই জন্য দিন দিন পিতাও কন্যাকে মানুষ করিতে কাতর হইয়া পড়িতেছেন, এবং মানুষ করা ব্যাপারটা তবু কতকটা চেষ্টা করিলে সম্ভব কিন্তু, কন্যার বিবাহ দেওয়া ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

তখন অশোক অনুপ্রভার ভার তাঁহাদের কতখানি লইতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিল।

হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে প্রায় সকলেরই বেলাতে উঠা অভ্যাস কারণ রাত্রি ১টার সময় আহারাদি করিয়া শয়ন করিলে উঠিতে একটু বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক। সকালে উঠিয়া আগেই অনুপ্রভা আসিয়া অশোকের সম্মুখে ধীরে ধীরে দাঁড়াইতেই অশোকে চিত্ত বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। অশোক চাহিয়া দেখিল অনুপ্রভার মুখ চোখ ঈষৎ স্ফীত ও জলসিক্ত।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখবিসুখ হয়েছে অনু?"

অনুপ্রভা অতি কাতরকণ্ঠে উত্তর দিল, "না।" তার পর দুজনেই খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অশোক প্রথমে কথা কহিল—"আমাকে কলকাতার ঠিকানায় পত্র দিও। কোন অসুবিধা হবামাত্র আমাকে জানিও। বল জানাবে?"

অনুপ্রভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে জানাইবে। তখন তাহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছিল।

অশোকের চক্ষু সিক্ত হইয়াছিল। একবার মনে হইল সে অনুপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করে কেন বা সে তাহাদের বাড়ী হইতে এমন নির্ম্মমভাবে চলিয়া আসিল। আবার ভাবিল, যদি এখনও অনুপ্রভা যাইতে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে এখনও সে তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যায়। এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি তাহার এখানে অনুপ্রভাকে রাখিয়া যাইতে কিছুতেই মন সরিতেছিল না। কিন্তু যে কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার উৎকণ্ঠা ও মনোভাব স্রোতের টানের মত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বলিতে লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। তাহার পরিবর্ত্তে অশোক বলিল, "তোমার যখনই যাবার ইচ্ছা হবে আমাকে লিখো, আমি তখনি তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাব।"

অনুপ্রভা আপনাকে আর দমন করিতে না পারিয়া, উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ সম্বরণ করিতে মুখে অঞ্চল প্রান্ত দিয়া ভিতরের দিক চলিয়া গেল।

ইহার খানিক পরে হরেন্দ্র বাবু বাহিরে আসিলেন। অশোক তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে অনুপ্রভার জন্য মাসিক খরচ সে নিয়মিতভাবে পাঠাইবে এবং অনুপ্রভার বিবাহের জন্য তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত হইতে নিষেধ করিয়া বলিল, "অনুপ্রভা যাহাতে সৎপাত্রে পড়ে তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা তাহার মা করিবেন এবং দরকার হইলে সে সুপাত্র আনিয়া উপস্থিত করিবে।

ইহার কিছু পরে অন্যের অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিয়া অশোক সেস্থান ত্যাগ করিল। অনুপ্রভা তখন বাড়ীর ভিতর একা একটা ভাঙ্গা ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন ভাব।

কলিকাতায় ফিরিবার পথে অনুপ্রভার অশ্রুসিক্ত মুখখানি অশোকের মনে সকণ্টক ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়া সেখানটিকে সুরভিত ও রক্তাক্ত করিয়া তুলিতেছিল। কলিকাতায় আসিয়া তাহার দুটি চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল এবং প্রিয়জনের অন্তর কাঁদিলে আপনার অন্তরে যে ক্রন্দন প্রতিধ্বনির মত জাগিয়া উঠে, সেইরূপ একটা অতি করুণ ক্রন্দন তাহার অন্তরের মধ্যে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। সে এই প্রথম স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল, সে যে অনুপ্রভাকে নিজেই গ্রহণ করিতে যাইতেছিল সে শুধু জেঠিমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য নহে। অনেকখানি প্রাণের টানও ইহার মধ্যে ছিল এবং সে টানটা যে কতখানি তাহা অনুপ্রভাকে ছাড়িয়া আসিয়া যেমন ভাবে অনুভব করিল এমন ভাবে আর কোনদিন করে নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত কায সমস্ত চিন্তার মধ্যে অনুপ্রভার চিন্তা অচল ও অটল হইয়া রহিল। যে খুড়িমার স্নেহনীড়ের মধ্যে সে আশ্রয় লইতে গিয়াছে, তাঁহার স্নেহহীন কঠোর স্বর তো সে বেশ করিয়াই শুনিয়া আসিয়াছে। পিতৃমাতৃহীনা শেষ-আশ্রয়চ্যুতা অভাগিনী নারীর সেখানে তো কোন সান্ত্বনা মিলিবে না। কোথায় সে যাইবে, কাহার পানে সে ভরসার জন্য চাহিবে? সেই স্নেহহীন নীড়ের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ধীরে ধীরে নামিয়া আসিবে, তখন তাহার ভারাক্রান্ত হৃদয় কাহারও সস্নেহ কথায় তো লঘু হইয়া উঠিবে না—কাহারও মুখের হাসির আলোক-রেখায় আঁধার হৃদয়ে দীপ জ্বলিবে না।

আজ অশোকের বেশী করিয়া মনে হইল যে সে তো অনুপ্রভাকে সেখানে রাখিবার জন্য তেমন করিয়া চেষ্টা করে নাই। সে যদি অনুপ্রভাকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, কিংবা অন্ততঃ তাহার বিবাহের সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি বা অনিচ্ছা পোষণ করিত, তাহা হইলে হয়ত অনুপ্রভা আসিতে চাহিত না। কিন্তু পিতার প্রতিকূলে দাঁড়ানও যে তাহার পক্ষে এখন অকর্ত্তব্য হইত। ভগবান্ তাহার শান্তিময় জীবনে এ কি অশান্তির ঢেউ সৃষ্টি করিলেন!

কিন্তু আজ অশোক ভাল করিয়া অনুভব করিল, তাহার পক্ষে এখন অনুপ্রভা ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করা সম্ভব নহে।

অনুপ্রভা তাহাকে ভালবাসে এবং তাহাকে পাইবে না এই অভিমানে সে অনেক দুঃখ সহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া এখান হইতে চলিয়া গেল, এই অনুভূতি, এবং পরিশেষে অনুপ্রভার অদর্শন তাহার অনুরাগকে প্রণয়ে সমৃদ্ধ ও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল।

দুই দিন পরে অশোক পিতাকে সমস্ত বুঝাইয়া পত্র লিখিল এবং আপনি গিয়া ডাকে দিয়া আসিল। সমস্ত রাত্রি সে তাহার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য ও অনুপ্রভার প্রতি কর্ত্তব্য এ দুইয়ের মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য-বিধান করিতে না পারিয়া, সমস্তরাত্রি অনিদ্রায় কাটাইল। রাত্রের অন্ধকারের মোহময়তা কাটিয়া গিয়া যখন প্রভাতের সত্যকার স্পর্শ ও আলোক জাগিয়া উঠিল, তখন অশোক ভাবিল পিতার নিকট এতক্ষণ সে পত্র পৌছিয়াছে এবং তিনি সে পত্র পাইয়া কি ভাবিতেছেন! তাঁহার বন্ধুর নিকট কতখানি লজ্জিত ও অপদস্থ হইতেছেন তাহা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। একবার মনে করিল বুঝি সে পত্রখানা না লিখিলেই ভাল হইত। কিন্তু নিক্ষিপ্ত তীর ও কথিত বাক্যের মত, প্রেরিত পত্রকেও তো আর ফিরাইবার উপায় নাই।

অশোক আরও ভাবিয়া দেখিল যে হয় পিতৃ-নির্ব্বাচিতা পাত্রীকে বিবাহ করা, না হয় তাহাতে অস্বীকৃত হওয়া এ দুটির মাঝামাঝি তো আর পথ ছিল না।

অশোক এই সব দুশ্চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় পিওন আসিয়া দুইখানা খামের পত্র দিয়া গেল।

একখানিতে অনুপ্রভার হাতের লেখা। তাহার লেখা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পত্রখানি খুলিয়া অশোক পড়িল—

শ্রীচরণেষু—

আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আপনি দয়া করিয়া না আসিলে আমার আর উপায় নাই।

হতভাগিনী অনুপ্রভা।

অপর পত্রখানি হরেন্দ্র বাবুর লেখা। তিনি লিখিয়াছেন—

আশীর্ব্বাদরাশয়সন্তু

পরে অশোক ঈশ্বরের স্থানে নিয়ত তোমার মঙ্গল কামনা করিতেছি। তুমি যাইবার পরে আর কোন সংবাদ না পাইয়া ভাবিত আছি।

অনুপ্রভা এখানে পিতামাতার কাছেই আছে মনে করিও। তাহার জন্য চিন্তা করিও না ও তোমার পিতামাতাকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিও। সম্প্রতি তাহার জন্য একটি সুযোগ্য পাত্র অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছি। কারণ অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ঘরে রাখিয়া আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অথচ ঘরের মেয়ে তাহাকে অন্যত্র দিবার উপায় নাই। তবে ঈশ্বরেচ্ছায় পাত্রীর তুলনায় পাত্র মিলিয়াছে খুবই ভাল। এখন বিবাহটা হইয়া গেলে আমি নিশ্চিন্ত হই। পাত্রের বয়স এখনও ৪০ হয় নাই, স্বাস্থ্য ভাল। বংশও উত্তম। আহারের সংস্থান বিলক্ষণই আছে। পাত্রটিকে অল্পেই স্বীকৃত করানো গিয়াছে। পাত্রপক্ষকে দিতে হইবে দুই হাজার টাকা, আর এখানকার খরচ সকল সংক্ষেপেই করা হইবে। পাঁচশত টাকা হইলেই চলিবে।

সর্ব্বসমেত এই আড়াই হাজার টাকার তুমি ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইবে। তুমি বলিয়া গিয়াছিলে যে টাকার জন্য আটকাইবে না। কিন্তু তা বলিয়া কি একেবারে তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারি? বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি আগামী বৃহস্পতিবার। তোমার এখন পড়িবার সময়, সেজন্য তোমাকে পুনরায় আসিতে অনুরোধ করি না, তবে যদি আস বড়ই সুখী হইব। না আসিতে পারিলে ব্যস্ত হইও না, আমি সব যোগাড় করিয়া লইব। তবে তুমি টাকাটা পত্রপাঠ পাঠাইবে, নহিলে কার্য্যের কোন যোগাযোগ হইবে না। টেলিগ্রাফে নাকি টাকা পাঠানো যায় শুনিয়াছি, তাহাই পাঠাও। তাহা হইলে দেরী হইবে না। এখানকার কুশল জানিও, তোমাদের কুশল দিও।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ (চট্টোপাধ্যায়)

এই পত্র পাইয়া, সকালের ট্রেণেই অশোক চৌবেড়িয়া যাত্রা করিয়াছিল। এবং অতুলকৃষ্ণ সেইদিনই অপাহ্নের ট্রেণে কলিকাতায় আসিয়া, পুত্রের চৌবেড়িয়া যাত্রার কথা বাসার ঝি ও বামুনের নিকটই জানিয়া গিয়াছিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রৌঢ়ের মনস্তত্ত্ব।

অতুলকৃষ্ণ পরদিন অপরাহ্নে কোন সংবাদ না দিয়াই সোণাপুর ষ্টেশনে নামিয়া একেবারে পাণিহাটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গিরিশ ব্যস্তভাবে আসিয়া বন্ধুকে হাতে ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি অতুল? এ যে মেঘ না চাইতেই জল!"

অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "যে কথাটা তোমাকে বল্‌তে এলাম, তা বল্‌তে আমার মাথা কাথা কাটা যাচ্ছে। তখন খুব দর্প করেই বলেছিলাম যে তোমার ও আমার দুজনের যখন মত, তখন বিবাহ তো হয়েই গিয়েছে। কিন্তু দর্পহারী তো কারু দর্প কখনও রাখেন না, তাই আমার সে দর্প সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ হয়েছে।"

বলিয়া অতুলকৃষ্ণ গভীর ক্ষোভের সহিত, আশীর্ব্বাদে সেদিন কেন বাধা ঘটিল সে সব কথা সবিস্তারে বন্ধুকে বলিলেন।

অতুলকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর, মুখভাব ও ভাষাতে তাঁহার অনুভূত লজ্জা ও মনোভঙ্গ পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

একটু স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় অতুলকৃষ্ণ বলিলেন,

"দেখ গিরিশ, সমস্ত ছোট বড় কাযের মধ্যে প্রায় সবটাই যে ভগবানের হাত, আমার সেই ছেলেবেলাকার বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্চে। এমন সব ঘটনা ঘটে, যার কোনও আশঙ্কাও কখনও মনে হয় নি। নইলে কে ভেবে-ছিল যে অশোক শেষটা আমাকে লিখ্‌বে যে আপাততঃ ঐখানে বিবাহ তাহার পক্ষে অসম্ভব এবং সে প্রকারান্তরে অমুক দুর্ভাগা মেয়েকে বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞা করেছে। তুমি তো বরাবরই নিজের চেষ্টার খুব প্রশংসা করে আস্‌ছ। কিন্তু বল দেখি এ ক্ষেত্রে কোন খানটায় আমি নিজে চেষ্টা করি?"

গিরিশ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয় এখন সব চেয়ে ভাল চেষ্টা হবে, বিশেষ কোন চেষ্টা না করা। দিনকতক ধীরভাবে অপেক্ষা করে দেখ্‌তে হবে, তার মনের গতি আপনা থেকে পরিবর্ত্তিত হয় কি না। কোনরূপে বাধ্য করার চেষ্টাতে তার সঙ্কোচ আরো বেড়ে যাবে। আমাদের দুজনেরই এটা ভাল মনে হচ্চে না যে এতদিনকার একটা পোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যাচ্ছে। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ্‌লে এটা বল্‌তেই হবে যে, এতে তার খুব দোষ নেই দুটি কারণে—প্রথম তাকে কোনদিনই তৈরি করে রাখনি; দ্বিতীয় সে তো একটা মানুষ, একটা কল তো নয় যে তার কোন স্বাধীন ইচ্ছা থাক্‌বে না। এক্ষেত্রে তার কথায় তোমার অত বেশী ক্ষোভ করা উচিত হবে না।"

অতুলকৃষ্ণের ক্ষোভ কিন্তু দূর হইল না। একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোমার কথাটা একটু বেশী দার্শনিক গোছের হয়ে পড়ল। বুকের সমস্ত স্নেহ দিয়ে তাকে মানুষ করলাম, তার উপর কত আশা ভরসা রাখলাম, একটা সামান্য ঘটনায় সে বিপরীত পথে চলে গেল—এটা আমি কোন মতেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারিনে।"

তারপর দুইজনে অনেক কথাই হইল। গিরিশের কন্যার নাম সতী। সে পিতার আজ্ঞায় আসিয়া অতুল-কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল। অতুলকৃষ্ণ মুগ্ধচিত্তে দেখিলেন মেয়েটির মুখখানি একেবারে দেবীপ্রতিমার মত। তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার কার্য্য-কুশলতা, তাহার লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়া অতুলকৃষ্ণের মনঃক্ষোভ আরও বাড়িল যে এমন মেয়েটিকে তিনি পুত্রবধূ করিতে পারিলেন না!

সন্ধ্যার পর জলযোগান্তে দুইজনে মিলিয়া গঙ্গার ঘাটেই গিয়া বসিলেন। সেদিন শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী। জ্যোৎস্নায় গঙ্গাবক্ষ, তটভূমি, নিকটস্থ শিবমন্দির সকলই যেন জলে পদ্মের মত শোভা পাইতেছিল।

গিরিশ বলিলেন, "দেখ অতুল, সময়ের সঙ্গে অবস্থার কি পরিবর্ত্তনই হয়ে যায়। আজ যদি আমরা আগেকার মত দুজনে গলা ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে এখানে বেড়াই, লোকে কি বল্‌বে জান?"

অতুলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "পাগল।"

গিরিশ বলিলেন, "পাগল বল্‌বে, কেন না আমাদের বয়স হয়েছে। অথচ দেখ, মনের মধ্যেটা তো প্রায় তেমনই নবীন আছে। জ্যোৎস্নায় বেড়াতে প্রাণের মধ্যে এখনও তো এই গঙ্গার ঢেউয়ের মতই ঢেউ খেলে যায়। পুরাণো বন্ধু দেখ্‌লে এখনও মনে হয় যে তাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করি। কিন্তু তা করতে দেখলে লোকে বল্‌বে দেখ, বুড়োর একবার কাণ্ডখানা দেখ! অতীত-যৌবনেরা যে যুবকের মত আনন্দ করবে তা যুবকেরা কিছুতেই পছন্দ কর্‌বে না। তারা ভাবে আমরা যৌবনের রাজ্য পার হয়ে এসেছি, আর তার দিকে আমা-দিগের যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা।"

তারপর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, আরও গল্পে ও নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল।

ইহার পরদিনও অতুলকৃষ্ণকে সেখানে থাকিতে হইল। নানা আনন্দের মধ্যে দুইটি প্রৌঢ় বন্ধুর দুটি দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনে অতুলকৃষ্ণ বিদায় লইলেন।

গিরিশ বলিয়া দিলেন, "যদি বিবাহ না হয়, তাহলে তুমি ক্ষুব্ধ হোয়ো না, বা রাগ কোরো না। আমাদের যে সম্বন্ধটি আছে সেটা তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না!"

অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি আজও কল্‌কাতা হয়ে বাড়ী ফির্‌বো। যদি নেহাত অদৃষ্টক্রমে নিজের ছেলের বিবাহে নিজের কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তোমার এই মেয়েটার বিবাহের ভার আমার উপর দিতে হবে। আমি আমার পছন্দমত পাত্রে এর বিবাহ দেবো।"

সেই দিনই অতুলকৃষ্ণ কলিকাতা হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। অশোক তখনও ফিরে নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

শক্তির উদ্‌বোধন

"প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালার ভাবধারার সম্বন্ধ" স্থির রাখিবার অভিপ্রায়ে আজ সমগ্র উত্তর ভারতের প্রতিনিধিবর্গ এই পরম পবিত্র কাশীধামে সম্মিলিত হইয়াছেন। জগতের সর্ব্বত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ অদ্বিতীয় বাঙ্গালী কবি এই সম্মিলনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধের আবশ্যকতা এবং যে দুই পক্ষের মধ্যে এই সম্বন্ধ স্থির হইতেছে তাহাদের পরস্পরের ইচ্ছা অনিচ্ছা, লাভালাভ ও হিতাহিত প্রভৃতি আলোচনার অযোগ্য নহে। যে সকল কারণে বাঙ্গালী বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া বিদেশে বাস করিতেছে তাহার বিস্তারিত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আলোচনা করা আবশ্যক। বাঙ্গালা পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ। বাঙ্গালী মিশ্রিত জাতি। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যেও মৌলিক আর্য্যত্ব প্রমাণ করা শক্ত। বৌদ্ধাদি অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্লাবনও বাঙ্গালা দেশেই আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ এই সকল কারণে বাঙ্গালাদেশে বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোনও পুণ্যক্ষেত্র দেখা যায় না। গয়া কাশী প্রভৃতি যে সকল পুণ্যক্ষেত্র হিন্দুদের মধ্যে মোক্ষদায়িকা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সে সব বাঙ্গালার বাহিরে। উত্তরভারতে বাঙ্গালী মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে মোক্ষলাভের জন্যই আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল এই কথা বলা অনৈতিহাসিক হইবে না। যাহারা ধর্ম্মের জন্য, মোক্ষলাভের জন্য, সমাজের মায়া কাটাইয়া দেশ-ত্যাগ করে, তাহাদের পক্ষে পরিত্যক্ত দেশের সহিত ভাবধারায় সম্বন্ধ স্থির রাখা কি পরিমাণে সম্ভব ও স্বাভাবিক তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত।

বাঙ্গালী বিজয় সেন লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার প্রতাপাদিত্য বীরপুরুষ ছিলেন, এরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু বাঙ্গালী যুদ্ধ করিয়া বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে নিজের দেশ কখনও ত্যাগ করিয়াছে এরূপ প্রমাণ নাই। অন্ততঃ এই উত্তর ভারতে বাঙ্গালী কোন হিন্দু বা মুসলমানকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কখনও করে নাই ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর বিজেতাদের পক্ষে পরিত্যক্ত দেশের সহিত সম্বন্ধ প্রায়ই স্থির থাকিয়া যায়। ভারতবর্ষীয় পাঠানেরা কাবুল প্রভৃতির সহিত ভাবধারার সম্বন্ধ কখনও ছিন্ন করিতে পারে নাই। মোগলদের কথা একটু স্বতন্ত্র। যাহারা ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু পরিত্যক্ত দেশের সহিত ভাবধারার সম্বন্ধ না থাকিলেও মোগলের মোগলত্ব কখনও নষ্ট হয় নাই; মোগল চিরদিন মোগলই রহিয়াছে। আর্য্যেরা এই শ্রেণীর জিগীষু ভ্রমণশীল লোক ছিল। ভারত যখন তদানীন্তন অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করে, পরিত্যক্ত দেশের সহিত তাহাদের সকল প্রকারের সম্বন্ধই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল সত্য; কিন্তু তখনও তাহাদের ভাবধারা অন্তর্মুখী হয় নাই,

আর্য্যের ভাবলহরী বেদেই বিদ্যমান। যে দেশে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি সে দেশ হইতেই আর্য্যেরা আসিয়াছিল ইতিহাস এইকথা স্বীকার করিয়াছে। উষা প্রভৃতির বর্ণনেই ঋগ্‌বেদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে এরূপ সুদীর্ঘ সুললিত উষা দেখা যায় না। আর্য্যেরা এই ভাব পরিত্যক্ত দেশ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল। ইংরেজজাতি পৃথিবীর অনেক স্থল জয় করিয়াছে, অনেক দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। রাজ্যশাসন, ধর্ম্মপ্রচার ও বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ইংরেজ ছাড়া পাশ্চাত্য আরও অনেক দেশের লোক বিদেশে বাস করিতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কখনও নিজের জাতীয়ত্ব ত্যাগ করে নাই ; পরিত্যক্ত দেশের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অক্ষুন্ন রহিয়াছে।

বাণিজ্য বলিতে যাহা বুঝায় সেই উপলক্ষ্যেও বাঙ্গালী উত্তর ভারতে প্রবাস করিতে আসে নাই। ওকালতি ও ডাক্তারি ব্যবসায় উপলক্ষ্যে কেহ কেহ এই প্রদেশে বাস করিতেন তাহাও সত্য। প্রধানতঃ চাকরিই বাঙ্গালীকে এই দেশে আকৃষ্ট করিয়াছে। চাকরির অবশ্য নানা বিভাগ রহিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা গৌরবেরই বিষয় যে সরকারি চাকরির সকল স্তরেই বাঙ্গালীকে দেখা যায়—জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্, ডিপুটি, মুনসেফ্ এঞ্জিনিয়র, পুলিসের কর্ম্মচারী, শিক্ষক ও কেরাণী। কেরাণীর ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, দুঃখের সহিত এই কথা স্বীকার করিতে হইবে। অল্পসংখ্যক ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী সকলের শেষে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই উত্তর ভারত প্রাচীন মধ্যদেশ; আর্য্যদের সভ্যতাবিস্তারের কেন্দ্রস্থল। বিদেশীর আক্রমণ এই হতভাগ্য দেশকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। অবশ্য-ম্ভাবী ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, এই প্রদেশের শাসন ও শোষণের উপযোগী সমস্ত উচ্চ পদেই হয় কাশ্মীরি, নয় বাঙ্গালী, নয় মাদ্রাজী, নয় বা মালব ও বিহার প্রভৃতি বিদেশের লোক। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিজের পরিত্যক্ত দেশের কথা সর্ব্বতোভাবে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক উত্তর ভারতীয় উচ্চপদস্থ হিন্দু বলিতে হয় কাশ্মীরী নয় মালব প্রভৃতি বিদেশের লোকই বুঝিতে হইবে। এই উত্তর ভারত এক্ষণে ইহাদের স্বদেশ। ইহাদেরই অশন বসন, আচার ব্যবহার, ভাব ও ভাষা উত্তর ভারতের হিন্দুদের পরিচায়ক। এই ভাবে যাহারা পরিত্যক্ত দেশের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে, মূলতঃ বিদেশী হইলেও তাহারা এই দেশের অর্থ স্থানান্তরিত করে না। এই দেশের মঙ্গলামঙ্গলের উপর ইহাদের নিজেদের শুভাশুভও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।

তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত এই দেশেই বাস করিতেছে এরূপ বাঙ্গালী উত্তর ভারতে অনেক আছে। কিন্তু তাহারাও এ পর্য্যন্ত আদান প্রদান বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ মৎস্যাশী বাঙ্গালীকে এই প্রদেশের নিরামিষাশী হিন্দু মৌলিক আর্য্য বলিয়া স্বীকার করে নাই। দ্বিতীয় কারণ সম্ভবতঃ ভাষার বিভিন্নতা, শিক্ষার অভাব, এবং বাঙ্গালাদেশের উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল উৎকর্ষ। রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং বিচারবিভাগে ও শিক্ষাপ্রচারে বাঙ্গালাদেশ যদি উত্তরভারত অপেক্ষা এতটা উন্নতিলাভ না করিত, তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশের প্রতি প্রবাসী বাঙ্গালীর এতটা আকর্ষণ থাকিত কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রবাসী বাঙ্গালী বা বাঙ্গালাদেশ কোন চেষ্টা করে নাই। ইহা একটা দৈবঘটনারই ফল। যে সকল কারণে প্রবাসী বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নাই, তাহা বিনা চেষ্টায় আরও কতকাল জীবিত থাকিতে পারে তাহাই এক্ষণে ভাবিবার বিষয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞানের প্রচার এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে অবাধ মেলামেশার উপর কাহারও জাতিত্ব বা ধর্ম্মভাব সম্পূর্ণ নির্ভর করে না এই প্রতীতি আধুনিক শিক্ষিত লোকমাত্রই নিজের স্বাভাবিক যুক্তি তর্কের ফলে লাভ করিয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও মুখরোচনই খাদ্যদ্রব্যের উদ্দেশ্য এবং শীতগ্রীষ্ম হইতে শরীররক্ষা ও দৈহিক সৌন্দর্য্যের পরিপোষণই পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য এই কথা এক্ষণে শিক্ষিত লোককে বুঝাইতে বিশেষ

আয়াস পাইতে হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্ব্বগ্রাহী ব্যাপকতা এবং বিজেতা ইংরেজের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিবার দুর্দ্দমনীয় লোভ বিজিত ভারতবাসীর অশন বসন বিষয়ের অভ্যাসকেও স্থল বিশেষে বদলাইয়া দিয়াছে। এই সকল কারণে উত্তর ভারতে যাহারা বাঙ্গালীকে মৎস্যাশী বলিয়া অহিন্দু মনে করিত তাহাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য মাংস আহারের উপযোগিতা বুঝিয়া তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরিচ্ছদাদি বিষয়ে বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বিনা আপত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে। এই সকল বিষয়ে কোন প্রবাসীর পক্ষেই সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। বাঙ্গলাদেশের শীতগ্রীষ্ম নিবারণের জন্য যেরূপ বস্ত্রাদির প্রয়োজন তাহা এই প্রদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

প্রবাসীর পক্ষে ভাষার বিভিন্নতা রক্ষা করিয়া চলাও সম্ভব নয়। যে প্রদেশে বাস করিতেছে সেই প্রদেশের ভাষা প্রবাসীকে শিখিতেই হইবে। রাজভাষাও বাঙ্গালীর পক্ষে বিদেশী ভাষা। যে ভাষায় ভৃত্য ও পরিচারিকাদির সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে হইবে তাহাও বিদেশী। একমাত্র নিজ পরিবারস্থ লোকদের মধ্যেই মাতৃভাষার ব্যবহার সম্ভব। প্রবাসে যাহাদের জন্ম তাহাদের পক্ষে অনেক স্থলে পরিত্যক্ত দেশের ভাষা শিখিবার প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ হয় না। যে পরিবারে মাতা পিতা উভয়েরই প্রবাসে জন্ম তাহাদের সন্তান সন্ততির মাতৃভাষা ও পরিত্যক্ত দেশের ভাষা এক হওয়া কেবলমাত্র রাজার জাতির পক্ষেই সম্ভব। রাজভাষা বিজিত লোকদিগকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিখিতে হয়। বাঙ্গালী যদি রাজা হইত তাহা হইলে প্রবাসী বাঙ্গালীর মাতৃভাষার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন চিন্তার কারণ থাকিত না। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় উর্দ্দু ও হিন্দির সহিত বাঙ্গালা ভাষাও স্থান পাইয়াছে এ কথা সত্য। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গালার যখন কোন প্রয়োজনই হইতেছে না তখন বাঙ্গালী শিশু যদি বাঙ্গালা না শিখে, তাহাকে বা তাহার পিতামাতাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। এইরূপে হিন্দি বা উর্দ্দুই ক্রমশঃ বাঙ্গালী সন্তানের মাতৃভাষা হইয়া পড়িতে পারে। ভাষার ভিতর দিয়াই লোক ভাবিতে শিখে ভাষাবিজ্ঞান তাহা প্রমাণ করিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালা ভাষা বিস্মৃত হইয়া যায় তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশের সহিত তাহাদের ভাবধারা স্থির থাকিতে পারে না।

আহার্য্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ ও ভাষা সাম্যের পর সামাজিক আচার ব্যবহার বা ধর্ম্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ই একমাত্র প্রতিবন্ধকতা যাহাতে প্রবাসী বাঙ্গালী ও এই প্রদেশের লোক পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান দ্বারা এক হইয়া যাইতে পারে নাই। ধর্ম্মের হিসাবে প্রবাসী বাঙ্গালীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু, অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম, ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালী।

মানব সমাজে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সত্যও আবির্ভূত হইয়াছিল। সভ্যতার প্রারম্ভেই চিন্তাশীল মানব বুঝিতে পারিয়াছিল যে পাশবিক শক্তিতে দুর্ব্বলতর লোককে জয় করা যাইতে পারে, কিন্তু এরূপে বিজিত লোক চিরদিন বশীভূত থাকে না। সে জন্য মধ্যযুগ হইতে আসবারী সৈন্যের পশ্চাতে পশ্চাতে কোরাণ বা বাইবেল রূপ অস্ত্র লইয়া ধর্ম্মপ্রচারক নামধারী আর এক শ্রেণীর যোদ্ধা বিজিত দেশকে আক্রমণ করিত। বিজেতার ধর্ম্মগ্রহণে বিজিতদের প্রলোভনের বিষয় অনেক থাকিত, যদিও রাজধর্ম্মাবলম্বী অনেকের ভাগ্যেই রাজশ্যালক বা রাজজামাতা হওয়া সম্ভবপর হইত না। বিজিতদের মধ্যে যাহারা পাশবিক বলে পরাজিত হইলেও আন্তরিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে জানিত তাহারা এই প্রলোভনে মুগ্ধ হইত না; অত্যাচার সহ্য করিয়াও নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিত। আর যাহাদের মধ্যে নিজত্ব বা পৈতৃক সভ্যতা বলিতে কিছু ছিল না, তাহারাই বিজেতার ধর্ম্মগ্রহণ করিত। ভারতে মুসলমান রাজত্বকালেও এই ঘটনা ঘটিয়াছিল; ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভেও তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু মুসলমান এই দেশে বাস করিবার অভিপ্রায়েই

এই দেশ জয় করিয়াছিল; পক্ষান্তরে ইংরেজ এদেশ শাসন করিবার মাত্র দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। সেই জন্য এদেশী খৃষ্টধর্মাবলম্বীর সহিত খাঁটি ইংরেজের আদান প্রদানের সম্বন্ধ কখনও স্থাপিত হইতে পারে নাই। মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিজিত ভারতবাসী মুসলমানের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছে; তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার আর উপায় নাই। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী ইংরেজের সঙ্গে সে ভাবে মিশিতে না পারিলেও, ইংরেজের অশন বসন, আচার ব্যবহার এবং ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ দাস হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ মৌলিকত্ব রক্ষার অভিপ্রায়েই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে ধর্ম্মত্যাগীকে পুনঃ গ্রহণ করিবার কোন প্রথা নাই। সে জন্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী দেশের নিকট বিনষ্ট এবং দেশের মঙ্গলামঙ্গলের পক্ষে সম্পূর্ণ উদাসীনই ছিল। তাহা হইলেও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা ধর্ম্মত্যাগীদের যে সকল ক্ষতি হইয়াছে তাহা প্রারম্ভে বুঝা যায় নাই। যে সকল সুখের লোভে বা যে সকল অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য যুবক যুবতী পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, প্রথম প্রথম তাহারা এই স্বাধীনতার সুবিধা ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয় না। তদানীন্তন ধার্ম্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে বিদেশী ও বিধর্ম্মী রাজার সাহায্যে মুক্তিলাভের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইতেছিল না। আমেরিকা আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আদিম অধিবাসীরা এই ভাবে একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে ইতিহাস-পাঠক এই কথা জানেন। ভারতবর্ষের নাগা কুকি প্রভৃতি আদিম অধিবাসীর বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা কাহারও অবিদিত নাই। খৃষ্ট ধর্ম্মের আক্রমণের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা ভাবিয়া দেশভক্ত ভারতবাসী অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিল কি কি অসুবিধার জন্য ভারতবাসী ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতেছিল। প্রধান কারণ অবশ্য ধর্ম্ম বা সামাজিক আচার ব্যবহার বিষয়ে স্বাধীনতা। পৌত্তলিকতার হিসাবে খৃষ্টধর্ম্ম সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নহে। পূর্ব্ব পুরুষের স্মৃতি রক্ষা বা মৃত পিতামাতাকে স্মরণ করার উপরেই মানবের ধর্ম্মাচরণের যে প্রারম্ভ, ধর্ম্মবিজ্ঞানে তাহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী লোক যিশু ও তাঁহার ক্রুশ বা ফাঁসি কাষ্ঠের পূজা এখনও করে; ব্যক্তি বা ভাববিশেষের স্মৃতি রক্ষার জন্য প্রস্তর ও অন্যান্য দ্রব্য-নির্ম্মিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে; কাগজে ও পটে ছবি আঁকে; এবং ফটোগ্রাফও তোলে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুদের মূর্ত্তি পূজার উপর ঘৃণাবশতঃ কোনও চিন্তাশীল হিন্দু খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। ধর্ম্মাচরণ বাদ দিয়া কেবল ধর্ম্মতত্ত্বের উৎকর্ষতার জন্য কাহারও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন প্রায়ই হয় না। কেন না ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়াও অন্য ধর্ম্মের তত্ত্ব চিন্তা করিতে কাহারও কখনও বিশেষ বাধা হয় নাই। দেশ ও সমাজ ত্যাগ না করিয়াও লোক বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিক মত অবলম্বন করিতে পারিয়াছিল। ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের পরে সমাজ তত্ত্ব এবং সমাজ তত্ত্বের মূলেই অশন বসন ও বিবাহ বা নারীতত্ত্ব। সম্ভবতঃ এই সকল বিষয়ে সুবিধার জন্যই অধিকাংশ লোক বিধর্ম্মী হইতেছিল। এই সকল বিষয়ে প্রাচীন বন্ধন শিথিল করিয়া এবং মূর্ত্তিপূজার সম্ভাবিত আপত্তি খণ্ডন করিয়া বিদেশী ধর্ম্মের আক্রমণ হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করিবার ভাবনা চিন্তাশীল দূরদর্শী দেশভক্তের মনে তখন উদয় হইয়াছিল। এইখানেই যেন অশীতি বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে কেন ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি হয় তাহার একটা মীমাংসা পাওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্মতত্ত্বের হিসাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম সনাতন হিন্দু ধর্ম্মেরই অনুশাসন বিশেষকে বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছে। অনাদি অনন্ত, বাক্য ও মনের অতীত অমূর্ত্ত নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ পরম ব্রহ্মই ব্রাহ্মদের উপাস্য দেবতা। এই ব্রহ্ম, ব্রাহ্মদের গড়া কোনও নূতন ঠাকুর নয়, ইহা সনাতন ধর্ম্মেরই সারতত্ত্ব। ধর্ম্মাচরণ বা সামাজিক আচার ব্যবহার বিষয়ে ইঁহারা সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া চলিবার প্রস্তাব

করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজাই, দেশের ন্যায়, দেশীয়দের ধর্ম্ম ও সমাজের রক্ষক। পরাধীন লোকের পক্ষে ধর্ম্মাচরণ ও সামাজিক ব্যবহার পরিবর্ত্তনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। সামাজিক পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিবার স্বাধীনতা থাকিলে ব্রাহ্মেরা হিন্দু নয়, বৌদ্ধ নয়, জৈন নয়, খ্রীষ্টান নয় অর্থাৎ কিছুই নয় এই অপমানজনক অসত্য ঘোষণা করিয়া পরাজিতদের শাসন সুবিধার জন্য বিধর্ম্মীরা যে আইন করিয়াছে তাহার জোরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইত না।

খৃষ্টান প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মেরা মূলতঃ মূর্ত্তিরই উপাসক। ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যা মূর্ত্তি পূজার উপরেই স্থাপিত। যাহারা শিল্পকে সভ্যতার এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাহারা মূর্ত্তিপূজার দোষ বা গুণের দায়িত্ব হইতে রক্ষা পাইতে পারেনা। আমি যাহাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা ভক্তি করি, মূর্ত্তি চিত্র বা কেতাবের অক্ষরের সাহায্যেই তাহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছি এই কথা প্রত্যেক শিক্ষিত লোককেই স্বীকার করিতে হইবে। মানচিত্র সকলে সমান পটুতার সহিত আঁকিতে পারে না। মিনার্ভার মূর্ত্তি কালীমূর্ত্তি অপেক্ষা দেখিতে বেশী সুন্দর। গ্রীকের শিল্পী নিজের ভাব প্রকাশে অধিকতর কৃতকার্য্য। কবির লিখিত প্রেমপত্রে রসের প্রাচুর্য্য এবং ভাব ও ভাষার বাহাদুরী সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু সে জন্য যাহার ভাব ভাষা ও হাতের লেখা বা অক্ষরচিত্র তেমন উৎকর্ষতা লাভ করে নাই, সে কি তাহার নিজের শক্তি অনুসারে প্রেমপত্র লিখিতে চেষ্টা করিবে না? নদী পাহাড় দেশ রাজ্য নিঁখুত ভাবে অঙ্কিত না হইলেও মানচিত্রের সাহায্যেই শিশুকে ভূগোল পরিচয় করিতে হয়। চাল কলা রুটি মাখন বা ফুল চন্দন ব্যতীতও মূর্ত্তির পূজা হইতে পারে। সংস্কৃত ও গ্রীক লাটিনের ছন্দোবদ্ধ শ্লোক বা বক্তার ওজস্বিনী ভাষায় মন্ত্রপাঠ না করিয়াও পূজা হইয়া থাকে। ধ্যান ধারণা মূর্ত্তিকে উপলক্ষ্য করিয়াই সম্ভব। ব্যক্তি বিশেষের জন্য শারীরিক মূর্ত্তির প্রয়োজন না হইতে পারে; কিন্তু মানস মূর্ত্তিও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণ দ্বারাই গঠিত হয়। মনু ব্রহ্মার মানস পুত্র হইতে পারেন, কিন্তু রক্ত মাংসের দেহের সংযোগেই মানবের বংশ রক্ষা হয় এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তুমি স্বীকার না করিত পার, তুমি আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে পার, কিন্তু তোমার যদি বিদ্যার অভিমান থাকে, তুমি যদি নিজেকে সভ্য বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে কোন না কোন প্রকারে তুমি মূর্ত্তিরই পূজা করিতেছ এই কথা যুক্তি দ্বারা অপ্রমাণ করিতে পার না। যাহারা আচার বিশেষকেই ধর্ম্মের তত্ত্ব বলিয়া মনে করে, এরূপ ব্রাহ্মের পক্ষে ব্যবসায়ী খৃষ্টান পাদ্রীর ন্যায় হিন্দুর দেব দেবীর উপর আক্রোশ থাকা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে বিশ কোটিরও অধিক হিন্দুর কোটি কোটি শিব ও অসংখ্য অগণিত দেব দেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস হইয়া যাইবে, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার দিনে, কাশীতে বসিয়া এই স্বপ্ন কেহ আশার সহিত পোষণ করিতে পারে না।

তথাপি সনাতন ধর্ম্মীদের অপেক্ষা আর্য্য ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায় কিছুদিন অধিকতর সামাজিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা এক হিসাবে লুপ্ত হইয়াছিল। তাহাদেরই মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, তাহাদিগকেই সম্ভাবিত পাশবিক অত্যাচার হইতে দূরে রাখিবার জন্য হিন্দু-রমনীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে হইত। ব্রাহ্মেরা এই আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম মহিলা একটু বেশী আলো বাতাস পাইতেছেন। স্থল বিশেষে হিন্দুদের প্রাচীন স্বয়ম্বর প্রথা ও যৌন সম্বন্ধ অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু ইঁহাদের সাম্য ও মৈত্রীর আশা এতটুকুও সফল হয় নাই। দেখিতে দেখিতে ইঁহাদের মধ্যেই আবার নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর যে অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্মেরা অবলম্বন করিতেছিলেন তাহারই পুনঃসংস্করণ আরম্ভ

হইয়া গেল। জাতি নির্ব্বিশেষে বিবাহের প্রথা উঠিয়া গেল। ব্রাহ্মদের সম্প্রদায় বিশেষ ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিতে পারিলেন না; বস্তুতঃ এই সম্প্রদায় সনাতন ধর্ম্মী হিন্দুদের এক উন্নত শাখা ব্যতীত স্বতন্ত্র কিছুই নহে। অতএব ভারতীয় খৃষ্টানের ন্যায় ব্রাহ্মেরা ত্রিশঙ্কুর অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই সত্য; কিন্তু রাজার জাতির অশন বসন ও আচার ব্যবহার অনুকরণ করিবার লিপ্‌সা তাঁহাদেরও প্রায় খ্রীষ্টানদের মতই স্থলবিশেষে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ ইতোমধ্যে জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা হইল, শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে জাতীয়তার গৌরব জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্ম, পৌত্তলিকদের সাধারণ নামে অর্থাৎ হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে ব্যগ্র হইলেন, খ্রীষ্টানদের ন্যায় ব্রাহ্মেরা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইলেন না।

একবিংশতি কোটি সনাতনধর্ম্মী হিন্দুদিগের মধ্যে পঞ্চ সহস্র পরিমিত ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের লোক, মহাসমুদ্রে জলকণার ন্যায়। বস্তুতঃ যে সকল কারণে ব্রাহ্মেরা হিন্দুদের সৌর শৈব বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় হইতে একটু বিভিন্ন, তাহা এক কথায় বলিতে হইলে বলা যাইতে পারে যে তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতা ও যৌন সম্বন্ধ বিষয়ে। শিক্ষিত সনাতনধর্ম্মীদের মধ্যে তাহাদেরই প্রাচীন এ সকল প্রথার পুনরাবির্ভাব হইতেছে। এই জন্য অদূর ভবিষ্যতে এই জলকণা সমুদ্রের সহিত মিলিয়া নিজের বিসদৃশ স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিয়া ফেলিবে এরূপ আশা দুরাশা নহে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক প্রবাসী ব্রাহ্ম যে বাঙ্গালী থাকিয়া যাইবে সে আশা তেমন উজ্জ্বল নয়। হিন্দুর ন্যায় আদান প্রদানে ব্রাহ্মের তেমন প্রতিবন্ধকতা নাই। অধিকাংশ ব্রাহ্মই জাতিভেদ মানেন না। ব্রাহ্ম মহিলা শিক্ষিত এবং অবাধ প্রেমের পক্ষপাতী। উত্তরভারতে অবাঙ্গালী বিলাত ফেরৎ যুবকও পাশ্চত্য বিদ্যার এই প্রধান অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রত্যাগমন করে নাই। উদ্যান ভোজন ও সভা সমিতি প্রভৃতিতে ছাত্রী শিক্ষয়িত্রী বা ধাত্রী ব্রাহ্ম যুবতী এবং এই প্রদেশের যুবক ছাত্র বা ব্যারিষ্টার প্রভৃতির মিলিবার মিশিবারও অসুবিধা নাই। স্থানবিশেষে এই প্রণয়প্রার্থী অবাঙ্গালী যুবক, স্বল্পসংখ্যক প্রবাসী বাঙ্গালী যুবক অপেক্ষা রূপ গুণ ও অর্থাদিতে অধিকতর লোভনীয়; সুতরাং এই ব্রাহ্ম যুবতী স্বভাবতঃই এই অবাঙ্গালীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া পড়িবে। অপরাঙ্গের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা এই যুবতীর পক্ষে অনাবশ্যক ও অসম্ভব। ভাব ও ভাষার অসুবিধা তাহার নাই। পশ্চাত্য প্রণালীতে তাহার প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত, স্বাধীনতা তাহার বীজমন্ত্র। সাংসারিক সুখ সুবিধা ও স্বাভাবিক বিলাসিতার আকর্ষণ তাহার পক্ষে দুর্দ্দমনীয়। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে ইহাই আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিতা রমনীর দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শ। সাধারণ বাঙ্গালী স্ত্রী, স্বামীর যে স্বার্থপরতা নীরবে সহ্য করে, সেরূপ দাসীপনা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এ সকল কারণে বিবাহের পরেও এই যুবতীর মধ্যে যেটুকু বাঙ্গালীত্ব কেবলই স্বাভাবিক কারণে আধমরা হইয়া থাকিতে পারে, তাহা তাহার সন্তান সন্ততিতে সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ঐরূপ অবাধ প্রেমের ফলে প্রবাসী হিন্দু যুবক যুবতীর বাঙ্গালীত্ব নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা এখনও দেখা যাইতেছে না। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু বাঙ্গালী অন্যভাবে অবাঙ্গালী হইয়া যাইতে পারে তাহা পরে আলোচিত হইতেছে।

পরিত্যক্ত দেশের সহিত প্রবাসীর ভাবধারা প্রধানতঃ নরী দ্বারাই অক্ষুন্ন থাকিতে পারে। ভারতবাসী ইংরেজ যদি এই দেশীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের সহিত ইহাদের ভাবধারার সম্বন্ধ স্থির থাকিতে পারিত না। ইংরেজ রাজাকে অস্বাভাবিক উপায়ে এই সম্বন্ধ স্থির রাখিতে হইয়াছে। যাহারা এইদেশী স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছ তাহারা নিজেদের সমাজে আমল পায় নাই। ইংরেজের স্ত্রী না হইলে

সাহেব মহলে এই দেশীয় শিক্ষিতা মহলার যে আদর, ইংরেজের স্ত্রী হইলে তাহার আর সে আদর থাকে না। পক্ষান্তরে ইংরেজী স্ত্রী হইয়া ভারতবাসীরাও সাহেবদের সহিত মিলিতে পারে নাই। অন্যভাবেও ইংরেজ রাজাকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। তিন বৎসরের মধ্যে রাজকর্ম্মচারী ইংরেজ একবার বিলাত যাইবে এরূপ সরকারী নিয়ম রহিয়াছে। এই অবকাশ ভোগের সুবিধার উদ্দেশ্যে চাকরি আরম্ভের পূর্ব্ব হইতেই পাথেয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা হয়। যাহারা এই অবকাশ উপভোগ না করে তাহাদের আর্থিক ক্ষতি অনেক। বিলাতের সমাজের সহিত প্রবাসী ইংরেজের ভাবধারা সজীব থাকে ইহাই এই নিয়মের উদ্দেশ্য। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর কাল চাকুরির পর রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাধারণ ইংরেজের পক্ষে এই দেশে থাকিবার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় ইংরেজ, ইংলণ্ডে গৃহাদি নাই বলিয়া, বরং আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় শেষকাল যাপন করিবে, তথাপি যে ভারতবর্ষে জীবনের অধিকাংশকাল যাপন করিয়াছে, যেখানে হয়ত তাহার অধিকাংশ আত্মীয় স্বজন রহিয়াছে, সেখানে মরিবার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবার উৎসাহ পায় না।

এরূপ রাজশক্তি প্রবাসী বাঙ্গালীকে উত্তরভারতে রক্ষা করিবে না। আর্থিক অভাব এবং বাঙ্গালাদেশে নিজের ঘর বাড়ী নাই বলিয়া অধিকাংশ বাঙ্গালীই বৎসরে হয়ত একমাস মাত্র যে অবকাশ পাইতে পারে, তাহা বাঙ্গালা দেশে যাপন করিতে পারে না। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর স্বভাবতঃ অলস বাঙ্গালী নূতন ভাবে জীবনের শেষ ক'টা দিন বাঙ্গালা দেশে কাটাইবার স্বপ্নও কখনও পোষণ করে না। বাঙ্গালাদেশের জল বায়ুও তখন তাহার সহ্য হইবে না। বিশেষতঃ তাহার বাড়ী ঘর পুত্র কন্যা সকলই এই প্রদেশে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বাঙ্গালার সহিত এই প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবধারার সম্বন্ধ সমূলে ছিন্ন হইয়া যায়। সভাসমিতির আলোচনা তাহার কাণে পৌঁছায় না। পরাধীন জাতির সভাসমিতি এরূপ সমস্যার বিশেষ মীমাংসাও করিতে পারে না। কেন না সভার নির্দ্ধারিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে রাজকীয় সাহায্যের প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত কোন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেও আমরা অক্ষম। যাহারা এরূপ নির্দ্ধারিত নিয়মের একান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি করে, তাহারাও অর্থের অনটন বশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। বাঙ্গালাদেশে ঘন ঘন যাওয়া আসা থাকিলে বাঙ্গালার সহিত প্রবাসী বাঙ্গালী বিশেষভাবে আকৃষ্ট থাকিতে পারে তাহা সত্য; কিন্তু আমাদের মুনিবেরা সে উদ্দেশ্যে আমাদের পাথেয়ের সাহায্য করিবেন না, ছুটিও বেশী করিয়া দিবেন না। এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

উত্তর ভারতে বঙ্গসাহিত্যের স্বাভাবিক প্রচার এবং তদ্দ্বারা বাঙ্গালার সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবধারা স্থির রাখা সম্ভবপর নহে। প্রবাসী বাঙ্গালীকে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য রাজভাষা ইংরাজীরই ব্যবহার করিতে হইবে। জীবন নির্ব্বাহের জন্য চাকর চাকরাণী ধোপা নাপিত গাড়ীচালক ও দোকানদার প্রভৃতির সহিত প্রাদেশিক ভাষাতেই কথাবার্ত্তা চালাইতে হইবে। এই সকল বিষয়ে সভাসমিতি করিয়া কিছুই করা যাইতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় যদি জোর থাকে, বাঙ্গালার লেখক লেখিকার দ্বারা যদি উত্তরোত্তর বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রবাসী বাঙ্গালী ত দূরের কথা, অবাঙ্গালীও বাঙ্গালায় লিখিত নাটক নভেল ও কাব্য গ্রন্থাদি কেবল অধ্যয়নেচ্ছা তৃপ্তির জন্যই পড়িবে। এই প্রদেশে মাসিক পত্রিকা প্রচার দ্বারাও প্রবাসী বাঙ্গালার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা সঞ্জীবিত থাকিতে পারে না। যাহারা মাসিক পড়িতে চায় তাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্রিকারই গ্রাহক হইবে, তাহা বাঙ্গালাদেশেই প্রচারিত হউক আর এই প্রদেশেই হউক। এই প্রদেশে প্রচারিত মাসিক পত্রিকার মূল্য হ্রাস করা কিংবা সহজতর উপায়ে প্রাপ্তিরও ব্যবস্থা করা যাইতে

পারে না। তথাপি এরূপ সভাসমিতি দ্বারা বাঙ্গালা লিখিবার অভ্যাস অল্প সংখ্যক প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে বাঙ্গালী ভাবধারা সঞ্জীবিত রাখিবার পক্ষে বিশেষ কোন সফলতার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ উপায়ে ভাষা বা ভাবকে বাঁচাইয়া রাখা একমাত্র রাজার জাতির পক্ষেই সম্ভব।

প্রবাসী বাঙ্গালীর পরিবারে বাঙ্গালা ভাষার প্রচার জোর করিয়া বাঁচাইয়া রাখিলেও ইহাদের বাঙ্গালী ভাবধারা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই প্রদেশের জল বায়ু ও ভাবের ভিতর প্রবাসীর জন্ম। শিক্ষা সমাপ্তির জন্য প্রবাসী ইংরাজেরা যেমন তাহাদের বালক বালিকাকে বিলাতে প্রেরণ করে, বা স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে অধ্যাপন করায়, প্রবাসী বাঙ্গালীর সন্তানকে শিক্ষা সমাপ্তির জন্য বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করিবার সেরূপ প্রয়োজন হয় না এবং স্থানবিশেষে আবশ্যক হইলেও অর্থাদির অনটনবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে না। শিক্ষাসমাপ্তির পরেই জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা। চাকরিজীবী বাঙ্গালীরই বাঙ্গালাদেশে স্থান হইতেছে না, প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকের চাকরির বন্দোবস্ত বাঙ্গালা দেশে কি করিয়া হইবে? অধিকন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর এই প্রদেশে চাকরি পাওয়ার যতটা সুযোগ আছে, বাঙ্গালা দেশে ততটা নাই। ডেপুটি কালেক্টরি প্রভৃতি চাকরির জন্য প্রবাসী বাঙ্গালী এই প্রদেশেই মনোনীত হইতে পারে, বাঙ্গালা দেশে পারে না। তার পরে এই প্রদেশেই জন্ম ও শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকার সহিত যদি এই যুবকের বিবাহ হয়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ বাঙ্গালীত্ব এই পরিবারে কিরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে? বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক মাড়ওয়ারী অধিবাসী আছে। বাঙ্গালীর সহিত আদান প্রদানের সম্বন্ধ তাহাদের কখনও হয় নাই। তথাপি রাজপুতনা প্রভৃতি প্রদেশের ভাবধারা তাহাদের মধ্যে নাই। বস্তুতঃ তাহারা সকল বিষয়েই বাঙ্গালীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে জন্মতঃ বাঙ্গালী ছিলেন না এ কথা বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষে শক্ত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আদান প্রদানের দ্বারা এই প্রদেশের সহিত মিশিয়া না গেলেও প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে প্রবাসী বাঙ্গালী যে চিরদিনই নিজেদের মধ্যে আদান প্রদানের সম্বন্ধ প্রচলিত রাখিয়া নামে মাত্র বাঙ্গালী থাকিয়া যাইতে পারিবে তাহার সম্ভাবনাও কম। প্রবাসী বাঙ্গালী যদি এই প্রদেশের সহিত মিশিয়া এক হইয়া না যায়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে মহা বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিন দিনই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। সেদিন মাত্র বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় আইন করা হইয়া গিয়াছে অবাঙ্গালী গুণ্ডানামক দুর্বৃত্ত লোকদিগকে আবশ্যক হইলে কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অধিকাংশই এই প্রদেশবাসী। এই প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা এই বিধান বিনা প্রতিশোধে সহ্য করিবেন এরূপ আশা করিবার কারণ নাই। চিন্তাশীল বাঙ্গালীকে একটি মাত্র ক্ষুদ্র ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। কলিকাতা ইংরেজ রাজের ভারতীয় রাজধানী ছিল। সে জন্য ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়া ইংরাজ ভারতীয় ব্যাঙ্কের নাম রাখিয়াছিল 'ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল'। এই প্রদেশের ন্যায় অন্যান্য স্থানেও এই ব্যাঙ্কের নানা শাখা প্রশাখা ছিল; কিন্তু তাহাদেরও নাম ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলই রাখা হইয়াছিল। সমগ্র ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিকতা যখন জাগিয়া উঠিল, বাঙ্গালার এই অনন্যসাধারণ গৌরবে অন্যান্য প্রদেশের লোক ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িল। এই প্রদেশেরই বক্তা বিশেষের উত্তেজনায় ইংরেজ রাজকে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইল। শিক্ষিত লোক ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের জন্মের কথা এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্মৃত হন নাই। এরূপ একটা প্রাদেশিক ঈর্ষা অবলম্বন করিয়াই দিল্লীর শ্মশানে ভারতবর্ষের রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিয়াছে।

প্রবাসী বাঙ্গালীর এই প্রদেশে বিস্তর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে এই

প্রদেশের অধিবাসীদের স্থায় প্রবাসী বাঙ্গালীও ভূসম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রবাসীর এই অধিকার বিনা চেষ্টায় নাও থাকিতে পারে এই আশঙ্কা কেবল জল্পনামাত্র নহে। ইংরেজ রাজের উপনিবেশ সমূহে সর্ব্বত্র প্রবাসী ভারতবাসীর এই সকল অধিকার নাই তাহা শিক্ষিত লোকের অগোচর নহে। এই সেদিন মাত্র আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ মন্ত্রণাসভার সচিব অভিমত প্রচার করিয়াছেন যে, শ্বেতবর্ণ ও স্বাধীন জাতি নহে বলিয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বংশীয় প্রবাসী ভারতবাসীরও নিগ্রো প্রভৃতি অনার্য্যদের স্থায় সে দেশে ভূসম্পত্তি ক্রয় বা রক্ষা করিবার অধিকার নাই। ইহার ফলে প্রবাসী হিন্দুর আমেরিকাতে যে সকল ভূসম্পত্তি আছে তাহা এক্ষণে সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। আমেরিকা প্রবাসী হিন্দু অনতিবিলম্বে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িবে।

উত্তর ভারত হইতে 'গুণ্ডা' বলিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী বিতাড়িত না হইতে পারে। কিন্তু বিহার উড়িষ্যা ও ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভায় এই নিয়ম প্রকাশ্য ভাবেই গৃহীত হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর আক্রমণ হইতে সে সকল প্রদেশকে ক্রমশঃ রক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ সে সকল প্রদেশের সরকারি কাযে গুণের হিসাবে আবেদনকারীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হইবে না। স্থলবিশেষে জন্মস্থলের অধিকার হইতেও প্রবাসী বাঙ্গালীকে বঞ্চিত হইতে হইতেছে। ডেপুটি প্রভৃতি যে সকল সরকারী কাযের জন্য মনোনীত হইবার ব্যবস্থা আছে তাহা হইতেও অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালী বঞ্চিত হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশেও প্রবাসী বাঙ্গালীর এই অধিকার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভূসম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার হইতেও যখন প্রবাসীকে বঞ্চিত করা হইবে, তখন প্রবাসী বাঙ্গালীকে একান্ত নিরাশ্রয় ও নিরুপায় হইয়া পড়িতে হইবে। যে কোনও দেশে বা প্রদেশের স্বতন্ত্রশাসন বৃদ্ধির সহিত প্রবাসীর এসকল দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। স্বরাজের সূচনা হইতেই ভারতপ্রবাসী ইংরেজেরও এই দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজ রাজা বলিয়া প্রতিকারের একটা না একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবে। বাঙ্গালী রাজা নয়, রাজদণ্ড বাঙ্গালাদেশের হাতে নহে। বিশেষতঃ সে জন্যই সমগ্র বাঙ্গালীর সমবেত সাহায্য ব্যতীত এই সকল সম্ভাব্য বিপদ হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না। কিন্তু এ সকল মহা সমস্যার মীমাংসা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বাঙ্গালার বাঙ্গালীর সহিত পরাধীন প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবধারার সম্বন্ধ কিরূপে স্থির থাকিতে পারে তাহাই আলোচ্য বিষয়।

প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব রক্ষা না করিলে বাঙ্গালা দেশেরই অধিকতর ক্ষতি। এই ক্ষতি কেবল ভাবপ্রবণতা মূলক নহে। ইহা প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে নামে মাত্র ক্ষতি, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের পক্ষে পারমার্থিক ক্ষতি। বাঙ্গালার নগর নগরীতে না হৌক, বাঙ্গালার বন জঙ্গলে এখনও অনেক অনাবাদি জমি রহিয়াছে। যখন আবশ্যক হইবে প্রত্যাগত প্রবাসী বাঙ্গালীর স্থান বাঙ্গালাদেশে না হইবে তাহা নয়। আসামের চা বাগান হইতে প্রত্যাগত কুলীদের স্থানের জন্য তাহাদের স্ব স্ব প্রদেশকে ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু নূতন ও পুরাতন পৃথিবীর নানা দ্বীপপুঞ্জস্থ ইংরেজের উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সুদীর্ঘ প্রবাসের পর প্রত্যাগত লোকদিগকে লইয়া ভারতবর্ষকে কি পরিমাণে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র অপমানিত হইতে হইয়াছে তাহা কাহারও অগোচর নহে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বারাই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বলতর হইতেছে ; বাঙ্গালার অন্ন সমস্যারও লাঘব হইতেছে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বাঙ্গালা দেশেরই গৌরব রক্ষার জন্য, বাঙ্গালীরই সুনাম ও সুখসৌভাগ্য বিস্তারের জন্য প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করা আবশ্যক। সাংসারিক ও আর্থিক লাভের হিসাবে প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে এই প্রদেশীয় কাশ্মারী প্রভৃতির সহিত আদান প্রদান দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে মিশিয়া যাওয়াই সুবিধাজনক। এই স্বাভাবিক প্রলোভন হইতে একমাত্র বাঙ্গালাদেশই

প্রবাসী বাঙ্গালীকে রক্ষা করিতে পারে। রাজদণ্ড যখন ইংরেজের হাতে, আমাদের বাঙ্গালাদেশ বলিতে বাঙ্গালী সমাজকেই বুঝিতে হইবে। রাজকীয় ব্যাপারে বাঙ্গালার কোন হাত নাই। প্রবাসী বাঙ্গালীকে অস্বাভাবিক উপায়ে বা জোর করিয়া বাঙ্গালী রাখিবার জন্য কোন রাজকীয় ব্যবস্থা বাঙ্গালাদেশ করিতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালার সমাজ স্নেহের জোরে প্রীতির বন্ধনে পরস্পরের অজ্ঞাত ভাবে চিরদিনের জন্য প্রবাসী বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা দেশের সহিত আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে। একমাত্র আদান প্রদান দ্বারাই প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালা দেশের এই স্নেহের বন্ধন সুদৃঢ় হইতে পারে। সমাজের এই মহাশক্তির দ্বারাই প্রবাসী বাঙ্গালীর হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় বাঙ্গালার ভাবধারা চিরদিন প্রবহমান রাখা যাইতে পারে।

আদান প্রদান বলিতে অবশ্য পুত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধকেই বুঝিতে বইবে। পুত্র ও কন্যার বিবাহ দ্বারা বিভিন্ন পরিবার বা দেশের মধ্যে সম্বন্ধ প্রায় সমান ভাবেই স্থাপিত হয় তাহা সত্য। কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর কন্যা বাঙ্গালাদেশে পরিবার বিশেষের গৃহিণী হইয়া, লবণের পুতুল যেমন সমুদ্রের জলের সহিত মিশিয়া যায় সেরূপ ভাবেই বাঙ্গালী হইয়া যাইবে; পরিত্যক্ত প্রবাসী পিতার পরিবারে বাঙ্গালার ভাবধারা সর্ব্বদা সমানভাবে জাগ্রত রাখিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে বাঙ্গালা দেশের কন্যা যখন প্রবাসী বাঙ্গালীর ঘর করিতে আসিবে, সে তত সহজে বিদেশী হইয়া পড়িবে না; রত্ন বিশেষের ন্যায় অগাধ সমুদ্রে পড়িয়াও স্বীয় ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করিবে। বিলাতী মহিলারাই ভারতবাসী ইংরেজের ইংরেজত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। এ দেশী ইংরেজ মহিলা বিলাতে গিয়া বিলাতী হইয়া গিয়াছেন, প্রবাসী পিতা মাতার উপর ততটা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। অবশ্য প্রকৃত চন্দন তরুই পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ সমূহে চন্দনত্ব বিস্তার করিতে পারে। বাঙ্গালীত্ব রক্ষার জন্য প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে স্পর্শমণিরই প্রয়োজন। অনুপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়িয়া বাঙ্গালী মেয়ের দুর্গতি ঘটিতেছে এই কথা প্রায়ই শুনা যায়। অতএব প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা বাঙ্গালা দেশের পক্ষেই অধিকতর লাভের বিষয়।

পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত আহার্য্য দ্রব্যাদির প্রতি মনুষ্য মাত্রেরই স্বাভাবিক লোভ থাকে। স্বাস্থ্যের হিসাবে না হইলেও মুখরোচকতার হিসাবে বাঙ্গালী ব্যঞ্জনাদি অবাঙ্গালীর পক্ষেও স্বাভাবিক লোভনীয়। খাঁটি বাঙ্গালী রক্তের সহিত রন্ধনপটুতা লইয়া যদি যদি বাঙ্গালী কন্যা এই প্রদেশে বাঙ্গালীর গৃহিণী হইতে আসে, তাহা হইলে রক্তমাংসের ভিতর দিয়াই প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গলার ভাবধারা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। রক্তের ন্যায় ঔদরিক সম্বন্ধও মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা বিষয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধন। ত্রিপুরার দই, ঢাকার খই, বাগবাজারের রসগোল্লা ও বর্দ্ধমানের সীতাভোগ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার হাত লইয়া বাঙ্গালী মেয়ে যদি উত্তর ভারতে আসে, তাহা হইলে শ্বশুর ভাসুরের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। বস্তুত বাঙ্গালী কন্যা মাত্রের দ্বারাই অল্পবিস্তর বাঙ্গালীত্ব প্রবাসীর উপর বিস্তৃত হইবে। কিন্তু যাহারা খাঁটি বাঙ্গালী মায়ের স্নেহ, বাঙ্গালী ভগিনীর যত্ন, বাঙ্গালী কন্যার ভক্তি এবং বাঙ্গালী সহধর্ম্মিণীর নিঃস্বার্থ পরিচর্য্যা লইয়া আসিতে পারিবে, তাহারাই বাঙ্গালার সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে।

পুত্র ও কন্যাকে সমান ভাবে দেখাই পিতামাতার পক্ষে স্বাভাবিক। কন্যা অপেক্ষা পুত্র জনক জননীর স্নেহমমতা বা ধনসম্পত্তি বেশী দাবী করিতে পারে না। তথাপি সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যখন আমরণ স্থায়ী বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই সময় হইতে কন্যা পরকীয়া হইতে আরম্ভ করে এবং পুত্রই পিতার ধন সম্পত্তি ও বংশের রক্ষক হইয়া পড়ে। সভ্য মানব সমাজে বিবাহের পর হইতে কন্যা অপর পরিবারস্থ হইয়া যায়, পিতার নাম গোত্র ও গৃহ পরিবার তাহাকে

ত্যাগ করিতে হয়। প্রধানতঃ পিতার বংশের শ্রীবৃদ্ধি ও কন্যার সুখ সুবিধার জন্যই এই নিষ্ঠুর প্রথা সভ্য-সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আদিম মানব অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিতে পারিয়াছিল যে এক পরিবারস্থ যুবক যুবতী দ্বারা মেধাবী ও দীর্ঘায়ু সন্তানের জন্ম হয় না। সে জন্যই কন্যাকে পরিবারান্তরে পাত্রস্থ করা এবং অপর পরিবারের কন্যাকে পুত্রবধূ করিবার নিয়ম হয়। ফলতঃ যে কন্যাকে পরিবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে বলিয়া প্রথম প্রথম মনে হয়, সে কন্যাই যখন নিজে জননী ও গৃহিণী হইয়া পড়ে তখন পরিত্যক্ত পিতৃপরিবারের প্রতি ততটা আসক্ত থাকে না। পরিবারান্তরে প্রেরিত হইলেও যথাসম্ভব সন্নিকটস্থ পাত্রেই কন্যা সমর্পিত হউক ইহাই পিতামাতার স্বাভাবিক ইচ্ছা। এই সমীপবর্ত্তিতা রক্ষার জন্য স্থলবিশেষে বান্ধবের প্রার্থিত কুল, পিতার আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যা, মাতার ঈপ্সিত বিত্ত এবং কন্যার ঈপ্সিত রূপেরও তেমন আদর করা হয় না। দূরস্থ বর অপেক্ষা নিকটস্থ বরই উদ্যমহীন বাঙ্গালীর প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে। একমাত্র আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী-কন্যার উদ্যমশীলতাই বাঙ্গালীর এই কলঙ্ক দূর করিয়া বিদেশে বাঙ্গালী সভ্যতা এবং স্বীয় সুখ সুবিধা ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত করিতে পারে। সভা সমিতি করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী বাঙ্গালার এই শক্তির উদ্‌বোধন মাত্র করিতে পারে। শক্তি প্রসন্না হইবেন কি না সে কথা বাঙ্গালা সমাজেরই ভাবিবার বিষয়।

বাঙ্গালা দেশ আপাততঃ নানা সমস্যায় বিব্রত। বিগত লোক গণনায় দেখা গিয়াছে বাঙ্গালী দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। বাঙ্গালার অর্দ্ধাধিক অধিবাসী অহিন্দু ও অবাঙ্গালী। বাঙ্গালার ধনকোষ অর্থশূন্য। বিদেশী লোক বাঙ্গালার অর্থ ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা স্থানান্তরিত করিতেছে। চাকুরি দ্বারা বাঙ্গালী অন্নসংস্থান করিতে পারিতেছে না। বাঙ্গালায় সুপেয় জলেরও অভাব। ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালার গ্রাম নগর জনশূন্য। কন্যাদায় বাঙ্গালীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা ভাবিবার অবকাশ বাঙ্গালাদেশের আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু পরম্পরের সৌভাগ্য বশতঃ এই ক্ষীণ ধ্বনি বাঙ্গালা দেশ যদি শুনিতে পায়, এই অমায়িক প্রস্তাব যদি বাঙ্গালা সমাজ সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিতে পারে, বাঙ্গালীর উদ্যমশীলতা যদি উদ্‌বোধিত হয়, তাহা হইলে প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালার ভাব ধারা স্থির থাকিয়া যাইবে। উত্তর ভারতীয় বাঙ্গালীর সম্মিলনে বাঙ্গালার নারী-শক্তিকে এই মাত্র বলা যাইতে পারে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" (উঠ, জাগ, বরলাভ করিয়া বা শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের সঙ্গী হইয়া আত্মোপলব্ধি কর)।

শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য।

তিষ্যরক্ষিতার কথা

আপনারা যাদুঘরে আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। আপনারা মনে করিতেছেন, আমি পুত্তলিকা মাত্র। আপনাদের ধারণা, পুত্তলিকার ন্যায়, চক্ষু থাকিলেও আমি দেখিতে পাই না; কর্ণ থাকিলেও আমি শুনিতে পাই না। কিন্তু ইহা আপনাদের ভুল। আমি চক্ষু কর্ণের সদ্ব্যবহার করিতে পারি। আমি আপনাদিগকে দেখিতে পাইতেছি; আপনারা যে কথোপকথন করিতে-ছেন, তাহা শুনিতেছি। কিন্তু, আমি যে আপনা-দিগকে দেখিতেছি, আপনাদের কথা উপভোগ করিতেছি তাহা আপনারা বুঝিতেছেন না। আমি পুত্তলিকা হইলেও আমার প্রাণ আছে; আমি আপনাদেরই ন্যায়—তবে আমি শাপভ্রষ্টা, তাই আজ আমার এই দুর্দ্দশা।

শুধু আজ কেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আমার এই দুর্দ্দশা।

আপনারা অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন না—কিন্তু যুগ যুগান্তর হইতে আমি এই অবস্থায় আছি। এই পুত্তলিকা অবস্থায় আমি রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের নির্ব্বাণ দেখিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছি। পুষ্যমিত্রের বংশাবলীর ধ্বংস, কণ্ব বংশের অভ্যুত্থান পতন, অন্ধ্রদের রাজ্যাধিকার ও বিতাড়িত হওয়া, গুপ্তদের প্রকাশ—সবই এই পুত্তলিকার চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়াছে। ভাঙা গড়া যে জগতের চিরন্তন প্রথা তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। তাই হিন্দুর পরে মুসলমান, তাহাদের পরে ব্রিটিশের প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছি।

একথায় আপনারা যে প্রত্যয় স্থাপন করিবেন না তাহা আমি খুবই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আপনারা আমার কথা শুনিয়া প্রত্যয় স্থাপন করিতেছেন না—অপিচ আমার কথা বাতুলতাপূর্ণ মনে করিতেছেন। কিন্তু আমি কে, আমি এখানে কেন, কতদিন এখানে থাকিব তাহা শুনিলে আর আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

আপনারা রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের নাম ও কীর্ত্তি-কলাপ অবশ্যই শুনিয়াছেন। যখন পাটলিপুত্রেই আপনাদের বাস, তখন আর পুনরুক্তির প্রয়োজনীয়তা নাই। এই অবিশ্বাসিনী তিষ্যরক্ষিতা—একদিন আমি অশোকের অঙ্কে শোভা পাইয়াছিলাম। বড় সোহাগিনী ছিলাম, রাজার দক্ষিণ হস্ত ছিলাম—বড় গরবিনী ছিলাম—তাই আজ এই দশা। আমার দুর্দ্দশার কথা শুনিলে আপনাদের চক্ষে জল আসিবে—হয়ত আমার পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তাই আজ আপনাদিগকে সেই কাহিনী শুনাইব। আপনাদিগকে উহা শুনিতেই হইবে, নতুবা আমার যে নিস্তার নাই।

আপনারা হয়ত জানেন যে অশোকের অসন্ধিমিত্রা নামে এক রাজ্ঞী ছিলেন। অসন্ধিমিত্রার দেহাবসানের পরে আমি অশোকের অঙ্কশায়িনী হইলাম। আমার অসামান্য সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া রাজা আমার হস্তে ক্রীড়নক হইলেন। সঙ্গেই আমি তাঁহার পাটরাণী হইলাম। আমার এক শত্রু ছিল—বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম। আমি তাহাকেও এক প্রকার বিনষ্ট করিলাম।

কেবল যে আমার সৌন্দর্য্যেই রাজা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে। আপনারা রাজ্ঞী কৈকেয়ীর কথা অবশ্যই শুনিয়াছেন। কি প্রকারে তিনি মহারাজ দশরথকে শুশ্রূষা করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন তাহা আপনারা জানেন। আমিও সম্রাট্ অশোককে নিরাময় করিয়াছিলাম। সম্রাটের কঠিন পীড়া হয়- তাঁহার উদরে দারুণ যন্ত্রণা হয়। রাজবৈদ্য ব্যাধি নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সুদূর পাশ্চাত্য দেশ হইতে রাজমিত্রগণ-প্রেরিত চিকিৎসকগণও বিফল মনোরথ হইলেন। সকলে নির্দ্ধারণ করিলেন রাজার মৃত্যু সুনিশ্চিত। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। কি করিব? রাজার দেহান্ত হইলে আমারও যে প্রাণান্ত হইবে। এই সুখ, সৌন্দর্য্য, রাজভোগ কোথায় যাইবে? কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে ভগবান এক সন্ধি নির্দ্দেশ করিলেন। তখন কি জানিতাম যে রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় ছিল! তাহা হইলে যুগযুগান্তর ধরিয়া আর এরূপ পাষাণমূর্ত্তি হইয়া থাকিতে হইত না।

অনুসন্ধানে জানিলাম যে রাজ্যমধ্যে আর একটি ব্যক্তিরও এরূপ ব্যাধি হইয়াছে। অর্থ দ্বারা এই পীড়িত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে বশ করিয়া তাহাকে দুর্গাভ্যন্তরে আনয়ন করিলাম। ২১ দিন তাহার ব্যাধির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, গোপনে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার উদর চিরিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম উদর মধ্যে এক প্রকাণ্ড ক্রিমিকীট। এই ক্রিমিকীটই তাহার ব্যাধির কারণ। আমি জানিতাম ক্রিমিকীট পলাণ্ডু স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। পরীক্ষার জন্য কীটের নিকট পলাণ্ডু স্থাপন করিলাম, উহার গাত্রে পলাণ্ডুর রস নিক্ষেপ করিলাম। ক্রিমিকীট প্রাণত্যাগ করিল। আমি অশোককে পলাণ্ডুর রস পান করিতে দিলাম—তিনি প্রথমে অস্বীকার

করিলেন। বলিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়। আমি পলাণ্ডুরস গ্রহণ করিব?" কিন্তু যে প্রাণভয়ে কাতর সে কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারে? রাজা পলাণ্ডুর রস পান করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যাধির উপশম হইল। আমি রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলাম।

কিন্তু মানুষের আশা মিটে না। অকস্মাৎ একদিন রাজান্তঃপুরে যুবরাজ কুণালকে দেখিলাম। আ-মরি মরি! কি রূপ! হায় হায়। কোথায় বৃদ্ধ স্বামী—আর কোথায় এই যুবক! হোক না স্বামী রাজচক্রবর্ত্তী হোক না সে রাজাধিরাজ! আমি মজিলাম—আমি মরিলাম। দাসী দ্বারা কুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। স্নেহ কর্ত্তব্য সব জলাঞ্জলি দিলাম, প্রেমের বন্যায় সব ভাসিয়া গেল, বুকের বোঝা নামাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে অটল রহিল। আমি তাহার গর্ভধারিণী না হইলেও মাতা! আত্মবিস্মৃত হইলাম, পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইলাম, রাজকুমারের পদপ্রান্তে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলাম—ঘৃণাভরে সে চলিয়া গেল।

কি? এত স্পর্দ্ধা! মহারাণী আমি! রাজচক্রবর্ত্তীর প্রিয়তমা মহিষী আমি! আমাকে ঘৃণা? আমার উপরোধ উপেক্ষা! রাজা কে? রাজ্যের অধিকারী কে? আমিই ত সব! রাজা ত আমার হস্তের ক্রীড়নক মাত্র। আমাকে তাচ্ছিল্য! এত অহংকার! তখন রাজাদেশ প্রচারিত হইল—রাজধানীতে কুণালের স্থান নাই। কুণাল তৎক্ষণাৎ তক্ষশিলায় প্রেরিত হইল।

রাজপুত্র এ আদেশে কাতর হইলেন না। দেখিলাম তিনি রাজার নিকট বিদায় লইয়া, সস্ত্রীক তক্ষশিলায় যাত্রা করিলেন। একবারও রাজান্তঃপুরে আসিলেন না। মনে করিয়াছিলাম বিদায় কালে যদি আর একবার অন্তঃপুরে আইসেন—তবে আর একবার চেষ্টা করিব। বেশ! তোমার দর্প কত, তোমার তেজ কত একবার দেখিব। আমার ক্ষমতা পরীক্ষা কর নাই, একবার দেখ। কিছু-দিবস পরেই তক্ষশিলার সহকারী শাসনকর্ত্তার নিকট রাজাদেশ প্রেরিত হইল—কুণালকে বিতাড়িত করিবে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহার চক্ষু দুইটি উৎপাটিত করিবে।

আদেশ প্রতিপালিত হইল। কুণাল অন্ধ হইয়া তক্ষশিলা ত্যাগ করিল। কেমন! হইয়াছে ত?

কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। অন্ধ কুণাল পত্নীর হাত ধরিয়া অতি কষ্টে রাজধানী পৌঁছিলেন। গভীর রাত্রে একটা করুণ বংশীধ্বনি রাজধানীর লোককে চমকিত করিতে লাগিল—"আমি রাজপুত্র ছিলাম, আজ আমি পথের ভিখারী। আমি দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম, আজ আমি অন্ধ। জগৎ অনিত্য, সংসার অনিত্য।" রাজা অন্তঃপুরে থাকিয়া সে বংশীধ্বনি শুনিলেন। পাপের প্রতিফল আছেই। তাই আমার সহস্র নিষেধ না মানিয়াও রাজা সেই অন্ধ বংশীবাদকের নিকটে গমন করিলেন। পিতা পুত্রে মিলন হইল। রাজা সকল কথা অবগত হইলেন। আমাকে জলন্ত চিতায় নিক্ষেপের আদেশ হইল। কিন্তু মহাঘোষের অনুরোধে আমার সে শাস্তি হইল না—আমার প্রতি অভিশাপ হইল—চিরজীবন আমি অভিশপ্তারূপে পুত্তলিকার ন্যায় রহিব। তাই আজও আমি পুত্তলিকা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু রাজত্বের পরে মুসলমান রাজত্ব—তাহাও চলিয়া গিয়াছে। আমার উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে। শোণের জলরাশি, পাটলিপুত্রের অগ্নিকুৎপাত সবই আমি সহিয়াছি। বহুকাল পরে এক শ্বেতদ্বীপবাসী আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া, মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে উদ্ধার করিলেন। আমাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল—মনে করিল আমি কোনও দেবী, তাই মহাসমারোহে তাহারা আমাকে পূজার্থ তাহাদের নগরে লইয়া গেল। আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু আমার অদৃষ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে, তাই সেই দিবস রাত্রিতেই নগরে এক গৃহে অগ্নি লাগিল; পবনদেব সেই সময়ে সদলবলে দেখা দিলেন। পরে নগরের অর্দ্ধাংশ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

ক্রোধে নগরবাসীরা মনে করিল যে আমিই তাহাদের এই দুরদৃষ্টের কারণ; আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে

তিষ্যরক্ষিতা

ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তাহাদের ক্রোধের ও আক্ষেপের সীমা রহিল না—তাই তাহারা সমবেত হইয়া আমাকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিল। আমার এক হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল - সে কি যন্ত্রণা! আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িলাম। আবার শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল; আমি গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া রহিলাম।

আবার বহুদিন অতিবাহিত হইল। আমি গঙ্গাগর্ভে গঙ্গার শীতল জলে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইতেছিলাম, কিন্তু বিধাতা আমাকে সেটুকুও ভোগ করিতে দিলেন না। গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী শীর্ণা ও শুষ্কা হইয়া যাওয়াতে আমার দেহের একস্থান লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইল। এক বালক আমাকে দেখিতে পাইয়া তাহার পিতার নিকট আমার কথা প্রকাশ করাতে লোকজন আসিয়া আমাকে উত্তোলন করিল। আবার সকলে মনে করিল এক দেবী আসিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী সকলে চন্দ্রাতপ তলে আমাকে স্থাপন করিয়া আমাকে পূজা করিতে লাগিল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে এ সুখ বেশী দিন সহিল না। একদিন শুনিলাম পাটলিপুত্রের উচ্চ বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক আমাকে দেখিয়া যাইয়া একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সহিত পুনর্ব্বার আমাকে দেখিতে আসিবেন। ভয়ে আবার আমার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কে এই অধ্যাপক, কে এই রাজকর্ম্মচারী? বিধাতা কি আমাকে শান্তি দিবেন না? আমি পাপ করিয়াছি সত্য, কিন্তু অহল্যা ত ইহাপেক্ষাও অধিক পাপ করিয়াছিলেন; তিনিও ত উদ্ধার হইয়াছিলেন! আমার কি উদ্ধার নাই? আর, কত দিন, কতদিন এই ভাবে যাইবে?

তিষ্যরক্ষিতা

ভগবান কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন না?

সেই অধ্যাপক ও রাজকর্ম্মচারী আসিলেন। আমাকে নানা দিক হইতে তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমার চতুষ্পার্শ্বে কি এক যন্ত্র রাখিয়া আমাকে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেন। অবশেষে তাঁহারা আদেশ দিলেন যে আমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইবে। আমার আর পূজা ভোগ রহিল না। আমাকে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া প্রকাণ্ড এক ক্ষেত্রে আনয়ন করা হইল।

এই স্থানেও লোকে আমাকে দেবতাজ্ঞানে দেখিতে আসিতে লাগিল; দলে দলে লোক পুষ্পমাল্য দ্বারা আমাকে সুশোভিত করিতে লাগিল। মনে করিলাম আমার বুঝি শাপাবসান হইয়াছে; আমার পাপের বুঝি প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। কিন্তু আমি যে গুরু পাপ করিয়াছি, মাতা হইয়া সন্তানের প্রতি কুদৃষ্টি করিয়াছি, অমন চক্ষুরত্ন নষ্ট করিয়াছি, এত গুরুপাপে কি অত লঘুদণ্ডে অব্যাহতি পাইতে পারি? তাই কয়েক দিবস পরে সেই অধ্যাপক ও অন্য একজন রাজকর্ম্মচারী উপনীত হইয়া আমাকে আবার দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া এই স্থানে আনিয়া রাখিয়াছেন।

দিনের পর দিন যাইতেছে। কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে, কত কথা কহিতেছে; তাহারা জানে না যে আমি পুত্তলিকা হইলেও আমার জ্ঞান আছে; আমি চক্ষু দিয়া সব দেখিতে পারি; কর্ণ দিয়া সব শুনিতে পারি। আপনারা আমাকে দেখিয়া কি মনে করিতেছেন, তাহা আমি না বুঝিতে পারিলেও, আমি কেবল প্রস্তর মূর্ত্তি নই—আমি সেই তিষ্যরক্ষিতা, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের প্রিয়তমা মহিষী, আমি অভিশাপগ্রস্তা তাই আমার এই দুর্দ্দশা। *

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

* পাটনা যাদুঘরের এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কেহ ইহাকে যক্ষিণী, কেহ দাসী বলিতেছেন। আমরা অপ্রত্নতাত্ত্বিক, সুতরাং ইহাকে রাজ্ঞী মনে করিয়াই লইয়াছি।

বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের কথা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শুভসংবাদ।

আ-মারা এত বড় সহর হইলেও এখানে কোন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় নাই। পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা ও একটি প্রাথমিক ইস্কুল আছে। সহরে শিক্ষিতের সংখ্যা ইহুদীদের ভিতরেই বেশী। ইস্কুলে সকলকেই তুর্কী ও ফ্রেঞ্চ শিখিতে হয়। মুসলমান ইহুদী ও খৃষ্টান সকলেরই মাতৃভাষা আরবী। হিব্রু ভাষার আলোচনা এখন আর হয় না। যাহারা সামান্য ইংরাজি জানিত তাহারা এ সময়ে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছিল। তাহাদের উচ্চহারে বেতন দিয়া প্রতি রেজিমেণ্টে ইণ্টারপ্রেটার বা দোভাষী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আরবী ভাষায় ইহাদের নাম তর্জ্জমান্, এ কথাটি বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের দোভাষীটি ইংরাজি ও হিন্দী দুই জানিত। সে বিখ্যাত সৈনিক ও রাজপুরুষ নাজিম পাশার আর্দ্দালী ছিল এবং বলিত যে নাজিমপাশাকে খুন করিয়া তুর্কীরা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে। ইহার কাছে শুনিয়াছিলাম নাজিমপাশা আরব দেশীয় ছিলেন, সওকত পাশাও নাকি খাঁটি তুর্ক নহেন, তিনিও আরবী ছিলেন। আমরা ইহার নিকট আরবী শিখিতাম এবং তিন মাসের মধ্যেই নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতে
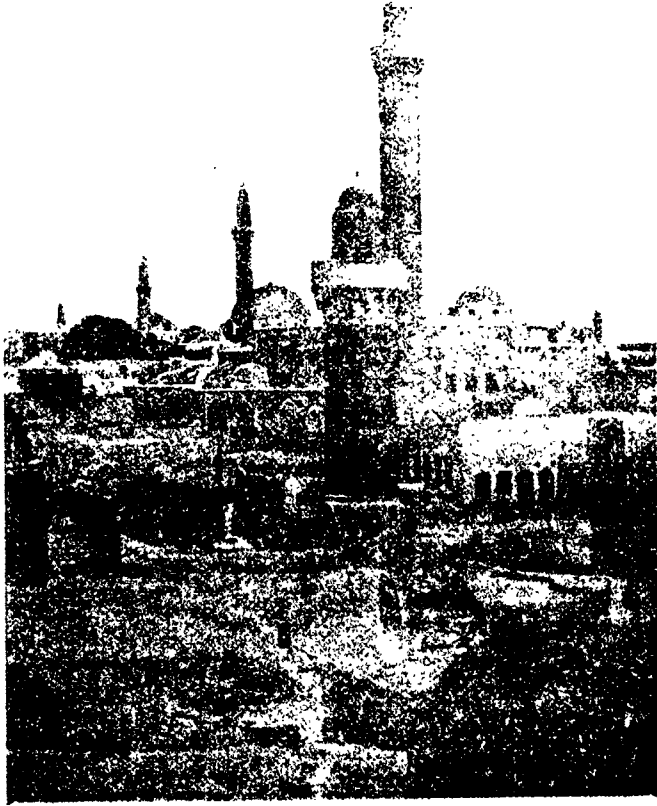
আ-মারার মসজিদ

ও লোকের কথা বুঝিতে কিছু কিছু সমর্থ হইয়াছিলাম। আমরা যখন আ-মারায় ছিলাম তখন রমজানের উপবাস চলিতেছিল। প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের সময় রেঙ্গুন ভলন্টিয়ার ব্যাটারি, নগরবাসীদের জ্ঞাপনের জন্য তোপের আওয়াজ করিত। এই ব্যাটারি বা তোপখানাটি ইউরেশীয়ানদের দ্বারা গঠিত। রেঙ্গুনবাসী এক বাঙ্গালী যুবকও ইহাতে ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান ও ঘোষ পদবীধারী।

ঈদ্পর্ব্বের দিন নগরবাসীদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য সহরের মধ্যে ব্যাণ্ড্-বাজের ব্যবস্থা, সামরিক বিভাগ হইতে করা হইয়াছিল। আমাদের হাঁসপাতালেও সেদিন হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় রুগ্ন সিপাহীদের পোলাও, কোর্ম্মা, পায়স প্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছিল। আ-মারার মিলিটারি গভর্ণরের কেরাণী, আমাদের বন্ধু ছিলেন। ইনি আলিগড় কলেজের গ্র্যাজুয়েট। ইনি সেদিন আমাদের কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এডেন পুলিসের অধ্যক্ষ ও একটি লান্সার দলের রিশালদার মেজরও তথায় উপস্থিত ছিলেন। আহারাদির পর ইহুদী ও আরবী নর্ত্তকীর ব্যবস্থা ছিল। ইহারা ব্যাঞ্জোর সুরের সহিত তুরি ধ্বনি করিতে করিতে উদ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিল। নৃত্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, বরং নর্ত্তকীদের উদর সঞ্চালন অত্যন্ত বিশ্রী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ডাক্তার বলিয়া সহরের অধিবাসীরা আমাদের একটু খাতির করিয়া চলিত। ডাক্তার গুপ্তের ও ভট্টাচার্য্যের চিকিৎসার গুণেও ইহারা বাঙ্গালীর আদর করিত। একদিন একজন সওদাগর আমাদের কয়েকজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, ইনি ডাক্তার ভট্টাচার্য্যের চিকিৎসাধীন ছিলেন। আদর আপ্যায়নে ইহারা মুসলমানের চিরন্তন প্রথামত সুদক্ষ। আহার্য্য সামগ্রী ভৃত্য সম্মুখে রাখিয়া গেল এবং বাড়ীর মহিলারা আসিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিয়া পুনরায় চলিয়া গেলেন। আমাদের সহযাত্রী ইণ্টারপ্রেটারের দেখাদেখি আমরা মহিলারা আসিলে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিলাম। ভোজ্যের মধ্যে মাছ, মটন, খবুস্ নামক চাপাটি, দই, চীজ এবং একখানি ট্রেতে সাজান একরাশ ডালিমের দানা। শুনিলাম গ্রীষ্মকালে ইহারা মাংস আহার প্রায়ই করে না, মাছ ও দই অধিক মাত্রায় আহার করিয়া থাকে। অন্যান্য সময় ভেড়ার মাংসের চলতি খুব বেশী। বিশেষ পর্ব্ব ভিন্ন বৃহৎকায় জানোয়ার বধ করা হয় না। আমাদের নিমন্ত্রণকারক বেশ অবস্থাপন্ন লোক এবং তাঁহার অতিথেয়তার ত্রুটি না থাকিবারই কথা। তাঁহার গৃহে প্রস্তুত আহার সামগ্রী দেখিয়া বুঝিলাম ইঁহারা আমাদের দেশের মত যথেচ্ছ মসলা ও ঘৃতের ব্যবহার করেন না—বোধ হয় জানেনও না। ইঁহাদের প্রস্তুত পোলাও আমাদের দেশীয় পোলাও হইতে বহু নিকৃষ্ট।

আমাদের হাঁসপাতালে যে সব রুগ্ন সিপাহী আসিত তাহাদের আরোগ্যের পর পুনরায় যুদ্ধের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইত। যাহারা অসুস্থতার জন্য সাময়িক হিসাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত তাহাদের বসোরায় বেস্ হসপিটালে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। সেখানেও মাস দুয়েকের ভিতর আরোগ্য না হইলে তাহাদের ভারতবর্ষে ফিরাইয়া দেওয়া হইত। আ-মারা বেঙ্গল ষ্টেশনারি হসপিটাল হইতে যে রোগীদের বস্রায় প্রেরণ করা হইত, তাহাদের ভার লইয়া অ্যাম্বুলেন্সের লোকদিগকে যাইতে হইত। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে আমাকে এরূপ একটি দল লইয়া বস্রাতে যাইতে হয়। এ কয় মাসে আসার ছাউনী যথেষ্ট বড় হইয়াছে দেখিলাম। সামরিক বিভাগে কেরাণীর কার্য্যে তখন অনেক বাঙ্গালী বসরাতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের কয়েকজন আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের মেসে লইয়া গেলেন। তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরদিন আ-মারায় ফিরিবার ষ্টীমার আরোহণ করিলাম। বিদেশে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সৌহৃদ্য ও আত্মীয়তা দেখা যায় তাহা বাস্তবিকই আনন্দজনক।

আ মারায় ফিরিয়া শুনিলাম সে আমাদের এতদিনের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। সামরিক বিভাগের কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তা অ্যাড্‌জুটাণ্ট জেনারেলের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আলি-আল-গর্ব্বীর যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমাদের ৩৬ জন লোক ৬ খানি ষ্ট্রেচার লইয়া যাত্রা করিবে, হাবিলদার চম্পটী দলের অধ্যক্ষ হইবেন। এ সংবাদে আমাদের ছাউনীতে আনন্দ রোল পড়িয়া গেল এবং মনোনীত ৩৬ জন সকলে নূতনত্বের আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। আমাদের অফিসারেরাও যাইবার জন্য একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু হাঁসপাতালের কার্য্যের হানি হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহারা যাইবার অনুমতি পাইলেন না।

আমরা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এই সময় একদিন কর্ণেল প্যারেড করিয়া আমাদের শুনাইয়া দিলেন যে আমাদের কোরের কমিটীর সভাপতি বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর ঘোষণা করিয়াছেন যে, সম্মুখ যুদ্ধে যাহারা বিশেষ কার্য্য তৎপরতা দেখাইয়া সম্মান চিহ্ন পাইবে তাহাদিগকে তিনি বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবেন।

মেসোপটেমিয়া পৌছানর পর হইতেই আমরা নানারূপে আমাদের দলপতি কর্ণেল নটের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলাম। আমাদের স্বাস্থ্যের ও আহারাদির বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং আমাদের মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধেও তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর বৈকালে আমরা ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম এবং তাহার পরদিন ভোরে কর্ণেল ও অন্যান্য

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর

বাঙ্গালী অফিসারদের বিদায় সম্ভাষণ লইয়া যাত্রা করিলাম। নদীর তীরে আমাদের কোরের সকলে সমবেত হইয়া আমাদের বিদায় দান করিল। মাত্র ৩৬ জন যাইতে পারিল; এবং ইহাদের থাকিতে হইল বলিয়া সকলেই মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের আনন্দে ইহারাও সর্ব্বান্তকরণে যোগদান করিয়া হাস্য ও অশ্রুর সহিত আমাদের বিদায় দিল। বেঙ্গল ষ্টেশনারি হসপিটাল, কর্ণেল নট ও বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স কোরের জয়ধ্বনি করিয়া এবং বন্ধুবর ডাক্তার ভট্টাচার্য্যকে "আনি খল্লি বুসক্" জানাইয়া আমরা যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

উপগুপ্ত

ইঁহার অপর নাম রতিগুপ্ত। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পায় ১১০ বৎসর পরে গুপ্ত নামক একটী

বৈশ্য বংশ মথুরায় বাস করিত। এই বংশে উপ নামে একজন গন্ধ বিক্রেতা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম মচ্ছ (মৎস্য) দেবী। তাঁহাদেরই পুত্রের নাম উপগুপ্ত। এই বালক ১৭ বৎসর বয়সে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি বৈশালী বিহারের সঙ্ঘপতি যশের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অন্যেরা বলেন ইনি মথুরাবাসী, হীন যান সম্প্রদায়ের মহাস্থবির সনবাসের শিষ্য। ইনি বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ লাভের জন্য সনবাসের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি ইহাঁকে কতকগুলি কৃষ্ণ ও কতকগুলি শ্বেত বর্ণের শিলাখণ্ড (নুড়ী) দিয়া বলিলেন, "যখন তোমার মনে কুচিন্তা আসিবে, তখন কৃষ্ণ প্রস্তর, ও সুচিন্তা উদয় হইলে শ্বেত প্রস্তর গুলি, একটী পাত্রে রাখিয়া নিজ মনের পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। পরে যখন দেখিবে সে সমস্ত পাত্রটী শ্বেত প্রস্তরে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে একটীও কৃষ্ণ প্রস্তর নাই, তখন আমার নিকট আসিয়া দীক্ষা লইও।"

উপগুপ্ত প্রথম দিন দেখিলেন যে, পাত্র মধ্যে সমস্তই কৃষ্ণ প্রস্তরে পূর্ণ হইয়া গিয়ছে। ইহাতে তিনি অতিশয় লজ্জিত হইয়া নিজ মনোভাব শোধনের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; এবং সুদৃঢ় মানসিক তেজে এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার পাত্রটী শ্বেত প্রস্তরে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি গুরুর নিকট যাইয়া নিজ চিত্তশুদ্ধি জানাইয়া দীক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাঁর বিষয়ে আরও একটী আখ্যান আছে যে, একজন মথুরাবাসিনী বারাঙ্গনা নিজ উপপতিকে হত্যা করিয়া তাহার মৃত দেহটা নিজ বাটীর প্রাঙ্গনে প্রোথিত করে, এবং বিদেশী একজন বণিকের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার হত্যা অপরাধ প্রমাণিত হইলে, রাজাজ্ঞায় সেই গণিকাকে নাসাকর্ণ ছিন্ন করিয়া অরণ্যে নির্ব্বাসিত করা হয়। উপগুপ্ত ভিক্ষা করিতে করিতে একদা অরণ্য

মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইয়া করুণ রসে গলিয়া গেলেন। বেশ্যা বলিল, "যখন আমি সুন্দরী ছিলাম তখন তোমায় কতবার ডাকিয়াও পাই নাই। এখন এ কুরূপার মৃত্যুকালে কেন আসিয়াছ?" উপগুপ্ত অশ্রু বিগলিত নেত্রে কাতরকণ্ঠে সেই অভাগিনীকে ধন, মান, রূপ ও যৌবনের, অসারতা বুঝাইয়া দিলেন। বেশ্যাও পরিতৃপ্ত হৃদয়ে আকুল প্রাণে ইঁহার নিকট দীক্ষা ভিক্ষা পাইয়া নিজ জঘন্য জীবন পবিত্র করিল। উপগুপ্ত অল্প দিন মধ্যেই জ্ঞান ও নিষ্ঠাজন্য বিশিষ্ট অর্হৎ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

আইসেন। তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের গলদেশে শবমালা (মড়ার মালা) ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। পরে তাহারা ইঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে ইনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন।

মথুরাই উপগুপ্তের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে থাকিয়া ইনি অসংখ্য মথুরাবাসী নাগরিকগণকে ও বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত নরনারী সমূহকে উপসম্পদা বা বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করেন। কেহ কেহ বলেন তিনি ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ রুদ্ধ পর্ব্বতে একটী গুহামধ্যে যে সকল লোককে

তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারানাথ বলেন যে, বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর ইঁহার ন্যায় লোকমান্য, হিতসাধক, দ্বিতীয় অর্হৎ বৌদ্ধসঙ্ঘে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইনি প্রথমে তিরভুক্তি (ত্রিহুৎ) জেলার অন্তর্গত বিদেহ (বেথিয়া) নগরের বসুসার নামক কোন গৃহস্থ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিহারের অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। তাহার পর কিছুদিন গন্ধমাদন পর্ব্বতে ছিলেন। তৎপরে নিজ জন্মভূমি মথুরানগরে আসিয়া শীর বা মুরুদ্ধ (গোবর্দ্ধন কি?) পর্ব্বতে নট ও ভট নামক বণিকের সংস্থাপিত বৌদ্ধ বিহারে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তথায় অবস্থান কালে মার (বৌদ্ধ শয়তান্) নিজ সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণকে লইয়া ইঁহাকে প্রলোভিত করিতে

বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন তাহাদের সংখ্যা গণনা করিবার জন্য একটী কাষ্ঠখণ্ড বা বংশকীলক প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। এখান হইতে সিন্ধুদেশে যাইয়া তথাকার রাজা মহেন্দ্র ও তৎপুত্র চমশকে দীক্ষা দেন, এবং কিছুকাল তথাকারি হংস সঙ্ঘারামে অবস্থান করেন।

তিনি তৎপরে কাশ্মীরে তিনমাস বাস করেন। তথায় নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ প্রদর্শন করেন। ইহার পর উপগুপ্ত মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। সম্রাট্ অশোকের আমন্ত্রণে নৌকাযোগে পাটলীপুত্র নগরে আসিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সম্রাট অশোকের সহিত ইনি বুদ্ধদেবের যে সকল লীলা-স্থল দেখিয়া আইসেন, সে সকল কথা আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। সম্রাট্ অশোক ইহাঁর পরামর্শ ও উপদেশ মতেই ভারতের নানাস্থানে চৈত্য, বিহার, স্তূপ, স্তম্ভ ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। * ইনি পাটনার বা পাটলীপুত্রের কুক্কুটারামে (বর্ত্তমান নাম ছোট পাহাড়ী) অবস্থান করিতেন। এই স্থানে অবস্থান কালে তাঁহার সহিত সম্রাটের যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা দিব্যাবদান নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

ইঁহার দেহাবসান বিষয়ে দুই মত। কেহ বলেন ইনি তীর্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইলে এই কুক্কুটারামেই তাঁহার নির্ব্বাণ লাভ হয়। অপর অপর কোন বৌদ্ধ পুস্তকে দেখা যায় যে তিনি চিরজীবী, এখনও নাগলোকে জীবিত রহিয়াছেন। কথিত আছে

* ফাহিয়ান বলেন যে, সম্রাট্ অশোক বুদ্ধদেবের দেহাবসান (অস্থি) সমন্বিত ৮টি স্তূপ বিনষ্ট করিয়া, দৈত্যগণের সাহায্যে ৮৪০০০ স্তূপ চৈত্য প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উপগুপ্ত, সম্রাটের অভিপ্রায় মত অলৌকিক শক্তি প্রভাবে দিবা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদন করেন। দৈত্যেরা ইহা গ্রহণ কাল মনে করিয়া পূর্ব্ব আদেশ মত একই সময়ে সমস্ত স্তূপ মধ্যে বুদ্ধদেবের চিতাভস্ম রক্ষা করে।

ইহাঁর আয়োজনে বর্ষাবসানে এ দেশে দীপাবলী (দেওয়ালী) উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজকেরা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে কার্ত্তিক মাসে মথুরায় বৌদ্ধদিগের মেলা বসিত। সেই সময় বুদ্ধভক্তেরা পুষ্পমাল্য, পতাকা প্রভৃতি দিয়া স্তূপগুলি বিভূষিত করিত। রজনীকালে প্রদীপশ্রেণী দিয়া সে গুলিকে আলোকিত করিত। মহাস্থবির উপগুপ্তই এই সকল প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি হিন্দুরাও ঐ সময়ে দেওয়ালী উৎসব করিয়া থাকেন। ইহাঁর সম্বন্ধে অপর একটী প্রবাদ এই যে, আমাদের দেশে পৌষ সংক্রান্তিতে সুয়াদুয়ার যে ভাসান হয় তাহা উপগুপ্তের মথুরা হইতে নৌকাযোগে পাটনায় আগমনের স্মৃতি মাত্র।

মিলিন্দ ও পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক মথুরায় উৎপীড়ন।

পুষ্যমিত্র—সম্রাট্ অশোকের খৃঃ পূঃ ২৩২ অব্দে তিরোধান ঘটে। মগধ সাম্রাজ্য ক্রমে খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া হীনবল হইয়া পড়িল। ইহার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পরে মৌর্য্য বংশীয় শেষরাজা বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া তাঁহার শুঙ্গবংশীয় বিদ্রোহী সেনাপতি পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাঁর রাজত্বের পঞ্চম বা ষষ্ঠ বৎসরে কপিশা বা কাবুলের গ্রীকবীর মিলিন্দ (Minander) বিপুল বাহিনী লইয়া সিন্ধু, সুরাষ্ট্র, মথুরা ও সাকেত জয় করিয়া কুসুমপুর (পাটনা) আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

অযাচিত উপদেশ

গিন্নীর কাছে হঠাৎ আজকে শুনলাম হৃষীকেশ,
(ভূতনাথও যেন বলছিল) তুমি পদ্য লিখছ বেশ।
চাকরি বাগাতে যদি মন হয়,
নকল করিয়া গোটাপাঁচ ছয়
মোদের আপিসে বড় বাবুটির বরাবর কর পেশ।

ভাল কথা—শুন, পদ্য লিখ্‌ছ, 'অমৃতাক্ষরে' লেখ,
'অমৃত'ছন্দে লিখে মাইকেল কত বড় হলো দেখ।
শক্ত শক্ত শব্দ লাগিয়ে
লেখ দেখি ভাই পদ্য বাগিয়ে,
নোবল প্রাইজ পেতে পারো যাতে দেবো তার উপদেশ।

গল্প লেখ ত ডিটেকটিভই সব হতে ভাল জেনো,
সাতকড়ি বাবু দেখতে দেখতে বড়লোক হলো কেন?
গুপ্ত হত্যা, গুম রাহাজানি,
জেল, দাগাবাজী, জাল, বেইমানি
ইত্যাদি কর লোমহর্ষণ ঘটনার সমাবেশ।

নাটক লেখ ত লিখ ভাই জেন খাসদখলের মত,
নইলে লিখিবে যাহাতে থাকিবে নাচগান হাসি যত।
কোরনা গিরিশ ঘোষের মতন
কেবল কাঁদুনী কথার বাঁধন
ট্র্যাজেডী কোরনা—মিলন করিয়ে বিয়ে দিয়ে কোর শেষ

রাজনীতি নিয়ে লিখনা লিখনা—হয়ে যেতে পারে জেল।
ব্রাহ্মদিগকে গালাগালি দিয়ে লেখ না আর্টিকেল!
উৎসাহ চাও, তা-আর দেবনা?
ছাপার জন্যে কিছু ভেবো না—
'আর্য্যভারতী' আপিসে রয়েছে আমাদের অমরেশ।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাহিত্য-সাধনার আদর্শ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন আমরা, সাহিত্য-সম্মেলন সম্বন্ধে এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য কয়েকটি আবশ্যক কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৎসরে বৎসরে সাহিত্যিকগণ একত্র মিলিত হইয়া যখন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তাঁহাদের সেই আলোচনা পরিচালনা করিবার জন্য, একজনকে সভাপতি নির্ব্বাচন করেন, তখন প্রথম চিন্তা করিতে হইবে—এই সভাপতির কার্য্য কি?—সভাপতিরূপে তিনি কি করেন?

সাহিত্য-সম্মেলন

আমাদের এই সম্মেলন, এখন একটি সামান্য ব্যাপার; কিন্তু সামান্য হইলেও আমরা ধর্ম্মবুদ্ধিতে ইহা পরিচালনা করিব। আমরা যতই অযোগ্য ও অক্ষম হইনা কেন, আমাদের লক্ষ্য উচ্চ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সভাপতির নিকট কি আশা করা উচিত, প্রারম্ভে তাহাই নির্দ্ধারণ করিতেছি।

আপনারা অবগত আছেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন কিছু দিন হইতে চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস। এই চারিটি বিভাগে চারিজন শাখা সভাপতি কার্য্য করিয়া থাকেন। আমাদের অবশ্য জেলা সম্মেলনে এখনও এই প্রকারের শাখা বিভাগ প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু কালে প্রয়োজন হইতে পারে।

সমগ্র বঙ্গের সাহিত্য সম্মেলনের যিনি সভাপতি হইবেন, তিনি যে বিভাগের সভাপতি, সেই বিভাগে বাঙ্গালী জাতি, এক বৎসরের মধ্যে কি করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিবেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন কোনও দেশের সাহিত্য, বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সম্বন্ধহীন একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নহে। সুতরাং বাঙ্গালী জাতি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সাহায্যে—ইতিহাসে, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও বিশুদ্ধ সাহিত্যে—এক বৎসরে কি করিয়াছে, তাহা আলোচনা করার পর, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকে, এই এক বৎসরে বিশেষরূপে স্মরণীয় কি কি করিয়াছে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। কারণ আমাদিগকে যে বিশ্বমানবের সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই।

সভাপতির কর্ত্তব্য

এই দুইটি কার্য্য ছাড়া আরও একটি বৃহৎ কার্য্য রহিয়াছে। আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাতি—আমাদের অতীত, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বর্ত্তমান পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির বর্ত্তমানের উন্নতিমুখী চেষ্টা ও সাধনা, আমরা যেমন জানিবার জন্য চেষ্টা করিব, সেইরূপ আমরা আমাদের অতীতকেও জানিবার চেষ্টা করিব। কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন জাতির শাস্ত্র সমাজ এবং সর্ব্ববিধ চেষ্টা ও উদ্যম উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া, পৃথিবীতে মনীষিগণের মধ্যে একটি সুবিপুল চেষ্টা চলিতেছে। জার্ম্মাণ ফরাসী প্রভৃতি জাতি ইহার পথ প্রদর্শক। ইংলণ্ডের মনীষিগণও এ বিষয়ে বহু চেষ্টা করিয়াছেন—এখনও সেই চেষ্টার বিরাম নাই। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতবর্ষের অতীতকে জানিবার জন্য এখন নবীন উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ রামদাস সেন, ডাঃ ভাণ্ডারকার ও লোকমান্য তিলক হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক অনেক ভারতীয় মনীষী, এই বিভাগে পরিশ্রম করিয়াছেন।

আমাদের অতীতকে গত এক বৎসরের মধ্যে, আমরা নূতন করিয়া কতটুকু বুঝিলাম এবং আমাদের অতীতকে বুঝিতে গিয়া পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির

অতীত বা কতখানি স্পষ্টীকৃত হইল, বৎসর বৎসর সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি কর্ত্তৃক তাহারও একটা হিসাব প্রস্তুত হওয় আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা এখন আমাদের সাধনার তিনটি ধারা পাইলাম। বর্ত্তমান এক বৎসরে আমরা কি করিলাম, বর্ত্তমান এক বৎসরে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি কি করিল, আর আমাদের বিস্মৃত ও উপেক্ষিত অতীতকেই বা আমরা কতখানি আপনার করিয়া বুঝিলাম—এই তিনটি ধারার ত্রিবেণী সঙ্গমই ভারতবর্ষের সাহিত্য-সাধনার পুণ্যতীর্থ হইবে।

সাধনার ত্রিধারা

কিন্তু যিনি সভাপতি হইবেন তিনি এই কার্য্য কি প্রকারে সাধন করিতে পারেন? তাঁহার অনুরাগ আছে, পরিশ্রম করিতেও তিনি প্রস্তুত, কিন্তু উপকরণ কোথায়? সমবেত চেষ্টার এইখানে প্রয়োজন। অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেক জেলার সদরে কি এমন একটি পুস্তকাগার ও পাঠাগার স্থাপনা করা যায় না, যেখানে এই প্রকারে সাহিত্য সাধনা করিবার উপকরণগুলি বৎসরের পর বৎসর সংগ্রহ করা যায়? আমরা অনেক সময় অনুভব করি যে ফরাসী, জর্ম্মান, গ্রীক ও এখনকার দিনে জাপানী ভাষায় অভিজ্ঞ লোক প্রত্যেক সাহিত্য-অনুশীলনের কেন্দ্রে দুই একজন করিয়া থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহে অভিজ্ঞ লোক থাকা যে দরকার তাহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় এম-এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, আমাদের একটি বিশেষ উপকার হইয়াছে যে, প্রত্যেক বৎসরে কয়েকটি করিয়া যুবক তামিলি, তেলেগু, মলয়ালম, কেনেরিস, গুজরাটী, পালি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষা শিখিতেছেন। এই সমুদয় যুবকেরা যদি ঐ ঐ ভাষার চর্চ্চা রাখেন এবং ক্রমশঃ বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলায় কর্ম্মের অনুরোধে ছড়াইয়া পড়েন, তাহা হইলে আমাদের প্রভূত উপকার হইবে।

সভাপতির কার্য্যপ্রণালী

প্রত্যেক জেলারই সদরে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি রহিয়াছেন। ইঁহাদের ভিতর হইতে এক একজন যদি ফরাসী জার্ম্মা . গ্রীক প্রভৃতি এক একটী ভাষা কিছু কিছু চর্চ্চা করেন, আর প্রত্যেক সদরে, পূর্ব্বে যে আদর্শ বলিলাম, সেই আদর্শ অনুযায়ী এক একটী করিয়া পুস্তকাগার ও পাঠাগার হয়, আর জেলার মধ্যে গ্রামে বা মফঃস্বলে যাঁহারা সাহিত্যানুরাগী এবং উন্নততর পদ্ধতিতে সাহিত্য রচনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যদি ঐ সহর হইতে গ্রন্থের ও শিক্ষকের সাহায্য পান, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যালোচনা সফলতা লাভ করিবে।

এই কার্য্যটী খুব কঠিন নহে। আমরা যখন বীরভূম সাহিত্যপরিষৎ করি, তখন অতি আনায়াসে বীরভূম টাউন হল লাইব্রেরীর নানারূপ সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে তথায় বাঙ্গলা পুস্তক একেবারেই ছিল না। সে সময়ে অতি সামান্য চেষ্টাতেই বহু বাঙ্গালা পুস্তক টাউন হলে আমদানী করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া Theosophy ও New Thought এর অনেক পুস্তক আমদানী হইয়াছিল। অবশ্য এই চেষ্টা এখন আর কেন নাই, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে আপনারা বৎসর বৎসর এই প্রকারের সাহিত্য-সম্মেলন করিয়া, যদি চেষ্টান্বিত হন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য আবার উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে।

আসল কথা এই সমুদয় কার্য্যে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। আর সমবেত ভাবে চেষ্টা করিতে হইলে কেবল সমবেত হইলেই চলিবে না। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া কর্ম্মের আদর্শ ও চেষ্টা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমরা কি করিতে চাই, কি করা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে একটা সুমীমাংসায় যাঁহারা উপস্থিত হন নাই, তাঁহারা কেবল মাত্র সমবেত হইয়া, কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না। এই প্রকারের সমবায়ের দ্বারা যাহা হয়, গীতা তাহাকে বিকর্ম্ম বলিয়াছেন।

সমবেত চেষ্টা

আমি সিউড়ী সহরে বসিয়া আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল আমার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া বঙ্গবাণীর মন্দিরে ঝাড়ুদারি করিতেছি। আমাকে যে সমুদয় অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহা

যদি বিস্তৃত রূপে কখনও বলিতে পারি, তাহা হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বুঝিতে পারিবেন মফঃস্বলে সত্য সত্য সাহিত্যপরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কি কি কার্য্য করা উচিত।

বর্ত্তমান সময়ে উন্নততর পদ্ধতিতে সাহিত্যালোচনা করিতে হইলে, প্রাতিদিন যে সমুদয় গ্রন্থের আবশ্যক হয়, তাহার মূল্য এতই বেশী যে, একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব। তুলনা মূলক ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থ (Comparative Philology, তুলনামূলক পুরাণতত্ত্ব (Comparative Mythology) প্রভৃতির মূল্য কত! অথচ এই সমুদয় গ্রন্থের আলোচনা না করিয়া, ভাষাতত্ত্ব বা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, তাহা একেবারে গ্রহণীয় হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে দেশ-বিদেশে যে সমুদয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, সে গুলিরই বা মূল্য কত! কলিকাতায় নানারূপ সুবিধা আছে। কিন্তু মফঃস্বলে বসিয়া যাঁহারা সাহিত্যালোচনা করিবেন, তাঁহাদের উপায় কি? অথচ, আমরা ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছি এবং সাহিত্য-সাধনার আদর্শ-আলোচনায় আমি সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, মফঃস্বলে সাহিত্য সাধনার স্বাধীন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং সাহিত্য-সেবকগণ বর্ত্তমান সময়ের নিম্ন ব্যবসায় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, ত্যাগ ও সেবার পথে আসিয়া না দাঁড়াইলে, আমাদের প্রকৃত কল্যাণের আশা নাই।

মফঃস্বলে সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র

অতএব মফঃস্বলে যাহাতে এই প্রকারের সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র অচিরে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই কেন্দ্র হইতে, আলোক ও স্বাস্থ্য, সমগ্র জেলার গ্রামে গ্রামে, পল্লী-বাসী দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে সংক্রামিত হয়, আপনারা সমবেত ভাবে, তাহার ব্যবস্থা করুন। আমি অতি সামান্য লোক হইলেও, এই উপদেশ দিবার অধিকার আমার আছে। আমি আমার একক চেষ্টায়, একমাত্র ভগবানের প্রীতি চাহিয়া, নিজে দারিদ্র্য ক্লেশ যথেষ্ট পরিমাণে সহ্য করিয়াও, সিউড়ী সহরে একটী সামান্য পুস্তকাগার গড়িয়া তুলিয়াছি। যাঁহারা বাঙ্গালা দেশে নানা জেলায় পরিভ্রমণ করেন, তাঁহারা বলেন—এই প্রকারের পুস্তকালয় বাঙ্গলায় অধিক নাই।

লাইব্রেরী করা, অনেক জায়গায় ফ্যাশন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ফ্যাশন হইলে, প্রকৃত কার্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রথমে চাই মানুষ, তাহার পর কর্ম্ম। যেখানে মানুষ নাই, সেখানে কর্ম্ম করিয়া কি হইবে? উষর ক্ষেত্রে বীজ বপন ও ভস্মে ঘৃতাহুতি পণ্ডশ্রম মাত্র।

আমাদের যেমন-তেমন গ্রন্থাগার হইয়াছে। কিন্তু এখন পড়িবার লোক কৈ? বাজে গল্পের বহি বা নূতন ছবিওয়ালা মাসিক কাগজ লইয়া যাইবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু গভীর ভাবে কোন বিষয়-বিশেষের অনুশীলন করিবার মত লোক, একেবারেই দুর্লভ। এই প্রকারের সাধু প্রকৃতি সম্পন্ন পাঠক পাইলে আমরা কষ্ট করিয়াও গ্রন্থ সংগ্রহ করিতাম। কিন্তু সে প্রকারের পাঠকের বড়ই অভাব। গ্রামে গ্রামে সাহিত্য সম্মেলন করিয়া, গভীরভাবে সাহিত্যালোচনা করিতে ইচ্ছুক এবং কতকটা নিষ্কামভাবে এই পথে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত—এই প্রকারের লোক যদি আপনারা দু'একজন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের অতি মহৎ উপকার হয়।

আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই প্রকারের লোকের অভাব হইবে না। আমাদের বীরভূম জেলা অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও অনেক বিষয়ে ভাগ্যবান। আমরা অনেকেই এখনও গ্রামে বসিয়া মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট আছি। আধুনিক নাগরিক জীবনের বিলাস ব্যসন যদিও প্রচণ্ড বেগে নানা প্রকারে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, তথাপি আমরা কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের মত একেবারে 'পরাজিত' হই নাই। আমাদের গ্রাম্য জীবন এখনও রহিয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এই জীবন আমাদের চিরস্থায়ী হউক।

উচ্চ চিন্তা করিতে হইলে মোটামুটিভাবে দিন যাপন করা প্রয়োজন ইহা আপনারা জানেন। Plain living and high thinking আমাদের বালককালের মুখস্থ

করা কথা। ভারতবর্ষ এই পথেই অমরতা লাভ করিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় আমাদের এই পথ অক্ষুণ্ণ থাকুক। কিন্তু আমরা স্থানে স্থানে দেখিতে পাই সাহিত্যালোচনার সামান্য বাতাস পল্লীগ্রামের কোনও লোকের গায়ে লাগিলে, প্রথমেই তাহার চাল বিগড়াইয়া যায়। সে কলিকাতায় হাঁটাহাটি করে। কি করিয়া নাম বাহির হইবে, সেই জন্য মাথাখোঁড়াখুড়ি করে—তাহার পর দুই একজন কৃতীলোকের দুয়ার ধরিয়া যদি একটু নাম হয়, তাহা হইলে চাঁদা তুলিয়া মোটর গাড়ী চড়িতে বা সিগারেট খাইতে শেখে।

সমবেত সাহিত্যান্দোলন করিয়া যদি মফঃস্বল হইতে এই প্রকারের লোক প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ মানুষের চরিত্রের উন্নতি হইল না—সামান্য কলমবাজী আর তাহার সহিত লোক ঠকাইবার উপায় জ্ঞান—ইহাই যদি দেশের মধ্যে ছড়াইয়া যায়, তাহা হইলে সাহিত্য সম্মেলনকে একটি সংক্রামক ব্যাধি বলিতে হইবে এবং এই সংক্রামক ব্যাধি আমাদের এই গরীব জেলায় না আসাই ভাল। অবশ্য এইরূপ যে হইবেই বা হইয়াছে, তাহা আমি বলিতেছি না। তবে একটা বড় কাজ করিতে গেলে অনেকদূর চিন্তা করিতে হয়। দেবতা পূজার মন্দির গড়িবার সময় অপদেবতা বা উপদেবতার আক্রমণ হইতে মন্দির রক্ষা করিবার জন্যও ব্যবস্থা করিতে হয়।

মফঃস্বলে সাহিত্যের কেন্দ্র কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। বীরভূমে অনেক সাহিত্যানুরাগী লোক আছেন এবং বড় লোক না হইলেও সাহিত্যের জন্য কিছুকিছু ব্যয় করিতে পারেন, এরূপ লোকের অভাব নাই। আমি আশা করি আধুনিক ও আবশ্যক গ্রন্থ সমূহ যাহাতে সংগৃহীত হয় এই সম্মেলন হইতে তাহার ব্যবস্থা হইবে।

সভাপতির কার্য্য কি তাহা বলিয়াছি এবং বর্ত্তমান অবস্থায় মফঃস্বলে বসিয়া একটী বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হওয়া যে কিরূপ কঠিন কার্য্য তাহাও বলিয়াছি। আমি কিছুদিন সময় পাইলে হয়ত অতি সামান্যভাবে একটা নমুনা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতাম। কিন্তু সময়াভাবে তাহাও পারি নাই।

বর্ত্তমান যুগে উচ্চশ্রেণীর সমালোচকেরা বলেন যে উপন্যাসই সর্ব্বোত্তম সাহিত্য; এখন উপন্যাসের যুগ চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বে নাটকের যুগ, তাহার পূর্ব্বে মহাকাব্যের যুগ ছিল। সাহিত্যের এই যে যুগ বিভাগ ইহা অবশ্য বিদেশীয় সমালোচকগণের নিকট আমরা পাইয়াছি। সাহিত্যের যুগের সহিত সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তনেরও সম্বন্ধ আছে একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

উপন্যাস বাহুল্যের অবাঞ্ছনীয়তা

ইংরাজী সমালোচক যখন বলিলেন—বর্ত্তমান যুগ উপন্যাসের যুগ, তখন আমাদিগকে যে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে তাহা নহে। আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে ইউরোপের সমাজের বা জনসাধারণের যে অবস্থা, আমাদের অবস্থা ঠিক সেই প্রকারের হইয়াছে কি না? হয়ত কেহ কেহ বিলাতী শিক্ষার প্রভাবে সেই অবস্থা লাভ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু জনসাধারণ ঠিক সেই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে কি না ইহা ভাবিবার বিষয়।

ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের সাহিত্যের তুলনা করিলে প্রথমেই আমরা বুঝিতে পারি যে, সমালোচনা করিয়া একটা জিনিষ বুঝিবার যে সামর্থ্য ইংরাজের হইয়াছে—সমালোচনা করিয়া নিজের স্বাধীন মত গঠন করিবার যে অভ্যাস সাধারণ ইংরাজের জন্মিয়াছে, আমাদের এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভের অসদ্ভাব বশতঃই তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও এই সমালোচনা-শক্তি ও স্বাধীন ভাবে মত গঠনের সামর্থ্য আমাদের দেশে এখনও গড়িয়া উঠিল না! লর্ড মর্লের গ্রন্থাবলী যদি উত্তমরূপে আমাদের সাহিত্য-সংঘ সমূহে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে আমার কথা প্রমাণিত হইবে।

সমালোচনা বৃত্তির অভাব

আজকাল অনেকে বাহিরের জিনিস লইতে অনিচ্ছা

প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন—আমাদের কি কিছুই নাই যে বিদেশের সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি আলোচনা করিয়া আমরা শিক্ষালাভ করিব? আমাদের যে কিছুই নাই তাহা নহে—যথেষ্টই ছিল, এবং যথেষ্টই আছে। কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষেই হউক, আর ভগবদিচ্ছাতেই হউক, যাহা কিছু উচ্চ ও মঙ্গলকর, একদিন তাহা হারাইতে বসিয়াছিলাম। সেই জড়তার অবস্থায়, বাহির হইতে ধাক্কা আসিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। একটা সামান্য উদাহরণ দেখুন—রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যখন সহমরণ লইয়া আন্দোলন হয়, তখন পণ্ডিতেরা সহমরণের সমর্থনে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই মন্ত্রটিকে মানিয়া লইয়া তর্ক করিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে আচার্য্য মোক্ষমুলারের চেষ্টায় যখন ঋগ্বেদীয় প্রাচীন পুঁথিসমূহ সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইল, তখন দেখা গেল যে ঐ মন্ত্রটির পাঠে ('অগ্রে' স্থলে 'অগ্নে') এমন ভাবে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল যে, তাহার যাহা প্রকৃত অর্থ ঠিক তাহার বিপরীত অর্থ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মনীষী কোলব্রুকও ইহা ধরিতে পারেন নাই! কিন্তু ইহা এখন ধরা পড়িয়াছে।

প্রতীচ্যের সহায়তার আবশ্যকতা

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চেষ্টায় বেদ প্রভৃতি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের যে আলোচনা হইয়াছে, তাহার সমুদয় সিদ্ধান্ত স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁহাদের উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা না করিলে আমরা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব। মোক্ষমুলরের অনুবাদের ভুল অনেকেই দেখাইয়াছেন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য ও তাহার ব্যাকরণ পাঠ করিয়া, তিনি যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তুলনামূলক পুরাণতত্ত্বের আলোচনা করিয়া তিনি হিন্দু আর্য্য (Indo-Aryan) জাতি সমূহের প্রচলিত ভাষার মৌলিক ধাতুগুলির যে রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কত জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং প্রতীচ্যের সাহায্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমাদিগকে সর্ব্বদাই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে আমাদের অপকার হইবে না—প্রত্যুত বিশেষ উপকার হইবে।

যাহাদিগকে Orientalist বলে—অর্থাৎ যে সমুদয় পাশ্চাত্য মনীষী পূর্ব্বদেশের শাস্ত্র সমূহ উত্তমরূপে আধুনিক পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের গবেষণার সহিত আমাদের উত্তমরূপ পরিচয় হওয়া আবশ্যক। আমাদের মহাভারত বা বেদান্ত লইয়া নব্য জার্ম্মাণী যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছে, আমাদের তন্ত্র লইয়া মার্কিণদেশে যে গবেষণা চলিতেছে, তাহার শতভাগের একভাগও আমরা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত করিতে পারি নাই!

অনেকে বলেন অর্থের অভাব, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব আমাদের এই পরাজয়ের কারণ। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। সুতীব্র ইচ্ছা থাকিলে, সমবেত চেষ্টা থাকিলে মানুষ কি না করিতে পারে? আজ যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা সম্ভব হইবে। স্বর্গীয় হরিনাথ দের মত বহুভাষাবিৎ বর্ত্তমান পৃথিবীতে কয়জন জন্মিয়াছেন? তিনি অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন ইহা আমাদের মহাদুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁহার জীবনের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী জাতির যে প্রতিভা আছে, তাহার আলোকে কেবল বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র পৃথিবী উপকৃত ও আলোকিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বভারতী আমাদের জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা আমাদের অতীব সৌভাগ্যের কথা। বিশ্ব-ভারতীর ন্যায় প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন আমরা প্রথম যৌবন হইতেই দেখিয়াছি। আজ রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই সুখস্বপ্ন সফল করিয়াছেন। তিনি ব্যতীত এ কার্য্য করিবার যোগ্যতা বা আর কাহার আছে? আমাদের বীরভূমে—জয়দেব চণ্ডীদাস ও নিত্যানন্দের দেশে—বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা যেন এই বিশ্বভারতীর সহিত সংসৃষ্ট হইয়া সাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর হই—ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

বিশ্বভারতী

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সমালোচনীবৃত্তি সুবিকশিত না হইলে, মানুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য

না জাগিলে ঔপন্যাসিক সাহিত্যের বাহুল্য জাতির পক্ষে হিতকর নহে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে এখন উপন্যাসেরই ছড়াছড়ি! তরলমতি যুবক আর অল্পশিক্ষিতা অলস স্বভাবা যুবতীরা এই সমুদয় গ্রন্থের গ্রাহক ও পাঠক। আমি ইহা বড়ই অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচনা করি। বিলাতে বা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে উপন্যাস সাহিত্যের বাহুল্য দেখাইয়া যাঁহারা আমাদের মতের প্রতিবাদ করিবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আপনাদিগকে আমার মত মানিয়া লইতে হইবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে দেশের ও সমাজের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনারা নিজ নিজ মত গঠন করিবেন—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।

উপন্যাস বাহুল্য

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য-সম্মেলন চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে। দার্শনিক শাখা ইহার মধ্যে অন্যতম। দার্শনিক শাখার যিনি সভাপতি হইবেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া সম্বৎসরের দার্শনিকী চিন্তা কি পরিমাণে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাঁহাকে তাহার হিসাব দিতে হইবে। বর্ত্তমান পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের দার্শনিকী সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার নিকট আশা করি। ইংরাজী ভাষায় যে সমুদয় মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজ বাহির হয়, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া পড়িলেই গুণবান ব্যক্তি এই কার্য্য অনায়াসেই করিতে পারেন। নীতিবিজ্ঞান বা Ethics সম্বন্ধে ত্রৈমাসিক কাগজ আছে—মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে মাসিক কাগজ আছে। তাহা ছাড়া হিবার্ট জর্ণাল প্রভৃতি দার্শনিক পত্রিকা সকলেরই পরিচিত। মফঃস্বলে বসিয়া ঐ সমুদয় কাগজ নিয়মিতভাবে সংগৃহীত করা এক ব্যক্তির পক্ষে কঠিন। কিন্তু সমবেত চেষ্টা থাকিলে, একটা ব্যবস্থা বা organisation থাকিলে ইহা সহজ হইয়া পড়ে। কেবল যে কাগজগুলিই আনা যায় তাহা নহে—দর্শন শাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া যাঁহারা ওকালতী বা শিক্ষকতা করিতেছেন, এবং দিনের পর দিন যাঁহাদের বিদ্যায় মরিচা পড়িয়া যাইতেছে, তাঁহাদিগকে খাটাইয়া এই সব জিনিষ পড়াইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে এই সকলের সারমর্ম্ম আমরাও মোটামুটি জানিয়া লইতে পারি।

দার্শনিক শাখা

সম্প্রতি দেখিলাম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় মূল গ্রীক হইতে গ্রীসীয় সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি বা cultureএর সহিত গ্রীসীয় সংস্কৃতির সুনিপুণ তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা বড়ই প্রশংসার কার্য্য হইয়াছে। "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয় সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে সমুদয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতেছেন তাহা বর্ত্তমান যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী। তিনি আধুনিক দর্শনশাস্ত্র সমূহ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং একালের লোক যাহাতে বুঝিতে পারে, ঠিক সেই ভাবে তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রচার করিতেছেন। পূর্ব্বে (অধুনা পরলোকগত) ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা নব্য বাঙ্গালীর দর্শনিকী প্রতিভার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু তিনি ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিও নব্য বঙ্গের দার্শনিকী চিন্তায় উচ্চশ্রেণীর দান। যাহা হউক, পূর্ব্বতন মনীষিগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমার সময়ও নাই সামর্থ্যও নাই। বর্ত্তমান সময়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বেদ ও বিজ্ঞান' বিষয়ক প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপনিষদ্ সম্বন্ধে প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান সময়ে দর্শন বলিতে অনেক জিনিষ বুঝায়। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বা জন ষ্টুয়ার্ট মিলও দার্শনিক, আবার কেয়ার্ড, গ্রীণ প্রভৃতিও দার্শনিক। কিন্তু দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে ইঁহাদের সংজ্ঞাই বিভিন্ন প্রকারের। আমরা কিন্তু কাহাকেও উপেক্ষা করিতে পারি না। যিনি প্রত্যক্ষবাদ বা Positivism প্রচার করিতেছেন, তিনিও দার্শনিক, আবার যিনি বাস্তব প্রয়োজনবাদ বা

Pragmatism প্রচার করিতেছেন তিনিও দার্শনিক। যিনি পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের (Experimental Psychology) প্রচারক তিনিও দার্শনিক। কিন্তু আমরা আমাদের দেশে দর্শন শাস্ত্র বলিলেই পরমার্থ তত্ত্বের আলোচনা বুঝিয়া থাকি। বর্ত্তমান কালে দর্শন বলিতে কি বুঝায়, তাহাও জানা দরকার। কেবল প্রাচীন দর্শনের স্বপক্ষে দুই চারিটি কথা বলিলেই দার্শনিক বিভাগের সভাপতির কার্য্য করা হইবে না।

আমাদিগের সমবেত সাহিত্যান্দোলন, দার্শনিক বিভাগে যদি কিছু সত্য সত্য করিতে চাহেন, তাহা হইলে দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস যাহা প্রতীচ্য জগতে নূতন নূতন মনীষী কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতেছে, সেই সমুদয় ইতিহাসের সহিত আমাদের দেশবাসিগণের যাহাতে পরিচয় হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ইংরাজী ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকেই উচ্চশ্রেণীর দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। অনেকে পরীক্ষা দিয়া বা প্রবন্ধ লিখিয়া যশোলাভও করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যার দ্বারা দেশের বিশেষ কোন কাজ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। যদিই বা হইতেছে, তাহা এতই অল্প পরিমাণে হইতেছে যে ধর্ত্তব্য নহে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীত বিদ্যাকে পরিপূরণ করিবার চেষ্টা আমাদের সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইংরাজী ভাষায় মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সাধারণ দর্শন দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ করেন। তাহা ছাড়া সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিরও আলোচনা হয়। হয়ত এমন দিন আসিবে যেদিন আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, এই সমুদয় বিষয়ের বাঙ্গালা ভাষায় পঠন পাঠন চলিবে। কিন্তু এতদিন তাহার সূচনা হওয়া উচিত ছিল। সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় এই সমুদয় বিষয়ের কি বক্তৃতা করাইতে পারেন না? অবশ্য কলিকাতায় সে প্রকার বক্তৃতা নহে—যাহার সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, যাহা শুনিতে বড় কেহ যায় না এবং যদিই বা কেহ যায়, তাহা হইলে অধিকক্ষণ থাকে না এবং থাকিলেও হয়ত কিছু পায় না। কিন্তু খবরের কাগজে যখন খবর বাহির হইয়াছে, তখন সেই বক্তৃতার যাঁহারা ব্যবস্থাপক তাঁহারা অম্লানবদনে চাঁদার খাতা লইয়া বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তির দ্বারে যাইতে পারেন। আমি এ-প্রকারের বক্তৃতার কথা বলিতেছি না! সত্যকার বক্তৃতা—যাহা হৃদ্য, শিক্ষা-প্রদ ও আকর্ষক—এই প্রকারের বক্তৃতার দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে ছাত্র-গণেরও উপকার হয়, আর দার্শনিকী চিন্তা দেশের মধ্যে অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

আমাদের সাহিত্যান্দোলনের আর একটি লক্ষ্য থাকা উচিত। যাঁহারা আধুনিক উচ্চশিক্ষা পাইতেছেন, তাঁহাদের সহিত সেকালের প্রাচীন বিদ্যায় যাঁহারা কৃত-বিদ্য সেই সমুদয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মানসিক ব্যবধান দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতেছে। প্রাচীন বিদ্যার অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহাতে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় উপাধিধারী পণ্ডিতের সংখ্যা বাড়িতেছে। অনেকে পাঁচটী বা সাতটী উপাধি লাভ করিতেছেন।

প্রাচীন ও নব্যপন্থী শিক্ষার্থীর মিলন

সংস্কৃত বিদ্যার এই প্রসার অবশ্য সুখের বিষয় বটে। কিন্তু বিদ্যার গভীরতা ক্রমেই যেন লুপ্ত হইতেছে—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! আমাদের বীরভূমে এখনও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম ন্যায়তীর্থের ন্যায় প্রাচীন পণ্ডিত রহিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রাচীন পণ্ডিত-গণের শাস্ত্রজ্ঞান বিস্ময়াবহ। কিন্তু এই শ্রেণীর পণ্ডিত-অধিক দিন আমাদের দেশে থাকিবেন না। এই প্রকারের পণ্ডিত রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষক হিন্দুসমাজের কার্য্য, সাহিত্য-সম্মেলন বা সাহিত্য পরিষদের কার্য্য নহে। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদ বা সাহিত্য-সম্মেলন যদি সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণের নিকট একালের বিদ্যার আলোক কিয়ৎ পরিমাণে লইয়া যাইতে পারেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আধু-নিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের সমক্ষে সেকালের বিদ্যার

কিরণ যদি কিয়ৎপরিমাণে ছড়াইয়া দিতে পারেন - এই উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থিগণকে মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত হইবার ও সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ভাবের আদান প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন,তাহা হইলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যবধান তাহা অচিরেই তিরোহিত হয়। জাপানে এক সময়ে প্রাচীন পন্থী ও নব্য-পন্থীর ভিতর এই প্রকারের ব্যবধান জন্মিয়াছিল এবং সেই ব্যবধান দূর করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। জাপানে নিদাঘ বিদ্যালয়ের (Summer School) প্রবর্ত্তনের দ্বারা এই ব্যবধান দূরীকৃত হয়। আমাদের দেশে প্রাচীন কালের বিদ্যা যে সমুদয় স্থানে আলোচিত হইয়া থাকে, সেই সমুদয় স্থানে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কিছুদিন করিয়া থাকিয়া যদি কিছু পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে উভয়দিকেই সুবিধা হয় এবং আমাদের জ্ঞানরাজ্যেও যথার্থ উন্নতি হয়।

এইবার ইতিহাস সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সমবেতভাবে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহারা অনেক সময়ে অসতর্ক ভাবে নানারূপ হাস্যোদ্দীপক মন্তব্য নির্ভয়ে ও নির্লজ্জভাবে প্রচার করিয়াছেন। অনেকে আমাদের সভ্যতা ও সাধনাকে অবজ্ঞা করিবার জন্যই যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এ সমুদয় কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেক সাধুপুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অতীব প্রশংসনীয়।

ইতিহাস-শাস্ত্র

এশিয়াটীক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতেই আমাদের দেশে ইতিহাসের আলোচনা একরূপ চলিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদও এই বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা কিছুদিন হইতে আমাদের সাহিত্যালোচনার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লইয়া আমাদের এই হতভাগ্য দেশে ইহারই মধ্যে দলাদলির ও গালাগালির সূত্রপাত হইয়াছে। সত্য নির্দ্ধারণ যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে মতভেদের জন্য মৈত্রীর অসদ্ভাব হইবে কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা বা ধনবান ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু এই পৃষ্ঠপোষকতা হইতেই স্থায়ী দলাদলির জন্ম হয়। যেখানে পৃষ্ঠপোষকতার প্রত্যাশা নাই, সেখানে বোধ হয় দলাদলি হয় না।

অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া সকল সময়েই যে একটা মীমাংসা পাওয়া যাইবে তাহা নহে। মীমাংসার জন্য আলোচনা নহে—আলোচনার জন্যই আলোচনা। মানুষের মধ্যে অনেকগুলি বৃত্তি আছে। এই বৃত্তিগুলির অনুশীলনের জন্যই মানুষ শাস্ত্রচর্চ্চা করে। মানুষের একটি বৃত্তির নাম—ঐতিহাসিকী বৃত্তি (historical sense)। এই বৃত্তির অনুশীলন আবশ্যক। বর্ত্তমানের যে কোন সমস্যা যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে এই বৃত্তির যথাযথ প্রয়োগ আবশ্যক। কিন্তু অনুশীলন না করিলে এই বৃত্তির বিকাশও হইবে না এবং আমরা ইহার যথাযথ প্রয়োগও করিতে পারিব না। অতীতের ইতিহাসে, মীমাংসার যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে; তবে এ জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোনও কারণ নাই। ইংরাজীতে যাহাকে উন্মুক্ত সমস্যা (বা Open question) বলে তাহা সকল সময়েই থাকিবে। কাজেই ঐতিহাসিক আলোচনায় ধৈর্য্য ও মত-সহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বোপরি সত্যনিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করা বড়ই অহিতকর সুতরাং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

বর্ত্তমানকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে বুঝিবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা আমাদের জাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপে অগষ্ট কোঁৎ ও হেগেল যে পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—প্রথমেই সূত্রস্থাপন করিয়া সেই সূত্রানুসারে সত্য সমূহের আলোচনা, যাহাকে অবরোহ-পদ্ধতি বলে,আমরা অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোকেরা স্বভাবতঃই সেই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। বর্ত্তমান যুগে কিন্তু আরোহ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। মনীষী মোক্ষ-

মূলর যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি সুষ্ঠুরূপে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা এই আরোহ পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশ। আমাদের দেশের মনীষী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ক্রম-বিকাশের সূত্র সম্বলিত তুলনা মূলক ঐতিহাসিক পদ্ধতির কথা ইউরোপের বিদ্বৎ সমাজে ব্যাখ্যা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন—ইহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার পদ্ধতির ইংরাজী নাম—Historico Comparative method, supplemented by Theory of Evolution। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহারা মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামাজিক প্রবন্ধ" পাঠ করিলে দেখিবেন যে, তিনি পূর্ব্বেই এই পদ্ধতির সূত্র স্থাপনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই মূল্যবান। আমার বলিবার কথা এই যে, দেশের লোকের ভিতর যাহাতে ঐতিহাসিকী বৃত্তির যথাযথ অনুশীলন হয়, সে জন্ম আমা-দিগকে চেষ্টা করিতে হইবে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বহু কর্ম্মী বহু কার্য্য করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নেতৃত্বে যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের গৌরবের কথা। আমাদের বীরভূমের 'বীরভূম বিবরণ' যে দুই খণ্ডে বাহির হইয়াছে তাহাও অতি প্রশংসার বিষয়। আমরা আশা করি ও প্রার্থনা করি, 'বীরভূম বিবরণে'র অবশিষ্ট অংশগুলি সত্বর বাহির হউক।

কিছুদিন হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতেছি। এসম্বন্ধে আধুনিক গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে F.E. Pargiter M.A মহাশয়ের Ancient Historical Tradition নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হই-য়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যন্ত্র ইহার প্রকাশক। পার্জ্জিটার সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। তিনি সমগ্র জীবন আমাদের বেদ ও পুরাণ আলোচনা করিয়াছেন। অতীত ভারতের ইতিহাস রচনায় বৈদিক ও পৌরাণিক—এই উভয় শ্রেণীর উপকরণের [illegible]ভেদ কি, সে সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি নূতন সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে J. F. Blackier প্রণীত The A B C of Indian Art নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতীয় শিল্পকলা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। Lionel D. Barnett সাহেবের Antiquities of India আধুনিক গ্রন্থ, মাত্র অল্পদিন পূর্ব্বে ইহা প্রচারিত হইয়াছে। বৈদিকযুগে ভারতীয় সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে, এই গ্রন্থখানি বিশেষ সাহায্য করিবে। এই সমুদয় গ্রন্থ আমাদের লাইব্রেরীর জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রকার মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহে আমরা দারিদ্র্য ক্লেশ সহ্য করিয়াও অর্থব্যয় করি। কিন্তু এসব বিষয়ের আলোচনা করে কে? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বা কলিকাতার ধনবান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বহু বহু লাইব্রেরীতেও যে সকল প্রাচীন অথচ মূল্যবান মাসিক পত্র নাই, আমরা তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে সংগৃহীত করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে দুই একজন সাহিত্যিক দূরদেশ হইতে আসিয়া পদধূলি দানে আমাদিগকে কৃতার্থ করেন। কিন্তু বীরভূম জেলার এবং এমন কি সদর সিউড়ীর কেহ তাহা জানেন কি না সন্দেহ! আমি বীরভূমের নিন্দা করিতেছি না—দেশের সাধারণ অবস্থাই এইরূপ!

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অনেক সভ্য আছেন। কিন্তু সভ্য সংখ্যা দেখিয়া কেহ বাঙ্গলা দেশের সাহিত্যা-নুরাগী লোকের সংখ্যার হিসাব করিবেন না। অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী যখন যেখানে কর্ম্মসূত্রে বদলী হইয়া যান, সেখান হইতে পরিষদের সভ্য যোগাড় করিয়া দেন। এই প্রকারে অনেকেই সভ্য হইয়াছেন। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি এই প্রকারে সংগৃহীত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সাহিত্য-পরিষদকে সাহিত্য 'পারিষদ' বলেন। সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধেও আমরা অনেক কথা শুনিতে পাই। এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে কোন

স্থানে সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে জমীদারেরা প্রজাদের উপর কিছু কিছু 'বাব' আদায় করিয়াছেন! আশা করি ইহা সত্য নহে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে জ্ঞানের বিস্তার ও সাহিত্যিকগণের জীবনের উন্নতিই সাহিত্যান্দোলনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই আন্দোলন যেন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন মাত্রে পরিণত না হয়।

কতকগুলি সুদক্ষ সাহিত্যপ্রচারক যদি দেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া নিয়মিতভাবে আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে অনেক কার্য্য হইত। সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতি করিয়া নবদ্বীপ পরিক্রমা, ব্রজপরিক্রমা প্রভৃতি গ্রন্থ ছাপাইয়া যে অর্থ হয়, সেই অর্থের দ্বারা এই প্রকারের প্রচার কার্য্য রক্ষা করা অসম্ভব নহে। কয়েক মাসপূর্ব্বে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রে সুকবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত সম্বন্ধে আলোচনায় আমি এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমরা মফঃস্বলের লোক, আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, সাহিত্য-রাজ্যে আমাদের প্রকৃত অভাব কি? এবং সেই অভাব কি প্রকারেই বা পূরণ করিতে পারি?

অনেক দিন সাহিত্যের আন্দোলন চলিতেছে। এখন আমাদের বুঝিতে পারা উচিত, কলিকাতার প্রতি চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। যাঁহারা সহৃদয় তাঁহারা সাহায্য করুন—কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অবনত মস্তকে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিব। কিন্তু আমাদিগকে জানিতে হইবে যে আমাদের গ্রামের কাজ গ্রাম হইতেই করিতে হইবে। আমরা দরিদ্র; দিন দিন আমাদের দারিদ্র্য বাড়িয়া যাইতেছে। নূতন নূতন ব্যাধি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিতেছে। গ্রাম্য দলাদলিতে আমরা জীর্ণ; দেশের ধন বন্যার স্রোতের ন্যায় রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে—আমরা অসহায় হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে একতাবদ্ধ হইয়া সাহিত্য ও সচ্চিন্তার সাহায্যে আমাদের এই দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বীণাপাণির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক, নরনারী সকলেই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বাণীর মন্দিরে সম্মিলিত হউক।

দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলিতে চাই। বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বব্যাপার বুঝিবার অভ্যাস যদি দেশের লোকের না হয়, তাহা হইলে কেবল বিজ্ঞানের গ্রন্থ তর্জ্জমা করিলেই কাজ হইবে না। এই কথাগুলি আমি পুনঃ পুনঃ কেন বলিতেছি তাহার হেতু নির্দ্দেশ আবশ্যক। আমরা সমস্ত ব্যাপার বাহির হইতে দেখিতে শিখিয়াছি। সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইবে, আসুন চাঁদা তুলিয়া কতকগুলি বড় বড় বই ছাপাইয়া ফেলা যাউক। ইহা বহির্মুখী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। যেমন বলা হইল—বিদ্যালয় করা যাউক, অমনি বড় বড় বাড়ী, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি সরঞ্জাম আমাদের মানস নেত্রের পুরোভাগে জাগিয়া উঠিল! বিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থা যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই হওয়া উচিত—পড়াইবে কে এবং কি পড়াইবে? অর্থাৎ প্রত্যেক প্রচেষ্টা, মানুষকে মুখ্য করিয়া আরম্ভ করিলে, প্রাণশক্তির সাহায্যে বা আত্মার ভূমিতে কার্য্য করা হয়। ভারতবর্ষের ইহাই নিজস্ব পদ্ধতি।

(বিজ্ঞান-শাখা)

বিজ্ঞানের আলোচনা সম্বন্ধে একটি কথা বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি। আমাদের দেশে কিছুদিন হইতে নূতন নূতন অবতার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং নূতন নূতন ধর্ম্মমণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছে। এই সব ধর্ম্মমণ্ডলী কর্ত্তৃক অসংখ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। সেই সমুদয় গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি দেখিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা যোগশক্তির দ্বারা এমন সব কার্য্য করিতে পারেন, যাহা সাধারণ লোকে করিতে পারে না—ইহা আমি অস্বীকার করি না। সিনেট (A. P. Sinnet) সাহেব তাঁহার Occult World গ্রন্থে যে সমুদয় সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক শক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাও না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম। সাইকিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটি প্রভৃতির যে চেষ্টা ও উদ্যম তাহারও আমি খুব প্রশংসা করি। কারণ এই সকল ব্যাপার অলৌকিক হইলেও বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিতে ইহার আলোচনা হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে অতি অল্প শিক্ষিত লোক কর্ত্তৃক যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘোষিত হইতেছে, এবং ব্যক্তিবিশেষের অলৌকিক কার্য্যকলাপ প্রচার করিয়া সরলচিত্ত নরনারীকে শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া কতকগুলি চতুর লোকের যে স্বচ্ছন্দে জীবিকার ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে কি প্রমাণিত হয়? তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আমাদের দেশে এখনও বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অগষ্ট কোঁৎ মানব সমাজের ক্রমবিকাশে যাহাকে প্রথম স্তর বলিয়াছেন, এবং যাহার নাম দিয়াছেন "অলৌকিকের দোহাই দিবার যুগ", আমাদের দেশে এখনও সেই যুগ চলিতেছে। আমি প্রাণের গভীর বেদনায় এই কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। আমি সংস্কারক নহি—আমি প্রাচীন পল্লীরক্ষণশীল হিন্দু, কিন্তু আমি মনে করি যে অলৌকিক সত্য হইলেও অলৌকিকের উপর ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভবও নহে সঙ্গতও নহে।

ভগবান মানুষকে বিচারণা শক্তি দিয়াছেন—তাহার যথাযথ সদ্ব্যবহার করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। বিজ্ঞান ধর্ম্মের বিরোধী নহে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানুষের ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে দৃঢ়ীকৃত করিবে—শিথিল করিবে না। দেশের কি দুরবস্থা, একটি সামান্য ঘটনার দ্বারা বুঝাইতেছি। একজন লোক, একজন কলেরাগ্রস্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। বই ছাপাইয়া প্রচার করা হইতেছে—অতএব তিনি সাধু, তোমরা পূজা লইয়া তাঁহার মন্দিরে প্রণামী দিয়া যাও—তাঁহার অলস, মুর্খ, অকর্ম্মণ্য ও চরিত্রহীন শিষ্যগণকে, রাজার আদরে খাওয়াইয়া পরাইয়া তোমাদের পরলোকের সুবিধা করিয়া লও! এই শ্রেণীর বই ছাপাইতে পয়সার অভাব হয় না—পয়সা-ওয়ালা অনেক লোক, এই শ্রেণীর বহি ছাপাইতে টাকা দিয়া সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সুলভে খ্যাতিলাভ করেন। আবার হয় ত দেখিব, তাঁহাদের মধ্যেই কেহ একদিন, সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

আমার বক্তব্য এই যে, রজার্সের মত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার, যিনি বহু গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া, কলেরা রোগের নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কলেরা আরোগ্য করিবার জন্য, যদি 'সাধু' বলিয়া কাহারও পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে এই রজার্স সাহেবেরই পূজা হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের চেষ্টায়, নানা রোগে উপদ্রুত মানবের বাসের অযোগ্য সুবিস্তৃত জনপদ, স্বর্গের ন্যায় স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়াছে। মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, পৃথিবীতে এই প্রকারে জয়যুক্ত হইয়াছে ও আজও হইতেছে। কিন্তু এই সব কথা আমাদের দেশে কতটুকু প্রচারিত হয়? কলেজে যাহারা বিজ্ঞান পড়িয়া পাশ করিয়া বাহির হইয়া যায়, চাকুরী না পাইলে তাহারাই, অলৌকিক ঘটনা প্রচার করিয়া অবতার গড়িয়া নূতন ধর্ম্ম মণ্ডলী খাড়া করে। এই ঘটনা দেশের মধ্যে সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। আজও যাহাদের মানসিক অবস্থা এইরূপ, তাহারা বিজ্ঞান চর্চ্চা হইতে, এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে!

ইংরাজ কবি টেনিসনের "প্রিন্সেস্" নামক কাব্যে একটি মেলার বিবরণ আছে। সে একটি গ্রাম্য মেলা। সেখানে বিজ্ঞানের বিজয় মহিমা, নানারূপ দৃশ্যের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। আমাদের দেশেও এইরূপ মেলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। আমাদের দেশে গ্রামের লোক ব্যারামে ভুগিতেছে, নিকটে চিকিৎসক আছে, দাতব্য চিকিৎসালয় আছে—কিন্তু ডাক্তারকে দেখাইয়া ঔষধ খাইবে না! কারণ সে বুঝিয়াছে, অদৃষ্টের ফল এড়াইবার উপায় নাই—সে অলস, একেবারে তমোগুণে আচ্ছন্ন, আত্মশক্তির মহিমা কি, সে ভাবিতে পারে না। সেই মানবের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে, বিজ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতে, সহস্র সহস্র নিষ্কাম কর্ম্মীর প্রয়োজন। আমাদের এই সাহিত্য সম্মেলন হইতে, এই প্রকারের কর্ম্মীর উদ্ভব হউক।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব? আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হইবে। যে দেশে আচার্য্য প্রফুল্ল

চন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের উদয় হইয়াছে—যে দেশ হইতে এই দুই চন্দ্রের প্রতিভা-কৌমুদী সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে জাতি বিজ্ঞান রাজ্যে যে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বোলপুর-শান্তি-নিকেতনের সুধী শ্রীজগদানন্দ রায়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি কোনও মৌলিক গবেষণা করেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার করিয়া দেশের উপকার করিতেছেন।

সমাপ্তি

আপাততঃ আমার আর কিছুই বলিবার নাই। আপনারা হয় ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার কথা শুনিয়া, যদি কেহ বলেন—'ছোট মুখে বড় কথা'—তাহাহইলে আমার দুঃখ করিবার কারণ নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, আমার মনে হয়, তাহা অত্যন্ত সাধারণ কথা। কোনও কথায় কিছুমাত্র নূতনত্ব নাই। যদি নূতন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আপনারা দয়া করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এবং আমার ভ্রান্তি সংশোধিত করিয়া আমায় উপকৃত করিবেন।

কোন কোনও স্থানে, সমালোচনা যদি তীব্র হইয়া থাকে, তাহাহইলে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি প্রায় একা,—অথবা, এক আধজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া, ঘরের কোণে বসিয়া, নানারূপ চিন্তা করি। সুতরাং সামাজিক জীবনে, যাঁহারা চলা-ফেরা করেন, তাঁহাদের ন্যায় অসীম সহিষ্ণুতা এবং মার্জ্জিত ভাব আমার হয়ত নাই! আমার উক্তির ভিতর যদি এককণাও সত্য থাকে, দয়া করিয়া তাহাই গ্রহণ করিবেন।

আমরা কেহই চিরদিন থাকিব না। যিনি ছিলেন, তিনিই আছেন, এবং চিরদিন চিরকাল একমাত্র তিনিই থাকিবেন। অতীতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনে, বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তিনিই লীলা করিয়াছেন। আবার, আজ বর্ত্তমানে, যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও জীবনে, চিন্তায়, কল্পনায়, আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় তিনিই, তাঁহার আনন্দের খেলা খেলিতেছেন! আমরাই বা কয়দিন?—কোন্ অজানা অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া যাইব। এই রঙ্গমঞ্চে নব নব অভিনেতা ও অভিনেত্রী আসিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া, আলোকে আঁধারে নব নব খেলা খেলিবে। কিন্তু তাহাদেরও জীবনে যিনি খেলিবেন, তিনিই সেই এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষ! তিনিই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানরূপ ও প্রেমরূপ। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, আমাদের ব্যক্তিগত বৈষম্য দূরীভূত করিয়া, আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ সত্ত্বেও, তাঁহার নামে সম্মিলিত হইয়া, তাঁহার চরণে প্রণত হই—তাঁহার কৃপায়, আমাদের এই সাহিত্য সাধনা সফল হউক।*

শ্রীশিবরতন মিত্র।

* বীরভূমের হেতিয়া গ্রামে সাহিত্যিক-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে (১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৯) সভাপতির অভিভাষণ রূপে পঠিত।

অন্ধের কাহিনী

আকাশের আলো দেখি নাই আমি,
অরুণ আমারে দিয়েছে ফাঁকি;
অকরুণ ভরে চিরতরে মোরে
বিধাতা আঁধারে রেখেছে ঢাকি।

দিন গুণি শুধু দিন গুণি,
সুখ স্বপনের জাল বুনি,
মনের খেয়ালে নিশিদিন ধরে
রঙ দিয়ে প্রাণে ছবি আঁকি;-

আশার কুহকে মরীচিকা রচি
হতাশার জ্বালা জুড়ায়ে রাখি!

দেখিনি শিশুর উল্লাস গতি,
কলরোল শুনি চারিটি পাশে;
তারা কি আমার অন্ধতা হেরি
বিদ্রূপ করি এমন হাসে?

মা'র হাসি ও গো মা'র ছবি,
আঁকা আছে মোর হৃদে সবি,
কেমনে জানাব কি যে শিহরণ
তোলে জননীর ব্যথিত শ্বাসে;
সামালিয়া হায় রাখিতে যে নারি—
বুক ঠেলে মোর কান্না আসে!

কুসুমের শোভা জানিনা কেমন,
সৌরভ তবু হৃদয় হরে;
উদাসী পবন পথ ভুলে বুঝি
অন্তরে মোর লুটায়ে পড়ে।

বিফল জীবন একা বাহ'
কেমনে সবার আড়ে রহি?
চারি দিক হতে সুরের পরশ
আমারে যে এসে পাগল করে।
বাঁধন যতই টুটিবারে চাহি
ধরণী ততই আঁকড়ি ধরে!

করুণায় গলি আসে বুঝি সবে
মিতালী করিতে আমার সাথে;
কত ব্যথাতুর মমতা মধুর
সুনিবিড় ডোরে আমারে গাঁথে।

এত সুখ আমি কোথা রাখি?
দীনতা আমার কিসে ঢাকি?
স্নেহের সুধায় বুক ভরে যায়,
হৃদয় আমার উলসি মাতে।
নয়ন পাতায় পাইনি যাহায়
দেখি সে যে আছে পরাণ পাতে!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

শিকার ও শিকারী

কৈফিয়ৎ।

সকলকেই সব কাযে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়; অন্ততঃ দেওয়া উচিত। সেই হিসাবে আমারও কৈফিয়ৎ এই—

আমার ছেলেবেলা হইতেই খুব শিকারের সখ। সেই সখের বহ্নি জীবনের এই মধ্যাহ্ন-শেষেও সমভাবে জ্বলিতেছে। ইহাকে কোন দিন নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করি নাই; বরাবরই ইন্ধন যোগাইয়া সমভাবে প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছি।

আজকাল সহরে, বন্দরে, হাটে বাজারে, এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামের মাঠেও যেরূপ ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতির চর্চ্চা দেখিতে পাই, তাহাতে দেশের মধ্যে যে একটা জীবন্ত ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্কুল কলেজ এমন কি ইউনিভার-সিটির কর্তৃপক্ষেরা পর্য্যন্ত ইহার জন্য বিশেষ বিধান করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এই শ্রেণীর খেলা (Sport) সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রযোজ্য। এই সকল উদ্দীপক আনন্দদায়ক বীরোচিত খেলা মনুষ্যের কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনের অবসর সময়ে যেমন শান্তি দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই জীবনী-শক্তি ও মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি করে। এইগুলি যেমন খেলা, শিকারও তেমনই খেলা। যত রকমের খেলা আছে, আমার বিশ্বাস শিকার সকলের রাজা। শিকার করিবার সুবিধাও সকলের সহজলভ্য নহে।

পশু হননই যদি শিকার হয়, তবে কসাইরা বা মিউ-নিসিপালিটির ডোমেরা বড় শিকারী। শিকারী হওয়া একটা শিক্ষা। এ শিক্ষা বিনা সাধনায় হয় না। ইহার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিতে হয়। শুধু তাস পাশা খেলিয়া অবসর সময়ে দুই চারিটা চাঁদমারী করিলেই শিকারী হওয়া যায় না। ইহার জন্য অধ্যবসায়ের সহিত বিশেষ পরিশ্রম ও সাধনা করিতে হয়।

আমাদের দেশে দুই চারিজন বড়লোক আছেন যাঁহারা যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া সময় সময় শিকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা কেবল নামের জন্য। প্রকৃত শিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের আছে কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বড় মানুষের একটা যোগ্যতা থাকা উচিত, সেই নাম জাহির করার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা শিকার করিয়া থাকেন।

আমার ছেলেবেলা হইতে অন্যান্য খেলার সখ তেমন বেশী না থাকিলেও, শিকারের বাতিক বরাবরই প্রবল। তাই মনে হয় ইহা আমি ওয়ারিশীসূত্রে পাইয়াছি। আমার স্বর্গগত পিতৃদেবও শিকারী ছিলেন। তিনিও যথেষ্ট শিকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে আমাদের অঞ্চলে প্রচুর শিকার ছিল। আমাদের সময়ে তদপেক্ষা ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া এখন প্রায় লুপ্ত হইবার মত হইয়াছে; তথাপি আমার জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসরের সাধনায় যে সব শিকার করিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।

আমি সাহিত্যিক নহি। সাহিত্য জগতে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় ইহা লিখিতেছি না। বই লিখিয়া জগতে বড় শিকারী (sportsman) হইবার দুরাশাও আমার নাই। তবে তিনটি কারণে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। প্রথমতঃ, এখন আমার যথেষ্ট অবসর আছে। দ্বিতীয়তঃ কতিপয় বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ। আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, আমার এই সাধনার ফলদ্বারা আমার ন্যায় বাতিকগ্রস্ত নবীন শিকারীদের সময়োচিত যদি কোন উপকার হয়। ইহাই আমার লিখিবার কৈফিয়ৎ।

সূচনা।

আমার এই শিকারের বিবরণ উপন্যাস পাঠের ন্যায় সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ ইহাতে ভাষার চাতুর্য্য ও কবিত্বের মাধুর্য্য নাই। যাঁহাদের শিকার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে বা যাঁহারা শিকার সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশেই ইহা লিখিতেছি।

একবার কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে গিয়া কতিপয় বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে একটা বাঘ শিকারের উদ্দীপক গল্প বলিতেছিলাম। হঠাৎ কলিকাতাস্থ কোন ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন "আপনি বাঘ শিকার করেন? জ্যান্ত বাঘ?" তদুত্তরে আমি সংক্ষেপে মাত্র বলিয়াছিলাম, "আজ্ঞে না, মরা বাঘ মারি।" বলা বাহুল্য ইহাতে উক্ত গৃহখানি হাস্য কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কলিকাতায় যাঁহারা ভোগবিলাসে বর্দ্ধিত, বৈদ্যুতিক পাথার বাতাসেও তৃপ্ত না হইয়া অনবরত বরফ জলে তৃষ্ণা নিবারণ করেন, মোটর ছাড়া যাঁহারা পঙ্গু, হাঁটিয়া বেড়ান যাঁহাদের কাছে কল্পনার জিনিষ, আমার এই নীরস কাহিনী তাঁহাদিগকে সরস করিতে পারিবে না। ইহাতে জঙ্গলের ভীষণ গম্ভীরতা, শিকারের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্যম এবং কঠোর ব্যাধবৃত্তি লিপিবদ্ধ হইবে। আমি এ পর্য্যন্ত যত স্থানে যে ভাবে যত শিকার করিয়াছি, তাহার কতক কতক ও জঙ্গলের বিবরণ এবং বধ্য পশু পক্ষীর স্বভাব ও আবাসভূমি এবং আগ্নেয় অস্ত্রের শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ যে জাতীয় বন্দুক দ্বারা যে শ্রেণীর শিকার করা সুবিধা, তৎসম্বন্ধে আমার যাহা জ্ঞান তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।

বন্দুক ও তাহার ব্যবহার।

শিকারী মাত্রেরই বন্দুক সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত। অনেকের ধারণা বন্দুক হইলেই বুঝি শিকার করা চলে। সচরাচর গ্রাম্য শিকারীরা একনলা গাদা বন্দুক (muzzle loading gun) দিয়াই শিকার

করিয়া থাকে। তাহার দুই কারণ—প্রথমতঃ তাহারা বেশী মূল্যের বন্দুক ও তাহার টোটা (cartridge) অর্থাভাবে ক্রয় করিতে অসমর্থ। আর যদিই বা কেহ সমর্থ হয় তাহাও আমাদের মত হীন পরাধীন জাতির অদৃষ্টের ফেরে সরকার অনেক সময়ই পাশ (license) মঞ্জুর করেন না, ইহাও অন্যতম কারণ। কাযেই তাহারা নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষা ও সখ নিবৃত্তি গাদা বন্দুক দিয়াই করিয়া থাকে। এই সব বন্দুক সাধারণতঃ মুঙ্গেরের দেশী কারিকরের তৈয়ারী। এই সব বন্দুক কখন কখনও একনলা (single barrel), কখন কখনও দোনলা (double barrel) হয়। ইহার দ্বারাই তাহারা পাখী ও জানোয়ার উভয় শিকারই করিয়া থাকে। ইহাদের বারুদের পরিমাণ সম্বন্ধেও বিশেষ কোন জ্ঞান নাই। সে বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ বলিলেই হয়। সাধারণতঃ বারুদের কাতির মাথার চোঙ্গের তিনভাগ (¾) পাখী শিকারে ও ব্যাঘ্র মহিষ হরিণ প্রভৃতি জানোয়ারে পূর্ণ এক চাঙ্গ বা কিছু বেশী ব্যবহার করে। কোন কোন সময় উহারা দোতালা করিয়াও বন্দুক ভরে। একবার বন্দুকে বারুদ ও গুলি ভরিয়া খড় কুটা বা কাগজ দিয়া গাদাইয়া, পুনরায় গুলি ও বারুদ দিয়া আর একবার ভরে। এই ব্যবস্থা বিশেষ বিশেষ শিকারের সময় করিয়া থাকে। ইহাদের ধারণা এই প্রণালীতে ডবল করিয়া ভরিলে জোরও ডবল হয়। ইহাকেই দোতালা ভরা বলে।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে হইল, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে আজ ২৬২৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা। একবার আমরা আমাদের দেশে ভবানীপুর নামক স্থানে শিকার করিতে যাই। একদিন বাঘের খবর পাইয়া শিকারে বাহির হইলাম, আমাদের সঙ্গে তথাকার একজন স্থানীয় মান্দাই (aboriginal race) শিকারী ছিল। উহাদিগকে মাটিয়া পালোয়ান বলে। তাহাকে এক গাছে উঠাইয়া দেওয়া হইল। এইরূপে বনের মধ্যে আরও কতকগুলি লোককে বিভিন্ন গাছে উঠান হইল। উদ্দেশ্য এই যে আমাদের লাইনের বাহির দিয়া বাঘ পলাইয়া গেলে হুইস্ল দিয়া সংবাদ দিবে। প্রথমে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহার বন্দুক দোতালা করিয়া ভরিয়াছিল। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় বাঘের সন্ধান হইবার অল্প পরেই বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তিদের মধ্যে "ঐ যায়—ঐ যায়" করিয়া চিৎকার শুনা গেল। আমরা এই চিৎকারে ব্যস্ত না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটু পরেই হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ডাক শুনিতে পাইলাম। তন্মুহূর্ত্তেই কতকগুলি লোক "রামুকে খাইল, রামুকে খাইল" বলিয়া চেঁচাইতে শুনিলাম। এই গোলযোগে আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম, লাইন নষ্ট হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া দেখি, রামু চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে কিছু রক্তের দাগও দেখা গেল। উহাকে ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিতে দেখা গেল, সে অচেতন হইয়া গিয়াছে। তখন আর কি করা যায়? আমাদের হাওদার বোতলে (Flask) যে জল ছিল তাহাই উহার মাথায় দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করা গেল। দেখা গেল তাহার ডান হাত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গলার হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহা হউক তাহাকে অতঃপর আমাদের শিকারের ডাক্তারের (Camp Doctor) অধীনে কিছুদিন রাখিতে হইয়াছিল। পরে জানিতে পারিলাম, রামু গাছের দুই ডালে দুই পা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আমাদের লাইনের তাড়ায় বাঘ তাহার গাছের তলা দিয়া যাইবার সময় সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া নিচের দিকে ঝুঁকিয়া আওয়াজ করাতে, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের ধাক্কায় (kick) গলার হাড় ভাঙ্গিয়া গাছ হইতে পড়িয়া যায়। পরে যখন ঐ বাঘ আমরা শিকার করি, রামুর গুলিতে সেটা খুব জখম হইয়াছিল দেখিতে পাই। আনাড়ীর দোতালা বন্দুক ভরার ফল অনেক স্থলে এইরূপই হইয়া থাকে।

ইহারা অনেক সময় জালের কাঠি বা শিশার টুকরা, দা কি কুড়াল দিয়া কোন রকমে ঠুকিয়া একটু গোল করিয়া নলের ভিতর দিতে পারিলেই গুলির মত কাষ হয় বলিয়া মনে করে। কোন কোন সময় ইহারা এই শ্রেণীর দুইটি গুলি বা পেরেকের চ্যাপ্টা মাথাও ব্যবহার

করে। আর একস্থলে এইরূপ দোতালা ভরা বন্দুকের নল আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেকটা উড়িয়া যাইতেও দেখিয়াছি।

এই শ্রেণীর শিকারীরাও বাঘ, হরিণ, মহিষ অনেক সময় মারিয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া পাছে কাহারও বিশ্বাস হয় যে যখন ইহাতেই কায চলে, তখন আর ভাল জিনিষের আবশ্যকতা কি? এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই উল্লিখিত গল্পটি লিখিলাম।

ইহারা অনেক সময় এই প্রণালীতে কৃতকার্য্য হইলেও, বহু সময়ই বিফল হয়। পা টিপিয়া টিপিয়া ইহারা জানোয়ারের অতি নিকটে গিয়া বা কোনও সময় গাছের উপর হইতে আট দশ হাতের মধ্যেই গুলি করে। ইহারা সর্ব্বদাই জানোয়ারের মর্ম্ম স্থলে (vital part) গুলি করিতে চেষ্টা করে। সুবিধা না হইলে অনেক সময় বিপদের আশঙ্কায় গুলি না করিয়া ফিরিয়াও আইসে। এই ভাবে সদা সর্ব্বদা বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে দশ পাঁচ দিনে এক একটা শিকার করে। কিন্তু সখের শিকারীদের পক্ষে এ জাতীয় আশঙ্কায় (risk) যাওয়া সমীচীন নহে।

সাধারণতঃ শিকারের বন্দুক দুই রকম। ১। Smooth bore gun ইহা দ্বারা ছর্‌রা ও গুলি (shots and balls) উভয়ই ছোড়া যায়। তবে সাধারণতঃ ইহা ছর্‌রার জন্যই ব্যবহৃত হয়। ২। রাইফেল (rifle) ইহাতে গুলি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার চলে না। ইহার ভিতরে পেঁচ কাটা (rifling) থাকে বলিয়া গুলির খুব জোর হয়। দড়িতে কোন জিনিষ বাঁধিয়া (sling) ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিলে যেরূপ বেগে চলিয়া যায়, বন্দুকের নলের ভিতর পেঁচ কাটা থাকায়, গুলি নলের পেঁচের মধ্য দিয়া খুব জোরে ঘুরিয়া বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ইহার শক্তি অত্যন্ত অধিক।

রাইফেল সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। (ক) big bore rifle (খ) high velocity express rifle। বিগবোর রাইফেলে সাধারণতঃ কালো বারুদই ব্যবহৃত হয়। বারুদের পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও ইহার নলের ছিদ্র (bore) বড় হওয়ার দরুণ গুলিও বড় ও ভারি হয়। এই জন্য গন্তব্য স্থানে পৌছিতে লাইন একটু বাঁকা (trajectory) হয়। Express rifleএ তাহা খুব কম হয়। বারুদের পরিমাণে গুলির আকার অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া লাইন সোজা যায়। এই শ্রেণীর বন্দুকের নলের ছিদ্র ছোট বলিয়া, গুলি ছোট হইলেও, আজ কাল নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈয়ারী বলিয়া গুলি অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্যকর (effective) হয়। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল এই জাতীয় বন্দুক নানা শ্রেণীর বাহির হইয়াছে। ইহাদিগকে high velocity express rifle বলে। এই সব বন্দুকে ধূমশূন্য (smokeless) বারুদ বা Cordite নামক একরকম explosive ব্যবহার হয়। বারুদও আজকাল নানাশ্রেণীর বাহির হইয়াছে। তাহাতে একদিকে যেমন ধোঁয়া হয় না, অন্যদিকে তেমনি প্রচণ্ড শক্তি (energy) উৎপাদন করে।

যাঁহারা হাঁটিয়া শিকার করেন, এই বারুদ তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ও সুবিধাজনক। হাঁটিয়া শিকারের অর্থই অনেক সময় স্বেচ্ছায় বিপদের সম্মুখীন হওয়া, কাযেই তাহাতে আমোদও বেশী। কোনও হিংস্র জন্তুর প্রতি আওয়াজ করিলে বন্দুকের সম্মুখে যে ধূম বাহির হয়, তাহা হাওয়া না থাকিলে অধিক হয় এবং ৮।১০ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়, তাহাতে সম্মুখের আর কিছুই দেখা যায় না। বন গভীর হইলে ধূম আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আওয়াজ করিয়াই যদি আহত শিকারকে দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করা যায় না বলিয়া অনেক সময় শিকার (Game) ছাড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক হয়। পক্ষান্তরে আহত জানোয়ার হিংস্র হইলে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কাও যথেষ্ট থাকে। ধূমশূন্য বারুদে সে সম্ভাবনা নাই। অতি অল্প কুয়াসার মত সাদা ধূম বাহির হয় মাত্র। কাযেই আওয়াজ করিয়াই নিজেও সতর্ক হওয়া যায়, জানোয়ারের গতিবিধিও লক্ষ্য করা যায়।

High velocity rifleএর আর এক সুবিধা এই যে, এইগুলি সহজে বহন করা যায়। যাঁহারা বনে বনে হাঁটিয়া শিকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বড় কম সুবিধার কথা নহে। এই সব বন্দুক বাহির হওয়ার পর শিকারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে ঘোড়াওয়ালা বন্দুক (hammer gun) ব্যবহৃত হইত। এখন ঘোড়াশূন্য (hammerless) বন্দুক বাহির হওয়ার পর, যাঁহারা একবার ইহা ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা আর ঘোড়াওয়ালা বন্দুক ব্যবহার করিতে চাহেন না। ইহার সুবিধা অনেক। ঘোড়াওয়ালা বন্দুকের অর্দ্ধেক সময়েই ইহা ছোড়া যায়। এই স্থলে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যাঁহারা ঘোড়াওয়ালা বন্দুক ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সব বন্দুকই এক জাতীয় হওয়া উচিত; নচেৎ অনেক সময় তাড়াতাড়িতে কোন শ্রেণীর বন্দুক হাতে আছে তাহা ভুলিয়া গিয়া গোল হইয়া যায়। ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে—বিশেষ হাঁটা শিকারীদের পক্ষে।

বন্দুকের ব্যালেন্স আর একটি মস্ত কথা। মূল্যবান বন্দুকের ব্যালেন্স ভালই হয়। যে বন্দুকের ব্যালেন্স যত ভাল হয় তাহাদ্বারা নিশানাও (aim) তত ভাল হয়। কাযেই বন্দুকও খুব ভাল হয়। কিন্তু বন্দুক যতই ভাল হউক না কেন, শিকারীর নাচিতে জানা উচিত, নচেৎ পরে উঠানের দোষ হইয়া পরে। শিকারীর নিজের উপর একটা আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত। মাত্র এইটুকুর জন্যই যথেষ্ট সাধনা ও গুলি বারুদ খরচ করিতে হয়। বন্দুক কিনিয়া দুই চারিটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া বা দৈবাৎ কোন শিকার করিয়া, যদি কোন ভ্রান্ত গরিমা মনে আইসে, তবে তাহা ভুল। ইহার ফল পরে বিষময়ও হইতে পারে।

যাহাদের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আছে, বা যাহারা পানাসক্ত, তাহারা কখনও ভাল শিকারী হইতে পারে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে বলিয়াই দৃঢ়তার সহিত লিখিতে সাহসী হইয়াছি। এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

আমার আরও ধারণা এই যে, যাঁহারা চশমা ব্যবহার করেন, শিকারে তাঁহাদের প্রতিবন্ধকতা জন্মে। তবে শিকার করিতে পরিপক্ক হইয়া হাত দুরস্ত হইয়া গেলে তখন চশমাতে আর বড় বেশী আটকায় না।

যাঁহারা পাখী শিকারে তৃপ্ত, বা যাঁহাদের বড় জনোয়ার শিকারের সুবিধা বা সুযোগ বড় একটা নাই তাঁহারা ছর্‌রার বন্দুক ব্যবহার করিবেন। এই বন্দুকও দুই প্রকার—১। Cylinder অর্থাৎ যাহাদ্বারা গুলি ও ছর্‌রা দুই চলে। ২। Choke ইহাতে সুধু ছর্‌রাই ব্যবহার করা হয়। কোন কোন বন্দুকের ডান নল সিলিণ্ডার হইয়া বাম নল চোক হয়। সর্ব্বসাধারণ শিকারীর পক্ষে ১২নং Cylinder shot gun ভাল।

পাখী শিকারের মধ্যে Snipe (কাঁদা খোঁচা) শিকারই সব চেয়ে আনন্দদায়ক। শ্রমসাধ্য হইলেও ইহাই শ্রেষ্ঠ শিকার। যাঁহারা Snipe শিকার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের বন্দুক খুব ভাল 'ব্যালেন্স'-এর হওয়া দরকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বন্দুকের ব্যালেন্সের সহিত শিকারের সাফল্যের বিশেষ সম্বন্ধ। Snipe শিকারীদের ধূমশূন্য বারুদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, নচেৎ Snipe শিকার এক প্রকার অসম্ভব, কারণ একে এই পাখী খুব ছোট, তাহাতে আবার মাটিতে ঘাসের উপর বসিয়া থাকে, সব সময় দেখা যায় না। উড়াতে flying shot মারিতে হয়। আর একটি কারণ ইহাদিগকে প্রখর রৌদ্রের সময় শিকার করিতে হয়, এবং ইহারা খুব জোরে এবং বক্রগতিতে উড়ে, কাযেই ধোঁয়া হইলে এই পাখী শিকার করা চলে না। অন্যান্য সমুদয় পাখী কালো বারুদে শিকার করা চলে।

Smooth bore বন্দুক সম্বন্ধে আর অধিক লিখিব না, কারণ এই জাতীয় বন্দুক বাঙ্গলার বহুস্থানে অল্প বিস্তর দেখা যায় বলিয়া ইহার সম্বন্ধে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে।

এখানে আর একটি কথা বলিয়াই এই বিষয় শেষ করিব। যাঁহারা এই বন্দুক ব্যবহার করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন যে ইহার গুলি ৪০।৫০ গজের বাহিরে কার্য্যকর হয় না এবং বন্দুকের যে নল choke হয়, তাহাতে যেন গুলি ভরা না হয়। ইহাতে নল ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। সিলিণ্ডার নলেই গুলি ব্যবহার হইয়া থাকে। অধিক দূরে ইহার গুলির শক্তি না থাকিবার কারণ, এই বন্দুকের নম্বর অপেক্ষা গুলি এক নম্বর ছোট হয়, বারুদও খুব বেশী দেওয়া চলে না। কাযেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে গুলি ঢিলের মত থপ করিয়া পড়ে। এই জন্যই ৫০।৫০ গজের বাহিরে শক্তি কমিয়া যায়। কোনও পুরু চামড়ার জানোয়ারের উপর ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়। বাঘ, চিতা প্রভৃতির পক্ষে ৩০।৪০ গজের rifle অপেক্ষা ইহা বড় হীন বলিয়া মনে হয় না।

ইহাতে যদি সম নম্বরের গুলি ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে গুলি আঁট (tight) হয় বলিয়া নল ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ঠিক এই কারণে Choke নলে গুলি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

ইহা ছাড়া Paradox নামক আর এক রকম Semi rifle বন্দুক বাহির হইয়াছে। ইহার নলের মাথায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ পেঁচ কাটা (rifling) থাকে, এই জন্য ইহা প্রায় rifleএর মত শক্তিশালী হয়।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা ও বন্ধু শিকারীদের অভিমতে যাহা বুঝিয়াছি, ইহার গুলিও ৬০।৭০ গজের বাহিরে খুব কার্য্যকর হয় না। কিন্তু এই ব্যবধানে rifleএর মত কায করে। খুব ঘন জঙ্গলে যেখানে সাধারণতঃ দূরে জানোয়ার প্রায় দেখাই যায় না, আর দেখা গেলেও হঠাৎ চকিতে দেখা যায়, সেই সব স্থানে এই বন্দুক বড় ফলদায়ক। ইহা rifle অপেক্ষা পাতলা হাওয়াতে Snap shot মারিবার পক্ষে বড় উপযোগী। অনেক সময় এরূপ ভাবে গুলি মারিতে হয় যে চোখ বুজিবার ও বন্দুক বুকে লাগাইবার সময়ও পাওয়া যায় না। সেই সব সময়ে এই বন্দুক খুব ফলপ্রদ। এই বন্দুকের আর একটি সুবিধা এই যে, ইহাতে ছর্‌রা ব্যবহার করাও চলে এবং তাহা রীতিমত কার্য্যকর হয়। কিন্তু সাধারণ ছর্‌রার বন্দুক অপেক্ষা ইহা ভারি হয়। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, বাঘ হরিণ ছাড়া পুরু চামড়া জানোয়ারে ইহা মোটেই কার্য্যকর হয় না। সম্প্রতি আমার কোনও বন্ধু ১২নং প্যারাডক্সে এক প্রকাণ্ড Bison মারিয়া আনিয়াছেন। তাহার মাথা আমি নিজে দেখিয়াছি। অবশ্য অত্যন্ত নিকটে ১০।১৫ গজের মধ্যেই উহার বুকে মারিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে ঐ বন্দুকই ছিল, উহা রাখিয়া rifle লইবার আর সময় পান নাই। বাধ্য হইয়া উহাদ্বারাই মারিতে হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি একগুলিতে একটি Bison নিহত করা এই বন্দুকের পক্ষে কম বাহাদুরী নয়।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

বিদায় স্মৃতি

মনে পড়ে বাষ্প ঢাকা অশ্রু ছলছল
ম্লান দুটি নীল আঁখি তারা
মনে পড়ে মুখখানি পবিত্র সরল
হিমসিক্ত গোলাপের পারা।
বিদায়ের শেষক্ষণে সেই আকুলতা
বদন বিষাদ মেঘে ঢাকা,
চির জনমের মত মম চিত্তপটে
সে মূরতি হয়ে আছে আঁকা।

বিনিদ্র সারাটি নিশা দীর্ঘশ্বাসে যাপি,
ঊষালোকে বাঁধি বাহু ডোরে,
অশ্রুসিক্ত রুদ্ধ কণ্ঠে কহেছিলে কাঁদি—
"প্রিয়তম! ভুলোনাক মোরে।"
আমি তো ভুলিনি প্রিয়ে! এসেছি আবার;
তুমি কেন জাহ্নবীর কূলে?
ভুলিতে নিষেধি মোরে, জনমের মত
তুমিই আমারে গেলে ভুলে!

শ্রীরাধারাণী দত্ত।

হেমচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মবিশ্বাস। হেমচন্দ্র হিন্দুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মেই আস্থাবান ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন হিন্দুশাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই পাশ্চাত্য ধর্ম্মবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ, যথা, বিচারপতি দ্বারকা-নাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টা-চার্য্য কোমতের ধ্রুববাদের পক্ষপাতী ছিলেন। হেমচন্দ্র ধ্রুবদর্শনসংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিয়াও হিন্দুধর্ম্মে শিথিলবিশ্বাস হন নাই। হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এতৎপ্রসঙ্গে আমাদিগকে কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়া-ছিলেন :—

"তিনি (হেমচন্দ্র) যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের পরম বন্ধু হইলেও বোধ হয় Positivist ছিলেন না। তবে কি যে ছিলেন তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। তাঁহার সহিত একদিন মাত্র আমার ধর্ম্মের কথা হইয়াছিল. সে দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা বিনোদ বাবু হেমবাবুর খিদিরপুরের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। আমাকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ত ব্রাহ্ম?" আমি বলিলাম, "আমি ব্রাহ্ম কেন হইতে গেলাম?" জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি?" আমি বলিলাম, "হিন্দু।" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর দেবতা সব মান?" আমি বলিলাম, "ঠাকুর দেবতার কথা বলিতে পারি না, আমি এক ভগবান মানি।" উত্তরে বলিলেন, "তা হ'লেই এক রকম ব্রাহ্ম হ'লে।" তার পর বিনোদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো বাবু, তোমার কি?" বিনোদ বাবু খাঁটি হিন্দু ছিলেন, আর শ্বশুরের তর্ক-শক্তিকে বড় ভয় করিতেন। তিনি বলিলেন, 'আমি কালী দুর্গা সব মানি। আপনি রক্ষা করুন,আমার বিশ্বাস টুকু টলিয়ে দেবেন না।" হেমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তোমাকে কিছু বলব না।" তার পর আমার সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কিন্তু তাহা ঠিক মনে নাই। ভাবে আমি বুঝিয়াছিলাম যে হেমচন্দ্র তখনকার অনেকের মত Refined Hindu ছিলেন।"

যখন ৺ রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রচার' মাসিকপত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হইতে-ছিল তখন হেমচন্দ্রের সহিত আর একবার আশুবাবুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল। আশুবাবু আমাদিগকে লিখিয়াছেন—

"একদিন বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া তাঁহার সহিত আমার কথা হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু সেদিন হেমবাবুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তিনি চলিয়া যাইবার পর আমার ডাক পড়িল। আমি বলিলাম, "যা হোক বঙ্কিম বাবু হঠাৎ খুব হিন্দু হয়ে গেলেন।" হেমচন্দ্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে জানলে?" আমি বলিলাম, "এই যে কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন।" তিনি বলিলেন, 'এইজন্যে? বঙ্কিম যা ছিলেন তাই আছেন,তবে উনি একটা intellectual giant, যা ধরেন তাই masterly ভাবে deal করতে পারে। ওতে ভুল না।' পরে কিন্তু বঙ্কিম বাবুর বাস্তবিক একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। হেম বাবু কিন্তু শাস্ত্র বিহিত সামাজিক ক্রিয়া কলাপ করিতেন।"

যৌবনে হেমচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে একটু প্রবণতা দেখা দিয়াছিল। 'চিন্তাতরঙ্গিণী'তে একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন :—

"দুর্ব্বল মানব মন সেই সে কারণ।
পুজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন ॥
সাকার স্বরূপে তাই নিরাকার ভাবে।
মাটী পূজা করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে ॥
একবার এরা যদি প্রকৃতি-মন্দিরে।
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত-বন্ধুরে ॥
শিব দুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল।
পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল ॥
কি প্রতিমা দশভুজা করেছে গঠন।
সে কি তাঁর রূপ যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥
কথায় সৃজন যাঁর কথায় প্রলয়।
দশভুজা নারীরূপ তাঁরে কি সাজায় ॥
কিবা জবা বিল্বদলে তুষিবে সে জনে।
ধরা পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে ॥
কিবা ধূপ দীপ গন্ধ তাঁর যোগ্য দান।
যেই জন ধূপ ধুনা কস্তুরি নিদান ॥
কি মন্দিরে তাঁর মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
সসাগরা ক্ষিতি ব্যোম যাঁহার রচন ॥
সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্ম নাম।
মুক্তি পদ জানি সেই পরব্রহ্ম ধাম ॥"

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন নহে—উহার একটী শাখা মাত্র। হেমচন্দ্র এই সময়ে একেশ্বরবাদী হিন্দু ছিলেন বলিলেই ঠিক বলা হয়। কিন্তু তিনি আজীবন হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী প্রচলিত আচারাদি মানিয়া চলিতেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ ধ্রুববাদের পক্ষপাতী হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করেন নাই। হেমচন্দ্র হিন্দু-ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া এই সকল ক্রিয়া কলাপাদি করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্রের পিতৃশ্রাদ্ধের পর কেশব-চন্দ্র সেন একটি বক্তৃতায় হেমচন্দ্রের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া 'কুসংস্কারপূর্ণ' হিন্দু আচারাদি পালন করিয়া যে নিজ নিজ বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে হেমচন্দ্র Brahmo Theism in India নামক একখানি পুস্তিকায় কিজন্য শিক্ষিত হিন্দু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার কোনও কারণ দেখিতে পান না এবং কি জন্য তিনি হিন্দু আচারাদি মানিয়া চলেন তাহা প্রদর্শিত করেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে হেমচন্দ্র ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন এবং এই বিষয় লইয়া কত গভীর চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে পত্রান্তরে (মালঞ্চ, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৫) এই পুস্তকখানির সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। প্রস্তাবটীর উপসংহারাংশের নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতে হেমচন্দ্র এই বিষয়ে কি মত পোষণ করিতেন তাহা জানিতে পারিবেন :—

"শিক্ষিত দেশবাসিগণ ধর্ম্মকে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান মনে করেন। তাঁহারা কোনও ধর্ম্মবাদকে ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু বা ব্রাহ্ম কেহই ভ্রান্ত সংস্কার বা অযৌক্তিকতা হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহারা ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান হইতে পারেন না, কারণ হিন্দু থাকিয়া বিশ্বাসের মান রক্ষা যেরূপ অসম্ভব, ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান হইলেও সেইরূপ অসম্ভব। হিন্দু, হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভগিনী ও ভ্রাতা সকলেই হিন্দু। এ ক্ষেত্রে যে সমাজে জন্ম সেই সমাজে অবস্থান ভিন্ন গতি কি? মনুষ্য-বিদ্বেষী হইয়া মানব সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে বাস? যাঁহারা তাঁহাদিগকে ভণ্ড বলেন, তাঁহাদিগের কি এই অভিপ্রায়? জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে, যে সমাজে বাস করিতে হইবে, সেই সমাজের আচার ব্যবহারাদি পদদলিত করাই কি কর্ত্তব্য? এই তর্ক আরও একটু প্রসারিত করা যাউক। এক ব্যক্তির স্থির ধারণা হইল, রাজতন্ত্র দুষ্য ও অহিতকর। তবে কি তাহার পক্ষে রাজহত্যাই কর্ত্তব্য হইল? এবং সকল দেশে ও সকল কালে রাজা অতি ঘৃণ্য রাক্ষস বিশেষ ইত্যাকার নিজমত প্রচার করাই কি তাহার উচিত? আমার ত মনে হয়, প্রত্যেক নগরবাসীর উচিত, রাজতন্ত্র বিষয়ে

নিজের মত ভিতরে যাহাই হউক, যে দেশে বাস করিতে হইতেছে সেই দেশের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গুলির প্রতি অন্ততঃ বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করা, এবং যতদিন উক্ত দেশে বাস করিতে হইবে ততদিন প্রচলিত রাজবিধানগুলি যতই অসঙ্গত বোধ হউক না কেন, তাহার বশ্যতা স্বীকার করা। অন্ততঃ ধর্ম্মান্ধ বা উন্মাদ ব্যক্তি ভিন্ন প্রত্যেক নগরবাসীরই এই নিয়ম প্রতিপালন করা সাধারণতঃ উচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। শিক্ষিত দেশীয়গণ উন্মাদও নহেন, ধর্ম্মান্ধও নহেন, সুতরাং তাঁহারা মানবজাতি-সাধারণ সদ্বুদ্ধির প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। হিন্দুদিগের ধর্ম্মসংস্কারাদি তাঁহারা সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করেন। তাঁহারা ইহার দোষ দেখিতে পান, এবং তাহার জন্য আক্ষেপ করেন। কিন্তু বাধ্য হইয়া তাহা সহ্য করেন। তাঁহারা দোষটার প্রতিবিধানের চেষ্টাও করেন কিন্তু বল প্রকাশদ্বারা নহে। সামাজিক রীতি ও আহারাদি, এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আচারাদি তাঁহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমোদন করেন, সংশোধনেরও ইচ্ছা করেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে প্রেম ও ভক্তি করেন, এবং যাঁহাদিগের সহিত জীবনের নানারূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ আছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া সংশোধন করিতে চাহেন না। তাঁহারা বিনা বল প্রয়োগে অথচ সম্যক্‌রূপে ঐ কার্য্য সমাধা করেন। আমাদের নিজ গার্হস্থ্য চক্রের মধ্যে এবং কখন কখনও অধিকতর প্রকাশ্যভাবে প্রচলিত শিষ্টাচার ঘটিত বহু বিষয়ে শিক্ষিত দেশীয়গণ পুরাতন প্রথা অগ্রাহ্য করেন; মাতা, পিতা, ভগিনী, বন্ধু ও আত্মীয়গণ তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়াও দেখেন না; অতি মন্থর গতিতে ক্রমশঃ গভীর-মূল প্রথার আধিপত্য শিথিল হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের চরিত্রপ্রভাবে নূতন ও বিরোধী মতগুলি ক্রমশঃ অধিকতর প্রতিপত্তি ও বিস্তার লাভ করে। হিন্দু সমাজের বিষয় যে কেহ অবগত আছেন, সত্য করিয়া বলুন, উক্ত সমাজে কত বিরোধী ভাব অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং উহা শিক্ষিত দেশবাসিগণের কার্য্যের ফল কি না? বাস্তবিক কোন ব্যক্তিকে নিজ বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে হইবে বলিলে এই মাত্রই বলা হয় যে, তাহার নিজের চরিত্রে এবং সাধারণ কার্য্য পরম্পরায় নিজের বিশ্বাস ও অভিমত কি তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে এবং দেখাইতে হইবে যে তদ্বিরুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছে তাহা নিবারণের উপায় না থাকায় বাধ্য হইয়া সহ্য করিতে হইয়াছে। এবং আমি প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়া নির্ভয়ে বলিতেছি যে, শিক্ষিত দেশীয়গণ ইহা সম্পূর্ণরূপে এবং সরল ভাবে করিয়া থাকেন। তাঁহারা হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ, তাহাহইলে মনুষ্য সমাজ পরিত্যাগ করিতে হয়। যেহেতু এরূপ কোন সমাজ নাই যাহার সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত আচার ব্যবহারাদির সহিত তাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তাঁহারা মনুষ্যবিদ্বেষী হইতে বিশেষ ইচ্ছুক নহেন এবং সকল প্রিয়তম এবং নিকটতম আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার কোন আবশ্যকতা বা প্রশংসনীয়তা দেখেন না। সুতরাং যে সমাজে তাঁহারা অদৃষ্টক্রমে পড়িয়াছেন, সেই সমাজেই থাকিয়া এবং যে সকল ব্যক্তিকে প্রেম ও ভক্তির উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছে তাঁহাদিগকে প্রেম ও ভক্তি করিয়াই তাঁহারা সন্তোষলাভ করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে কোন কোন সময়ে হিন্দু সমাজের প্রচলিত যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের (কারণ অনেকগুলি আচার যুক্তি বিরুদ্ধই বটে) অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা—যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও স্পর্শক্ষম ও বাস্তব দেবতা স্বরূপ—যাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে মহত্তম, পবিত্রতম এবং মধুরতম—তাঁহাদের বন্ধন ছিন্ন করা অধিকতর পাপজনক ও অকর্ত্তব্য।"

হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না, কিন্তু যে উচ্চ নৈতিক জীবন যাপন করা, যে সকল সদ্‌গুণের অনুশীলন করা, সকল সভ্যজাতির ধর্ম্মেই উপদেশ দেয়

হেমচন্দ্র যে সেইরূপ উচ্চ নৈতিক জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই।

হেমচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কতদূর উন্নতি সাধিত করিয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ সমূহে যথাসাধ্য প্রদান করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। পাশ্চাত্য গীতিকাব্যের বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব-সম্পদ-সমৃদ্ধ ছন্দোবৈচিত্র্য-হেমচন্দ্রের স্থান। পূর্ণ রচনাপদ্ধতি হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর দ্বারাই বাঙ্গালা সাহিত্যে অসাধারণ সাফল্যের সহিত প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত হয়। আধুনিক গীতিকাব্যের তিনি অন্যতম জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গীতি কবিতার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার কবিতাগুলির বিশেষত্ব এই যে সেগুলি ভাবপ্রধান। "শবদে শবদে বিয়া"দিবার জন্য কিংবা "কথা গেঁথে শুধু নিতে করতালি"হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি উচ্চতম ভাবের প্রেরণায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যকে অনেক ঊর্দ্ধে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ, তাঁহার লক্ষ্য অতি উচ্চে অবস্থিত ছিল এবং তিনি তাঁহার প্রেমঘটিত কবিতাগুলিকেও "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন" প্রভৃতি ভাবদ্যোতক টপ্পায় পর্য্যসিত হইতে দেন নাই। একজন সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন—"হেমবাবুর রুচি ও নীতি অতি উচ্চ ও অতি বিশুদ্ধ। পাপের প্রতি বিদ্বেষ, অত্যাচারের প্রতি ক্রোধ, সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা, দুঃখীর প্রতি দয়া, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা, পবিত্রতার প্রতি ভক্তির সঞ্চার, হেমচন্দ্রের কবিতাপাঠে পাঠক উপলব্ধি করিবেন। হেমবাবুর কবিতা কখনও বা বোধ হয় ধর্ম্ম মন্দিরে বেদী হইতে পঠিত হইবার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে—কখনও বা বোধ হয় নির্ব্বাসিত ম্যাটসিনার জলন্ত হৃদয়ভেদী রচনাবলীর ন্যায় ভূতগৌরব-বিস্মৃত সুষুপ্ত অধীন জাতিদিগকে জাগরিত করিবার জন্য রচিত হইয়াছে।"

হেমচন্দ্র যে গীতি কবিতার ক্ষেত্রে চিরদিন একটি বিশিষ্ট ও গৌরবান্বিত আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন তাহা একটি বিষয় চিন্তা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে। 'জগৎ কবি সভায় মোরা যাঁহার করি গর্ব্ব' সেই 'গানের রাজা' রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার বিশাল সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশেই তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রযুক্ত করিয়া বিশ্ববাসীকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি এত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ভাব এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দে আবদ্ধ করিয়া এত রকম সুরে আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা তাঁহার পরবর্ত্তী কেহ তাঁহার অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন সে আশা অল্প। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ যত জটিল ও সূক্ষ্মভাব লইয়া গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন, হেমচন্দ্র তত করেন নাই। হেমচন্দ্র যে সকল ভাব তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অতি সরল অতি সনাতন। কিন্তু তিনি যে যে গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা সংখ্যায় অল্প হইলেও, তাহার মধ্যে এমন একটু বিশেষত্ব আছে যাহা রবীন্দ্রনাথেও নাই। কোন কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্রের বিশেষত্বগুলি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কিছুকাল পূর্ব্বে 'দুই রকম কবি হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সুচিন্তিত প্রবন্ধে অতি সুন্দর ও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সহিত সর্ব্বত্র একমত না হইলেও তাঁহার সেই সুললিত সন্দর্ভের কোন কোন অংশ নিম্নে সঙ্কলনযোগ্য বিবেচনা করি :—

সামাজিকতা (Collectivism) হেমচন্দ্রের "কাব্যে সামাজিকতা অতি সুন্দর পরিস্ফুট হয়; তিনি যাহা ভাবেন যাহা করেন, তাহা দশের জন্য, লোক সমষ্টির জন্য, একাকী ঘরের কোণায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে এমন লোকের বা 'পর্ণকুটীরে অতি বিষন্ন' নির্জ্জন বনবাসীর প্রতি উদ্দেশ করিয়া হেমচন্দ্রের কবিতা গীত হয় নাই। তাঁহার প্রতি ছত্রে দেখা যা

যে তিনি সর্ব্বদা মনে রাখিতেন যে তিনি জনসমষ্টির মধ্যে একজন; যেন এ জগৎ ছাড়িয়া বাহিরে একা দাঁড়াইয়া নীরবে অন্ত সব লোককে দেখিতেছেন,এ রকম তাঁহার মনের ভাব নহে। সপ্তকোটী ভ্রাতার সঙ্গে একত্র দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতেছেন, সপ্তকোটী কণ্ঠের কলকল নিনাদের সুর তিনি ধরাইয়া দিতেছেন এবং নিজেও তাহাতে যোগ দিতেছেন, ইহাই তাঁহার ভাব। * * * এই ভাবের পূর্ণ বিকাশ তাঁহার স্বদেশ-প্রেমমূলক পদ্যগুলিতে। এক্ষেত্রে হেম সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। এগুলি আমাদের সকলেরই হৃদয়ে গাঁথা আছে, সুতরাং বেশী কথা বলার প্রয়োজন নাই।

হেমচন্দ্রের রাজনৈতিক কবিতাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের সেই মত কবিতার তুলনা করিলেই বুঝা যায় হেমচন্দ্র কত সামাজিক, রবীন্দ্র কত একক (individualistic)। রবীন্দ্র দেশের দশা ভাবিয়া যেন একা একধারে দাঁড়াইয়া থাকেন, দলে মেশেন না। তাঁহার এই শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ্য 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' এবং 'সে যে আমার জননীরে।'

প্রথমটীতে কবি দেশের কথা বলেন; আকাশ, নদী, সমুদ্র, ক্ষেত্র, বনের কথা আছে, এদেশের মানুষ-দের কথা নাই। সপ্তকোটী কণ্ঠ কলকল নিনাদের একটু শব্দও নাই। 'আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা সেই বংশোদ্ভব জাতির' নাম গন্ধও নাই। পদ্যটি পড়িয়া মনে হয় ভুবনমনোমোহিনী বুঝি নিঃসন্তান।

'সে যে আমার জননীরে!' এই পদ্যের বিশেষত্ব 'আমার এই কথাটিতে' কবি একা এক পাশে দাঁড়াইয়া দূর হইতে জননীর কুপুত্রদের ব্যবহার দেখিতেছেন, লজ্জায় অধোবদন, কিন্তু হৃদয় দৃঢ়, একা হইয়াও জননীর সেবায় ব্রতী। আর সমস্ত লোক যাহাই করুক না কেন, তিনি একা নিজ কর্ত্তব্য করিবেন, কাহারও মুখ চাহিবেন না। এই মনের তেজ, এই এককতা, ধর্ম্ম-সংস্কারকের হৃদয়ে পূত অগ্নিশিখা। To be in the minority of one কম সাহসের কথা নহে।

হেমচন্দ্র, কিন্তু কুলাঙ্গার ভ্রাতাদিগকেও আহ্বান করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে যাইয়া হাত ধরিয়া টানিতে-ছেন। হেমচন্দ্র বলেন "আমরা," রবীন্দ্র বলেন "আমি"; ইহাই উভয়ের পার্থক্য। এই জন্য রবীন্দ্রকে aristocrat হেমচন্দ্রকে democrat বলি। [একথা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে, কারণ মিল্টন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক হইলেও aristocrat, এবং শেলী রায় বাহাদুরের (baronet) জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও democrat] হেমচন্দ্রের সামাজিকতার আর একটী অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁহার রচনার ধরণ। তাঁহার ছবিগুলি বড় বড়, পটখানি পরিপূর্ণ, দৃশ্য সুদূরব্যাপী, যেন প্রাসাদ গবাক্ষ হইতে জনসমষ্টি দেখিতেছি, যেন পর্ব্বতশিখর হইতে দেশ জনপদ নদনদীর ছবি আঁকা হইয়াছে। তাঁহার রং অতি স্পষ্ট, পরিসীমার রেখাগুলি অতি পরিষ্কার।

কাব্যে চিরন্তন সহজ ভাব

(Eternal Primary Feeling). হেমচন্দ্র যে সকল ভাব তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অতি সরল অতি সনাতন; তাহা প্রাচীন কালেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও অনেক লোকের হৃদয়ে থাকিবে। মুটে মজুরেও তাহা বুঝিতে পারে। দয়া, প্রেম, ঘৃণা, প্রতিহিংসা, পুত্রস্নেহ, প্রভৃতি মানব জাতির প্রাথমিক ভাবগুলিতে কিছু কঠিনতা নাই, বুঝিতে বিদ্যা বা সভ্যতার আবশ্যকতা হয় না। প্রাচীন জগতের প্রশ্নগুলি (problems) বড় সহজ ছিল, লোকের মনের বাসনা-গুলি বড় স্পষ্ট অবিকৃত ও অমিশ্র ছিল। এই জন্য হোমার ও বাল্মীকির এত পশার।

বর্ত্তমান জগতের প্রশ্নগুলি এত সহজ নহে; সমাজ ও শিক্ষা যেমন বাড়িয়াছে, প্রশ্নগুলিও সেই সঙ্গে বড় জটিল ও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

হেমচন্দ্র যখন আসরে নামেন তাহার আগে এসব নূতন প্রশ্ন এদেশের কাব্যে কেন, ইংলণ্ডেও বড় স্থান পায় নাই, তাই তাঁহার লেখায় এদের আভাস নাই। আমাদের মধ্যে কেবল রবীন্দ্র এই নূতনতম যুগের ভাব

অভিব্যক্ত করার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্য সফলও হইয়াছেন। যদি পদ্য বলিতে 'জীবনের সমালোচনা' বুঝি তবে হেমের অনেক কবিতা পদ্য নহে। আর যদি পদ্য ভাবময়ী চিন্তা (inpassioned thought) হয় তবে হেমের পদ্য কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তিনি অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর পদ্য লিখিয়াছেন। তাঁর এক একটা রচনা পড়িয়া উঠিবার সময়, বোধ হয় না যে আগে যাহা ছিলাম সেই মানুষই রহিয়াছি ; অনুভব করি যে মনটা বিচলিত, উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, এই নীচ ধূলা মাখা জগৎ হইতে উচু হইতে ইচ্ছা হয়,—ইহাই পদ্যের কাজ।

কাব্যগঠন ক্ষমতা (construction)। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সূক্ষ্মে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার কাব্যগঠন ক্ষমতা খাট হয়েছে। যেমন তাঁহার ছোটগল্পগুলি বড় সুন্দর, উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ নভেল গুলি তাহা নহে। কাব্যগঠন অর্থাৎ মাল মশলার ঠিক আয়োজন ও বিন্যাস করিতে মাইকেল প্রথম, তার পর হেম, তারপর রবি। কিন্তু মাইকেলও প্রথম শ্রেণীর নহেন।

যে শিল্পী তাজ মহলের নক্সা (plan) আঁকিয়াছিল তাহার প্রতিভা একমত, আর যে কারিগর তামের একটি প্রস্তর ফলক লইয়া তাহাতে অতি সূক্ষ্ম বিশ রকম পাথর বসাইয়াছে (mosaic) তাহার প্রতিভা অন্যমত।

অথবা যেমন একজন ওলন্দাজ চিত্রকর ছয় মাস ধরিয়া একটি কপিগাছ আঁকে, প্রত্যেক পাতার প্রত্যেক ভাঁজটি রংটি রেখাটি সযত্নে নকল করে ; অথচ সেই সময়ের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলোর মত ইতালীয় চিত্রকর রোমের প্রকাণ্ড ধর্ম্ম প্রাসাদের ভিতরের ছাদ কত সাধু যোগী ও দেবদূতের চিত্রে পূর্ণ করিয়া ফেলেন।

প্রকৃতি বর্ণন। হেমের স্বভাব বর্ণনার প্রধান লক্ষণ এই দুটী—ইহা উপমামূলক এবং মানব সংসৃষ্ট। কবি পদ্মের মৃণাল দেখিলেন আর অমনি তাহার সাদৃশ্যে জাতীয় উত্থান পতনের কথা মনে হইল ; বিন্ধ্যগিরি দেখিয়া অমনি সেকাল ও একালের পার্থক্য মনে পড়িয়া গেল। কোন একটি পাখীর ডাক শুনিয়া সেই মত প্রেয়সীর কথা হৃদয়ে জাগিল। অশোক তরু, যমুনাতট সকলই গাছ বা নদী ছাড়া অন্য ভাবনা কবির হৃদয়ে জাগ্রত করে। অর্থাৎ বৃক্ষ নদী পর্ব্বত প্রভৃতিতে কবি যেন জীবন দেখিতে পান না ; ও গুলির নিজের কোন মূল্য বা আদর নাই ; তাহারা কেবল এই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে যে উপমার পদার্থ হইয়া কবির হৃদয়ে অপর কোন দ্রব্যের—জাতি, দেশ, মানবজীবন, অতীত স্মৃতি প্রভৃতির ভাব আনিয়া দিবে, অথবা উহাদের রঙ্গ, গন্ধ, শব্দ, আমাদের বাহেন্দ্রিয় তৃপ্ত করিবে। হেমচন্দ্র প্রকৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া শুধু প্রকৃতির দৃশ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না ; উহার সঙ্গে মানবকে সংযোগ করিয়া দিতে না পারিলে অসুখী হন। অর্থাৎ প্রকৃতি মানবের কাজের মানবের মনোবৃত্তির পট (Back-ground) মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। * * * এ বিষয়ে হেম নবীন বাইরণের শ্রেণীর। দুই জনেরই Reflective landscape painting.

কিন্তু রবির প্রকৃতি বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ; ইহা সূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিক, idealised—তাঁহার চক্ষে প্রকৃতি নিজেই আদরের জিনিষ। উহার জীবন আছে, মনোবৃত্তি আছে, অনুভবক্ষমতা আছে, হৃদয় আছে। জগৎ জড় নহে, সেও একটা প্রাণী।

ভাষা—ভাষার ঝঙ্কারে ও বেগে, লালিত্য ও তেজের সম্মিলনে হেমচন্দ্র অদ্বিতীয়। যখন তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন, আমাদের দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের পাঠকগণ আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন যে বাঙ্গালা ভাষায়ও এমন জিনিষ হইতে পারে !

উদ্দীপনায় হেমচন্দ্র অতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন সমালোচক লিখিয়াছেন তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে উদিত হইয়া যে অমৃতময় মৃতসঞ্জীবনী গীতাবলি বর্ষণ করিয়াছেন, তেমন গম্ভীর তেমন তেজোময় স্বরলহরী কেহ কখন শুনে নাই। বাঙ্গালার সেই গীত অভূতপূর্ব্ব—অননুভূতপূর্ব্ব। হেমচন্দ্র বাঙ্গালায় ধ্রুপদ আরোপ

করিলেন—সমস্ত বাঙ্গালা স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইল—কিয়ৎক্ষণের জন্য বাঙ্গালীর মৃতদেহে শোণিত সঞ্চার হইল—কিয়ৎকালের জন্য বাঙ্গালীর শীতল হৃদয়ও উষ্ণ হইয়া উঠিল।"

সুপণ্ডিত বরদাচরণ মিত্র এই জন্য বলিতেন 'রবীন্দ্রকে কাব্যকুঞ্জের কোকিল বলিলে হেমচন্দ্রকে কাব্যাকাশের সূর্য্য বলিতে হয়।' কারণ হেমচন্দ্রের কবিতার বিশেষত্ব এই তেজ, এই উদ্দীপনা। অধ্যাপক ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন, "তিনি যেরূপ উদ্দীপিত করিতে পারিতেন, নিদ্রিতকে জাগরিত, অলসকে শ্রমপরায়ণ, রোগীকে সুস্থ, বৃদ্ধকে যুবা, এমন আর কেহ পারেন নাই। অন্যান্য ভাবে কেহ তাঁহার সমকক্ষ, কেহ তাঁহার শ্রেষ্ঠ আছেন, কিন্তু উদ্দীপনায় তাঁহার তুল্য কেহ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। তিনি বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেন না, আবশ্যক বুঝিয়া পিঠের উপর জোরে কশাঘাত করিতেন। কখন স্নেহে কখন ক্রোধে, কখন দর্পে, কখন তেজে যখন যা কিছু বলিতেন, মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শ করিত, দেহ মন প্রাণ কাঁপাইয়া দিত। যেন মূর্ত্তিমান পবন ঝটিকাঘাতে পৃথিবী কাঁপাইতে সমুদ্যত। তাঁহার সম্বোধন তুরী ভেরীর ন্যায়—কোমল নহে। জলদ গম্ভীর ভীষণতায় উচ্ছসিত জলপ্রপাতের ন্যায় ভাসাইয়া লইত।"

ডাক্তার রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর লিখিয়াছেন—

"ইংরাজাগমনের পূর্ব্বে বঙ্গীয় পদ্য-সাহিত্য-কাননে কোমল ব্রততীর অভাব ছিল না; উহাতে সুন্দর ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছিল। বামাকণ্ঠের ধ্বনির ন্যায় মৃদু মনোরম স্বরে কবিগণ প্রেম ও গার্হস্থ্য সুখ দুঃখের কথা গান করিয়া গিয়াছেন। কবিগণ যুদ্ধগীতি গাহিতে যাইয়া সমরাঙ্গনকে সংকীর্ত্তন ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, যুদ্ধযাত্রী রাক্ষস রাম নামাঙ্কিত দেহে নূপুর পায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, রাক্ষসের কর্ত্তিত মুণ্ড রাম নাম উচ্চারণ করিয়াছে। কখনও বা সমর ক্ষেত্রে দেবী ভগবতী আসিয়া ভক্ত বীরের শরীরে হাত বুলাইয়া দিয়াছেন, গলদশ্রুনেত্রে যোদ্ধার মুখোচ্চারিত চৌত্রিশ অক্ষর স্তোত্র শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছি, ভাবিয়াছি এত যুদ্ধক্ষেত্র নহে; কবি আমাদিগকে রণবাদ্যে ভুলাইয়া কোন দেবমন্দির বা পীঠস্থলের নিকট লইয়া আসিয়াছেন।

বঙ্গীয় কবিতা-কুঞ্জ এইরূপ মৃদু ও মনোরম ছিল, ইহা যেন সর্ব্বত্র রমণীকণ্ঠের ধ্বনিতে মুখরিত ছিল,—ইহার এক অভাব ছিল। এই কবিতা সাহিত্যে পৌরুষের অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হইত, ইহা যেন অতি মাত্রায় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যেন করুণ-রসাত্মক একতন্ত্রী অনবরত একটা একঘেয়ে মধুর স্বর গাহিয়া গাহিয়া আমাদের মিষ্টত্ব সম্ভোগে কতকটা অবসাদ আনয়ন করিয়াছিল।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্র, এই দুই কবি বাঙ্গালা কবিতার গীতির প্রবাহ ফিরাইয়া দিয়াছেন। করুণরসের একতন্ত্রীটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ইঁহারা গম্ভীর তানপুরার সঙ্গে তাঁহাদের ওজস্বী পুরুষোচিত কণ্ঠ মিলাইয়া বাঙ্গালীকে এক নূতন সঙ্গীত রসের রসিক করিয়া তুলিয়াছেন।"

পাশ্চাত্য কবিগণের ওজস্বিতা, বাঙ্গালার আধুনিক কাব্য সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিতে রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তিনজনেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র যতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, আর কেহই সেইরূপ পারেন নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বীররসের সমধিক উপযোগী, কিন্তু মিত্রাক্ষরেও যে উদ্দীপনা চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে তাহা হেমচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হেমচন্দ্রের কাব্য ভাব-প্রধান। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ সকলেই শব্দের ঝঙ্কার ও সুরের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখেন। হেমচন্দ্রের কবিতা অতি সরল ও মধুর হইলেও সময়ে সময়ে ভাবের উত্তেজনায় হেমচন্দ্র ছন্দ যতি সমস্ত বিস্মৃত হন, তাঁহার বক্তব্য বিসুবিয়সের অগ্নিস্রাবের ন্যায় বা নায়েগ্রার জল-প্রপাতের ন্যায় উদ্দাম শক্তিতে নির্গত হয়। হেমচন্দ্র প্রধানতঃ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সঙ্গীতকার। রবীন্দ্র-নাথ একটি প্রবন্ধে "কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সঙ্গীতও

তেমনি ভাবের ভাষা। তবে কবিতা ভাব প্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সঙ্গীত ততখানি করে নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ আছে। শূন্যগর্ভ কথায় কোন আকর্ষণ নাই, না তাহার অর্থ আছে, না তাহা তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে তাহা কাণে মিষ্ট শুনায় এই জন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এইনিমিত্ত সঙ্গীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এক কালে যে দাস ছিল, আর এক কালে সেই প্রভু হইয়াছে। মিষ্ট সুর শুনিবামাত্রই ভাল লাগে, সেই নিমিত্ত সঙ্গীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাবাকর্ষণ করিতে হয় নাই—কিন্তু শুদ্ধ মাত্র কথার যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চ্চা করিতে হইয়াছে, সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সঙ্গীতের এমন অবনতি।"

রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সঙ্গীতে সুর বড় বেশী আধিপত্য বিস্তার করিতেছে কেহ কেহ এইরূপ অনুযোগ করিয়া থাকেন।

ভাষার ওজস্বিতায় এবং ভাবের উচ্চতায় হেমেন্দ্রের দ্রব্যবহ্নিসদৃশ গীতি কবিতানিচয় যে বঙ্গ সাহিত্যে চিরদিন এক গৌরময় উচ্চস্থান অধিকৃত করিয়া থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার কাব্যসমূহ বিশেষতঃ দশমহাবিদ্যায় যে জীবন সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন তাহাও যে চিরদিন তাঁহার দেশবাসীর জীবনযাত্রার সহায়ক হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, "যাঁহারা দশমহাবিদ্যা পড়িয়াছেন ও বুঝিয়াছেন তাহারা সকলেই মজিয়াছেন, কিন্তু পড়িয়া বুঝা একটু বিশেষ শিক্ষা সাপেক্ষ।" কিন্তু কেবল গীতিকাব্যরচয়িতা বলিয়া হেমচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস চিরস্মরণীয় থাকিবেন তাহাই নহে, তিনি মাতৃভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচয়িতা বলিয়া চিরদিন বাঙ্গালীর পূজা প্রাপ্ত হইবেন।

বাঙ্গালায় একজন বিখ্যাত সমালোচক লিখিয়াছেন:—

"আমাদিগের বিবেচনায় মহাকাব্য রচনায় যে শক্তির পরীক্ষা ও পরিচয় হয়, খণ্ডকাব্য রচনায় তাহা কখনও হইতে পারে না। খণ্ডকাব্যের কবি আপনার ভাবে আপনি বিভোর, আত্মকথা লইয়াই ব্যস্ত। তাঁহার কবিতা দুঃখের গীত কি হর্ষের উচ্ছ্বাস। উহাতে শুদ্ধ কবি হৃদয়ই প্রতিবিম্বিত হয় কিন্তু মানব হৃদয় রূপ অনন্ত জগতের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। কবি প্রণয়ে নিরাশ হইয়া প্রীতির মর্ম্ম স্থলে আঘাত করেন, প্রণয়ে প্রতারিত হইয়া মনুষ্য জাতিকেই শঠ, কপট, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া বাষ্প-গদ্‌গদ রুদ্ধ কণ্ঠে তিরস্কার করিতে থাকেন। মহাকাব্যের কবি আত্মচিন্তারহিত, আত্মবিস্মৃত এবং আপনা হইতে দূরে অবস্থিত। তাঁহাকে তাঁহার কাব্যে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহার সুখ, দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, তাঁহার ঘৃণা, তাঁহার দ্বেষ, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হয় এবং তিনি পরের প্রাণে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দিয়া পরের হৃদয়কে আপনার করিয়া, একেবারে সর্ব্বময়ত্ব লাভে যত্নপর হন। তাঁহার ভাষা ভীমের জিহ্বায় করকাভিঘাতের ন্যায় গর্জ্জন করে, দ্রৌপদীর অভিমান-পূর্ণ উদ্বেল অন্তরে ক্রোধ তরঙ্গের ন্যায় উথলিয়া উঠে, রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখে 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্' ইত্যাদি সদর্থযুক্ত হিতকথা স্মরণ করিতে থাকে, এবং প্রকৃতির সায়ন্তন শোভামুগ্ধ দিব্যাঙ্গনাদিগের স্ফুরিতাধরে শৈল প্রস্থবাহিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায়, অথবা প্রেম কি বিরহের কণ্ঠধ্বনির ন্যায়, আপনার ভরেই ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে।"

আমরা বৃত্রসংহার সমালোচনা কালে দেখিয়াছি, হেমচন্দ্র মহাকাব্য রচনায় যে প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, মধুসূদনও সে শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অমর লেখনী এ পর্য্যন্ত

মহাকাব্য রচনায় নিযুক্ত করেন নাই, ভবিষ্যতে যে করিবেন সে আশাও অল্প। *

হেমচন্দ্রের অলৌকিকী প্রতিভা সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

কাব্যজগতে হেমচন্দ্র যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অচলভিত্তির উপর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত অভ্রভেদী দেব মন্দিরের ন্যায় চিরকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া বহুদূর হইতে অসংখ্য যাত্রী আহ্বান করিবে এবং স্বীয় বিরাট আয়তন ও অতুল সৌন্দর্য্যগুণে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। ক্ষণিক রুচিবিকার জনিত কুজ্ঝটিকা আসিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তি লোকনয়ন হইতে আবৃত করিতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই উহা উজ্জ্বলতর জ্যোতিঃতে স্নাত হইয়া দিগন্ত উদ্ভাসিত করিবে।

আমাদের বিশ্বাস যে বত্রিশ লক্ষ শিক্ষিত বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ের উপর কাব্য সাম্রাজ্যের এই অমিত-পরাক্রম বিক্রমাদিত্য যে অপূর্ব্ব গৌরবময় সিংহাসন প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, সেই সিংহাসন অধিকার মানসে যদি ভবিষ্যতে কেহ অগ্রসর হন, তবে হেমচন্দ্রের লক্ষ লক্ষ ভক্ত কণ্ঠ বিনিঃসৃত যশোগান শ্রবণান্তে তিনি আপন অনুপযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই সিংহাসন সম্মুখে সম্ভ্রমে নতজানু ও শ্রদ্ধায় অবনত শির হইবেন।

সমাপ্ত

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

* শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন "রবীন্দ্রনাথ কখনই একটা মহাকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই, কেবল 'বটন হোল' বা ফুলের ছোট তোড়া রচিয়াছেন। ছোট গল্পে এবং গীতি কবিতায় তাঁহার হাত বেশ খুলিয়াছিল। তাঁহার এক একটি কবিতা যেন মিহরীর পুতুলী, অতি মধুর অতি নির্ম্মল, অতি সুন্দর। কিন্তু তিনি মিছরীর কুঁদা রচিতে পারেন নাই। তিনি রাজমিস্ত্রী কেবল সুন্দর ক্রোটন বক্ষ রচিয়াছেন, ভাবের মান মন্দির রচিতে পারেন নাই। তিনি সাহিত্যের architect বা নির্ম্মাণ কুশলী বড় কারিকর নহেন।

চোর

(গল্প)

নিত্যকার মত আজও সন্ধ্যার পরে শ্রান্ত দেহে গৃহে ফিরিতেই হরেন তার মায়ের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, তখনও ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই বা উনানে আগুন পড়ে নাই। ইহা যদিও তাহার পক্ষে দৈনন্দিন ব্যাপার তথাপি সে আজ এতই ক্লান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছিল যে সে তার এত দিনের অটুট ধৈর্য্যের বাঁধটিকে আর স্থির রাখিতে পারিল না। সে কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিল - "বলি তোমরা কি আমায় বাড়ী ছাড়া করবে? না কি আত্মহত্যা করে তোমাদের হাত এড়াব?"

তাহাকে দেখিয়াই মাতা সপ্তমে সুর চড়াইয়া বধুর অশেষবিধ অপরাধের কাহিনী বর্ণনা করিয়া এবং উপসংহারে নিজের সাফাই গাহিয়া অবশেষে বলিলেন— "দেখ্, আমার কি দোষ?"

হরেন বলিল, "দোষ কারও নয়, আমার ভাগ্যের দোষ। একজন একটু সয়ে গেলেই ত রোজ রোজ কুরুক্ষেত্রের অভিনয় হয় না। বাপরে বাপ তোমাদের চীৎকারে পাড়ার লোকশুদ্ধ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।"

সুনীতি স্বামীকে আসিতে দেখিয়াই ঘরের মধ্যে গিয়া দরজার আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার সে ক্রন্দনমিশ্রিত স্বরে বলিল, "সকাল বেলায় চাল ধুতে গিয়ে কলতলায় দুটো চাল পড়ে গিয়েছিল, সেই থেকে উনি আমায় সমানে বকছেন। তার পর এখন আলো

পরিস্কার করতে গিয়ে হঠাৎ হাত থেকে চিমনিটা পড়ে ভেঙ্গেছে—তা কি আমি ইচ্ছে করে চিমনি ভেঙ্গেছি?"

ঝঙ্কার দিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "না ইচ্ছে করে কি? হঠাৎই এমন ভাঙ্গে আর কি! কৈ আমাদের কাছে ত কোন জিনিস লোকসান হয় না? কায কর্ত্তে গেলেই একটা না একটা কিছু লোকসান করে বসবেন। বকবেনা, আদর করবে? ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার! মুখোমুখী করতে লজ্জা করে না?"

সুনীতিও সোজা মেয়ে নয়; উদ্ধত স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "কথায় কথায় আমার বাপ তুলবেন না বলে দিচ্ছি। আলো বাতি সাফ বাপের ঘরে কখনও করিনি, ও তে ঝি চাকরের কায।"

"কি! যত বড় মুখ নয় ততবড় কথ? দেখ একবার ছোটলোকের মেয়ের আস্পর্দ্ধা, তবু মুখোমুখী না করে ছাড়বে না। ইস, বাপ তুলবে না! একশো বার তুলব। কি না বড়লোক বাপ ঝি চাকর রেখে, তবে না বুঝি বড়লোক বাপের আদর। দেখ্ হরেন্ শুন্‌লি তো? তোর সামনে তোর বৌ আমায় কি অপমানটা করে গেল এখন তুই বিচার কর।"

"বিচার? বিচার—চুলোয় যাক্, তোমরাও চুলোয় যাও—আমিও আমার পথ দেখি। বাপরে বাপ! সারাদিন খেটে খুটে বাড়ী এসে কোথা একটু জিরুব, না, নিত্যি এই ব্যাপার!"

সত্য সত্যই হরেন চলিল। যায় দেখিয়া তাহার স্নেহময়ী মাতার স্নেহসমুদ্র আলোড়িত হইল। তিনি পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে ফের ফের, আমার মাথা খাস, যাসনি।"

মাতার আহ্বানে অগত্যা হরেন ফিরিয়া আসিল এবং স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এতটুকুন একটা মেয়ে কাল এসেছে, সবে বিয়ে হয়ে তার এত তেজ! কালই বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিব। আর মা যত বুড়া হচ্চেন ততই পাড়া কুঁদুলে হয়ে উঠেছেন! একটা চোদ্দ পনের বছরের মেয়েকে বশে আনতে পারলেন না! আদর যত্ন পেলে যে বনের পশুও বশ মানে।"

ক্ষণপূর্ব্বে যে কলহরতা গৃহিণী পরিশ্রান্ত পুত্রের বিশুষ্ক মুখের প্রতি চাহিয়া, সহসা আপনার স্বভাবসিদ্ধ কোন্দলপ্রিয়তা দূরে সরাইয়া দিয়া গমনোদ্যত পুত্রের হাত দুখানি স্নেহভরে ধরিয়া তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, এবং ক্ষুধার্ত্ত পুত্রের জলখাবারের আয়োজনে যিনি সব ভুলিয়া নিমেষ মধ্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, পুত্রের মুখে আপনার কোন্দলপ্রিয়তার উল্লেখ শুনিবামাত্র পরক্ষণে তিনিই আবার তাঁহার যত্ন-সজ্জিত জল খাবারের রেকাবিখানি উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দম্ভে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"কি! এত বড় কথা! আমি পাড়া কুন্দুলি, আর তোর বউ ভাল? বেশ! ভাল বউ নিয়ে তুই ঘর কর, চল্লাম আমি।" আলুথালু বেশে গৃহিণী বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য সুনীতি পূর্ব্বেই সশব্দে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়াছিল।

মা যে অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের লোক তাহা হরেনের অবিদিত ছিল না। তাহার পিতা ছিলেন অতি শান্ত স্বভাবের লোক, তথাপি সময় সময় ইঁহার জ্বালায় তাঁহার ঘরে তিষ্ঠান দায় হইত। তবে সুনীতি একটু মানাইয়া চলিলে তো আর রোজ রোজ এই খণ্ড প্রলয়ের অভিনয় হয় না, লোকের কাছেও উপহাসাস্পদ হইতে হয় না। কিন্তু সেও যে সাত ভাই না হোক পাঁচ ভাইয়ের বোন, ভাগ্যবতী, বাপমায়ের একমাত্র আদুরে মেয়ে, সংযম শিক্ষার ধার বড় ধারে না।

নিরুপায় হরেন ক্ষণেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রতিবাসী গৃহ হইতে মাতাকে ফিরাইয়া আনিল, এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্ত করিল। কিন্তু সুনীতির ঘরের রুদ্ধ দ্বার খোলা সহজসাধ্য নয় জানিয়া সে রাত্রিটা সে নীচের বৈঠকখানা ঘরেই কাটাইয়া দিল।

২

পরদিন সন্ধ্যায় কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া হরেন শুনিল, সুনীতির পিতা আসিয়া কন্যাকে লইয়া গিয়াছেন। সেই

দিনই তাঁহারা হাওয়া খাইতে মধুপুর যাইবেন। মেয়েটিকেও তাঁহারা সঙ্গে লইয়া যাইবেন। এ বন্দোবস্ত যদিও পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল, তথাপি হরেনের অনুপস্থিতি সময় তাহার সহিত একবার দেখা মাত্র করিবার অপেক্ষা না রাখিয়া, পিতা আসিবামাত্র তাহার সঙ্গে সুনীতির চলিয়া যাওয়াটা একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধরূপে হরেনের নিকট বোধ হইল। সে দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—"উঃ এতটা হেনস্থা! স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর উপর এত দর্প! এত তেজ মেয়েমানুষের? এ অসহ্য। দেখি, এ অভিমান চূর্ণ করতে পারি কি না?" হরেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল স্ত্রীর এই ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিশোধ না লইয়া সে ছাড়িবে না। এবং এই বলবতী প্রতিশোধ-স্পৃহাকে সংযত করিতে না পারিয়া সে তখনই স্ত্রীকে লিখিয়া দিল যে আজ হইতে তাহার সহিত সে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিল, এমন কি তাহার স্মৃতিটুকুও সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিল!

চিঠিখানি সেদিনের ডাকে পোষ্ট না হইলেও, চিঠিখানি ডাক বাক্সে না দেওয়া পর্য্যন্ত যেন হরেন মনে সোয়াস্তি পাইল না। তাই মাতার আহ্বানে ক্ষুধার অভাব জানাইয়া চিঠিখানি হাতে করিয়া হরেন গ্যাসালোক বিবর্জ্জিত অন্ধকার গলি পথে বাহির হইয়া গেল।

লিপিখানি ডাক বাক্সের ভিতর সে দিনের মত বিশ্রাম সুখ লাভ করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় সুনীতিবালাও চলন্ত গাড়ীর গবাক্ষ পথে দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া নীরবে বেঞ্চির এক কোণে বসিয়াছিল; বিষম খাইতেছিল কি না জানি না—কিন্তু তাহার মুখের উপরকার বিষাদের ঘনীভূত ছায়া তাহার মনের উদ্বেগই প্রকাশ করিতেছিল।

৩

দুইটী মাস কাটিয়া গিয়াছে। হরেনের অব্যর্থ সন্ধান যে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ হইতে অবশ্য বিলম্ব হইল না; হরেন মনে করিয়াছিল মধুপুরে পৌঁছা মাত্রই তো সুনীতি তাহার চিঠি পাইবে এবং ব্যাধশরে নিপীড়িতা কুরঙ্গীর ন্যায় নিশ্চয়ই সে তাহার চরণ তলে লুটাইয়া পড়িবে।

সুনীতির চিঠির আশায় হরেনের উৎকণ্ঠিত চিত্ত উৎসুক থাকিলেও, মধুপুরের সিল-মস্তকে বহন করিয়া আকা বাঁকা ইংরাজীর ছাপে পৃষ্ঠ অঙ্কিত করিয়া এই দুই মাসের মধ্যে একখানি চিঠিও হরেনের নামে আসিল না।

ও পক্ষের অবহেলা দিনের পর দিন যতই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া হরেনের চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, অসহিষ্ণু হরেন আকুল আবেগে ততই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল।

বড় দিনের ছুটীও নিকটবর্ত্তী। সম্মুখে দীর্ঘ ছুটী; এমন দিনে কোথায় সে বাসর শয্যা রচনা করিয়া লিখিবে "এস এস কাছে, দূরে কিগো সাজে, রচিয়া রেখেছি কুসুম শয়ন" তাহার পরিবর্ত্তে কি না;—স্বামীকে এই অবহেলা!

আফিসে কাজ করিতে করিতে সখেদে হরেন তাহার বন্ধু সত্যেনকে বলিল, "আজ কালকার মেয়েরা দ্বিতীয় ভাগের দুপাতা পড়েই নিজকে বড় পণ্ডিত বলে মনে করে হে, আর বড় স্বাধীনচেতাও হয়ে উঠ্‌ছে।"

সবিস্ময়ে বন্ধু বলিয়া উঠিলেন, "কেমন?"

"এই দেখনা, সেকালের সতীরা পরের মুখে স্বামীনিন্দা শুনলে দেহত্যাগ কর্ত্তেন, এমন কি মড়া স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতেন। আর এখনকার সতীরা—হুঁঃ বুঝলে কি না; স্বামীর নিন্দে না করে জলগ্রহণ তো করেনই না, তা ছাড়া স্বামী বেচারী মল' কি বাঁচলো তার খোঁজ খবরটা—তাও নেওয়া দরকার বলে মনে করেন না।"

দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হরেন পুনরায় বলিল "ইচ্ছে করে, বুঝলে কি না, এই জানিয়ে দিতে স্বামীর দরকার আছে কি না?" সেদিন বন্ধুর মেজাজটাও তাঁর স্ত্রীর উপর বড় খুসী ছিল না, তাই তিনিও সখেদে, বলিলেন, "যা বলেছ ভাই! কিন্তু ওদের না হলেও যে আমাদের ঘর করার কাষ চলে না—তাই

ভয় হয় যদি রাগ করে বাপের বাড়ী চলে যান, তখন—"

বন্ধুর কথায় বাধা দিয়া হরেন বলিয়া উঠিল, "কেন চলবে না? আলবৎ চলে। এই যে আমাদের উনি—দুমাস ধরে বাপের বাড়ী গিয়ে বসে আছেন। আমি কি না খেয়ে আছি?"

"সে ঠিক। তবে কি না, বুঝলে কি না হরেন, যা বলেছ, এই শিক্ষে একটা দেওয়াই চাই। আর সে শিক্ষেটা হচ্ছে বুঝলে কি না।"

শিক্ষেটা যে কি তাহা সত্যেনের মনে আসিল না। তিনি ক্ষণকাল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সহসা হর্ষভরে বলিয়া উঠিলেন "হয়েছে, ঠিক হয়েছে, এইবার। সে শিক্ষেটা হচ্ছে, ওঁদের মাছ খাওয়া বন্ধ করা। বাটি বাটি মাছ না হ'লে যে মুখে ভাত রোচে না হুঁ: হুঁ: তার পরিবর্ত্তে বুঝেছ কি না ভায়া, মাসে দু দুটো করে একাদশীর উপোসের জ্বালা পড়লে তখন বুঝতে পারবেন, স্বামী কি জিনিস। তখন বুঝলে কি না হরেন, একেবারে এই পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বলবেন "এইবার বুঝেছি ওগো তোমায় চিনেছি"—বলিতে বলিতে তিনি জুতা শুদ্ধ পদযুগল উত্তোলন করিলেন।

৪

বড় দিনের ছুটী আসিয়া পড়িতেই হরেনের কর্ত্তব্য বুদ্ধি হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। তাইতো, আঁমিষ নিরামিষ দুই ঘরের রান্না! মা বুড়া মানুষ তায়, আবার যে দারুণ শীত, মায়ের কষ্ট কি আর দেখা যায়? তাঁর সুবিধার জন্যও অন্ততঃ বউকে এখন আনা দরকার।

মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সেই রাত্রির ট্রেণেই হরেন মধুপুর যাত্রা করিল।

পর দিন সকাল বেলা মধুপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে নিজের ব্যাগ ও লাল কম্বলে মোড়া বিছানার বাণ্ডিলটি ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে নামাইয়া হরেন মুটিয়ার সন্ধানে ইতস্তত চাহিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে মুটিয়া আসিলে তাহার মাথায় বিছানার বাণ্ডিল ও হাতে ব্যাগটী ঝুলাইয়া দিয়া সে একটু দ্বিধায় পড়িল; তাইতো, বিনা আহ্বানে শ্বশুর গৃহে জামাতার আগমন! তাতে খবর একটা না দিয়ে আসা কাযটা বড়ই অন্যায় হইয়া গিয়াছে।

এমন অতর্কিত ভাবে জামাতার আগমনে তাহার শ্বশুর ও শাশুড়ী ঠাকুরাণী বিস্মিত হইলেও আনন্দ প্রকাশ করিয়া জামাতার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। গৃহে প্রবেশের মুহূর্ত্ত হইতে হরেনের চোখ, দুটী কালো চোখের সতৃষ্ণ দৃষ্টির অপেক্ষায় ঘুরিয়া ফিরিতেছিল; তাহাকে কিন্তু দেখা গেল না।

যথাসময়ে সে আহারে বসিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী মাথার কাপড়টা সম্মুখের দিকে একটু টানিয়া দিয়া জামাতার আহারের তদারক করিতে আসিলেন এবং নানারকম আদর আপ্যায়নে জামাতার ভোজনের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে অনুচ্চ কণ্ঠে "ও কি ঝোলের বাটীতে যে হাতই দিলে না, ভাত যে ধরাই রৈল, তাইতো কি দিয়েই বা খাবে? এ পোড়ার দেশে কিই বা ছাই পাওয়া যায়? আমরা বাঙ্গালী মানুষ, মাছ দুধটারই প্রত্যাশী, তা বাবা সে দুটোতেই আগুন লেগে গেছে। হায়রে আমাদের সোনার কলকেতা! কোন জিনিসের দুঃখ নেই। এই ত্যাখনা বাবা, নাউ ডাঁটাটা অবধি পাওয়া যায় না! তোমার শ্বশুর বুড়া মানুষ, একটু শাক ডাঁটার চচ্চড়ীই চিবুতে ভাল বাসেন।" সম্মুখে নানাবিধ ভোজ্য উপকরণ সত্ত্বেও "পোড়া দেশে কিছু পাওয়া যায় না" এবং সেই জন্যই জামাতার আধপেটা খাওয়া হইল এই কথাটিতে হরেনের বড় হাসি পাইল। বাড়ীতে বিনা চীৎকারে একটি দিনও আফিসের ভাত পাওয়া যায় না, আজ এই সামান্য সময়ের মধ্যে এই বিদেশে কি করিয়া তার শাশুড়ী ঠাকুরাণী যে এত রকম রান্না করিলেন ইহাই আশ্চর্য্য—আর সুনীতি এই লক্ষ্মীরূপিণী সুগৃহিণীর মেয়ে হইয়া যে মাতৃগুণে বঞ্চিত হইয়াছে সে শুধু তাহার দুরদৃষ্ট বলিয়াই।

হরেন লজ্জিত হইয়া বলিল, "আপনাদের খবর না দিয়ে আসাটা খুবই অন্যায় হয়ে গিয়েছে, আমার অ.স-

বারও কিছু তেমন ঠিক ছিল না, গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা খানেক আগে হঠাৎ ঠিক হল। পর দিন মঘা, তার পরদিন অম্বুবাচী এই সব অজুহাত তুলে মা তখনি রওনা করে দিলেন। নৈলে আপনাদের জন্ম কিছু তরকারী টরকারী আনবার খুব ইচ্ছে ছিল। এখন সজনে খাড়া, এঁচড় উঠেছে।"

হাত মুখ ধুইয়া হরেন তাহার জন্য যে কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেখানে গিয়া দেখিল, একখানা নেওয়ারের খাটের উপর তাহার জন্ম বিছানা পাতা রহিয়াছে। গত রাত্রিতে অসম্ভব ভিড়ের জন্ম গাড়ীতে মোটেই সে ঘুমাইতে পারে নাই; বিশ্রামের বন্দোবস্ত দেখিয়া সে মনে মনে বেশ খুসী হইল।

"পাণ"—ফিরিয়া দেখিল তাহার বালক শ্যালক অনিল সাজাপানে পূর্ণ একটি রূপার ডিবা হাতে করিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

নিষ্ফল আশার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হরেন পাণের ডিবাটি হাতে লইয়া দুই খিলি পাণ মুখে পুরিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। বালকটি একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল—"জামাই বাবু, আর কিছুর দরকার আছে কি?"

"দরকার? হাঁ আছে—না—থাক তুমি শুধু দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও" বলিয়া হরেন শুইয়া পড়িল।

অনিল চলিয়া গেল। নিস্তব্ধ কক্ষে কিছুক্ষণ লেপে মুখ অবধি ঢাকিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার কৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়া হরেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং খানিকক্ষণ ছটফট্ করিয়া সে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

অসময়ে জামাতাকে বাড়ীর বাহির হইতে দেখিয়া তাহার শ্বশুর তারাপদ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "এই রোদের ভিতর বাইরে যাওয়াটা ঠিক নয় হে! একটু বিশ্রাম টিশ্রাম করে রোদটা পড়লে পরে বেরিও এখন।"

শ্বশুর মহাশয়ের বাক্যের প্রতিবাদ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সে সুশীল বালকের মত বিনা বাক্যে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষটির দিকে অগ্রসর হইতেই তিনি পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তাই বলে দিনের বেলা ঘুমিও না—শীতকালে দিনে ঘুমান বড় খারাপ শুয়ে শুয়ে কাগজখানা পড়—"

"দিনে ঘুমান অভ্যাস আমার নাই" বলিয়া খবরের কাগজখানি হাতে করিয়া হরেন পুনরায় সেই কক্ষটিতে ফিরিয়া আসিল। ভাবিল এখানেই থাকা যাক্, কি জানি যদি ইতিমধ্যে সুনীতির দর্শন লাভের সৌভাগ্যটুকু তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া যায়।

পাশের ঘর হইতে চুড়ি বালার ঠুন্ ঠান্ আওয়াজ ও মৃদু গুঞ্জনধ্বনি হরেনের কাণে ভাসিয়া আসিতেছিল। এই ঠুনঠুন আওয়াজটুকুর মধ্যে এমনি একটী শক্তি লুক্কায়িত ছিল যাহাতে হরেনের পত্নী-দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া সেই আওয়াজটুকুর দিকে তাহাকে টানিতে লাগিল।

দুর্দ্দমনীয় মনের আবেগ সহিতে না পারিয়া হরেন অনিলকে নিকটে ডাকিল, ইচ্ছা তাহাকে দিয়া সুনীতিকে ডাকাইয়া আনে। এই বালকটী ইতিপূর্ব্বে তাহার শ্বশুরগৃহের অনেক গোপন সংবাদ প্রদান করিয়াছে।

অনিল কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "জামাই বাবু কি বলবেন ভেবে পেলেন না বুঝি?"

অপ্রতিভ হরেন আপনার ভ্রম সারিয়া লইবার অভিপ্রায়ে বলিল, "ওঃ তুমি এসেছ বুঝিতে পারিনি।"

"জামাই বাবু কি দিন দুপুরেই রাতকাণা হলেন নাকি?"

"হুঁঃ" বলিয়া হরেন চুপ করিল এবং বলিবার মত কথা খুজিয়া না পাইয়া সে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিল, "ভাল লাগছে না, চল বাইরে একটু বেড়িয়ে আসা যাক!"

বেড়াইতে যাইবার আনন্দে বালক লাফাইয়া উঠিল। উৎসাহভরে বলিল, "বেশ চলুন না, আপনাকে ঝরণা দেখিয়ে আনি। কি সুন্দর জায়গা যে জামাই বাবু! সেখানটা গেলে আর আসতে ইচ্ছে করে না। তা আপনি একটু দাঁড়ান আমি কোটটা পরে জুতো পায়ে দিয়ে

আসি। আর দিদি যেতে চেয়েছিল, যদি যায় তাকেও ডেকে আনি।"

দিদির যাইবার নামে আনন্দে হরেনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেও উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল, "বেশ, বেশতো, তাকেও ডেকে নিয়ে এস, সব এক সঙ্গে বেশ স্ফূর্ত্তি করে যাওয়া যাবে এখন।"

উৎকণ্ঠিত চিত্তে হরেন বাহিরের বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিল ও বারংবার দরজার দিকে তৃষিত নয়নে চাহিতে লাগিল, আধঘোমটার অন্তরালে হাস্য মণ্ডিত মুখখানি কখন আসিয়া দরজার ফাঁকে দর্শন দিবে।

"না, সে এলনা" বলিতে বলিতে অনিল বিরক্ত চিত্তে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অগত্যা তাহারা দুইজনে ঝরণার অভিমুখে রওনা হইল।

তাহারা যখন "ভুবনালয়", "যামিনী কুটীর" ছাড়াইয়া অসমতল কণ্টক ও কঙ্করময় পথে পড়িয়াছে, সেই সময় অনিল হাসির রোল তুলিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "জামাই বাবু দেখুন পেছনে কারা সব আসছে!"

হরেন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, তাহাদের কিছু দূরে সর্ব্বাগ্রে তাহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ শ্যালক অমূল্য ও তাহার পশ্চাতে এক দল মহিলা।

"সেই এল, আমাদের সঙ্গে তখন দেমাক করে আসা হলো না! বল্লেন কি না অসুখ করেছে। বুঝলেন জামাই বাবু, বদ মেজাজী লোক আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে।"

কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া অনিল এ কথাগুলি বলিল বুঝিতে না পারিয়া হরেন জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

"ঐ দিদি গো, দিদি। ঐ যে লাল শাল গায়ে, চিনতে পারেন নি বুঝি?"

হরেন পুনরায় পশ্চাতে চাহিয়া, মহিলাদলের মধ্যে সুনীতিকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। ক্ষণপূর্ব্বে যে শরীর অসুস্থ বলিয়া তাহার সহিত বেড়াইতে আসিতে আপত্তি করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই তার অসুখ ভাল হইয়া গেল নাকি!

অল্পক্ষণ মধ্যেই দুই দল একত্র হইল। পথ প্রদর্শক উভয় দলের অধিনায়ক উভয় বালকের মধ্যে তর্ক বাধিল "কোন পথ সোজা?"

দুই জনের মত এক না হওয়ায় দুই জন যাত্রী লইয়া দুই পথে যাত্রা করিল—কথা রহিল যে আগে পৌঁছিবে অন্যদল তাহাকে পুরস্কৃত করিবে।

শীতকাল হইলেও প্রখর রৌদ্রতাপে এই সমতল পথ অতিবাহিত করিতে হরেন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল "আর কত দূর" জিজ্ঞাসা করিলে অনিলের সেই একই উত্তর "এইতো এসে পড়েছি আর কি! ঐ যে শালবন দেখছেন না, ঐ তো ঐখানে।"

দূরের ঘন কৃষ্ণবর্ণ প্রাচীরের মত শালবন এইবার স্ফুটতর হইয়া দেখা দিল। কিন্তু কি দুরতিক্রমণীয় অসমতল পথ! পথে জনমানবের সাড়া নাই শব্দ নাই, শ্রান্ত ক্লান্ত হরেন একখানা পাথরের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ঝরণা দেখবার সাধ মিটে গেছে, এখন চল বাড়ী ফেরা যাক। কিন্তু তারা সব কোথায়?"

বাস্তবিকই তখন অন্যদল দৃষ্টির বহির্ভূত। এই নিভৃত পার্ব্বত্য পথে একটী বালকের ভরসায় এতগুলি মহিলা! যে কোনও মুহূর্ত্তে কোনও বিপদ ঘটিতে পারে। চিন্তিত হইয়া হরেন পুনরায় বলিল, "তাদের ত আর দেখা যাচ্ছে না হে, তারা সব কোথায়?"

হো হো করিয়া অনিল হাসিয়া উঠিল বলিল, "কিছু ভয় নেই জামাই বাবু, মনে রাখবেন মধুপুর মেয়েদেরই রাজ্য। এখন উঠুন।"

চলিতে চলিতে অনিল হঠাৎ গাহিতে লাগিল "আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি।" বালকের সুকণ্ঠ নিঃসৃত সুললিত সঙ্গীত ধারায় মুগ্ধ হরেন গন্তব্যস্থানে কখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সহসা অনিলের "ঐ দেখুন জামাই বাবু ওরা বসে বসে কেমন মজা করে কমলা লেবু খাচ্ছে; আপনি তো ভেবেই খুন।"

হরেন চাহিয়া দেখিল অন্য দল তাহাদের পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং বাস্তবিকই তাহাদের মধ্যে

কেহ কেহ কমলালেবু খাইতেছে ও বিজয়া বীরের মত তাহাদের দিকে চাহিতেছে।

কিন্তু সম্মুখে এ কি দৃশ্য! অপরূপ দৃশ্য এ! এই গভীর জলোচ্ছ্বাস, ফেনময় কিরীট ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে লুটাইয়া দিতেছে।

"জামাই বাবু অবাক হয়ে কি দেখছেন? বসুন, একটু জিরিয়ে নিন।"

এখানে পৌঁছিবামাত্রই হরেনের সকল পথশ্রম নিমেষে কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল। এখন অনিলের কথায় তাহার যেন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, সে অল্প হাসিয়া একখানি মসৃণ প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িল এবং ঝরণার স্বচ্ছ শীতল জল অঞ্জলি পুরিয়া পান করিল।

বড় বড় পাথরের উপর নানাবর্ণের রঙে ফলান নামধাম লিখিত দেখিয়া, অন্য একদিন লিখিবার সরঞ্জাম সঙ্গে আনিয়া নিজের নামধাম লিখিবে বলিয়া হরেন মনস্থ করিল।

এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে হরেনের চোখ পড়িল কতকগুলি কবিতার উপর। এমন স্থানে আসিলে যে-কোনও ভাবপ্রবণ হৃদয় যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে এবং কবিতার উৎস খুলিয়া যাইবে ইহাতে অবশ্য বিচিত্রতা কিছুই নাই, কিন্তু তবুও এই কবিতাগুলিতে এমনি কিছু বিশেষত্ব ছিল যাহা স্বতঃই পাঠকের মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এ শুধু কবি হৃদয়ের কল্পনার উদ্দাম নর্ত্তন নয়; এ কোনও ব্যর্থ প্রেমিকের করুণ হৃদয়োচ্ছ্বাস—তার উপাস্য দেবীর পদতলে তার নিরাশ ব্যথিত হৃদয়ের পবিত্র অর্ঘ্য।

পাশে বসিয়া মহিলাদলও এই কবিতাগুলি পড়িয়া বড় বড় নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন

সন্ধ্যার ধূসর ম্লান রেখা দূরে অপসারিত করিয়া রজনী তাহার কৃষ্ণ যবনিকাখানি দূরের গাছপালার মধ্য দিয়া ক্রমে নিকটের শালবন মধ্যে বিস্তার করিয়া দিলেন।

চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া, মহিলাদলের অভিভাবক বালক অমূল্য সহসা কর্ত্তৃত্বভরা স্বরে বলিয়া উঠিল, "উঠে এস সব, এইবার বাড়ী ফিরতে হবে, বেশীক্ষণ এসব যায়গায় থাকা ঠিক নয় বলছি।"

তাহার এই বিজ্ঞোচিত বাক্যে সকলেই হাসিয়া উঠিল। হরেনও হাসিল, কিন্তু তাহাকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া অমূল্য তাহার নারীসৈন্য লইয়া রওনা হইল, সুনীতিও স্বামীর দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ভ্রাতার অনুগমন করিল।

একখানা বড় পাথরের উপর সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া দিয়া হরেন মুদিত নেত্রে পড়িয়া ছিল। অমূল্যরা চলিয়া যাইবার পরও হরেনকে এইরূপ নিশ্চেষ্ট দেখিয়া অনিল মনে মনে দারুণ অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। নির্জ্জন প্রান্তর; অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিতেছে, ভূতের ভয়টাও তাহার অত্যন্ত প্রবল, অকস্মাৎ যদিই কোন অদৃশ্য হাত আসিয়া তাহার ঘাড়টি মটকাইয়া দেয় তো কে রক্ষা করিবে? অগত্যা হরেনকে একরূপ জোর করিয়া উঠাইয়া লইয়া সে বাড়ীর পথে যাত্রা করিল।

৫

পিতৃগৃহে দিনের বেলা পতি-সম্ভাষণে আসিতে বোধ হয় সুনীতির সঙ্কোচ হইয়া থাকিবে, হরেন ইহাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু শীতের রাত্রি, এগারটা অবধি স্ত্রীর প্রতীক্ষায় বিছানার মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে কখন তাহার একটু নিদ্রার আবেশ হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। পাশের ঘরের অনুচ্চ কোলাহলে হঠাৎ তাহার তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল, সে শুনিতে পাইল তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কন্যাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন—"ধেড়ে মেয়ে, মা হবার বয়সে হয়েছে, তার এ'কি কেলেঙ্কারী! যা বল্‌ছি, শীগ্‌গির! ও ঘরে উনি শুয়ে আছেন তাও নাকি লজ্জা আছে? শুনলে কি ভাববেন?"

পদশব্দে বোধ হইল সুনীতিকে কেহ জোর করিয়া তাহার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া বাহিরে সুনীতির চাপা কান্নার শব্দ

শুনা গেল। সহসা সেই দুই তিন মাস পূর্ব্বের ঘটনাটি হরেনের মনে পড়িয়া গেল—এ বোধ হয় সেই অভিমানের অভিনয়! এ মান ভাঙাইয়া তাহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু সুনীতির এ কি কেলেঙ্কারী, এখানেও এই ভাব! ছিছি বাড়ীর লোকে কি মনে করিতেছেন, সে ত নেহাৎ ছেলে মানুষও নয়। হরেনের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। উঠিবার উপক্রম করিয়া সে পুনরায় শুইয়াই পড়িল, মনে মনে বলিল "আপনিই পথে আসবে এখন।"

স্ত্রীর প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিত থাকিবার পর হরেন ঘুমাইয়া পড়িল। স্বামী আসিয়া, সাধিয়া, খোসামোদ করিয়া না লইয়া গেলে সে ঘরে যাইবে না বলিয়া সুনীতি খানিক ক্ষণ দরজার বাহিরে বসিয়া কাঁদিল। শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসে অল্পক্ষণ মধ্যেই তার দেহ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল; চারিদিকের নীরবতায় লুপ্ত ভূতের ভয়ও মনে জাগিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া আলোটি নিবাইয়া দিয়া, মেঝের উপর একখানি কম্বল পাতিয়া পড়িয়া রহিল এবং ভোর হইবার পূর্ব্বেই নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে পরদিন প্রাতে স্ত্রী, শ্যালিকা ও পুত্রদের লইয়া তারাপদ বাবু বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিয়া গেলেন। জামাতাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে যাইতে সম্মত হইল না, কাযেই সুনীতিকেও রাখিয়া যাইতে হইল।

আজ এই খালি বাড়ীতে আর সুনীতির সঙ্গে দেখা করিবার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। হরেনই আজ এ বাড়ীর একচ্ছত্র অধিপতি; তার শাসনদণ্ডতলে সুনীতি আজকার দিনটি অন্ততঃ থাকিতে একান্তই বাধ্য।

এত দিনের বিরহক্লেশ আজ মন হইতে দুরীভূত করিতে হইবে। প্রথম কিরূপ ভূমিকা সহকারে এই অভিনয়টি আরম্ভ করিতে হইবে ইহারই জল্পনা কল্পনায় ঘন ঘন পায়চারী করিতে করিতে হরেন ক্লান্ত হইয়া বাহিরের বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মনে মনে বলিল, কি নিরেট মূর্খ সে! আজ এ রাজ্যের রাজা হইয়া তার অধীনস্থ একটি ক্ষুদ্র প্রজাকে আয়ত্তে আনিবার জন্য এত জল্পনা কল্পনার কি প্রয়োজন?

হরেন বাড়ীর ভিতর আসিয়া ভাবিল, এইবার সুনীতিকে ডাকা যাক্। সুনীতির নাম ধরিয়া ডাকিবার চেষ্টা সত্ত্বেও হরেনের কণ্ঠ লজ্জায় কেমন আড়ষ্ট হইয়া গেল। খালি বাড়ী হইলেও শ্বশুরবাড়ী তো বটে। বিশেষ করিয়া সুনীতির নাম সহজ কণ্ঠে উচ্চারণ করিবার সুযোগ সুবিধাও তার ঘটে নাই, বিবাহিত জীবনও তো তাহাদের বেশী দিনের নয়। নাম ধরিয়া ডাকিতে যখন সঙ্কোচ হইতেছে, তখন "বাড়ীর মধ্যে" বলিয়া ডাকা যাইতে পারে, কেননা স্ত্রীকে অনেকেই ঐ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শুধু "বাড়ীর মধ্যে" বলিয়া ডাকিতেও যেন কেমন বাধবাধ লাগে। হরেন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া "ওগো বাড়ীর মধ্যে" বলিয়া ডাকিবে স্থির করিল এবং পর মুহূর্ত্তেই সে "ও-গো—" বলিয়াই থামিয়া গেল। বাকি অংশের উচ্চারণ আর তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

"ওগো" অর্থে যাহাকে বুঝায় এবং যাহার আসিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাকে কিন্তু দেখা গেল না। "হুজুর" বলিয়া যে আসিয়া হরেনের সম্মুখে দাঁড়াইল সে তারাপদ বাবুর ভৃত্য কালু। এ ব্যক্তি জাতিতে তন্তুবায়, বহু বৎসর তারাপদ বাবুর চাকরি করিতেছে। দেহখানা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মুখখানা গোল, অত্যন্ত সাদা কথা বুঝিতেও তাহার পাঁচ মিনিট বিলম্ব হয়। কালুকে দেখিয়া হরেনের আপদ মস্তক যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে তাহার অসহনীয় গাত্র জ্বালা হতভাগ্য ভৃত্যের উপর বর্ষণ করিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিল—"কি চাই?" ভৃত্য বিনীতভাবে জানাইল তাহার কিছুই চাইনা, সে হুজুরকে তেল মাখাইতে আসিয়াছে। শীত কালের বেলা—আটটা না বাজতেই তেল মাখাবার তাড়া মজা মন্দ নয়! ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বিরক্ত চিত্তে হরেন তাহাকে জানাইল, এত সকালে সে কোন দিনই তেল মাখে না।

ভৃত্য দশনপংক্তি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

৭

যথা সময়ে স্নান করিয়া হরেন আহার করিতে বাড়ীর মধ্যে উপস্থিত হইল এবং সম্মুখস্থ আসনের উপর বসিয়া আহারে মনঃসংযোগের প্রয়াস পাইল। কিন্তু সে প্রয়াস ব্যর্থ! আহারে তাহার মোটেই প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

লজ্জার জন্য সম্মুখে আসিয়া বসিতে না পারিলেও অন্ততঃ দ্বারের পার্শ্বে সুনীতি আসিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাকে এটা ওটা খাইবার অনুরোধ করিবে, পাচককে উপদেশ দিবে ইহা হরেন মনে মনে আশা করিতে লাগিল

কিন্তু হরেনের ঘন ঘন দৃষ্টি সঞ্চালন সত্ত্বেও দ্বার অন্তরালে শাড়ীর পাড়টুকু এবং চঞ্চল চাহনি কিংবা চুড়ি বালার ঠুন্ ঠুন্ মৃদু মধুর আওয়াজ টুকু বারেকের জন্যও শ্রুত হইল না, এবং লজ্জা জড়িত কণ্ঠে এটা ওটা খাইবার অনুরোধও কেহ করিল না।

তৈলাভাবে তাহার আশা প্রদীপটি নিবিয়া গেল; থালায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আহারীয় ফেলিয়া রাখিয়াই হরেন উঠিয়া পড়িল। অভুক্ত ভাত তরকারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পাচক গণেশ পাণ্ডা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"এক জামাই বাবু, কিছুই খেলেন না! রান্না কি ভাল হয় নি?" তার মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হরেন বলিল, "কেন, বেশ হয়েছে,আর কত খাব?" হরেনের চাহিবার অর্থটুকু পাচক বুঝিল কিনা ঠিক বলা যায় না, তবে ইহা সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে রন্ধনের দোষ হইলে সেটা আজ সে দিদিমণির উপরেই চাপাইবে—তবে প্রসংশার অংশটা সে অন্যকে দেওয়া যে বড় কঠিন।

বিছানার উপর বসিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে হরেন নিজের মনকে প্রবোধ দিতে দিতে ভাবিতেছিল, বাড়ীতে কেহ না থাকিলেও চাকর বাকরদের সামনে হয়তো সুনীতি আসিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকিবে, তা ছাড়া এ রান্না কিছুতেই উড়ে বামুনের হাতের নয়। রান্না বান্নায় অনবকাশ থাকাটাও সুনীতির না আসিবার একটা কারণও হইতে পারে বলিয়া তাহার মনে হইল; কিন্তু বেশীক্ষণ এই সান্ত্বনাটুকু তাহার মনকে শান্ত রাখিতে পারিল না, কেন না তাহার আহারের পরে প্রায় দেড় ঘণ্টা অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও সুনীতির হইয়া গিয়াছে এখনও সুনীতির দেখা নাই।

একে ত সারা দুপুরটি এমন নিষ্কর্ম্মা ভাবে তাহার কাটান সম্ভব; তার পর এই খালি বাড়ীতে শুধু চাকর বাকরদের মধ্যে সুনীতির থাকাটাই কি উচিত? অসহিষ্ণু হরেন শয্যাত্যাগ করিয়া সুনীতির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, এবং বাড়ীর প্রত্যেক খানি ঘর খুঁজিয়া যখন সুনীতির দেখা মিলিল না তখন সে কালুকে ডাকিয়া তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এরা সব গেল কোথায়?"

হায়, যত দোষ নন্দ ঘোষ! সুনীতির উপরকার বিদ্বেষের ঝালটা প্রতিবারই এই কৃষ্ণের জীবটির উপর বর্ষিত হইতেছে। 'এরা' অর্থ সে বেচারী বুঝিল না, দশন পংক্তি বিকশিত করিয়া সে শুধু প্রশ্ন কর্ত্তার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

"বাড়ীর লোক গুলো সব গেল কোথায়?"

এত বড় সমস্যার সমাধান যখন জামাই বাবুই করিয়া দিলেন তখন কালু বেচারীও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং বলিল, "এই লোকগুলো, বামুন ঠাকুর মাংস আনতে দোকানে গেছে, রামদাস ইঁদারার ধারে বাসন মাজছে, আর আমি এই হুজুরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি।"

"মর হতভাগা গাধা, বাড়ীর মালিকরা কোথায়?"

"ওঃ বাড়ী মালিকরা! কর্ত্তা বাবু মাদের নিয়ে তো নিমন্ত্রণে গিয়েছেন।"

"বেটা একটা আস্ত গাধা—ইচ্ছে করে—কর্ত্তা বাবুর মেয়ে কোথায়?"

কথাটা এতক্ষণ সোজা করিয়া বলিলে তো

আর কালু বেচারীকে এই হাঁটু জলে নাকানি চুবানি খাইতে হইত না! সে তখন অত্যন্ত সহজ স্বরে, অদূরস্থ একটি বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দিদিমণি ঐ বাড়ীতে তার সইয়ের সঙ্গে তাস খেলিতে গিয়েছে।"

৮

সুনীতি ভাবিতেছিল, সারাটি দিন যেন কোন রকমে পাশ কাটাইয়া গিয়াছে, এখন রাত্রিটা সে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে না শুইলেও, তাঁহার ঘরে তো শুইতেই হইবে, তাহাও আবার উপযাচকের মত। আজ মা কিংবা মাসীমাও নাই যে ঠেলিয়া ঠুলিয়া ঘরে পাঠাইয়া দিবেন। তাহাকে এমন অসহায় ভাবে একাকী বাড়ীতে ফেলিয়া রাখিয়া পিতা মাতা দিব্য নিশ্চিন্ত মনে নিমন্ত্রণে চলিয়া গেলেন; কাল আসিলেও সে অনেক রাত্রে আসিবেন, ততক্ষণ সে থাকে কোথা? পিতা মাতার এই অবিবেচনার উপর শত ধিক্কার দিতে দিতে সুনীতি নিরুপায়ের মত শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া খাটের উপর শায়িত স্বামীর নিকট আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। নিশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দে স্বামীকে নিদ্রিত মনে করিয়া সে কয়েক মিনিট তাঁহার শয্যা পার্শ্বে দাড়াইয়া রহিল। তার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, কি ভাবিয়া, গত রাত্রির মত কম্বল মুড়ি দিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল।

প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, এই দুইজনের কাহারও চোখে আজ নিদ্রা আসিল না।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে লাগিল। ক্রমাগত উস্ খুস্ ও পাশ ফিরিবার শব্দে উভয়েই যে জাগ্রত তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিল; মন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেও অভিমানকে ক্ষুণ্ণ করিতে কেহই প্রস্তুত নহে।

সুনীতির মনে হইল, এরূপ অনাদৃত ভাবে স্বামীর ঘরের মেঝেতে পড়িয়া থাকা একান্তই অপমানজনক। তার চেয়ে মাসীমার ঘরে গিয়া শোয়া ভাল। তাই সে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং লণ্ঠনটী হাতে লইয়া আস্তে আস্তে দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

দুইটা বারান্দা পার হইয়া তবে সুনীতির মাসীর ঘর। ঘরে তালাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় চাবিটি সুনীতির কাছে ছিল। চাবি খুলিয়া সুনীতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল; অমনি সহসা তাহাকে পেছন দিকে হইতে কে সবলে চাপিয়া ধরিল। এই অতর্কিত আক্রমণে সুনীতির হাত হইতে লণ্ঠনটী মাটীতে পড়িয়া নিবিয়া গেল।

সুনীতি "চোর চোর" বলিয়া ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিল।

বারান্দার নিম্নে, নিকটেই ছিল কালুর কুটীর।

সে বেচারীর চোখেও আজ ঘুম আসে নাই, বাড়ীর পত্রে সে আজ বিকালেই জানিতে পারিয়াছে যে বৃদ্ধ বয়সে সে প্রথম পুত্রের পিতা হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে পিতৃপদ! হর্ষে কালুর চোখে আজ আনন্দাশ্রু বহিয়াছে। হায়, বাবু যদি তাহাকে কয়েকটী দিনের জন্তও ছুটী দিতেন, তাহা হইলে সে একবার বাড়ী গিয়া পুত্রমুখ দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিত। কিরূপ ভূমিকা সহকারে তাহার আবেদনটী আগামী কল্য প্রভুর চরণে জানাইলে তাঁহার অনুগ্রহটুকু সে লাভ করিতে পারিবে; এবং ছুটী মঞ্জুর হইলে নবজাত শিশুটীর জন্য কিরূপ জিনিস লইয়া গেলে খোকার জননীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, এই ভাবনা-সমুদ্রে নিমগ্ন কালুর কর্ণে সুনীতির আর্ত্ত চিৎকার প্রবিষ্ট হইয়া তাহার আশা আনন্দের কল্পনা চিত্রখানি কোথায় অন্তর্হিত করিয়া দিল! সে কাঁপিতে কাঁপিতে ধড় মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—"আমি আসছি দিদিমণি ভয় নেই।" মনে মনে বলিল, আজকাল বাঙ্গালা বাবুরা হাওয়া খাইতে আসায় এখানে চোরের উপদ্রব কি ভয়ানক হইয়াছে।

অন্ধকার ঘরে কালু দেশলাই খুঁজিতে লাগিল।—এখানে ওখানে হাতড়াইতে বিছনার নীচে দেশলাইটী পাইয়া, তাহা হাতে করিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইতে গিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল, চোর নিশ্চয়ই অস্ত্রে সস্ত্রে সজ্জিত

হইয়া আসিয়াছে, এখন তো তার শুধু একটা প্রাণ নহে, এক অসহায় শিশু ও শিশু-জননীর ভারও যে তাহার উপর ন্যস্ত! কিন্তু এদিকে আবার মনিব-কন্যার উপর চোরের আক্রমণ—সাহায্য করিতে না গেলে চাকুরীর ভয়ও যে যথেষ্ট!

"শক্ত করে ধরে রাখ দিদিমণি, এই আমি আসছি" বলিয়া কালু কম্পিত পদে বারান্দায় উঠিল। চোরকে একবার চোখে না দেখিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে তাহার সাহস হইতেছিল না। পিস্তল কিম্বা ছোরা ছাড়া সে বদমাস কখনই আসে নাই। তাই প্রাণভয়ে ভীত ভৃত্য পুঙ্গব মুখে অবিরত বলিতেছে—"ধরে রেখে দিদিমণি, ছেড়ে দিওনা—এই আমি এলাম বলে!" চোরের আকৃতি দূর হইতে দেখিবার আশায় সে বারংবার দেশলাই জ্বালিতে লাগিল, কিন্তু দেশলাইয়ের কাঠি যেমন জ্বলিয়া উঠিতেছে অমনি তাহার সঘন নিশ্বাস ও ভীত কম্পিত হস্তের কাঁপুনিতে নিবিয়া যাইতেছে।

হঠাৎ কালুর মাথায় এক বুদ্ধি খেলিয়া গেল। সে ত্বরিৎ পদে অগ্রসর হইয়া, বাহির হইতে ঘরের শিকলটি বন্ধ করিয়া দিল। বাবু ফিরিয়া আসুন, তিনিই ইহার বিহিত করিবেন। চোর এখন বন্ধ থাকুক। এই ভাবিয়া কালু সম্মুখের বারান্দায় গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই গৃহকর্ত্তা মোটরে করিয়া গৃহে পৌছিলেন। নিদ্রিত পুত্র দুইটিকে সঙ্গে করিয়া গৃহিণী ও তাঁহার ভগিনী ভিতরে চলিয়া গেলেন। তারাপদ বাবু মোটর বিদায় দিয়া কালুকে ডাকিয়া তামাক আনিবার জন্য আদেশ করিলেন।

কালু বলিল, "হুজুর, একটা কাণ্ড হয়ে গেছে।"

তারাপদ বাবু ভৃত্যের মুখ চক্ষুর ভাব দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাণ্ড রে?"

"এজ্ঞে চোর এসেছেন।"

তারাপদ বাবু প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "চোর! কোথা রে?"

"এজ্ঞে মাসীমার ঘরে।"

"সে কিরে? কখন? কখন?"

কালু বলিল, "এজ্ঞে—রাত্রির তখন প্রায় ১১টা। মাসীমার ঘর থেকে, দিদিমণি চোর চোর বলে চেঁচাতে লাগলো। আমি লাফিয়ে বারান্দায় উঠে শুনলাম, চোরটা পালাবার জন্য ঝটাপটী করছে। খুব শক্ত করে ধরে থাক দিদিমণি ছেড় নি—বলে আমি আমি শেকলটা বাইরে থেকে বন্ধ দিলাম। চোর আর পালাতে পারলেন না।"

ভৃত্যের এই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে তারাপদ বাবুর আপদ মস্তক জ্বলিয়া গেল। কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন—"হতভাগা পাজী শুয়ার, চোরশুদ্ধ দিদিমণিকে ঘরে বন্ধ করলি, চোর যদি তাকে মেরে ফেলে থাকে!"

কালু বলিল, "এজ্ঞে তাও কি হয় কত্তা? ছিরি-লোকের গায়ে কি হাত তুলতে পারে হেঁ হেঁ!"

ভৃত্যের কথায় তারাপদ বাবু হতবুদ্ধি হইয়া গেলেও, বাহিরের লোকজন এ ব্যাপার জানিতে পারিলে যে একটা কেলেঙ্কারী অবশ্যম্ভাবী এ বিবেচনা-বুদ্ধি হারাইলেন না। তাই অযথা চেঁচামেচি গোলমাল না করিয়া, তিনি ড্রয়ার খুলিয়া একটি পিস্তল বাহির করিয়া, সেটা একবার আলোকের নিকট ধরিয়া দেখিয়া, নির্দ্দিষ্ট কক্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া কালুর হাতে লণ্ঠন ও লাঠি দিয়া, পিস্তল হাতে তিনি দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলেন। জামাতা যে গৃহেই আছে, তাহার সাহায্য লওয়া যাইতে পারে, অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় সেটা তাঁহার মনে হইল না।

পিস্তল উচাইয়া কঠোর স্বরে গৃহ মধ্যস্থ চোরকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশে তারাপদ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "পালাতে গেলেই গুলি করবো।" বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজে চোরকে সন্ত্রস্ত করিয়া, তিনি কালুকে দরজা খুলিতে আদেশ দিলেন।

শিকল খুলিলে, দ্বার ঠেলিয়া দেখিলেন উহা ভিতর হইতে বন্ধ। সজোরে দুই তিন ধাক্কা দিতে ভিতর হইতে জড়িত স্বরে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

পর মুহূর্ত্তে দ্বার খুলিয়া গেল। তারাপদ বাবু

সবিস্ময়ে দেখিলেন, চোর নহে, জামাই। সুনীতি জুটী সুটী হইয়া এককোণে দাঁড়াইয়া আছে।

রহস্য প্রকাশিত হইল জানা গেল, সুনীতি যখন স্বামীর ঘর হইতে বাহির হইয়া মাসীমার ঘরে শুইতে আসে, সেই সময় হরেন তাহাকে ভয় দেখাইবার ও জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে নিঃশব্দ পদে পিছু লইয়াছিল, এবং কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুনীতিকে ধরিয়াছিল।

কন্যা জামাতার কাণ্ড শুনিয়া তারাপদবাবু ও তাঁহার গৃহিনী মুখ খুব গম্ভীর করিয়া রহিলেন বটে, কিন্তু ভিতরে হাসির উচ্ছ্বাস চাপিতে তাঁহাদের উভকেই বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

অতঃপর সুনীতি মাতৃ-তাড়নায় স্বামীর শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, দুই ঘণ্টাকাল বন্দী দশায় যাপনের ফলে কোনও অজ্ঞাত উপায়ে উভয়ের বিপদ ভঞ্জন হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীকিরণবালা দেবী।

পথহারা

(গল্প)

ভোর বেলা কাত্যায়নী যখন স্নান সারিয়া পূজা করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন প্রতিবেশী তারিণী চক্রবর্ত্তী আসিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল, "শুনছ গা অ ছোট খুড়ী, শুনেছ তোমাদের নরেনের কীর্ত্তি?"

কাত্যায়নী বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কার কথা বলছ তারিণী?"

তারিণী কহিল, "তোমাদের নরেন গো নরেন! জান না? যার আশায় থুবড়ো ধিঙ্গি মেয়ে করে রেখেছ। তখন তো আর কারুর কথা শুনলে না, মনে করলে সাহেব জামাই হয়ে চোদ্দ পুরুষ সগ্‌গে তুলে দেবে। তা সইবে কেন, অত অনাচার কি আমাদের হিঁদুর ঘরে সয়? এখন তার ফল পেলে তো হাতে হাতে? এখন ঐ ধিঙ্গি মেয়ে নিয়ে কি করবে কর।"

অসহিষ্ণুভাবে কাত্যায়নী কহিলেন, "কি বলছ তারিণী? ভাল করে বল, নরেন কি করেছে?"

তারিণী বলিল, "আজকালের ছেলেরা যা করে থাকে তাই করেছে। তুমি ভাবছ বিলেত থেকে ফিরে এলেই তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে; এদিকে সে সেখান থেকে এক মেম সাহেব বিয়ে করে আনছে।"

কাত্যায়নী এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে বিস্ময়ে বিমূঢ় ভাবে স্তব্ধ হইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহাকে চুপ করিতে দেখিয়া তারিণী পুনরায় আরম্ভ করিল, "তোমাদের একটু ক্ষতি দেখলে আমার প্রাণ কাঁদে, ছোট খুড়ী, তাই আমার বলতে আসা। তোমা-হয় তো তা ভাল লাগে না।"

তারিণী একটু কাসিয়া, চাদরের প্রান্তে চক্ষু দুইটি মার্জ্জনা করিয়া, করুণস্বরে কহিতে লাগিল, "ছোট খুড়ো কি ভালই বাসতেন আমাকে—এই তারিণী না হোলে, তাঁর কোন কাযই হোত না। তোমরা তো আমার পর নও! তাই যখন যদু মিস্তিরের পরিবার মরে গেল, তখনই তোমায় বল্লুম, অমন পাত্তর হাতছাড়া কোরনা, ছোট খুড়ী! এই বেলা কমলীর বিয়ে দিয়ে ফেল; তোমার যখন পয়সা নেই, মেয়েও বড় হয়েছে, তখন ওর চাইতে ভাল পাত্তর আর কোথায় পাবে? যদু মিস্তির তেজারতি করে কি কম ফেঁপে উঠেছে? তার উপর ছেলেগুলোও সব চাকরী করছে। তুমি তো তখন সে কথা শুনলে না, ছোট খুড়ী। কিন্তু সেই মাসেই ওপাড়ার রায়েদের মেয়ের সঙ্গে যদু মিস্তিরের বিয়ে হয়ে গেল।

মুখুয্যেদের মেজ জামাই এসেছে কি না, তারি কাছে কাল শুনলুম নরেনের বিয়ের কথা।"

এত গুলা কথা বলিবার পরও যখন অপর পক্ষ হইতে কোনও উত্তর আসিল না, তখন সে বিরক্তচিত্তে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কাত্যায়নীর আজ প্রথম মনে হইল যে, মানুষের ভিতর বাহির সমান নয়। নরেন যে এত দুর্ব্বল চিত্ত, এমনভাবে সে যে প্রতারণা করিতেও পারে এ কথা এক দিনের জন্যও তাঁহার মনে হয় নাই। নরেনও যদি এমন ব্যবহার করিতে পারিল, জগতে তাহা হইলে কিছুই অসম্ভব নয়। অমন সরল মুখ, তেমন উন্নত ব্যবহার—সবই কাপট্যের আবরণ মাত্র! তাহার বন্ধুত্ব কি সকলই মৌখিক? এই যে আশা দিয়া নিরাশ করিয়া গেল, একবার ভাবিয়া দেখিল না যে, সে খেলাচ্ছলে কতখানি তাঁহাদের ক্ষতি করিয়া গেল!

কাত্যায়নীর ভয় হইল মেয়ের জন্য। কুসুমকোমলা বালিকা—সে এতখানি আঘাত কি সহিতে পারিবে? পারুক আর নাই পারুক, তাহার জন্য ত আর বিধির বিধান বদল হইবে না।

ঘরের ভিতর হইতে কমলাও শুনিয়াছিল, নরেন বিবাহ করিয়াছে। সে কাঁদিল না, মূর্চ্ছাও গেল না, খালি তাহার মাথার ভিতর যন্ত্রণা হইয়া উঠিল। আনন্দ বা দুঃখের আতিশয্যে মানুষ যেমন স্তব্ধ হইয়া যায়, কিছুক্ষণ সেও তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে সে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেলে তাহার মনে পড়িল, মায়ের আজ দ্বাদশী, এখন সরবতের জন্য মিছরি ভিজান হয় নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল, মা সেইখানে তখন বসিয়া আছেন।

কমলা কাছে আসিয়া ডাকিল, "মা!"

কাত্যায়নী কোন উত্তর দিলেন না, চাহিয়াও দেখিলেন না।

কমলা তখন মায়ের পাশে বসিয়া, তাঁহার হাতখানা নিজের কোলের উপর রাখিয়া, পুনরায় ডাকিল—"মা!"

কাত্যায়নী চাহিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর, ধীরে ধীরে তাঁহার দৃষ্টিতে সহজ ভাব ফিরিয়া আসিল। কমলার মাথাটা কোলে টানিয়া লইতেই, বেদনায় উজ্জ্বল দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া বৃষ্টিধারার মত জল ঝরিয়া পড়িল।

২

হরিশ্চন্দ্র এবং বিনোদকুমার ছিলেন এক গ্রামেরই বাসিন্দা; এবং কর্ম্মস্থান কলিকাতায় বাস করিতেনও উভয়ে পাশাপাশি দু'খানা বাড়ীতে। এই কারণেই বোধ হয়, এই দুইটি পরিবারের মধ্যে একটু বেশী রকমের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

বিনোদকুমারের সংসারের বন্ধন, একমাত্র পুত্র—নরেন্দ্রনাথ। পত্নী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু নরেনকে স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া অনেকদিনই ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মা-হারা নরেন যে হরিশের স্ত্রী কাত্যায়নীর নিকট অনেকখানিই স্নেহ যত্ন পায়, এ কথা তিনি ভালই জানিতেন; সেই জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞও ছিলেন। আর সবচেয়ে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল হরিশচন্দ্রের একমাত্র কন্যা কমলা। মেয়েটির দুইটি কালো চোখের কোমল দৃষ্টিতে কি ছিল কে জানে, যাহাতে তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকা যায় না। কমলার মনেও জেঠামহাশয়ের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল।

দেশ ছাড়িয়া পর্য্যন্ত কমলার কোন সঙ্গিনী যুটে নাই, তবে সে তাহাতে একটুও দুঃখিত নয়। সে আপনার রাজ্যে বনবিহঙ্গীর মত সানন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। নিয়মিত সময়ে পাঠাভ্যাস করা এবং পাঠান্তে মার কাজের সাহায্য করা; আর জননীর স্থান অধিকার করিয়া জেঠামহাশয়কে সেবা যত্ন করিয়াই সে পরিতুষ্ট থাকিত।

কমলার আর একজন উদার ও স্নেহসম্পন্ন বন্ধু যুটিয়াছিল, সে তরুণ যুবক নরেন্দ্রনাথ। নরেন তাহার পাঠ বুঝাইয়া দেয়, তাহার সহিত সাহিত্য, ইতিহাসের আলোচনা করে, আবার মায়ের স্নেহের অংশ লইয়া কলহ মান অভিমান সন্ধিও করে। এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন সঙ্গী

তাহার আর কথনও মিলে নাই, তাই নরেনের উপর তার কৃতজ্ঞতা কখন্ শ্রদ্ধায়, এবং শ্রদ্ধা ভালবাসায় রূপান্তরিত হইয়া গেল, অনভিজ্ঞ কমলা তাহা জানিতেও পারিল না।

মেয়ে যখন মাথা ঝাড়া দিয়া তাহার আশু বিবাহ দিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে চাহিল, এবং মা বাপ মেয়ের বিবাহ চিন্তায় মন দিলেন, সেই সময়ে একদিন ধরণীর মরুবক্ষে বর্ষার প্রথম বারিপাতের মত নরেন্দ্রনাথ কাত্যায়নীর কাছে অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব করিয়া বসিল— সে কমলকে বিবাহ করিবে।

হরিশ্চন্দ্র বিনোদকুমারের নিকট যাইয়া অনুমতি চাহিতেই, বিনোদকুমার কোনমতে আনন্দাশ্রু সংবরণ করিয়া, স্বর্গগতা পত্নীর বহুকালের পরিত্যক্ত গহনার বাক্স হইতে একযোড়া বালা বাহির করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র মা-টিকে পরাইয়া দিয়া আসিলেন।

তারপর যখন নরেন্দ্রনাথ মেডিকেল কলেজ হইতে "এম বি" উপাধি ভুষিত হইয়া বাহির হইল, তখন পিতার এখানকার শিক্ষায় মন উঠিল না; তিনি পুত্রকে বিলাত পাঠাইতে চাহিলেন। কথা রহিল, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেই বিবাহ হইবে। নরেন্দ্রনাথ উচ্চ সম্মানের সন্ধানে সাগরপারে যাত্রা করিল।

নরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাওয়ার কিছু দিন পরেই বিনোদকুমার ও হরিশ্চন্দ্র প্রায় এক সঙ্গেই, পুত্র কন্যার বিবাহ অসমাপ্ত রাখিয়া, সংসারের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। হরিশ্চন্দ্র মৃত্যুকালে পত্নীকে বলিয়া গিয়াছিলেন, কমলার যেন অন্যত্র বিবাহের চেষ্টা না করা হয়।

৩

মানুষে গড়ে আর বিধাতা ভাঙ্গেন। নরেন্দ্রনাথ যেদিন কাত্যায়নীকে প্রণাম করিয়া, কমলার নিকট বিদায় লইয়া জাহাজে চড়িল, সেইদিন হইতে কমলা প্রবাসী নরেনের অধ্যয়ন সমাপ্তির দিন গণিয়া সুখ-মিলনের প্রতীক্ষা করিতেছে। তরুণ জীবনে আশার আলোকে কত মোহন ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বিধাতার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে ভবিষ্যতের রঙীন ছবি বিদীর্ণ করিয়া তাহার সকল সুখ-সাধের সমাপ্তি হইয়া গেল। কমলার মনে পড়িল, নরেনের সেই বিশ্বাসদীপ্ত জ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় নয়নযুগল —তাহারা যে বিশ্বাসের অনেকখানি পরিচয়ই দিয়াছিল! তবে কেমন করিয়া তেমন বিশ্বাস সে ভাঙ্গিল? শুধু একখানা শুভ্র মুখের প্রলোভন? সে কি এতই বড় যে, তাহার নিকট সত্য, ধর্ম্ম, বিশ্বাস ও উচ্চ মনোবৃত্তি সকল বিক্রীত হইয়া যায়!

নরেন তাহাদের সহিত সকল বন্ধন ছিন্ন করিল, করুক; কিন্তু কমলা তার মাকে বুঝায় কি করিয়া? তিনি যে তাহার বিবাহের জন্য আবার কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। কেমন করিয়া সে মাকে বুঝাইবে যে সে অপরের উৎসৃষ্ট ফুল, তাহার আর বিবাহ হইতে পারে না। জীবনে স্বামী পূজার অধিকার তাহার নাই বা ঘটিল; সে যে ব্রহ্মচারিণী, ব্রতধারিণী হইয়া মায়ের সেবা করিয়া কাটাইতে পারিলেই বেশী সুখী হইবে, এ কথা যে মা কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না।

সত্যই কাত্যায়নী আজ মেয়ের বিবাহের জন্য অন্ধকার দেখিতেছেন। তিনি সহায়-সম্পদহীনা, কে তাঁহাকে সৎপাত্র আনিয়া দিবে?

জগতে কাহারও জন্য কিছুই আটকাইয়া থাকে না। কমলার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার বিবাহ হইয়া গেল। আবার বিবাহের মাস খানেকের মধ্যেই কমলার বৃদ্ধ স্বামীটি কমলাকে চিরদিনের জন্যই মুক্তি দিয়া পরপারে যাত্রা করিলেন।

সিক্তবসনা, মুক্তকেশী, নববিধবা কন্যাকে লইয়া কাত্যায়নী যখন ঘরে ফিরিলেন, তখন সবিস্ময়ে দেখিলেন, দণ্ডদাতা নরেন নিজে দণ্ডিতের ফাঁসি দেখিবার জন্য তাঁহারই আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া আছে।

৪

ঘনান্ধকার রাত্রি। বাহিরে ঝড়ের বাতাস আসন্ন

বৃষ্টির সম্ভাবনা জানাইয়া দিতেছে। আকাশে চাঁদ নাই, নক্ষত্র নাই, খালি আকাশের কোলে জমাট বাঁধা অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে, চেষ্টা করিয়াও যেন দিগ্বলয়ের সীমারেখা নির্দ্দেশ করা যায় না। সেই সীমাহীন অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া, খোলা জানালা পথে কমলা দাঁড়াইয়া আছে। বাহিরের অনুরূপ তাহার হৃদয়ের মাঝেও অন্ধকার ও দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে। সেখানেও আলোর চিহ্নটুকুও নাই, খালি গাঢ় অন্ধকার। নিজের ভুলের কথা ভাবিয়া সে অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল। বাহিরে ঝড়ের বাতাস যখন সোঁ সোঁ গোঁ গোঁ শব্দে প্রকৃতির আর্ত্ত হাহাকার রব দিগ্‌দিকে ছড়াইয়া দিতেছিল, ঠিক তাহারই প্রতিধ্বনি তাহার বুকের মাঝে হাহা করিয়া ফিরিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে মুখেও তাহার অন্তরের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। আজ যেন রজনীর সমস্ত সুপ্ত অন্ধকার বিদ্রোহ করিয়া কমলাকেই তিরস্কার করিবার জন্য জমাট বাঁধা প্রকাণ্ড একটা তাল পাকাইয়া উঠিয়াছে। কালো আকাশের বুক চিরিয়া চপলা তাহার ভ্রূকুটি হানিয়া কড় কড় নাদে যেন তাহাকেই বলিতেছিল, ওরে নির্ব্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন! নিজের কায চাহিয়া দেখ্; কি করিয়াছিস! বুঝিবা কমলার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে জানালা বন্ধ করিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িল।

তাহার বার বার সেই দিনের কথা মনে পড়িতে লাগিল, যেদিন নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের জানাইল তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা ভুল শুনিয়াছেন; এতখানি হীনচেতা মানুষ সে নয়।

এত দুঃখের ভিতরেও কমলার অন্তরে একটা প্রচণ্ড সুখের অনুভূতি বেদনার মতই বিঁধিতেছিল—সে পরের নয়, দেবতা এখনও দেবতার আসনেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু এ সুখও তাহার স্থায়ী নয়। নরেন অপরের না হইলেও তাহার নয়। সে স্মৃতিতেও তাহার পাপ। নরেনের সহিত সকল সম্বন্ধ জন্মের মতই ফুরাইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধ নির্ম্মম কুঠারাঘাতে নিজের হাতেই সে ছিন্ন করিয়াছে। তাহার কত বড় বিশ্বাসে কি নিষ্ঠুরভাবে কতখানি আঘাতই সে দিয়াছে, এই কথাটা স্মরণ হইতেই কমলার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কমলা উঠিয়া ঘরের একটা জানালা খুলিয়া দিল। তখন বৃষ্টি কমিয়া বাতাসের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘগুলি আকাশকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সামনের বাড়ীতে কে একজন মিষ্ট গলায় গান গাহিতেছিল। সেই গানেরই দু'টি চরণ কমলার কাণের ভিতর দিয়া মনের ভিতর বাজিতেছিল—

"তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।"

কমলা যুক্ত করে, ঊর্দ্ধ নেত্রে মনে মনে বলিল, "তাই কর, ঠাকুর, তোমার মঙ্গল হস্ত দিয়া আমার মনের মলিনতা মুছাইয়া দাও। আমায় তুমি নূতন চিন্তা নূতন স্বার্থের হাত হইতে রক্ষা কর। তোমায় স্নেহে যেন বিশ্বাসহারা না হই, শুধু এইটুকুই আমার রাখিও, ঠাকুর।"

৫

সেদিন সন্ধ্যার সময় মেঘ ও বিদ্যুতের অবিশ্রাম কৌতুক-দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টিধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। বাগান হইতে সদ্য ফোটা রজনীগন্ধার ভিজা গন্ধটুকু গায়ে মাখিয়া মুক্ত গবাক্ষপথে চঞ্চল বাতাস ছুটাছুটি করিতেছে। নরেন তাহার অন্ধকার ঘরের খোলা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, কমলার কথা। কমলাও তাহাকে এমন করিয়া ভুল বুঝিল? কিন্তু সে তো অধ্যয়নের পেষণে, কমলার কথা একদিনের জন্যও ভুলিয়া যায় নাই! সে যে অধ্যয়নের কঠোরতা তাহারই স্মৃতির সুখে মধুরতর করিয়া তুলিতেছিল। তাহার কল্পনা প্রাণময়ী হইয়া আশার স্বপ্নকে সোণার রঙে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। সফলতার আনন্দ বহিয়া যেদিন সে কমলার পাশে গিয়া

দাঁড়াইতে পারিবে, সেদিন তাহার অভীষ্টদেবী কৃতার্থতার পুরস্কারে কখনই তাহাকে বিমুখ করিবে না, ইহাই যে সে ভাবিয়াছিল।

নরেন ঠিক করিল, সে সরকারী চাকরীতে আর যাইবে না। তা'র প্রয়োজনই বা কতটুকু? সে তা'র পৈতৃক ভিটায় বসিয়া ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশের এবং ঐ দুইটী অনাথা রমণীর সেবা করিয়াই চিরজীবন কাটাইবে। পর দিন যাইয়া সে কাত্যায়নীকে এই কথা জানাইয়া আসিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। কয়েকটি উজ্জ্বল তারকা ধরার পানে চাহিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিতেছিল। কমলা তুলসীমূলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, নরেন।

নরেনকে দেখিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কমলা বলিল, "তুমি নাকি, ঠিক করেছ এইখানে থাকবে?"

নরেন বলিল, "তাই তো মনে করছি, কমলা!"

পার্শ্বের লাউমাচার খুঁটীটা সবলে চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে কমলা বলিয়া উঠিল, "না, না, তুমি চলে যাও। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এখানে থেক না।"

বিস্মিত হইয়া নরেন বলিল, "আমাকে ভয় কর কমলা?"

মরণাহতের অন্তিম নিশ্বাসের মত কমলার কণ্ঠ চিরিয়া বাহির হইল, "তোমাকে ভয় নয়। তুমি মহৎ, তুমি পবিত্র; কিন্তু তোমার নীরব আত্মত্যাগ মনকে ভীত করে। তুমি ফিরে যাও। আমার ধর্ম্ম আমায় সফল করতে দাও।"

"তবে তাই হোক্, কমলা। এই শেষ, আমি কাল জন্মের মত এদেশ থেকে চলে যা'ব। এ জীবনে আর নারায়ণপুরের মাটিতে ফিরে আস্‌বো না। তোমার মঙ্গল ঈশ্বরের উপর নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠিত হো'ক। ঈশ্বর তোমায় শান্তি দিন।"

ভোর বেলা এক হাতে গ্লাডষ্টোন ব্যাগ, অপর হাতে ছাতা লইয়া নরেন আসিয়া যখন কাত্যায়নীর চরণে প্রণাম করিল, তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাচ্ছ?"

নরেন বলিল, "কোথা যাচ্ছি, কাকীমা, তা'র কিছু ঠিক নেই। এখন তবে কোথাও একস্থানে যাচ্ছি এ কথা ঠিক।"

কাত্যায়নী বলিলেন, "কবে ফিরবে?"

নরেন বলিল, "আর বোধ হয় এখানে ফিরবো না, কাকীমা। জন্মের মতই যাচ্ছি।" আর উত্তরের প্রতীক্ষা মাত্র না করিয়া নরেন চলিয়া গেল।

ঘরের ভিতর মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নরেনের উদ্দেশে কমলা বলিল, "তুমি এত মহৎ, এত উচ্চ, এত পবিত্র! তোমার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। কিন্তু পারবে কি অভাগিনী কমলাকে ক্ষমা করতে? তুমি যে আজ এই অভাগিনীর জন্তেই, তার পথ সুগম করে' দিয়ে, নিজে দুর্গম মরু পথে পথহারা।"

শ্রীসূর্য্যমুখী দেবী।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিনিময় তত্ত্ব।

হেম চলিয়া গিয়াছে। কিশোরী তাহাকে কলিকাতা মেলে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে। পরদিন ঘোষ ও মল্লিক সাহেবদ্বয়ও দার্জ্জিলিঙ ত্যাগ করিয়াছেন, কিশোরী দূর হইতে তাঁহাদিগকে প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে।

প্রভাতে ও বৈকালে কিশোরী ভ্রমণে বহির্গত হয়। আশা, যদি সত্যবালাকে পথে' একটিবার দেখিতে পায়। যদিও তাহার মা বোনেরা সঙ্গে থাকিবে, বাক্যালাপের

কোনও সুযোগ মিলিবে না,—তথাপি চোখে একবার দেখিবে ত! তিন চারিদিন বিফল প্রয়াসের পর, একদিন বিকালে মেকেঞ্জি রোডের উপরিভাগে ইঁহাদিগকে সে দেখিতে পাইল। তাঁহারা বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলেন, নিকটস্থ হইলে, কিশোরী টুপী উত্তোলন পূর্ব্বক অভিবাদনাস্তর ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেল। মিসেস ঘোষ গম্ভীর ভাবে ঈষৎ শিরোনমন পূর্ব্বক অভিবাদনের উত্তর দিয়াছিলেন, বীণা মৃদু হাসিয়াছিল, সতী এক নজর কিশোরীর পানে চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল। দুই তিন দিন পরে, আবার একবার, রোজব্যাঙ্কের নিকট কিশোরী ইহাঁদিগকে দেখিল। আচরণ পূর্ব্ববৎ।

আরও দিন দুই পরে, বেলা ১২টার সময়, কিশোরী এক বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ সারিয়া বাসায় ফিরিতেছিল। দূর হইতে দেখিল, বিপরীত দিক হইতে একটি বাঙ্গালী মেয়ে একাকী আসিতেছে। সত্যবালা নহে ত? হাতে দুই তিনখানি বহি ও খাতা। একটু নিকটস্থ হইলে কিশোরী স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সত্যবালা—এবং একাকিনী! পথটও সে সময় প্রায় নির্জ্জন। তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সতীর সম্মুখীন হইবামাত্র, টুপী তুলিয়া সে বলিল, "কেমন আছেন?"

কিশোরীকে দেখিয়া সত্যবালা যেন বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু দাঁড়াইল। তাহার ললাট ও কপোলদেশ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া কিশোরী বলিল, "অনেক দিনের পর দেখা। ভাল আছেন ত?"

এইবার সতী বলিল, "কেন পণ্ডিত"—বলিয়া চুপ করিল। তাহার দৃষ্টি কিশোরীর মুখের দিকে নহে, কঙ্করময় রাজপথের দিকে অবনত।

কিশোরী বলিল, "সে ত শুধু চোখের দেখা। তাতে কি আর আশা মেটে?"

এবার সতী মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কি যে বলেন আপনি!—যান্!"

কিশোরী বলিল, "যাব? যাবই ত! আচ্ছা, তবে যাই?"

সতী বলিল, "তাই কি আপনাকে আমি বলেছি? কোথায় গিয়েছিলেন এ সময়?"

"নিমন্ত্রণ ছিল। কলকাতা থেকে আমার একদল বন্ধু সম্প্রতি এখানে এসেছেন, তাঁরাই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আপনি কোথায় যাচ্চেন?"

সতী বলিল, "আমি যাচ্চি পড়তে। মাদাম লেভেরো বলে' একজন ফ্রেঞ্চ শিক্ষয়িত্রী আছেন, আমি রোজ দুপুরবেলা তাঁর বাড়ীতে ফ্রেঞ্চ পড়তে যাই। চলুন, সেখানে আমায় পৌঁছে দেবেন?—আপনার বিশেষ কোনও কায ত এখন নেই?"

কিশোরী বলিল, "অত্যন্ত বিশেষ কাযই এখন আমার আছে।"

"কি?"

"এই, আপনাকে পৌঁছে দেওয়া। এরচেয়ে লোভনীয় স্পৃহনীয় কায আর আমি কোথায় পাব?"

সতী বলিল, "যান! ঐ সব বুঝি বলে? চলুন।"

পথে চলিতে চলিতে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "এ ক'দিনে নতুন কবিতা কিছু লিখলেন না কি?"

"লিখেছি একটা। আপনিও লিখেছেন নিশ্চয়?"

"লিখেছি গোটাকতক।"

"সঙ্গে আছে?"

কিশোরী বলিল, "না—আমি কি জানি, আপনার দেখা পাব—এ সৌভাগ্য আজ আমার কপালে আছে!—যদি হুকুম পাই ত কাল নিয়ে আসি।"

সতী বলিল, "অন্যদিন কিন্তু আমার সঙ্গে দরোয়ান থাকে। আজ তার 'শির দুখাচ্ছে' বলে তাকে আনি নি।"

কিশোরী বলিল, "আহা, তার শিরঃপীড়াটী চিরস্থায়ী হোক। কিন্তু আপনার মা আপনাকে একলা আসতে দিতে আপত্তি করেন নি?"

সতী বলিল, "মা বলেন, দার্জ্জিলিও কতকটা বিলেতের মত; এখানে মেয়েরা—অন্ততঃ দিনের বেলায়—নির্ভয়ে পথে বেড়াতে পারে। কাল আপনি কবিতাগুলি আনবেন, আমি বাড়ী নিয়ে যাব, রাত্রে পড়ে, পশু আবার আপনাকে ফেরৎ দেবো।"

"নিষ্ঠুরের মত ফেরৎ দেবেন কেন? আপনার কাছে তারা থাকুলেই বা! তার বদলে বরঞ্চ আপনার কবিতাগুলি আমায় দেবেন, আমি রেখে দেবো।"

সতী বলিল, "বিনিময়? আগে ত বিনিময় প্রথাই ছিল। যখন টাকা পয়সার সৃষ্টি হয় নি, তখন বিনিময়েই সংসার চল্‌ত। এখনও শুনেছি খুব পাড়াগাঁয়ে আছে। ধান দিয়ে গুড় কেনা যায়।"

কিশোরী বলিল, "খুব সহরেও আছে।"

"কি? পুরাণো কাপড় দিয়ে বাসন কেনা?"

কিশোরী বলিল, "তাও আছে। ধান-গুড়, কাপড়-বাসন বিনিময় ছাড়াও অন্য বিনিময় আছে। যথা—হৃদয়-বিনিময়, মাল্য-বিনিময়—ইত্যাদি।"

সতী একটু হাসিয়া বলিল, "মিষ্টার 'নাগ ওটা কি অর্থশাস্ত্র, না, অনর্থ শাস্ত্রের কথা?"

কিশোরী বলিল, "সে যাই হোক্‌। আপনি কিন্তু দয়া করে' আমাকে মিষ্টার নাগ বলবেন না।"

"তবে কি বলব?"

"আমার কিশোরী বাবু বলবেন।"

"আপনি চটবেন না? অনেকে কিন্তু বাবু বল্লে চটে যান।"

"আমি মিষ্টার বল্লেই চটি।"

সতী হাসিয়া বলিল, "মজা মন্দ নয়! একদিন ছিল, যখন, বাবু বল্লে লোকে চট্‌ত। মিষ্টার বল্লে চটে, আজকাল এমন লোকও আছে। আপনি খুব স্বদেশী, না?"

কিশোরী বলিল, "ভয়ঙ্কর স্বদেশী।"

সতী বলিল, "তবে আপনাকেও আমার মনের কথা খুলে বলি কিশোরী বাবু, আমিও মনে মনে ভয়ঙ্কর স্বদেশী। আমার বাড়ীর লোকেরা এ জন্যে বরং আমার উপর চটা। ঐ দেখুন, মাদাম লেভেয়োর বাড়ী দেখা যাচ্ছে। কাল তা হলে কবিতাগুলি আনবেন, ভুলবেন না।"

মেম সাহেবের বাড়ী তথায় দেখিয়া কিশোরী মুগ্ধ হইয়া গেল না। আরও অন্ততঃ আধক্রোশ খানেক দূর হইলে সুখী হইত। ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল, "কবিতা আন্‌বো। আপনিও আনবেন, ভুলবেন না।"

"আমি ভুলি না"—বলিয়া সতী তাহার দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিল। কিশোরী তাহা মর্দ্দন করিয়া, বিদায় লইল।

পথ হইতে একটু চড়াই উঠিয়া মাদাম লেভেয়োর বাড়ী যাইতে হয়। কিশোরী ধীরপদে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, আবার ফিরিল; সমস্তক্ষণ ঊর্দ্ধগামিনী সত্যবালার প্রতি তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ রহিল। সতী বাড়ীর ভিতর অদৃশ্য হইলে, সে ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিল। যেখানে সত্যবালার সহিত দেখা হইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া আবার ঘড়ি দেখিল—দশ মিনিট মাত্র। খুব গড়িমসি করিয়া চলিলে, এই দশ মিনিটকে টানিয়া বড় জোর পনেরো মিনিটে লম্বা করা যায়। পথের ধারে দুই স্থানে বসিবার বেঞ্চি আছে। মধ্যাহ্ন কালে সেগুলি প্রায় খালিই থাকে। সেখানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিলে আরও কিছুক্ষণ সময় পাওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, কিশোরী স্যানিটেরিয়ম্‌ অভিমুখে পদচালনা করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

নাছোড়বান্দা।

কিছুদিন ধরিয়া, দশ মিনিটের পথ পনেরো মিনিটে হাঁটিয়া, পথে বেঞ্চির উপর বসিয়া বিলক্ষণ বিশ্রম করিয়া এই দুইজন তরুণ কবির কাব্যালোচনা চলিল। এখন আর পরস্পরকে ইহারা 'আপনি' বলে না, তুমি বলিয়া থাকে। এখন আর অন্তরের প্রণয় বিনিময় জন্য কবিতার বেনামী আবশ্যক হয় না, স্ব-স্ব নামেই তাহা নির্ব্বাহিত হয়। ইহারা পরস্পরে হিন্দুমতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, কিন্তু তাহার কোনও উপায় এখনও ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে নাই।

উভয়ের প্রতিদিন দেখা সাক্ষাতে ক্রমে একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন জুন মাস মাঝে, মাঝে

বৃষ্টি হইতে লাগিল। যেদিন মধ্যাহ্নকালে বৃষ্টি নামে, সেদিন সব পণ্ড করিয়া দেয়।

বিকালে স্যানিটেরিয়মে বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ কিশোরীর নজর পড়িল, মিষ্টার পি মল্লিক আই-সি-এস তিনমাসের প্রিভিলেজ ছুটি গ্রহণ করিয়াছেন।

সংবাদটা দেখিয়া কিশোরীর মন বেশ প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। ভাবিল, "চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর"—এই নীতির অনুসরণে আবার কি হতভাগা আসিয়া জুটিতেছে না কি? সেরূপ যদি কিছু সম্ভাবনা থাকে তবে সতীর নিকট অবশ্যই জানিতে পারা যাইবে।

পরদিন সতী বলিল, সেই মল্লিক সাহেব ছুটি লইয়া দার্জ্জিলিঙে আসিতেছে, এবং তাহাদের পাশের বাড়ীখানা তিন মাসের জন্য ভাড়া লইয়াছেন। এই সংবাদ দিয়া সতী প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, "কি করবো আমি? আবার এসে আমায় সেই রকম করে' জ্বালাতন করবে।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কবে সে আসবে?"

"সে বাড়ীখানা ১লা জুলাই খালি হবে। তার দুই একদিন আগে এসে আমাদের বাড়ীতেই উঠবে, ১লা নিজের বাড়ীতে যাবে। যাবে ঐ পর্য্যন্ত, যতদূর বুঝতে পারছি আমাদের বাড়ীতেই হবে তার আড্ডা। পথও তাকে মাড়াতে হবে না, তার ডিঙালেই আমাদের হাতায় আসা যায়। আমি মাকে বল্লাম আমার এখানে আর ভাল লাগছে না, আমি কলকাতায় যাই। মা বল্লেন সেখানে একলা বাড়ীতে থাকবি কেমন করে, তোর বাবা ত সারাদিন থাকবেন হাইকোর্টে!" একটু থামিয়া বলিল, "এবার মল্লিক এসে আমার পিছনে সেই রকম করে লাগলে আমি একটা কাণ্ড করে বসবো তা কিন্তু আমি বলে রাখছি হাঁ।"

পিতা মাতাকে লুকাইয়া অথবা তাঁহাদের জানাইয়া বিদ্রোহ করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আত্মসুখের মোহে মুগ্ধ হইয়া পিতা মাতার মনে ব্যথা দেওয়া উচিত হইবে বলিয়া সতী মনে করে নাই,—কিশোরীও তাহার সে মতের সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু অবস্থা ক্রমে যেরূপ দাঁড়াইতেছে, কি করিতে যে বাধ্য হইতে হয় তাহা বলা যায় না।

সময় হইয়া আসিল—সতীকে উঠিতে হইল। "আচ্ছা—আমি ভেবে চিন্তে দেখে একটা উপায় ঠিক করি।"—বলিয়া কিশোরী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন যথাসময়ে যথাস্থানে আসিয়া কিশোরী বলিল, "তিন আইন অনুসারে আমরা বিয়ে করে' ফেলি এস। বিয়ের পর, তোমার মা বাপকে জানালেই হবে—তখন ত আর বিয়ে ফিরবে না।"

সতী একথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষে বলিল, "তা হলে ত, 'আমি হিন্দু নই'—বলে আমাদের সই করতে হবে!"

"তা হবে, কিন্তু উপায় কি?"

"এখানে হবে?"

"হ্যাঁ। সব খবর আমি নিয়েছি। বিবাহের তিন সপ্তাহ আগে, তিন-আইনের রেজিষ্ট্রারকে নোটিস দিতে হয়। তিন সপ্তাহ পরে বিবাহ হতে পারে।"

"নোটিস দিলে ত জানাজানি হয়ে যাবে। আমাদের বাড়ীর লোকের কাছে সে খবর কি পৌঁছবে না?"

"এখানে কে-ই বা আমাদের চেনে!—কেই বা এসে তোমাদের বাড়ীতে সে গল্প করতে যাবে বল।"

"কখন বিবাহ হতে পারে।"

"দুপুর বেলা। এই সময়। সেটা রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিতে হয়।"

"বিয়ে হতে কতক্ষণ লাগে?"

"পাঁচ মিনিট। বিয়ের পর, বাড়ী গিয়ে মাকে তুমি বলবে। তার পর, আমরা দুজনে কলকাতায় চলে যাব।"

পরদিন সতী আসিয়া বলিল, এই পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য করিতে সে প্রস্তুত। তৎপরদিন উভয়ে রেজিষ্ট্রারের

আফিসে গিয়া, যথারীতি নোটিসের ফরম সহি করিয়া দিয়া আসিল।

ইহার দশ দিন পরে মল্লিক সাহেব দার্জ্জিলিঙে আসিয়া পৌঁছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দিনী।

নোটিসের তিন সপ্তাহ পূর্ণ হইতে আর চারিটি দিন মাত্র বাকী আছে। যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়া কিশোরী আজ সত্যবালাকে দেখিতে পাইল না। সেই পথে অনেকক্ষণ ধরিয়া পাইচারি করিয়া বেড়াইল; যে বেঞ্চে বসিয়া তাহারা বিশ্রাম করে, সে বেঞ্চখানিও দেখিয়া আসিল, সত্যবালা নাই। এরূপ যে আর কখনও হয় নাই এমন নহে—কিন্তু পূর্ব্বদিন সতী বলিয়া গিয়াছে, "কাল আমি আসিতে পারিব না।" কিন্তু গতকল্য সতী ত সেরূপ কোনও আভাস দেয় নাই! কি হইল; অবশ্য কোনও অভাবনীয় কারণেই সতী আসিতে পারে নাই, কিন্তু কি সে কারণ? তাহার শরীর ভাল আছে ত?

যে রাস্তায় ঘোষভিলা, সে রাস্তা দিয়াও কিশোরী কয়েকবার যাতায়াত করিল। "বাড়ী বন্ধ"—সুতরাং গিয়া জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই। শেষবার দেখিল, মল্লিক সাহেব বারান্দায় দাঁড়াইয়া সিগারেট খাইতেছেন।

কিশোরী স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া গিয়া, বড়ই দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে কিশোরী আবার গিয়া সেই পথে ঘোরাঘোরি করিল, কিন্তু সতীকে দেখিতে পাইল না। সে তখন ভাবিল, যা থাকে কপালে, যাই ওদের বাড়ী। ঘোষ ভিলায় গিয়া বারান্দায় কাহাকেও না দেখিয়া ডাকিল—"বেয়ারা।" বেহারা বাহির হইয়া আসিল, কিশোরী তাহার হাতে নিজ কার্ড দিয়া বলিল—"মেম-সাহেবকা পাস।"

ক্ষণকাল পরে বেহারা কার্ডখানি ফেরৎ আনিয়া কিশোরীর হস্তে দিল। তাহার পৃষ্ঠে পেন্সিলে ইংরাজীতে লেখা আছে—"দূর হও। আর কখনও যদি এ বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ কর তবে তোমার লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।"

স্ত্রীহস্তাক্ষর নহে—পুরুষ মানুষেরই হস্তাক্ষর। ক্রোধকম্পিত স্বরে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কৌন লিখা?"

বেহারা বলিল, "মল্লিক সাহেব। আপ যাইয়ে বাবু, আউর মৎ আইয়ে।"

কিশোরী বলিল, "আচ্ছি বাত। বড়া মিস্ সাহেব কৈসী হ্যায়?"

"আচ্ছি হ্যায়।"

কিশোরী তখন দ্রুতপদে "ঘোষভিলা" পরিত্যাগ করিয়া গেল।

বিকালে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিশোরী সত্যবালাকে একখানি পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিল। তাহার এরূপ অভাবনীয় অদর্শনে নিজ দুশ্চিন্তার কথা, বিবাহের দিনস্থিরতা প্রভৃতি অনেক কথাই পত্রে লিখিল। পরদিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় সে যাপন করিল। তৎপরদিন ডাকে দুইখানি খামের পত্র আসিল। একখানির শিরোনামায় হস্তাক্ষর অপরিচিত—অপরখানি সত্যবালার লেখা। প্রথমে সে সতীর চিঠিখানিই খুলিল। তাহাতে লেখা আছে—

প্রিয়তম,

যে দিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, সেদিন বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, ভারি কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। মল্লিক এখানকার ডেপুটি কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাছারিতে গিয়াছিল, সেখানে নোটিস বোর্ডে আমাদের বিবাহের নোটিস্ টাঙ্গানো আছে দেখিয়া আসিয়া মাকে বলিয়াছে।

আমি আসিতেই মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম হঁ্যা, আমরা নোটিস দিয়াছি এবং বিবাহ করিব। তোমার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ কোথায় কি প্রকারে হইল জিজ্ঞাসা করায়, আমি সমস্তই বলি-

লাম। শুনিয়া মা আমায় যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। বলিলেন, এখন হইতে আমার বাড়ীর বাহিরে যাওয়া নিষেধ, যদিই বা যাই তবে মল্লিক আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ম সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। সেই অবধি মল্লিক সারাদিন আমাদের বাড়ীতেই আছে, রাত্রে কেবল নিজ বাড়ীতে শুইতে যায়।

আমি তোমায় আর দুই দিন পত্র লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বেহারা বলিয়াছিল আমার কোনও পত্র মাকে না দেখাইয়া ডাকে ফেলিবার তাহার হুকুম নাই।

আমি আজ এই পত্র লিখিয়া, বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া, বেড়াইতে বাহির হইব। মল্লিক নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে থাকিবে। কিন্তু কোনও ডাকবাক্স হাতের কাছে পাইলেই পত্রখানি আমি ক্ষিপ্রহস্তে পোষ্ট করিয়া দিব।

আজ তুমি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলে; তোমাকে মল্লিক কি রকম অপমান করিয়াছে তাহাও আমি শুনিয়াছি—মল্লিক নিজমুখেই মাকে তাহা বলিতেছিল। আমি আর এ বাড়ীতে থাকিব না। আমার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এত অপমান আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। আজ রাত্রি ১২টা সময় আমি এখান হইতে পলায়ন করিব। তুমি কোনও হোটেলে আমার জন্য একটি কামরা স্থির করিয়া রাখিও—এবং আমাকে সেখানে পৌছইয়া দিও। কল্য আমাদের বিবাহের দিন স্থিরীকৃত আছে—দ্বিপ্রহরে সেখানে গিয়া আমরা বিবাহিত হইব।

ক্যালকাটা রোড হইতে উঠিয়া, তুমি আমাদের বাড়ীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিও, কারণ সামনের ফটকে রাত্রে তালা বন্ধ থাকে। রাত্রি ঠিক ১২টা বাজিলে আমি আপন শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া তোমার হস্তধারণ করিব। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার সমস্ত বাকী জীবনের মালিক তুমিই হইবে।

তোমারই

সতী।

দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিয়া দেখিল, তাহার ভিতর, সতীকে পূর্ব্বে লিখিত তাহারই সেই পত্রখানি। খাম খোলা, তাহারা উহা পড়িয়াছে, পড়িয়া ফেরৎ পাঠাইয়াছে—সতীকে নিশ্চয়ই দেয় নাই, বা দেখায় নাই—কারণ সতীর পত্রে ইহার কোনও উল্লেখ নাই।

বিকালে বাহির হইয়া ম্যাডানের হোটেলে একটি কামরা ঠিক করিয়া, কিশোরী ক্যালকাটা রোডে গেল। এই রাস্তার এক পার্শ্বে খদ, অপর পার্শ্বে কোনও বাড়ী ঘর নাই। উচ্চ ভূমিতে যে সকল বাড়ীঘর আছে, সেগুলির সম্মুখভাগ অকল্যাণ্ড রোডে। ক্যালকাটা রোডে দাঁড়াইয়া, উৰ্দ্ধে ঘোষভিলা কিশোরী বেশ চিনিতে পারিল। কোনখান দিয়া ওঠা অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিরাপদ, তাহাও কিশোরী বেশ করিয়া দেখিয়া লইল।

বাসায় ফিরিয়া, ডিনার খাইয়া, ঘড়ির পানে চাহিয়া কিশোরী বসিয়া রহিল। সাড়ে ১১টা বাজিতেই, টমিকে বাঁধিয়া রাখিয়া, সে বাহির হইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

(ভিকর্ অব্ ওয়েকফিল্ডের একটি দৃশ্য)

সোফায়া ও মিঃ বর্শে´ল

(চিত্রকর—W. Mulready R. A.)

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৩০

১ম খণ্ড
৫ম সংখ্যা

পাহাড়পুর স্তূপ

গত ১লা মার্চ্চ তারিখে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি"র প্রযত্নে, কুমার শরৎকুমার রায়ের অর্থসাহায্যে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-বিভাগের আনুকূল্যে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের পরিচালনায় এই খনন কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এ বৎসরের মত খনন কার্য্য স্থগিত হইয়াছে।

দৈনিক ও মাসিক সংবাদ পত্রে এই খনন কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ পুরাতত্ত্ববিদের গণ্ডীর বাহিরে এই সংবাদ বিশেষ কোনও কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া অবগত নহি। ব্যাপারটির মধ্যে উত্তেজনা বা মাদকতা নাই, ইহার আশু ফলও খুব চমকদার নহে, তাই বাঙ্গালার জনসাধারণ ইহাকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সহিত উপেক্ষা করিয়াছেন। কেবল উপেক্ষা করিয়াছেন বলিলে বোধ হয় ঠিক বলা হইবে না। অনেকে ব্যঙ্গ ও উপহাসও করিয়াছেন। দেশের এই দুর্দ্দিনে মাটি কাটিয়া টাকা নষ্ট করার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি আছে! যে টাকাটা পাহাড়পুরের মাটিতে ঢালা হইয়াছে তাহা দিয়া কত চরকা কেনা যাইত, কতটা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত ও কতটি পুষ্করিণী খনিত হইতে পারিত, অথবা অন্য আরও কত দেশহিতকর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারিত তাহার উল্লেখ করিয়া অনেক বিজ্ঞ বৃদ্ধ, কুমার শরৎকুমারের বুদ্ধিভ্রংশতার বিষয় চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

সৌভাগ্যের বিষয় কুমার শরৎকুমারের মত বুদ্ধিভ্রষ্টের দৃষ্টান্ত আরও অনেকে আছে। যেমন জার্ম্মাণ দেশীয় শ্লীমান। হোমরের মহাকব্য ইলিয়ড অনেকেই পড়িয়া থাকেন, কিন্তু এই তরুণ যুবক তাহাতে একেবারে ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি মানসচক্ষে ট্রয়ের চিত্র দেখিতে দেখিতে বাস্তব জগতে ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু উথায় হৃদি লীয়ন্তে

দরিদ্রানাং মনোরথা। দরিদ্র শ্লীমানের পক্ষে এই ব্যয়-সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইল না, অন্নবস্ত্র সংস্থানের জন্য তাঁহাকে সংসারের আবর্ত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল। কিন্তু তথাপি তিনি যৌবনের সংকল্প বিস্মৃত হন নাই। ৪৬ বৎসর বয়সে তিনি পর্য্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। অমনই তিনি ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ খনন করিতে ছুটিলেন। বর্ত্তমান বুনারবাসি নামক গ্রামেই ভূতপূর্ব্ব ট্রয় নগরী অবস্থিত ছিল তখনকার কালে ইহাই লোকের বিশ্বাস ছিল। তাই শ্লীমান প্রথমে সেইখানেই খননকার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু বিশেষ কোন ফল পাওয়া গেল না। ভগ্নোৎসাহ না হইয়া শ্লীমান নানারূপ পরীক্ষার পর হিসারলিক নামক স্থানে খনন করিতে আরম্ভ করেন। অপরিমিত অর্থ-ব্যয়ে ও অতুল অধ্যবসায় সহকারে সস্ত্রীক শ্লীমান ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত (১৮৭১—১৯০০ খ্রীঃ অঃ) এইখানে খনন কার্য্য করেন। তাহার ফলে কবি বর্ণিত ট্রয় নগরী আজ আবার লোকচক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে। শ্লীমান গ্রীসদেশের অন্তর্গত সমসাময়িক 'মাইকেনী' ও টাইরিণস নগরও খনন করেন। এই সকল খনন ক্রিয়ার ফলে কেবল যে লুপ্ত নগরীর নিদর্শন বাহির হইয়াছে তাহা নহে, একটি বিলুপ্ত সভ্যতার কাহিনী এবং গ্রীসদেশের ইতিহাসের ও সভ্যতার একটি নূতন অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলে গ্রীসদেশের ইতিহাস এক নূতন আলোকে নবরূপ ধারণ করিয়াছে।

হেনরী অষ্টেন লেয়ার্ড (১৮১৭-১৮৯৪) আর এক জন এই শ্রেণীর খেয়ালী লোক। ২২ বৎসর বয়সে তিনি স্থলপথে সিংহল যাত্রা করেন। পথিমধ্যে টাইগ্রিস নদের তীরে নিনিভের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ইহা খনন করিতে তাঁহার কৌতূহল হয়। প্রথমে তিনি নিজ ব্যয়ে খনন কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ভূতপূর্ব্ব আসিরীয় সাম্রাজ্যের বিলুপ্তপ্রায় নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার করেন। তাঁহার খননকার্য্যের এবম্বিধ কৃতকার্য্যতায় তিনি সভ্য-জগতে প্রশংসা লাভ করেন এবং পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহার খননকার্য্যে অর্থ্য সাহায্য করেন। নিনিভের ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধীয় দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের D.C. L উপাধি ও এবারডীন বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। পরে ক্রমান্বয়ে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর, পররাষ্ট্র বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী এবং স্পেনে ও তুরস্কে ব্রিটিশ রাজদূতের পদ অলঙ্কৃত করেন।

এই প্রসঙ্গে পল এমিল বোটা'র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি মোসুলে ফরাসী কন্‌সাল ছিলেন এবং খোরসাবাদ নামক স্থানে খনন করিয়া প্রাচীন আসিরীয় সাম্রাজ্যের অনেক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন।

এইরূপ আরও অনেক পুরাতত্ত্ববিদের প্রযত্নে এবং খনন কার্য্যের ফলে প্রাচীন মিসর, বাবিলন ও আসিরীয় দেশের লুপ্ত ইতিহাস ও সভ্যতার কাহিনী আবিষ্কৃত হইয়া জগতের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

আমাদের দেশেও যে এই সকল খনন কার্য্যের ফলে পুরাতন সভ্যতার কত কীর্ত্তি ও নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সারনাথ, তক্ষশিলা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আবার লোক-চক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস যে কি পরিমাণ সম্পৎশালী হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এখন একথা অনুভব করিতেছেন যে প্রাচীন ভারতলক্ষ্মীর মুকুটমণি মৃত্তিকাতলেই লুক্কায়িত আছে—তাহাকে খুঁজিয়া আনিতে হইলে মাটি কাটা ভিন্ন উপায় নাই।

দুঃখের বিষয় বাঙ্গালাদেশে এখন পর্য্যন্তও এবিষয়ে কোন কাযই হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে এত দিন উদাসীন ছিলেন, কারণ বাঙ্গালা বিহার আসাম মধ্যপ্রদেশ একই পুরাতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্গত ছিল এবং যাহা কিছু টাকা পাওয়া যাইত তাহা কেবল বিহার ও মধ্যদেশেই ব্যয় হইত। বিহার ও মধ্যপ্রদেশ পুরাতন স্মৃতি ও ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ, সেখানে খনন ও অনুসন্ধান করিলে সহজেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়, এই জন্য এ পর্য্যন্ত পুরাতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি অনেকটা ঐ দুই প্রদেশেই নিবদ্ধ রহিয়াছে।

পর্ব্বতহীন নদীমাতৃক বাঙ্গালাদেশে স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন দুর্ল্লভ, কারণ পাথরের অল্পতা হেতু বেশীর ভাগ স্থপতি কার্য্য ইটের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে—তাহাও আবার কালক্রমে নদীগর্ভে বিলীন হয়। বাঙ্গালাদেশের নদীগুলি ক্রমশঃ সরিতে সরিতে সমস্ত দেশটা যেন একেবারে ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে কৃতসংকল্প। এ অবস্থায় যে দুই একটী পুরাতন নিদর্শন করাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহার মূল্য অনেক বেশী। যদি বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধার করিতে হয়, তবে ঐ সমুদয় নিদর্শনের আশ্রয় লইতে হইবে। বাঙ্গালার বিলুপ্ত কাহিনী ইহাদেরই মর্ম্মস্থলে লুক্কায়িত আছে, তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। বাঙ্গালী আজ হীন পতিত অধম জাতি—কিন্তু এককালে সে বড় ছিল, তাহার আকাঙ্ক্ষা মহৎ, কল্পনা উচ্চ ছিল। পৃথিবীর মধ্যে সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত। তাহার শিক্ষা দীক্ষা ভারতবর্ষের গৌরবস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ও তাহার অতুল বিক্রম সমস্ত ভারতবর্ষে ঘোষিত হইত। তাহার বাহুবলে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত শাসিত হইত। তাহার বীর সন্তানগণের উচ্চ জয়ধ্বনিতে গান্ধার হইতে কামরূপ ও উৎকল পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইত। দুর্ব্বার গুর্জ্জর জাতি সে পরাক্রম সহ্য করিতে পারে নাই। মদোন্মত্ত হুণ সেনা তাহার ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে। বিশ্রুতকীর্ত্তি কর্ণাটরাজ তাহার বাহুবলে হৃতগর্ব্ব হইয়া বিন্ধ্যের পরপারে কোনও মতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। আর, কেবল কি বাহুবলে? ললিতকলায়ও বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগনে আরোহণ করিয়াছিল। তাহার মুখ-নিঃসৃত ললিত পদাবলী দেবভাষায় যে অভিনব ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, সহস্র বর্ষপরে আজিও তাহার মাধুর্য্যগানে জগৎ মুখরিত। কঠিন পাষাণের বক্ষ ভেদ করিয়া তাহারা যে সৌন্দর্য্যের অমৃত নিস্যন্দিনী প্রবাহিত করিয়াছিল, তাহার কণামাত্রের আস্বাদ পাইয়া আজ শিল্পজগৎ বিস্ময়ে অভিভূত। এ সমুদয় কবির কল্পনা বা ভাবুকের উচ্ছ্বাস নহে—ইতিহাসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত চরম সত্য।

নিস্তব্ধ রজনীতে দূরাগত বংশীধ্বনি মিলিত সঙ্গীতের অস্পষ্ট সুর কাণে আসিলে রসজ্ঞের প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, আরও কাছে যাইয়া সঙ্গীতের স্বরূপ উপলব্ধি ও সুরলহরীর উপভোগ করিতে অদম্য আগ্রহ জন্মে। বাঙ্গালার লুপ্ত কাহিনীর একটুমাত্র সুর সুপ্ত বঙ্গবাসীর মনে তেমনই উন্মাদনা জাগাইয়াছে। আরও কাছে—আরও কাছে যাইয়া তাহার মর্ম্মের কাহিনী শুনিতে ইচ্ছা করে। আমরা যেটুকু জানিয়াছি তাহা তো কেবল ইঙ্গিত ও আভাস মাত্র। বঙ্গজননীর অঞ্চলের একটুখানি বাতাস মাত্র আমাদের গাত্র স্পর্শ করিয়াছে। তাহাতেই আমরা পুলকে শিহরিয়া উঠিয়া জননীর স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতে ব্যগ্র হইয়াছি। সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় এক অভিনব মোহে আমরা আচ্ছন্ন হইয়াছি। আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম স্থল হইতে অহরহ এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইতেছে—হে অতীত, তুমি কথা কও। শিশুকালে মাতৃহীন ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার জননীর মূর্ত্তি স্মৃতিপথে অঙ্কিত করিতে যেমন আকুল আবেগে চেষ্টা করে, আমরাও তেমনি জননী জন্মভূমির বিলুপ্ত গৌরবের মূর্ত্তস্বরূপ উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী।

আমাদের আকুল প্রার্থনা বুঝি বা জগৎপিতার কাণে পৌছিয়াছে। তাই অন্ধকার কাটিয়া যে নব-প্রভাতের সূচনা হইবে, পাহাড়পুরে তাহার প্রথম উষার আলোক রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। মাতৃমন্দিরে আত্মোৎসর্গ ব্যতীত মায়ের পূজা হইবে না। তাই সেদিন পাহাড়পুরে মায়ের অভিনব পূজার বিরাট আয়োজন দেখিয়া আসিলাম। কমলার বরপুত্র, ক্লেশানভিজ্ঞ, চিরসুখাভ্যস্ত, সত্যানুসন্ধিৎসু কুমার শরৎকুমার, পালিতকেশ জীর্ণদেহ জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ স্থবির অক্ষয়কুমার, এবং মহারাষ্ট্র কুলপ্রদীপ, সুধী উদ্যমশীল দেবদত্ত এই কৃচ্ছ্রসাধ্য পূজার পুরোহিত, এবং নবীন যুবকত্রয় জিতেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ও ননীগোপাল ইহার তন্ত্রধার। ইঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও বিপুল আত্ম-ত্যাগের ভিত্তির উপর মায়ের বোধন ঘট স্থাপিত হইয়াছে, মা এ পূজা অবশ্য গ্রহণ করিবেন।

সীমাহীন প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। মাঝখানে একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ কোনমতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর ইহাকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে বিস্তীর্ণ লতাগুল্ম কণ্টক বৃক্ষের সারি। এই তো পাহাড়পুর। কিন্তু যাহাদের চক্ষু সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছে, যাহাদের দিব্যদৃষ্টি বর্ত্তমানের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অতীতের আলোকের সন্ধান লাভ করিয়াছে—তাহারা এই জড় প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন। হিসারলিকের উষর ক্ষেত্রে যেমন শ্লীমান ট্রয়ের ভূতপূর্ব্ব গৌরবময় ছবির আভাস পাইয়াছিলেন, ইঁহারাও তেমনি এই মধ্যাহ্নসূর্য্য-তপ্ত বালুকাময় জনহীন প্রান্তরে বাঙ্গালার ভূত গৌরবের আভাস পাইয়াছেন।

বস্ত্রাচ্ছাদিত পটমণ্ডপের অভ্যন্তরে প্রকৃতির তাণ্ডব দূতগণের প্রকোপ হইতে কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া মাতৃমন্দিরের এই ঋত্বিক ও তন্ত্রধারগণ পূজার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে লতাগুল্মরাজি অপসারিত হইয়া প্রাচীর, মন্দির, স্তূপ আবির্ভূত হইল। কত কক্ষ, অঙ্গন, মূর্ত্তির পাদপীঠ জন্মান্তরের স্মৃতি বহন করিয়া পুনর্ব্বার নবজীবন লাভ করিল। যুগের পর যুগ কত পুণ্যকামী, এইস্থানে কত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, স্তরে স্তরে সজ্জিত ধ্বংসাবশেষ তাহারই পরিচয় প্রদান করিল। যেখানে কেবল শুষ্ক বালুকা রাশি বায়ুভরে উড়িয়া বেড়াইত, সেইখানে রমণীপদলাঞ্ছিত দীর্ঘ সোপানাবলী মোহাবেশ ত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিল। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সমুদয় মৃন্ময় ঘট পুরকামিনীগণের কক্ষে কক্ষে শোভা পাইত, ভগ্নহৃদয় তাহার কয়েকটিও সোপানাবলীর পাশে পাওয়া গেল।

বেশ বোঝা গেল যে আজ যাহা জঙ্গলাকীর্ণ কাঁটা গাছের সারি মাত্র, এককালে তাহা সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল এবং তাহার অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ বসতি ছিল। বসতি বলিতে যাহা বুঝায়—গৃহ অঙ্গন বর্ত্ম কূপোদক দেবমন্দির স্তূপ স্তম্ভ—সকলই ছিল। কিন্তু কেবল এইটুকুমাত্র বুঝিয়াই এবারে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে। যে বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন বর্ত্তমান, তাহার শতাংশের একাংশও এখনও পর্য্যন্ত খনন করা হয় নাই। কখনও হইবে কি কি না ভগবান জানেন। সম্মুখে অনেক বাধাবিঘ্ন। ইঞ্চকেপ কমিটির নির্ম্মম কুঠার বিশেষ করিয়া এই অতীতের নিদর্শন গুলিই ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল কুমার শরৎকুমারের অর্থের উপর নির্ভর করিয়া এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে না। আগামী বৎসর যদি সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এই পূজার আয়োজন হইবে না। বাঙ্গালী একটী কঠিন কর্ত্তব্য সম্মুখে উপস্থাপিত। যে জাতির অতীত নাই, তাহার ভবিষ্যতের আশা অল্প। বাঙ্গালী যদি কোনও দিন জাগিয়া উঠে, অতীতের ভিত্তির উপর তাহার নবীন জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেই অতীতকে জীবন্ত জাগ্রত করিতে হইলে পাহাড়পুর ও অন্যান্য স্থানের ধ্বংসাবশেষ খনন করা আবশ্যক।

দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুর গৌরবসূর্য্য অস্তোন্মুখ, তখনও বরেন্দ্রভূমির দুইটি স্তূপ সমগ্র বৌদ্ধ-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহার একটীর নাম মৃগস্থাপন স্তূপ, আর একটীর নাম তুলাক্ষেত্র স্তূপ। পাহাড়পুরে যে উচ্চ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দণ্ডায়মান, তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে এমন আর কোন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বরেন্দ্রে নাই। অসম্ভব নহে যে ইহাই উক্ত সুপ্রথিত স্তূপদ্বয়ের অন্যতম। বাঙ্গালায় যে কীর্ত্তি একদিন এশিয়াখণ্ডের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, যদি তাহারই নিদর্শন আমরা আবার বাহির করিতে পারি, তবে সে কি গৌরবের কথাই না হইবে! আমরা আবার বুকে সাহস করিতে পারিব, আবার বড় হইবার কল্পনা আমাদের অহরহ উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। যাহা কল্পনা ছিল তাহা সম্ভব হইবে, যাহা স্বপ্ন ছিল তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন সংঘটনে কি পরিমাণ সহায়তা করে তাহার সাক্ষী বর্ত্তমান গ্রীস ও ইতালী। বাঙ্গালীর এই জাতীয় অভ্যুত্থানের চেষ্টায় হয়ত পাহাড়পুরের প্রান্তরও অনেক সহায়তা করিতে পারে। বাঙ্গালী যেন হেলায় এ সুযোগ না হারায়।

শ্রী[illegible]।

পাঠানের প্রতিহিংসা

বিদ্রোহী সিপাহীদের অন্যতম নায়ক, ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেব ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের শেষভাগে এবং জুলাই মাসের মধ্যভাগে কাণপুরে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে ইংরাজদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া ভারতবর্ষের উপর যে কলঙ্ক কলিমা লেপন করিয়াছে, তাহা ক্ষালন করা দুঃসাধ্য। সেই লোমহর্ষণ কাহিনী স্মরণ-পথে উদিত হইলে আজও লজ্জায় ও ঘৃণায় আমাদের মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। অহিংসার জন্মস্থান, বুদ্ধদেবের লীলানিকেতন এই ভারতবর্ষ আজও বোধ হয় সেই গুরু পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই। কথিত আছে যে নানাসাহেব শ্বেতাঙ্গ শিশু এবং মহিলাদিগের প্রাণনাশের আদেশ দিতে প্রথমতঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে এক রাক্ষসী ক্রীতদাস-কন্যার প্ররোচনায় ঐ পৈশাচিক কার্য্যে সম্মত হয়। নানার শরীর রক্ষকগণ এবং অন্যান্য সিপাহীগণ তাহার ঐ নির্ম্মম আদেশ পালন করিতে অস্বীকৃত হইলে সেই সয়তানী নারী কতিপয় নরপশুর সাহায্যে তাহার শোণিত পিপাসা নিবৃত্তি করে। প্রবাদ সত্য হইলেও, যাহার আদেশে ঐ ঘৃণিত কার্য্য সাধিত হইয়াছে, নরহত্যার অপরাধ হইতে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ঐ হত্যা ব্যাপারে বিদ্রোহীদিগের অন্যান্য নায়কগণের সহানুভূতি ছিল একথা বলিলে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। কথিত আছে যে মহারাষ্ট্র সেনাপতি তান্তিয়া তোপী ঐ ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া নানার সহিত কলহ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে ইংরাজ সেনাপতি হেভলক্ কাণপুরের নিকট নানার বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া দুই দিবস পর সহরে প্রবেশ করেন। কিন্তু কাণপুর হেভলকের করতলগত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছিল। নানা সাহেবও সহর হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজ সৈন্যগণ সহরে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য দর্শন এবং যে কাহিনী শ্রবণ করিল, তাহাতে তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তাহাদের প্রতি শিরায় অগ্নি-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—হৃদয়ের ভিতর বৈরনির্য্যাতনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দাবাগ্নির মত প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

ইংরাজ কর্ত্তৃক কাণপুর অধিকৃত হওয়ার কয়েক দিবস পর, ২৫শে জুলাই তারিখে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল নেইল নগরে এই মর্ম্মে ঘোষণা করেন যে, যাহারা ইউরোপীয় মহিলা এবং শিশুদিগের হত্যাব্যাপারে লিপ্ত বা সংসৃষ্ট ছিল, বিচারালয়ে তাহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইলে, তাহাদের প্রত্যেককে মেথর-পুলিশ কর্ত্তৃক যে গৃহে উক্ত ঘৃণিত কার্য্য সাধিত হইয়াছিল সেই হত্যাগৃহে লইয়া যাওয়া হইবে। ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক আসামীকে নত হইয়া রক্তাক্ত গৃহতলের কিয়দংশ লেহন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য মেথর-পুলিশের বেত্রভয়ে কাহারও আপত্তি করিবার সাহস ছিল না। সেনাপতি নেইলের এই অদ্ভুত ও অমানুষিক আদেশ দুই মাসের অধিক কাল কাণপুরে প্রচলিত ছিল। অবশেষে, ৩রা নভেম্বর প্রধান-সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্পবেল কাণপুরে প্রবেশ করিয়া ঐ অসঙ্গত এবং মনুষ্য-ধর্ম্ম বিগর্হিত আদেশ রদ করিয়া দিয়াছিলেন।

যে সকল হিন্দু এবং মুসলমান সিপাহী হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্ব্বে সেনাপতি নেইলের সেই অদ্ভুত আদেশে মেথর-পুলিশ কর্ত্তৃক উক্তরূপে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দফাদার সফর আলী নামক একজন মুসলমান সৈনিক ছিল। সফর আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে সতীচৌরাঘাটে ইংরাজ সেনাপতি

হুইলারকে তরবারির আঘাতে নিহত করিয়াছিল। সেনাপতি হুইলর তখন কানপুর পরিত্যাগ-কল্পে পাল্কী হইতে অবতরণ করিতেছিলেন। সফর আলী এই অপরাধ অস্বীকার করিয়াছিল এবং নিজেকে রাজভক্ত প্রজা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট প্রয়াসও পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল এবং সেনাপতি নেইলের আইনানুসারে তাহাকে হত্যাগৃহে মেথর-পুলিশ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত-রূপে নির্য্যাতিত হইতে হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সফর আলী তাহার নির্য্যাতন-কাহিনী এবং তাহার নিম্নলিখিত শেষ বার্ত্তাটি রোহটাকে তাহার শিশু পুত্র মজর আলির নিকট জ্ঞাপন করিতে সমবেত প্রত্যেক মুসলমানকে অনুরোধ করিয়া গেল :—

"ঈশ্বর এবং হজরতের নিকট আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা যেন তোমাকে জীবিত রাখিয়া তোমার বাহুতে শক্তি প্রদান করেন। সেই শক্তির সাহায্যে তুমি যেন সেনাপতি নেইল কিংবা তাহার কোন বংশধরের উপর তোমার পিতার এই অন্যায় লাঞ্ছনার এবং মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে পার।"

এই ঘটনার অন্যূন ত্রিশ বৎসর পর, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মেজর এ এইচ্ এস নেইল নামক একজন ইংরাজ-সৈনিক মধ্যভারতের অগার (Augur) নামক স্থানে সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া হর্স্এর (Central India Horse) কমাণ্ডার পদে নিযুক্ত ছিলেন। মজর আলী নামক একজন পাঠান সওয়ার তাঁহার অধীনে কয়েক বৎসর যাবৎ কার্য্য করিতেছিল। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল এবং মজরের প্রতি মেজর নেইলের যথেষ্ট স্নেহ এবং অনুগ্রহ ছিল। এই মজর আলীই পূর্ব্বোক্ত সফর আলির পুত্র। মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে যখন মজর আলী পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে, অবস্থান করিতেছিল সেই সময় একদা এক ফকির মজরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে তাহার পিতার শেষ আদেশ স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং মেজর নেইলই যে তাহার পিতৃশত্রু জেনারেল নেইলের পুত্র একথাও বলিয়া দেয়।* ফকিরের উত্তেজনায় রুগ্ন মজরের হৃদয়ে লুপ্তপ্রায় পূর্ব্বস্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিল। পিতৃশত্রু নিপাত করিতে সে বদ্ধপরিকর হইল।

পরদিন প্রভাতে সৈন্যসমাবেশে যোগদান করিয়া মজর আলী গুলীর আঘাতে মেজর নেইলের প্রাণসংহার করিল। বড়লাট বাহাদুরের প্রতিনিধি স্যর লেপেল গ্রিফিনের বিচারে মজর আলী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। প্রতিহিংসা-পরায়ণ পাঠান এইরূপে স্বীয় প্রাণ বিনিময়ে একজন নির্দ্দোষ ইংরাজ সৈনিকের প্রাণ লইয়া পিতার সেই নির্ম্মম আদেশ পালন করিল।†

শ্রীবনওয়ারীলাল বসু।

---

* মেজর নেইল যথার্থই জেনারেল নেইলের পুত্র ছিলেন।

† Mr Forbes Mitchell কর্ত্তৃক লিখিত Reminiscences of the Great Mutiny নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত—লেখক।

ছলনাময়ী

পিছনে চাহিবে জানি পথ চলিতে ;
হাসিছ হেলায় তবু কারে ছলিতে ?
আঁখি দুটি ছলছল
কেমনে লুকাবে বল ?
কথা যে কাঁপিয়া গেল 'যাই' বলিতে !

লুকাও কাঁদন বৃথা কথার ছলে,
পলকে ফিরাও মুখ ঢাকি' আঁচলে !
চলিতে চপল পায়
বসন বাধিয়া যায় !
পথ যে হারালো হায় নয়ন জলে !

জানিগো একেলা বসি' দূর বিজনে
কার কথা বারবার পড়িবে মনে ;—
শিথিল অলকপাশ,
সজল নিচোল-বাস,
দিবানিশি হাহাশ্বাস বসি' গোপনে।

জানিগো কাটিবে রাতি, হে মোর প্রিয়া!
বিজন শয়নে শত স্মৃতি স্মরিয়া,—
কত মান অভিমান,
কত হাসি কত গান,
ব্যথায় বিধুর প্রাণ বেদনা দিয়া!

'বিদায়' কহিতে হাসি বাঁধিয়া বুকে
হাসি যে মিলায়ে এল মলিন মুখে!
কেমনে বুঝিব তবে
অমনি ভুলিয়া রবে,
বিরহ সহজ হবে স্বপন-সুখে?

আপনা লুকাতে, সখি, ধরা পড়িলে!
অপরে ছলিতে, নিজ মন ছলিলে!
হৃদয় রুধিয়া রাখি'
জানাতে যা ছিল বাকী,
নিমেষে বোঝালে ফাঁকি আঁখি-সলিলে!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

পাট বা জুট

অতি প্রাচীন কালে শুদ্ধ যে বৃক্ষবিশেষ হইতে উৎপন্ন তন্তুকে পট্ট বা পাট বলিত তাহা নহে, তসর ও গরদও পট্ট বা পাট নামে অভিহিত হইত। পট্টবস্ত্র বা পাটের কাপড় বলিলে, বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে পাট (jute) বলি তাহার তৈয়ারী কাপড় বুঝায় না। কোন একটী বিশেষ বৃক্ষের তন্তুকে পাট বলিত, অথবা কোন বিশেষ বিশেষ বৃক্ষতন্তুর সাধারণ নাম পট্ট বা পাট ছিল তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। যে পাট গাছের পাতাকে নালিতা (ঘি নালিতা) বলা হয়, ঠিক সেই গাছ হইতেই বর্ত্তমানে পাট উৎপন্ন করা হয় কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। নালিতা গাছ এক্ষণে অনেক স্থলে অযত্নসম্ভূত অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার পাতা তিক্ত, কিন্তু সকল প্রকার পাটের পাতা তিক্ত নহে। কুষ্টিয়াতে উৎপন্ন হইত বলিয়া, অনেকে অনুমান করেন, পাটের নাম কোষ্টা হইয়াছে। এক্ষণে কুষ্টিয়াতে যে পাট উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে কতকগুলির পাতা তিক্ত, আর কতকগুলির পাতা তিক্ত নহে। নালিতা গাছের ক্রমোন্নতিতে বর্ত্তমান পাট গাছের উৎপত্তি কিনা তাহা ...গণের বিবেচ্য।

প্রাচীন কৃষকগণের নিকট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন গাছ হইতে উৎপন্ন সূত্রবৎ পদার্থকে পাট বলা হইত—যথা শালের পাট, ধঞ্চার পাট ইত্যাদি। ধঞ্চার পাট সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্য না হইলেও, উহা অতি দৃঢ় ও দীর্ঘকালস্থায়ী, এই জন্য গৃহস্থের ব্যবহার্য্য স্থূল রজ্জু উহা হইতে উৎপন্ন করা হইত। শনের পাট হইতে উৎপন্ন রজ্জু সুতলী নামে পরিচিত। উহা দৃঢ় ও সুদৃশ্য। গৃহের চাল সৌখিনভাবে প্রস্তুত করিতে হইলে উহার প্রয়োজন হয়। আজ কাল পাটের রং তসরের ন্যায় সুদৃশ্য করিবার জন্য পাটগাছগুলিকে বেশী দিন পচাইয়া যেমন সুন্দর করিয়া ধৌত করা হয়, পূর্ব্বে সেরূপ করা হইত না। পাটগাছ বেশীদিন পচাইয়া ভাল করিয়া কাচিলে সূত্র দেখিতে সুন্দর হয় বটে, কিন্তু তাহাতে উহার টান-সহন শক্তির হ্রাস হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ের মত পূর্ব্বে এত অধিক পরিমাণে

পাটের চাষ না হইলেও বহুকাল হইতে এদেশে পাট উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গৃহনির্ম্মাণ, নৌকাদির সাজ সরঞ্জম প্রস্তুতকরণ এবং শস্যাদি রাখিবার থলিয়া চট প্রভৃতির বয়ন জন্ম প্রতি বৎসর প্রচুর পাটের প্রয়োজন হইত। পাট হইতে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা সুন্দর সুন্দর শিকা প্রস্তুত করা এবং বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত পাটে সুদৃশ্য মালা রচনা করিয়া বিবাহ আদি উৎসবে উপহার দেওয়া পুর্ব্বকালে এদেশীয় রমণীদিগের গৌরবের বিষয় ছিল। পূর্ব্বে পাট হইতে এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্রও প্রস্তুত হইত—উহার নাম গড়া। নালিতা পাতা ভিজাইয়া সেই জল খাইলে কোন কোন রোগের উপশম হয় এবং ভাত খাইতে বসিয়া প্রথম গ্রাস অন্ন ঘিয়ে ভাজা নালিতা পাতা দিয়া খাইলে আমাশয় রোগের পেট কামড়ানি দূর হয়, এইজন্ম অনেকে উহা যত্নের সহিত ব্যবহার করিতেন।

পাটের ইংরাজী নাম জুট (jute)। ইংরাজ বণিকেরা ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন সূত্রবৎ পদার্থকে কোন্ সময় হইতে এবং কি জন্ম জুট আখ্যা প্রদান করেন তাহা নিশ্চয় রূপে বলা সহজ নহে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতীয় পাট ও শণ হইতে জাহাজের দড়িদড়া ও পাল ইত্যাদি তৈয়ার করিতে মনোযোগী হন। তৎকালে তাঁহারা ভারতের নানাস্থানে ঐ সকলের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার সমুদ্র-উপকূলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া (East India) কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বে কয়েকটী প্রসিদ্ধ পাটের কারখানা ছিল। গগ্রামের নিকট বালিকোলে এবং হুগলীতে রেশমের কুঠী ব্যতীত যে পাটের কারখানাও ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় ঐ সকল কারখানায় যে পাট বা শণের কায হইত তাহা জুট নামে অভিহিত হইত না। স্যর্ টমাস রো, বার্ণিয়ে, ফেরার প্রভৃতি যে সকল বিদেশীয় ভ্রমণকারী তৎকালে এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভ্রমণ বিবরণীতে জুটের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অব ট্রেডের কার্য্য বিবরণীতে জুট কথার উল্লেখ আছে। উহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় মাননীয় ডিরেক্টার-দিগকে বহুবার জুট পাঠান হইয়াছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সেক্রেটরী যে লিপি প্রেরণ করেন, তাহাতে শণ ও পাটের উল্লেখ আছে, জুটের নাম কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সময় পর্য্যন্ত জুট কথার ভালরূপ প্রচলন হয় নাই। ইহার পরবর্ত্তী চিঠি পত্রে কেবল জুট কথারই ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে, পাট বা শণের উল্লেখ কোথাও নাই।

জুট কথার উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ অনুমান করেন উহা উড়িষ্যা দেশীয় জট কথার অপভ্রংশ। তাঁহাদিগের এইরূপ অনুমানের হেতুবাদে তাঁহারা বলেন, ইউরোপীয় বণিকেরা উড়িষ্যা দেশেই সর্ব্ব প্রথম পাটের সন্ধান পান। পাটের তন্তুগুলি জটার ন্যায় একত্র সংবদ্ধ থাকিত বলিয়াই বোধ হয় উহাকে তথায় জট বলা হইত। উচ্চারণের তারতম্যে জট হইতে জুট উৎপন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাটের নাম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, বিদেশী বণিকেরা প্রথমে যে নাম শুনিয়াছিলেন সেই নামই সর্ব্বত্র ব্যবহার করিতেন।

জট হইতে জুটের উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ অনুমান করা অপেক্ষা, ঝুটা বা ঝুট হইতে উহার উৎপত্তি অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না। পাট বা শণ উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও রঞ্জিত হইলে রেশমের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। দক্ষতার সহিত উহা রেশমের সহিত মিশ্রিত করিলে সাধারণ লোকে তাহা সহজে বুঝিতে পারে না। নকল বা কৃত্রিম মুক্তা যেমন ঝুটা মুক্তা এবং অপ্রকৃত সোণার জরি যেমন ঝুটা জরি নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ অপ্রকৃত রেশম অর্থাৎ পাট, ঝুটা রেশম নামে অভিহিত হইত ইহা অনুমান করা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। কালক্রমে ঝুটা রেশম হইতে রেশম কথাটীর অন্তর্ধান হইয়াছে। পরে ঐ ঝুটা বা ঝুট হইতে জুটের উদ্ভব হওয়া নিতান্ত বিচিত্র নহে। বণিকেরা যদি প্রথমে শণ বা পাট ব্যবহার না করিয়া একেবারেই জুট বা জট কথা ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে প্রথমোক্ত অনুমান অসন্দিগ্ধ ভাবে গ্রহণ করা

যাইতে পারিত, এবং শেষোক্ত অনুমান আবশ্যক হইত না।

পাট সর্ব্ব প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত কোম্পানির বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় ১৭৯০ খৃঃ অব্দে অন্যূন ১০০ টন (কিঞ্চিদধিক ২৭০০ মণ) পাট ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স ঐ পাট দেখিয়া সন্তুষ্ট হন এবং অনুমান করেন, বৎসরে ন্যূনাধিক এক হাজার টন অর্থাৎ ২৭।৮ হাজার মণ পাট ৪০ হইতে ৬০ পাউণ্ড (৬০০৲ হইতে ৯০০৲) টন দরে বিক্রীত হইতে পারে। ইহার পর পরীক্ষা করিবার জন্ম কয়েক জাহাজ পাট রপ্তানী করা হয়। খৃঃ ১৮২৮—২৯ অব্দের পূর্ব্বের সরকারী বিবরণীতে পাট রপ্তানীর কথা উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে, ঐ সময়ে যে পাট রপ্তানী হইয়াছিল তাহার পরিমাণ এত সামান্য যে তাহা গণনার যোগ্য নহে। ১৮২৮--২৯ অব্দে ৪৯৬ মণ ৩০ সের পাট (তাৎকালিক মূল্য ৬২০৸৴৯ পাই) রপ্তানী করা হইয়াছিল। ইহার পর বৎসর ইংলণ্ডে ১২৭মণ ২০ সের পাট প্রেরিত হয়। এই সময় হইতেই পাটের বাণিজ্য নিয়মমত চলিতে থাকে। ১৮৩৪—৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটনে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১৩২৮ মণ ৩৪ সের (তাৎকালিক মূল্য ৫৩৯১৫।৴০) এবং নোভস্কোসিয়া ও উত্তর আমেরিকায় ২২মণ পাট রপ্তানী করা হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জুট কমিশনারের রিপোর্টে জ্ঞাত হওয়া যায় ঐ অব্দে বঙ্গ ও আসামের ৯,২৫,৮৯৯ একর অর্থাৎ প্রায় ২৮,০০,০০০ বিঘা ভূমিতে ১,৩৫,৬৮,৪৮৬ মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলাতেই প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। আসামেও পাটের চাষ হইতেছে, তবে বাঙ্গালার তুলনায় আসামের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ সামান্য। সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে যে পাট উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৯৮ ভাগ এক বাঙ্গালা দেশেই জন্মে। বর্ত্তমানে ন্যূনাধিক এক কোটি বিঘা জমিতে ৪ কোটি মণ পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে পাটের চাষের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা উল্লিখিত সংখ্যা হইতে পাঠক মহাশয়গণ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

যতদূর সন্ধান পাওয়া যায় তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এখনকার মত এত প্রচুর পরিমাণে পাটের চাষ না হইলেও তৎকালের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য ছিল না। দেশের সকল অভাব পূর্ণ করিয়াও প্রচুর পাট প্রতিবৎসর বিদেশীয় বণিকদিগের ব্যবহারার্থ ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রদত্ত হইত। বিদেশীয় চটকলের প্রচলনের পূর্ব্বে বস্তা বা বোরা এবং চট প্রস্তুত করা বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের একটী বিশেষ কার্য্য ছিল। বণিকেরা যে চট বা বোরায় আবদ্ধ করিয়া পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতেন তাহা এদেশীয়েরাই প্রস্তুত করিয়া লাভবান হইত। এদেশে জুটমিল স্থাপিত হইবার পর হইতে ঐ কার্য্য এদেশীয়দিগের হস্ত হইতে ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইয়াছে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের রিষড়াতে প্রথম পাটের কল স্থাপিত হয়। প্রথম প্রথম এই কলে দৈনিক ৮ টনের অধিক পাটের কার্য্য হইত না। ঐ কলে গণিক্লথ (থলিয়া) প্রভৃতি যাহা উৎপন্ন হইত তাহা ছাড়া এদেশীয়দিগের উৎপন্ন পাটের দ্রব্যাদিও বিদেশে রপ্তানী হইত। কিন্তু ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ কলে দৈনিক ৩০০টন চট ও থলিয়া প্রস্তুত হইতেছে। রিষড়ার কলের উন্নতি দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিদেশীয় কোম্পানি সিরাজগঞ্জ, গৌরীপুর, বজবজ, কামারহাটি প্রভৃতি বাঙ্গালার নানা স্থানে পাটের কল স্থাপন করেন। বর্ষে বর্ষে চট ও থলিয়া প্রস্তুতের যে রূপ আধিক্য হইতেছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৮৮৩-৮৪অব্দে যে পরিমাণ টাকার চট ও থলিয়া কলে উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯১৩-১৪ অব্দে তাহার ২২গুণেরও অধিক টাকার পাটের দ্রব্যাদি ঐ সকল কল হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। সরকারী বিবরণ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় ১৯১৪-১৫ অব্দে ২৫,৮২,০০০০০ টাকার চট ও থলিয়া কলসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাট

নির্ম্মিত দ্রব্যের শ্রীবৃদ্ধির সহিত দেশীয় শিল্পের কোন সম্পর্কই নাই। অধিকন্তু পাটের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে এ দেশীয়দিগের যে কিছু দক্ষতা ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। এক্ষণে অনেক কৃষক নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় দড়িদড়া চট থলিয়া ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য কিছুমাত্র না রাখিয়া, নিজ নিজ ক্ষেত্রোৎপন্ন সমস্ত পাট বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করে, আর কলের তৈয়ারী দড়ীদড়া চট থলিয়া ক্রয় করিয়া স্ব স্ব প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকে। কৃষকদিগের স্বহস্তনির্ম্মিত থলিয়া যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন বর্ত্তমান কলের তৈয়ারী থলিয়া হইতে উহা কত দৃঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। কৃষকের স্বহস্ত রচিত থলিয়া পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করিতে দেখা যায়, কিন্তু কলের থলিয়া এক পুরুষও ব্যবহার করিতে হয় না। কৃষক নিজ ক্ষেত্রোৎপন্ন পাটে অবসর সময়ে স্বহস্তে থলিয়া প্রস্তুত করিলে উহার কোন মূল্য আছে বলিয়া বুঝিতে পারে না, কিন্তু কলের তৈয়ারী একটী থলিয়া আট আনার কমে পাওয়া যায় না। সরকারী রিপোর্ট হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশীয় কল হইতে ৯১,৯০, ৪২,৭৭১ থলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু ইহার মধ্যে ৪,১৫,২৩,৬০৭ থলিয়া বিদেশে প্রেরিত হয়। সুতরাং প্রায় ৮ কোটি থলিয়া এদেশের ব্যবহারে লাগিয়াছিল। এইগুলি যদি এদেশীয় লোকেরা প্রস্তুত করিত, তাহা হইলে তাহাদিগের আর্থিক কত উন্নতি হইত। কিন্তু সে উন্নতির কথা দূরে থাকুক, প্রলোভনে পড়িয়া সমস্ত পাট বিক্রয় করিয়া, শেষে অনেক কৃষকের শস্যাদি রক্ষণের জন্য থলিয়া ক্রয় করিতে অনেক সময় মুখের অন্ন হ্রাস করিতে হয়।

কোন কোনও বণিক কলে চট থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করেন, কোন কোনও কোম্পানি কলে পাট পরিষ্কৃত, ছাঁটাই এবং জাহাজ করিয়া বিদেশে পাঠাইবার উপযোগী গাঁইট বন্দী করেন, কোন কোনও কোম্পানী পাট ও পাটের দ্রব্যাদি জাহাজ করিয়া বিদেশে বহন করিয়া থাকেন, আবার কোন কোনও কোম্পানি অন্য কোম্পানির জন্য ঐ সকল খরিদ করিয়া দালালী প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ এক্ষণে পাট বিদেশীয় বণিকদিগের একটী প্রধান পণ্যদ্রব্য। কত সামান্য অবস্থা হইতে বর্ত্তমানে এই ব্যবসার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা পাঠক মহাশয়গণকে দেখান হইয়াছে। কত বণিক পাটের ব্যবসায়ে বর্ষে বর্ষে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়া পার্থিব সুখ সৌভাগ্যের চরমসীমা প্রাপ্ত হইতেছেন। আর জৈষ্ঠ্যের রৌদ্রে, শ্রাবণের ধারায়, পৌষের শীতে উদাসীন বাঙ্গালার কৃষকগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে সপরিবারে প্রাণপণ চেষ্টায় পাট উৎপন্ন করতঃ, তাঁহাদিগের ধনবৃদ্ধির একমাত্র উপলক্ষ্য হইয়াও অভাব অনটনের দারুণ কষাঘাতে মুমূর্ষু প্রায় হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে যখন পাটের তত প্রাদুর্ভাব ছিল না, তখন তাহারা যে ভোগসুখ প্রাপ্ত হইত, এখন তাঁহার শতাংশের এক অংশও পায় কিনা সন্দেহ। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি ফল শস্য প্রদানে কখনও কার্পণ্য করেন না। কিন্তু মোহমুগ্ধ বঙ্গবাসী ধান্যশস্যের পরিবর্ত্তে পাট চাষ করিয়া উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িতেছে। পাট চাষ করিয়া বাঙ্গালী বিদেশীয় বণিকের হস্তে কুবেরের ভাণ্ডার তুলিয়া দিতেছে, আর নিজেরা অন্নহীন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে!

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

জৈনদের ঐতিহাসিক যুগের তীর্থঙ্কর

ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামীকে ঐতিহাসিক যুগের লোক বলা যাইতে পারে। তিনি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে খৃ, পূ ৮১৭ তে জীবিত ছিলেন। জৈন গ্রন্থমতে তিনি ৮৭৮ খৃ, পূ, জন্মগ্রহণ করিয়া একশত বৎসর বয়সে (৭৭৮ খৃ, পূঃ) মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন।— তিনি ইক্ষাকু কুলোদ্ভব কাশীর রাজা অশ্বসেন ও রাণী বামার পুত্র। সকল তীর্থঙ্করের মাতারা গর্ভবাস কালে যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ইহার অতিরিক্ত, তাঁহার গর্ভবাস কালে প্রসূতি একদিন দেখিলেন একটি কৃষ্ণসর্প তাঁহার পাশে শুইয়া আছে। তাঁহার জীবনে প্রায়ই সাপের ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বাল্যাবস্থায় একদিন দেখিলেন এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ধুনির জন্য অগ্নি ধরাইতেছিল, একটি ভীত সর্পশিশু সেই কাঠে আশ্রয় লইয়াছিল; পার্শ্বনাথ তাহাকে রক্ষা করিলেন।

প্রবাদ আছে যে তাঁহার "কেবল" জ্ঞানলাভ করিবার জন্য তপস্যা কালে এই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী গায়ে জল ছিটাইয়া ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং এই সর্প তাঁহাকে ফণা দিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে সর্পই তাঁহার চিহ্ন হইয়াছে।

তিনি একবার কলিঙ্গের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি অযোধ্যার রাজা প্রসেনজিতের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৩০ বৎসর বয়সে তাঁহার বৈরাগ্য উদয় হয় ও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র ৮৩ দিন কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া 'কেবলী' হইয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ স্বামী সাধুদের জন্য চারিটি নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী তীর্থঙ্কর আর একটি নিয়ম বাড়াইয়া পঞ্চ নিয়ম করিয়াছেন। কোন্ নিয়মটি পরে বাড়ান হয় সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের নিগন্থ বা নির্গ্রন্থ বলে। তিনি নিগন্থদের আপন আপন গুরুর কাছে পাপ স্বীকার (confession) করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই পাপ স্বীকার করিতে বাধ্য ছিল না, যাহার ইচ্ছা হইত সে স্বীকার করিত। অবশ্য জৈনেরা বলেন নিগন্থ সম্প্রদায় জৈন সম্প্রদায়েরই নাম বিশেষ ও ঋষভদেবের সময়ে স্থাপিত; কিন্তু ইউরোপীয় লেখকেরা ইহাতে সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন সম্ভবত পার্শ্বনাথ স্বামীই জৈন মত স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনিই নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। নিগন্থ বা নির্গন্থ বা নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ গ্রন্থিহীন - যাহার সংসারে কোন প্রকার আসক্তি নাই। কিন্তু পার্শ্বনাথ স্বামীর পূর্ব্বে যে নির্গ্রন্থ সম্প্রদায় ছিল না তাহার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। ইহা সম্ভব বোধ হয় যে, যখন ব্রাহ্মণেরা সন্ন্যাসাশ্রম স্থাপিত করিলেন ও আশ্রমে অব্রাহ্মণদের স্বীকার করিলেন না, তখন ক্ষত্রিয়েরাও ঐ প্রকার আশ্রম স্থাপন করিয়া তাহার নাম নির্গ্রন্থ রাখিলেন। পার্শ্বনাথ স্বামীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে এ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। এখন যেমন যে দেশে শৈব সন্ন্যাসী সংখ্যাই বেশী, বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কদাচিৎ দেখা যায়, সেখানে কেবল মাত্র সন্ন্যাসী বলিলে লোকে শৈব সন্ন্যাসীই বুঝিয়া থাকে, সেই প্রকার পার্শ্বনাথ স্বামীর জীবিত ও পরবর্ত্তী কালে কেবল নির্গ্রন্থ বলিলে লোকে পার্শ্বনাথ স্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীই বুঝিত। পার্শ্বনাথ স্বামীর সময়েও এই নির্গ্রন্থেরা ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের মত কৌপিন, বহির্ব্বাস, কাঁথা, কম্বল, জলপাত্র, দণ্ড ইত্যাদি রাখিত। তাহাদের নিয়মগুলিও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের নিয়মের মত ছিল।

পার্শ্বনাথ স্বামী যতি [সাধু] ও শ্রাবক [গৃহস্থ জৈন] দের জন্য নানা নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যতি ও শ্রাবক উভয়ে, শরীর অপটু হইলে, অন্নজল ত্যাগ করিয়া দেহাবসান করিতে পারেন—সোজা কথায়, আত্মহত্যা করিতে পারেন। যতি দ্বাদশ বৎসর কায়োৎসর্গ [কৃচ্ছ্র

সাধন] করিবার পর গুরুর অনুমতি লইয়া দেহত্যাগ করিতে পারে। যতির জন্য তিন প্রকার দেহত্যাগ বিধি আছে—

১। ভক্ত প্রত্যাখ্যান মরণ—ইহাতে যতি প্রথমে গ্রামে বা বনে স্থান পরিষ্কার করিবে—সেস্থানে কোনও প্রকার জীব বা ডিম না থাকে। পরে খড় ভিক্ষা করিয়া আনিয়া পাতিবে। অবশ্য খড়ও বাছিয়া লইতে হইবে, তাহাতে কোনও প্রকার জীব বা ডিম না থাকে। তাহার পর ভোজন পান ত্যাগ করিয়া শুইয়া থাকিবে। সংসার চিন্তা করিবে না। কিছুই কামনা করিবে না, এমন কি মৃত্যু কামনাও করিবে না। কেবল মাত্র কর্ম্মক্ষয় কামনা করিবে। পোকা মাকড় কামড়াইলে বা রক্ত মাংস খাইলে তাহাদের তাড়াইবে না, দংশিত স্থান রগড়াইবে না। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবে না। যন্ত্রণা, সুখের মত ভোগ করিবে।

২। ইঙ্গিত মরণ—ভক্ত প্রত্যাখ্যান মরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিয়মগুলি আরও কঠোর ভাবে পালন করা হয়।

৩। প্রায়োপগমন মরণ—ইঙ্গিত মরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাতে শরীরের কোনও অংশ একটুও নড়িতে দিবে না।

সংসারী শ্রাবকের জন্যও ইচ্ছামৃত্যুর বিধান আছে। যখন শ্রাবক দেখিবে তাহার শরীর অপটু হইয়া পড়িয়াছে, তখন সংসার বন্ধন কাটাইয়া কর্ম্মক্ষয় করিবার চেষ্টা করিবে। গৃহে অল্প সময়ই থাকিবে, অধিক সময় মন্দিরে কাটাইবে। জৈনদের মন্দির দুই প্রকার হয়। একপ্রকার মন্দিরে যে কোনও এক বা একাধিক তীর্থঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। মূর্ত্তির চারিদিকে তীর্থঙ্করের গর্ভবাস কালে প্রসূতি যে ১৪টি বস্তু স্বপ্নে দেখিয়া থাকেন, তাহাদের চিত্র অথবা প্রতিমূর্ত্তি সাজাইয়া রাখা হয়। অন্য প্রকার মন্দিরে কোনও সাধুর চরণ-চিহ্ন একটি অল্প উচ্চ বেদীতে চিত্রিত বা খোদিত করা হয়। ধনবান জৈনেরা আপন আপন বাটীর এক অংশে মন্দির স্থাপন করেন। এরূপ গৃহমন্দিরকে প্রায় "দেরাসর" বলে। দেরাসরে গৃহস্বামীর অনুমতি না লইয়া সাধারণ জৈনেরও প্রবেশাধিকার নাই। সাধারণ লোকে পল্লীর মন্দিরের দালানে বসিয়া বিগত জীবনের পাপ ও আত্মচিন্তা করিয়া থাকে। শরীর অপটু হইবার পর দেহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলে আপনার গৃহে, দেরাসরে বা মন্দিরে কুশ পাতিয়া তাহাতে "সন্থারো" পাঠ করিতে করিতে, অন্ন জল ত্যাগ করিয়া শুইয়া থাকে। এই সন্থারো পাঠে তাহাকে বলিতে হয়, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমি কোনও প্রকার খাদ্য বা পেয় বা ফলাদি, এমন কি সুপারিও খাইব না। আমি এই শরীরের এক কালে বহু যত্ন ও সেবা করিয়াছি, এখন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আর কোনও যত্ন করিব না। এক কালে এই শরীর রত্ন-কৌটার মত ছিল, আমি শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিষধর সর্প, চোর, পোকা-মাকড় ও সর্দ্দী, কাশী, জ্বর ইত্যাদি রোগ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি, এখন আর করিব না। শ্রাবক দিবারাত্র আত্মচিন্তা করিতে থাকেন। শরীরের বল অনুযায়ী ৩।৪ দিন হইতে ৩০।৪০ দিন পর্য্যন্ত শরীরে প্রাণ থাকে। শ্রাবক যখন এরূপে দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন আত্মীয়েরা নানাপ্রকার বুঝাইয়া ইচ্ছা ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু একবার সঙ্কল্প করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলে আর কেহ ত্যাগ করিতে বলে না। একবার সঙ্কল্প করিয়া শয্যাগ্রহণ করিবার পর আবার ত্যাগ করিলে শ্রাবককে পতিত হইতে হয়। এরূপ মৃত্যুকে জৈনেরা "সমাধি লাভ" বলেন। এখনও কাঠিয়াওয়াড়ে কদাচিৎ ২।১টি সমাধি হইয়া থাকে। দেশ দেশান্তরের জৈনেরা সংবাদ পাইয়া সমাধি দর্শন করিয়া ধন্য হইতে আসে।

পার্শ্বনাথ স্বামী আর যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন, বর্দ্ধমান স্বামীর সময়ে তাহাদের অল্পাধিক পরিবর্ত্তন বা সংস্কার করা হইয়াছিল। তাহাদের বর্ণনা সংস্কৃত রূপের বর্ণনার সময়ে করা হইবে।

পার্শ্বনাথ স্বামী আপন সম্প্রদায়ের সাধুদের আটটি গণে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এক এক গণের সাধুরা

এক এক গণধরের শাসনে কৃচ্ছ্রসাধন করিত। তিনি প্রায় ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়া পূর্ণ একশত বৎসর বয়সে বঙ্গদেশের সমেত শিখরে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মোক্ষলাভের পর সমেত শিখরের নাম পার্শ্বনাথ পর্ব্বত (Pareshnath hill) হইয়াছে। জৈনদের ২৪ জন তীর্থঙ্কর মধ্যে ২০ জন এই পর্ব্বতেই মোক্ষলাভ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ নীল ও চিহ্ন ফণাধারী সর্প।

২৪ চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান বা মহাবীর স্বামী কুণ্ডগ্রামের [বৈশালী] ইক্ষ্বাকু কুলোদ্ভব জ্ঞাতি, ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থ ও ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার পুত্র। ইনি খৃঃ পূঃ ৫৯৯ জন্মগ্রহণ করিয়া ৩০ বৎসর সংসারী ছিলেন। পরে দ্বাদশ বৎসর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া "কেবল" জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি তীর্থঙ্কর হইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি খৃঃ পূঃ ৫২৭ কার্ত্তিক অমাবস্যার রাত্রে কাশীর নিকট পাপাপুরী [পাবাপুরী] তে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ পীত স্বর্ণাভ ও চিহ্ন সিংহ।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

অগ্নিশুদ্ধি

(গল্প)

চির-পরিচিত দ্বার-সমীপে উপস্থিত হইয়া মোক্ষদার পা আর উঠিতেছিল না। পূর্ব্বে সে যে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া দশজনের সম্মুখে গর্ব্বভরে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইত, আজ সেই স্থানে চোরের ন্যায়, অপরাধীর ন্যায় অবনত মস্তকে প্রবেশ করিতে তাহার অন্তরটা হাহাকার করিয়া উঠিল। লজ্জায়, সঙ্কোচে, ভয়ে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল; মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ও মা, মাগো!"

স্বামীর কথা তাহার মনে পড়িল; যাঁহার অযাচিত-স্নেহ, অপ্রমেয় ভালবাসার পরিবর্ত্তে উগ্রবিষ ঢালিয়া দিয়া সে পাপের পঙ্কিল-সাগরে ডুবিতে বসিয়াছিল! লালসার তীব্র-বহ্নিতে পতঙ্গের মত মরিতে ছুটিয়াছিল! তারপর, তারপর মনে পড়িল,—কেমন করিয়া কোন্ দয়াময় দেবতার তাড়িত-দণ্ড-স্পর্শে সুপ্ত বিবেক চকিতে উদ্বোধিত হইয়া অক্ষুণ্ণ নারীধর্ম্মের সহিত তাহাকে আবার তাহার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিল! সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া দিল,—এই গৃহেই তাহার সকল ব্রতের সার্থকতা, সর্ব্ব তীর্থের পূতরেণু, জীবনে আশ্রয়, মরণে স্বর্গ! সে হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

২

ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র ইজিচেয়ারে শয়ন করিয়া কি একখানা পুস্তকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পুষ্পাধার হইতে সদ্য-চয়িত পুষ্পের মৃদু সৌরভে গৃহখানি আমোদিত হইয়াছিল। ভিত্তি-গাত্র-বিলম্বিত মুকুরের উপর সূর্য্যের শেষ-রশ্মি পতিত হইয়া ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল। সহসা তাহাতে কাহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইল। অন্যমনস্কে সেই দিকে দৃষ্টি পড়ায় শ্রীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। মোক্ষদা ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—"আমি এসেছি!"

শ্রীশচন্দ্র অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া উদাস স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

মোক্ষদার মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল; চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। পরক্ষণে অসীম-ধৈর্য্যবলে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দৃঢ়কণ্ঠে

কহিল—"এসেছি, এই লাঞ্ছিত জীবনটা তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে! আর, আমার গুরুতর অপরাধের জন্ম ক্ষমা-ভিক্ষা—"

বাধা দিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন—"তার কোনও আবশ্যক আছে বলে ত আমার মনে হয় না। তোমার ইচ্ছে হয়েছে করেছ, তার জন্তে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে কেন? আর, আজ আমার ক্ষমা করবারই বা অধিকার কি?"

কাতরকণ্ঠে মোক্ষদা বলিয়া উঠিল—"তোমার অধিকার নেই, তবে কার আছে? তোমার আমার সম্বন্ধের ভিতরেই ভগবান যে সে অধিকার নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন!"

"হ্যাঁ, তা একদিন ছিল বটে; কিন্তু তুমি আমার সে অধিকার অশ্রদ্ধায় পায়ে ঠেলে চলে গেছ। মন কাচের মত, একবার ভাঙলে তা আর জোড়া লাগে না।"

মোক্ষদা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"মুহূর্ত্তের ভুলের জন্তে আমার সারা জীবনটা ব্যর্থ করে দিও না! ওগো, দয়া কর! একটু স্থান দাও!"

দৃঢ়কণ্ঠে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন—"আমি সংসারী, সমাজ-শাসন আমায় মেনে চলতে হয়; কাজেই তোমাকে আশ্রয় দিতে পারব না।"

মোক্ষদার মর্ম্মকোষে কে যেন সজোরে কশাঘাত করিল। তাহার কণ্ঠের ভিতর ঝলকে ঝলকে রক্ত প্রবাহ ছুটিয়া আসিতে লাগিল। শরাহত পক্ষিণীর ন্যায় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল! মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল ধরণী তাহার চক্ষে যেন লুপ্ত হইয়া আসিল।

বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যার মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, শ্রীশচন্দ্র কহিলেন—"সন্ধ্যে হলো, তোমার যেখানে যাবার যাও। যদি কখনও কষ্টে পড়, জেনো, আমার সাধ্যমত সাহায্য করতে চেষ্টা করব।"

মোক্ষদা স্বামীর দিকে একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিল; তারপর উঠিয়া, যন্ত্র-চালিতের মত নীরবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

৩

ঘোষালদের ঠাকুর বাড়ীতে তখন আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। গললগ্নীকৃতবাসা পল্লীরমণীগণ সতৃষ্ণ-নয়নে গোপালজীর মনোহর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন। মোক্ষদার মনে হইল, একদিন সেও এইরূপ তদ্গতপ্রাণা হইয়া এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিত। দেবতার চরণে স্বামীর মঙ্গল কামনায় হৃদয়ের সমগ্র একাগ্রতা ঢালিয়া দিত। তারপর তাঁহাদেরই মত আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া প্রশান্ত-হৃদয়ে গৃহে ফিরিত। আর আজ?

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। অবশ চরণ কোনও রকমে টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। পথে গ্রাম্য বধূরা বর্ষীয়সীদিগের সহিত প্রদীপ হস্তে গল্প করিতে করিতে নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সেও কতদিন তাহাদের সাথী হইয়াছে! যে গৃহে আজ তাহার স্থান হইল না, কিছুদিন পূর্ব্বে সেই গৃহেরই কল্যাণ-কামনায় তাহাদেরই ন্যায় নদীতে প্রদীপ ভাসাইতে গিয়াছে! কিন্তু আজ এই রমণীদিগের সহিত মেশা ত দূরের কথা, তাহাদের নিকটে যাইবার সাধ্যও তাহার নাই!

হায়, ভগবান! এমনই করিয়া কতদিন সে উদ্দেশ্য-হীন, আশাহীন জীবন লইয়া ধরণীর বক্ষে বিচরণ করিবে? কতদিনে তাহার এ চলার শেষ হইবে? তারপর সেই দিন, জীবনের সেই চরম-দিনে স্বামীর পদতলে মাথাটা লুটাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে সতী-লোকে মহাপ্রস্থান করিবে বলিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রলোভনটা বড় যত্নে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, আজ তাহা এই পথের ধূলির মত ধূলিতেই মিশাইয়া গিয়াছে! আজ সংসার তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে! সাহস করিয়া সে স্বামীর পদধূলিটুকু গ্রহণ করিতে পারে নাই।

কতকগুলি মদ্যপায়ী শ্মশান হইতে গণ্ডগোল করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছিল। সে ভয়ে শিহরিয়া একটা গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তাহারা চেঁচামেচি করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিয়া গেল।

মোক্ষদা তাহার অনিশ্চিত জীবনের অনির্দ্দিষ্ট পথে পুনরায় অগ্রসর হইল।

* * *

শ্মশানে শবদাহ হইতেছিল। স্থানটী নীরবতায় ভরিয়া গিয়াছিল। মোক্ষদা ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। চিতার আগুনে নদীতীর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দীপ্তি যেন মোক্ষদার অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল; সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে ভবিষৎ-জীবনের চিত্রটা জলজল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সে শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল—সম্মুখে শত লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া চিতাগ্নি যেন তাহাকে বলিতেছে—"শুদ্ধ হবি ত আয়! তোর পাপের কালি পুড়িয়ে আজ তোকে খাঁটি করে দেবো!" সে আহ্বান উপেক্ষা করা মোক্ষদার সাধ্য হইল না। সঙ্গীত-বিহ্বলা হরিণীর মত সে অগ্নিবক্ষে প্রবেশ করিল! পরক্ষণে বিকট চীৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া সে নদীজলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—'না গো, না, এ মরণ ত আমাকে তোমার পায়ে স্থান দেওয়াতে পারবে না! হবে না, হবে না!"

৪

দীর্ঘ রজনীর অলস অবশতার অবসানে ধরণী আবার নবোঢ়া বধূর ন্যায় সলাজ-হাসিতে জগৎকে মাতাইয়া তুলিতেছিল। পূর্ব্ব রাত্রে দুঃস্বপ্নের মত মোক্ষদার স্মৃতি মনে উঠিয়া শ্রীশচন্দ্রকে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড় হইতে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিতেই তিনি প্রভাত-প্রকৃতির অবাধ সৌন্দর্য্যে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনমতেই সেই সজল, মিনতি-ভরা মুখখানির হাত এড়াইতে পারিতেছিলেন না। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বসিয়া কে যেন কেবলই বলিতেছিল—"ওরে তুই ভুল বুঝেছিস্, তুই ভুল করেছিস্!"

শান্ত হওয়া দূরের কথা, কথাটার প্রতিধ্বনি যেন আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহার অস্থির চিত্তটাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিতেছিল! এমন সময় ফটকের বাহিরে আপনার দগ্ধ, যাতনা-ক্লিষ্ট দেহটাকে কোনরূপে টানিয়া আনিয়া মোক্ষদা একবার সতৃষ্ণ নয়নে বহুস্মৃতি-বিজড়িত উদ্যানটীর দিকে চাহিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয়ের বোঝা হাল্কা করিবার প্রয়াস পাইল; কিন্তু আর দাঁড়াইতে পারিল না। মনের অদম্য আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় এতটা পথ চলিয়া আসিলেও, তাহার দেহ নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া ছিল। এইবার সে ছিন্নমূল ব্রততীর মত সে সেই স্থানেই লুটাইয়া পড়িল; শব্দে চিন্তাহত শ্রীশচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"বাবু, একজন মেয়েলোক—"

কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া শ্রীশচন্দ্র দ্রুতপদে ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ঘটনা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন; তারপর চাকরের সাহায্যে মোক্ষদার মুমূর্ষু দেহটীকে সযত্নে তুলিয়া লইয়া গিয়া আপনার শয্যার উপর শয়ন করাইয়া দিলেন। পরীক্ষার্থ বক্ষবাস উন্মোচন করিয়া দেখিলেন,—বক্ষমধ্য সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে,—তাঁহারই ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। বহু বর্ষ পূর্ব্বে নবীনদম্পতীর প্রথম-মিলন-চিহ্নস্বরূপ এইটি তিনি মোক্ষদাকে উপহার দিয়াছিলেন।

মুহূর্ত্তে সকল বিপ্লব ভাসিয়া গেল। সন্দেহ-অগ্নি যাহা এখনও শ্রীশচন্দ্রের হৃদয়ে তুষানলের ন্যায় জ্বলিতেছিল, অতীত জীবনের সুখময়ী স্মৃতির আবর্ত্তে পড়িয়া তাহা একেবারে কোথায় তলাইয়া গেল। তিনি তখন অধীর আবেগে বলিয়া উঠিলেন—"মোক্ষ! মোক্ষদা!"

সে ডাক যেন মোক্ষদার হৃদয়-তারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়া, মুহূর্ত্তে তাহার অবসাদ দূর করিয়া দিল। বিপুল আনন্দে তাহার কণ্ঠস্বর নির্গত হইল না; সে শুধু নয়ন-কোণে হৃদয়ের সমগ্র আকুল প্রার্থনা জাগাইয়া তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সাধ্যমত চেষ্টাতেও

অশ্রুবেগ রোধ করিতে পারিল না। তাহার গণ্ড বহিয়া ধারা গড়াইতে লাগিল।

শ্রীশচন্দ্রের ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বালকের ন্যায়, পাগলের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে পত্নীর বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। পুলকে মোক্ষদার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। জ্বালা যন্ত্রণা সমস্ত অপসৃত হইয়া প্রেম-মন্দাকিনীতে তীব্র-বেগে প্রবাহ ছুটিল। সে তাহার অসহ আঘাতে স্থির থাকিতে পারিল না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।

কম্পিতকণ্ঠে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন—"মোক্ষদা, আমার জন্যেই তোমার এ অবস্থা, এ কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। বল, তুমি আমার অপরাধ বিস্মৃত হতে চেষ্টা করবে?"

বাধা দিয়া মোক্ষদা বলিল—"যাকে মনে-জ্ঞানে অপরাধ বলে স্বীকার করতে পারছি না, তাকে ভুলব কেমন করে? এত বড় মহৎ স্বামী পেয়েও তাঁর বুকে যে দাগা দিয়েছি, সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? তবু তুমি যে দয়া করে পায়ের তলায় স্থান দিয়েছ, এ কি আমার কম সৌভাগ্য? দয়া পেলেও ক্ষমা চাইবার মত সাহস আমার নেই! কিন্তু আজ সে প্রলোভনটাকেও কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছিনা! বল, ক্ষমা করলে?"

শ্রীশচন্দ্র অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন—"সামাজিক কতকগুলো সঙ্কীর্ণতা সেদিন তোমায় ক্ষমা করতে দেয় নি! আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম যে, এটা ভুলেরই সংসার; এখানে জীবনে ভুল করে নি, এমন লোক একজনও খুঁজে পাওয়া যায় না! আর মানুষ যদি মানুষের ভুল মার্জ্জনা করতে না পারে, তবে ভগবানের দ্বারে কি সাহসে তাঁর ক্ষমার ভিখারী হয়ে সে দাঁড়াবে?"

মোক্ষদার বদনে শান্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া স্বামীর কোলে মাথা রাখিল; তারপর পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

এই পাথেয়টুকু সম্বল করিয়া সে কি জীবনপারে যাত্রা করিবে? অন্তরের অনির্ব্বাণ-অগ্নি কি তাহাকে শুদ্ধ করিয়া দিবে! সতীলোকের দ্বার কি তাহার জন্য উন্মুক্ত হইবে? কে জানে!

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারীর সম্মান

চারিদিকে রব উঠিয়াছে—স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কর, আর তাহাদিগকে গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না। শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে যে পুরুষের ন্যায় সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই।

অনেকেরই ধারণা, অবরোধ প্রথার নিমিত্ত মেয়েদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার মূলে কতটা সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা একটু শক্ত। কারণ ২০.২৫ বৎসর পূর্ব্বেও যে সমস্ত রমণী অবরোধ প্রথা মানিয়া চলিতেন, অর্থাৎ ছেলেদের সম্মুখে বাহির হইলেও সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য তো বর্ত্তমান সময়ের রমণীদিগের স্বাস্থ্যাপেক্ষা একটুও খারাপ ছিল না; বরং ভালই ছিল। তবে আমি যতটা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে বেশ বলিতে পারি, অধুনা যে সমস্ত বালিকা স্কুল কলেজে

পড়ে, তাহাদিগের মানসিক পরিশ্রম অতিরিক্ত রকম হইয়া থাকে, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম একটুও হয় না। ফলে জন্মের মত স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

একটা কথা সর্ব্বদাই মনে হয়, যাঁহারা অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি নারীজাতির মা ভগিনীর উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে পারেন? কোনও রমণী পথে বাহির হইলে শিক্ষিত ভদ্র-নামধেয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে উপহাস করিতে কখনও কি সঙ্কুচিত হয়েন? কোনও সভাসমিতিতে নারীগণ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে লইয়া বিদ্রূপ করিবার আনন্দ হইতে অনেক পুরুষই আপনাকে বঞ্চিত করেন না।

অবরোধ-প্রথার ঘোর বিপক্ষে এরূপ দুই চারিজন নারী, আধুনিক শিক্ষা পাইয়াও আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না বলিয়া মাঝে মাঝে আমার সহিত তর্ক করেন বটে; কিন্তু তাঁহারা যে যুক্তি প্রয়োগ করেন তাহা সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয় না। কোনও কথা উঠিলেই তাঁহারা পাশ্চাত্যের তুলনা দিয়া থাকেন। অথচ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে কত যে প্রভেদ তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতে চাহেন না। সে দেশে পুরুষ, নারীর সম্মান জানে।

একবার একটি উচ্চশিক্ষিতা নারীর সহিত এ বিষয়ে অনেক কথা হইয়াছিল। তিনি বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের ব্যায়ামের নিমিত্ত যে সমস্ত ক্রীড়া প্রচলন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, আমি তাহাতে অমত করায় বলিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডের বালিকা বিদ্যালয়ে যদি এসমস্ত ক্রীড়া প্রচলিত থাকিতে পারে, তবে এদেশের বালিকা-বিদ্যালয়ে থাকিলেই বা দোষ কি?" ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "প্রথমতঃ ইংলণ্ডের জলবায়ু এবং এদেশের জলবায়ু এক নহে, এদেশীয় বালিকাদিগের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা (অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে Constitution বলে) সে দেশীয় বালিকাদিগের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাযেই, যে সমস্ত ব্যায়াম ও ক্রীড়াতে সেদেশীয় বালিকাদিগের শরীরের পক্ষে ক্ষতি হয় না, এদেশীয় বালিকাদিগের পক্ষে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সেদেশে যে বিষয় তুচ্ছ মনে করিয়া কেহ কিছু গ্রাহ্য করে না, এদেশে তাহাতে বহু নিন্দা হইয়া থাকে।" আমাকে প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকের কথা গ্রাহ্য না করিলেই হয়।" সমাজে বাস করিতে হইলে লোকের কথা গ্রাহ্য করা যে কতখানি দরকার উহা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। জানিনা, আমার কথাগুলি তাঁহার মনঃপূত হইয়াছিল কিনা—কিন্তু অতঃপর তিনি এ বিষয়ে আর কোনও কথা উল্লেখ করেন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে দেশে যেরূপ অন্নসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে নারীরও পুরুষের ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের দিকে মন দিবার আবশ্যকতা পড়িয়াছে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া নারীর শ্রেষ্ঠভূষণ লজ্জা বা নম্রতা বিসর্জ্জন দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে। নারীকে মূর্ত্তিমতী-করুণা রূপে প্রতীয়মানা হইতে হইবে। প্রকৃতির কোমলত্ব হারাইলে তাহার চলিবে না। কিন্তু কয়জন নারী ইহা মনে রাখেন? উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া যে সমস্ত রমণী পুরুষের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই নারী-প্রকৃতির মাধুর্য্য হারাইয়া পুরুষের প্রকৃতির ন্যায় আপনাদিগের প্রকৃতি-কেও গড়িয়া তোলেন।

শিক্ষিতা নারীদিগের মুখে লাবণ্যের বড়ই অভাব —ইহা অনেকের মুখেই শুনা যায়। ইহা পুরুষের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিবার ফল। বহুকাল পূর্ব্বেই একজন ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "The face is an index to a man's character." কাযেই যে যেরূপ কার্য্য করে কিংবা চিন্তা করে, তাহার মুখে সেরূপ ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেরূপ অবস্থার মধ্য দিয়াই নারীকে চলিতে হউক না কেন, তাহাকে স্বীয় নারীচরিত্রের গুণগুলি বজায় রাখিবার চেষ্টা সর্ব্ব প্রথম করিতে হইবে। আপনার সম্মান

আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। সুতরাং যে দেশে পুরুষ নারীর সম্মানের মূল্য জানে না, সে দেশে অবরোধ প্রথা না মানিয়া উপায় নাই—উহা যতই কঠিন বা অনিষ্টকর হোক না কেন।

শ্রীসরযূবালা মিত্র।

মুক্তি-পাগল

নিষেধ বাঁধন মানিস না আর মানিস না,—
কণ্ঠ চেপে ধরলে পরেও থামিস্‌না আর থামিস না।
অই আসে অই শঙ্খরোলে বদ্ধ হৃদয় রুদ্ধ পাগল গান
এবার যে তোর ভোরের অভিযান।
বজ্রবাঁধন সব টুটি আজ বাহির হবি ছুটি পথের মাঝ;
আসুক না রে ঝঞ্ঝাপ্রলয় গর্জ্জি মহা দুর্য্যোগেরি বাজ!

সত্য আজি আগল ভেঙে ধরফড়িয়ে দিচ্ছে প্রলয়সাড়া
লক্ষ যুগের কণ্ঠ চেতন হারা;
গুমরে উঠে মৌনভাষা কল্পনা সব মুষড়ে গেছে আজ,
সৃষ্টি সবই দৃষ্টি বিঘোর, বিশ্বদেবের অনাসৃষ্টি লাজ।
ধ্বংস আজি সবার মাথার পর—
ত্রিশূলী আজ উঠছে দুলে, তাণ্ডবে সে মত্ত ভয়ঙ্কর।

কর্ম্ম আজি মিনার সম দাঁড়িয়ে গেছে উচ্চ মাথা তুলে
রোষের নদী উঠছে ফুলে ফুলে!
লুপ্ত সকল প্রেমের গজল বক্ষে পাগল বিশ্ব-দরদ গান
কলজে ছেপে ছলকে উঠে কল্‌কলিয়ে সমর অভিযান;
মসজিদে আজ মরদগণের বাণী
মন্দিরে আজ রুদ্রদেবের বন্দনা সব করছে অভিমানী!

শিব ছেড়েছেন মদন মোহে ধকধকিয়ে উঠছে ত্রিনয়ন,
ক্ষুদ্র, পাথার করবে সন্তরণ!
যে মার চিররুদ্ধগতি বুদ্ধদেবের নিশ্চলতার পাশে,
সয়তানের আজ হয়না সময় দেবস্থানে রাখতে আপন গ্রাসে
ভক্তরক্তে ক্রুশের ফলক হবেই রক্তময়—
দীন দুনিয়ার মুক্তিপাগল শক্তি গাহে বিশ্বমাতার জয়!

শ্মশান মাঝে উঠছে জেগে শিশুদেবের বিরাট পরিচয়
কণ্ঠ চেপে ধরলে কিবা হয়?
পাগলা ঝোরার জল কি শোষে? কাল বোশেখী কোথায় পেল লয়?
ধ্বংস কেতন যতই নাচুক কংশ পরাণ হবেই হবে ক্ষয়!
বক্ষে চির রুদ্র মরণ যত—
থমকে যাওয়া দম আঁকড়ি মত্ত পরাণ ছুটছে অবিরত।

মৃত্যু যে আজ মুখর হয়ে বসছে এসে প্রেমের সিংহাসনে
লাগবে কিনা ভাবছ মনে মনে?
আপদ তোদের ছাপিয়ে উঠে, মগজ তোদের হাঁফায় বদ্ধ হয়ে
শিরায় শিরায় উল্কা ছোটে মায়ের জমাট রক্ত তরল হয়ে!
বসে থাকাই মৃত্যু চমৎকার,
ব্যথার বাঁধন রুদ্র জাগে ত্রিলোকের আজ
কাটতে সকল ভার!
যাবিই ছুটে যাবিই ছুটে মহালোকের কোলের পাশে
আর বাঁধাবাঁধ মানিস্ না আর মানিসনা
কণ্ঠ চেপে ধরলে পরেও থামিস না আর থামিসনা।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অপূর্ণ

(উপন্যাস)

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুরমা।

পথে গরুগুলি রৌদ্রে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তাহাদের বৃক্ষতলে খানিকক্ষণ বিশ্রাম দেওয়ার পর অশোক যখন চৌবেড়িয়ায় পৌছিল তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। হরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া অনেকক্ষণ ডাক দিবার পরও যখন অশোক তাহাদের কোনও সাড়াশব্দ পাইল না, তখন তাহার মনে সত্যই একটু আশঙ্কা হইল। একবার ভাবিল, তবে কি সে বাড়ী ভুল করিয়াছে? কিন্তু তাই বা কি করিয়া বলা যায়? এটা কাহারও না কাহারও বাড়ী বটে ত! অন্য কাহারও বাড়ী হইলে অন্ততঃ তাহারা তো বলিতে পারিত যে এ হরেন্দ্র বাবুর বাড়ী নয়। তবে এটা যদি পোড়ো বাড়ী হয় সে স্বতন্ত্র কথা। আর যদি হরেন্দ্র বাবুর বাড়ী সত্যই হয় এবং সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এমনই হইয়া থাকে? ইঁহারা ঘুমাইতে পারেন, কিন্তু অনুপ্রভা তো ঘুমাইবে না।

বাড়ীর দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাস্তায় পৌছিয়া ভাবিতেছে কোথায় ইহাদের খোঁজ করিবে, এমন সময় অশোক দেখিল রাস্তার ধারে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের পার্শ্বে কে একজন হাত বাড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত অশোক অগ্রসর হইয়া দেখিল একটি কিশোরী মূর্ত্তি। "তুমি কে?" জিজ্ঞাসা করিতেই মেয়েটি বলিল, "আমি ইন্দু, অনুদি'র বোন্। আপনি অনুদি'কে ডাকলেন কি না তাই আমি এসেছি।"

মেয়েটির দিকে আরও খানিকটা সরিয়া গিয়া অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "অনুপ্রভা কোথায়? তোমরা কোনও উত্তর দিলে না কেন?"

ইন্দু চুপি চুপি বলিল, "অনুদি' লুকিয়ে আছে। নইলে কাল রাত্তিরে যে জমিদার মুখপোড়া দিদিকে বিয়ে করে ফেল্‌বে।"

অশোক অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া ইন্দুপ্রভার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, "তাহলে সে কোথায় আছে এখন?"

ইন্দু বলিল, "আমি আপনাকে যে সেইখানেই নিয়ে যাচ্ছি। আপনি এই রাস্তাটা দিয়ে বরাবর গিয়ে বাঁদিকে এক বাগানের মধ্যে চালাঘর দেখ্‌তে পাবেন। সেই খানেই দাঁড়াবেন। আমি বাগানের মধ্যে দিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে সেখানে যাচ্ছি। কাউকে যেন কিছু বল্‌বেন না—ঐ কে একটা মিন্‌সে আসছে—আপনি যান, আমি পালাই।" বলিয়া নিমেষ না ফেলিতে ইন্দুপ্রভা সেই অশ্বত্থ গাছের নীচে হইতে অদৃশ্য হইল। অশোক সেদিক হইতে সরিয়া আসিয়া নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর হইল।

যাহাকে দেখিয়া ইন্দু পলাইয়াছিল সে লোকটা ক্রমে ক্রমে অশোককে অতিক্রম করিয়া গেল। লোকটা কুটুম্ব বাড়ী যাত্রী একজন কৃষক। সে ব্যক্তি মেলায় কেনা লাল ছিটের একটা কামিজ কাঁধে ফেলিয়া, কালো বুরুষের জুতা জোড়াটা সাবধানে হাতে লইয়া পথ চলিয়াছে। তাহার ভরসা আছে, কুটুম্ব বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া একটা পুকুরে হাত পা ধুইবে এবং জুতা জামা পরিয়া তাহাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিবে, তখন তাহার খরচ করিয়া জুতা জামা কেনা সার্থক হইবে।

মিনিট ৭।৮ এর মধ্যে অশোক ইন্দুপ্রভার নির্দ্দিষ্ট বাড়ীখানার কাছে পৌছিয়া দেখিল, বাগানের মধ্যে ইন্দুপ্রভা তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। অশোক

কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে বলিল, "আপনি বরাবর বাড়ীর ভেতর চলে যান, আমি ঠাকুরমাকে সব বলে এসেছি। তিনি বড় ভাল লোক।"

অশোক গমনোদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আসবে না?"

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "উহুঁ—আমার দেরী হলে যদি কেউ জেনে ফেলে!"

তারপর যাইতে যাইতে ফিরিয়া চাহিয়া ইন্দু মৃদুস্বরে বলিল, "অশোকদা, অনুদি'কে কিন্তু আজ বে করতে হবে। যেন 'না' বলবেন না। অনুদি' আপনার জন্যে কেবল কাঁদে, অনুদি' আপনাকে খুব ভালবাসে।" বলিয়া ইন্দু সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।

একটা খুব গুরুতর কাণ্ডের আভাস পাইয়া, অথচ তাহার সমস্তটা বুঝিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত হৃদয়ে অশোক সম্মুখের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই এক বর্ষীয়সী মহিলা 'এস, দাদা এস' বলিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন।

রমণীর হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। অশোকের মনে হইল যেন এইমাত্র তিনি আহ্নিক সমাধা করিয়া তিনি উঠিয়াছেন। অশোক বুঝিল ইনিই বোধহয় ইন্দুপ্রভার উল্লিখিত ঠাকুরমা। ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে তিনি আশীর্বাদ করিলেন—"মনের সুখে থাক ভাই।"

এই ঠাকুরমা অনুপ্রভার বাপের খুড়িমা, একটু দূর সম্পর্ক। উপযুক্ত যুবক পুত্রকে হারাইয়া, বালক পৌত্রকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া আপনার রুচিমত গড়িতেছেন। সে কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়ে। সম্প্রতি বাড়ী আসিয়াছে।

ঠাকুরমা অশোকের রৌদ্রক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আহা গরমে বড্ড কষ্ট হয়েছে। জুতো জামা খুলে ফেল। হাত মুখ ধুয়ে আহ্নিক করে কিছু খাও ভাই। সেই কখন্ খেয়ে বেরিয়েছ!"

অশোক একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "তেমন কষ্ট তো হয় নি।"

"হয়েছে বৈ কি ভাই। আমি তোমারও ঠাকুরমা হই। লজ্জা কোরো না।"

বলিয়া ঠাকুরমা ঘরের ভিতর জুতা জামা ইত্যাদি রাখিতে দেখাইয়া দিলেন।

অশোক জুতাজামা খুলিয়া, হাত মুখ ধুইয়া লইয়া ঠাকুরমার দেওয়া একখানি কাচা কাপড় পরিয়া, হাসিয়া বলিল, "হাত মুখ ধোয়া আর খাওয়ার মাঝখানে যে কাযটার কথা বল্লেন সেটা যে অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।"

"তা হোক ভাই। অন্ততঃ মন স্থির করে' গায়ত্রীটা জপ করে নাও তো! কত সময় বাজেখরচে যাচ্চে, যার দৌলতে সব মিল্‌ছে তাঁকে কিছু দেবে না?" বলিয়া পিছন ঘরটিতে অশোকের জন্য আহ্নিকের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অশোক আর কোন কথা না বলিয়া গায়ত্রী জপ করিতে বসিল। তাহার পর সে জলযোগ করিতে বসিলে ঠাকুরমা বলিলেন, "তোমাকে এখন সব কথা বলি ভাই। এসে দেখে শুনে তুমি বোধ হয় অবাক হয়ে গিয়েছ।"

অশোক আগ্রহের সহিত ঠাকুরমার পানে চাহিল।

ঠাকুরমা যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই।—গ্রামের এক প্রৌঢ় জমীদারের সঙ্গে অনুর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। সম্বন্ধ করিয়াছিলেন অবশ্য অনুর জ্যেঠামশায়। তবে তাহাতে জেঠাইমারই বেশী কৃতিত্ব। কারণ তাঁহারই পরামর্শমত এই সমস্ত ঘটিয়াছিল। জমীদার বাবুর যত রকম দোষ থাকিতে পারে তাহা আছে। ভয়ঙ্কর মাতাল ও বদরাগী, স্বভাবও খারাপ। আগে দুই বিবাহ করিয়াছিল। গুজব এক স্ত্রীকে রাগের বশে মারিয়া ফেলে। আর একটী ভয়ে আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি পায়। যে দিন অশোক অনুপ্রভাকে রাখিয়া যায় তাহার দুই দিন পরেই সম্বন্ধ স্থির হয়। জমীদারের নিকট দুই হাজার টাকা অনুর জ্যেঠাইমা হস্তগত করিয়াছে, উদ্দেশ্য ঐ টাকায় নিজের মেয়ের ভাল বিবাহ দিবে।

ইন্দু তাহার মার সহিত ঝগড়া করিয়াছিল, কেন

তিনি দুষ্ট লোকের সঙ্গে অনু দির বিবাহ দিতেছেন? ইন্দুর নিকট হইতেই ঠাকুরমা আজ এই সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। একেতো অশোক যাইবার পর হইতেই অনু কান্না আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার উপর, অন্য লোকের সহিত বিবাহের কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত তাহার চক্ষের জলের বিরাম ছিল না।

পাছে অনু কোনও গোলমাল করিয়া বসে এই আশঙ্কায় ইন্দুর মা তাড়াতাড়ি বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলেন। ইহার পূর্ব্বেই আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য অশোককে পত্র লেখা হইয়াছিল।

ইন্দু মেয়েটি বড় ভাল ও একটু অসাধারণ প্রকৃতির। কাহারও চোখের জল সে দেখিতে পারে না। বুদ্ধিও তাহার তীক্ষ্ণ। অনু অশোককে যে চিঠি লিখিয়াছিল সে নিজে তাহা ডাকে দিয়া, কি উপায়ে সে অনুদিদিকে রক্ষা করিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ঠাকুরমার কাছে আসে এবং তাঁহাকে বলে, অনুকে যতদিন অশোক না আসে ততদিন যেন লুকাইয়া রাখেন। ইন্দু মেয়েটিকে ঠাকুরমা বড়ই ভালবাসেন, তাহার উপর অনুপ্রভার অবস্থা বুঝিয়া ও শুনিয়া তিনি কাল হইতে তাহাকে এখানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। আজ বিবাহের দিন। আজিকার রাতটা কাটিয়া না যাইলে ঠাকুরমার ভয় যাইতেছে না; কারণ জমিদার কাল হইতে আবার গ্রাম তোলপাড় করিতেছেন।

সমস্ত কথা ঠাকুরমা বলিয়া শেষে উপসংহার করিলেন, "এখন তুমি এসেছ ভাই, তোমার ভার তুমি নেও।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কি করলে সমস্ত বিপদ কেটে যায় আপনি বলুন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "জমীদার যে রকম ভয়ানক লোক, তাতে এখানে অনুকে বেশী দিন রাখ্‌তে সাহস হয় না, রাখা উচিতও নয়। তোমাকে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু নিয়ে যেতে হলে তোমাকে ওকে বিবাহ করতে হবে। নইলে এখান থেকে ওকে তোমার নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না, নিরাপদও হবে না।"

অশোক চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল। কোনও উত্তর করিল না।

ঠাকুরমা তাহাকে বলিলেন, "ওকে নিয়ে যেতে হলেই বিবাহ করা উচিত ও নিরাপদ কেন বল্‌ছি, তা শোন। অনুর যেরকম মনের অবস্থা, আর তোমার উপর ওর যে রকম মনের টান, তাতে তুমি যদি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, অথচ শেষে বিবাহ না কর, তাহলে ওর জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এমনি নিয়ে গেলে আরও এক বিপদ, জমিদার টের পেলেই তোমাদের পুলিস দিয়ে মিথ্যা যা হয় একটা কিছু বলে আট্‌কাবে। কিন্তু বিয়ে করে সেই অবস্থায় নিয়ে গেলে তার আটকাবার সাহস হবে না। তোমার কি মত এখন বল। যদি বিয়ে করা মত হয়, আজ রাত্রেই বিবাহ করতে হবে। আর অনুকে রক্ষা করতে হলে ও ছাড়া তো অন্য উপায় নেই।"

অশোক লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমার তো কোন আপত্তি বা অনিচ্ছা নেই—তবে বাবা কি বল্‌বেন তাই ভাবছি।"

ঠাকুরমা চিন্তিত মুখে বলিলেন, "তা ঠিক। তাতে আবার তিনি তাঁর বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির করেছেন।"

অশোক আরও লজ্জিত হইয়া বলিল, "একে এখানে রেখে গিয়ে আমি কলকাতা থেকে তাঁকে এক পত্র লিখে দিয়েছি যে ওখানে বিবাহ করা অসম্ভব। কি যে তিনি ভেবেছেন তাও জানি নে।"

ঠাকুরমা। কিন্তু এখন তো তাঁর মত নিয়ে ঠিক করতে গেলে সময় থাকে না। মেয়েটার তাহলে দুর্গতির শেষ থাকবে না। হয়ত বাঁচবেই না। উপরি উপরি কত আঘাতই পেলে বাছা!"

অশোক। আমার অবস্থা আপনি সব বুঝেছেন, আপনিই বলুন কি করলে সব দিক রক্ষা হয়।

ঠাকুরমা একটুখানি ভাবিয়া বলিলেন, "আমি ভাই সে আগেই ঠিক করে রেখেছি। আমার মতে তুমি বিবাহ করে' কালই এখান থেকে কলকাতা রওনা হও। সেখানে গিয়ে সব কথা [illegible] লিখে জানাও। তাঁর

হৃদয় মহৎ, তোমাকে ক্ষমা করতে তাঁর দেরী হবে না।"

অনুপ্রভার সহিত যখন অশোকের দেখা হইল তখন তাহার আরক্ত মুখমণ্ডল ও কাতর ভাব দেখিয়া অশোকের দুঃখের অবধি রহিল না। তাহার উপর নির্ভর করিয়া সেই মৃত্যুশয্যার প্রতিজ্ঞার কথা প্রতিদিন জপ করিয়াছে ইহা ভাবিয়া অশোকের চিত্ত বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। এত ঘটনাতেও যে সংকল্প দৃঢ় হইয়া উঠে নাই, অনুপ্রভার কাতর মুখ দেখিয়া তাহা সুদৃঢ় হইয়া উঠিল।

সস্নেহে অনুপ্রভার হাতখানি নিজে মধ্যে লইয়া বলিল, "অনু, তোমাকে এতদিন মনের কথা বল্‌তে পারি নি। তুমি হয়ত আমাকে কত নিষ্ঠুরই ভেবেছ। তোমাকে পেলে কত সুখী হই ভগবান জানেন। তোমাকে এখানে রেখে গিয়ে কি কষ্টে যে ছিলাম! ঠাকুরমা যেমন বল্‌ছেন তাই হোক। বল আমার উপর তোমার কোন রাগ নেই, যে রাগে আমাদের বাড়ী থেকে চলে এসেছিলে?"

ইহার উত্তরে অনুপ্রভা শুধু অশ্রুজলে অশোকের হাত সিক্ত করিয়া দিল।

বাহিরে আসিয়া অশোক ঠাকুরমাকে বলিল, "ঠাকুরমা আপনার আদেশই তাহলে মাথা পেতে নিলাম।" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

ঠাকুরমা হাস্যমুখে অশোককে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ঠাকুরমার পৌত্র বিবাহের মন্ত্রাদি পূর্ব্ব হইতেই আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ঠাকুরমার আদেশে সেই পুরোহিত হইয়া বিবাহ সম্পন্ন করিল। সম্প্রদান করিলেন ঠাকুরমা।

যাহাকে সত্যই ভাল বাসিয়াছিল, তাহাকে পাইয়াও, পিতা ইহাতে কতখানি আঘাত পাইবেন তাহা ভাবিয়া অশোকের সমস্ত আনন্দ ও তৃপ্তির মধ্যেও কণ্টকের একটা ক্ষতবেদনা জাগিয়া রহিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মায়ের প্রাণ।

আজ দিন দশেক হইল অশোকের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সেই যা অতুলকৃষ্ণ সন্ধান লইয়া আসিয়াছিলেন সে চৌবেড়িয়া যাত্রা করিয়াছে, সরস্বতীর মনে সেই হইতেই একটা আশঙ্কা জাগিয়া রহিয়াছে—গতকল্য হইতে তাহা যেন আরও বাড়িয়াছে। আজ সকালে উঠিয়া তাঁহার মন এতই উদাস হইয়া গিয়াছে যে মনে হইতেছে তাঁহার আর সংসারে কিছুই করিবার নাই।

তাঁহার সংসারে ত কিছুরই অভাব কোনও অশান্তি ছিল না। আজ পিতাপুত্রের মধ্যে কেন এই মেয়েটিকে লইয়া ব্যবধান রচিত হইয়া উঠিল? অথচ সেই মেয়েটিকে এতদিনে যাহা জানিয়াছিলেন,তাহাতে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবার তো কিছুই নাই। তাহার মাসীমার মৃত্যুশয্যায় একটি প্রতিজ্ঞাকে সে যদি খুব বড় করিয়াই ভাবিয়া থাকে, তাহার বিরুদ্ধে তিনি কি বলিতে পারেন? তাঁহার পুত্রেরই যে তাহাতে কোন দোষ ছিল তাহাও ত নহে। সরস্বতী স্বামীর ক্রোধের বিরুদ্ধেও কিছু মনে করিতে পারিলেন না। বন্ধুর সহিত কথা দিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত না করিতে পারায় ক্ষোভ যে তাঁহাকে কতখানি পীড়িত করিতেছিল তাহা ত তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

দোষ ঠিক কাহারও নাই, তথাপি কেন সংসারে এই অশান্তি প্রবেশলাভ করিল?

সরস্বতীর ভাবনা হইতেছিল, মেয়েটিকে রাখিয়া আসিয়া কেন অশোক আবার তাড়াতাড়ি সেখানে গেল? সে ত তেমন ছেলে নয় যে বিনা কারণে শুধু আপনার ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চলিয়া যাইবে।

এইরূপ কত কথাই সরস্বতীর মনে হইতে লাগিল।

ধীরে সন্ধ্যা হইয়া গেল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্বামী অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য ভিতরে আসেন এবং কিছু জলযোগ করিয়া পুনরায় বাহিরে যান। আজ

দুপুরের পর হইতে একবারও তিনি ভিতরে না আসায় তাঁহার চিন্তার ভার আরও বাড়িয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর বালক ভৃত্য শম্ভুকে ডাকিয়া সরস্বতী বলিলেন, "শম্ভু একবার বাইরে যা, ওঁকে ডেকে আনগে।" শম্ভু তখনি চলিয়া গেল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কর্ত্তাবাবু এলেন না। রাগ করে বল্লেন এখন যা।"

স্বরস্বতী দেবীর মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আশঙ্কা হইল তবে কি অশোকের নিকট হইতে কোনও সংবাদ আসিয়াছে?

আরও খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। তখন স্বরস্বতী বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। শেষে আর ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে না পারিয়া পুরাতন ভৃত্য হরিকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাওতো, তিনি কেন আস্‌ছেন না একবার জেনে এস।"

এই বৃদ্ধ ভৃত্য এই সংসারে কায করিয়া মাথার সব চুলগুলি পাকাইয়াফেলিয়াছে। ইংরাজ সরকারের অধীনে কায করিলে এতদিন কোনকালে তাহাকে অর্দ্ধেক বেতন অর্থাৎ পুরা পেন্‌সন লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু দেশী লোকের নিকট বলিয়া সে বছর বছর 'এক্সটেন্সন'পাইয়া কার্য্যকাল ৪৫বৎসর করিয়া ফেলিয়াছে এবং দিনে দিনে তাহার মূল্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কারণ অনেকের মতে পুরাতন বিশ্বাসী লোক মিলাই দুষ্কর, নূতন মিলা তেমন নহে।

হরিচরণ সাবেক কালের ভৃত্য। অতুলকৃষ্ণকে কোলে পিঠে করিয়া বড় করিয়াছে, তাই সে নির্ভয়ে বাবুর কাছে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই একখানি পত্র আনিয়া একটু চিন্তাকুল ভাবে বউমার হাতে দিল।

এই পত্রখানি অশোক কলিকাতার বাসায় সস্ত্রীক আসিয়া পিতাকে লিখিয়াছিল। অদ্য অপরাহ্ণের ডাকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে সরস্বতী পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

অশোক পত্রে সমস্ত অবস্থা বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছে। পিতার অনুমতি না লইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে হইতেছে তাহাতে সে নিজেকে যে কত অপরাধী বলিয়া মনে করিতেছে তাহা অতি করুণ ভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এবং সর্ব্বশেষে অশেষ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছে যে, পিতার মার্জ্জনা ও অনুমতি পাইলেই সে সস্ত্রীক আসিয়া পিতামাতার চরণ বন্দনা করে। ইহাও সে লিখিয়াছে, যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে সে এমন দেবতুল্য পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে জীবন বিষময় হইবে এবং তাহার মত দুর্ভাগ্য জগতে আর কেহই রহিবে না।

পত্রখানি দীর্ঘ ছিল। পাঠ শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যেমন তিনি পত্র হইতে মুখ তুলিয়াছেন, দেখিলেন স্বামী সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার চোখ দুটা যেন বিদ্যুতের মত মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং মুখমণ্ডলে আহত পিতৃগর্ব্বের একটা বিরাট ক্রোধের মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

স্ত্রীকে পত্র হইতে মুখ তুলিতে দেখিয়া অতুলকৃষ্ণ অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ, তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত তেমন জোর করে কোনও কথা বলি নি। কিন্তু আজ যা বল্‌ছি তা তোমাকে শুন্‌তে হবে। আজ থেকে ছেলের কথা ভুলে যাও। মন থেকে দূর না কর্‌তে পার, মুখে যেন এনো না। অন্ততঃ আমাকে যেন কখনও আর তার নাম না শুন্‌তে হয়। আমি তাকে এইমাত্র চিঠি লিখে দিয়ে আস্‌ছি, আজ থেকে সে আমার কেউ না। যতদিন আমি বাঁচব তার মুখ যেন আমাকে আর না দেখ্‌তে হয়।"

সরস্বতী দেবী স্তম্ভিতের মত সেখানে বসিয়া রহিলেন। মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

অতুলকৃষ্ণ বারকয়েক পাইচারি করিয়া বলিলেন, "এত কষ্টে এত আশা করে এত ভেবে দুজনে মিলে যাকে মানুষ করলাম, একটা তিন দিনকার পরিচিত মেয়ের জন্যে সে অনায়াসে সব ভুলে গেল। উঃ!"

সরস্বতীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া অতুলকৃষ্ণ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তার জন্যে

চোখের জল ফেল্‌তে পাবে না—কিছুতে না—এ আমি তোমাকে বলে রাখ্‌ছি। তোমার কাছেও যদি ওরকম ব্যাভার পাই, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে"—বলিতে বলিতে অতুলকৃষ্ণ পত্নীর রক্তহীন ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

সরস্বতী অতিকষ্টে সাম্‌লাইয়া লইয়া চক্ষের জল চক্ষে বিলোপ সাধন করিলেন।

অতুলকৃষ্ণ তখন ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সরস্বতীর চক্ষু ছাপাইয়া আবার তখন অশ্রু ছুটিল। পুত্রের পত্রের সেই সকরুণ ভাষা, তাহার উদ্বেগ, তাহার সেই ক্ষমাভিক্ষা এবং দৃঢ়চিত্ত স্বামীর ক্রুদ্ধ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অশ্রু নিবারণ করা তাঁহার কঠিন হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন—"বাবা আমার! যখন এই কঠিন পত্রখানা তোর হাতে পড়বে, কি দুঃখের শেলই তোর বুকে বাজবে! কোথায় তোদের দুজনকে আজ রাজা-রাণীর আদরে ঘরে তুলে নেবো, তা নয় তোদের আজ চিরজন্মের মত দূর করবার ব্যবস্থা শুনতে হল!"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পিতৃক্রোধ।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কত ঘটনাই ঘটিয়াছে। মহা সমারোহে অতুলকৃষ্ণ গিরীশের কন্যার বিবাহ আপন ব্যয়ে আপন আলয়ে সম্পন্ন করিয়াছিলেন—যদিও গিরীশ তাহাতে যথেষ্ট আপত্তি করিয়াছিলেন। সরস্বতী স্বামীর অনুরোধে এই বিবাহের সব মঙ্গল কার্য্যেই যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতৃহৃদয়ে তখন যে দুঃখের তুফান উঠিত, তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারিতেন না। সকলের অসাক্ষাতে তিনি নিশ্বাস ফেলিতেন, আর ভাবিতেন আহা—আজ অশোক যদি আমাকে এমনি একটি বধূ আনিয়া দিত, তাহা হইলে আমার জীবনের কোন সাধই অপূর্ণ রহিত না।

অতুলকৃষ্ণের আহত অভিমান এত বেশীদূর অগ্রসর হইয়াছে যে তিনি গিরীশের কন্যাকেই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পারেন নাই কেবল গিরীশের জন্য। গিরীশ প্রথম হইতেই তাঁহাকে অশোকের উপর ক্রোধ করিতে নিষেধ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ও বিষয় তোমার স্বোপার্জ্জিত নহে, পিতৃপুরুষের, ইহা হইতে তোমার পুত্রকে বঞ্চিত করিবার কোনও অধিকার তোমার নাই। তা ছাড়া আমার মেয়েকে এরূপ অন্যায় ভাবে বিষয় গ্রহণ করিতে কেন দিব?

এই উপলক্ষ্যে দুই বন্ধুতে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যও ঘটিয়াছিল।

অতুলকৃষ্ণ অশোককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন যে তাহাকে তিনি বর্জ্জন করিলেন, তাহার পর মাস কয়েক অশোক কলিকাতায় অনুপ্রভাকে লইয়া অতি কষ্টে কাটাইয়াছিল। পরে আপন অর্থকষ্ট জানাইয়া পিতার নিকট গৃহে ফিরিবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়াছিল। উত্তরে অতুলকৃষ্ণ রেজেষ্ট্রি করিয়া পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দেন ও পৃথক একখানি পত্রে পুত্রকে লিখেন—ফিরিয়া আসিবার দরকার নাই—কোনও নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তি নিজের অভাব জানাইলে যেমন তাহাকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য, তোমাকেও সেইরূপ সাহায্যের জন্য পাঁচশত টাকা পাঠান হইল।

কথা কয়টা অতি নিদারুণ ভাবে অশোকের হৃদয়ে আঘাত করিল। নিতান্ত পরের মত দেওয়া পিতৃদত্ত অর্থ সে ফেরৎ দিয়াছিল এবং সেই দিনই তাহাদের কলিকাতার বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিল। পিতাকে সে অত অভাব জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিল এই উদ্দেশ্যে যে, হয়ত তিনি পুত্র কষ্টে পড়িয়া অনুতাপ করিতেছে জানিতে পারিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিবেন।

সরস্বতী এই টাকা চাওয়া টাকা ফেরৎ দেওয়ার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃহৃদয় তখনি বুঝিয়াছিল, কোন অভিমানে পুত্র অভাবের মধ্যেও

টাকাগুলি ফেরৎ দিয়াছে। ইহার দিন কয়েক পরেই গ্রামের একটি ছেলে কলিকাতায় যাইতেছিল। সরস্বতী গোপনে তাহার নিকট অশোকের ঠিকানা ও দুইশত টাকা দিয়া পুত্রকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে যেন এই টাকাগুলি লয়, কর্ত্তা রাগ করিয়াছেন তাই তিনি তাহাকে কোনও পত্র লিখিতে পারিলেন না, ইহা যেন সে বুঝাইয়া বলে।

ছেলেটী দিন দশ পরে ফিরিয়া আসিয়া টাকাগুলি সরস্বতীকে ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছিল ও বলিয়াছিল যে অশোক সেই টাকা ফেরৎ দেওয়ার পর হইতেই, পূর্ব্ব ঠিকানা ত্যাগ করিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারিতেছে না।

এ সংবাদ তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল। আহা বাছা বৌকে নিয়া কলিকাতা সহরে অর্থাভাবে কি কষ্ট পাইতেছে! যাদের রাজ্য, তারা এই রাজ্যপাট সব ছাড়িয়া ভিখারীর মত বেড়াইতেছে, আর আমি এই অট্টালিকায় সুখে বাস করিতেছি—এই সব ভাবিয়া সরস্বতীর মনের শান্তি ছিল না। ক্রমে তাঁহার আহারে রুচি চলিয়া গেল, কোমল শয্যা কণ্টকের মত বিঁধিতে লাগিল, দাস দাসীর পরিচর্য্যা অসহ্য হইয়া উঠিল। মুখে আহারের গ্রাস তুলিতেছেন, এমন সময় মনে হইল অশোকের হয়ত খাওয়া হয় নাই। হাত হইতে অন্ন পড়িয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে আহার ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইতেও বঞ্চিত হইলেন। অশোক যে এক পয়সা মাত্র না লইয়া চলিয়া গিয়াছে, অন্ধকার রাত্রে ঝড় বৃষ্টির দিনে তারা দুই স্বামী স্ত্রীতে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার রাত্রি কাটিয়া গেল। যদি বা কোন সময় নিদ্রা আসিত, পুত্র সম্বন্ধে এক একটা কুস্বপ্ন দেখিয়া সেই স্বল্প নিদ্রাটুকু তখনি ভাঙ্গিয়া যাইত।

তাহার উপর সব চেয়ে কষ্টের কথা এই ছিল যে, স্বামীর নিষেধ ছিল বলিয়া তিনি এক সুদীর্ঘ বৎসর মধ্যে একটি দিনের জন্যও স্বামীর সাক্ষাতে পুত্রের নামোল্লেখ করিতে পারেন নাই। স্বামীর অসাক্ষাতেও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া পুত্রের প্রসঙ্গ তুলিতেন না। যে চিন্তা যে কথা বুকের মধ্যে সারাক্ষণ তোলপাড় করিতেছে, তাহা বুকের মধ্যেই অহোরাত্র চাপিয়া রাখার যে কি দুঃখ তাহা সুধু অনুভব করিবার, বুঝিবার বা বুঝাইবার মত নহে।

এইরূপে অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্র দুশ্চিন্তা সহিয়া সরস্বতী রোগশয্যা গ্রহণ করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন মাসীমা।

পিতার নিকট হইতে যে দিন স্নেহহীন পত্র ও নিঃসম্পর্কিতের ভিক্ষার মত ৫০০৲ আসিয়া পৌছিয়াছিল, সেই দিনই অশোক মনের দুঃখে সে টাকা ফিরাইয়া দিয়া স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতার বাসা হইতে বাহির হইল। বামুন ও চাকরের মাহিনা শোধ করিয়া দিয়া, তাহাদের বলিয়া দিল, এ মাসটা ইচ্ছা করিলে এ বাসায় তাহারা থাকিয়া অন্য চাকরীর সন্ধান লইতে পারে, কারণ সে মাসের ভাড়া তখনও অগ্রিম দেওয়া আছে। সে যে উঠিয়া যাইতেছে, বাড়ীওয়ালাকেও সে খবর জানাইয়া দিয়া গেল।

অশোক অভিমানে একটা নিশ্চিত আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আগে সে ভাবিয়াছিল কোনও এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া উঠিবে। কিন্তু এমন কোনও বন্ধুর নাম তাহার মনে পড়িল না যেখানে এরূপ অবস্থায় স্ত্রীকে লইয়া অসঙ্কোচে উঠিতে পারে। হঠাৎ অশোকের মনে পড়িয়া গেল, ভবানীপুরে তাহার মায়ের দূর সম্পর্কের এক বোন আছেন। তখন সে গাড়োয়ানকে ভবানীপুরে যাইতে কহিল।

মাসীমা তখন উনানে ভাত চাপাইয়া মালা লইয়া দুয়ারের গোড়ায় মগ্নচিত্ত হইয়া বসিয়াছিলেন ও ঘন ঘন উকি মারিতেছিলেন, ফেন পড়িয়া আগুন না নিভিয়া যায়।

এই মাসীমাটি বড় সহজ মাসীমা নহেন। বৎসর

খানেক বিধবা হইয়া কিছু গুছাইয়া উঠিয়াছেন। স্বামী ছিলেন নেহাৎ গোবেচারা মানুষ—কি একটা আপিসে কায করিয়া মাস গেলে মাত্র ৩০টি টাকা মাহিনা আনিতেন। এবং পাইপয়সাও হিসাব করিয়া গৃহিণীর হাতে দিতে হইত। ট্রাম ভাড়া বা পাণ সিগারেট বাবদ একটি পয়সা খরচ করিলেই অনর্থ হইত। স্বামী বেচারা স্থির করিয়া লইয়াছিল এ জন্মটাই ভগবান তাহার উপরে সশ্রম কারাবাসের দণ্ড দিয়াছেন। জেলারের হুকুম মত কায কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে, পয়সাকড়ির সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

একবার ভদ্রলোক একটা ভাল কায করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বুঝি ভগবান তাঁহাকে সকাল সকাল মুক্তি দিয়াছিলেন। ভাল কাযটা এই যে, ঝোঁকের মাথায় গোটা পঁচিশ টাকা ধার করিয়া তিনি দুই চারিজন বন্ধু বান্ধবদের সহিত কাশী ও গয়া এই দুট তীর্থস্থানে গিয়াছিলেন। কথা ছিল মাসে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া পাঁচ মাসে টাকা কয়টা শোধ দিবেন। কিন্তু শেষে দিবার সময় গৃহিণী বিষম বাঁকিয়া বসিলেন। মাস শেষে মাহিনার ত্রিশটি টাকা গৃহিণীর হাতে সমর্পণ করিয়া যখনি সেই টাকার কথা পাড়িতেন অমনি গৃহিণী হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন—"কেন, তখন যে বড় দরদ জানিয়ে তীর্থ করতে নিয়ে যাওয়া হল। তখন বুঝি টাকার কথা মনে ছিল না? সে মুখপোড়ার বা কি আক্কেল! টাকার আণ্ডিল—এই পঁচিশটে টাকা দেবতা ব্রাহ্মণ বলে ছাড়তে পারে না?" অথচ কোনও মাসে যে সেই বন্ধুকে পাঁচটা টাকা দিয়া পঁচিশটা টাকা গৃহিণীকে দিবেন সে ভরসাও হইত না। ফলে এইরূপে অদ্যাবধি ছয় মাসে দেনা শোধ হইল না।

ছয়মাস পরে হঠাৎ একদিন বন্ধু টাকাটা চাহিয়া বসিলেন. কারণ গৃহিণী উক্ত বন্ধুকে টাকার আণ্ডিল বলিয়া অভিহিত করিলেও তিনি মোটেই তাহা ছিলেন না। মাসীমার স্বামী তখন বড়ই লজ্জিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"দেখ ভাই, প্রায়ই ভাবি টাকাটা দেবো অথচ দেবার সময় ভুলে যাই। কাল আমি দিয়ে আসবই।" গতকল্য মাহিনা পাইয়াছিলেন তাই একটু ভরসাও ছিল।

বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর নিকট বলিলেন, "দেখ তোমার হাতে যে টাকা জমা আছে তা থেকে আমায় ২৫টা টাকা দাও। নরেন বাবুর টাকাটা কাল দেবই দেব বলে এসেছি। অনেক দিন হয়ে গেল।"

স্ত্রী একেবারে অগ্নি হইয়া উঠিলেন। হাত মুখ উলটাইয়া বলিলেন—"কার মাথা রক্ষে করতে কাশী গিয়েছিলে শুনি? আর গয়ায় গিয়ে কি আমার মা বাপের পিণ্ডি দিয়ে এলে?"

বেচারার এটুকু সাহস হইল না যে বলেন, যাহার টাকা তাহার বাপের পিণ্ড দিতেই তিনি গিয়াছিলেন। রাত্রে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন—"সবটা না হয় দশটা টাকা দেও। আসছে মাসে কোনওখান থেকে হাওলাৎ বরাৎ করে বাকী টাকাটা যোগাড় করে নেব।" স্ত্রী পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলেন, "এক কথা এক-শ বার ভাল লাগে না ছাই। এখন থাম। কাল ত আবার সকালে উঠে পিণ্ডি সিদ্ধ করতে হবে। একটু ঘুমুতে দাও।"

রাত্রে কিছু সুবিধা হইল না। সকাল হইল তবু টাকার যোগাড় হইল না। অবশেষে যাইবার পূর্ব্বে তিনি স্ত্রীকে বলিলেন, "তাহলে অন্ততঃ পাঁচটা টাকা দাও, নইলে যে আর মুখ দেখাতে পারব না।"

ইহার উত্তরে স্ত্রী এমন একটা উত্তর দিল যে তাহা শুনিয়া স্বামী একেবারে স্তব্ধ হইয়া ঘরের ভিতর ফিরিয়া গেলেন। ঘরের তাকের উপর গৃহিণীর নিত্য সেব্য অহিফেন একটা কৌটায় থাকিত। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই কৌটার ভিতরকার ভরিটাক অহিফেন তৎক্ষণাৎ উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়া চুপটি করিয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিলেন। খুব যখন যন্ত্রণা আরম্ভ হইল তখন ছেলে স্কুলে। গৃহিণী আসিতেই সব কথা খুলিয়া বলিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, এখন হাউমাউ করিলে পুলিশ ডাক্তার সব ডাকিতে হইবে. কাল অন্ততঃ শ'খানেক টাকায় ঘা পড়িবে।

যন্ত্রণার মধ্যেও ভদ্রলোকের ভয় হইতেছিল, যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যান, তবে জেলে গিয়া পাথর ভাঙ্গিয়া দিন কাটাইতে হইবে।

ডাক্তার ও পুলিশের কথায় গৃহিণী একেবারে চুপ। তবে স্বামীদেবতা আঁখি মুদিবার আগে তাঁহাকে দিয়া দেবরের নামে অতি কষ্টে একখানি চিঠি লিখাইয়া লইলেন, যেন তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও পিতৃহীন পুত্রের জন্ম সে মাসে মাসে অন্ততঃ ১৫টা করিয়া টাকা পাঠায়। ইহার কিছু পরেই স্বামী ভব-কারাগার হইতে চিরদিনের মত মুক্তিলাভ করিলেন।

তখন গৃহিণীর চিৎকারে সমস্ত পাড়া নিনাদিত হইয়া উঠিল। এবং পাড়ার ভদ্রলোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সমস্ত অবগত হইয়া শীঘ্র শবদেহ সংকার করিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাষ্ট্র হইল মতি বাবুর হঠাৎ হৃদ্রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

পাড়ার আত্মীয় বন্ধু আগত হইলে মাসী ঠাকুরাণী এমন চীৎকারে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে এমন করিয়া বলিয়াছিলেন—"ওগো তুমি যে এমন দাহ করার পয়সাটী পর্য্যন্ত রেখে যাওনি, আমি এখন একটা অপোগণ্ড ছেলে নিয়ে কি করব!" যে তাহার ফলে সকলে মিলিয়া শবদাহের খরচটা চাঁদা করিয়াই সম্পন্ন করিয়াছিল।

তার পর মাসী, স্বামীর ভ্রাতা ও আপনার ভ্রাতাকে সংবাদ দিয়া আনাইলেন এবং তাঁহারা আপন খরচে শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিয়া তুলিলেন।

মতি বাবুকে তাঁহার ভাই খুবই ভালবাসিতেন। তাঁহার কাছে যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শেষ হস্তাক্ষরের অন্তিম মিনতি উপস্থিত করা হইল, তিনি সজল চক্ষে বলিলেন —"বৌদিদি, তুমি দুঃখ কোর না, আমি মাসে মাসে তোমাকে ২০৲ টাকা পাঠাব। তার পর খোকা বড় হোক, ওকে আমি ভাল করে পড়াব।"

এইরূপে কুড়ি টাকার সংস্থান করিয়া মাসী তখন ভ্রাতার দিকে ঝুঁকিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, "এ বার দাদা আমাকে নিয়ে চল।"

দাদা ভগিনীকে বিলক্ষণ জানিতেন। ইঁহাকে লইয়া গেলে বাড়ীতে একদিনেই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে; অথচ ভগিনীকে পরিত্যাগও করিতে পারিলেন না। ইনিও বলিয়া গেলেন মাসে মাসে ১৫ টাকা করিয়া পাঠাইবেন।

ভগিনী চোখের জল ফেলিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "দাদা তুমি যদি টাকা বন্ধ কর, দুটোর হাত ধরব, বাড়ীতে চাবি লাগাব, আর ছুম্নি গিয়ে উঠব। আর আমার কে আছে?" ইত্যাদি।

এই হিসাবে মাসীমার বিধবা হওয়ার ৫ টাকা আয় বাড়িয়াছিল ও প্রায় ১০ টাকা খরচ কমিয়াছিল। গড়ে ১৫ টাকার সুবিধা হইয়াছিল। আর একটা সুবিধা হইয়াছিল, ভবানীপুরের এই বাড়ীটা দুই ভাইয়ের পৈতৃক বাটী। বড় বধূর উৎপাতে মতিবাবুর ছোট ভাই সপরিবারে কলিকাতার ভাড়াটে বাড়ীতে উঠিয়া যান। দুই ভ্রাতার দেখাশুনা হইত, তা এখানে নয়। হয় আফিসে, নয় ছোট ভাইয়ের বাড়ীতে। বিধবা বড় বধূ বাড়ীর কথা তুলিলে তিনি বলিয়াই ছিলেন, "আমার অংশের কথা তুলবেন না, ও আমি কানাইকে দিলাম।" কানাই বা নুটু মাসীর বালক পুত্র।

এহেন মাসীম, বাড়ীতে হঠাৎ অশোক ও অনুপ্রভাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। প্রথমটা ভাবিলেন, কলিকালের ছেলে, বলা যায় না, হয়ত বা এই বয়সেই একটা উপদ্রব জুটিয়েছে!

অনুপ্রভা যে অশোকের বিবাহিতা স্ত্রী এটা তিনি চট করিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কারণ দূর সম্পর্কের মাসীমা হইলেও এটুকু বিশ্বাস তাঁহার ছিল যে, সরস্বতী তাহার ছেলের বিবাহে তাঁহাকে ফাঁকি দিবে না এবং সে যে রকম সাদাসিদে মানুষ, তাহাতে অশোকের বিবাহে গেলে সরোর কাছ হইতে অন্ততপক্ষে মাস দুয়েকের খোরাক যোগাড় না করিয়া ছাড়িবেন না। শেষে যখন অশোকের নিকট সব কথা শুনিলেন তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

"হাঁরে অশোক, বলিস্ কি! একেবারে ঘোর কলি!

বাপকে বলা নেই, মাকে কহা নেই, আমি একটা ছেঁড়া মাসী এক পাশে পড়ে আছি আমাকে একটা খবর দেওয়া নেই—একেবারে সাহেবদের মত মেমসাহেব নিয়ে হাজির!" বলিয়া মাসী একবার অশোক আর একবার অনুপ্রভার পানে চাহিলেন। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে অশোক ও অনুপ্রভা দুজনকেই মাথা নীচু করিতে হইল।

তার পর একটা আপোষ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে মাসীমা কহিলেন, "তা করেছিস করেছিস, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি সরোকে যে ছেলে বৌ নিয়ে আমি যাচ্ছি, বৌভাতের যোগাড় কর।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অশোক বলিল, "না মাসীমা, সে চেষ্টা বৃথা। আমি বাবাকে চিঠি লিখেছিলাম, তিনি আমাকে আর কখনও বাড়ী যেতে বারণ করেছেন।"

এ সংবাদে মাসীর বোনপোর প্রতি আকর্ষণ অনেকটা কমিয়া গেল। তখনি একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে যা হয় হবেখন। ছেলের ওপর বাপ মায়ের রাগ থাকে? তুমিও যেমন! তা দেখ, বৌমার বাপের কিছু পেয়েছ টেয়েছ তো? গায়ে ত কিছু দেখছি নে! সব বুঝি নগদ পেয়েছিলে?"

অশোক হাসিয়া বলিল, "না মাসীমা, বাপ মা তো নেই, নগদ কোত্থেকে আসবে?"

এবার মাসীমার সত্যই রাগ হইল। "হ্যাঁ, সরোর উপযুক্ত ছেলে বটে, সেও যেমন বোকা, লেখাপড়া শিখে তুমিও তাই। নইলে বিষয় নেই আশয় নেই এই রূপের ধোচন ধেড়ে মেয়েকে কোন্ পুরুষ ব্যাটাছেলে বে করে?"

মাসীমা একেবারে সাত হাত বসিয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যদি কিছু টাকাকড়ি হাতে করিয়া আসিয়া থাকে, মাসখানেক থাকে থাকুক, তাহাতে লাভ বই লোকসান নাই। কিন্তু গাঁট হইতে খরচ করিতে উহাদের খাওয়াইতে হইবে ইহা তিনি ভাবেন নাই।

মাসীমাকে প্রারম্ভেই ঐরূপ ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অশোক বলিল, "মাসীমা তোমাকে কোন বিপদে ফেলব না, ভয় নেই। আমি চাকরি বাকরির চেষ্টায় আছি। আমার কাছেও নিজের গোটাকতক টাকা এখনও আছে। শুধু তোমার বাড়ীতে দিনকয়েক থাকব এই কষ্টটুকু তোমাকে সহ্য করতে হবে।"

বলিয়া পকেট হইতে দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মাসীমার নিকট রাখিল।

মাসীমা তাঁহার ছোট ছোট চোখদুটা একবারে কপালে তুলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে অশোক, তুই শেষটা গরীব বলে আমায় এমন অপমান করলি? আমি টাকার জন্যে এ সব বল্‌ছি তুই ভাবলি?"

অশোক বিপদগ্রস্ত হইয়া বলিল, "না মাসীমা তা নয়। আমাদেরই তো তোমায় দেবার কথা। ছেলে যদি মাকে কি মাসীকে কিছু দেয় সে কি তাঁরা গরীব বলে?"

আগুনে জল পড়ার মত মাসী তৎক্ষণাৎ নরম হইয়া পড়িয়া বলিলেন, "তা দিবি বৈকি বাবা! জন্ম জন্ম দে। মা মাসী কি ভেন্ন, পর? কথায় বলে মা আর মাসী।"

বলিয়া মাসী নোট দুইখানা বেশ ভাল করিয়া অঞ্চল প্রান্তে বাঁধিয়া রাখিলেন।

একটু ভাবিয়া পরে আবার বলিলেন, "তোদেরই ঘর বাড়ী, তোরা থাকবি তার আবার কথা? তা একটা চাকরি বাকরি ঠিক কর্। বৌকে নিয়ে এখানে থাক না যতদিন ইচ্ছে। তোর মেসো তো ভাসিয়ে গেল।"

এইরূপে অশোক কিছুদিনের জন্য সস্ত্রীক মাসীমার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

বৈদেশিকী

যুদ্ধের প্রকৃতি ও নিদান

"War: its nature, cause and cure" by G. L. Dickinson, author of "The Letters of John Chinaman", "The European Anarchy" etc. 1923.

উপরোক্ত গ্রন্থখানির মূলসূত্র এই—মানুষ যদি যুদ্ধ করিতে বিরত না হয়, তাহা হইলে মানববংশ যুদ্ধের কবলে লুপ্ত হইবে। ("If mankind does not end war, war will end mankind.")।

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব সমর-সচিব মেজর-জেনেরল সীলী বলিয়াছেন যে, বিষাক্ত গ্যাস দিয়া একলক্ষ লোক মারিবার জোগাড়যন্ত্র ও খরচা সামান্যমাত্র, এবং খুব মারাত্মক গ্যাস তৈয়ারি করা ব্যয়সাধ্য নহে। মার্কিন বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসন বলিয়াছেন যে, বিষাক্ত গ্যাস দিয়া বিশাল লণ্ডন সহরের সত্তর লক্ষ নরনারীর প্রাণনাশ করিতে মাত্র তিন ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই মানুষ-মারা ফাঁদ যেরূপ ক্ষিপ্রগতিতে পাতা হইতেছে, উড়ো জাহাজ, বোমা, টর্পিডো, স্ফোটন-ধর্ম্মী পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতির ধ্বংস-সামর্থ্য যেরূপ দিন দিন বাড়িতেছে, তাহাতে যুদ্ধের ফলে সভ্যতার নিদর্শন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে। ("War now means extermination of civilisation.")।

নিজের রাজ্য ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অপরের রাজ্য ও প্রভাব খর্ব্ব করিতে হইলে, সৈন্য, কামান, রণতরি প্রভৃতির প্রয়োজন। পররাজ্য-লোলুপতার ভদ্রনাম ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম বা বাদসাহীগিরি। ইহার ফলে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ, এসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ ও আমেরিকার কিয়দংশ, য়ুরোপীয় কয়েকটী জাতির অধিকৃত হইয়াছে। ইহার জন্য পৃথিবীর শত শত স্থল লক্ষ লক্ষ নির্দোষ লোকের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে। ("The real cause of war is the desire of all States to hold what they have and to take what belongs to others.")।

আত্মরক্ষা ও পরস্বলুণ্ঠন এই দুই প্রয়োজনে সকল রাজ্যই যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত। ("For this double reason of defence-offence States have armed.")। এক রাজ্যে গোলাগুলি, কামান, টর্পিডো বাড়িতেছে দেখিলেই পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলি ঐ সব বাড়াইতে থাকে—ভয়, যদি প্রবল প্রতিবেশী ঘাড় মটকাইয়া দেয়। ভিতরে ভিতরে সকল রাজ্যই অবিশ্বাসের মন্ত্র জপিয়া, ঈর্ষার আগুনে পুড়িয়া, চুপি চুপি চাল মারিতে ও দল পাকাইতে থাকে। এই চুপি চুপি চাল মারা ও দল পাকানর নাম পররাষ্ট্রনীতি (Foreign policy) বা মন্ত্রণাকৌশল (Diplomacy)। যুদ্ধের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, দল বাঁধিয়া, দাঁও কসাকসির নাম, শান্তি রক্ষার্থ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। ("If you want peace, prepare for war.")। কিন্তু চোক টেপাটিপি করিয়া বেশী দিন চলে না; আগুন লইয়া খেলিতে খেলিতে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়া যায়। ("War becomes inevitable, precisely beeause every one is fearing it and preparing for it.")।

লোভোন্মত্ত হইয়া দুর্ব্বলের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেছি ইহা স্বীকার করা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুমোদিত নহে। অসভ্যদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তার, অশিক্ষিতের মধ্যে জ্ঞানরত্ন বিতরণ, দুর্ব্বল জাতিকে ক্রমশঃ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করা, এই সব বুলি কপচাইয়া, য়ুরোপবাসীকে বক-ধার্ম্মিক সাজিতে হয়। এইরূপ অসত্য ও ভণ্ডামি প্রচারের প্রধান উপায় সংবাদপত্র। ("Force and fraud are two

sides of one medal. The Press is the obverse of the gun—the one kills the body, the other the soul.")।

পুস্তকের একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের মধ্যে, আধুনিক যুরোপের গত পঞ্চাশ বৎসরের কপটতা, রেষারেষি ও যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানির কাছে ফ্রান্সের দর্প চূর্ণ হইলে, যে বিদ্বেষ-বাত্যা এতকাল লণ্ডন হইতে প্যারিসের দিকে ধাবিত হইত, তাহা বার্লিনাভিমুখ হইল। ফ্রান্স প্রাণের দায়ে রুসিয়ার দ্বারস্থ হইয়া তাহার বন্ধুত্ব-প্রার্থী হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্ম্মানির বাণিজ্যতরি ও রণতরির বহর দেখিয়া, ইংলণ্ড তাহার রাজনৈতিক বন্ধুত্বের জন্য হাত বাড়াইল, কিন্তু ভবি ভুলিল না। ইংরাজ ফরাসীকে বুঝাইল যে, ইংলণ্ডের মিসরে প্রেম বিলাইবার পথে যদি ফ্রান্স প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়, তাহা হইলে মরক্কোকে ফ্রান্সের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে ইংলণ্ড কোনও বাধা দিবে না। ঐ দুই গভর্মেণ্টে এক গুপ্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল—তাহাতে স্থির হইল যে যদি জার্ম্মানির সহিত যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে ফরাসী রণতরি ভূমধ্য সাগর পাহারা দিবে, এবং ইংরাজ তথা হইতে নিজের রণতরি সরাইয়া, আটলাণ্টিক মহাসাগর ও উত্তর সাগর আগলাইয়া রাখিবে। কৃষ্ণসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরে আসিবার পথটী নিরাপদ করিবার জন্য রুসিয়ার বহুকালের ইচ্ছা। তুরস্ক ঘাটি আগলাইয়া আছে—তাহাকে কাবু না করিলে উহা সফল হয় না। এড্রিয়াটিক সমুদ্রে প্রভাব বিস্তারের জন্য বসনিয়া, মণ্টেনিগ্রো, এলবেনিয়া প্রভৃতি প্রদেশের টিকি বাঁধা অষ্ট্রিয়ার পক্ষে আবশ্যক। অষ্ট্রিয়ার মুরুব্বি জার্ম্মানি। কৃষ্ণ সাগর ও ইজিয়ান সাগরে প্রভুত্ব ব্যাপ্তির জন্য রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতিকে দলে টানা রুসিয়ার প্রয়োজন। কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক রক্তারক্তির পর তুরুস্ক ধরাশায়ী হইল—রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া প্রভৃতি "যুরোপীয় তুরুস্কের" অন্তর্গত প্রদেশগুলি স্বাধীন হইল। যুরোপের রাজনৈতিক দাবাখেলার ছকে নূতন রকমের বড়ে সাজান হইল। তুরুস্ক এইবার জার্ম্মানির হাতের মুঠার মধ্যে গিয়া পড়িল। ১৯০৪ সালে জাপানের কাছে পর্য্যুদস্ত হইয়া, রুসিয়ার গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হয়। যুরোপ ও এসিয়ায় সকল দরজা বন্ধ দেখিয়া, রুসিয়া ইংলণ্ডের সহিত পুরাতন শত্রুতায় ধামা চাপা দিল। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইংলণ্ড ফ্রান্স রুসিয়া এক দল, জার্ম্মানি অষ্ট্রিয়া তুরুস্ক: অন্য দল। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইটালী জার্ম্মান-ভক্ত ও অষ্ট্রিয়াদ্বেষী ছিল। যুদ্ধ বাধিলে ইটালী জার্ম্মানির বিপক্ষ হয়।

লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ও সম্পত্তি লইয়া যাঁহারা খেলা করিয়াছেন, যুরোপের সেই সকল রাজনৈতিক ও সামরিক পাণ্ডাদের সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য নিজেদের অধিকৃত দেশের সীমা বর্দ্ধন, স্বজাতির ক্ষমতা ও বাণিজ্য বিস্তার, এবং ন্যাকা সাজিয়া নিজেদের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ কুকার্য্যের সমর্থন। ("Statesmen and soldiers and sailors and all who really determine policy...consider, at every crisis, whether it is or is not worth while to have a war, for the sake of power or territory or markets; and they then paint the moral camouflage, so that the situation may look well for their country.")। ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ, দুর্ব্বলের রক্ষাকল্পে সংগ্রাম, এ সকল ভণ্ডের উক্তি। যুরোপের দুই দলই নিজের বেলা পাঁচ কড়ায় ও পরের বেলা তিনি কড়ায় গণ্ডা গুণিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এই খেলায় জার্ম্মানি ও রুসিয়ার জিত ছিল; মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের চালমাত করিয়াছে।

রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার মন্তব্য করিয়াছেন যে, অন্যদেশে চালবাজী ও অত্যাচার করিয়া নিজেদের যে অধঃপতন হয়, স্বজাতি-বিগ্রহ বা গৃহবিদ্রোহ তাহার

অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ("The demoralisation caused by foreign war is the readiest cause of Civil war.")।

গ্রন্থকার দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে কোনও রাজ্য কিছুকাল ধরিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিলেই তাহার মাথা গরম হয়—সে আসেপাশে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। পারস্যের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া এথেন্স ও স্পার্টা, মূরদিগকে পরাজিত করিয়া স্প্যানিয়ার্ড, ইংরাজের কবল হইতে মুক্ত হইয়া ফরাসী, অষ্ট্রিয়ানদের পরাভূত করিয়া ইটালিয়ান, সকলেই অপরের স্বাধীনতা হরণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। ('It is a commonplace of history that no sooner has a State liberated itself from oppression than it starts out to oppress others.")।

পররাজ্য-লোলুপতা কমিলেই যুদ্ধের প্রধান কারণ অন্তর্হিত হইবে। যতদিন য়ুরোপীয় জাতিরা আফ্রিকা ও এসিয়ায় জবরদস্তি করিয়া অধিকার স্থাপন করিবে, ততদিন মুড়ুলি ও ভাগাভাগি লইয়া তাহাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি চলিবে। ("So long as the ownership of African and Asiatic territory is regarded as a pecuniary or military advantage to the owning State, so long will competition for these territories be a cause of war.")।

স্বদেশ-প্রীতির দোহাই দিয়া মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়াছেন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা। তাঁহারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, মনুষ্যবংশ ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহারা বোমা, টর্পিডো, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিবেন না, তাহা হইলে যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা যদি স্বজাতি-পক্ষপাতিতার ঠুলি পরিয়া,অসত্য ও দম্ভের তুলিতে আঁকা, ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান বা ইটালিয়ান ইতিহাস ছাড়িয়া, মনুষ্যজাতির তরফ হইতে লেখা মানবের ইতিবৃত্তের জন্য আস্থা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে যথার্থ ইতিহাস রচিত হইতে আরম্ভ হয় ও ইতিবৃত্ত পাঠ সার্থক হয়। ("What we want is the history of Man, written from the standpoint of Man.")।

শ্রীগৌরহরি সেন।

সাঁচি

সাঁচি যাইতে হইলে ইটার্সিতে (Itarsi junction) গাড়ী বদল করিয়া জি-আই-পি রেলওয়ের বম্বে আগ্রা দিল্লী লাইনে যাইতে হয়। এই জংশন হইতে সাঁচি ৮৫ মাইল দূরে; ষ্টেশনটা ক্ষুদ্র—ভূপাল ষ্টেটের অন্তর্গত। মেল অথবা এক্‌সপ্রেস গাড়ী সাধারণতঃ থামে না—তবে পূর্ব্বে ইটার্সি অথবা ভূপালের ষ্টেশন মাষ্টারকে সংবাদ দিলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে নামাইয়া দেয়, ও তুলিয়া লয়।

আমরা যখন ইটার্সিতে পৌছিলাম তখন রাত্রি সওয়া নয়টা। রাত্রি ২-৫২ মিনিটে পঞ্জাব মেইল ধরিতে হইবে। আমাদের টিকিট বরাবর বম্বে পর্য্যন্ত ছিল। নূতন লাইনের জন্য টিকিট করা বাকি ছিল। নটবহর লইয়া আমরা ওয়েটিংরুমে আশ্রয় লইলাম। একটী সোফা পূর্ব্বেই একজন শ্বেতাঙ্গ যাত্রী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। বাকীটি সত্য ও গোকুল বাবু অধিকার করিয়া দেহ বিস্তার করিলেন—আমি ইজিচেয়ারখানি দখল করিলাম। প্রায় রাত্রি বারোটার সময় জাগিয়া দেখি ঘরটা নিনাদিত হইতেছে—মূর্দ্ধণ্য 'ষ' (বৈয়াকরণগণ

অবশ্য মার্জ্জনা করিবেন) এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। সেই তানলয়বিশুদ্ধ নাসিকাগর্জ্জন একান্ত উপভোগ করিলাম। তবে 'কালা' হারিল, না 'ধলা' হারিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। আমাকে টিকিট করিতে হইবে সুতরাং জাগিয়া থাকিতে হইল। টিকিট করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে আমাদের সাঁচি গমনের অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি বলিলেন—সারথি যথা সময়ে গাড়ী থামাইয়া দিবে—কোনও চিন্তা নাই।

প্লাটফর্ম কাঁপাইয়া মেল আসিয়া পড়িল। তথনও কিন্তু বন্ধুরা 'প্রতিযোগিতা' ফলাইতেছেন! তাঁহাদিগকে জাগাইয়া দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মুখে আসিলাম —ভিতরে যাঁহারা বসিয়াছিলেন কিছুতেই উঠিতে দিবেন না। সঙ্গে বারো তেরটা জিনিষ। সত্য ও গোকুল বাবুর দেখা নাই। সদ্য সুপ্তোত্থিত সত্যবাবু বাথরুমের দিকে পঞ্চনদগামী রথের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন —গোকুল বাবু তাঁহার ভ্রম নিরসনে ব্যাপৃত ছিলেন। আমি এ দিকে মরি! কোনও রকমে অর্দ্ধেক জিনিষ প্রবেশ করাইয়াছিলাম—বন্ধুরা আসিয়া পড়াতে সব সুরাহা হইল। যাত্রীদিগের বিরক্তির সীমা রহিল না। প্রথমতঃ আমাদের জিনিষপত্রের উপর বসিলাম,—পরে Settled fact দেখিয়া সহৃদয় যাত্রিগণ একটুকু করিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিলেন।

গাড়ী ভুঁপালে আসিতে চা-ষ্টলে গেলাম; সেখানে আর একটি মাত্র নেশাখোরকে দেখিলাম—মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু বামন ভীম মেঘকৃষ্ণ জনৈক ফিরিঙ্গি। তাড়াতাড়ি গিলিতেছি দেখিয়া বলিল—"অত তাড়া কেন, বাবু? আর এক পেয়ালাও ইচ্ছা করিতে পার।" আমি মনে মনে বলিলাম—"বুঝিবে কি তুমি ফিরিঙ্গি আমার ব্যথা?" প্রকাশ্যে বলিলাম গাড়ী পলাইলে যে প্যাজ পয়জার হইবে! তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া সে বলিল—("Lud, who starts the train, I' d like hear! I'm the driver. But who wanted me to stop at Sanchi, can yon tell?" (বলি, গাড়ী ছাড়ে কে-টা শুনি? আমি হলাম ড্রাইভার! কিন্তু বলতে পার কি আমাকে কার জন্যে সাঁচিতে গাড়ী থামাতে হবে?") হাসিয়া বলিলাম—"আমাদের জন্য। সাহেব, গাড়ীটা যেন খানিকক্ষণের জন্যে থামে—জিনিষটিনিষগুলো নামিয়ে নিতে পারি।" সাহেব বলিল—"সব ঠিক হবে। তোমাদের নামানো হলে গাড়ী ছাড়বো।" দেখিলাম লোকটা ভাল।

সালামাতপুর ষ্টেশন ছাড়িয়া কিছুদূর আসিতেই স্তূপ দৃষ্ট হইল; তরল কুয়াসায় মনে হইল যেন খুব পাতলা চাদর ঢাকা রহিয়াছে। সাঁচি ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামিল। আমরা সমস্ত জিনিষপত্র নামাইবার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

চতুর্দ্দিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। সূর্য্যদেব সেই মাত্র পূর্ব্বাশা রঞ্জিত করিয়া উদিত হইতেছেন। মাঝে মাঝে পাহাড় হইতে কেকাধ্বনি আসিয়া শ্রুতিসুখ জন্মাইতেছে। সে কেকা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, কেমন একটা উদাসভাবের সৃষ্টি করে। কেকা শ্রবণ এ নূতন নয়—আসামের বনপ্রদেশে শত শত ময়ূরের অবিশ্রান্ত কেকা শুনিয়াছি। ইহাতে কিন্তু সে মত্ততা নেই। অতীতের কত স্মৃতিই না এই স্থানটীর সহিত মিশাইয়া রহিয়াছে। অদূরে প্রাচীন বিদিশা। পরম ভাগবত গ্রীক হেলিওডোরাসের তীর্থভূমি এই সেই বিদিশা।১ মৌর্য্যকুলরবি অশোকের—প্রথম যৌবন-বিকশিত প্রেমের লীলাস্থল এই সে বিদিশা।২ বিরহী যক্ষের মর্ম্মগাথার কবি কালিদাস বর্ণিত এই সে বিদিশা।

১। তক্ষশিলার নরপতি গ্রীক-আণ্টিয়ালকিডাস হেলিওডোরস নামক দূতকে বিদিশাধিপতির নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই হেলিওডোরস বাসুদেবের উপাসক ছিলেন, এবং তাঁহার উদ্দেশে একটা সুন্দর মর্ম্মর স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরে কয়েকজন বিদেশীয়, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু দেবতাকে উপাস্য বলিয়া, গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। সিংহলদেশের ইতিহাস গ্রন্থ মহাবংশে লিখিত আছে যে যুবরাজ অশোক উজ্জয়িনীর উপরাজা হইয়া যাইবার কালীন বিদিশায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তথাকার জনৈক শ্রেষ্ঠীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বিবাহে সন্তান—পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা। ইঁহারা সিংহলকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।
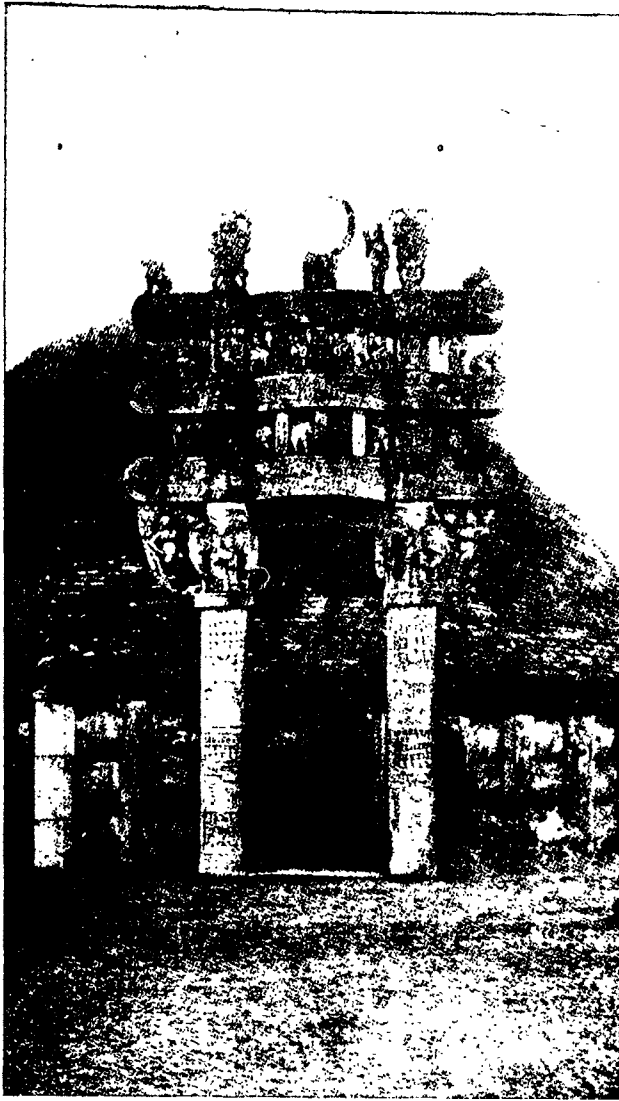
প্রধান স্তূপের উত্তর তোরণ

তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি॥

শুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠাতৃ পুষ্যমিত্র-পুত্র অগ্নিমিত্রের রাজধানী, 'মালবিকা' স্মৃতিশুচি এই সেই বিদিশা।[৩] হায়, কোথায় সে দশার্ণের রাজধানী দিক্‌প্রথিতা বিদিশা, আর কোথায় আজিকার ভিলসা; কোথায় সে চলোর্ম্মি বেত্রবতী, আর কোথায় আজিকের শীর্ণকায়া অপগতজোয়া বেতোয়া।

ষ্টেশনের অতি নিকটেই একটা ক্ষুদ্র শৈল, তাহার উপর স্তূপ। ষ্টেশন হইতে বরাবর একটা পথ চলিয়া গিয়াছে। মিনিট সাত আট হাঁটিলেই পাহাড়ের নীচে পৌঁছান যায়। রাস্তার দুই পাশে ছোট ছোট [illegible] গাছ রোপণ করা হইয়াছে। ইহা বামদিক দিয়া সাঁচি গ্রামে গিয়াছে। এই গ্রামের নামেই স্তূপের নামকরণ হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে আমাদের পথ —পাথরের 'ব্লক' দিয়া বাঁধান। স্যর জন মার্শাল (Director General of Archaeology in India) ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই পথটি নূতন করিয়া সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। [illegible] বাবুর 'দেখেগো' [illegible] বুঝিয়া একবার চোখ দিয়া [illegible] আমরা একটা ছায়াবহুল গাছের তলে বসিয়া চতুর্দ্দিকের [illegible] দেখিলাম। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় যেন ইহাকে ঘিরিয়া আছে। [illegible] পরে আমরা উত্তর পশ্চিম দিক দিয়া চত্বরে প্রবেশ করিলাম, চত্বরটি পাথরের প্রাচীর দিয়া [illegible] বেষ্টিত। দুইচারি কদম আসিয়াই প্রধান স্তূপের উত্তর তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

৩। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নামক নাটকে দেখিতে পাই যে পুষ্যমিত্র রাজসূয় যজ্ঞে ব্রতী হইয়া অগ্নিমিত্রকে এই পত্র লেখেন "স্বস্তি যজ্ঞশরণাৎ সেনাপতিঃ পুষ্যমিত্রো বৈদিশস্থং পুত্রমায়ুষ্মন্তমগ্নিমিত্রং স্নেহাৎ পরিষ্বজ্যানুদর্শয়তি ......"

স্তূপের তাৎপর্য্য কি সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। প্রাচীন কালে চক্রবর্ত্তী রাজা, আভিজাত্য সম্পন্ন ব্যক্তি, ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ, বিখ্যাত রাজপুরুষ এবং সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেশকের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের শব দাহ করা হইত এবং সেই চিতাভস্ম অথবা শরীরের কোনও ধাতু—যথা নখ দন্ত অস্থি—মৃত্তিকার স্তূপের নীচে সংরক্ষিত হইত। মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে দেখা যায় যে বিশিষ্ট ব্যক্তির স্তূপ চতুষ্পথে স্থাপিত হইত। এই স্তূপ শব্দ হইতে পালি 'থূপ' শব্দ হইয়াছে—এবং ইংরাজীতে তাহা Topeএ পরিণত হইয়াছে যথা Sanchi Topes, Bharhut tope, Ahin posh tope ইত্যাদি। ইহারই অপর নাম 'ডাগব' অর্থাৎ ধাতু-গর্ভ। সিংহলদেশে অনেক ডাগব দেখা যায়—যথা কেলানিয় ডাগব, রুবণবেল ডাগব, থূপারাম ডাগব ইত্যাদি। তিব্বতে এইরূপ chorten আছে (Waddel's Lhassa and its Mysteries দ্রষ্টব্য।) বৌদ্ধদেশ মাত্রেই এইরূপ অন্তিমের স্মারক চিহ্ন দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে শবদেহ অথবা তাহার কোন অংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইত—শুধু ভারত নহে জগতের সকল দেশেই। অতএব এই স্তূপ বৌদ্ধগণের নিজস্ব বৈশিষ্ট নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম উত্থানের সময় লক্ষ্য করা যায় যে, এই স্মৃতিচিহ্নকে স্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে শুধু মৃত্তিকাস্তূপ অথবা পাথর মাটী মিশান ঢিবির পরিবর্ত্তে ইটের চলন হইয়াছিল। পরে যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, যাঁহারা সমাজের আবর্জ্জনা দূর করিয়া তাঁহার সংস্কার করিয়াছিলেন, যাঁহারা নূতন চিন্তার ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, যাঁহারা জীবন-রহস্যের বিচিত্র সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন—ভক্তের উপকূলের পূজার্চ্চনার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের স্মৃতি লইয়া নানা স্তূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল। মুখ্যতঃ মৃতব্যক্তির দেহাবশেষের ৪ উপর স্তূপ নির্ম্মিত হইলেও,গৌণতঃ ধর্ম্মো-

দক্ষিণ তোরণ—ছদ্দন্ত জাতক

৪। বুদ্ধদেবের শরীরধাতু লইয়া মগধরাজ অজাতশত্রু স্তূপ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। বিমানবত্থু পরমাত্থদীপনী (P. T. S) পৃঃ ২০০ দ্রষ্টব্য-"ভগবতি পরিনিব্বুতে রঞ্ঞো অজাতসত্তুনা অত্তনা পটিলদ্ধা ভগবতো শরীরধাতুয়ো গাহেত্বা থূপ চ মহে চ

পদেষ্টার জীবনের কোনও বিশিষ্ট ঘটনার স্মারক হিসাবেও স্তূপ নির্ম্মিত হইত।

বোধ করি প্রথমে ধাতুর উপরে প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকা-দ্বারা স্তূপ নির্ম্মিত হইত এবং তাহা চুণ দিয়া পলস্তারা করা হইত। পরে সেই সময়ের বড় বড় ইট দিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করা হইত এবং সর্ব্বশেষে স্তূপের চতুর্দ্দিক কাঠের বেষ্টনী (রেলিং) দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইত। এই 'হর্ম্মিক' বেষ্টনী প্রস্তরেরও হইত। পরিশেষে স্তূপের শিরোভাগে প্রস্তরের ছত্র স্থাপিত হইত।৫

সাঁচির ইতিহাসটা একবার স্মরণ করিয়া লওয়া যাউক। স্যর আলেক্জাণ্ডার কানিংহাম তাঁহার Bhilsa Topes (1854) নামক পুস্তকে সাঁচি ছাড়া সোনারি, শতধারা, পিপলিয়, অন্ধের প্রভৃতি স্তূপের বর্ণনা করিয়াছিলেন—এই সব স্তূপই সাঁচির অনতিদূরে। তৎপরে মেজর কোল, বর্জেস, ফুশে, গ্রুণওয়েডল, গ্রিফিন' মেইসী ও স্যর জন মার্শাল তাহার বিবরণ নানা দিক দিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থকারের পুস্তক Guide to Sanchi সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও প্রামাণিক।

মহাকপি জাতক

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অনতিদূরে দশার্ণের রাজধানী দিক্‌প্রথিতা বিদিশা অবস্থিত। এই কোলাহলমুখর রাজধানী ছাড়াইয়া চতুষ্পার্শে শান্তজনপদ-সন্নিহিত রমণীয় শৈলচূড়ায় বৌদ্ধভিক্ষুকগণ মঠ ও স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভক্তেরাও অল্পায়াসে এইখানে আসিয়া তাঁহাদের ভক্তি নিবেদন করিতে পারিতেন। বুদ্ধগয়াতে বুদ্ধদেব সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, সারনাথে তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন; কুশীনগরে তিনি পরিনির্ব্বাণে

কতে রাজগহবাসিনী অঞ্ঞতরা উপাসিকা সত্থু থূপং পূজেস্সামীতি ইত্যাদি। V. V. A., V. 13. p. 259 দ্রষ্টব্য।

৫ হ্যাভেল সাহেব Tee বলিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তৎকৃত Study of Indo-Aryan Civilisation দ্রষ্টব্য।
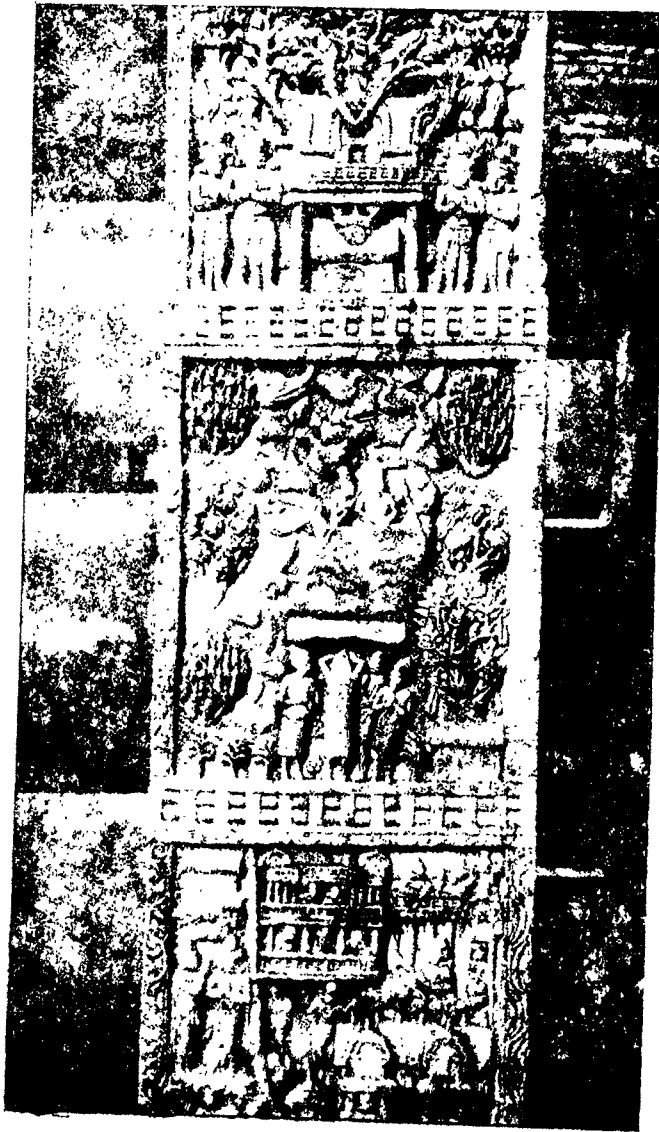
বুদ্ধদেব জলের উপর চলিতেছেন

প্রবেশ করিয়াছিলেন; সাঁচি এইরূপ ভাবে তাঁহার জীবন ও নির্ব্বাণের সহিত কোনও রূপে সম্পর্কিত নহে। বৌদ্ধ পরিব্রাজক চীনা ফা-হিয়ান অথবা হুয়েন-শাঙও ইহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। ফা-হিয়ান বর্ণিত 'শা-চি' রাজ্য সাঁচি নহে।

অশোকের সময় হইতে (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক) খৃষ্টাব্দ দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান ও পতন কাল ব্যাপিয়া, সাঁচির ইতিহাস নানা রাজবংশের আবির্ভাব তিরোভাব, ধর্ম্মের নানা বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন, শিল্প কলার নানাবিধ অবস্থার সহিত জড়িত। প্রথম যুগে ইহার নাম চেতি গিরি ছিল। মহাবংশে লিখিত আছে যে যখন অশোক উজ্জয়িনীর উপরাজ নিযুক্ত হইয়া তথায় যাইতেছিলেন, তখন বিদিশাতে তত্রত্য জনৈক শ্রেষ্ঠীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভজাত মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা পরে সিংহলকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বিদেশযাত্রার পূর্ব্বে মহেন্দ্র এই চেতিয় গিরিতে আসিয়া মাতার পাদবন্দনা করেন। এই মহীয়সী নারীই এইস্থানে একটী বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ইহাই সিংহলীয় কিম্বদন্তী। (ভারতীয় কিম্বদন্তী অনুসারে মহেন্দ্র অশোকের ভ্রাতা)।

সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির জন্য যে প্রযত্ন করিয়াছিলেন, তাহারা আবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এই সাঁচিতে তাঁহার জীবনকালে যে স্তম্ভ ও অন্যান্য স্মারকচিহ্ন রচিত হইয়াছিল, তাহাতেই প্রতীয়মান হয় তিনি ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের নিমিত্ত কিরূপ ব্যস্ত থাকিতেন। কথিত আছে যে তিনি বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ লইয়া চৌরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মিত করান। রামগ্রামের স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের নাগরক্ষিত দেহাবশেষ লইতে গিয়া তিনি বিপর্য্যস্ত হন। এই দৃশ্যটা দক্ষিণ তোরণের সম্মুখের দ্বিতীয় অধঃপ্রস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্তূপের উপরে দেবতারা মাল্যহস্তে রহিয়াছেন। দক্ষিণে রথারূঢ় অশোক অশ্ব বারণ-পদাতিক

পরিবৃত হইয়া স্তূপের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, বামে ফণিফণাধারী মানবমূর্ত্তি নাগ ও নাগী নানা উপচারে স্তূপের পূজা করিতেছেন। পূর্ব্ব তোরণের সম্মুখ দিকে নিম্ন অধঃপ্রস্তার দেখিতে পাই সম্রাট্ অশোক ও দেবী তিষ্যরক্ষিতা বোধিদ্রুমের অর্চনা করিতেছেন। দেবী তিষ্যরক্ষিতা ঈর্ষ্যাবশে অভিচার মন্ত্রে এই বোধিদ্রুমকে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইয়া সঞ্জীবিত করিয়া দেন। এই দৃশ্যে তিনি দ্রুমের আলবালে অম্বুসিঞ্চন করিতেছেন। এই অধঃপ্রস্তারের (architrave) দুই অন্তে ময়ূর লিখিত আছে—তাহা সম্ভবতঃ মৌর্য্যবংশের দ্যোতক।

[ইহারই উপরিভাগে আর একটা বোধিদ্রুমের সাহেব তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহা বুদ্ধদেবের মহাভিনিষ্ক্রমণ সূচিত করিতেছে। বামে কপিলাবস্তু (অনুরাধাপুর বা তাম্রলিপ্তি নহে); বৃক্ষটা জম্বু বৃক্ষ, বোধিদ্রুম নহে, ইত্যাদি; তৎকৃত Guide to Sanchi (পৃঃ ৬০, ৬১) এবং Plate v (a) দ্রষ্টব্য। অন্যান্য অংশেও বিরোধ দৃষ্ট হয়, যথা—Plate VI (c) এ লিখিত আছে—East gateway : Left pillar : front face. The miracle of Budhha walking on the Waters (চিত্রবস্তু নৈরঞ্জনার নদীর প্লাবন, কাশ্যপ শিষ্য ও মাঝি হইয়া বুদ্ধদেবের উদ্ধারার্থ ছুটিতেছেন; চংক্রমের দ্বারা বুদ্ধদেবের জলের উপর দিয়া গমন সূচিত হইতেছে।)
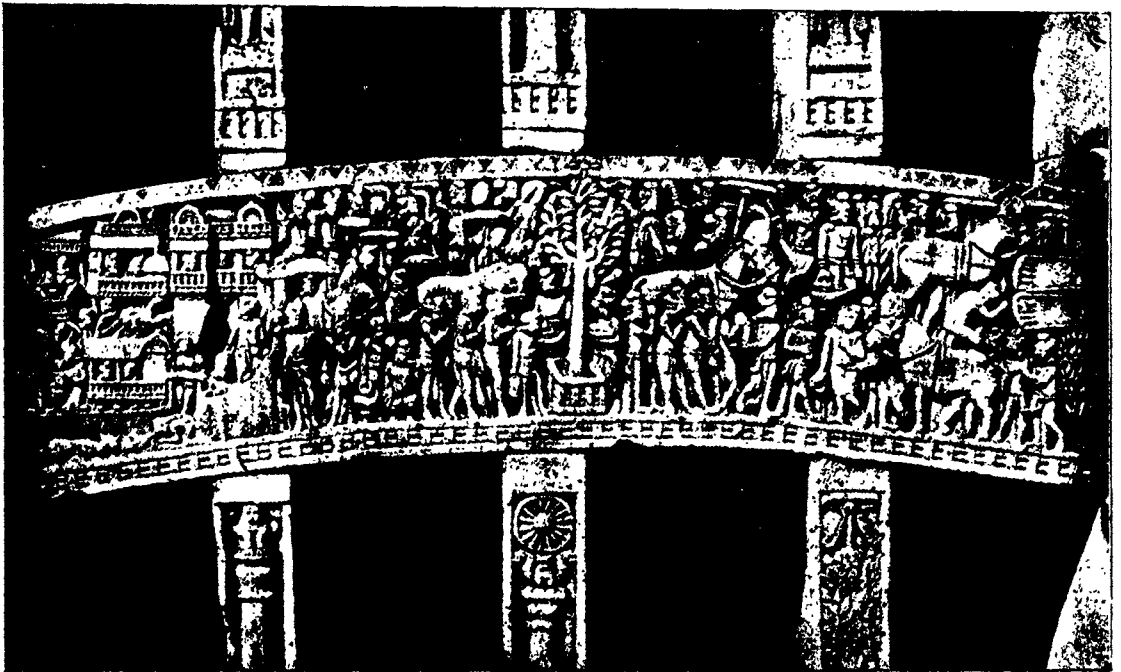
সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণ

প্রতিলিপি আছে, ময়ূর এবং সিংহও দৃষ্ট হয়। Rhy Davids তাঁহার Buddhist India নামক পুস্তকে (পৃঃ ৩০২) বলেন যে, সিংহলে যে বোধিদ্রুমের শাখা নীত হইয়াছিল, ইহা তাহারই সূচক। সিংহ হইতে সিংহল, ময়ূর হইতে মৌর্য্য বংশ লক্ষণায় বুঝিতে হইবে। মার্শ্যাল কিন্তু Cunningham তৎকৃত Bhilsa Tope এ বলিয়াছেন যে তাহা বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সূচিত করিতেছে, তীরদেশে দাঁড়াইয়া শিষ্যেরা বিলাপ করিতেছে, ইত্যাদি। নিকটে Bhilsa Topes পুস্তক নাই, পৃষ্ঠা সংখ্যা দিতে পারিলাম না।]

দক্ষিণ তোরণের সন্মুখে অশোক একটা বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মিত করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রায় ৪২ ফুট উচ্চ ছিল। ইহারই উপরে চারিটা সিংহমূর্ত্তি পরস্পর পিছু ফিরিয়া বসিয়া আছে। সিংহের প্রতিমূর্ত্তি এখন মিউজিয়ম গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। ১৯১৫ সালে যখন আমি সারনাথে যাই তখন খননের মধ্যে এইরূপ স্তম্ভ দেখিতে পাই। ভাস্কর্য্য সেকালে কত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন এই স্তম্ভে এবং এই সিংহ মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তম্ভ আগাগোড়া এত মসৃণ, তাহার পালিশ এত উৎকৃষ্ট যে তাহার সম্যক্ বর্ণনা চলে না। এই স্তম্ভের গাত্রে ব্রাহ্মী লিপিতে অশোকের অনুশাসন আছে -"যে ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী সঙ্ঘ বিরোধ জন্মাইয়া সঙ্ঘ ভিন্ন করিবার প্রয়াস পাইবে, তাহাকে অবদাত বসন পরাইয়া সঙ্ঘ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইবে।" এইরূপে সাঁচি মৌর্য্যবংশের সহিত নানারূপে সম্পর্কিত।

মৌর্য্যকুলরবি অশোকের তিরোভাবে বিস্তৃতমৌর্য সাম্রাজ্য ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। একদিন শেষ মৌর্য্য বৃহদ্রথকে সৈন্যদর্শন ব্যপদেশে সেনাপতি পুষ্যমিত্র হত্যা করিয়া শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র পশ্চিমাংশের উপরাজা হইয়া বিদিশায় রহিলেন। এই সময় সাঁচির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তূপও প্রস্তরের আবরণী দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। মার্শ্যাল সাহেব বলেন যে এই সময়কার ভাস্কর্য্য শিল্প অপরিণত হইলেও ভবিষ্যতের সৌকুমার্য্য উহাতে নিহিত ছিল।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর সেলিউকাস পশ্চিম এসিয়াতে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। তাহার পর তাঁহার পৌত্র ও প্রপৌত্রের রাজত্বকালে অপর দুইটা রাজ্য—পার্থিয়া এবং ব্যাক্ট্রিয়া (বহ্লীক দেশ) গঠিত হইয়া উঠিল এবং ক্রমে স্বাধীন হইল। এই ব্যাক্ট্রিয়ারাজগণ গ্রীক ছিলেন। পঞ্চনদ প্রদেশে ক্রমে অনেক গ্রীক উপনিবেশ সংস্থাপিত হইল; তাঁহাদের আমলে এই গ্রীক ব্যাক্ট্রিয় শিল্পের প্রভাব ভারতশিল্পের বহির্দ্দেশকে কতকটা স্পর্শ করিয়াছিল। তাহারই নিদর্শন এই

অশোকের বোধিদ্রুম পূজন
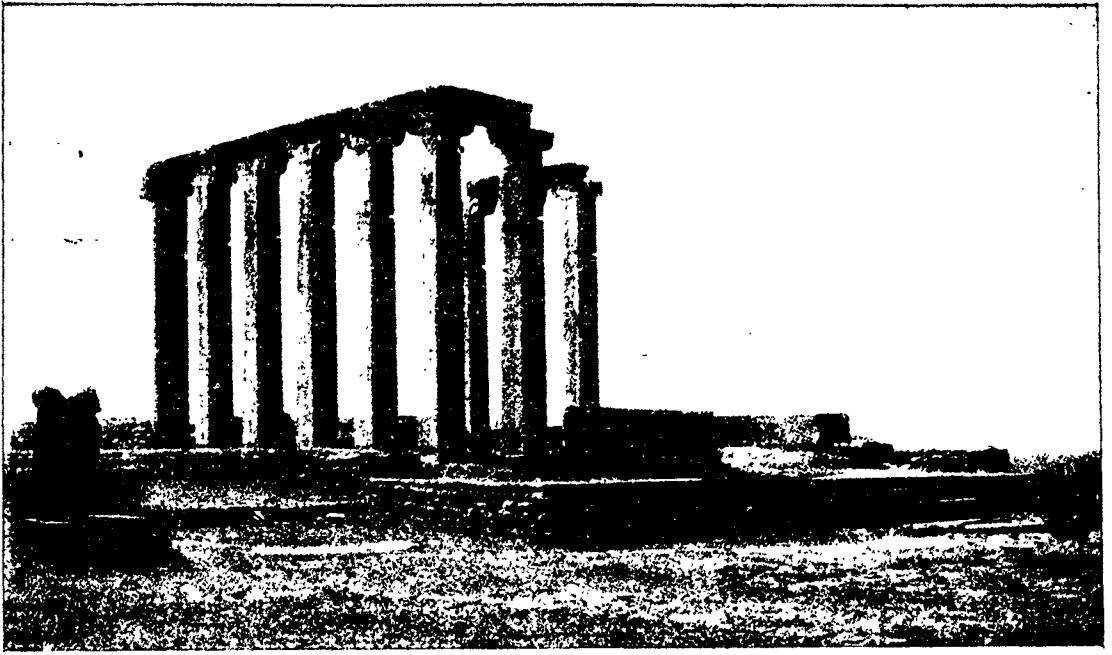
চৈত্য গৃহ

সমসময়কার শিল্পে—সাঁচি, ভারহুত এবং বুদ্ধগয়ায় দেখা যায়। কিন্তু ভারতশিল্পের স্বাধীনতা এবং জাতীয়তা কোনরূপেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই—তাহা মার্শাল, স্মিথ প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। ৬

শুঙ্গবংশের পর কাণ্বায়ন এবং অন্ধ্রবংশের নৃপতিগণ প্রাদুর্ভূত হন। খ্রীষ্টজন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই অন্ধ্রগণের প্রভাব দাক্ষিণাত্যে এবং পশ্চিম ভারতে অনুভূত হইয়াছিল এবং খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের শেষপাদে মালবের পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত তাহা বিস্তৃত হইয়াছিল। ৭ এই সময়ে ভারতের আদিশিল্প তুঙ্গস্থান অধিকার করিয়াছিল। মার্শাল বলেন যে, প্রথম স্তূপের (বড় স্তূপ) চারিটা তোরণ এবং তৃতীয় স্তূপের তোরণটী—এই পাঁচটা তোরণই এই যুগে দুই এক দশকেরই মধ্যে নির্ম্মিত হয়। দক্ষিণ তোরণে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত আছে—'রাঞো সিরি সাতকনিস আবেসনিস বাসিঠীপুতস আনন্দস দানং।' অর্থাৎ রাজা শ্রী শাতকর্ণির শিল্পীদের প্রধান বাশিষ্ঠী পুত্র আনন্দের দান।' এই শাতকর্ণি যে অন্ধ্ররাজ তদ্বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই, কিন্তু তিনি যে কে, তদ্বিষয়ে অনেক

৬। "Here and there the reliefs of the Sunga period at Sanchi, as well as at Bharhut and Bodh Gaya, reveal the influence which foreign, and especially Hellenistic ideas, were exerting on India through the medium of the contemporary Greek colonies in the Panjab; but the art of these reliefs is essentially indigenous in character and though stimulated and inspired by extraneous teaching, is in no sense mimetic. Its national and independent character is attested not merely by its methodical evolution on Indian soil, but by the wonderful sense of decorative beauty which pervaded it and which from first to last has been the heritage of Indian Art"—Guide to Sanchi, pp. 11. 12.

৭। অন্ধ্রগণের তারিখ লইয়া অনেক বাদানুবাদ আছে ভিন্সেণ্ট স্মিথের Early History of India, pp 207, 215 এবং Indian Antiquary Vol. XLIX (1920) pp. 30-34 এ আচার্য্য দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

বিতর্ক আছে। মার্শালের মত যে ইনি পুরাণোক্ত কোনও শাতকর্ণি হইবেন এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের উত্তরার্দ্ধে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে শুঙ্গযুগ অপেক্ষা গ্রীক ও পশ্চিম এসিয়ার শিল্প আন্ধ্রযুগের ভারতীয় শিল্পের উপর অধিক-

গুপ্তমন্দির

তর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা পারস্যদেশের bell capital, আসিরিয়ার ফুলের ডিজাইন (design), পশ্চিম এসিয়ার পক্ষযুক্ত সিংহ অথবা অন্য জন্তুর অঙ্কনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তখনই একথাও বলিয়াছেন যে, তাহাতে ভারতীয়দের নিছক অনুচিকীর্ষা লক্ষিত হয় না, এবং ভারতীয় আর্টের স্বাধীনতা, জাতীয়তা, আদর্শ, কিছুই ক্ষুণ্ন হয় নাই। ৮

কিছুকালের নিমিত্ত আন্ধ্রদিগের প্রভাব নহপান-বংশীয় ক্ষহরাত নৃপতিগণ কর্তৃক দমিত হয়। খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতকের প্রথম পাদে আন্ধ্ররাজ গৌতমীপুত্র শ্রীশাতকর্ণি সে লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার করেন বটে, কিন্তু তাহা অল্পকালের জন্য। পশ্চিম ক্ষত্রপ কুলপ্রদীপ রুদ্রদামন অন্ধ্রনৃপতিগণকে বারবার বিধ্বস্ত করিয়া যে আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, তাহা চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। নাম ও উপাধি দেখিয়াই বুঝা যায় যে এই ক্ষত্রপগণ বিদেশীয়—প্রথমে শক পার্থীয় এবং পরে কুশানদিগের অধীন সামন্তরাজ অথবা রাজ প্রতিনিধি (ক্ষত্রপ—satrap; Gr Satrapes অর্থাৎ

৮ "The artists of early India were quick with the versatality of all true artists to profit by the lessons which others had to teach them; but there is no more reason for calling their creations Persian or Greek than there would be in designating the modern fabric of St. Paul's Italian. The art which they practised was essentially a national art, having its root in the heart and in the faith of the people, and giving eloquent expression to their spiritual beliefs and to their deep and intuitive sympathy with nature." ইত্যাদি—Guide to Sanchi, p. 14

Viceroy) ছিলেন। সাঁচিতে এই যুগের শিল্প দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রসার হইয়াছিল, কিন্তু শিল্পের কিঞ্চিৎ অবনতি ঘটিয়াছে।

চতুর্থ শতকে বিক্রমাদিত্য-উপাধিক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই ক্ষত্রপগণকে পরাভূত করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম মালবের অধীশ্বর হইলেন। আম্রকার্দ্দব নামক তাঁহারই এক উচ্চ কর্ম্মচারী সাঁচি (তাৎকালীন নাম—কাকনদবোট) বিহারে ভিক্ষুদের ভোজন ও দীপদান জন্য একটা গ্রাম ও প্রভূত অর্থ দিয়া গিয়াছিলেন।

গুপ্তযুগ হিন্দু ইতিহাসে নবজাগরণের (Renaissance) যুগ। যেন কোনও নব বসন্তের অমৃতস্পর্শে ভারতীয়দিগের জ্ঞান ও কল্পনা সহসা পুষ্পিত হইয়া উঠিল। তাহার যশঃসৌরভে ভারত আমোদিত হইল। এ কি নব উদ্দীপনা! এ কি নব উন্মেষ! ভক্তি, জ্ঞান কর্ম্ম, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, বিজ্ঞান; কাব্য সাহিত্য রাজনীতি, সঙ্গীত চিত্রবিদ্যা স্থপতি, তক্ষণ ও নানাবিধ শিল্পে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস এই যুগের, গণিত ও জ্যোতিষ বিশারদ আর্য্যভট, বরাহ মিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত এই যুগের। অজন্তার কতকগুলি অতুলনীয় গুহাচিত্র এই যুগের। স্মিথ, হ্যাভেল, মার্শ্যাল প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই যুগের উন্নত আর্ট সম্বন্ধে একমত। প্রধান স্তূপের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে একটা প্রকাণ্ড মন্দির আছে। তাহাকে মার্শ্যাল সাহেব এথেন্সের অ্যাক্রোপোলিসস্থিত Temple of Wingless Victoryর সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—"It is reminiscent of the classic art of Greece." এই মন্দির গুপ্তযুগের।

কুমারগুপ্তের সময়ে হূণগণ পঙ্গপালের মত উত্তর ভারত ছাইয়া ফেলিল। তাহাতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্কোচ ঘটিল। এই হূণবংশীয় তোরমাণ ও মিহিরগুল অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া শাসন করিলেন। পরে মিহিরগুল মালবাধিপতি যশোধর্ম্মণ ও গুপ্ত বংশীয় বালাদিত্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের এই অশুভ দিনেও পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত আদর্শ জনসমূহের জীবনে শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে প্রতিফলিত হইতেছিল। পরে থানেশ্বরে হর্ষবর্দ্ধন উদিত হইয়া বিলীনপ্রায় গুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্বোধন করিলেন। এই যুগের শিল্প কয়েকটা মূর্ত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই কালের অজন্তা গুহার ভাস্কর্য্য হইতে বুঝা যায় যে, ভাস্কর্য্য তদানীন্তন চিত্রকলার মত তত উচ্চ স্তরের ছিল না। বিহার গাত্র পূর্ব্বে চিত্রিত হইত, সম্ভবতঃ সাঁচি বিহারে তেমন চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু থাকিলেও তাহার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ শতাব্দী ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিল্পশক্তির বিশেষ কোনও স্ফুরণ দেখা যায় না। যে শক্তিও বা ছিল তাহা আত্মবিরোধে ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তাহার পর কান্যকুব্জে প্রতীহার বংশ, মালবে পরমার-বংশ, অনিলহবারে চালুক্যবংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পর কোন বৌদ্ধ বিহার অথবা সৌধ নির্ম্মাণের নিদর্শন পাওয়া যায় না। মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছু পূর্ব্বেই বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্মের নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রধান স্তূপটা দেখিতে অণ্ডাকৃতি, উপরিভাগ ঈষৎ বিস্তৃত, উপরে পাথরের ছত্র থাকিত। অশোকের সময় এই স্তূপটা ছোট এবং ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল, পরে তাহা পাথরের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। কিঞ্চিৎ নিম্নে পাথরের রেলিং দিয়া ঘেরা। রেলিং ও স্তূপের অন্তর্বর্ত্তী পথকে প্রদক্ষিণ পথ বলে। ইহারও নীচে মাটীর উপর দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ পথ আছে। ইহাও প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ রেলিং দ্বারা বেষ্টিত। ইহার বিভিন্ন অংশগুলি শুম্ভ (post), সূচি (cross bar), উষ্ণীষ বহু ভক্তের দান। প্রস্তরের উপর ব্রাহ্মী অক্ষরে কাহার দান তাহার উল্লেখ আছে। বিদিশা হইতে যাত্রীর অভাব হইত না।

প্রথমে দক্ষিণ তোরণ, ক্রমে উত্তর, পূর্ব্ব, এবং সর্ব্বশেষে পশ্চিম তোরণ নির্ম্মিত হয়। উত্তর তোরণের মূর্ত্তিগুলি এখনও বেশ স্পষ্ট আছে। দুইটা চতুষ্কোণে স্তম্ভের উপর দুইটা বোধিকা (capital) তাহার উপর কুণ্ডলিত প্রান্তবিশিষ্ট তিনটা অধঃপ্রস্তার (architrave)।

এই বোধিকাগুলির মধ্যে ব্যবধান আছে। এই ব্যবধানভাগে নানামূর্ত্তি যথা হস্তী, অশ্বারোহী পুরুষ আছে। বোধিকার হস্তী ও তাহারই পার্শ্বে নিম্নতম অধঃপ্রাস্তরের নীচে সুন্দর যক্ষিণীমূর্ত্তি শাখা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তোরণের শীর্ষদেশে হস্তী অথবা সিংহের উপর ধর্ম্মচক্র এবং ইহার দুই পার্শ্বে চামর হস্তে যক্ষের মূর্ত্তি। মধ্যভাগের দুই পার্শ্বে—দক্ষিণে ও বামে ত্রিশূলাকৃতি বৌদ্ধ ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ - সূচিত করিতেছে।

তোরণের অন্যান্য অংশে বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা এবং জাতকের কোনও কোনও কাহিনী প্রদর্শিত হইয়াছে। আদি বৌদ্ধধর্ম্মে মূর্ত্তি ছিল না—বুদ্ধদেবের উপস্থিতি কোনও বিশিষ্ট অভিজ্ঞান দ্বারা সূচিত হইত। তন্মধ্যে চারিটি অভিজ্ঞান এই—

(১) ভদ্রঘটের উপরিস্থিত কমল অথবা কমলদলদ্বারা তাঁহার জন্ম সূচিত হইত। কোনও কোনও অংশে মায়াদেবী কমলদলে বসিয়া আছেন। কোথাও বা তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই নাগ মঙ্গলঘট নিঃসৃত বারিধারা দ্বারা তাঁহাকে অভিসিক্ত করিতেছে। কোথাও আসন্নপ্রসবা মায়াদেবী দাঁড়াইয়া আছেন। নিদান কথায় লিখিত আছে—সালসাখং গাহত্বা গব্‌ভুট্‌ঠানং আহাসি—শালশাখা গ্রহণ করিতে তাঁহার গর্ভবেদনা উপস্থিত হইল।

[এই মূর্ত্তি লক্ষ্মীরও হইতে পারে, এবং সকলেই ইহাকে কমলদলবাসিনী লক্ষ্মীরই মূর্ত্তি বলিয়া ধরিয়াছিলেন। অবশেষে Foucher বলেন ইনি মায়াদেবী। Gnide to Sanchi, p42 দ্রষ্টব্য। অমর বলিয়াছেন—"লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রীঃ হরিপ্রিয়া।" প্রথম দৃষ্টিতে আমিও লক্ষ্মী ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তখনই কেমন একটা সন্দেহ হইয়াছিল। Rhys Davids-এর মতে লক্ষ্মী পূর্ব্বে হিন্দুদেবী ছিলেন না; তিনি অনার্য্যদের দেবতা 'সিরিমা', 'সিরি' ছিলেন; তাঁহার ভক্ত অনুচরও ছিল অনেক। বেগতিক বুঝিয়া হিন্দুগণ তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রী করিলেন। ভারহুৎ স্তূপে তাঁহার মূর্ত্তি আছে। এতদ্বিষয়ে Rhys Davidsএর Buddhist India, pp. 216 ff দ্রষ্টব্য। এলোরা এবং দক্ষিণ ভারতে এরূপ মূর্ত্তি ('গজলক্ষ্মী') অনেক দেখিলাম। যথাস্থানে আলোচনা করিব।]

(২) গয়াতে নৈরঞ্জনার তীরে বোধিদ্রুম মূলে তাঁহার সম্বোধিলাভ ঘটিয়াছিল। ইহার অভিজ্ঞান—অশ্বত্থবৃক্ষ অথবা অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে সিংহাসন; এবং বৃক্ষের উপরিভাগে ছত্র অথবা পতাকা। কোথাও বা ভক্তবৃন্দ অথবা নাগাদি জন্তু সমূহ তাঁহার বন্দনা করিতেছে।

(৩) সারনাথ মৃগদাবে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মের ব্যাখ্যান করেন এবং ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করেন। ইহার অভিজ্ঞান—স্তম্ভস্থিত অথবা সিংহাসনারূঢ় চক্র। কোনও স্থলে মৃগদাব সূচিত করিতে দুইটী মৃগ প্রদর্শিত হইয়াছে। অজন্তা গুহায় মৃগমধ্যবর্ত্তী চক্র দেখিয়াছিলাম।

(৪) তাঁহার পরিনির্ব্বাণ সূচিত করিতে স্তূপ চতুর্থ অভিজ্ঞান। শেষ সপ্তবুদ্ধ সূচিত করিতে স্তূপ এবং বোধিদ্রুম নিয়োজিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দিকের তোরণের সম্মুখভাগে সর্ব্বোচ্চ অধঃপ্রস্তারে এবং দক্ষিণ তোরণের পশ্চাদ্ভাগের সর্ব্বোচ্চ অধঃপ্রস্তারে ক্রমনিম্নস্থ সিংহাসন এবং স্তূপ শেষ সপ্তবুদ্ধ সূচিত করিতেছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণের নিমিত্ত মল্লিখিত "এলাম্মা" দ্রষ্টব্য।

তোরণগাত্রে লিখিত ভাস্কর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। জাতকবর্ণিত ছদ্দণ্ড কাহিনীর বিবরণ দিয়া আমরা বৃহৎ স্তূপের নিকট বিদায় লইব। এই জাতক উত্তর দক্ষিণ তোরণদ্বারে লিখিত আছে। আখ্যান বস্তুটা এই—হিমবন্ত প্রদেশে ছদ্দণ্ড হ্রদের উপকূলে বোধিসত্ব একবার নাগরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বশরীর তাঁহার শুভ্রবর্ণ, মুখ ও পদ লোহিতবর্ণ। তাঁহার দেহ হইতে ছয়টি রশ্মি বিচ্ছুরিত হইত—অথবা রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র তাঁহার ছয়টি দন্ত ছিল। (ষট্‌দন্ত)। তাঁহার বিশাল দেহ উচ্চে অষ্টাশীতি হস্ত ও দৈর্ঘ্যে বিংশতি শতোত্তর হস্ত পরিমাণ। তাঁহার দুই প্রাধানা রাণী ছিলেন—চুল্লসুভদ্দা

(ক্ষুদ্র সুভদ্রা) ও মহা সুভদ্দা (মহাসুভদ্রা)। একদিন নাগরাজ একটি বৃহৎ উৎপলের রেণু মহাসুভদ্রার কপোল দেশে বিকীরণ করেন। তাহাতে ঈর্ষ্যার্জ্জরিত চুল্লসুভদ্দা প্রত্যেক বুদ্ধগণের বন্দনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন—"যেন পরজন্মে বারাণসী রাজের প্রধানা মহিষী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। তখন আমি নাগরাজকে বধ করিয়া তাঁহার দন্ত আনাইব।" তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হইল। পরজন্মে রাজমহিষী কাশীরাজ্যের তাবৎ ব্যাধগণকে সমবেত করিয়া সোমুত্তর নামক ব্যাধকে এই ষড়্‌বিষাণ গজরাজের বধ সাধন নিমিত্ত সেই হ্রদে প্রেরণ করিলেন। সোমুত্তর বিষদিগ্ধ শরের দ্বারা গজরাজকে আহত করিল। এই চিত্রের বামভাগে শ্বেতরক্ত নীলাব্জ সুশোভিত হ্রদমধ্যে ষড়্‌দন্ত নাগরাজ কেলি করিতেছেন, একটা নাগ শিরোপরি আতপত্র ধারণ করিয়া আছে, অপর নাগ চামর ব্যজন করিতেছে। চিত্রের দক্ষিণভাগে গজরাজ পরিষদ পরিবৃত হইয়া গমন করিতেছেন—আর সোমুত্তর শৈলান্তরে আত্মগোপন করিয়া নাগরাজকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতেছে।

আবদুল বাঁকি নামক এই স্থানের এক কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন, এবং যত্ন করিয়া সব দেখাইলেন। বৃহৎ স্তূপ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত মন্দির দেখিয়া আমরা পূর্ব্বভাগে ঈষদুন্নত আর একটা চত্বরে আসিলাম। তথায় একটা মন্দির এই অধিত্যকার প্রান্তভাগে অবস্থিত দেখিলাম। এই স্থান হইতে পাদভূমি প্রায় তিনশত ফুট নিম্নে। এই মন্দিরটা দশম একাদশ শতাব্দীর। খুব বড় বড় পাথরের ব্লক দিয়া এটা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহারই গর্ভগৃহে বুদ্ধদেবের একটা বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি আছে—তিনি ভূমিস্পর্শমুদ্রায় পদ্মাসনের উপর বসিয়া আছেন, তাহার নীচে আর একটি সিংহাসন আছে। সিংহাসনের মধ্যভাগে দুইটা অর্দ্ধভগ্ন মূর্ত্তি আছে—একটা উত্তান শয়নে, অপরটা তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া। বুদ্ধদেব মারকে জয় করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ তাহাই সূচিত করিতেছে। এলোরাতে ১১ নং গুহায় এইরূপ মূর্ত্তি দেখা যায়। এই চত্বরে বৌদ্ধদিগের অন্য মন্দির ছিল, সম্ভবতঃ সেই গুলির ধ্বংস হইলে তাহারই কোনওটা হইতে উক্ত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আনিয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। এই মন্দিরটার শিল্পের ধাঁজ অনেকটা হিন্দু যুগের —অতএব তাহাকে হিন্দু মন্দির বলিয়া ধরণা করিলে বিশেষ অন্যায় হয় না।—দশম একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকটা হিন্দুভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন ও কতকটা তদন্তর প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এই স্থান হইতে সম্মুখে দূরে উদয়গিরি শৈল, অনতিদূরে ঈষৎ দক্ষিণ ভাগে বেত্রবতী নদী। এই শৈলে গুপ্তযুগের অনেকগুলি হিন্দুমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইখান হইতে আমরা মিউজিয়ম গৃহে আসিলাম। তথায় পূর্ব্বোক্ত সিংহের মূর্ত্তি এবং অন্যান্য কতকগুলি মূর্ত্তি দেখিলাম। একটা গ্লাস কেসে প্রাচীন যুগের শিকল, চাবি, লাঙ্গলের ফাল, জমিতে মই দিবার যন্ত্র, বদনা, ভাঁড় প্রভৃতি মাটীর বাসন দেখিলাম।

এই অবকাশে বন্ধুদ্বয় বিদায় লইয়া দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থার নিমিত্ত ষ্টেশনে ফিরিয়া গেলেন। আমি পুনরায় বৃহৎ স্তূপের উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত তিন নম্বর স্তূপের সম্মুখে ফিরিয়া আসিলাম। এই স্তূপ হইতে জেনেরাল কানিংহাম বুদ্ধদেবের দুই প্রধান শিষ্য—সারিপুত্র ও মহা মোগগলানের দেহাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই স্তূপের সম্মুখে মাত্র একটা তোরণ ছিল। তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। এইখান হইতে 'চৈত্যহলে' গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই হলে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। এইরূপ চৈত্যহল এলোরা এবং অজন্তা দুই স্থানেই দেখিয়াছি তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। সেখান হইতে দক্ষিণদিকের দুইটা বৌদ্ধমঠ দেখিয়া অধিত্যকা হইতে অবতরণ করিয়া দুই নম্বর স্তূপের সম্মুখে আসিলাম। পথে পাথরের একটা বৃহৎ বৌদ্ধ ভিক্ষাপাত্র দেখিলাম। সম্ভবতঃ ভক্ত ও তীর্থযাত্রিগণ এই ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষুদের উদ্দেশে খাদ্য নিবেদন করি-

তেন। ভুবনেশ্বর হইতে খণ্ডগিরি যাইবার সময় পথি-পার্শ্বে প্রকাণ্ড ভিক্ষাপাত্র দেখিয়াছিলাম, তখন ঠিক করিতে পারি নাই উহা কি।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন জনসন এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জেনেরাল কানিংহাম এই দুই নশ্বর স্তূপকে খনন করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা হইতে একটা পেটিকা (relic box) এবং আরও চারিটী ক্ষুদ্র পেটিকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। হিমবন্ত প্রদেশে যে ধর্ম্মাচার্য্যগণ ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাৎকালীন ধর্ম্ম মহা-সঙ্গীতিতে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদেরই কয় জনের—যথা কাসপগোত্ত, মঝিম, সারীসুত প্রভৃতির—অস্থি উক্ত পেটিকাগুলিতে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই স্তূপের সম্মুখে কোনও তোরণ ছিল না। মার্শ্যাল বলেন বেষ্টনীর শিল্প খাঁটী ভারতীয়।

বাঁকি সাহেব সঙ্গে করিয়া, রেষ্ট হাউসের পাশ দিয়া প্রথমে যে পথ দিয়া পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম, তথায় পৌছাইয়া দিলেন। তাঁহার সৌজন্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলাম। এই বিশ্রামাগারে থাকিবার বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছা হইল যে একদিন থাকিয়া উদয় গিরিটা দেখিয়া যাই। ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুদের নিকট বুক ঠুকিয়া প্রস্তাবটী করিয়াও ফেলিলাম। সত্যবাবুর কাতর দৃষ্টি ও গোকুল বাবুর ভ্রূভঙ্গে সে বাসনার সমাধি হইল। ষ্টেশন মাষ্টারের অনুগ্রহে স্নানাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হইল। গোকুল বাবু এক অভিনব পন্থায় ষ্টোভ জ্বালিয়া দিলে রান্না চড়িল। তরকারীর অভাব ষ্টেশন মাষ্টার দত্ত দুধের কৃপায় বুঝিতে পারিলাম না। আত্মার কোনওরূপে তর্পণ করিয়াছি মাত্র, এমন সময়ে গাড়ী আসিয়া পৌছিল। শ্রীহরি বলিয়া এলোরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

মুক্তিনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩০শে মার্চ্চ ১৯২২—অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম। উষাগমেও হিমালয়ের এই নিভৃত ক্রোড়দেশে গম্ভীর নীরবতা বিরাজমান। দিগন্ত নিস্তব্ধ, প্রকৃতির নিবাত নিষ্কম্প গৌরব সম্যক্ অনাহত।

একাকী যখন নিসর্গের এই গাম্ভীর্য্য দর্শনে ভূমানন্দে মগ্ন ছিলাম, তখন দিবাকর লোহিত মেঘমৌলি রথে আরূঢ় হইয়া বিজয় অভিযানে অগ্রসর হইতে হইতে দশদিক মহিমা মণ্ডিত করিয়া অত্যুচ্চ শিখরে উপনীত হইলেন। দিবাকরের উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিগ্-বলয়স্থিত রজতগিরির ভীষণ রুক্ষ গরিমার অন্তরালে পশ্চিম দিগন্ত অদৃশ্য ছিল। সূর্য্যোদয়ের অনতিবিলম্বেই ঐ সমস্ত উচ্চ দিগ্‌দেশ যেন চঞ্চল মুক্তামালার শ্বেতরশ্মিতে উদ্ভাসিত হইল এবং অধিত্যকা ভূমি পদ্মরাগ মণির স্নিগ্ধ লোহিত আভায় স্নাত হইয়া এক অপূর্ব্ব মধুর মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিল।

যাঁহারা হিমালয়ের অন্তর্দ্দেশে কখনও প্রবেশ করেন নাই তাঁহাদিগকে এই "দেবতাত্মা নগাধিরাজ"এর তীব্র রাজশ্রী ও তাহার বিবিক্ত প্রদেশের শান্ত ভীষণ গৌরবের আভাস দেওয়া অসাধ্য কর্ম্ম; এই মহান্ গিরিরাজির তোরণ দ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলেই অসীম ও অতীন্দ্রিয়ের ক্ষণাভাস হৃদয়ে জাগ্রত হয় এবং চরম তত্ত্বগুলি যেন প্রত্যক্ষগোচরবৎ প্রতীয়মান হয়।

এই লীলাময় ঐশ্বর্য্য সান্নিধ্যে কেন হৃদয় সেই প্রাণের প্রাণ বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি কমনীয় প্রীতিরসে

আপ্লুত হইয়া উঠে? এই মহাভাবের নিদান ইহাই কি নয় যে সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" এই বাহ্যবিশ্বে এবং অন্তর্বিশ্বে সমভাবে প্রকটিত এবং যখনই অন্তরাত্মা হিমালয় সদৃশ মহিমান্বিত মহাসত্তার সম্মুখীন হয়, তখনই উভয়ের সমজাতীয়তা প্রতিপন্ন ও অনুভূত হয়?

এই বিশাল অন্তহীন গিরিরাজি আমার হৃদয়ে চির-বিস্ময় রূপে বিরাজিত। বহুবার ইচ্ছা হইয়াছে বিমান বিহারী বিহঙ্গবৎ উড্ডীন হইয়া গিরিরাজের অত্যুচ্চ শিখরে সমাসীন হই। এই নভশ্চুম্বী শৈলমালার দর্শনে অনাদিতত্ত্ব হৃদয়ে স্বতঃ উন্মেষিত হইয়া চিত্তকে নিসর্গ সুন্দরের চরণে উপস্থিত করে।

এই দৃশ্যমান জগতে এরূপ বহু পবিত্র পদার্থ আছে যাহার সম্মুখীন হইবামাত্রই আত্মশুদ্ধি ও আত্মজাগরণ অবশ্যম্ভাবী। এই বিশাল উত্তুঙ্গ নিভৃতে যখনই আমি উপস্থিত হইয়াছি তখনই সেই জাগরণে জাগ্রত হইয়া স্বভাবতঃ সালোক্য ও সামীপ্য আনন্দে অভিভূত হইয়াছি।

সূর্য্যোদয়ের পরে আমি আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কিয়ৎকাল পরে পূজারী ও ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে মুক্তিনাথের মন্দিরে আসিলাম।

মুক্তিনাথের অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ ধারায় স্নান করিলাম। মুক্তিনাথ দর্শনান্তর বৌদ্ধ মন্দির "নয়াগুম্ফা" নৃসিংহ এবং জ্বালামুখী দর্শন করিলাম।

মুক্তিনাথ বিগ্রহ বৌদ্ধদিগের অধিকারচ্যুত হইলে একজন তিব্বতীয় বৌদ্ধ এ গুম্ফায় নূতন বৌদ্ধদেবতা স্থাপনা করিয়াছেন, এই গুম্ফাই নয়াগুম্ফা নামে পরিচিত।

গুম্ফা মধ্যে দিবাভাগেও অন্ধকার, প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে বিগ্রহ দর্শন করিলাম। বিগ্রহগুলি সমস্তই সিংহী অথবা ব্যাঘ্রীর মস্তক সংযুক্ত ষড়্ভুজা স্ত্রী-মূর্ত্তি। দুই একটা ধ্যানী বৌদ্ধ মূর্ত্তিও গুম্ফায় আছে।

নৃসিংহ মন্দিরেও একটী ভীতিজনক বিগ্রহ স্থাপিত। নয়াগুম্ফার ও নৃসিংহ মন্দিরের বিগ্রহগুলি কি প্রকারে বৌদ্ধদেবতার মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইলেন বুঝিলাম না।

জ্বালামুখী মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই, মন্দির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র প্রস্রবণ, প্রস্রবণের জলে অগ্নি জ্বলিতেছে। এই মন্দিরটীও বৌদ্ধ পুরোহিতের অধিকারে। জ্বালামুখী দর্শনান্তর পুনরায় মুক্তিনাথের প্রাঙ্গণে আসিলাম।

কোন্ যুগে কে মুক্তিনাথের বিগ্রহ স্থাপনা করিয়াছে বোধ হয় কেহই জানে না। নেপাল উপত্যকা গোর্খারাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে মুক্তিনাথ জুম্লারাজের অধিকারে ছিল। জুম্লা রাজসরকারই দেবার্চ্চনের ও অতিথি সৎকারের বন্দোবস্ত করিতেন।

বর্ত্তমানে দেবার্চ্চন ও অতিথি সৎকার জন্য একব্যক্তি নেপাল সরকার হইতে জায়গীর ভোগ করেন। এইরূপ জায়গীর ভোগকারীদের নেপালী আখ্যা "ডিট্‌ঠা"। পূর্ব্বে ঝাংকোটের সুভাই মুক্তিনাথের ডিট্‌ঠা ছিলেন। বর্ত্তমানে মুক্তিনাথ হইতে চারিদিবসের পথ দূরবর্ত্তী রাকু ন.মক স্থানের এক ব্যক্তি এই জায়গীর ভোগ করিতেছেন।

রামনবমী হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পরে এখানে লোক সমাগম অসম্ভব, তখন সদাব্রত বন্ধ থাকাতে কাহারও অসুবিধা হয় না। শিবরাত্রির পর হইতে রামনবমী পর্য্যন্ত সদাব্রত না থাকায় বিদেশী সাধু সন্ন্যাসিদের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাঁহারা অনেকেই শিবরাত্রির পর হইতে রামনবমীর মধ্যে মুক্তিনাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ডিট্‌ঠার বাড়ী মুক্তিনাথ হইতে অনেক দূরে থাকাতে অভাব অভিযোগও তাঁহার নিকট উপস্থিত করা যায় না।

মস্তাং গিরিসঙ্কটের পথে যাতায়াতকারী ভুটিয়া সওদাগর ও নেপালী প্রজা ভিন্ন অতি অল্প গৃহস্থ যাত্রীই মুক্তিনাথ তীর্থে আগমন করিয়া থাকে।

নেপালী তীর্থযাত্রিগণ সাধারণতঃ রামনবমী হইতে মুক্তিনাথে আগমন করিতে থাকে এবং এই উভয় শ্রেণীর যাত্রীই আপনাদের আহার্য্য ও জ্বালানী কাষ্ঠ সঙ্গে আনে।

মুক্তিনাথের অঙ্গন হইতে বাসায় প্রত্যাগমনের পথে

মুক্তিনাথের মন্দিরের সম্মুখস্থ কুণ্ড হইতে নির্গত জলধারার কূলে কূলে অনেকদূর আসিলাম। একস্থানে জলধারার উপর চতুর্দ্দিকে গবাক্ষ বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দির মধ্যে একটি তাম্রনির্ম্মিত প্রার্থনাচক্র স্রোতোবেগে অবিরাম ঘূর্ণিত হইতেছে। রাণী পাউয়া যাত্রীনিবাসের সম্মুখস্থ উচ্চ পর্ব্বতের উপর আর একটী প্রার্থনা চক্র বায়ুশক্তিতে ঘূর্ণিত হইতেছে।

আমাদের আহার্য্য সংগ্রহ জন্য ভারিয়া জিৎবাহাদুর লামা, আমাদের মুক্তিনাথ মন্দিরে রওয়ানা হইবার পরেই নিকটবর্ত্তী রূপাং গ্রামে মুখিয়ার সন্ধানে গিয়াছিল। "ভক্তিপুরা" "প্রীতিপ্রসাদ" প্রভৃতি পরিচিত নামগুলি আর এখানে শোনা যায় না। এখানকার নামগুলি প্রায়ই অশ্রুতপূর্ব্ব এবং অতিশয় কঠোর। মুখিয়ার নাম "ধ্যাছাং"। মুখিয়ার অনুপস্থিতিতে তাহার ভগিনী চাউল, গোল আলু, দুগ্ধ, পশুলোমজাত কোমরবন্ধ, জুতা (Tibetan cloth boots) এবং শালগ্রাম চক্র প্রভৃতি লইয়া জিৎবাহাদুরের সঙ্গে যাত্রী নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিলাম। পূজারী বলিলেন, এখানকার দুগ্ধ পান করা অবিধেয়। প্রথমতঃ ইহা চমরী গোর দুগ্ধ, দ্বিতীয়তঃ ভুটিয়াগণ দুগ্ধ দোহনকালে আপন জিহ্বার লালাদ্বারা গাভীর স্তনাগ্র কোমল করিয়া থাকে।

আমরা মুক্তিনাথ দর্শনান্তর দামোদর কুণ্ড যাইব স্থির করিয়াছিলাম। জিৎ বাহাদুরের সাহায্য জন্য মুক্তিনাথ নিবাসী দ্বিতীয় একজন ভারিয়াও নিযুক্ত করিয়াছিলাম। এখান হইতে দামোদর কুণ্ড গমন এবং প্রত্যাবর্ত্তনে ছয় দিন লাগিবে। এই ছয় দিনের পথে কোন লোকালয় নাই, আমাদিগকে খাদ্যসামগ্রী সঙ্গেই লইয়া যাইতে হইবে। শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার ও পূর্ব্ব পরিচিত গাড়োয়ালী সন্ন্যাসীদ্বয়ও আমাদের সঙ্গে যাইবেন ঠিক হওয়ায়, অতিরিক্ত পরিমাণে চাউল ও গোল আলু ক্রয় করিলাম, এখানে চাউল অতি মহার্ঘ্য—এক টাকায় আড়াই সের, তাহাও ভাল নহে।

আহারান্তে আমাদের প্রকোষ্ঠে অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে সভা বসিল। সভ্য আমি পূর্ব্ববঙ্গবাসী, ব্রহ্মচারী আসাম প্রদেশীয়, আয়াঙ্গার মাদ্রাজী, পূজারী, অপর একজন তীর্থযাত্রী, পোখরার কনেষ্টবল ও জিৎবাহাদুর নেপালী, যাত্রীনিবাসের নিম্নতলবাসী একজন দোকানদার দামোদর কুণ্ডগামী ও ভারিয়া—ভুটীয়া। এতন্মধ্যে আমি জিৎবাহাদুর, দামোদর কুণ্ডগামী ও ভারিয়া গৃহী. পোখরা কনেষ্টবল গৃহশূন্য, এবং অবশিষ্ট কয়জন স্ত্রীপুত্র পরিজন শূন্য।

ভুটীয়া দোকনদারটী অকর্ত্তিত মেষচর্ম্ম সেলাই করিয়া কোট প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে এবং তাহাদ্বারা শীত হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। চর্ম্মের কোট ব্যবহার জন্য পূজারী ইহাকে উপাধি দিয়াছেন "চর্ম্মদাস।" এতদঞ্চলে এই জাতীয় চর্ম্মের কোট অনেকের গায়েই দেখিলাম। কোটের লোমশ অংশ শরীরের দিকে থাকে।

চর্ম্মদাস বেচারার মাথায়, শিশুর মস্তকের ন্যায় একটী প্রকাণ্ড টিউমার। আমি এই রোগের কোনও প্রতিকার জানি কি না আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। এই ব্যক্তি বলিল, সে পদব্রজে তিব্বতের মধ্য দিয়া চীনের রাজধানী পিকিং পর্য্যন্ত বৎসরে একবার গমনাগমন করিয়া থাকে।

অপরাহ্নে আকাশের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া উঠিল। এখানে আষাঢ়ের পূর্ব্বে আকাশ নীলবর্ণ হয় না, শ্বেতবর্ণ থাকে। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন (শ্বেত বর্ণ মেঘ) হইলে তুষারপাত হইয়া থাকে। যখন আষাঢ়মাসে আকাশ নীলবর্ণ হয় তখন হইতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়।

আকাশের অবস্থা দেখিয়া পূজারী ও ভুটীয়া ভারিয়া বলিল, বোধ হয় দামোদর কুণ্ড দর্শন আমাদের অদৃষ্ট নাই।

বৈকালিক আহারের জন্য চর্ম্মদাসের দোকান হইতে আটা ক্রয় করা হইল। এখানকার আটা অতি সুস্বাদু। আমার জ্ঞান হইল যেন এমন সুমিষ্ট আটা পূর্ব্বে কখনও খাই নাই। মূল্যও চাউল অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধেক কম—

টাকায় পাঁচ সের। যে কয়দিন মুক্তিনাথে ছিলাম, ব্রহ্মচারী ও আমি দুই বেলা আটার রুটিই আহার করিয়াছি।

মধ্য রাত্রে আমার অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল। আমার যেন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। জাগিয়া দেখি কুণ্ডের অগ্নি প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে, ধূমে প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ। শীতের ভয়ে বহির্বায়ু প্রবেশের পথ জানালা চারিটি এবং কক্ষান্তরে প্রবেশের দরজাটা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি একটা জানালা খুলিয়া দিলাম এবং মুক্ত বাতায়ন পথে প্রায় অর্দ্ধেক শরীর বাহির করিলাম। নির্ম্মল ও মুক্ত বায়ু সেবনে যন্ত্রণার উপশম হইল। ব্রহ্মচারীজীও অপর জানালা কয়টী খুলিয়া দিলেন এবং কুণ্ডের অগ্নি পুনঃ প্রজ্জলিত করিলেন। আর জানালা বন্ধ করা হইল না, এবং যে কয়দিন মুক্তিনাথে ছিলাম রাত্রে জানালা বন্ধ করি নাই।

৩১শে মার্চ্চ ১৯২২। আকাশের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। সকালে একবার মুক্তিনাথের মন্দিরে যাইব মনস্থ করিয়া নীচে আসিলাম। চর্ম্মদাসের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন লামাপুরোহিত প্রার্থনাচক্র ঘুরাইতেছে এবং এক অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র পাঠ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। এই জাতীয় ভিক্ষার্থী পূর্ব্বেও দার্জ্জিলিংএ দেখিয়াছি।

মুক্তিনাথের অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে গাড়োয়ালী সন্ন্যাসীদ্বয় চলিয়া গিয়াছেন। স্বভাবতঃ নির্জ্জন মুক্তিছত্র আজ আরও নির্জ্জন বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পূজারী আসিলেন এবং পূজা অন্তে আমরা যাত্রীনিবাসে প্রত্যাগমন করিলাম।

অদ্য বীরবল আসিয়া পৌঁছিল।

এতক্ষণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া বেলা ১১-৩০ মিনিট হইতে তুষার বর্ষণ আরম্ভ করিল। এরূপ দৃশ্য পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সমস্ত অন্তরীক্ষমণ্ডলে যেন অতি সূক্ষ্ম ধুনিত কার্পাস ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পৃথিবীর আকর্ষণে ধরাপৃষ্ঠে বিশ্রামলাভ করিতে আরম্ভ করিল। জানালার নিকট বসিয়া তুষারপাত দর্শন করিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ কিছুক্ষণ তুষার ধরাপৃষ্ঠে পতন মাত্রই লুপ্ত হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর প্রথম স্তর তুষার সঞ্চিত হইল। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার মধ্যেই সমস্ত নিম্নভূমি তুষারাবৃত হইয়া গেল।

বাণ ডাকিলে যেমন সমস্ত স্থলভাগ জলপ্লাবিত হইয়া যায়, তখন যতদূর দৃষ্টি চলে চর্তুর্দ্দিকে কেবল জলরাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং মনে হয় যেন দিগ্‌বলয় দূরে জলরাশিকেই স্পর্শ করিয়াছে, তুষার পতনেও আমাদের চতুর্দ্দিকের অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইয়া গেল। আমাদের চতুর্দ্দিগস্থ পর্ব্বত প্রাচীর চিরহিমানীশীর্ষ, কিন্তু দিগ্‌বলয় এই হিমানীশীর্ষ পর্ব্বতমালা স্পর্শ করে নাই। এখন তুষার পতনে চিরহিমানীরেখার নিম্নস্থ ধূসরবর্ণ পর্ব্বতগাত্র এবং পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত অধিত্যকা ভূমি সমস্তই ধবলাকার হইয়া গেল। কোথাও একবিন্দু স্থানও অন্য বর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হইল না। কি যে সুন্দর দৃশ্য তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

এই তুষার পতনের মধ্যেও কার্য্যোপলক্ষে কোন কোন গ্রামিককে বাহিরে আসিতে হইয়াছে। আমাদের সঙ্গে দামোদর কুণ্ড যাইতে অঙ্গীকারে আবদ্ধ ভারিয়া ঝাড়কোট হইতে তাহার পালিত গর্দ্দভ তাড়াইয়া আনিতেছে দেখিলাম। ভারিয়ার পোষাক এবং দীর্ঘ কেশ এবং পশুর দেহ যেন ধুনিত কার্পাসে অসম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি স্ত্রীলোক যাত্রী নিবাসের সম্মুখস্থ পথ দিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছিল, তাহাদের অবস্থাও তদ্রূপ।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় তুষারপতনের সময় আমি অনেকবার বাহিরে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু নেপালী যাত্রীটি আমাকে বাধা দিয়াছিলেন। এখন একবার বাহিরে আসিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সমগ্র দেশ যেন রূপার পাত দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। দূরস্থ মুক্তিনাথের মন্দির, যাত্রীনিবাস, রূপাং গ্রামের ঘর গুলি সমুদয়ই যেন রৌপ্যমণ্ডিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আমাদের দামোদর কুণ্ড যাওয়ার আশা শেষ হইল। ভারিয়া আসিয়া জানাইল দামোদর কুণ্ড যাইবার পথ

যদিও কথঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইয়াছিল, অন্তকার তুষারপাতে তাহা পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসিয়া স্থির হইল আগামী কল্য আহারান্তে আমরা মুক্তিনাথ ত্যাগ করিব।

১লা এপ্রিল ১৯২২—আকাশ বেশ পরিষ্কার। পতিত তুষার রাশির উপর প্রাতঃসূর্য্য-কিরণ পতিত হইয়া অন্ত এক অভিনব সুন্দর দৃশ্য রচনা করিয়াছে। মুক্তি-নাথের অঙ্গনে আসিয়া ধারায় স্নান সমাপন করিয়া যাত্রী নিবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং আহারাদি সমাপনান্তে অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় মুক্তিনাথ ত্যাগ করিলাম।

মুক্তিনাথ ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল, ইহা যেন আমার হৃদয়ে এক যন্ত্রণা উপস্থিত করিল। মুক্তি-নাথের সেই উষা ও প্রদোষের স্বর্ণাংকৃত গগন, সেই স্বর্গ স্পর্শী স্ফটিকগিরি শিখর, সেই চির হিমানী মণ্ডিত পর্ব্বত প্রাচীর—এই সমস্ত শোভা আর কখনও যে আমার নয়ন পথে পতিত হইবে না এই চিন্তা দুঃসহ হইয়া উঠিল।

তিনটার সময় কাকবেণী পৌছিলাম। গত কল্য-কার পতিত তুষার রাশি এখনও সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয় নাই। তুষার স্তূপের উপর দিয়াই আমাদিগকে সমস্ত পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

কাকবেণীতে আমরা গণেশ বাহাদুর সুভার ভানসায়ে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

ব্রহ্মচারীজীর শালগ্রাম সংগ্রহের বাতিক ঠাণ্ডা না হওয়ায় বীরবল, জিৎ বাহাদুর এবং কতকগুলি ভুটীয়া বালক সমভিব্যাহারে তিনি গণ্ডকীতটে শালগ্রাম সন্ধানে গেলেন। চিরকালই ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করিয়া থাকেন, কিন্তু কালসহকারে সময় সময় এই সনাতন বিধিরও ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ভগবানের বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া ব্রহ্মচারীজী ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত শালগ্রাম শিলাখণ্ডের ওজন প্রায় পাঁচসের হইবে। এই গুরুভার শালগ্রামচক্রগুলি এক খণ্ড শক্ত কাপড়ে বাঁধিলেন এবং বৈষ্ণবদের মালা রাখার থলীর ন্যায় গলায় ঝুলাইয়া যাইবেন ঠিক করিলেন। আমরা ভূতের বোঝা বহিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভগবানের বোঝা বহিতে প্রস্তুত হইলাম না।

২রা এপ্রিল ১৯২২ প্রত্যুষে কাকবেণী ত্যাগ করিলাম। গতরাত্রে ঘড়ীটী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মচারীজী আপন ছায়া মাপিয়া সময় নিরূপণ করিলেন, তদনুসারে ঘড়ী ঠিক করিলাম।

৯ ঘটিকার সময় জানগুম্বার গ্রামে পৌছিলাম এবং প্রীতিপ্রসাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

১১-৩০ মিনিটের সময় জানগুমবার ত্যাগ করিলাম। মারফা গ্রামে পৌছিয়া দেখিতে পাইলাম বৌদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থরাশি সহকারে গ্রামবাসিগণ শোভাযাত্রায় বাহির করিয়াছে। একখানা চিত্রিত কাষ্ঠের থালাতে পিত্তল নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি লইয়া সর্ব্বাগ্রে পুরো-হিত, তাঁহার পশ্চাতে বাদকদল এবং তাহাদের পশ্চাতে স্ত্রী পুরুষ অনেকে শাস্ত্রগ্রন্থরাশি পৃষ্ঠে বহন করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছে। আগতপ্রায় রাম নবমী উপলক্ষে এই উৎসব।

রামচন্দ্র বিষ্ণু অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি রাজপুত্র ছিলেন, বুদ্ধদেবও বিষ্ণুর অবতার এবং রাজপুত্র ছিলেন এই যুক্তি অনুসারে রামনবমী উপলক্ষে বৌদ্ধগণও উৎসব করিয়া থাকে। রামনবমীতে বৌদ্ধ উৎসব বৌদ্ধধর্ম্মের উদারতা কি শিথিলতা জ্ঞাপক তাহা ধর্ম্ম সমন্বয়কারীদের বিচার্য্য।

ভিন্সেট স্মিথ সাহেবের মতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নেপালে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহা মহাযান মতের বিকৃত তান্ত্রিক সংস্করণ। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে উহা কোন্ পদার্থে পরিণত হইয়াছে তাহা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। সাহেব যে লিখিয়াছেন বর্ত্তমান গোর্খা গবর্ণমেণ্ট ধ্বংসোন্মুখ বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ধ্বংসের মুখে আরও অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, ইহার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রজার সহিত একধর্ম্মাবলম্বী রাজার নিকট প্রজাগণ ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি জন্ত যাহা আশা করিতে পারে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজার নিকট সেরূপ আশা করিতে পারে না। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজা যদি

পরাজিত প্রজার ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করেন তবেই যথেষ্ট। হিন্দু গোর্খা রাজগণ বৌদ্ধ নেওয়ার এবং ভুটীয়া প্রজাগণের ধর্ম্মস্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেছেন তাহার প্রমাণ নাই *

মুক্তিনাথ গমন সময় টুক্‌চে হইতে মারফা পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ক্লেশ হয় নাই। কিন্তু প্রত্যাগমন পথে প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। মারফা ত্যাগের পরই অল্প বৃষ্টি এবং প্রবল বাতাসে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অপরাহ্ণ ৩-৪০ মিনিটের সময় টুক্‌চে উপস্থিত হইলাম এবং গণেশ বাহাদুর সুভার গৃহে অতিথি হইলাম।

৩রা এপ্রিল ১৯২২ প্রাতঃকাল ছয় ঘটিকার সময় টুক্‌চে ত্যাগ করিলাম। অনেক নেপালী যাত্রী স্ত্রী এবং পুরুষ রামনবমী উপলক্ষে মুক্তিনাথ যাইতেছে দেখিলাম। আমরা ৯ ৩৫ মিঃ সময় ছয়ে বস্তিতে উপস্থিত হইলাম এবং পূর্ব্ব পরিচিতা গৃহকর্ত্রীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারান্তে ১-৫ মিঃ ছয়ে ত্যাগ করিলাম এবং ৫-৩৫ মিঃ ঘাসা বস্তিতে সুবাদার জগৎ সিংহের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমরা যখন সুবেদারের বাড়ীতে পৌঁছিলাম তখন পর্য্যন্ত সুবেদার বাড়ীতে আগমন করে নাই, কিঞ্চিৎ পরেই (দীর্ঘ ?) প্রবাসের পর বাড়ী পৌঁছিল। এদেশেও গুরুজনের পদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিবার রীতি প্রচলিত দেখিলাম। রাত্রে সুবেদার তাহার জীবনের অনেক কাহিনী বর্ণনা করিল। সে এখন ইংরেজ সরকার হইতে পেন্সন পায় এবং বৎসরে দুইবার গোরখপুর যাইয়া পেন্সনের টাকা আনিয়া থাকে। ঘাসার এ বাড়ী তাহার নহে, সুবেদারণীর, তাহাকে বিবাহ করিয়া জগৎ সিংহ এখানে আছে।

৪ঠা এপ্রিল ১৯২২ ভোর ছয়টায় ঘাসা ত্যাগ করিয়া ৯-৩৫ মিনিটের সময় ডানা ভানসারে পৌঁছিলাম। আমার শরীর আজ কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত শরীরে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। মুক্তিনাথে কয়দিন অহোরাত্র অগ্নি সেবন, অতিরিক্তমাত্রায় গরম কাপড় ব্যবহার এবং গত কল্য স্নান না করা এই অসুস্থতার কারণ, ব্রহ্মচারীজী এরূপ নির্ণয় করিলেন।

ডানা ভানসারে স্নানাহার করিয়া যথেষ্ট বিশ্রাম করিলাম। অদ্য আমরা তাতপানিতে রাত্রিবাস করিব এবং সে স্থানও এখান হইতে অধিক দূর নয়, কাযেই বিশ্রামের মাত্রা দীর্ঘ করা গেল। জিৎবাহাদুর ও পোখরার কনেষ্টবল আমাদের অনেক পূর্ব্বেই রওয়ানা হইয়া গেল। কনেষ্টবল তাতপানি হইতে পোখরা যাইবে, আমরা অন্য পথে যাইব। অদ্য হইতেই সে আমাদের সঙ্গচ্যুত হইল।

ব্রহ্মচারীজী, বীরবল এবং আমি ২-৩৫ মিঃ সময় ডানা ত্যাগ করিয়া ৫ ঘটিকার সময় তাতপানি পৌঁছিলাম এবং পূর্ব্বপরিচিতা গৃহকর্ত্রীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, অদ্য তাঁহার অতিথিরূপে নহে।

শুঁঠ ও গোলমরিচ সহকারে চা প্রস্তুত হইল এবং লবণ সংযোগে পান করিলাম। রাত্রে কিছুই আহার করিলাম না।

৫ই এপ্রিল ১৯২২। অদ্য শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম। প্রাতে উষ্ণপ্রস্রবণ এবং গণ্ডকীতে স্নান করাতে শরীরের অবসাদ দূর হইল। আহারান্তে ৯-৪০ মিঃ সময় তাতপানি ত্যাগ করিলাম।

গণ্ডকী পার হইয়া নদীর দক্ষিণ কূলে কূলে কিছুদূর পশ্চিমে অগ্রসর হইলাম এবং ঘারাখোলা নদীর সেতু পার হইয়া উল্লারী শৈলশ্রেণীর পূর্ব্বপাদদেশে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের পূর্ব্ব ক্রোড়দেশ দিয়া দক্ষিণদিকে

* During the Newar dynasty the Government took great pride in securing the proper observance of different religious festivals and liberally contributed large sums of money towards necessary expenses It is quite different with Gurkha government. They take no interest in the Newar or any other festivals, they contrbute no money for their support ; they sanction their occurrence but do not actively encourage them—Ooldfield.

পো–রা গামী পথ গিয়াছে। পর্ব্বতের পশ্চিম পাদদেশ দিয়া দক্ষিণ দিকে আমাদের গন্তব্য পথ। পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে পশ্চিম পাদদেশে যাইতে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে না, উত্তর প্রান্ত আবেষ্টন করিয়া পশ্চিমে আসিতে হইবে।

এই আবেষ্টনের পথে আমাদের বাম দিকে বিশাল উচ্চ পর্ব্বত, ডান্‌দিকে বহু নিম্নে গণ্ডকী। মধ্যস্থ পথ অতিশয় সংকীর্ণ, স্থানে স্থানে পর্ব্বতের অংশ গাড়ী-বারান্দার ছাদের ন্যায় পথের উপর আসিয়াছে। সেই সকল স্থানে ঠিক সোজা হইয়া হাঁটিবার উপায় নাই। এইরূপ বিপজ্জনক পথে আবেষ্টন শেষ করিয়া পর্ব্বতের পশ্চিম পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। অন্য পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে না হইলেও আবেষ্টনে যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিঃ সময় আমরা রাকু নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে একটী দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে। মুক্তিনাথের ডিট্‌ঠার বাড়ী এই গ্রামে, এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে উচ্চ পর্ব্বতের উপর। ডিট্‌ঠার একজন গোমস্তা ধর্ম্মশালায় অবস্থান করে এবং অতিথিদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে।

আমাদের অবস্থান জন্য গোমস্তা একটী প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল এবং চারিজনের উপযুক্ত চাউল, ডাইল, ঘৃত, গোল আলু প্রভৃতি উপহার দিল।

সায়াহ্ন ছয় ঘটিকায় বীরবল ও ভারিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আহারান্তে সকলে বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম।

৩রা এপ্রিল অপরাহ্নে ছয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পশ্চিমদিকস্থ ধবলা গিরি অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিল। অদ্য উল্লারী আবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বদিকস্থ "হিমমণ্ডিত শোভন তুঙ্গ গিরি" মস্তক লুক্কায়িত করিল। এখন আমাদের দক্ষিণে ও বামে কেবল শ্রেণীর পর শ্রেণী ধূসর পর্ব্বত।

৬ই এপ্রিল ১৯২২। প্রাতঃকালে ৬-১৫ মিঃ সময় রাকু ধর্ম্মশালা ত্যাগ করিলাম এবং ৭-৩০ মিঃ সময় ভদ্রকালী নদী উত্তীর্ণ হইলাম। রাকু হইতে একজন নেপালী সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে পথি-পার্শ্বস্থ এক মন্দিরে লইয়া গেলেন। মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গের নাম "ধনেশ্বর" শিব। সন্ন্যাসী বলিলেন এই শিব অনাদিলিঙ্গ।

ধনেশ্বর শিব মন্দির পরিত্যাগ করিয়া বেণী বাজারে পৌঁছিলাম। এখানে একজন নেওয়ার আমাদিগকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। তখনও বেলা অধিক হয় নাই, আমরা তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম না। তিনি আমাকে ও ব্রহ্মচারীজিকে কিছু মিশ্রী উপহার দিলেন।

বাজার হইতে আমরা গণ্ডকীর পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইলাম। গণ্ডকী পার হইবার জন্য এখানে একটি ঝোলা আছে।

পশ্চিম দিক হইতে একটী নদী আসিয়া বেণী বাজারের দক্ষিণে গণ্ডকীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থান হইতে গণ্ডকী গর্ব্ববাহিনী হইয়াছে।

বেণী হইতে তান্‌সিন্ যাইবার দুইটী পথ। একটী গণ্ডকীর উপনদী পার হইয়া গণ্ডকীর দক্ষিণ তীরস্থ অত্যুচ্চ বাঘলুম পর্ব্বতের উপর দিয়া, অপরটী ঝোলা পার হইয়া গণ্ডকীর উত্তর তীরস্থ অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমির উপর দিয়া। আমরা শেষোক্ত পথেই রওয়ানা হইলাম।

হরিদ্বারের অনেক প্রাচীন যাত্রীর নিকট লছমন-ঝোলার নাম এবং ঝোলার বর্ণনা শুনিয়াছি, অদ্য ঝোলা জিনিষটী দর্শন করিলাম এবং তাহার উপর দিয়া নদী পার হইলাম।

পঠিত কি শ্রুত বর্ণনায় ঝোলার নির্ম্মাণ কৌশল সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিলেও, এই ঝোলা সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হওয়া যে কি বিপজ্জনক তাহা নিজের অভিজ্ঞতা ভিন্ন সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না।

ঝোলাটী সর্ব্ব প্রকারে লৌহসম্পর্ক-শূন্য। নদীর এক তীর হইতে অপর তীর পর্য্যন্ত দুইগাছি মোটা ও শক্ত দড়ি সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত। দড়ির প্রান্ত উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভের সহিত দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ। প্রত্যেক দড়ি

হইতে দুই কি আড়াই হাত লম্বা অনেকগুলি দড়ি নিম্ন দিকে বিলম্বিত। এক এক খণ্ড কাষ্ঠ নির্ম্মিত অপ্রশস্ত পাদপীঠের উভয় প্রান্তে মূল দুইগাছি দড়ি হইতে বিলম্বিত, দুইগাছি ছোট দড়ির প্রান্ত ভাগের সহিত দৃঢ় ভাবে সম্বদ্ধ। প্রথম কাষ্ঠ খণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয় খণ্ড একটু দীর্ঘতর। ঝোলার উভয় প্রান্ত হইতে ক্রমশঃ দীর্ঘতর কাষ্ঠখণ্ডগুলি ঝোলার মধ্যদেশ অভিমুখে বিন্যস্ত। ঝোলার অধিরোহণ ও অবতরণ স্থান অনেকটা ইংরাজী 'ভি' (V) অক্ষরের ন্যায়।

পরস্পর অসংলগ্ন পাদপীঠ গুলির উপর দিয়া ঝোলা পার হইবার সময় মূল দড়ি দুইগাছি দুই বগলের মধ্যে দিয়া চাপিয়া রাখিতে হয়। কাষ্ঠ খণ্ডের উপর পদ স্থাপন করিলেই শরীর অগ্রে ও পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে। এক কাষ্ঠখণ্ড ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে পদার্পণ করিবার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। নিম্নে ভীমনাদিনী শিলাখণ্ডবহুলা খরস্রোতা নদী। নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলেই কেমন যেন একটা দুর্ব্বলতা মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়, অথচ নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াও উপায় নাই। একই সময় বিপরীত দিক্ হইতে দুইব্যক্তি ঝোলা উত্তীর্ণ হইতে পারে না এবং একদিক হইতেও একাধিক ব্যক্তির একত্রে ঝোলা পার হওয়া বিপজ্জনক।

অতি সন্তর্পণে ঝোলা পার হইয়া গণ্ডকীর পূর্ব্বতীরে আসিলাম এবং কিছু দূর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া গণ্ডকীর উত্তর কূলে কূলে পূর্ব্বদিকে পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম।

অদ্য রামনবমী। গণ্ডকীর দক্ষিণ তীরস্থ বাঘলুমে মেলা হয়। দলে দলে পাহাড়ীয়া স্ত্রী পুরুষ হাঁস, মুরগী, কবুতর লইয়া বাঘলুমে যাইতেছে; সেখানে স্থাপিতা দেবীর প্রীত্যর্থে এই সমস্ত বলি উৎসর্গ হইবে।

বেলা ১১৩০ মিঃ সময় আমরা কন্তাবাস বাজারে পৌছিলাম। দোকান হইতে দই চিঁড়া ক্রয় করিয়া গণ্ডকীর কূলে আসিলাম। স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া আমরা নদীর তীরে বিশ্রাম করিতেছিলাম, হঠাৎ একটা দমকা বাতাস ব্রহ্মচারীজীর একখানা লেঙ্গোটা উড়াইয়া লইয়া গণ্ডকীর জলে ফেলিয়া দিল। পবনদেবের এই কার্য্য যুগপৎ একজনের মনে করুণ ও অপরের মনে হাস্য রসের উদ্রেক করিল। ব্রহ্মচারীজী যখন বুঝিলেন দুঃখ করা নিষ্ফল তখন তিনিও আমার সহিত হাস্যে যোগদান করিলেন।

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় প্রবল বাতাসের সহিত বর্ষণ আরম্ভ হইলে আমরা নদীকূল ত্যাগ করিয়া দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সূর্য্যাস্তের অল্প পূর্ব্বে গাইড ও ভারিয়া আসিয়া পৌছিলে বাজারের অনতি-দূরবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

বেণী হইতে কন্তাবাসের পথে কোন কোন স্থানে নেপালীদিগকে কাগজ প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি। চতুর্দ্দিক ঈষৎ উচ্চ, কাষ্ঠনির্ম্মিত একটা চতুষ্কোণ পাত্রের উপর এক প্রকার ঘন তরল বস্তু উত্তপ্ত অবস্থায় ঢালিয়া দিয়া ঐ চতুষ্কোণ পাত্রটাকে জলের উপর রাখা হয়। নিম্নে জলের শৈত্য ও উপরে রৌদ্রের তেজ তরল পদার্থ জমাট করিয়া কাগজে পরিণত করে।

৭ই এপ্রিল ১৯২২ ভোর ছয়টায় কন্তাবাস ত্যাগ করিলাম এবং ৭-৩ মিঃ সময় ব্রহ্মচারীজী ও আমি এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পশ্চিম পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। গাইড ও ভারিয়া আমাদের অনেক পশ্চাতে।

আমাদের গন্তব্যস্থান পর্ব্বতের উপর দিয়া পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতের পাদদেশ বেষ্টন করিয়া একটা স্বতন্ত্র পথ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। এই পথটা দেখিয়া ব্রহ্মচারীজী সিদ্ধান্ত করিলেন যে এই পথেও আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিব এবং "চড়াই উৎরাই"এর কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

এই পথে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পথ ক্রমেই অপ্রশস্ত ও দুর্গম দেখিতে লাগিলাম। প্রায় কুড়ি মিনিট অগ্রসর হইবার পর পশ্চাতে চাৎকার শুনিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখি এই দুর্গম পার্ব্বত্যপথে বীরবল প্রাণপণে দৌড়াইয়া আসিতেছে। সে হস্ত সঙ্কেতে আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিল। নিকটে আসিয়া দেখি অতি দ্রুতগমন হেতু বীরবল কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইয়া

পড়িয়াছে। অল্প বিশ্রাম অন্তে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম এবং পর্ব্বত "চড়াই" করিয়া ৯.৩০ মিঃ সময় কুস্মা বাজারে পৌছিলাম।

এই "কুপথে চালিত" করিবার জন্য ব্রহ্মচারীজী কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, হিমালয় ভ্রমণকারী অনেকেরই পথভ্রম হয়। কোনও পথভ্রান্ত বা একবিংশতি হস্ত দীর্ঘ ধ্যানমগ্ন যোগীর আশ্রমে উপনীত হয়েন, যোগীবর তাঁহার কিস্তি (ভিক্ষাপাত্র) হইতে তপ্ত লুচি হইতে আরম্ভ করিয়া কতপ্রকার সুখাদ্য দ্বারা পথভ্রান্তের রসনা পরিতৃপ্ত করাইয়া থাকেন এবং পরে তাঁহাকে সুপথে পাঠাইয়া দেন।* আবার কেহবা জীবন-মৃত্যুর সন্ধি স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন এবং মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত তাঁহার চৈতন্য অপসৃত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিতে থাকে। তাঁহার চক্ষুর উপর কুয়াসার জাল বিস্তৃত হইতে থাকে। তখন তিনি দেখিতে পান "শিরোদেশে সন্ন্যাসী, হস্তে একটি লাল নূতন কমণ্ডলু" তিনি সন্ন্যাসী প্রদত্ত জল পান করেন এবং ক্রমে তাঁহার সুপ্তি বিলুপ্ত হয়।† আমাদের ভাগ্যে এরূপ কিছুই ঘটিল না। যদিও আজ পথভ্রমের একটা সুবিধা করিয়া তুলিয়া ছিলাম তাহাও বীরবল নষ্ট করিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

* বাবু বেচারাম লাহিড়ী—"সজ্জনসঙ্গ ও সদুপদেশ।"

† রায় বাহাদুর জলধর সেন —"প্রবাসচিত্র।"

ঝাল

ওহে ঝাল, ওহে ঝাল!
ওহে লঙ্কা-মরিচ-বক্ষোনিবাসী রসরূপী মহাকাল!
পরশে রসনা ওঠে তিড়বিড় নাচিয়া
গন্ধে নাসিকা সজোরে সে ওঠে হাঁচিয়া
মুখে ছোটে লালা,নয়নেতে লোর, কে নেবে তোমার টাল?
ওহে ঝাল, ওহে ঝাল!

ওহে ঝাল, ওহে ঝাল!
ওহে মাদ্রাজে আর পূর্ব্ববঙ্গে ব্যঞ্জন-মহীপাল!
পরদেশবাসী অজ্ঞেরা একসাপ্‌টা
সেবিলে তোমায়, দিতে হয় জল ঝাপ্‌টা
চোখে মুখে আর মাথার চাঁদিতে, বেধে যায় জঞ্জাল;
ওহে ঝাল, ওহে ঝাল!

ওহে ঝাল, ওহে ঝাল!
ওহে ষড় রসরাজ কি ভীষণ তব পরতাপ সুবিশাল!
তব কোপানলে যেজন পড়েছে আহারে,
মিষ্ট ও টক দুজনে মিলিয়া তাহারে
বাঁচাইতে নারে, ঝাল্ ঘাম ঝরে, শোচনীয় তার হাল;
ওহে ঝাল, ওহে ঝাল!

ওহে ঝাল, ওহে ঝাল!
ওহে ধ্যানেতে তোমার জবাকুসুমের মতই বরণ লাল।
লঙ্কা-পিপুল-জোয়ান-মরিচ-বাহনে
বিশ্ব জুড়িয়া ঘুরিছ মানব দাহনে,
আদাতে বচেতে চৈ-এ লবঙ্গে পেতেছ যাতনা জাল;
ওহে ঝাল, ওহে ঝাল!

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

"ঘণ্টা"

(মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

উহার দুঃখ দৈন্য সত্ত্বেও, উহার অঙ্গহীনতা সত্ত্বেও, এক সময় উহার ভাল দিন গিয়াছে।

১৫ বৎসর বয়সে, একটা বড় রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়িয়া উহার দুই পা ভাঙ্গিয়া যায়। ঐ সময় হইতে, দুইটা ঠেকো লাঠি দুই বগলে রাখিয়া, কাঁধটা কাণ পর্য্যন্ত তুলিয়া—ঐ লাঠির উপরে ভর দিয়া, ক্ষেতবাড়ীর জমির উপর দিয়া হেঁচ্ড়াইয়া হেঁচ্ড়াইয়া চলিয়া বেড়াইত। মনে হইত, দুই কাঁধের মধ্যে তাহার মাথাটা যেন, দুইটা পাহাড়ের মধ্যে নিমজ্জিত।

পরিত্যক্ত শিশুটিকে গ্রামের পাদ্রি একটা নর্দ্দমায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। তার নাম রাখা হইল— "নিখোলাস তুস্‌ঁা"। সাধারণের দানের সাহায্যে তাহাকে "মানুষ" করা হয়। সে শিক্ষার কোন ধার ধারিত না। পা যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন গ্রামের রুটিওয়ালা তাকে কয়েক গেলাস ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া দিয়াছিল—সেই অবধিই সে খোঁড়া হইয়া আছে;—লোকের একটা হাসির জিনিস হইয়া আছে। তখন হইতেই সে ভবঘুরে। হাত বাড়ানো ছাড়া সে আর কিছুই জানে না।

ইতিপূর্ব্বে একজন বড় লোক, নিজ প্রাসাদের সংলগ্ন ক্ষেতবাড়ীতে কুক্কুট গৃহের পাশে, কুলুঙ্গি ধরণের একটা খড়ে ভরা কুঠরীতে শুইবার জন্য তাহাকে স্থান দিয়াছিলেন। অতি বড় দুর্ভিক্ষের সময়েও সে ওখানে অন্তত এক টুকরা রুটি ও এক গেলাস সিডার-সুরা যে বরাবর খাইতে পাইবে সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। অনেক সময় বৃদ্ধা কর্ত্রী ঠাকুরাণী, উপরের সিঁড়ির ধার হইতে, কিংবা শয়ন ঘরের জান্‌লা হইতে দুই চারিটা পয়সাও উহার নিকট ছুড়িয়া ফেলিতেন। এখন তিনি পরলোকে।

গ্রামের লোকেরা উহাকে বড় কিছু দিত না; উহার সহিত তাহাদিগের অতিপরিচয় ঘটিয়াছিল। উহাকে উহারা ৪০ বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছে—দুইটা কেঠো পায়ের উপর ভর দিয়া, স্বীয় কুৎসিৎ হীনাঙ্গ শরীরটাকে টানিয়া টানিয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে আর কোথাও যাইতে চাহিত না; কেননা দেশের এই কোণটুকু ছাড়া সে আর কোন জায়গাই চিনিত না। সে দুই চারিটা কুটীরেই যাতায়াত করিত, সে তার ভিক্ষা-ভ্রমণের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছিল; সেই অভ্যস্ত সীমা সে কখনই লঙ্ঘন করিত না।—"অন্য গ্রামে যাস্‌নে কেন? খট্‌খট্‌ করে তুই কেবল এইখানেই আসিস্।"

সে কোন উত্তর দিত না, সে দূরে চলিয়া যাইত। একটা অজানা দেশের অস্পষ্ট ভয়ে, দরিদ্রসুলভ নানাপ্রকার কল্পিত আশঙ্কায় সে অভিভূত হইয়া পড়িত। কোন নূতন মুখ দেখিলে, কারও মুখে গালি মন্দ শুনিতে পাইলে, রাস্তায় সারি-বন্দি পাহারাওয়ালারা যাইতেছে দেখিলে, সে পলাইবার চেষ্টা করিত। যখন দূর হইতে দেখিতে পাইত,—একটা ঝোপ ঝাড়, একটা নুড়ির ঢিবি রৌদ্রে ঝিক্‌মিক করিতেছে, তখন তাহার শরীরে একটা অভূতপূর্ব্ব চটুলতা ও ক্ষিপ্রতা আসিত; ব্যাধের তাড়ায় কোন শিকারের জীব যেরূপ একটা লুকাইবার স্থান পাইবার জন্য প্রাণপণে ছুটিয়া যায়, সে সেরূপ যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কিংবা নুড়ির ঢিবির পিছনে আশ্রয় লইত, সেখানে সে তার পা-লাঠিসমেত ভূতলে লুটিয়া পড়িত। তাহার ময়লা কাপড় মাটির রং-এর সহিত মিশিয়া যাইত। এইরূপে সে লোক-লোচনের অদৃশ্য হইত।

উহার কোন আশ্রয়স্থান ছিল না; মাথার উপর

একটা চালও ছিল না, একটি কুটীরও ছিল না, একটু আড়ালের জায়গাও ছিল না। গ্রীষ্মকালে সে সর্ব্বত্রই নিদ্রা যাইত এবং শীতকালে কোন একটা গোলাঘরের ভিতর কিংবা কোন একটা আস্তাবলের ভিতর খুব নিপুণভাবে ঢুকিয়া পড়িত, এবং লোকের চোখ পড়িবার পূর্ব্বেই ঐ সব স্থান হইতে সরিয়া পড়িত। কোন ইমারতের ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে, কোথায় কি রন্ধ্র আছে সে সমস্তই জানিত। পা-লাঠির ব্যবহারে তাহার বাহুর বল আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়া গিয়াছিল, সে শুধু তার হস্তের কব্জির জোরে বিচালি-রাখার গোলা ঘরের উপরপর্য্যন্ত আরোহণ করিত। ভিক্ষা করিয়া আনিয়া, সেইখানে কখনো কখনো সে ৪।৫ দিন অবস্থিতি করিত।

মানুষের মাঝখানে বনের পশুর মত সে জীবন যাপন করিত; কাহাকেও চিনিত না; কাহাকেও ভালবাসিত না। চাষারা তাহাকে উপেক্ষা করিত, উহার সম্বন্ধে একটা চাপা বৈরতা মনে মনে পোষণ করিত। উহারা তাহাকে "ঘণ্টা" বলিয়া ডাকিত। ঘণ্টা যেমন দুইটা খোঁটার মধ্যে ঝোলানো থাকে সেও তেমনি দুই পা-লাঠির মাঝখানে অবস্থিত বলিয়া উহারা তাহার এই নাম দিয়াছিল।

দুই দিন ধরিয়া সে আহার করে নাই। কেহই আর তাহাকে কিছুই দিত না। তাহাকে দেখিলে চাষারা তাদের দরজায় দাঁড়াইয়া দূর হইতে বলিয়া উঠিত:—"দূর হয়ে যা এখান থেকে। তোকে তিন দিন এক এক টুকরা রুটি দিয়েছি।"

তখন সে তার ঠেকোর উপর ভর দিয়া চট্ করিয়া ঘুরিয়া অন্য কুটীরে চলিয়া যাইত—সেখানেও সে একই রকমের অভ্যর্থনা পাইত।

এক কুটীর হইতে অপর কুটীরের লোকদিগকে শুনাইয়া স্ত্রীলোকেরা বলিত:—"না বাপু, সমস্ত বৎসর ধরে এই নিষ্কর্ম্মাটাকে খাওয়ান যায় না।" কিন্তু প্রতিদিন ঐ নিষ্কর্ম্মাটার না খাইলেও ত চলিবে না।

সে তার পরিচিত দুই তিনটা গ্রাম পার হইয়া গেল;—কোথাও একটি পয়সাও পাইল না—এক টুকরা বাসী রুটিও পাইল না। কেবল একটি গ্রামে যাওয়া তাহার বাকী ছিল। কিন্তু সে গ্রামটি এক ক্রোশ দূরে। সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—আর টানিয়া হিঁচ্‌ড়িয়া চলিবার শক্তি ছিল না। তখন তাহার পাকেট খালি—পেটও খালি।

তবু সে চলিতে ক্ষান্ত হইল না। তখন ডিসেম্বর মাস; একটা ঠাণ্ডা বাতাস মাঠময় ছুটাছুটি করিতেছিল; পত্রশূন্য নগ্ন গাছের ডাল পালার মধ্য দিয়া সোঁ-সোঁ শব্দ হইতেছিল। চাপ্‌ চাপ্‌ মেঘের দল তমসাচ্ছন্ন আকাশ পথে ছুটিয়া চলিয়াছিল—কোথায় যাইতেছে তাহা জানিত না। খুব কষ্টসৃষ্টে দুই ঠেকোর মধ্যে পর-পর একটার পর একটায় ভর দিয়া, খোঁড়া খুব আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে, রাস্তার নর্দ্দমার উপর বসিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিল। মন চিন্তাবিহ্বল ও ভারাক্রান্ত, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির। শুধু এক কথা তার মাথায় ছিল—"আহার"—কিন্তু কি করিয়া আহার জুটিবে তাহার কোন ধারণা ছিল না।

এইরূপ তিনঘণ্টা কাল ঐ রাস্তা ধরিয়া চলিল। তাহার পর গ্রামের গাছপালা তাহার নজরে আসিল—তখন সে আরও দ্রুত চলিতে লাগিল।

প্রথমেই এক চাষার সহিত দেখা হইল; তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল:—

"আবার যে তুই এসেছিস? তোর সেই পুরোনো বদমাইসি এখনো ছাড়িস নি বুঝি? তোর হাত থেকে ছাড়ান্ পাওয়া যে দায় হল দেখছি।"

"ঘণ্টা" সেখানে আর দাঁড়াইল না—কিছু দূরে চলিয়া গেল। দ্বার হইতে দ্বারান্তরে সে কেবলই মুখঝাম্‌টা খাইল; কিছু না দিয়া সবাই তাহাকে দূর করিয়া দিল। তবু সে ধৈর্য্যসহকারে একরোখাভাবে পথ চলিতে লাগিল।

তাহার পর সে ক্ষেত বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। বৃষ্টিতে মাটি ভিজিয়া কাদা হইয়া গিয়াছে। তাহার

উপর দিয়াই চলিতে লাগিল। কিন্তু এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে কাদা হইতে তাহার লাঠি উঠাইতে পারিতেছে না। সে চারিদিক হইতেই তাড়িত হইতে লাগিল। আবার, সে দিনটা ছিল ভয়ানক ঠাণ্ডা, বিষণ্ণ ধরণের; এই রকম দিনে হৃদয় স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়, মেজাজটা সহজেই চটিয়া যায়, বিষাদের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; এমন দিনে দান করিতে হাতও খোলে না কোন রকম সাহায্য করিতে মনও উঠে না।

তার পরিচিত সব গৃহেই যখন যাওয়া শেষ হইল, তখন সে ক্ষেতের মালিক "শিকে"র অঙ্গনের ধারে, একটা নর্দ্দমার কোণে গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার উচ্চ ঠেকা দুইটা বগলের নীচে দিয়া গলাইয়া, ভূতলে ফেলিয়া রাখিল এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইয়া অনেকক্ষণ নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল।

সে এখানে কে জানে কিসের প্রত্যাশায় ছিল; আমাদের সকলেরই এইরূপ একটা অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট প্রত্যাশা প্রায় সব সময়েই মনের ভিতরে থাকে।

এই অঙ্গনের কোণে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসিয়া সে একটা রহস্যময় অজানা সাহায্যের প্রত্যাশায় ছিল; দেবতার নিকট হইতে কিংবা মানুষের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য লাভের আশা আমরা অনেক সময়েই করিয়া থাকি; অথচ আমরা ভাবিয়া দেখি না, সে সাহায্য কেমন করিয়া হইবে, কেন হইবে, কাহার দ্বারা হইবে। সেইখানে এক ঝাঁক মুর্গির বাচ্চা আহার অন্বেষণে মাটীর উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, "একটা" শস্য-দানা কিংবা অদৃশ্য পোকা মাকড় দেখিতে পাইলে ঠোঁট দিয়া উঠাইয়া লইতেছিল।

ঘণ্টা কিছু মনে না করিয়া উহাদিগকে শুধু দেখিতেছিল। কিন্তু একটু পরে একটা কথা তার মাথায় আসিল। "মাথায় আসিল" না বলিয়া বরং বলা উচিত—একটা কথা তার উদরে অনুভূত হইল—এই একটা মুর্গির বাচ্চাকে কাঠের আগুনে পোড়াইয়া খাইলে হয় না?

এ কাজ করিলে যে চুরির অপরাধে অপরাধী হইতে হয়, এ কথাটা তার মাথায় একবারও আসিল না। হাতের কাছে যে একটা পাথর পাইল, সেই পাথর ছুঁড়িয়া ঝাঁকের একটা মুর্গিকে মারিল। পাখীটা পাখা ঝাপটা দিয়া পাশেই পড়িয়া গেল। অন্যগুলা পালাইয়া গেল। তখন ঘণ্টা তার ঠেকা দুইটা আবার বগলে লইয়া, শিকারটা উঠাইয়া লইবার জন্য খট্ খট্ করিয়া চলিতে লাগিল।

মাথায় লাল দাগ সেই কালো পাখীটার কাছে যেই সে আসিয়াছে, অমনি সে তার পিঠে একটা ভয়ানক ঠেলা খাইল। সেই ঠেলায় ধাক্কায় তার ঠেকা দুইটা তার বগল হইতে বিচ্যুত হইয়া, সে ১০ পা দূরে গড়াইয়া পড়িল। ক্ষেত্রপতি "শিকে" ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ঐ চোরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তার পঙ্গু-শরীরের উপর চড় ঘুসি লাথি বেদম প্রয়োগ করিতে লাগিল। এই সময় ক্ষেত বাড়ীর গোপালেরাও আসিয়া পড়িল, উহারাও ঘণ্টাকে উত্তম মধ্যম প্রদান করিল। যখন উহাকে মারিয়া মারিয়া উহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন উহাকে মাটি হইতে উঠাইয়া ক্ষেতবাড়ীতে লইয়া গেল এবং সেখানকার কাঠগুদামে বন্ধ করিয়া রাখিল। উহাকে বন্ধ রাখিয়া পুলিসে খবর পাঠাইল।

ঘণ্টা অর্দ্ধমৃত, ক্ষুধার জ্বালায় কাতর, মাটীর উপর শুইয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ক্রমে রাত্রি হইল, তাহার পর অরুণোদয় হইল। সে কিছুই খায় নাই।

প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি, তখন পাহারাওয়ালারা আসিয়া খুব সাবধানে দ্বার খুলিল। মনে করিয়াছিল বাধা পাইবে; কেন না, ক্ষেত্রপতি "শিকে" উহাদিগকে জানায় যে এই ভিক্ষুক উহাকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং অতি কষ্টে সে আপনাকে বাঁচাইয়াছে।

জমাদার সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "এই!—খাড়া হ'!"

কিন্তু ঘণ্টা নড়িতে পারিতেছিল না; তার ঠেকোর উপর ভর দিয়া সে উঠিতে খুব চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। উহারা মনে করিল, ওটা একটা ছলনা—একটা ফন্দি মাত্র। বদমাইশরা প্রায়ই ঐরূপ করিয়া থাকে।

এইরূপ মনে করিয়া দুই সশস্ত্র পাহারাওয়ালা কঠোর ভাবে উহ'কে উঠাইয়া ধরিয়া উহাকে ঠেকোর উপর চড়াইয়া দিল।

ঘণ্টা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। "লালপাগড়ি" দেখিলে স্বভাবতঃ লোকের যেরূপ ভয় হয়, শিকারীর সম্মুখে শিকার পাখীর যেরূপ ভয় হয়, বিড়ালের সম্মুখে ইঁদুরের যেরূপ ভয় হয়—এ সেইরূপ ভয়। তখন সে প্রাণপণ করিয়া কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জমাদারসাহেব বলিয়া উঠিলেন, "চল্ রে চল্!"

ঘণ্টা চলিতে লাগিল। ক্ষেতবাড়ীর লোকজন চাহিয়া দেখিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা মুষ্টি দেখাইল। পুরুষেরা ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল, গালিগালাজ করিতে লাগিল—"এতদিনের পর ব্যাটা পাকড়াও হয়েছে, বাঁচা গেছে।"

দুই রক্ষকের মাঝে সে চলিয়া গেল। মরিয়া হইয়া সে চলিতে লাগিল। সন্ধ্যাপর্য্যন্ত এইরকম হাঁচড়াইতে হাঁচড়াইতে চলিতে হইবে। তাহার কি ঘটিবে সে কিছুই জানে না; এরূপ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

উহার সঙ্গে পথে যে সকল লোকের সাক্ষাৎ হইল, তাহারা একটু থামিয়া উহাকে দেখিতে লাগিল। চাষারা মৃদুস্বরে বলিল, "একজন চোর!"

রাত্রির দিকে জিলার প্রধান স্থানে উহারা আসিয়া পৌঁছিল। ঘণ্টা অতদূর কখনও আসে নাই। সে কল্পনা করিতে পারিল না—কি হইতেছে কিংবা কি ঘটিতে পারে। এই সব ভীষণ অদৃষ্টপূর্ব্ব জিনিস, এই সব মুখ, এই সব নূতন বাড়ীঘর দেখিয়া তাহার আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না; কেন না তাহার কিছুই বলিবার নাই, সে কিছুই আর বুঝিতে পারিতেছে না। তাছাড়া এতবৎসর ধরিয়া কাহারও সহিত কথা না কহায়, সে তাহার জিহ্বার ব্যবহার হারাইয়াছিল। তাহার মস্তিষ্কে এরূপ গোলমাল বাধিয়াছে যে দুইটা কথা যোড়া দিয়া সে যে কিছু গুছাইয়া বলিবে এরূপ তাহার শক্তি নাই।

সেই স্থানের জেলখানায় তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। তাহার যে কিছু আহার করা দরকার এ কথা পাহারাওয়ালারা একবারও মনে করিল না। তাহাকে ঐভাবেই রাখিয়া উহারা চলিয়া গেল। মনে করিল, সকালে আসিয়া আবার দেখিবে।

কিন্তু পর দিন প্রত্যূষে ঘণ্টার এজাহার লইবার জন্য যখন তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেখিল সে মাটির উপর মরিয়া পড়িয়া আছে। "মরেছে? কি আশ্চর্য্য!"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তারকেশ্বর

আমার অনেক দিনের সাধ তারকেশ্বর দর্শন করা, কিন্তু নানারূপ বাধা বিঘ্নে মনের ইচ্ছাটাকে এতদিন কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। এবার সঙ্কল্প করিলাম, যেমন করিয়াই হোক্ তারকেশ্বরে যাইতেই হইবে। ১২ই চৈত্র রামনবমীর দিন আমাদের তারকেশ্বর যাওয়া স্থির হইল। আমাদের যাওয়ার কথা শুনিয়া তারকেশ্বর হইতে সদ্য প্রত্যাগত একটী আত্মীয়া বলিলেন, এখন যেন আমরা না যাই, কারণ চৈত্রমাসে সন্ন্যাসের সময়; গেলে লোকের ভিড়ে কষ্ট পাইতে হইবে।

আত্মীয়ের নিষেধে তারকেশ্বর দর্শনের পিপাসা আমার আরও প্রবল হইল। ঠিক করিলাম আমরা উভয়ে যাইব, গোলমালের মধ্যে আর কাহাকেও লইয়া

যাওয়া হইবে না। আমার মেয়েটির মা-অন্ত প্রাণ, মা না হইলে এক মুহূর্ত্তও তাহার কাটিতে চায় না, তাহাকে কেমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া যাইব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। সুখের বিষয় আমাকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। মেয়ে বলিল, অনেকগুলি পুতুল ও খেল্‌না পাইলে সে এখানেই থাকিবে; আমাদের যাত্রাকালে একটুও কাঁদিবে না।

খেল্‌না ও পুতুলের বিনিময়ে এমন সুবিধাটি পাইবার আশায় বেশ একটু আরাম অনুভব করিতে লাগিলাম।

ভোরের গাড়ীতে রওনা হইব বলিয়া রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। কি জানি সময় মত ঘুম যদি না ভাঙ্গে, প্রথম ট্রেণে যাওয়া না হইলে হয়তো আবার নূতন একটা বাধা আসিতে পারে! রাত সাড়ে চারিটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম, তখনও গগনপট চন্দ্র তারকায় ভূষিত। বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ পুষ্পরাশির সৌরভ বহন করিয়া মৃদু মৃদু বহিতেছিল। জনকোলাহলে মুখর কলিকাতা নীরব নিস্তব্ধ। বহুদূর হইতে রহিয়া রহিয়া কলের বাঁশী প্রভাত ঘোষণা করিতেছিল।

মুখ হাত ধুইয়া ষ্টোভে চায়ের জল চড়াইয়া, কাপড় চোপড় গুছাইয়া লইতেছিলাম, এমন সময় কন্যারত্নের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সন্ধ্যায় সে যে সঙ্কল্প করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল, প্রভাতের পূর্ব্বেই তাহার মতের পরিবর্ত্তনে মনটা একেবারেই প্রসন্ন হইল না। সে আমাদের সহিত যাইতে চাহে। অনেক উপদেশ ও প্রলোভনে কিছুই হইল না বলিয়া বিরক্ত হইয়া ধমক দিলাম। ক্ষণকালের মধ্যে আদরিণী কন্যার দুটি চক্ষে বরষার ধারা ছুটিল। সে অশ্রু বর্ষণ দেখিয়া, আমার ইহলোকের সুখ দুঃখের সঙ্গীটি বলিয়া বসিলেন, এত গোলমাল করিয়া আমার আর তারকেশ্বরে গিয়া কায নাই, তিনি একাই যাইবেন। "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য," ইত্যাদি।

তাঁহার এ সদুপদেশ আজ শিরোধার্য্য করা হইল না, বহুদিন বহু যুক্তি মানিয়া লইয়া ঠকিয়া গিয়াছি। সুতরাং মেয়ে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। মেয়ের বাহন স্বরূপ একটি চাকরকে লওয়া ঠিক হইল।

কাপড় জামা পরিয়া, চা পান করিয়া আমরা সকলে হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হইলাম। সুপ্তিমগ্ন কলিকাতা নগরের মধ্য দিয়া ফোঁস ফোঁস শব্দে আমাদের বহন করিয়া মোটর ছুটিয়া চলিল। যথাসময় টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠা গেল, কিন্তু স্ত্রীলোকের পৃথক গাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেও স্ত্রীলোকের পৃথক্ ব্যবস্থা নাই। স্ত্রী পুরুষ সংমিশ্রিত গাড়ীতে বসিয়া মনটা আমার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না, বিরক্তিতে চিত্ত যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি এককোণে জানালার নিকটে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কিয়ৎকাল পরে ষ্টেশন সচকিত করিয়া ঘন ঘন বংশীধ্বনির সহিত গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। তখনও বনের ফাঁকে ফাঁকে রজনীর ম্লান আভা তিরোহিত হয় নাই। পথের দুই পাশে অগণিত বৃক্ষশ্রেণী উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নারিকেল ও তাল বৃক্ষের পত্রাবলী ধীর পবনে আন্দোলিত হইয়া শান্তিময় প্রভাতকে যেন অভিনন্দিত করিতেছে। ঘন বনের মধ্য হইতে কলকূজনে বিহঙ্গেরা সঙ্গীত ঝঙ্কারে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভাতের মধুর স্নিগ্ধতায়, বনবিহঙ্গের কলতানে, কুসুমের নির্ম্মল সুবাসে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। গাড়ী যতই তারকেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—ততই বন যেন নিবিড় হইয়া আসিল। বনের শেষে মাঠ এবং মাঠের শেষ বন দেখিতে লাগিলাম। মাঠে এখন শস্য নাই—দিগন্তরেখা অবধি কর্ষিত অকর্ষিত বহু প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে। প্রান্তরের শেষ সীমায় বনের শ্যামল কান্তি চারিদিকেই বসন্তের সৌন্দর্য্যচ্ছটা প্রকাশ করিতেছে। ক্রমে তালীবনের উচ্চশিরে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন—শৈবালাচ্ছন্ন পুষ্করিণী ছায়ানিবিড় আম্রকানন স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইল। প্রকৃতি যেন সেই মাত্র প্রসাধন শেষে বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়া নির্ম্মল প্রভাতালোকে দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষে রবিকরোজ্জ্বল আকাশের পানে চাহিয়া সূর্য্যোদয় দেখিতে ছিলেন। দূরে

কৃষকের ছোট ছোট কুটীরগুলি দেখিয়া মনে পড়িল—

অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্রকানন রাখালের খেলা গেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল নিশীথ শীতল স্নেহ।

'হরিপাল' ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে একটি স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন। অনুমানে বুঝিলাম তিনি আমার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু আমার অবসর কোথায়? রাস্তার মনোরম দৃশ্যাবলীই যে আমার নয়ন মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। উন্মুখ অন্তর মানুষের সহিত আলাপ পরিচয়ে নিমগ্ন হইতে পারিল না। সে যে ছায়াচ্ছন্ন আঁকা বাঁকা পথটীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে চায়—

তব সঙ্গীত শুনেছি আমার মর্ম্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।

কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা হইল না। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই আমাদের সহযাত্রীণী নামিয়া গেলেন। নূতন কেহ আর উঠিলেন না।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু উত্তপ্ত হইয়া পথের ধূলা উড়াইয়া খেলা আরম্ভ করিল। প্রভাতের চির পরিচিত হাস্যময় রৌদ্র, বৃক্ষশির্ষ হইতে ধরণী বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। রেলপথের অদূরে পানা পুকুরে একটি কৃষকবধূ স্নান করিতেছিল। জলে কলসী ভাসাইয়া বিস্ময় ভরা ডাগর চক্ষু মেলিয়া সে গাড়ীর লোক সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিল। চক্ষু দুটি বড় সুন্দর, দৃষ্টিটা প্রাণ স্পর্শী—অনেকক্ষণ স্মরণ থাকে। এ যেন কবি-বর্ণিত সেই "কালোমেয়ের হরিণ কালো চোখ।" কোথাও বা গরু চরিতেছে। ভাঙ্গা রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ী চলার শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কিশোর গাড়ী-চালক গান ধরিয়াছে "যমুনাকি তট, বংশী বট, আয়—রাধে, আওয়ে।" তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠের সুর বড়ই মধুর লাগিল। কোন্ অতীত কালের একটি তরুণ রাখালের চিরনবীন চিরসুন্দর প্রেম কাহিনী অন্তরে জাগ্রত হইয়া পুলক সঞ্চার করিল।

বেলা সাড়ে নয়টার সময় আমরা তারকেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। প্ল্যাটফর্ম্মে ভয়ানক ভিড়। "জয় বাবা তারক-নাথের জয়" বলিতে বলিতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে যাত্রীগণ নামিতে লাগিল। যাত্রীগণের অধিকাংশই রমণী; কাহারও কোলের ছেলে কাঁদিয়া আকুল, কেহবা তীর্থ করিতে আসিয়াও ঝগড়া ভুলিতে পারে নাই—মুখ-ভঙ্গী করিয়া হস্ত নাড়িয়া সঙ্গিনীর সহিত তুমুল কলহে মাতিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি মাড়োয়ারী যুবক দল বল লইয়া আমোদ করিতে আসিয়াছেন; সঙ্গে উপযুক্ত "সঙ্গিনী"রও অভাব দেখিলাম না। তীর্থে পাপের প্রকাশ্য অভিনয় দেখিয়া মনটা ব্যথিত হইয়া উঠিল।

প্ল্যাটফর্ম্মের ফটকে অত্যন্ত জনতা দেখিয়া আমরা এক পাশে দাঁড়াইয়া ভিড় কমিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। একটি ১৭।১৮ বছরের ছেলে হঠাৎ আমাদের সম্মুখে আসিয়া চির পরিচিতের মত কথা বলিতে লাগিল, এবং তাহার বাড়ীতে আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিল। ভাবিলাম ছেলেটি বুঝি পাণ্ডা, কিন্তু পরিচয়ে জানিলাম সে পাণ্ডা নহে, তবে পাণ্ডারই চেলা—তাহার নাম নিতাই পাল। গুরুর প্রসাদে এখনই তাহার শিকার ধরার কৌশল দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত হইয়া তাহাকেই অনুসরণ করিলাম। ষ্টেশনে যান বাহনাদির ব্যবস্থা ছিল না; পথও অধিক নহে বলিয়া আমরা পদব্রজে বাজারের মধ্য দিয়া নিতাই-য়ের বাসাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। খুব কোলাহলের সহিত বাজারের ক্রয় বিক্রয় চলিতেছিল। বাজারে ফল মূল তরকারী মাছ ও দধি দুগ্ধেরও যথেষ্ট আমদানী দেখি-লাম। বাজারের পর সঙ্কীর্ণ পথের দুই ধারে সারি সারি দোকান দৃষ্টিপথে পড়িল। অধিকাংশ দোকানেই প্রচুর পরিমাণে মাটীর হাঁড়ি কলসী সাজান রহিয়াছে। এখানকার মাটির হাঁড়ি নাকি অত্যন্ত টেঁকসই। যাত্রী-দের সকলের হাতেই হাঁড়ি কলসী।

কিয়দ্দূর গিয়াই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত নিতাইয়ের

কুটীর পাওয়া গেল। বৃহৎ খোলার ঘরখানির মধ্যে মাটীর দেওয়াল দেওয়া পৃথক পৃথক কাম্‌রাগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথায়ও ধূলা বালির লেশও নাই; আলো বাতাস যথেষ্ট আছে। এক কোণের একটি নিরিবিলি কামরায় আমাদের খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর বসাইয়া, নিতাই নূতন শিকারান্বেষণে ধাবিত হইল। আমি তো বাসস্থান পাইয়া মহা খুসী; কর্ত্তাটির কিন্তু মন উঠিতেছিল না। খোলার ঘরে খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসিয়া তিনি অনবরত খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিলেন। আমাদের গৃহখানির সম্মুখেই একটী ছোট্ট বারান্দা, বারান্দার নীচেই প্রকাণ্ড পুকুর। পুকুরের পাড়ে ছায়া-নির্জ্জন ঘাটে একটী বালক বঁড়শীতে মাছ ধরিতেছিল। ছোট একটী মেয়ে নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়া উৎসুক নয়নে জলের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া ছিল।

খানিকক্ষণ পর অনেক গুলি নূতন শিকার লইয়া নিতাই ফিরিয়া আসিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে সকলের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, আমাদের নিকটে আসিয়া আমাদের আহারাদির কি হইবে জিজ্ঞাসা করিল। আমরা বাজারের খাবারের পরিবর্ত্তে রান্না করিয়া খাওয়া স্থির করিয়া নিতাইকে বাজারের টাকা দিলাম। সঙ্গের চাকরকে বাজারে না পাঠাইয়া নিতাইকে টাকা দেওয়াতে সে অতিশয় খুসী হইয়া চলিয়া গেল; অনতিবিলম্বে বাজার লইয়া ফিরিয়া আসিল।

আমরা সম্মুখের পুকুরেই স্নানের আয়োজন করিতে-ছিলাম; নিতাই বলিল এ জলে কেহ স্নান করে না; বাবার দুধ পুকুরে স্নান করিতে হইবে। এখানে আসিয়া নিতাইকেই কর্ণধার করা গিয়াছিল সুতরাং তাহার আদেশ অবহেলা করা গেল না। নিতাইয়ের সহিত বাবার পুকুরে আসিয়া আমার তো চক্ষু স্থির। পুকুরে জল যদিও আশাপ্রদ বটে, কিন্তু ঘাট ভয়ানক পিচ্ছিল। একটী মাত্র ছোট বাঁধানো ঘাট, স্ত্রী পুরুষে গায়ে গা ঠেকাইয়া স্নান করিতেছে। ঘাটের উপরের চাতালে পাণ্ডাদের রীতিমত একটী মেলা বসিয়া গিয়াছে। ছাঁচ, বাতাসা, সুতা, মালা, শাঁখা, সিন্দুর, ফুল, বিল্বদল হইতে আরম্ভ করিয়া চাউল, ডাইল, নুন, তৈল কিছুরই অভাব দেখিলাম না। এখানেও ক্রেতার অভাব নাই। কয়েকটী পুরুষ ও স্ত্রীলোক স্নান করিয়া সিক্ত বসনে বুকে হাঁটিয়া হাঁটিয়া তারকেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিল। কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইয়া এইরূপ বুকে হাঁটিয়া নাকি বাবার পূজা দিতে হয়।

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর ঘাটের জনতা কমিয়া গেল। কোন প্রকারে স্নান ব্যাপার সমাধা করিলাম। ফুল বিল্বদল ও পূজোপকরণ কিনিবার জন্য পূর্ব্বেই নিতাইকে পয়সা দেওয়া হইয়াছিল। দুইটী মাটীর ভাঁড়ে সিদ্ধি মিশ্রিত কাঁচা দুগ্ধ, গঙ্গাজল, ও পূজোকরণ লইয়া আমরা নিতাইয়ের সহিত মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। মন্দিরের সম্মুখে ভয়ানক ভিড়। পূজা আরম্ভ হইয়াছে। বহুকণ্ঠে "জয় বাবা তারকেশ্বর" শব্দ নিনাদিত হইতেছে, নর নারীগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভোলানাথের মন্দির দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। বিনা দক্ষিণায় কাহারও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই। সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় পাণ্ডারা বীর-দর্পে দ্বার রক্ষা করিতেছে। অর্থপিশাচ মানবের নিকটে দেবতার অপমান ও ভক্তের লাঞ্ছনা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইতে লাগিলাম। ভিড় ঠেলিয়া আমরা মন্দিরে ঢুকিতে পারিলাম না। পূজার মন্ত্র পড়াইবার জন্য নিতাই একটী পাণ্ডা নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তিনিও অনেক চেষ্টায় আমাদিগকে মন্দিরে লইয়া যাইতে পারিলেন না; বাহিরে বসিয়া আমরা জনতাহ্রাসের প্রত্যাশায় লোকের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। ঢাকের উচ্চ রবের সহিত তারকনাথের স্তব ও কোলাহল মিশিয়া পুরী প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছিল।

ক্ষণকাল পর পাণ্ডা আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেলেন; তখন ভিড় পূর্ব্বাপেক্ষা ঢের কম। মন্দির তেমন আলোকিত নহে। ভক্তের পূজা উপহারে পুষ্প বিল্বদলে শিবলিঙ্গ আচ্ছাদিত। আমি দক্ষিণ হস্তে বিগ্রহ স্পর্শ করিয়া তাঁহারই সন্নিকটে বসিয়া পড়ি-

লাম। মন্দিরের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল। ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিতেছিলেন; ধূপ ধুনা ও পুষ্প সৌরভে সে পবিত্র স্থান আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল, বাহিরে বিপুল জনতা, করুণ কোলাহল। পাণ্ডা পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার কর্ণে তাহার এক বর্ণও প্রবেশ করিল না। আমি দুই হস্তে দেবতাকে বেষ্টন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধার মত বসিয়া রহিলাম। কি একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দোচ্ছ্বাসে আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। কামনার কিছুই যেন খুঁজিয়া পাইলাম না। কোনও অভাব অভিযোগের কথাও স্মরণ হইল না! আমি যেন সবই পাইয়াছি—প্রাপ্তির পুলকে আমার হৃদয়-নদী কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মাল্য স্তূপের মধ্য হইতে দেবতা যেন আমার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আমাকে অভয় দিতেছিলেন! আমি পূজা ভুলিয়া গেলাম, মন্ত্র ভুলিয়া গেলাম, ক্ষণকালের জন্ত জগৎ ভুলিয়া আপন ভুলিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণ প্রান্তে মুদ্রিত নয়নে স্বপ্নাবিষ্টার মত বসিয়া রহিলাম।

আর কতক্ষণ এমনি করিয়া বসিয়া থাকিতাম জানি না; সহসা স্বামীর আহ্বানে আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। প্রণামান্তে বাহিরে আসিলাম—আমার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইলেও বাহিরের একটু পরিবর্ত্তনও চক্ষে পড়িল না। দারিদ্রের প্রতি পাণ্ডাদের তেমনই বীভৎস অত্যাচার, দুঃখীর সকরুণ ক্রন্দন, বিলাসীর নির্লজ্জ আচরণে প্রসন্ন হৃদয়টা আবার বিষণ্ণ হইল। যে শুভক্ষণটিতে অন্তরের অন্তস্তলে অমৃত প্রবাহ বহিয়াছিল—ধীরে ধীরে তাহা যেন মরম কোণে লীন হইয়া আসিল।

মন্দিরের সন্নিকটেই নাট মন্দির। দুই একটি পুরুষ আর অনেকগুলি স্ত্রীলোক ধন্না দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ ১০।২ দিন অনাহারে পড়িয়া আছে, তারকেশ্বরের চরণামৃত ব্যতীত অন্ত কিছু আহার করিবার নিয়ম নাই। অধিকাংশ রমণী ধন্না দিয়াও সঙ্গিনীর সহিত সুখ দুঃখের কথা কহিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছে। চারিদিকেই ভিখারীর উৎপাত, একঘেয়ে সুরে একই কথা "রাজবাবু একটা পয়সা, রাণীমা একটা পয়সা।" রাজাবাবুর পকেটের ও রাণীমার অঞ্চলের পয়সাগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া অতি কষ্টে তাহাদের কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল। বাবার অঙ্গনে বসিয়া একটী খঞ্জ ব্রাহ্মণ সুললিত কণ্ঠে শিবাষ্টক আবৃত্ত করিতেছিল

"প্রভু মীশ মনীশ মশেষ গুণং
গুণহীন মহীশ গরলাভরণং,
রণ নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্য পুরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।

সময়োচিত স্তবটি আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। ব্রাহ্মণকে একটি পয়সা দিয়া পুনরায় মন্দিরের নিকটে আসিলাম। তারকেশ্বরের মন্দিরটি ক্ষুদ্র, মন্দিরের চূড়ায় একটি ত্রিশূল সূর্য্য করণে ঝকমক করিতেছিল। এই দুর্গা নামের মন্দিরে ত্রিশূল চিহ্ন দেখিয়াই কি কবি গাহিয়াছিলেন—

নাচিছে বাহিনী অগ্রে উড়িছে পতাকা,
শিবের ত্রিশূল চিহ্ন শিবনাম আঁকা!

মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দর্শনান্তে নিতাইয়ের সহিত আমরা বাসায় ফিরিলাম। বাজার হইতে আনীত একটি তরমুজ, সন্দেশ ও বাবার প্রসাদ চিনির ছাঁচে জলযোগ হইল। তাহার পর রন্ধনের পালা; তীর্থে আসিয়া মাছ খাওয়া হইবে না পূর্ব্বেই স্থির ছিল। ডাইল তরকারি ইত্যাদি রান্নাও অনেক হাঙ্গাম, তাই এ দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে খিচুড়ি রান্নাই স্থির হইল। প্রচুর পরিমাণে ঘি আনা হইয়াছিল। বাসার ঝি আসিয়া রান্নার যোগাড় করিয়া উনুন ধরাইয়া দিল; পুকুরের ঘাটের উপরে চারিদিকে বেড়া ঘেরা বারান্দায় খিচুরী ও আলুর দম রান্না করিলাম। দোকান হইতে দই ও মিষ্টান্ন আনাইয়া ভোজন ব্যাপার সমাধা হইল।

আহারান্তে চাটাইয়ে বসিয়া আমাদের পাশের ঘরের সহযাত্রী ও যাত্রীনীদের জলযোগ দেখিতে লাগিলাম। তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে ছেলে মেয়েতে প্রায় ১৭।১৮টী লোক আসিয়াছেন; রান্না খাওয়ার এক বিরাট পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। এখানে মাছ অত্যন্ত সস্তা, তাঁহারা বৃহৎ একটা রুইমাছ কিনিয়া আনিয়াছিলেন, কয়েকটী

বালক বালিকা উৎফুল্ল নয়নে ঘন ঘন মাছের দিকে চাহিয়া বোধ হয় উহার সদ্‌গতির চিন্তা করিতেছিল। দলের কর্ত্তাটি নিতাইয়ের সহিত বাজারের হিসাব লইয়াই মহাব্যস্ত। তাঁহার এক পয়সার লঙ্কা না কি আধ পয়সার ফোড়নের হিসাবে গোল বাধিয়াছে; তাই তুমুল জটলা। যাঁহাদের আহারের এত আয়োজন, দধি দুগ্ধের কত সরবরাহ, তাঁহাদেরই একটী পয়সার প্রতি এত মায়া দেখিয়া আমার খুবই আমোদ লাগিতেছিল। বসিয়া বসিয়া আমরা যখন আমোদ উপভোগ করিতেছিলাম; এমন সময় উচ্চরবে ঢাক বাজিয়া উঠিল। ভোগের পর তারকেশ্বরের শিঙ্গারবেশ হইতেছিল, তাহাই দেখিবার জন্ম পাণ্ডা আমাদের ডাকিতে আসিলেন। তখনকার মত হিসাব স্থগিত রাখিয়া নিতাই আমাদের সঙ্গে চলিল।

দ্বিপ্রহর বেলা, সূর্য্যদেব অগ্নিবর্ষণ করিতেছিলেন; চারিদিকে মরীচিকা স্রোত খেলিতেছিল। বাতাস শুব্ধ, বিহঙ্গ কণ্ঠ নীরব, দোকান পসার বন্ধ। বাসা হইতে মন্দিরের পথটুকু আসিতেই ঘামে কাপড় ভিজিয়া গেল। পিপাসায় গলা শুকাইয়া আসিল। অতিকষ্টে পথটা অতিক্রম করিয়া মন্দিরের ছায়াশীতল বারান্দায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

শিঙ্গার বেশ দর্শন করিবার জন্ম এ দ্বিপ্রহরের ভীষণ গরমের মধ্যেও লোকসংখ্যা কম হয় নাই, কিন্তু প্রভাতের তুলনায় এ জনতা অনেক অল্প। এখনও বিনা পয়সায় কাহারও দেবদর্শনের অধিকার নাই। একবার পয়সা দিয়া আমাদের শিঙ্গার বেশ দর্শন ঘটিল না; সম্মুখের লোক সরাইয়া ভাল করিয়া দর্শন করিবার জন্ম পুনরায় পয়সা দিতে হইল।

যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষু জুড়াইয়া গেল; হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ফুল বিল্বদলে ও পুষ্পমাল্যে শিব-লিঙ্গকে অতি রমনীয় বেশে সজ্জিত করা হইয়াছিল; তাহার উপর মুক্তামালা ও স্বর্ণাভরণ ঝিক্ মিক্ করিতে-ছিল। বিগ্রহের মস্তকে চূড়া হইয়া ছিল একটী শ্বেত কুরুবক কলি; বামে একখানি সুবর্ণের ত্রিশূল দেখিলাম; একখানি রূপার পাত্রে সোণার বিল্বদলের মালা গিনির মালা প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। পূজার বাসনগুলি সমস্তই রৌপ্য নির্ম্মিত। দুইটী রমণী সিক্ত বস্ত্রে অঞ্চল দিয়া মন্দির মার্জ্জনা করিতেছিল। আর দুইজন তামার কলসী ভরিয়া ভরিয়া জল আনিয়া ঢালিতেছিল। প্রাণ ভরিয়া দর্শনের পর প্রণাম করিয়া মন্দিরের পাশ দিয়া বাসায় ফিরিবার সময়, ভোগের ঘরে পাণ্ডাদের বাদানুবাদ শুনিলাম। খুব সম্ভব ভোগ ভাগ লইয়াই এ বচসার সূত্রপাত। ইহারাই নাকি সংসারে লিপ্ত মানবের মুক্তি পথপ্রদর্শক!

পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, আমাদের নিভৃত খোপটীর মধ্যে ঢুকিয়া সকলে খুব খানিকটা জল পান করিলাম। একে রৌদ্রে ভ্রমণ, দ্বিতীয় শরীরের মধ্যে খিচুড়ীর ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, কাযেই দেখিতে দেখিতে কলিকাতা হইতে আনীত জলের ভাণ্ড শেষ হইয়া গেল, কিন্তু পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। তারকে-শ্বর জলাভূমি, যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই পানা পুকুর শৈবালাচ্ছন্ন ডোবা, কিন্তু সে জল পান করিতে সাহস হইল না। ঝিকে ডাকিলা জলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম খানিকটা দূরে একটী পানীয় জলের পুকুর আছে, তারকেশ্বর বাসীদের তাহাই একমাত্র অবলম্বন। কলসী লইয়া ঝি জল আনিতে গেল। ঝির প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমাদের সাহল না। মাটীর ভাঁড়ে পাণ্ডা চরণামৃত দিয়া গিয়াছিল—উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই চরণামৃত পান করিলাম। গঙ্গাজলের সহিত অল্প সিদ্ধি মিশ্রিত সুস্বাদু শীতল চরণামৃত অমৃতের মত লাগিল। বড়ই আরাম অনুভব করিলাম।

চাটাইয়ের উপর শয়ন করিয়া তারকেশ্বরের মাহাত্ম্য পড়িতে পড়িতে কখন যে চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া গিয়াছিল জানি না। যাত্রীদের কোলাহলে বালক বালিকার ক্রন্দনে নিদ্রাভঙ্গে দেখি বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। রৌদ্র তাপিতা বসুন্ধরায় স্নিগ্ধ মধুর বিজনতা বিরাজমান। পাশের ঘরের আহারাদি তখনও সমাধা হয় নাই, মেয়েরা খাইতে বসিয়াছে। তাহাদের কর্ত্তা আহারান্তে বারান্দায়

বসিয়া নিতায়ের সহিত কথোপ কথন করিতেছেন ; মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন ; অনুমানে বুঝিলাম এখনও তাঁহার হিসাবের গোল মেটে নাই।

মুখ ধুইয়া গা মুছিয়া জলযোগের পর আমাদের জিনিষ পত্র বাঁধিয়া যাইবার জন্ত প্রস্তত হইতে লাগিলাম। পাণ্ডা নিতাই ও ঝিকে ডাকিয়া পুরস্কারে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া আমরা বাসা পরিত্যাগ করিলাম। নিতাই ও ঝি বহুদুর পর্য্যন্ত আমাদের পশ্চাতে আসিল, পুনরায় তারকেশ্বরে আসিলে তাহাদের গৃহে পদধূলি দিতে বারবার অনুরোধ করিল। তাহাদের নাম ধাম পাছে আমরা ভুলিয়া যাই এই আশঙ্কায় আকুল হইয়া নাম লিখিয়া লইবার জন্ত মিনতি করিতে লাগিল। আমার স্বামী নোটবুকে নাম ঠিকানা লিখিয়া লইলেন। নিশ্চিন্ত মনে তাহারা বিদায় হইল। আমরা বাজারে উপনীত হইলাম। এবেলাও বাজার মন্দ লাগে নাই। স্থানে স্থানে স্তূপাকারে তরকারী ও জল রহিয়াছে। সাম ন্য দুই একটা জিনিষ কিনিয়া আমরা ষ্টেশনের পথ ধরিলাম। পথে ছবির দোকান হইতে তারকেশ্বর মন্দিরের একখান ছবি কেনা হইল। দূর হইতে মোহান্তের প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা দৃষ্টিপথে পড়িল। কত মোহান্ত আসিয়াছেন গিয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি কাহিনী ধরাবক্ষ হইতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে, কিন্তু সেই প্রাসাদ, দীঘির কালোজলে ছায়া ফেলিয়া আজিও তেমনি সগৌরবে দাঁড়াইয়া আছে।

গাড়ীর বিলম্ব জানিয়া পথের পাশের একটি ছায়াময় বকুল তলে বসিয়া আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঝুর ঝুর করিয়া প্রস্ফুট বকুল আমাদের মাথার উপরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বায়ু বকুল সৌরভে সৌরভময় হইল। বৃক্ষের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে মিষ্টস্বরে কোকিল ডাকিয়া উঠিল কুউ! কুউ! দূরে প্রান্তরের শেষ সীমায় লোহিতরাগে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। বৃক্ষশির অস্তগামী সূর্য্যকিরণে অপরূপ শোভার আধার হইল।

কোথা হইতে একপাল ভিখারী ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। আর বসিয়া থাকা থাকা চলিল না। বিরক্ত হইয়া ষ্টেশনে আসিলাম।

বেলা দুইটার গাড়ীতে অনেক যাত্রী চলিয়া গিয়াছে, অনেক যাত্রী আবার আরতি দর্শনের আশায় রহিয়া গিয়াছে, তাই এ গাড়ী খানিতে ভিড় হইল না। প্রভাতে অনর্থক স্ত্রীলোকের গাড়ী খুঁজিয়া হয়রান হওয়া গিয়াছিল, এখন আর খোঁজাখুজির মধ্যে গেলাম না।

একটি নিরিবিলি কামরাতে উঠিলাম। আমাদের গাড়ীতে আর কেহ উঠিল না ; কেবল এক কোণে একটি মাড়োয়ারী যুবক তাহার বাঙ্গালিনী "সঙ্গিনী"টিকে লইয়া বসিয়া ছিল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল ; দিবসের স্নিগ্ধ আলো মিলাইয়া গেল। ফিরিওয়ালারা ষ্টেশন সচকিত করিয়া গরম চা ও শীতল সরবৎ হাঁকিতে লাগিল। পুরী হইতে সন্ধ্যারতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে গাড়ী প্লাটফর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখের বহুদূর বিস্তৃত পথে ছুটিয়া চলিল। দূর হইতে চাহিয়া দেখিলাম তারকেশ্বরের মন্দির চূড়ায় সেই স্বর্ণবর্ণের ত্রিশূল, গোধূলি আভায় মণ্ডিত। দেখিতে দেখিতে বিটপি-শ্রেণীর অন্তরালে মন্দিরচূড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। অকস্মাৎ হৃদয়টা যেন কেমন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। হাত যোড় করিয়া তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। মনে মনে বলিলাম, "আবার আনিও প্রভু ; তোমার চরণ প্রান্তে এ অধম সন্তানকে আবার আনিও। তোমার দ্বারে আসিয়া আজ বড় শান্তি বড় তৃপ্তি পাইলাম।" নিত্যকার হাসি অশ্রুর মধ্যে এ এক স্মরণীয় দিন!

একটা অজানিত আশার আবেশে বিভোর হইয়া যে পথে প্রভাতে আসিয়াছিলাম ;—সন্ধ্যায় সেই পথেই ফিরিয়া চলিলাম। সেই উন্মুক্ত প্রান্তর, সেই শ্যামলকান্তি বৃক্ষের সারি। প্রভেদ, প্রভাতে যাহা রক্তচ্ছটায় প্রতিফলিত ছিল, সন্ধ্যায় তাহা শ্যাম শোভায় শোভমান। সেই কাঁচা অসমতল পথ দিয়া "গোঠের ধূলা গায়েতে মাখি, রাখাল ফেরে উদাস আঁখি!" কোথাও বা

"পথের বাঁকে বধূ চলে নত আঁখে; ভরাঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।" দেখিতে দেখিতে "সেওড়াফুলি" ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। মাড়োয়ারী যুবক সিগারেট ধরাইল, তাহার সঙ্গিনী পাণ কিনিল। আমরা সকলে চা পান করিলাম।

রেল লাইনের অদূরে বসিয়া একটি অন্ধ গান গাহিতেছিল—

"আমি—আঁধারে করি না ভয়,
আঁধার বড় ভালবাসি;
এই, আঁধারে দেখ্‌তে পাই
শ্যামা মায়ের মধুর হাসি!"

সুরটা ভারী করুণ। অনেকেই গাড়ীর মধ্য হইতে পয়সা আনী ছুড়িয়া দিতে লাগিলেন; আমারও কিছু দিতে ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু দূরত্বের জন্য দিতে পারিলাম না। কাছে গিয়া দিবারও সময় ছিল না, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অন্ধের সকরুণ স্বরটা অন্তরের অন্তস্তলে রহিয়া রহিয়া ধ্বনিতে লাগিল "আঁধারে করি না ভয়, আঁধার বড় ভালবাসি;" বনফুলের মিষ্ট গন্ধে বাতাস উতলা হইয়া উঠিল। গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী জঙ্গল হইতে শৃগালেরা ডাকিয়া উঠিল।

'জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী' দেখিয়াই বোধহয় আমাদের সহযাত্রিনী হর্ষাবেগে গান ধরিলেন—

"আমার চোখে যদি লাগে ভাল কেন দেখ্‌বো না!
দেখ্‌বো শুধু মুখখানি তার; আরতো কিছু
চাইবো না।"

সঙ্গীতের পর সঙ্গীতের ধারা ছুটিতে লাগিল। আমি বেঞ্চির গদির উপর শয়ন করিয়া বাহিরে চন্দ্রাতপের তলে ফলফুলে সুশোভিতা ধরণীর শ্যামল শোভা দেখিতে দেখিতে স্বপ্নাবিষ্টার মত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলাম। আধ স্বপ্নে আধ জাগরণে কোথা দিয়া যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইল বুঝিতেই পারিলাম না। জনকোলাহলের শব্দে উঠিয়া দেখি, রাত সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে; আমরা হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়াছি।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

প্রাচীন সাঙ্কাশ্য নগর

বৌদ্ধ সাহিত্যে সাঙ্কাশ্য নামে একটি প্রাচীন নগরের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা বৌদ্ধদিগের অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। কথিত আছে যে সিদ্ধার্থের জন্মের সাতদিন পরে তাঁহার জননী মায়াদেবী ইহলোক ত্যাগ করেন এবং দেবরাজ শক্রের পুরী ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করেন। একারণ তাঁহার পুত্রের বুদ্ধত্বলাভের পর তদীয় মুখনিঃসৃত অমৃতোপম উপদেশ-বাণী শ্রবণ করা মায়াদেবীর ঘটিয়া উঠে নাই। সেজন্য তথাগত বুদ্ধত্বলাভের সপ্তমবর্ষে একবার পৃথিবী ছাড়িয়া ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করেন এবং তথায় তিনমাসকাল অবস্থান করিয়া মায়াদেবীর নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শক্র ও ব্রহ্মার সহিত বুদ্ধদেব সাঙ্কাশ্যধামেই অবতরণ করিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজকগণের বিবরণ মধ্যেও সাঙ্কাশ্যের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহারাও বৌদ্ধ কিম্বদন্তীর অনুরূপ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ফাহিয়ান, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউয়েনসঙ্গ ও অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে উকোং এদেশে আসিয়াছিলেন। ফাহিয়ান "সেংকিয়াসি" নামে একস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, বলাবাহুল্য তাহা সাঙ্কাশ্যেরই অপভ্রংশ। হিউয়েনসঙ্গের ভ্রমণকাহিনীতে সাঙ্কাশ্য 'কিপিথা'

নামে উল্লিখিত হইয়াছে। সাঙ্কাশ্যের এরূপ নামকরণের কারণ কি তাহা বলা যায় না। 'বৃহজ্জাতকে' আছে যে বরাহমিহির কাপিত্থকে ভগবান সূর্য্যদেবের অনুকম্পা লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে চীন পরিব্রাজকের কিপিথা বা কপিথ ইহারই সহিত অভিন্ন। ডা: কার্ণি ইহার অর্থ করেন যে বরাহমিহির সাঙ্কাশ্যে শিক্ষালাভ করেন। সে যাহা হউক প্রাচীন যুগে সাঙ্কাশ্য যে একটি প্রধান নগর ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। বর্ত্তমানে সাঙ্কাশ্যের যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতেও ঐ কথাই সমর্থিত হইতেছে। উকোংএর বিবরণে এইস্থান "দেবাবতার" নামে কথিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য তাহা দেবাবতরণেরই রূপান্তর।

রামায়ণে সাঙ্কাশ্যনগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। উহাতে সাঙ্কাশ্য স্বর্গোপমা সর্ব্বকল্যাণময়ী ও ইক্ষুমতীতটবর্ত্তিনী এবং পুষ্পকরথের সদৃশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নগরীর প্রাচীরপরিসর পরসৈন্যনিবারণার্থ যন্ত্রকলকে পরিব্যাপ্ত থাকিত বলিয়া জানা যায়। ১ সাঙ্কাশ্য প্রথমে সুধন্বা নৃপতির রাজ্য ছিল। তিনি সীতা ও হরধনুলাভের আশায় মিথিলা অবরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে জনকের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। শিরধ্বজ জনক অতঃপর স্বীয় কনিষ্ঠভ্রাতা কুশধ্বজকে উক্ত রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ২ রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিলে পরে সীতার বিবাহ কালে রাজা জনক কুশধ্বজকে আনয়নের জন্য সাঙ্কাশ্য নগরে দূতপ্রেরণ করেন। এই কুশধ্বজেরই দুই কন্যার সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণেও শিরধ্বজ জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজ সাঙ্কাশ্যনগরাধিপতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ৩

ইহার পর বহুকাল আর সাঙ্কাশ্যের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ও প্রাদুর্ভাবকালে সঙ্কাশ্য একটি প্রধানতম নগর ও পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। অশোকের সময়েও যে সাঙ্কাশ্য একটি পবিত্রস্থান বিবেচিত হইত তাহার প্রমাণ স্বরূপ এখানে মৌর্য্যসম্রাটের প্রতিষ্ঠিত একটি স্তম্ভের শীর্ষদেশ পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধেরা আজিও এ কাহিনীতে আস্থাবান। সাঁচি ও ভারহুতের স্তূপবেষ্টনীর চিত্রমালামধ্যেও বুদ্ধাবতরণের চিত্র খোদিত দেখা যায়। তাহা সর্ব্বাংশে বৌদ্ধসাহিত্যবর্ণিত কাহিনী ও পরিব্রাজকগণের বিবরণের সহিত অভিন্ন। প্রাচীন শিল্পীগণ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বা চিত্র গড়িত না—তাই এখানে বুদ্ধদেব অঙ্কিত হয়েন নাই। উপরে বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসন দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব বুঝান হইতেছে। তাঁহার চারিদিকে পূজারত দেবগণ অঙ্কিত—চিত্রের মধ্যে দীর্ঘসোপান, তাহার চারিপাশে নানা দেবমূর্ত্তি—ডান দিকে চামর ও পদ্মহস্তে ব্রহ্মা। সিড়ির নীচে বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসন পুনরায় দেখান হইয়াছে—তাহার চারিদিকে পূজারত বহু মনুষ্যমূর্ত্তি দ্বারা বোঝান হইয়াছে যে সকলে ধরাধামে অবতরণ করিয়াছেন। ৪ প্রাচীন সাঙ্কাশ্যের নিদর্শন বর্ত্তমান সঙ্কিশ গ্রামেও এক খণ্ড প্রস্তরে খোদিত এইরূপ একটি চিত্র কানিংহাম পাইয়াছিলেন।

প্রাচীন সাহিত্যের সাঙ্কাশ্যের সহিত বর্ত্তমান সঙ্কিশের বা ফাহিয়ানের সেংকিয়াসির কতকটা নামের মিল আছে বলিয়াই যে ঐ তিন স্থান অভিন্ন স্থির হইয়াছে তাহা নহে। মথুরা, কনোজ প্রভৃতি সুপরিচিত স্থানসমূহ হইতে সাঙ্কাশ্যের যে দূরত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বর্ত্তমান গ্রামটিকেই সেই প্রাচীন নগরের নিদর্শন বলিয়া জানা যায় এবং এখানকার ধ্বংসরাশি হইতে তাহা সমর্থিত হইতেছে। যুক্ত প্রদেশের ফরুখাবাদ জেলার প্রধান নগর ফতেগড় হইতে ২৩ মাইল পশ্চিমে কালীনদী তীরে সঙ্কিশ গ্রাম অবস্থিত; মৈনপুরী হইতে ইহার দূরত্ব উত্তরপূর্ব্বদিকে প্রায় ১৫ মাইল।

---

১ আদিকাণ্ড ৭০। ২—৩। ২ আদিকাণ্ড ৭১। ১৬—১৯

৩ বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ৫ম অধ্যায় ১২

৪ Sir John Marshall, A Guide to Sanchi p 56. Plate III.

হিউয়েনসঙ্গ সাঙ্কাশ্য প্রদেশের পরিধি প্রায় ৩৩৩ মাইল এবং রাজধানীর পরিধি প্রায় সাড়ে ছয় মাইল বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। দেশের জলবায়ু ভাল এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গোধূমই প্রধান, অধিবাসীরা কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং অধ্যয়নশীল। নগরে ১০০০ হীনযান মতাবলম্বী যতি বাস করে এবং ভিন্নধর্ম্মীদের ১০টি দেবমন্দির আছে। নগরের পূর্ব্বদিকে সুন্দর একটি সঙ্ঘারাম মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। উহার প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে মূল্যবান দ্রব্য নির্ম্মিত তিনটি সিঁড়ি আছে। এই থানেই তথাগত অবতরণ করিয়াছিলেন। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ম তিনি ইচ্ছুক হইলে শক্র দিব্যশক্তি বলে তিনটী সোপান গঠন করেন। মাঝেরটী সুবর্ণ, বামেরটী নির্ম্মলস্ফটিক ও দক্ষিণেরটী রজত নির্ম্মিত। তথাগত মধ্যেরটী দ্বারা, ব্রহ্মা দক্ষিণেরটী এবং শক্র বামের সোপানযোগে অবতরণ করেন। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেও সোপানত্রয় ঐ স্থানে দৃষ্ট হইত; বর্ত্তমানে কিন্তু ঐ গুলি ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী রাজগণ সিড়ি দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণচিত্তে মণিরত্নাদি অলঙ্কৃত তিনটী সিঁড়ি ঐ স্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উপরে একটি বিহারে তথাগত, ব্রহ্মা ও শক্রের মূর্ত্তি আছে।

বিহারের বাহিরে অল্পদূরেই অশোক রাজপ্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে। তাহা বেগুনি রঙের কঠিন এবং সূক্ষ্মদানাদার প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহা প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ এবং খুব উজ্জ্বল। ইহার উপরে, সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর দিয়া উপবিষ্ট একটি সিংহমূর্ত্তি আছে। বিহারের দক্ষিণপূর্ব্বে নাগহ্রদ অবস্থিত। ঐ নাগ, পবিত্র চিহ্নগুলি অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষা করে এবং সেজন্ম কেহ ঐগুলির অনাদর বা ক্ষতি করিতে পারে না। কালের বশে উহারা নষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু কোনও মানবের উহাদের ক্ষতি করিবার সাধ্য নাই।

ফাহিয়ানের বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং তিনি সাঙ্কাশ্যে আরও অনেকগুলি স্তূপ বিহারাদির উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের কথা হিউয়েন সঙ্গের লেখার মধ্যে নাই। এক বিষয়ে উভয়ের রচনার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। হিউয়েন সঙ্গ বলিয়াছেন যে বুদ্ধদেব ব্রহ্মা, ও ইন্দ্র যে সোপানত্রয় যোগে নামিয়াছিলেন, সেগুলি কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেও দৃষ্ট হইত। কিন্তু ফাহিয়ান বলেন সকলে অবতরণ করিবার পর তিনটী ধাপ বাদে সিড়িগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়। পরে অশোক ভূগর্ভে ঐগুলি কতদূর গিয়াছে খুঁড়িয়া দেখিবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। তাহারা খুঁড়িতে খুঁড়িতে পৃথিবীর প্রান্তভাগে পৌঁছিলেও সোপানশ্রেণীর শেষ পাইল না। ইহাতে রাজার ভক্তি ও বিশ্বাস খুব বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি সিঁড়ির উপরে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিলেন। ইহার মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। বিহারের পশ্চাতে রাজা অশোক একটি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেন। তাহার উপরে একটি সিংহমূর্ত্তি আছে। স্তম্ভটী ৩০ হাত উচ্চ এবং খুব উজ্জ্বল। কোন সময়ে কয়েকজন ভিন্নধর্ম্মী আচার্য্যের সহিত এই স্থানের অধিকার লইয়া শ্রমণগণের তর্কবিতর্ক হইতেছিল। শ্রমণগণ পরাজিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে স্থির হইল যদি যথার্থই এইস্থান তাঁহাদের হয় তবে সেই মুহূর্ত্তেই কোন এক অমানুষিক ঘটনা ঘটিয়া তাহা সপ্রমাণ করিবে। এই কথা বলামাত্র উপরের প্রস্তরের সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ইহাতে বিধর্ম্মীগণ লজ্জিত হইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিল।

ফাহিয়ানও সকাশ্যের সুখ সমৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন। এইদেশ অত্যন্ত উর্ব্বর, অধিবাসীরা সমৃদ্ধ এবং অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের সহিত তাহাদের অবস্থার তুলনাই হইতে পারে না। ভিন্ন দেশবাসিগণ এদেশে আসিলে তাঁহাদের যথেষ্ট সমাদর করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই দেওয়া হয়। এই স্থানে এত ছোট ছোট স্তূপ আছে যে, যদি কেহ সমস্ত দিন ধরিয়া গণিতে থাকে তাহা হইলেও শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। যদি কেহ প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণের জন্ম ইচ্ছুক থাকেন তবে

প্রত্যেক স্তূপের পাশে একজন করিয়া লোক রাখিয়া পরে তাহাদের গণনা করিতে পারেন।

এক সহস্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সাধারণ ভাণ্ডার হইতে আহার্য্য পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে হীনযান ও মহাযান উভয় মতাবলম্বীই আছেন। তাঁহারা একত্রে বাস করেন এবং শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট এক দৈত্য তাঁহাদের রক্ষা করে। এই দৈত্য যথাসময়ে প্রচুর বারিবর্ষণ করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা সাধন করে এবং অন্যান্য বিপদাপদ হইতে দেশ রক্ষা করে। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সকলে দৈত্যের এক বাসস্থান নির্ম্মাণ এবং আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বর্ষাঋতুর অপগমে দৈত্য শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট ক্ষুদ্র এক সর্পের আকার ধারণ করে। ভিক্ষুগণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষীরপূর্ণ একটী তাম্রপাত্র তাহার বাসস্থানে রাখিয়া দেয় এবং সকলে মিলিয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা করে। তাহার পর দৈত্য হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। এইরূপে বৎসরে একবার সে দেখা দিয়া থাকে।"

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সর্ব্ব প্রথম সঙ্কিশ গ্রামকে প্রাচীন সাঙ্কাশ্য বলিয়া স্থির করেন এবং তাহার কুড়ি বৎসর পরে এখানে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন।

পার্শ্বস্থ সমতলক্ষেত্র হইতে ৪০ ফুট উচ্চ ভগ্নস্তূপের উপরে সঙ্কিশ গ্রাম অবস্থিত। এই টিপি সাধারণের নিকট গড় বা কেল্লা নামে পরিচিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০০ হস্ত ও বিস্তার ৬৫০ হস্ত হইবে। কেল্লার কেন্দ্রস্থল হইতে কিছুদূর দক্ষিণ দিকে ভগ্ন একটি ইষ্টক স্তূপের উপরে আধুনিক কালে নির্ম্মিত বিশারী বা বিশালী দেবীর মন্দির অবস্থিত। কেল্লার চারিপাশে ছোটবড় নানা আকারের বহুসংখ্যক টিপি আছে। সেগুলি সঙ্কিশগ্রামকে মণ্ডলাকারে ঘিরিয়া অবস্থিত। বলা বাহুল্য এইগুলি সাঙ্কাশ্যেরই নিদর্শন। কেল্লা বা যে টিপির উপর সঙ্কিশ অবস্থিত তাহা প্রাচীন নগরীর শুধু কেন্দ্রস্থল মাত্র। রাজপ্রাসাদ এবং পবিত্র সোপানত্রয়ের সন্নিকটে নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দিরগুলিই শুধু এই অংশে অবস্থিত ছিল। ইহারই চারিপাশে জনসাধারণের অধ্যুষিত সাঙ্কাশ্যের নগরাংশ অবস্থিত ছিল। তাহার নিদর্শন বর্ত্তমানে প্রায় দুইমাইল ব্যাপী স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। তাহার চারিদিকে যে উচ্চ প্রাচীর ছিল তাহার নিদর্শন এখনও দেখা যায়।

বিশাড়ীদেবীর মন্দিরের ২০০ ফুট দক্ষিণে একটি ছোট টিপি আছে, ইহাকে কানিংহাম দেখিয়া কোন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বদিকে ৬০০ ফুট দূরে নিবিকাকোট নামে পরিচিত একটি প্রকাণ্ড টিবি আছে। তাহার পরিমাণ ৬০০×৫০০ ফুট হইবে। টিবিটি ভগ্ন ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডে পূর্ণ। ইটগুলি যে বেশ বড় আকারের ছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। কানিংহাম ইহাকে কোনও সঙ্ঘারামের নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। এই স্থানের অদূরে দক্ষিণপূর্ব্ব, উত্তরপূর্ব্ব এবং উত্তর কোণে তিনটি বিশাল গোলাকার ভগ্ন স্তূপ আছে। গ্রামবাসীরা ইষ্টকসমূহ খুলিয়া লইয়া যাওয়াতে ঐগুলি এক্ষণে মৃত্তিকা ও রাবিশের স্তূপ হইয়া পড়িয়া আছে। কানিংহাম ইহাদের হিউয়েন সঙোক্ত তিনটী স্তূপ বলিয়া মনে করেন। বিশালীদেবীর মন্দিরনিম্নস্থ স্তূপটি এককালে যে বেশ প্রকাণ্ড ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। উহা এখনও ২০ ফুট উচ্চ এবং তলদেশের ব্যাস ১৬০ ফুট। ইষ্টকগুলি নিতান্ত প্রকাণ্ড; দৈর্ঘ্যে সাড়ে ২৪, প্রস্থে সাড়ে ১০ ও স্থূলত্বে সাড়ে ৩ ইঞ্চি। এই ধরণের বৃহৎ ইট সারনাথ, মহাবোধি, বৈশালী, রাজগৃহ, কুশীনগর প্রভৃতি অতি প্রাচীন স্থানসমূহের সুপ্রাচীনযুগে নির্ম্মিত স্তূপ চৈত্যাদির ধ্বংসাবশেষে দেখা যায়। হিউয়েনসঙ্গ ঐ সকল স্থানে যে সকল স্তূপ অশোকরাজ নির্ম্মিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তৎসমুদয় এই ধরণের বৃহৎ ইষ্টকে নির্ম্মিত। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের হর্ম্ম্যাদিতে ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ইট দেখা যায়। প্রাচীন ইটগুলি এখনও যে প্রকার সুন্দর ও কঠিন অবস্থায় দেখা যায় তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আজ দ্বিসহস্রাধিক বৎসর অতীত হইলেও তাহা আজকালকার যুগের ইট অপেক্ষা ঢের বেশী মজবুত। পূর্ব্বোক্ত

প্রাচীন স্থানগুলিতে দেখা যায় যে অধিবাসীরা ঐ প্রকার ইট বাহির করিয়া তাহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণ করে, নূতন ইষ্টক নির্ম্মাণের আর ক্লেশ স্বীকার করে না। এই প্রকারে প্রাচীন যুগের কত সুন্দর সুন্দর নিদর্শন নষ্ট হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সঙ্কিশেও কতকটা এই কারণে এবং হিউয়েন সঙ্গের বিবরণ সামান্য হওয়াতে আধুনিক ধ্বংসচিহ্নগুলির যথার্থ স্বরূপ নির্দ্ধারণ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক ঐ স্তূপটির কাছে কানিংহাম সোপানত্রয় অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে করেন।

চীনপরিব্রাজক বর্ণিত নাগপূজা এখনও সঙ্কিশে প্রচলিত দেখা যায়। ভগ্ন স্তূপের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে বিশারীদেবীর মন্দিরের প্রায় ২০০০ ফুট দূরে কাণ্ডাইয়া তাল নামে এক কুণ্ড আছে। তাহার পাশে এক ভগ্ন স্তূপের উপরে কারেবর নাগের স্থান। বৈশাখমাসের প্রত্যহ, শ্রাবণ মাসের নাগপঞ্চমীর দিন এবং বৃষ্টির আবশ্যক হইলেই সকলে এই স্থানে দুগ্ধ দিয়া নাগের পূজা হয়।

বিশারীদেবীর মন্দিরের ৪০০ ফুট উত্তরে একটি প্রস্তর স্তম্ভের হস্তীমূর্ত্তিযুক্ত ক্যাপিটাল বা উপরাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা সর্ব্বাংশে অশোকের অন্যান্য স্তম্ভের ঐ অংশের সদৃশ।

হস্তীর নিম্নস্থ বেদীর চারিপার্শ্বে সুন্দর সপদ্মলতিকা-বলীর চিত্র খোদিত। মূর্ত্তির লেজ ও শুণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তবুও তাহা যে কত সুন্দর বলিবার নহে। ভারতীয় ভাস্কর্য্যে এরূপ সুন্দর হস্তী খুব কমই দেখা যায়। স্তম্ভটী রক্তাভবর্ণের দানাদার বালুপাথরের এবং অশোকের অন্যান্য স্তম্ভের মতই উজ্জ্বল পালিসযুক্ত। ক্যাপিটলের ঠিক নীচে দণ্ডদেশের ব্যাস সাড়ে ৩৩ ইঞ্চি। এলাহাবাদ স্তম্ভের ঐ অংশের ব্যাস ২৬ ইঞ্চি এবং উহার দৈর্ঘ্য ৩৫ ফুট। সেই হিসাবে সাঙ্কাশ্য স্তম্ভের দৈর্ঘ্য ৪৪ ফুট ৩ ইঞ্চি হইতে পারে বলিয়া কানিংহাম মনে করেন। ঘণ্টাকার ক্যাপিটালের দৈর্ঘ্য ৩ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং পরিধিও ঐ পরিমাণ। হস্তীমূর্ত্তির উচ্চতা ৪-৪ ইঞ্চি—অতএব সমগ্র স্তম্ভটী অভগ্নাবস্থায় অনুমান সাড়ে ৫২ ফুট দীর্ঘ ছিল মনে করা যাইতে পারে।

কানিংহাম মনে করেন সঙ্কিশের এই স্তম্ভটীকেই চীন পরিব্রাজকগণ দেখিয়াছিলেন এবং ভ্রমে পতিত হইয়া হস্তীকে সিংহ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে স্তম্ভশীর্ষের পশুমূর্ত্তির এরূপ ভগ্ন-দশা উপস্থিত হইয়াছিল যে ৫০ফুট উর্দ্ধের হস্তীমূর্ত্তিকে দেখিয়া সিংহ বলিয়া মনে করা কিছুই অসম্ভব নহে। চীন পরিব্রাজকগণের এইরূপ অশোক স্তম্ভর উপরের পশুমূর্ত্তিকে ভুল করার প্রমাণ স্বরূপ কানিংহাম এক নজীর দিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল তাহা হিউয়েন সঙ্গের ভুল না হইয়া তাঁহার অনুবাদকের ভুল বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রাবস্তীতে জেতবনের দ্বারের সন্নিকটে দুইটী অশোক স্তম্ভ ছিল বলিয়া ফাহিয়ান ও হিউয়েনসঙ্গ উভয়ে লিখিয়া গিয়াছেন। প্রথম ব্যক্তি বলেন যে একটির উপরে চক্র ও অপরটীর উপরে বৃষমূর্ত্তি রক্ষিত ছিল।

হিউয়েনসঙ্গও ঐ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অনুবাদক জুলিয়েন ভুল করিয়া বৃষ স্থলে হস্তী লিখিয়াছিলেন। বিল ও ওয়াটার্স কৃত অনুবাদে বৃষই দেখা যায়।

আমাদের মনে হয় কানিংহাম যত সহজে এ মীমাংসার সমাধান করিয়াছেন আসলে তাহা তত সহজ নহে। ফাহিয়ান ও হিউয়েনসঙ্গ উভয়েই উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তির কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান হস্তীকে সিংহ বলিয়া উভয়েরই ভ্রম করা এত সহজ বলিয়া মনে করা যায় না। হিউয়েনসঙ্গ-এর অন্যান্য স্থানের বিবরণ যেরূপ বিশদ ও সম্পূর্ণ, কিপিথার বিবরণ সেরূপ নহে এবং তাহার কারণ কি তাহাও বলা যায় না। তাঁহার ভ্রমণবিবরণের আরও অনেক স্থলে এরূপ অসম্পূর্ণ রচনা দেখা যায়, তবে সে সকল প্রদেশে তিনি স্বয়ং যান নাই। তাই বলা যায় না যে কালক্রমে পাণ্ডুলিপি নষ্ট হওয়ায় তাঁহার রচনার কিয়দংশ লুপ্ত হইয়াছে কি না। সাঙ্কাশ্যে হস্তীস্তম্ভ ব্যতীত আর একটি সিংহস্তম্ভ অবস্থিত ছিল মনে করিলেও সকল সমস্যা মিটিয়া যায় না। তাহা হইলেও হস্তীস্তম্ভের

অনুল্লেখের কারণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ তাহার কোনই নিদর্শন দেখা যায় না, এবং তাহা হইলে হস্তীস্তম্ভের অবস্থান হইতে কানিংহাম যেভাবে সঙ্কিশের ধ্বংসাবশেষ গুলি নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পরিত্যক্ত হয়।

১৮৭৬ অব্দের মার্চ্চমাসে স্তম্ভের দণ্ডদেশ আবিষ্কারের জন্ত কানিংহাম সঙ্কিশে পুনরায় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। হস্তীমূর্ত্তির অবস্থান হইতে তিনি অনুমান করিলেন যে স্তম্ভটী উহার সহিত ঋজু রেখায় অবস্থিত কোনস্থান হইতে সোজা পড়িয়া গিয়াছিল। ক্যাপিটালের আকার হইতে ও পরিব্রাজকোক্ত বিবরণ হইতে স্তম্ভটী ৫০।৬০ ফুটের মধ্যে ছিল বলিয়া তিনি অনুমান করেন। তদনুসারে হস্তীমূর্ত্তি হইতে ঐ পরিমাণ স্থান দূরে খানিকটা জায়গা মাপিয়া লইয়া তিনি তথায় খুঁড়িতে লাগিলেন। বেশীক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইল না, একঘণ্টা অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেই তথায় ইষ্টক নির্ম্মিত ভিত্তিদেশ বাহির হইল। ঐ চত্বর উত্তর দক্ষিণে ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ১০-২ ইঞ্চি বিস্তৃত। মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড গোলাকার গর্ত্ত, তাহার মধ্যেই স্তম্ভটী প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে দিকে ক্যাপিটালটা পড়িয়াছে, গর্ত্তের গায়ে সেই দিকে অনেকখানি ফাঁক দেখা যায়। বলাবাহুল্য স্তম্ভটা পতনের সময়ে ইট সরিয়া যাওয়ারই তাহা ফল।

এই বেদী বাহির হওয়ায় উৎসাহিত হইয়া কানিংহাম স্তম্ভদণ্ড বা তাহার ভগ্নখণ্ড পাওয়া যায় কিনা দেখিবার জন্ত সচেষ্ট হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ক্যাপিটাল হইতে বেদী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান জুড়িয়া একটি দীর্ঘ চওড়া নালা কাটিলেন। স্তম্ভের কোন নিদর্শন পাওয়া গেলনা বটে, তবে ভগ্নপ্রাচীরের দীর্ঘ দীর্ঘ চাপড় বাহির হইল। স্তম্ভের পূর্ব্বদিকে অল্পদূরেই উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত স্থূল প্রাচীরও বাহির হইল। কানিংহাম মনে করেন, যে সংঘারামের অভ্যন্তরে অধিরোহণীত্রয় অবস্থিত ছিল, এই প্রাচীর তাহাকে ঘিরিয়াই নির্ম্মিত ছিল।

প্রাচীরের ভগ্নখণ্ড গুলি যে অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, ভূকম্পনে উহা ভূমিসাৎ হইয়াছিল। স্তম্ভটীও ঐ একই দিকে পড়িয়াছিল। ইহা হইতে কানিংহাম মনে করেন যে উভয়ই সমকালে ভূমিসাৎ হয়। কানিংহাম স্তম্ভটী নষ্ট হওয়ার কাল নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্তম্ভের বেদীর চারিপাশে ইষ্টকের মেঝের নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ভূস্তর হইতে উহা চারিফুট নিম্নে। দুই সহস্র বৎসরে এরূপ হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। ক্যাপিটালের তলদেশের ২ ফুট ৩ ইঞ্চি তখন মাটিতে বসিয়া গিয়াছিল। সে হিসাবে ১১২৫ বর্ষে ভূস্তর ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি হইবার কথা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অনুসন্ধান করিয়া কানিংহাম স্থির করেন যে অনুমান ৭৫০ অব্দে, বা হিউয়েন সঙ্গ দেখিয়া যাইবার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে স্তম্ভটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

কানিংহাম সঙ্কিশে বহু সংখ্যক প্রাচীনমুদ্রা এবং অন্তান্ত দ্রব্যাদি পাইয়াছিলেন। মুদ্রাগুলির মধ্যে অনেকগুলি সুপ্রাচীন Punch marked coins—ইহাতে কোন প্রকার লেখা নাই, সুধু নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখা যায়। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে নামাঙ্কিত নির্দ্দিষ্ট ওজনের মুদ্রা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই প্রকার মুদ্রারই প্রচলন ছিল। সে হিসাবে এগুলি বহু প্রাচীন আলেকজান্দার বা অশোকের সমসাময়িক বলা চলে। কানিংহাম এই ধরণের রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা পাইয়াছিলেন। মথুরায় শত্রপ রাজুবুল এবং সোদাস ও শকরাজ উইম বাদ ফিস, কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বসুদেবের এবং পরবর্ত্তী শকরাজগণের দুর্ব্বোধ্য গ্রীক অক্ষরে লেখাযুক্ত মুদ্রা এখানে তিনি পাইয়াছিলেন। ইহাদের কাল খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত। তাহার পর ইন্দোসাসানীয় এবং শ্রীমৎ আদিবরাহ নামাঙ্কিত মুদ্রা বাহির হইয়াছিল। অন্তান্ত দ্রব্যাদির মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত বুদ্ধাবতরণের চিত্রটীই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

সঙ্কিশের ৬মাইল পূর্ব্বে পাকনা বিহার নামে একটী গ্রাম আছে। এখানে প্রাচীন যুগের বহু ধ্বস্ত নিদর্শন

বাহির হইয়াছে। কানিংহামের মতে এইখানেই সেই হিউয়েনসাঙ্গোক্ত কিপিথার প্রায় ২০ লি পূর্ব্বস্থিত অপূর্ব্ব মনোরম সংঘারাম অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান গ্রাম সমচতুষ্কোণাকার বিশাল এক ধ্বংসস্তূপের উপর অবস্থিত। খননের ফলে তন্মধ্য হইতে বহু সংখ্যক কারুকার্য্যযুক্ত ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড, ভগ্নস্তম্ভ ও "যে ধর্ম্ম-হেতু প্রভবা" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শ্লোক খোদিত প্রস্তর খণ্ড বাহির হয়। এই সমুদয় হইতে এবং গ্রামটীর নাম হইতে বোঝা যায় এককালে এখানে একটী হর্ম্ম্য বা সৌধ অবস্থিত ছিল। এখানেও শকরাজগণের বহু মুদ্রা ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে বুদ্ধদেবের অবতরণের একটী ভাস্কর্য্য বাহির হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কানিংহাম বর্ত্তমানে প্রাপ্ত স্তম্ভটীকে পরিব্রাজক দৃষ্ট স্তম্ভের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন, এবং উহার অবস্থান হইতে প্রাচীন দ্রব্যাদি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার আছে এবং উভয় যুক্তিই সমান প্রবল। তাই হস্তীস্তম্ভ ব্যতীত সাঙ্কাশ্যে আর একটী সিংহস্তম্ভ ছিল কি না তাহা সহজে বলা যায় না। ১৯১৯ অব্দে পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী সঙ্কিশে উজ্জ্বল পালিস-যুক্ত বহু সংখ্যক প্রস্তরখণ্ড বাহির করিয়াছিলেন। এগুলিকে অশোকের স্তম্ভের ভগ্নখণ্ড বলিয়া মনে হয়।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৺নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

বিগত ২ শে মার্চ্চ ১৯২৩, ৮৮বৎসর বয়সে, বেথুন কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য রাজনীতিক রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা, রেওয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান সচিব নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় পৃথিবীর পান্থশালা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সেকালের ও একালের আর একটি বন্ধনগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল।

১৭৫৭ শকাব্দা ১৩ই আশ্বিন (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) ৺বারাণসীধামে মাতামহ সূর্য্যকুমার ঠাকুরের বাটীতে নিরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল সম্বন্ধে মৎপ্রণীত "রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়" নামক জীবনচরিত-বিষয়ক প্রস্তাব হইতে কিয়দংশ নিম্নে সঙ্কলিত হইল। "ইনি ফুলের মুখুটী, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্রীহর্ষ বংশ ফুলে মেল। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ভট্টপল্লীতে বাস করিতেন। ইঁহারা গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান। ইঁহাদের বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন কালিকারঞ্জন বিশ্বরঞ্জন নিরঞ্জন সর্ব্বরঞ্জন

নিরঞ্জনের পিতামহ ভৈরবচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হিজলী কাঁথির লবণ কুঠীর সদর আমিন ছিলেন

এবং প্রভূত অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পারস্ত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। এইজন্য অনেকে তাঁহাকে 'মৌলবী মুখুয্যে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন।

ভৈরবচন্দ্রের জীবনকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কুলভঙ্গ হয় নাই। দক্ষিণারঞ্জনের পিতা পরমানন্দ (ওরফে জগন্মোহন) পিরালী বংশে ৺সূর্য্যকুমার ঠাকুরের কন্যাকে বিবাহ করায় ইঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কুলভঙ্গ হয়। *

জগন্মোহনের সংস্কৃত ও পারস্ত ভাষায় অসামান্য অধিকার ছিল। তিনি এই দুই ভাষার লিখিত গ্রন্থাদি পাঠেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত সংস্কৃত পুঁথি প্রভৃতি বহুদিন তাঁহার বংশধরগণ সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

নিরঞ্জনের মাতৃপিতামহ গোপীমোহন ঠাকুর কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনী ছিলেন। কিন্তু তিনি পার্থিব ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মূল্যবান মানসিক সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, পারস্ত ও উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং ইংরাজী, ফরাসী ও পোর্টুগীজ ভাষাও কিছু কিছু জানিতেন। তিনি স্বধর্ম্মে যেমন নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, দানে তেমনই মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থব্যয় পূর্ব্বক মূলাযোড়ে গঙ্গাতীরে দ্বাদশটী শিবলিঙ্গ ও ব্রহ্মময়ী দেবী নামে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপিত করেন এবং তাঁহাদের যথোপযুক্ত সেবাদির ও অতিথি সৎকারের জন্য যথেষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। দুর্গাপূজার সময়ে তাঁহার বাটীতে যেরূপ সমারোহ হইত সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। তিনি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার একজন পুরোহিত ছিলেন। দেশীয় শিল্প সাহিত্যাদির উন্নতির প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কালি মির্জ্জা (কালিদাস মুখোপাধ্যায়), নকে কানা (লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস) প্রভৃতি গীতরচয়িতৃগণ এবং অজ্জু খাঁ, লালা কেবলাকিষণ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়কগণ তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। তিনি স্বয়ংও সুন্দর গীত রচনা করিতে পারিতেন।*

মৃত্যুকালে গোপীমোহন ছয় পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যকুমারের পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার দুই কন্যা হইয়াছিল, জ্যেষ্ঠা ত্রিপুরাসুন্দরী ও কনিষ্ঠা শ্যামাসুন্দরী। পরমানন্দ (জগন্মোহন) প্রথমে জ্যেষ্ঠা ত্রিপুরাসুন্দরীকে এবং পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে কনিষ্ঠা শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে জ্যেষ্ঠার গর্ভে রাজা দক্ষিণারঞ্জন এবং কনিষ্ঠার গর্ভে কালিকারঞ্জন, বিশ্বরঞ্জন, নিরঞ্জন ও সর্ব্বরঞ্জন এই চারি পুত্র হয়। দক্ষিণারঞ্জনের জন্মের অনতিকাল মধ্যেই ত্রিপুরাসুন্দরী পরলোকে গমন করেন এবং শ্যামাসুন্দরী দক্ষিণারঞ্জনকে নিজগর্ভজাত সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করেন। সেইজন্য নিরঞ্জনকে দক্ষিণারঞ্জন চিরদিন সহোদরজ্ঞানেই স্নেহ করিতেন, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া কখনও মনে করেন নাই।

* কিরূপে পরমানন্দের সহিত সূর্য্যকুমারের কন্যার বিবাহ হয় এবং কি জন্য তাঁহার নাম জগন্মোহনে পরিবর্ত্তিত হয় তৎ সম্বন্ধে যে সকল কৌতুকাবহ গল্প প্রচলিত আছে তাহা মৎপ্রণীত 'রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
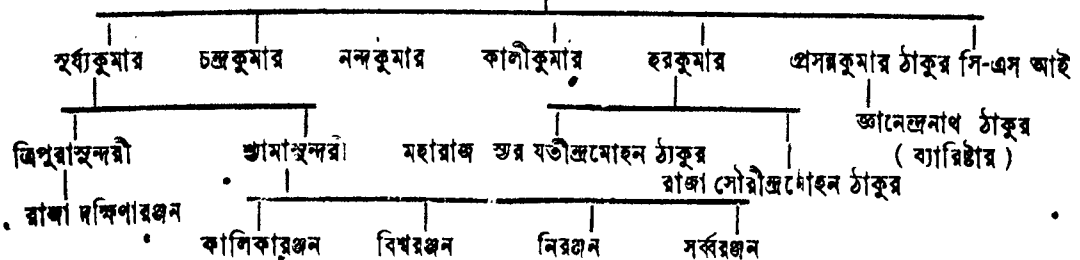
সূর্য্যকুমার অল্পবয়সেই গতাসু হন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কাশীধামে অনেকদিন জীবিত ছিলেন। সেই স্থানেই নিরঞ্জনের জন্ম হয়। সূর্য্যকুমারের বিষয়ের অর্দ্ধেক দক্ষিণারঞ্জন এবং বাকী অর্দ্ধেক নিরঞ্জন প্রভৃতি চারি ভ্রাতা তুল্যাংশে প্রাপ্ত হন।

সূর্য্যকুমারের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া তাঁহার কন্যাদিগকে তাঁহার ভ্রাতারা বিশেষ স্নেহ করিতেন। দক্ষিণারঞ্জন নিরঞ্জন প্রভৃতিও সেইজন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন।

বাল্যকালে নিরঞ্জন তাঁহার অগ্রজ দক্ষিণারঞ্জনের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাশিক্ষা করেন। হিন্দু কলেজে তাঁহার শেষশিক্ষা লাভ হয়। তাঁহার সহপাঠীদিগের মধ্যে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। নিরঞ্জন পরে কাশীধামে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। এই দুই ভাষায় এবং ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান উত্তরকালে দেশীয় করদরাজ্যাদিতে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

শিক্ষা সমাপ্তির পর নিরঞ্জন কিছুদিন কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর দেওয়ানের কার্য্য করেন। অনতিকাল পরেই তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী পান এবং কিছুকাল কৃষ্ণনগর, যশোহর, ও পূর্ণিয়ার ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। তিনি বলিতেন যে তিনি যশোহরের বিখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা সার জেম্‌স্ ওয়েষ্টল্যাণ্ডের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। পূর্ণিয়ায় অবস্থান কালে ম্যালেরিয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধার মানসে বারাণসীতে মাতামহীর নিকট যাইতে মনস্থ করেন এবং কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে রওনা হন। কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবরের সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভীষণ মহাঝটিকায় তাঁহার নৌকা উল্‌টাইয়া যায় এবং অতি আশ্চর্য্যরূপে ঘুষুড়ীর নিকট সেবারে নিরঞ্জনের জীবনরক্ষা পায়। ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং কিছুদিন পরে কাশীধামে গমন করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নিরঞ্জন এলাহাবাদে বেড়াইতে যান। সেখানে রেওয়ার মহারাজা রঘুরাজ সিংহ বাহাদুর জি-সি-এস-আই এর সহিত আলাপ পরিচয় হয়। মহারাজা তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, ও শিষ্টাচারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে (অন্যান্য আনুসঙ্গিকবৃত্তি ব্যতীত) পাঁচশত টাকা মাসিক বেতনে তাঁহার সেক্রেটারী ও নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দক্ষিণারঞ্জনের সাহায্যে বহু উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী এবং দেশীয় রাজা ও মহারাজার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জুলাই তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেলের মিলিটারী সেক্রেটারী রেওয়াধিপতিকে লিখিয়াছিলেন ;

"Your secretary Niranjan Mukerjee Bahadur is, I assure your Highness, a very zealous and useful person to have about you, and he is personally acquainted with many British officers."

কিন্তু তাঁহার প্রতি মহারাজার পক্ষপাতিতা দেখিয়া মহারাজার অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিরঞ্জনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। নিরঞ্জন যখন মহারাজার নিকটে না থাকিয়া বারাণসী বা অন্য কোনও স্থানে থাকিতেন, তখন তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার প্রতি মহারাজার মন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা পাইতেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর—যিনি নিরঞ্জনকে আপন দৌহিত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন,—তাঁহাকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ সম্বলিত একখানি ইংরাজী পত্রে প্রসন্নকুমার নিরঞ্জনকে লিখিয়াছিলেন—"আমি তোমাকে সর্ব্বদাই বলিয়া আসিতেছি যে মহারাজার নিকটে না থাকিয়া দূরে থাকা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, বিশেষতঃ যখন সেখানে এমন লোক অনেকগুলি আছে যাহারা

তোমার উন্নতিতে মোটেই সন্তুষ্ট হইবে না। একজন পারস্যদেশীয় লেখক বলিয়াছেন 'চাকরী বসরতে হাজিরি।' তুমি এই বাক্যটী মূলমন্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করিবে।" প্রসন্নকুমার স্মৃতিসম্বন্ধীয় অনেক প্রাচীন পুঁথি সম্পাদিত করিয়াছিলেন এ সংবাদ হয়ত অনেক পাঠক অবগত আছেন। এই সকল পুঁথি সংগ্রহ করিবার ভার অনেক সময়ে নিরঞ্জনের উপরে থাকিত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে প্রসন্নকুমার একখানি ইংরাজী পত্রে (নিরঞ্জন তখন বারাণসীধামে অবস্থান করিতেছিলেন) নিরঞ্জনকে লিখিয়াছিলেন—"তুমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিবে কাশীতে কিম্বা তাহার উপকণ্ঠে ভবদেব ভট্ট সম্পাদিত 'ব্যবহার তিলক' গ্রন্থ পাওয়া যায় কি না। যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে অবিলম্বে তাহার একটী নকল প্রস্তুত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে।" ১৮৬৭খ্রীষ্টাব্দে সি-এস-আই উপাধি পাইয়া সনন্দ গ্রহণ করিবার জন্ম প্রসন্নকুমার আগ্রায় বড়লাটের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিরঞ্জনের সহিত সেই সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। অনেকে মনে করিয়াছিলেন প্রসন্নকুমার মৃত্যুকালে তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্র নিরঞ্জনকে কিছু সম্পত্তি দিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি কিছুই দিয়া যান নাই। নিরঞ্জনের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃতুল্য ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহাতে একখানি পত্রে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শত্রুগণের বিবিধ চেষ্টা স্বত্তেও নিরঞ্জন তাঁহার well wisher & protector (মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও প্রতিপালক) রেওয়াধিপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং ক্রমে দেওয়ানের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজা কর্ত্তৃক 'রায়বাহাদুর উপাধিতেও ভূষিত' হইয়াছিলেন।

রেওয়ার কার্য্যকালে নিরঞ্জনের মনে এই বাসনা উদিত হয় যে তিনি সমস্ত করদরাজ্যের শাসনকর্তাদিগকে প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ করিবেন। পাতিয়ালা মহারাজার সহিত অনেক দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তার প্রীতিসূচক পত্র ব্যবহার ছিল। নিরঞ্জন রেওয়ার সহিত পাতিয়ালার সখ্য স্থাপন করিয়া দেন। ভিজিয়ানাগেরএর মহারাজা ভিজিয়াগ্রাম রাজও নিরঞ্জনকে তাঁহার সহিত পাতিয়ালার এইরূপ সখ্যস্থাপন করিয়া দিতে বলেন। নিরঞ্জন পাতিয়ালা এবং অন্যান্য রাজ্যের সহিত তাঁহার ও রেওয়াধিপতির সখ্য স্থাপন করিয়া দেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পুণ্যস্মৃতি মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র মহামাননীয় ডিউক অব এডিনবরা এতদ্দেশে আগমন করেন। ইতঃপূর্ব্বে ব্রিটীশ রাজবংশের কেহ এদেশে আসেন নাই। বলা বাহুল্য মহাসমারোহে তিনি অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। যখন ডিউক লক্ষ্ণৌ নগরীতে আসেন তখন নিরঞ্জন দক্ষিণারঞ্জনের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং ডিউকের সহিত পরিচিত হন। ডিউক তাঁহাকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ ফটোগ্রাফখানি নিরঞ্জনের বংশধরগণ এখনও সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। উহার পশ্চাদ্দিকে লিখিত আছে—

"This photograph was given to Babu Niranjan Mukerje by H. R. H. the Duke of Edinburgh at Lucknow on the 21st February1870."

রাজা দক্ষিণারঞ্জনের জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে—"১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের রাজস্ব সম্বন্ধীয় কতিপয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্ম পার্লিয়ামেণ্টের কতিপয় সদস্য লইয়া ইংলণ্ডে একটী বিশেষ সমিতি গঠিত হয়। রাজা দক্ষিণারঞ্জন এই সমিতির সভ্যগণের নিকট সাক্ষ্য প্রদান মানসে ইংলণ্ড গমনের সঙ্কল্প করেন।" দক্ষিণারঞ্জনের সহিত নিরঞ্জনও ইংলণ্ড গমনের সঙ্কল্প করেন। তিনি আমেরিকা হইয়া ইংলণ্ডে যাইবেন বলিয়া কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমেরিকান ভদ্রব্যক্তির নিকট হইতে সুপারিষ পত্র যোগাড় করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণবশতঃ উভয়েরই যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এই পরিচয়পত্রগুলি পাঠ করিলে নিরঞ্জনকে বিদেশীয়গণও কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহা বুঝিতে পারা যায়।

৺নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এই সময়ে নিরঞ্জন কাশীতে অবস্থান করিয়া ভিজিয়ানগরম্-এর মহারাজার সেক্রেটারীর কার্য্যও করিয়াছিলেন। এই স্থানে আরও অনেক হিন্দু রাজার সহিত নিরঞ্জনের আলাপ হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী শেষিয়া শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নিরঞ্জনকে লিখিত একখানি পত্রপাঠে প্রতীতি হয় যে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা তাঁহার বিনয় ও শিষ্টাচারে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে ত্রিবাঙ্কুরের হস্তিদন্ত নির্ম্মিত একটী কারুকার্য্যময় দ্রব্য উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নিরঞ্জন "ভারতবর্ষীয় রাজদর্পণ" নাম দিয়া ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ দেশীয় রাজা, মহারাজা, নবাব, সরদার প্রভৃতিগণের একটী বিস্তৃত ইতিহাস হিন্দীভাষায় রচনার সঙ্কল্প করেন। এচিসনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের উপর সেই ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপিত হইলেও সঙ্কল্পিত গ্রন্থে ইতিহাস জীবনচরিত ও অন্যান্য তথ্য আরও বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড—কাশী নরেশগণের ইতিহাস—রচনা করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়।* উহাতে কাশী-নরেশ ঈশ্বরী

* Bharatavarshiya Rajadarpana, or a history of the Kings, Princes, Chiefs, Nawabs, Sirdars, & Rajas of India in treaty with the British Government, by Niranjan Mukarji, part 1, History of the present Raj Family of Benares., Benares 1874.

প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের যে লিথো চিত্র প্রকাশিত হয় তাহা তাঁহার অগ্রজোপম বন্ধু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয়। নিরঞ্জনকে লিখিত রাজেন্দ্রলালের কতকগুলি ইংরাজী পত্রে এই অধুনা দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত্যর্থে নিম্নে কতকগুলি পত্রের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

গোপীমোহন ঠাকুর

(১)

মানিকতলা
৪ জুলাই ৭৪।

প্রিয় নিরঞ্জন,

তুমি যে ফটোটী পাঠাইয়াছ, তাহা বড় ছোট তাহাতে ভাল প্লেট হওয়া সম্ভব নহে। ছবিখানি বড় করিয়া লইলে মুখখানি তত পরিষ্কার হইবে না; বড় করিলে ছবির দোষগুলিও বড় করিয়া দেখা দেয়। তুমি কি উহা অপেক্ষা বড় আর একখানি ফটো পাঠাইতে পার না? ইহাতে ছবিখানি বড় করিবার খরচও বাঁচিয়া যাইবে প্লেটখানিও ভাল হইবে। আর এক কথা তুমি আবক্ষ মূর্ত্তি চাহ না সমস্ত মূর্ত্তিটি চাহ? আবক্ষ মূর্ত্তি সস্তায়ও হইবে, ভালও হইবে, আর সমগ্র মূর্ত্তিটী করিতে গেলে একশত টাকার কমে হইবে না। আমার মতে এই আকারের [এই স্থানে একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে] আবক্ষ মূর্ত্তি দিলে ভাল হয়।

আমার বালিশের জন্য তুমি সেই কাপড়ের টুকরা

সূর্য্যকুমার ঠাকুর

চাবিটী কবে পাঠাইবে? শনিবারে এবং সোমবারে আমার অবস্থা বড় ভাল ছিল না, কাল হইতে একটু ভাল আছি।

ভবদীয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

বাবু নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বারাণসী

মাণিকতলা

৪ অক্টোবর ১৮৭৪।

প্রিয় নিরঞ্জন,

কাপ্তেন বেয়ারিংকে উৎসর্গ করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া যে পত্র লিখিয়াছ তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছি এবং শীঘ্রই তাহার উত্তর প্রাপ্তির আশা করি। তিনি যে অনুমতি দিবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তুমি যে ২৮ পাতা পাঠাইয়াছিলে তাহাও পত্রের সহিত প্রেরিত হইয়াছে।

আমি লেখাটী পড়িয়াছি এবং আমার মনে হয় যে তুমি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছ। ভাষা বিশুদ্ধ ও লালিত্যপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য্যও সংযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

দুঃখের সহিত জানাইতেছি ছবি এখনও খোদাই হয় নাই এবং আরও কিছু সময় লাগিবে। যে খোদাই করে তাহার অসুস্থতানিবন্ধন কার্য্য অতি সামান্যই অগ্রসর হইয়াছে। দশহরায় কাজ হইবে না, স্কুল বন্ধ থাকিবে এবং তোমাকে অন্ততঃ আরও একমাস অপেক্ষা করিতে হইবে।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রেওয়াধিপতি মহারাজ রঘুরাজ সিংহ বাহাদুর

তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। তাঁহারাও আমাকে লইয়া এবং নিজের কাজে ভয়ানক ব্যস্ত ছিলেন। ছবি ছাপা হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ ১০৮০ কপি। তন্মধ্যে আমি দুইখানি লইয়াছি। কাজটি বেশ করিয়াছে এবং আশা করি দেখিয়া তুমিও সুখী হইবে। উহার খরচ আমি পূর্ব্বে যা অনুমান করিয়াছিলাম তাহার চেয়ে বেশী পড়িয়াছে এবং তুমি ঐ কারণে ও পূর্ব্বের পাওনার দরুণ যে ১৪২৫/০ পাঠাইয়াছ তাহাতে বোধহয় কুলাইবে না। অবশিষ্ট কপিগুলি এখনও পাঠান নাই বলিয়া মিষ্টার সেজফীল্ড এখনও হিসাবপত্র কিছুই দেন নাই। তাঁহার বিল পাইলে তোমাকে পাঠাইব। কাগজের

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

দাম বোধ হয় আনুমানিক খরচ অপেক্ষা কমই হইবে, কারণ যে আকারের কাগজে ছবি ছাপিবার কথা ছিল তাহা অপেক্ষা ছোট আকারের কাগজে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু ছাপার খরচ বেশী পড়িবে কারণ রঙীন

আমি কিন্তু অত দিন অপেক্ষা করিতে পারিব না এবং এই মাসের মাঝামাঝি (সঠিক তারিখ পরে জানাইব) আমাকে বাহির হইতেই হইবে। আমি রাজপুতানায় একবার ঘুরিয়া আসিতে চাই। তুমি কি আলোয়ার, জয়পুর এবং ঐরূপ অন্যান্য স্থানে যাইতে পারিবে না? সকলে বলে ফৈজাবাদ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল জায়গা। সেখানে গেলে কি আমি ভাল বাড়ী পাইতে পারি? সেখানে কি হোটেল আছে?

তোমার অনুষ্ঠানপত্রটি এতৎসহিত ফেরত পাঠাইতেছি। না, উহা পৃথকভাবে পাঠাইতে হইবে। বিতরণের জন্য উহা আগে ছাপাইয়া লও।

ভবদীয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

(৩)

মানিকতলা

২২ জুন ৭৫।

প্রিয় নিরঞ্জন,

আবার জ্বর এবং পেটের অসুখ হওয়ায় তোমার ১১ই

জমিতে ছাপিবার জন্য দুইবার ছাপিতে হইয়াছে।

আমি তোমার জন্য কিছু তপস্বীমৎস্য আনিতে দিয়াছি। সন্ধ্যার সময় পাওয়া যাইবে এবং বরফে প্যাক করিয়া পাঠাইব। অন্যান্য জিনিষগুলি আমার অসুখের জন্য সংগ্রহ করা হয় নাই, শীঘ্রই পাঠাইব। * * *

ডিউক অব্ এডিনবরা

মহারাজ যে তোমার প্রতি ভাল ব্যবহার করিতেছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। আশা করি তিনি তোমার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবেন।

আমগুলি (৬৬) ঠিক আসিয়াছে, সেগুলি ভারি চমৎকার। গত বৎসরে পাওয়া যায় নাই—এগুলি তাহার জন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করিয়াছে। অনেক—অনেক ধন্যবাদ। আমার সাদর সম্ভাষণ জানিবে।

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

(৪)

মাণিকতলা
২৯ জুলাই ৭৫।

প্রিয় নিরঞ্জন,

তোমার ২৪শে তারিখের পত্রে জানিলাম তুমি এখন আরোগ্যলাভ করিয়াছ এবং বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আগ্রা যাইতেছ। অবশ্য স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং কার্য্যোদ্ধার উভয়ের জন্য যাইতেছ, তাহাতে কিছু বলা যায় না, নতুবা কেবল স্বাস্থ্যের জন্য হইলে আগ্রানগরী আমি কখনও মনোনীত করিতাম না। আমার শরীর এত খারাপ এবং আমি এত কম বাহিরে যাই যে এবারে কে star পাইবে কিছুই জানি না, তবে তুমি কিম্বা আমি যে পাইব না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তালিকাটি এরূপ গোপনে রাখা হইয়াছে যে কিছুদিনের জন্য কোন সংবাদ বাহির হইবার উপায় নাই। তুমি কবে এখানে আসিবে সেই প্রতীক্ষায় আছি।

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

পুনশ্চ। আমি দেখিতেছি মিষ্টার কোনীয়ান বলবন্ত-নামার এক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। তোমার বইখানি সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আমি উহা দেখিতে চাহি। বইখানি এখানে পাওয়া যায় না সুতরাং আমি উহার জন্য নিত্যকে লিখিয়াছি। উহা হয় বারাণসী নয় এলাহাবাদে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাবু নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত ডাকঘরে অপেক্ষা করিবে—আগ্রা

(৫)

২৯শে সেপ্টেম্বর ৭৫।

প্রিয় নিরঞ্জন,

তুমি এখন কোথায় আছ জানি না। বোধ হয় কোটা হইতে বাটী ফিরিয়াছ এবং সেই আশায় বারাণসীর ঠিকানায় পত্র পাঠাইতেছি। কিছুদিন হইল তোমার গ্রন্থের সমালোচনা সম্বলিত পেট্রিয়ট এক খণ্ড পাঠাইয়াছি আশা করি তাহা পাইয়াছ। মহারাজার ছবির দরুণ বিল এতৎ সহিত পাঠাইতেছি। আমি যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহার অপেক্ষা কয়েক টাকা বেশী লাগিয়াছে। তুমি ১২৯৶০ পাঠাইয়াছিলে কিন্তু ১৩৮৲ পড়িয়াছে। আমি দুই সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিমে যাইতেছি

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

কোথায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে জানিতে চাই। বেশী যাহা পড়িয়াছে তোমার হিসাবের খাতায় খরচ লেখা হইয়াছে।

ভবদীয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ তারিখের 'হিন্দুপেট্রিয়টে' রাজেন্দ্রলাল নিরঞ্জনের পুস্তকের যে দীর্ঘ সমালোচনা করেন তাহার উপসংহারে যথার্থই লিখিয়াছিলেন :—

"Part I is a fair example of the manner in which the author proposes to execute the work. The project is a gigantic one, and if he has the patience and perseverance to carry it to completion he will have rendered a valuable service to the cause of Indian historical literature."

বাস্তবিক এই গ্রন্থ সঙ্কলনে নিরঞ্জন অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি ঐ বিষয়ের বহু ইংরাজী, উর্দ্দু ও হিন্দী গ্রন্থ সংগ্রহ ও পাঠ করিয়া ঐ ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় ঐ সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখিত আছে।

(আগামীসংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

শিকার ও শিকারী

শিকারের পোষাক।

এবার শিকারের পরিচ্ছদাদির সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। ধুতি পরিয়া কোঁচা ঝুলাইয়া শিকার করা চলে না। শিকারীদের পোষাক খুব আঁটাসাটা হওয়া উচিত। তা ছাড়া পরিচ্ছদের বর্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পোষাক ব্যবহার করা উচিত। কোট, ব্রিচেস্, বুট ও হ্যাটই শিকারের উপযুক্ত পোষাক। ব্রিচেস্ অভাবে হাফপ্যাণ্ট বা নিকার-বোকারও ব্যবহার করা চলে। বুটের নীচে রবার সোল লাগাইয়া লইলে ভাল হয়। জঙ্গলে ঘাস বা পাতার মধ্যে এবং পাহাড়ে রবার সোল বড় উপকারী। ইহাতে দুই সুবিধা হয়। প্রথমতঃ শুক্‌না ঘাস বা পাতার মধ্যে শব্দ কম হয়। দ্বিতীয়তঃ পা পিছলাইবার আশঙ্কাও কম। আমি নিজে হাওদায় এবং গ্রাম্য বাঁশবনে ও অন্যান্য জঙ্গলে ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুবিধা বোধ করিয়াছি। কিন্তু আবার বৃষ্টি হইয়া পিছল হইলে পা পিছলাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী; তখন চামড়ার সোল বা তলায় পেরেক দেওয়া জুতাই সুবিধা। নূতন জুতা যাহা মচ্‌মচ্ শব্দ করে তাহা ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ।

শিকারের সময় শিকারীর গতিবিধি শিকারকে জানিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে নিজেরও যেরূপ বিপদের আশঙ্কা শিকার না পাওয়ারও সম্ভাবনা তদ্রূপ।

ধুতি পরিয়া শিকার করিতে গেলে ধুতির অর্দ্ধেকটা বনেই রাখিয়া আসিতে হয়। তারপর আবার মধ্যে মধ্যে খুলিয়া গিয়া বড়ই বিব্রত করে।

আঁটাসাটা পোষাক পরিতে হইবে বলিয়া বেশী টাইট পোষাক ব্যবহার করাও উচিত নয়। ইহাতে

তাড়াতাড়ি চলাফেরা করা যায় না ও আবশ্যকমত খুব তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া ফিরিয়া বন্দুক চালনা করাও অসুবিধা হয়। পোষাক easy fitting হওয়াই উচিত।

আর একটী বিশেষ কথা এই যে পরিচ্ছদের বর্ণ লাল সাদা ইত্যাদি হওয়া উচিত নয়। ইহাতে দূর হইতে জানোয়ারের সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবুজ বা খাকী রংই প্রশস্ত। এই দুই রং সব স্থানে জঙ্গলের রং-এর সহিত প্রায় মিশিয়া যায় বলিয়া জানোয়ারের দৃষ্টি এড়ানো সহজ। সাদা টুপি ব্যবহারও অকর্ত্তব্য। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এই নিয়ম হাঁটা শিকারীদের পক্ষে বিশেষ ভাবে পালনীয়।

হাওদা শিকারে এ সব নিয়ম রক্ষা না করিলেও তত দোষ হয় না। কারণ হাওদায় শিকারের অর্থই জানোয়ারকে তাড়াইয়া শিকার করা। এ অবস্থায় তাহারা শিকারীকে দেখুক বা নাই দেখুক তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু ধুতি পরিয়া শিকার করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে।

এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। যাঁহারা হাঁটিয়া বা মাচায় বসিয়া শিকার করেন, তাঁহাদের শিকারের সময় সিগার বা সিগারেট খাওয়া অত্যন্ত দোষাবহ। ইহার গন্ধ অনেক দূর পর্য্যন্ত যায় ও জানোয়ারকে সতর্ক করিয়া দেয়। তবে যদি খুব জোর ও প্রতিকূল বাতাস থাকে তবে অবস্থা বুঝিয়া সময় সময় দুই একটা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু না করাই ভাল। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সতর্ক না হইলে কিরূপে বিপদ হয় তাহার দুইটী ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

আমাদের দেশে গারো পাহাড় অঞ্চলের মহিষখোলা নামক স্থানের কোন জঙ্গলে একজন স্থানীয় হাজং শিকারী রাত্রে হরিণ শিকার করিতে ধান ক্ষেতের পাশে জঙ্গলের কিনারে ঘুপি করিয়া বসিয়া ছিল। বনের মধ্যে
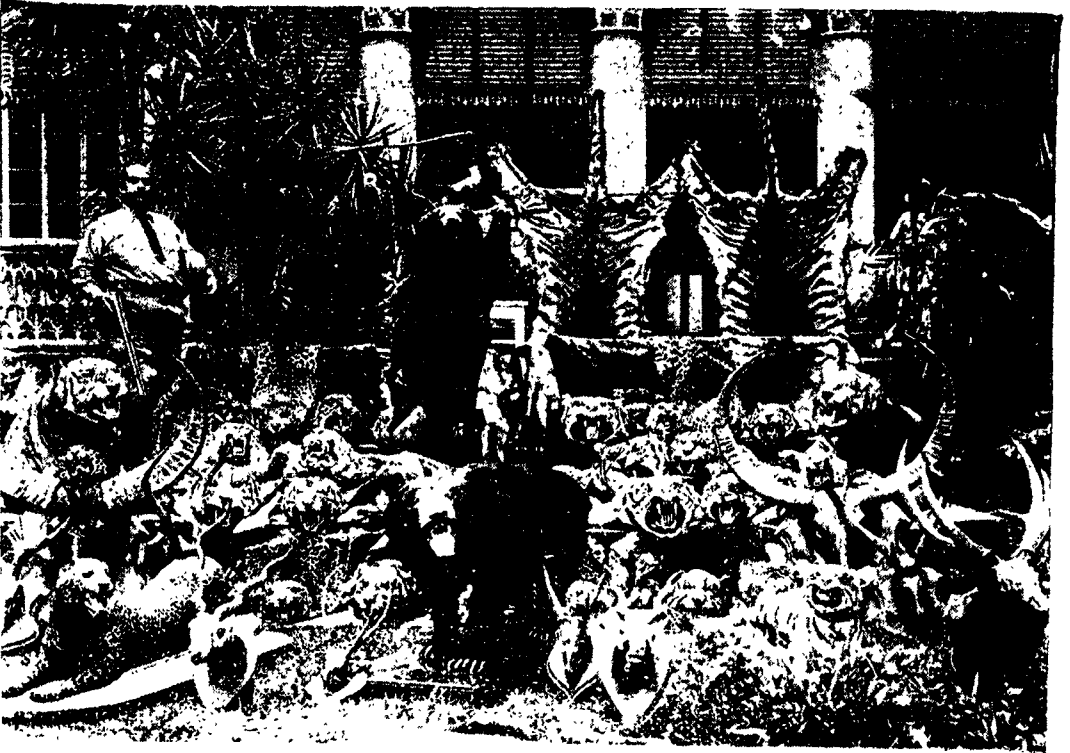
আমাদের ট্রোফির (trophy) একাংশ

খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া লইয়া তথায় বসিয়া শিকারকেই ঘুপিতে শিকার বলে। এই ক্ষেতখানির চতুর্দ্দিকেই বন ছিল। গভীর রাত্রে ধানক্ষেতের আইল বাহিয়া হরিণের পরিবর্ত্তে এক প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া উপস্থিত। শিকারী পুঙ্গবের তামাক টিকা ও হুঁকা কল্‌কে বাঁধা একটি সাদা নেকড়ার পুঁটলী তাহার সম্মুখেই ছিল। বাঘ দেখিয়া ভয়ে তাহার মারিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বোধ হয় বাঘের দৃষ্টি হঠাৎ ঐ সাদা পুঁটলিটির উপর পড়াতে, কোনও কারণ না থাকা সত্বেও খানিকদূর হইতে সে charge করিয়া আসিয়া উহা কামড়াইয়া ধরে। প্রায় ঘাড়ে আসিয়া পড়িল মনে করিয়া, উক্ত শিকারী গুরুর নাম স্মরণ করিয়া বাঘের দিকে বন্দুকের নল সোজা করিয়া ঘোড়া টিপিয়া দেয়। গুরু বিমুখ ছিলেন না, তাই সেবারে সে রক্ষা পাইয়া গেল। বাঘটী আহত হইয়া আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া বনে গিয়া পড়িল। রাত্রে সে বাঘের আর কোনও সন্ধান করিল না। বাঘও আর তাহাকে আক্রমণের কোন চেষ্টা করে নাই। সমস্ত রাত্রি অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় ঘুপিতে থাকিয়া পরদিন প্রাতে গ্রামে গিয়া লোকজন লইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া বাঘের আর কোনও খোঁজ পায় নাই। স্থানে স্থানে রক্তের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল মাত্র। বাঘটা বোধ হয় গুরুতররূপে জখম হয় নাই।

এইরূপ সিলেটের লাউরগড় নামক এক বনে তথাকার এক স্থানীয় মুসলমান শিকারী হরিণ মারিবার জন্ত রাত্রে মাচা করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সঙ্গে একখানা সাদা গামছা ছিল; উহা উড়িয়া গিয়া মাচার সহিত আটকিয়া যায় এবং নিশানের মত উড়িতে থাকে, কিন্তু ইহা সে টের পায় নাই। কতক্ষণ পরে দুই একটি হরিণকে অতি সন্ত্রস্ত ভাবে একটু দূর দিয়া ছুটিয়া পলাইতে দেখিতে পায়, কিন্তু সুযোগ না পাওয়ায় গুলি করে নাই।

ইহার একটু পরেই হঠাৎ এক প্রকাণ্ড বাঘ তাহার মাচার নীচে আসিয়া উপস্থিত হয়। নিশানের মত একটি সাদা কাপড় উড়িতে দেখিয়াই ভয়ানক ডাক দিয়া লাফাইয়া উহা কামড়াইয়া ধরে এবং মাটিতে পড়িয়া জড়াজড়ি করিতে থাকে। শিকারীও আর দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ গুলি করে। গুলির সঙ্গে সঙ্গেই বাঘের ডাক শোনা গেল মাত্র। সে রাত্রে শিকারীটী আর নামিতে সাহস করে নাই। পরদিন প্রাতে খানিক দূরেই বাঘটাকে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পায়। এই ঘটনার দুই তিন দিন পরেই আমরা ঐ বনে উহার সন্ত পতি-বিয়োগ-বিধুরা পত্নীকে বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। ঐ শিকারী পুঙ্গব তাহার বাঘের চামড়াখানি আমাকে নজর দিয়াছিল। চামড়া দুইখানি একত্রে রাখার সময় সর্ব্বদাই আমার মনে হইত যে, ইহারা মরিয়াও বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না। মরণের পরপারেও ইহাদের মিলন অক্ষুণ্ণ ছিল কি না কে জানে!

এই দুইটি ঘটনা হইতেই বুঝা যায় শাদা কাপড়ের কত বিপদ। বিপদ সর্ব্বদা হয় না, কিন্তু তথাপি সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হয়। মহিষাদি জানোয়ার শিকারে ধূমপান বা সাদা কাপড় ব্যবহার আরও বিপজ্জনক।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া একটী বিদেশী গল্প সংক্ষেপে লিখিতেছি। কোনও সময় ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মান্ সম্রাট সম্রাজ্ঞীসহ তাঁহার কোন রক্ষিত জঙ্গলে (Reserved forest) শিকার করিতে গিয়া সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু রাজকীয় বনরক্ষক সম্রাটের সাদা পোষাকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দিলে তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন।

জান্তব জগৎ রাজকীয় আইন কানুন বা খামখেয়ালীর বশবর্ত্তী নয়। তাহারা স্বাধীনতার ক্রোড়ে পালিত, এবং প্রকৃতির আইনে চালিত। পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ জাতির মত রাজকীয় স্বেচ্ছাচার অবনত মস্তকে সহ্য করে না।

বাস্তবিক যাঁহারা নিপুণ শিকারী হইতে ইচ্ছা করেন,

তাঁহাদের শিকার সংক্রান্ত নিয়মের খুঁটিনাটি বিষয়টুকু পর্য্যন্তও অবহেলা করা উচিত নয়, এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ শিকার নির্ব্বিশেষে সমজ্ঞানে মনোযোগী থাকা উচিত। কোনও সময় কোন ছোট শিকার করিতে গেলেও তাহার ক্ষুদ্রত্ব মনে জাগাইয়া তাহাকে তাচ্ছিল্যের ভাবে দেখা উচিত নয়; সে শিকার যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন।

বড় শিকার ও ছোট শিকার।

(BIG GAME AND SMALL GAME)

আমাদের দেশে—আমাদের দেশে কেন, প্রায় সকল দেশেই—যে সকল শিকার পাওয়া যায় তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়। Big game ও Small game—অর্থাৎ বড় শিকার ও ছোট শিকার। বড় শিকারের অন্তর্গত কতকগুলি জানোয়ার পুরু চামড়া বিশিষ্ট, ও কতকগুলি পাতলা চামড়া বিশিষ্ট।

টাইগার, লেপার্ড, প্যান্থার, ভালুক প্রভৃতি মাংসাশী হিংস্র জন্তু এবং গণ্ডার, বাইসন, মহিষ, বিবিধ শ্রেণীর হরিণ নীল গাই প্রভৃতি, বড় জাতীয় অ্যান্টিলোপ ও শূকরাদি নিরামিষভোজী জন্তুকে বড় শিকারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ছোট শ্রেণীর অ্যান্টিলোপ অর্থাৎ সচরাচর যাহাকে কৃষ্ণসার বলে, চিকারা. খরগোস এবং বিবিধ শ্রেণীর পক্ষীকে ছোট শিকারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়; wolf, hyena প্রভৃতি শৃগাল জাতীয় জন্তুকে কেহ কেহ বড় শিকারের অন্তর্গত এবং কেহ কেহ ছোট শিকারের অন্তর্গত মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক ধরিতে গেলে, এইগুলি ও হরিণের মধ্যে হগ্ ডিয়ার, বারকিং ডিয়ার প্রভৃতি ছোট জাতীয় হরিণ, ছোট শিকারের অন্তর্গত হওয়া উচিত। এই সব জানোয়ারের মধ্যে আবার বাঘ, ভালুক, হরিণ ও শূকরকে পাতলা চামড়া বিশিষ্ট এবং মহিষ, বাইসন, গণ্ডার ও হস্তী প্রভৃতি অতিকায় নিরামিষভোজী জানোয়ারকে পুরু চামড়া বিশিষ্ট শ্রেণীতে ধরা হয়।

যে শিকার যত দুষ্প্রাপ্য ও কষ্টসাধ্য, তাহাই তত আনন্দদায়ক। এই দুই শ্রেণীর শিকারের মধ্যে বাঘ, হরিণ, মহিষ প্রভৃতি আয়াসসাধ্য হইলেও অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। কারণ এই সব শিকার বাঙ্গালা ও বিভিন্ন প্রদেশের নানাস্থানে পাওয়া যায়। বাইসন, গণ্ডার প্রভৃতি জানোয়ার সহজ লভ্য নহে। ইহারা বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষ বিশেষ জঙ্গলের দুর্গমস্থানে বাস করে।

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর শিকার আছে, তাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। ইহা কোনও বাঙ্গালী শিকার করিয়াছেন কি না, তাহা আমার জানা নাই। ইহারা ছাগল ও ভেড়া জাতীয় জানোয়ার। ইহাদিগকে থার ও ওভিস (Thar and ovis) বলে। ইহারা হিমালয়ের বার তের হাজার হইতে সতের আঠার হাজার ফিট উচ্চে, বৃক্ষাদির চিহ্নবর্জ্জিত চিরতুষারাবৃত দুর্গম শৃঙ্গে বরফের শেওলা (moss) খাইয়া জীবনধারণ করে। এই সমস্ত শিকার অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও কষ্টসাধ্য বলিয়াই খুব সম্মানজনক।

কোন শিকার কোথায় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে যে সকল শিকারের উল্লেখ করিলাম, ইহাদের অধিকাংশ বাঙ্গালার অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ছাড়া আসাম, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানেও দেখা যায়।

বাইসন, এন্টিলোপ, নেকড়ে বাঘ (wolf) প্রভৃতি কতকগুলি জানোয়ার বাঙ্গালায় প্রায়ই দেখা যায় না। তবে বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশের সংলগ্ন কতক কতক স্থানে ইহাদের কোন কোন শ্রেণী দেখা যায়। ঠিক তেমনই মহিষ, গণ্ডার, বারশিঙ্গা (swamp deer) প্রভৃতি জাতীয় হরিণ বাঙ্গালা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কম পাওয়া যায়। কিন্তু চিতল (spotted deer), টাইগার, লেপার্ড, প্যান্থার প্রভৃতি বাঙ্গলা ও অন্যান্য প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। তবে দেশভেদে ইহাদের বিভিন্ন নাম। খরগোস ও পাখী প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্র শিকার ভারতের সর্ব্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু প্রায় এই সমস্ত সর্ব্বশ্রেণীর শিকারই আমাদের

বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কেবল এন্টিলোপ শ্রেণী কদাচিৎ কোন কোন স্থানে দেখা যায়।

সমস্ত জানোয়ারেরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। ইহারা সচরাচর পাহাড়েই জন্মগ্রহণ করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া, সময় উত্তীর্ণ হইলেই আবার যে যাহার স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যায়।

বিভিন্ন জাতীয় কতকগুলি হাঁস (duck), টিল, স্নাইপ প্রভৃতি পাখী সুদূর সাইবেরিয়া ও কামস্কাট্কা হইতে শীতের প্রারম্ভে এদেশে আসিয়া, পুনরায় শীতান্তে ফিরিয়া যায়। কেবল স্নাইপ বর্ষান্তে আসিয়া শীত পড়িতেই চলিয়া যায়। রাজহাঁস ও আরও কয়েক জাতীয় হাঁস হিমালয়ের অপর পারে মানস সরোবর ও তিব্বৎ প্রভৃতি স্থান হইতে আসে। শীত অন্তে বর্ষার প্রারম্ভে ইহাদের প্রসবের সময়। তাহার বহু পূর্ব্বেই ইহারা যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যায়। ইহারা বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া পুনঃ নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে চলিয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে migratory bird অর্থাৎ যাযাবর পাখী বলে।

ইহারা চলিয়া আসিবার ও ফিরিয়া যাইবার সময়, পথে বহু শিকারী কর্ত্তৃক নিহত হয়। কিন্তু ইহাদের এমন স্বভাব যে, যাহারা প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যায়, তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব বৎসরের নির্দ্দিষ্ট স্থান আবার আসিয়া অধিকার করে। ইহারা ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থান প্রিয় মনে করে বলিয়া বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও চিনিয়া আসিতে কোন কষ্ট বোধ করে না।

কলকাতার 'জু' গার্ডেনের ঝিলে সময় সময় বুনো হাঁস পড়িত। বহু চেষ্টায় একবার কতকগুলিকে জাল দিয়া ধরিয়া পায়ে আংটী পরাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী দুই তিন বৎসরও উহাদিগকে ঐ ঝিলে আসিয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু প্রতি বৎসরই সংখ্যার হ্রাস হইতেছিল। আরও দুই এক স্থানে পরীক্ষায় ইহাদের এইরূপ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ইহারা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে এদেশে আসিতে আরম্ভ করে, তখন দশ পনের দিনের ভিতরেই ঝিল বিল ভরিয়া ফেলে। আবার যাইবার সময়ও এইরূপে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহাদ্বারা অনুমান হয় যে ইহাদের অতি দূরদেশ হইতে আসিতে বা ফিরিয়া যাইতে পথে বিশ্রাম সহকারে দশ পনের দিনের অধিক সময় লাগে না। ঝাঁকশুদ্ধ উড়িলেও, ইহাদের উড়িবার পদ্ধতি অন্য রকম। সূত্রাকারে আকাশের অতি উচ্চ দিয়া উড়িয়া যায়। উড়িবার সময় অগ্রপশ্চাৎ হইলেও সূত্রাকারেই যাইতে থাকে। এই জন্য বোধ হয় কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে সারসের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা হংসাদিতেও সেইরূপ দেখিতে পাই।

"শ্রেণীবন্ধাদ্বিতন্বদ্ভিরস্তম্ভাং তোরণস্রজং।
সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ কচিদুন্নমিতাননৌ।"

ইহাদের উড়িবার শক্তিও অসাধারণ, উড়েও খুব জোরে। স্নাইপকে কদাচিৎ দিনে আসিতে দেখা যায়, ইহারা সচরাচর রাত্রেই চলাফেরা করিয়া থাকে। যে মাঠে দুই একদিন পূর্ব্বে পাখী নাই দেখা গিয়াছে, সেই মাঠ দুই এক দিন পরেই পূর্ণ হইয়া যাইতে দেখা যায়। এই জন্যই চলাফেরা করিবার সময় ইহারা ঝাঁক ধরিয়া চলে বলিয়া মনে হয়। চরিবার স্থানে হাঁসের মত ইহারা দল বাঁধিয়া বসে না। বিভিন্ন স্থানে পৃথক হইয়া বসে। এই জন্য ইহাদিগকে এক একটী করিয়া শীকার করিতে হয়। এতদ্দেশে চারি শ্রেণীর স্নাইপ দেখিতে পাওয়া যায়—১ pintail, ২ fantail, ৩ painted, ৪ jack। Pintail ও fantail দেখিতে একই রকম, কিন্তু পুচ্ছে কিছু পার্থক্য আছে বলিয়া ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। Jack ছোট জাতীয় স্নাইপ, ইহার সংখ্যাও কম। Painted, জ্যাকের ন্যায় ছোট নয়, ময়ূরের ন্যায় নীলবর্ণে চিত্রিত। Fantail স্নাইপ, প্রথম এদেশে আসে এবং দীর্ঘ দিন থাকিয়া অন্যান্য স্নাইপের পরে ফিরিয়া যায়। এই জন্যই আমার মনে হয় যে, অন্যান্য জাতীয় স্নাইপের ন্যায় ইহাদের বাসস্থান তত

সুদূর উত্তর প্রদেশে নহে। ইহারা সমস্ত রাত্রি ও সকাল বেলা আহার অন্বেষণে চরিয়া বেড়ায়। প্রখর রৌদ্রের সময় এক একটী, এক এক স্থানে বসিয়া ঝিমাইতে থাকে। সেই জন্যই ইহাদিগকে একটু বেলা না হইলে শিকার করা অসুবিধা। প্রখর রৌদ্রের সময়েই ইহাদিগকে শিকার করা প্রশস্ত। ইহারা ক্ষুদ্রকায় এবং জোরে ও বক্রগতিতে উড়ে বলিয়া সকালবেলা জাগরিত অবস্থায় ইহাদিগকে নিকটে পাওয়া কঠিন।

স্নাইপকে এক একটী করিয়া মারিতে হয় বলিয়া ইংরাজীতেও ইহা হইতেই. যুদ্ধের সময় যাহারা দূর হইতে এক একটী সৈন্য গুলি করিয়া মারে, তাহাদিগকে 'স্নাইপার' ও এক একটী করিয়া মারার নাম স্নাইপিং বলে। অনেকে snipid নামক এক প্রকার পাখীকে snipe বলিয়া ভ্রম করেন। বাস্তবিক snipe যখন মাটিতে বসিয়া থাকে, তখন ইহাকে প্রায়ই দেখা যায় না। কাদা ও ঘাসের রঙের সহিত যেন মিশিয়া থাকে। নিকটে গেলেই অতি জোরে 'চ্যাক্' শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়। ইহাদিগকে কদাচিৎ নিঃশব্দে উড়িতে দেখা যায়। ইহারা জলা জমি ও ধানক্ষেতে প্রায় থাকে এবং পোকা মাকড়, কেঁচো প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য।

উড্ কক্ (wood cock) নামক আর এক শ্রেণীর পাখী আছে ; ইহারাও দেখিতে ঠিক স্নাইপের মত, কিন্তু আকারে অনেক বড়। আমরা একবার সিলেটের কোন স্থানে শিকার করিতে করিতে একস্থানে মাত্র দুইটী দেখিয়াছিলাম। একটীকে বহু কষ্টে মারা হয়। উহার আকার শালিকের মত ছিল। শিকারের পরে উহার চামড়াটি, পালক সমেত stuff করিবার জন্য রাখিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কুকুরে উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। শোনা যায় ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে, উড্ কক্ (wood cock) ইহা অপেক্ষা বড় আকারের হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৈকালিক ভ্রমণ।

পূর্ব্বদিনের ঘটনাটি এখানে বিবৃত করা আবশ্যক। কিশোরীকে চিঠি লিখিয়া, খামে বন্ধ করিয়া, চা পানান্তে বেড়াইতে যাইবার জন্য সত্যবালা যখন প্রস্তুত হইল, তখন বেলা প্রায় চারি ঘটিকা। নিজ ঘর হইতে উঁকি দিয়া দেখিল, মল্লিক সামনের বারান্দায় বেতের ডেক্ চেয়ারে পড়িয়া, সিগারেট মুখে করিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে—পাশের টেবিলে তাহার চায়ের পেয়ালা পড়িয়া রহিয়াছে। বাহির হইলেই, মল্লিক সঙ্গ লইবে—যাক্, সে ত জানা কথা। পাতলা ওভারকোটটি গায়ে দিয়া, ভিতর দিকের বুকপকেটে চিঠিখানি লইয়া সতী বারান্দায় বাহির হইবামাত্র মল্লিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া ইংরাজিতে বলিল, "বেরুচ্ছ না কি ?"

সতীও ইংরাজিতে উত্তর করিল, "একটু বেড়িয়ে আসবো।"

মল্লিক বলিল, "আমি কি তোমার সঙ্গী হবার সুখলাভ করতে পারি ?"

সতী জানিত, যত অনিচ্ছা বা বিরক্তিই সে প্রকাশ করুক না কেন, মল্লিক যাইবেই—এবং সেই মৎলবেই ঘাঁটি আগলাইয়া বসিয়া আছে।

তথাপি সে বলিল, "না, আপনার কষ্ট করবার দরকার নেই।"

মল্লিক ইতিমধ্যে হ্যাট্‌র্যাক হইতে নিজ টুপী ও ছড়ি লইয়াছিল। টুপীটি মাথায় দিয়া বলিল, "না মিস্ মল্লিক, কষ্ট নয়, আমার অত্যন্ত আনন্দের কারণ হবে।"—বলিয়া, সতীর সঙ্গে সেও বাহির হইল।

সতী রাস্তায় পৌঁছিয়া একটু দাঁড়াইল—কোন্ দিকে যাইবে যেন একটু ভাবিল; তাহার পর ম্যালের অভিমুখে অগ্রসর হইল। সতী দাঁড়াইতে, মল্লিকও দাঁড়াইয়াছিল; এখন সেও সতীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। দুজনের, কাহারও মুখে কথা নাই।

এইরূপে ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে ক্রমে ইহারা ম্যালের নিকট পৌঁছিল। স্থানটি সুবিস্তীর্ণ চত্বর সদৃশ, প্রান্তদেশে স্থানে স্থানে বেঞ্চ পাতা আছে, কোনও কোনও বেঞ্চে সাহেব মেম, কোনওটাতে বা বাঙ্গালী বাবুরা বসিয়া আছেন। ম্যালের মাঝামাঝি পৌঁছিতেই বিপরীত দিক হইতে একজন ইংরাজ সিভিলিয়ন যুবক "হেলো মল্লিক্" বলিয়া ইহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সতীর প্রতি এক নজর মাত্র চাহিয়া টুপী উঠাইয়া তাহাকে সম্মান জ্ঞাপন করিল। মল্লিক তৎক্ষণাৎ তাহাকে সতীর নিকট (ইণ্ট্রোডিউস) পরিচিত করিয়া দিল। ইংরাজ যুবক সতীর প্রতি চাহিয়া শিরোনমন করিয়া মল্লিকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। সতী পাশে চাহিয়া দেখিল, অদূরেই চিঠিফেলার একটি বাক্স রহিয়াছে। "Excuse me for a moment" (এক মুহূর্ত্তের জন্ম আমায় ক্ষমা করুন)—বলিয়া সতী ক্ষিপ্রপদে গিয়া, চিঠিখানি সেই বাক্সে ফেলিয়া দিয়া, আবার আসিয়া ইহাদের নিকট দাঁড়াইল। মল্লিক কট্‌মট করিয়া চাহিয়া সতীর এ কার্য্য দেখিল, কিন্তু কোনও কথা কহিতে পারিল না। দুই চারি কথার পরেই ইংরাজ যুবকটি সতীর প্রতি টুপী উত্তোলন করিয়া, মল্লিকের করমর্দ্দন করিয়া, নিজপথে অগ্রসর হইল। সতী, প্রাবারির পাশের রাস্তা দিয়া উত্তরমুখে চলিল।

পথটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন হইলে, মল্লিক ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "ডাকবাক্সে তুমি কি ফেল্লে?"

সতী বলিল, "কি আপনার অনুমান হয়?"

"চিঠি।"

"উঃ—কি বুদ্ধি আপনার!"

"কাকে তুমি ও চিঠি লিখেছ?"

সতী হঠাৎ দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, "মিষ্টার মল্লিক, আপনি জানেন, আমায় এ প্রশ্ন করবার আপনার কোনও অধিকার নেই।"

মল্লিক না দমিয়া উগ্রভাবে বলিল, "কিন্তু তোমার মা বাপ, কাউকে কোনও চিঠি লিখতে তোমার মানা করেছেন তাও তুমি জান! আমি গিয়ে তোমার মাকে এ কথা বলবো কিন্তু।"

"বেশ, যান, বলুন গিয়ে।—বলিয়া সতী অগ্রসর হইল। মল্লিককেও তাহার সহিত অগ্রসর হইতে দেখিয়া বলিল, "যান, বাড়ী গিয়ে মাকে বলুনগে। কুকুরের মত আমার পিছু পিছু আসছেন কেন?"

মফস্বলের আমলা ফয়লা, এমন কি পুলিসের দারোগা পর্য্যন্ত যাহাকে কখনও "হুজুর" কখনও "ধর্ম্মাবতার বলে, এক ফোঁটা বাঙ্গালীর মেয়ে তাহাকে কুকুর বলিল! ক্রোধে মল্লিকের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু এই ক্রোধ ও অপমান মনের মধ্যেই সে হজম করিতে করিতে, শিষ্ট শান্ত ভদ্রলোকটির মতই তাহার সঙ্গিনীর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিল। উপায় কি?

অনেক দূর গিয়া সতী একটু ক্লান্ত হইয়া ক্রমে নিজ গতিবেগ কমাইল। এ সময় তাহারা প্রাবারির উত্তর প্রান্তে পৌঁছিয়াছিল। সতীকে হাঁফাইতে দেখিয়া মল্লিক এবার কোমলভাবে বলিল, "বেঞ্চে বসিয়া একটু বিশ্রাম করবে?"

"না, ধন্তবাদ।"

"আমার সঙ্গে বসতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তুমি বেঞ্চে বস, আমি এইখানেই ঘুরে বেড়াই।"

সতী সে কথায় কোনও উত্তর না দিয়া, মন্দ মন্দ

পদে প্রাবারি প্রদক্ষিণের রাস্তা ধরিয়া গৃহাভিমুখী হইল।

গৃহে পৌঁছিয়া, সারা সন্ধ্যাবেলা মাতার তিরস্কারের জন্ম সতী অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মা কোনও কথাই বলিলেন না। মল্লিক এক সময় তাহাকে নিরিবিলি পাইয়া চুপি চুপি বলিল, "আমার উপর তুমি রাগ কোর না, তোমার মাকে আমি সে কথা বলি নি।"—পুরস্কার স্বরূপ; সতীর সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির পরিবর্ত্তে, তাহার ভ্রুকুটি ও তাচ্ছিল্য পূর্ণ দৃষ্টি লাভ করিয়া, মল্লিক সে রাত্রির মত নিজ বাসায় ফিরিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন পরামর্শ।

স্যানিটেরিয়ম হইতে বাহির হইয়া, কিশোরী মৃদুমন্দ পদে অগ্রসর হইল, কারণ তখনও যথেষ্ট সময় ছিল। যখন সে ম্যালে গিয়া পৌঁছিল, তখনও বারোটা বাজিতে পনেরো মিনিট বাকী। রাস্তা প্রায় জনশূন্য, কেবল মাঝে মাঝে দুই একজন ইংরাজ পুরুষ, পুরু ওভারকোট গায়ে দিয়া ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। ম্যাল হইতে ক্যালকাটা রোড নামিয়া গিয়াছে—এ পথটি এখন পরিত্যক্ত—ইহার কোনও দিকে বাড়ীঘর নাই—বামে খদ নামিয়া গিয়াছে; দক্ষিণ দিকে উচ্চ ভূমিতে অকল্যাণ্ড রোডের বাড়ীগুলির পশ্চাদ্‌ভাগ মাত্র দেখা যায়।

কিশোরী ক্যালকাটা রোড দিয়া চলিল। কৃষ্ণপক্ষ রজনী—এখনও চন্দ্রোদয় হইতে বিলম্ব আছে। মেঘশূন্য পরিষ্কার আকাশে নক্ষত্রগুলি ঝিক্‌মিক করিতেছে। সেই নক্ষত্রালোকে সাবধানে ধীরে কিশোরী পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। নিম্নে—বহুদূরে—লিবং ছাউনির কয়েকটা আলো মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে। উপরে অকল্যাণ্ড রোডের বাড়ীগুলির পশ্চাদ্‌ভাগ প্রায়ই অন্ধকার—সকলেই সুপ্তিসুখে নিমগ্ন—মাঝে মাঝে কোনও একটি কক্ষের বদ্ধ সার্সি ভেদ করিয়া আলোক বাহির হইতেছে।

ক্রমে কিশোরী ঘোষভিলার নিম্নভাগে আসিয়া পৌঁছিল। উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া বাড়ীটি ভাল করিয়া দেখিল—কোনও ভুল হয় নাই ত? না ভুল হয় নাই, সেই বাড়ীই বটে। পর্ব্বতারোহণ জন্ম যে পথটি আজ বিকালে স্থির করিয়া গিয়াছিল, সেটিও বেশ চিনিতে পারিল। পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া, দেশলাই জ্বালিয়া দেখিল, বারোটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকী।

তখন সে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। অতি ধীরে—অতি সাবধানে—কোনও শব্দ না হয়, নিজের পদস্খলন না হয়। দেখিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আরোহণ অপেক্ষা বসিয়া বসিয়া আরোহণই সুবিধা। সেইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া, অনেক কষ্টে সে উপরে উঠিয়া পড়িল। ঘোষভিলার তার ডিঙ্গাইয়া হাতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিল

সহসা অনতিদূরে গৃহের একটি কক্ষের সার্সি আলোকিত হইয়া উঠিল। কিশোরী জানিত, এইটি সতীর শয়নকক্ষ। পরক্ষণেই আলোক নিবিয়া গেল। দ্বার খুলিয়া সতী বারান্দায় আসিল, বারান্দা হইতে বাগানে নামিল, ধীরে ধীরে কিশোরীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, কিশোরী তাহাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিল। তাহার মুখে একটি চুম্বন করিয়া চুপি চুপি বলিল, "চল সতী—আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

কিশোরীর বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সতী কহিল, "অনেক কথা আছে, আগে শোন।"

কিশোরী কহিল, "ম্যাডানের হোটেলে তোমার জন্যে কামরা ঠিক করে রেখে এসেছি—চল, সেইখানে বসে শুনবো। এখানে বেশীক্ষণ থাকা কি ঠিক হবে?"

সতী বলিল, "কিন্তু দেখ—আজ না; এ ভাবে না। আজ তোমায় আমি মিছামিছি কষ্ট দিলাম।"

কিশোরী নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "আজ না? কেন? কবে তবে?"

কিয়দ্দূরে একখানা বড় পাথর পড়িয়া ছিল। সতী

কিশোরীকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া কহিল, "এস, এইখানে দুজনে বসি। আমার কথা যা, সেগুলি সব শোন আগে।"

উভয়ে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবেশন করিল। কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কাল যে চিঠি লিখেছিলে সেই চিঠিখানা নিয়ে বাড়ীতে কোনও রকম গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?"

সতী বলিল, "না, তা হয় নি। মল্লিক সে সময় আমায় শাসিয়েছিল বটে যে মাকে এসে বলে দেবে; কিন্তু কি জানি কি ভেবে, তা দেয় নি। সেই চিঠি ফেলার পর থেকে, আমি কিন্তু ক্রমাগত ভাবছি, এ রকম করে রাত্রে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া আমার উচিত হবে কি না। অনেক ভেবে চিন্তে আমি স্থির করেছি সেটা ঠিক হবে না। একাযটা মূলতঃ বেশী অন্যায় কায না হলেও, বাইরে থেকে দেখতে বড়ই খারাপ দেখাবে। যা করবো তা দিনের আলোতে, সর্ব্বসমক্ষে করবো—এ রকম ভাবে চোরের মত নয়—অনেক ভেবে চিন্তে, এই আমি মনে ঠিক করেছি।"

কিশোরী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায় স্থির করেছ?"

সতী বলিল, "আমি যা স্থির করিয়াছি তা এই—কাল সকালে তুমি ডেপুটী কমিশনার সাহেবের বাঙ্গলায় গিয়ে, তাঁর সঙ্গে দেখা কর। তিনিই ত তিন আইনের বিবাহের রেজিষ্ট্রার? তাঁকে গিয়ে সমস্ত কথা তুমি বল। এ বিবাহে আমার মা বাপের অমত, মল্লিকের জিদ, সমস্ত তাঁকে খুলে বল। বল যে আমরা উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত, আইনসঙ্গত ভাবে আমরা যে কায করবো, কারুই অধিকার নেই যে তাতে বাধা দেয়। যদি কেউ কোনও রকম গোলযোগ করে, জোর জবরদস্তি করে, তাহলে ডেপুটি কমিশনার সাহেব যেন আইনের বলে আমাদিকে তা থেকে রক্ষা করেন। এই রকম ভাবে, সব কথা বুঝিয়ে, তাঁকে তুমি বলতে পারবে ত?"

"পারবো।"

"তাঁকে আরও জিজ্ঞাসা কোর, কাছারীতে না গিয়ে, তাঁর বাঙ্গলায় যদি আমরা দুজনে যাই, তাহলে সেখানে আমাদের বিবাহ হতে পারে কি না? যদি তিনি রাজি হন, তাহলে পশু, কোন্ সময় আমরা তাঁর বাঙ্গলায় যাব সে কথাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে' এস। কাল রাত্রে, এই সময়, তুমি আবার এসে আমায় সব খবর দিয়ে যাবে। সেই অনুসারে যথাসময়ে পশু আমি বেড়াতে বেরুব এবং যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছব—অবশ্য মল্লিকও আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। তা যাক্, বয়েই গেল। ডেপুটি কমিশনরের বাঙ্গলা আমি চিনি, কাছারিও চিনি; যেখানে দরকার সেখানে যাব। তুমি আগে থাকতে সেখানে গিয়ে বসে থাকবে। যথাসময়ে, আমাদের বিবাহ হয়ে যাবে— তার পর, বাড়ী এসে মাকে আমি বল্‌বো। আমাদের বিয়ের নোটিস দেওয়া আছে সে ত তিনি জানেন।—তার পরের দিন, আমরা কলকাতা চলে যাব। কেমন, এ পরামর্শ তোমার কেমন বোধ হয়?"

কিশোরী বলিল, "এই ভাল। রাত্রে পালানোর চেয়ে, এই ভাবে কায করা ঢের ভাল।"

সতী বলিল, "তবে এই কথাই রইল। এখন আর বেশী দেরী করে কায নেই—শত্রুপুরী—কে কোথায় দিয়ে এসে পড়বে।"—বলিয়া সতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরী উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে ঠিক এই সময় কাল, সব খবর এসে তোমায় বলে যাব। এখন তা হলে আসি।"—বলিয়া সে তাহার প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, তাহাকে চুম্বন করিয়া বিদায় লইল।

"শত্রু" অদূরেই ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাশের বাড়ীখানি মল্লিক সাহেবের অধিকৃত। সতী ও কিশোরী যে স্থানে পাথরের উপর বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, সেখান হইতে কিছু দূরেই সেই বাড়ীর একটা অন্ধকার কক্ষের জানালা, এতক্ষণ খোলা ছিল, সতী উঠিয়া প্রস্থান করিতেই উহা খট্ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আইনের সাহায্য।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া চা পানান্তে, ক্ষৌরকার্য্য ও

পোষাক পরিধান সম্পন্ন করিয়া, কিশোরী ডেপুটি কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। সাহেবের কুঠীতে পৌঁছিয়া, আর্দ্দালিহস্তে নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিল। আর্দ্দালি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সাহেব ছোটহাজরী খাইতেছেন, অপেক্ষা করিতে বলিলেন।"—বলিয়া আর্দ্দালি তাহাকে একটি কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল।

প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করিবার পর, আর্দ্দালি পুনরায় আসিয়া কিশোরীকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সাহেব, চটিজুতা পায়ে, ড্রেসিংগাউন পরিয়া, কাগজপত্র বোঝাই একটা টেবিলের সম্মুখে বসিয়া চুরটের ধূমসেবন করিতেছেন। "গুড্‌মর্ণিং সার"—বলিয়া কিশোরী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

"গুডমর্ণিং"—বলিয়া সাহেব তাহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন।

কিশোরী বসিয়া বলিল, "তিন আইন বিবাহের রেজিষ্ট্রার স্বরূপ, আপনাকে আমি বিবাহের নোটিস দিয়াছিলাম, আপনার স্মরণ আছে কি না বলিতে পারি না।"

সাহেব বলিলেন, "হাঁ আমার স্মরণ আছে। কবে আপনি বিবাহ করিতে চান মিষ্টার নাগ?"

কিশোরী বলিল, "আগামী কল্য, আমাদের বিবাহিত হইবার ইচ্ছা। কিন্তু ইহার ভিতর একটু গণ্ডগোল আছে। আপনি এই জেলার শাসনকর্ত্তা। আমাদের প্রতি কোনরূপ বে-আইনী বাধা বা অত্যাচার যদি হয়, তবে সে সমস্ত হইতে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন এরূপ আশা করিতে পারি না কি?"

সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়—যদি আপনাদের কার্য্যটী সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত হয়।"

কিশোরী বলিল, "আমরা উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত। আমার বয়স ছাব্বিশ, যাঁহাকে আমি বিবাহ করিব—মিস্ ঘোষ—তাঁহার বয়স উনিশ। তিনি কুমারী, আমিও অবিবাহিত। উভয়ের তিন পুরুষের মধ্যে রক্তের কোনও সংস্রব নাই। আইনে বাধে, এমন কিছুই কোথাও নাই। সুতরাং আমাদের কার্য্যে কেহ বাধা দিতে পারে না ত?"

সাহেব বলিলেন, "কেহ না।—কেন, এ বিবাহ কি মেয়েটীর বাপ মায়ের অমতে হইতেছে?"

কিশোরী বলিল, "আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন। সমস্ত ব্যাপারটী অনুগ্রহ করিয়া শুনিবেন কি?"

সাহেব ঘড়ির দিকে এক নজর চাহিয়া বলিলেন, "বলুন।"

কিশোরী তখন পারিবারিক ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে সাহেবকে জানাইল। মল্লিক এ ব্যাপারের মধ্যে কি ভাবে জড়িত এবং কিরূপ তাঁহার আচরণ, তাহাও বর্ণনা করিল। শেষ বলিল, "আমাদের ইচ্ছা, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সম্মত হন, তবে কাছারিতে না গিয়া, এইখানে আপনার আফিসেই আমাদের বিবাহ হয়।"

সাহেব বলিলেন, "আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই, মিষ্টার নাগ। কাছারির পূর্ব্বে না, পরে? পূর্ব্বে হইলেই ভাল, এই সময়—ধরুন বেলা নটা?"

কিশোরী বলিল, "বেশ। আমরা দুজনে কাল বেলা ৯টার সময় এখানে উপস্থিত থাকিব। আপনাকে ত বলিয়াছি, মল্লিক, মিস ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন। প্রথমে অবশ্য তিনি কিছুই জানিবেন না যে মিস্ ঘোষ কোথায় কি অভিপ্রায়ে যাইতেছেন। কিন্তু আপনার কুঠীর কাছে আসিলে হয়ত তিনি সন্দেহ করিয়া মিস্ ঘোষকে জবরদস্তি ফিরাইতে চেষ্টা করিতে পারেন।"

সাহেব তাচ্ছিল্য ভাবে বলিলেন, "ফোঃ—সে সব কিছুই হইবে না। ইহা আপনার অমূলক আশঙ্কা।—আমি কাল বেলা ৯টার সময় কাগজপত্র সহ আমার পেস্কারকে এখানে হাজির থাকিতে আদেশ দিব। দুইজন সাক্ষী আবশ্যক, তাহা আপনি জানেন ত? সাক্ষী দুইজন আনিবেন। গুড্‌মর্ণিং।"—বলিয়া সাহেব হাত বাড়াইয়া দিলেন।

"গুড্‌মর্ণিং"—বলিয়া সাহেবের সহিত করমর্দ্দন

পূর্ব্বক কক্ষ হইতে বাহির হইয়া কিশোরী ফটকের দিকে চলিল।

বাঙ্গলার সম্মুখে অনেকখানি স্থান লইয়া ফুলের বাগান। মাঝামাঝি আসিয়া দেখিল, একটি ১৪।১৫ বৎসরের ইংরাজ বালিকা, পিঠের উপর নীল ফিতা বাঁধা একরাশি কটা চুল, বাগানে দাঁড়াইয়া ফুল তুলিতেছে। কিশোরী নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মেয়েটি অগ্রসর হইয়া কহিল, "মিষ্টার নাগ!"

কিশোরী ত অবাক্! এ কে? আমার নামই বা জানিল কোথা হইতে? মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "আমি ডেপুটী কমিশনার সাহেবের কন্যা। আমি একটী অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি; তাই আমি আপনার ক্ষমাপ্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইয়া আছি।"

কিশোরীর বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। তাহার ভাব দেখিয়া মেয়েটি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "বাবার সঙ্গে আপিস কামরায় বসিয়া আপনি যে সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, পাশের ঘর হইতে আমি সে সমস্তই শুনিয়াছি। আমি বড় দুষ্ট, সর্ব্বদাই নানা রকম অপকর্ম্ম করিয়া থাকি। আপনি যাঁহাকে বিবাহ করিবেন, সেই মিস ঘোষের পুরা নামটী কি?"

এতক্ষণে কিশোরী ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল এবং মনে মনে কিছু কৌতুকও অনুভব করিল। পুরা নাম বলিল। মেয়েটী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি তাঁকে —খুব খুব খুব ভালবাসেন?"

কিশোরী মৃদু হাসিয়া বলিল, "খুব খুব খুব ভালবাসি।"

মেয়েটি আনন্দে হাত তালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি মজা! কি চমৎকার! আর তিনি?—তিনিও কি আপনাকে খুব খুব খুব ভালবাসেন?"

কিশোরী বলিল, "তা ঠিক জানিনা, একটু একটু বাসেন বৈকি!"

"আমার বোধ হয়, তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন। ভালবাসার বিবাহ কি চমৎকার! আমার বড় ভাল লাগে। তিনি কি ইংরাজি জানেন? ইংরাজি কথা কন?"

"উত্তম ইংরাজি কন্।"

"আচ্ছা, কাল এখানে আসিয়া আপনাদের বিবাহ হইয়া গেলে, আমাকে তাঁর কাছে আপনি ইণ্ট্রোডিউস (পরিচিত) করিয়া দিবেন?"

"অতি আহ্লাদের সহিত।"

"বেশ, মনে রাখিবেন। আপনার বধূর জন্ম আমি একটি ফুলের তোড়া গড়িয়া রাখিব, তাঁহাকে সেটি আমি উপহার দিব। এখন আমি চলিলাম—গুড্‌বাই।" —বলিয়া মেয়েটী হাসিতে হাসিতে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া কিশোরী কলিকাতায় তাহার গৃহভৃত্যকে পত্র লিখিল। লিখিল যে বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক অমুক দিন দার্জ্জিলিঙ মেলে সে কলিকাতায় ফিরিবে, বেলা ১২টার সময় বাড়ী পৌছিবে। ঘর দুয়ার ঝাড়িয়া মুছিয়া, ব্রাহ্মণ ঠাকুর দ্বারা পাকাদি যেন সম্পন্ন করাইয়া রাখে। হেমকেও সমস্ত জানাইয়া একখানি পত্র লিখিল এবং অনুরোধ করিল, আপিসের ফেরৎ বিকালে নিশ্চয় যেন সে আসিয়া দেখা করে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মল্লিকের অনিদ্রা।

গতরাত্রে মল্লিকের বাসায় যাহা ঘটিয়াছিল, এই সময় তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক। গতরাত্রে মল্লিক নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, রাত্রি ১০টার পর শয়ন করিয়াছিল। শয়ন করিয়া, সত্যবালার দুর্ব্যবহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—"কেন, এত অহঙ্কার তার কিসের জন্য? একজন সিভিলিয়নকে স্বামী পাওয়া, বিলাতফেরৎ সমাজের যে কোনও মেয়ের পক্ষেই পরম সৌভাগ্যের বিষয়—তা সে মেয়ে রূপে গুণে ধনে মানে যত বড়ই হউক না কেন। সত্যবালাকে প্রোপোজ না

করিয়া, আমি যদি অন্ত কোনও মেয়েকে প্রোপোজ করিতাম, তবে সে একটা রাজার মেয়ে হইলেও, তাহার বাপ মা ভাই, তাহার গোষ্ঠীবর্গ পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়া যাইত। আর, ইনি কিনা নাক তুলিলেন!—তাও যদি মানুষের মত মানুষ হইত, তাহা হইলেও দুঃখ ছিল না। শেষে পছন্দ করিলেন কিনা একটা মূর্খ বর্ব্বর ভ্যাগাবণ্ডকে! উঃ—ইশ একেবারে অসহ্য।”

গতকল্য বেড়াইতে গিয়া সত্যবালার দুরুক্তি, আজ তাহার সারাদিনব্যাপী তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার, চিঠি ফেলার কথা বাড়ীতে গোপন রাখা সত্বেও লেশমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অভাব—এই সমস্ত দুর্ব্যবহারের কথা যতই মল্লিক মনে মনে আলোচনা করে, ততই তাহার ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ঘণ্টা খানেক বিছানায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিয়া, কিছুতেই যখন নিদ্রা আসিল না, তখন সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। ভাবিল, আজ বোধ হয় হুইস্কির মাত্রাটা অত্যন্ত কম হইয়াছে, আর একটু পান না করিলে ঘুম আসিবে না।

মল্লিক তখন শয্যা হইতে নামিয়া, আলো জ্বালিল। ড্রয়িং রুমের ওপাশের ঘরে তাহার পাহাড়িয়া ভৃত্য মংলু শয়ন করে, তাহাকে গিয়া জাগাইয়া, পেগ হুকুম করিয়া আসিল। তাহার পর শেলফ্ হইতে একখানি ইংরাজি উপন্যাস বাছিয়া লইয়া, ঈজি চেয়ারে লম্বমান হইল। পড়িতে পড়িতে, হুইস্কি পান করিতে করিতে নিদ্রা আসিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়।

ক্ষণকাল পরে মংলু, হুইস্কির ডিকাণ্টার ও সোডার সাইফন্ সমেত একখানা ট্রে হস্তে প্রবেশ করিল। সাহেবের পার্শ্বস্থিত টেবিলে তাহা রাখিয়া, অপর আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। মল্লিক গ্লাসে হুইস্কি ঢালিয়া, সাইফন টিপিয়া খানিকটা সোডা লইয়া, ভৃত্যকে বলিল, “যাও।” মংলু সেলাম করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

এক গ্লাস—দুই গ্লাস পার হইয়া গেল, কৈ, তেমন ঘুম ত আসিল না!’ এইবার শেষ বার—একটু বেশী করিয়া ঢালিলেই ঠিক ঘুম আসিবে। দাতার হাতে হুইস্কি এবং কৃপণের হাতে সোডা ঢালিয়া লইয়া, অর্দ্ধেকটা শেষ করিতে না করিতেই ঘুমে তাহার চক্ষু ঢুলিয়া পড়িল। প্রায় পনেরো মিনিট এই ভাবে কাটিলে, হাতের বহিখানি ধপাস করিয়া নীচে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে মল্লিক চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। ঘড়ি দেখিল, বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বাকী হুইস্কি টুকু শেষ করিয়া, আলো নিবাইয়া দিয়া সে অনুভব করিল, ঘরটা অত্যন্ত গরম হইয়া গিয়াছে। ভাবিল, একটা জানালা মিনিট দশেক খুলিয়া, ঘরের গরম হাওয়াটা বাহির করিয়া দিই, তাহা হইলে সুখে ঘুমাইতে পারিব।

সে তখন হাতড়াইতে হাতড়াইতে একটা জানালার, কাছে গেল। সার্সিটা খুলিয়া দিতেই, হিমালয়ের হাওয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহার মদিরা-তপ্ত মস্তকে সেই শীতল স্পর্শ বড়ই আরামদায়ক বোধ হইতে লাগিল। সার্সি ধরিয়া সেই অন্ধকারে সেইখানে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

সম্মুখে ঘোষ ভিলা—সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত। সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মল্লিক ভাবিতে লাগিল—ঐ—ঐ কক্ষখানিতে সতী শয়ন করিয়া আছে। শয়ন করিয়া হয়ত সেই বর্ব্বরটাকে স্বপ্ন দেখিতেছে। ক্রোধে ও বিরক্তিতে তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ তাহার নজর পড়িল, ঘোষ গৃহের অনতিদূরে, হাতার প্রায় প্রান্তভাগে, ও কি? দুইটা মনুষ্য মূর্ত্তি—সহসা যেন ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইল। মল্লিক তাহার সেই সুরাবিহ্বল নেত্রযুগল যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

সেই স্বল্প নক্ষত্রালোকে সে দেখিতে পাইল, একটি পুরুষ, একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। দুইজনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইল,—একটা চুম্বনের শব্দও যেন শুনা গেল। তাহার পর স্ত্রীমূর্ত্তি, গৃহের দিকে গিয়া বারান্দায় উঠিল, পুরুষটা, পাথরের উপর ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে ক্যালকাটা রোডের দিকে নামিতে লাগিল।

প্রকৃত ব্যাপারটা মল্লিক এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

একবার ইচ্ছা হইল, বাহির হইয়া, ছুটিয়া গিয়া কিশোরীকে ধরিয়া ফেলে। কিন্তু ভয়ও হইল—যাহারা এই প্রকার নিশাচরবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহারা আত্মরক্ষার্থ সঙ্গে ছুরিছোরাও রাখিয়া থাকে। সুতরাং মল্লিক আস্তে আস্তে জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল।

আবার আলো জ্বালিয়া, আর খানিক হুইস্কি ঢালিয়া তাহা এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিয়া, শয্যায় প্রবেশ করিয়া মল্লিক জড়িত স্বরে বলিতে লাগিল,—"বাহবা কি বাহবা! তোমাদের প্রেমলীলা চলছে ভাল। আচ্ছা, রও, কাল অবধি সবুর কর—তোমাদের লীলা আমি সাঙ্গ করে দিচ্ছি।"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অভিশপ্ত গ্রাম

গ্রামের প্রান্তে ঐ না ওখানে দেখা যায় ভাঙা চালা,
ঘোর জঙ্গল, ভীষণ আঁধার, চারিদিকে গাছপালা,
দিনের বেলায়ও শেয়ালের ডাকে তালা লেগে যায় কাণে,
এক হাঁটু জল কাদা পার হয়ে যেতে হয় ঐখানে।
ওখানে থাকিত বাউল বাবাজী হরিদাস বৈরাগী,
কোনোরূপে করি জীবন ধারণ গ্রামে গ্রামে ভিখ্ মাগি।
ছেঁড়া কাঁথা আর ছেঁড়া ঝুলি পুঁজি, ধুলায় ধূসর দেহ
একতারা আর হরি ছাড়া তার জগতে ছিল না কেহ।
মানুষ থাকিতে পারে যে ওখানে ভাবিতেও ভয় হয়,
দেখেনি যে হোথা বাবাজীরে সে ত করেনাক প্রত্যয়।

সন্ধ্যা সকালে হরিদাস যবে ধরিত ভজন সুর
পাষাণ হিয়াও গলিত, সে তান সুমধুর, সুমধুর!
সারা গ্রামখানি করিত মুখর উতরোল মধুতান,
পশু পাখীরাও মুগ্ধ হইয়া পাতিয়া রহিত কাণ।
শাক্তের গ্রামে বাবাজীর প্রতি ভক্তি ছিল না কারো,
তবু গান শুনে টলিত হৃদয় কৌলাচারী যে, তারো।
ঝুঁটি বাঁধা চুল মাথায়, কোমরে কৌপীন ছিল খালি,
ছেলেরা ক্ষেপাত ছড়া গেয়ে গেয়ে, দিয়ে পাছে হাততালি।
এ গ্রামে তাহার মিলিত না কিছু ঘৃণা উপহাস ছাড়া,
তবু যে এখানে কেন যে থাকিত, যায় না বুঝিতে পারা।

একদিন প্রাতে সন্ধ্যায় গান শুনিতে পেল না কেউ
তার পরদিনও পল্লীপবনে নাই সে সুরের ঢেউ।
গ্রামের লোকেরা ভাবিল, বাবাজী গিয়াছে গঙ্গাস্নানে;
পরাণ কিন্তু পাতকীর মত প্রবোধ নাহিক মানে।
ভট্‌চায্ খুড়ো বলিলেন, "দূরো—কিছু নয়, কিছু নয়,
খেতুরের মেলা, ভারি ধূমধাম, গিয়াছে সে নিশ্চয়।"
ঠাকুরের কথা নাহি শুনে কাণে রাখালের দল হায়
বাবাজীর ঘরে গিয়া যা দেখিল, পরাণ ফাটিয়া যায়।
তুলসী তলাতে শায়িত বাবাজী, গলে হরিনাম ঝুলি,
শিয়াল কুকুরে ছিঁড়িয়া খেয়েছে গায়ের মাংসগুলি।
ললাটে এখনও তিলকের ছাপে লেখা আছে হরিনাম,
ভক্ত বিরাগী বাবাজীর হায় এই হলো পরিণাম!

সেই হ'তে এক অভিশাপ এসে গোটা গ্রামে দিল হানা,
পুড়িতে লাগিল তুষানলে যেন সেই হ'তে গ্রামখানা।
সুসময়ে আর হয় না বৃষ্টি, ক্ষেতে না ফসল ফলে,
তরুলতা সব ঝলসিয়ে পড়ে, মড়াইয়ে আগুন জ্বলে।
কেমন একটা আতঙ্কে যেন সারা গ্রাম খানি মূক
সন্ধ্যা ঘনায়ে আসিলে সবার দুরু দুরু করে বুক।
পাখীগুলি সব গ্রাম ছেড়ে গেছে, ধেনু ঢালেনাক দুধ,
কুম্ভ ভরিতে জলে উঠেনাক কলতান বুদ্‌বুদ,

হাসিতে গেলেও হাসি আসেনাক কে যেন কণ্ঠ চাপে।
ওলাউঠা হয় প্রতি বৎসরই, দেবতার অভিশাপে।
শিয়াল বেড়ায় গ্রামপথে, উড়ে শকুনি গৃধিনী কুল,
ফলেনাক তরু বনে বা বাগানে, ফুটে না একটী ফুল।

ঐ যে কেতকী-কুঞ্জ হেরিছ বাঁশ বাগানের আড়ে
গো ভাগাড়ের ধারে ঠিক ঐ উঁচু পগারের পাড়ে।
ঝোপ ঝাড় বেঁধে ঘেরিয়াছে ঐ বাবাজীর চালাখানা
সাপের আড্ডা, পেচকের বাসা, বুনো শুয়োরের থ না।

বর্ষা পড়িলে এই গ্রামে শুধু ওইএক ফুল ফুটে.
সিক্ত সমীর উতরোল করি উহার গন্ধ ছুটে।
ঠিক্ ফুটে তা'ও কেমনে বলিব ? গন্ধটা দুর্জ্জয়,
বাবাজীর মত রজোধূসরিত বনের আড়ালে রয়।
বাবাজীর সাথে তুলা দিয়ে কয়, গ্রামের তরুণ কবি
"বাবাজীরি গান ছুটিয়া আসিছে গন্ধ স্বরূপ লভি।"
আরো কয়, "শোন, ভক্ত আসিয়া বিলাইবে হরিনাম,
শাপ হতে তবে মুক্ত হইবে ভক্তহন্তা গ্রাম।"

শ্রীকালিদাস রায়।

পিতৃহীন

(গল্প)

শোকের প্রথম বেগটা অনেকটা সামলে নেবার পর সুধার মনে পড়ে গেল, ছেলেকে অনেক দিন আদর করে পড়ান হয় নি। মা না হলে সুকুর পড়াই হয় না, মার কোলটাতে বসে হেলে দুলে নানা অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা না করে সুকুর পড়েই সুখ হয় না। সে প্রত্যহ দুটী বেলা তার কাগজের মলাট দেওয়া প্রথম ভাগখানি হাতে করে এনে মার কাছে বসতো, আর এক এক দিন গম্ভীর হয়ে বলতো—মা একটু বেশী করে পড়াও না, আমি যে বড় হচ্চি। কিন্তু আজ এ কদিন হ'ল সে বড় একটা মার কাছে আসে নি। যা দু'একবার এসেছিল, তা মাকে অনবরত কাঁদতে দেখে, আর মার কাছে কোন রকম আদর না পেয়ে অধিকাংশ সময়টা সে ঠাকুরমার কাছে কাটিয়ে দিয়েছে। তাই সেদিন যখন তার মা একটু হেসে তাকে বল্লে, "বাবা সুকু, আর পড়তে এস না কেন ?" তখন সুকুর প্রাণটা আহ্লাদে লাফিয়ে উঠলো।

সে তাড়াতাড়ি বল্লে, "মা তুমি যে আজকাল রাতদিন কাঁদো, আমায় ভাল করে ডাক না, তাই ত আসিনি। বইটা নিয়ে আসবো মা ?"

মা জবাব দিল, "হাঁ বাবা নিয়ে এস।—আবার কি ভেবে একটু পরে বল্লে, "আচ্ছা বাবা আজ থাক, কা'ল সকাল থেকে পড়াব।"

সুকু একেবারে মাথা নেড়ে বলে উঠলো, "না মা, আজ থেকে পড়বো। আমার অনেক দিন নূতন পড়া হয় নি।"

সুধা বুঝতে পারলে, মার কোলে বসে বইখানি হাতে নিয়ে হেলে দুলে পড়বার জন্যে তার ক্ষুদ্ধ অন্তঃকরণ আজ বড় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। তাই বল্লে, "আচ্ছা তবে নিয়ে এস বাবা।"

সে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তোরঙ্গের উপর থেকে নিজের ধূলি ধূসরিত বইখানা এনে মার কাছে দাঁড়াল। সুধা ওকে দুহাতে টেনে নিয়ে নিজের কোলের উপর বসিয়ে দিয়ে চিবুক ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা সুকু, আজ কোথা থেকে পড়া হবে ?"

সুকু বই না খুলে মুখে মুখে বলে দিল, "মা, গিরিশের গল্প শেষ হয়ে গেছে, আজ তার পর থেকে পড়া হবে।" মা বই খুলে একস্থানে হাত দিয়ে বল্লে, "তা হলে বাবা, আজ এখান থেকে হবে ত ?"

পুত্র উৎসাহের সহিত বলে উঠলো, "হাঁ মা, এইখান থেকেই হবে।"

মা পড়াতে লাগলো,—গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে।

ছেলে পড়তে পড়তে বলে উঠলো, "হাঁ মা, আমিও ত খুব সুবোধ, না মা? আমায় যে যা বলে আমি ত তাই করি মা।"

মা একটু হেসে বল্লে, "হাঁ বাবা তুমি খুব লক্ষ্মী, তুমি আমার সোণা মাণিক।"—এই বলে ছেলের মুখটা ধরে একটা চুমু খেলে।

আহ্লাদে ছেলের বুকটা একটু ফুলে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "তারপর মা পড়াও, তারপর।"

মা পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লে, "আগে বাবা এটা ভাল করে বানান কর, মানে কর, তারপরে আবার পড়বে।" ছেলে বলে উঠলো, "না মা, আগে আর একটু পড়াও, তার পর সবটা একসঙ্গে বানান করবো, মানে করবো।" পড়বার ঝোঁক দেখে মা আর কিছু না বলে বল্লে, "আচ্ছা বাছা, পড়।"

মার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে পড়ে যেতে লাগলো,—যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না। গোপাল আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভালবাসে।

সুকু হঠাৎ বলে উঠলো, "আচ্ছা মা, আমার ছোট ভাই বোন নেই কেন?"

মা শুধু একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "না বাবা, নেই।" এ প্রশ্নের আর কি জবাব দেবে?

ছেলে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে মার সঙ্গে পড়তে লাগলো,—সে কখনও তাহাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না। এ কারণে তাহার পিতামাতা তাহাকে অতিশয় ভালবাসেন।

কি ভেবে সুকু হঠাৎ বলে উঠলো, "মা, বাবা কিন্তু আমায় মোটে ভালবাসে না।"

মার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সে কথাটা চাপা দেবার জন্তে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "বাসেন বই কি বাবা! পড়—গোপাল যখন পড়িতে যায়—।" সুকু সে কথা না শুনে একটু অভিমানের সুরে বলে উঠলো, "না মা, বাবা কখনও ভালবাসে না। এই দেখনা ঠাকুমা বলেছে, বাবা আমার জন্তে কল্‌কাতা থেকে কত ভাল ভাল জিনিষ কিন্‌তে গেছে। হাঁ মা, এতদিন ত হয়ে গেল, বাবা এখনও আসতে পারলে না?"

সুধার বুকটা তোলপাড় করে উঠলো। সে কি করে তার কচি বুকে আঘাত দিয়ে বল্‌বে, ওরে অভাগা তুই যে পিতৃহীন!—সে দিনের সেই মৃত্যুর করুণ ছবি সুধার চোখের সামনে আবার ফুটে, কান্নার বান তার চোখের পাতায় ছুটে এল। কিন্তু তখনি ছেলের কথা মনে পড়ে গেল, তাই উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ চাপতে গিয়ে বুকটা যেন ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হল। অন্য দিকে চেয়ে সুধা বলে উঠলো, "ভাল ভাল জিনিষ আনবেন কি না, তাই দেরী হচ্চে বাবা! তারপর পড় বাবা।"

ছেলে অভিমান সুরে ছলছল চোখে বলে উঠলো, "না মা, আমি পড়বো না।"

মা গালে গাঢ়ভাবে একটা চুমু দিয়ে বল্লে, "আচ্ছা বাবা পড়তে হবে না, একটা পরীর গল্প শুন্‌বে?"

সুকু বল্লে, "না মা, আমি ঘুমবো।" মা অমনি বলে উঠলো, "না বাবা, কিছু খেয়ে ঘুমোও। এই দেখনা ঠাকুর কেমন এক্ষুণি খাবার দিয়ে যাবে, গরম গরম লুচি, পটল ভাজা, মাছ—"

কথা শেষ হতে না দিয়ে সুকু ঠোঁঠ ফুলিয়ে কেঁদে বল্লে, "কেন এখনো খাবার হয় নি, আমি কক্ষণো খাব না। আমি ঘুমোব ঘুমোব।"

মার আর বুঝতে বাকী রইল না যে, এই একটা ছুতো করে কেঁদে সে তার কোমল বক্ষ হতে একটা ব্যথার ভার নামিয়ে দিতে চায়। এমন ত কত দিন গেছে এর চেয়ে বেশী রাতে সে খেয়ে শুয়েছে।

আর কিছু না বলে মা তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্লে, "আচ্ছা বাবা খেতে হবে না, চল আমরা শুতে যাই।"

ছেলেকে কোলে করে সুধা বিছানায় গিয়ে শুলো।

মাকে জড়িয়ে ধরে স্বকু চোখের পাতাগুলি বন্ধ করে দিলে; কিছুক্ষণ পরে স্বকুর চোখের পাতা স্থির হয়ে এল, আস্তে আস্তে নিশ্বাস পড়তে লাগল। ম বুঝতে পারলে স্বকু ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মুখখানিতে সুধা বেশ দেখতে পেলে তখনও একটা অভিমানের ব্যথা মাখান রয়েছে। নীরবে সুধার ছটো চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়াতে লাগলো।

শ্রীরাজকুমুদকৃষ্ণ মিত্র।

নালন্দা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

পূর্ব্বে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছি তাহাতে মাত্র দুইজন পরিব্রাজকের কথা বলা হইয়াছে। হুয়েনসাং ও ইৎসিং ছাড়াও যে অন্য চীন পরিব্রাজক নালন্দায় আসিয়াছিলেন, তাহার বিষয় আজ বলিব। নালন্দার মঠে যে কেবল বিদেশী পর্য্যটকেরা আশ্রয় পাইত, তা নয়, সেই মঠ হইতে অনেক ভারতীয় ভিক্ষুও বিদেশে যাইত।

ইৎসিং যখন ভারতে আসেন, তখন আরও অনেক চীন পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন। ইৎসিং তাঁহাদের বিবরণ একখানি বহিতে লিখিয়া গিয়াছেন। সেই বহিটী চীনা ভাষা হইতে ফরাসীতে অনুবাদ করিয়াছেন—সাভান (M. Chavannes) সাহেব। সেই বহি হইতে জানা যায় যে Tchchong (চেহং) নামে একজন চীনা ভিক্ষু সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসেন। সমুদ্রপথে ভারতে আসিয়া তিনি আট বৎসর মধ্যভারতে বাস করিয়াছিলেন। সেই আট বৎসর তিনি নানা তীর্থস্থান দর্শন এবং নালন্দাতে অবস্থান করিয়া কাটান। তিনি নালন্দাতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১

অষ্টম শতাব্দীতে আর একজন চীনা ভিক্ষু আসেন। তাঁর চীনা নাম Ou-Kong (ওকং)। তিনি স্থলপথে ভারতে আসেন। ভারতে আসিয়া তাঁহার ইচ্ছা হয় যে তিনি একটা ভারতীয় নাম গ্রহণ করিবেন। সেই জন্য বৌদ্ধ আচার্য্যদের নিকট হইতে তিনি একটী ভারতীয় নাম লয়েন, তাঁর সেই নামটী "ধর্ম্মধাতু"।

ধর্ম্মধাতু ৭৫১-৭৯১ অব্দ পর্য্যন্ত (প্রায় ৪০ বৎসর) ভারতে ছিলেন। অধিকাংশ সময় উত্তর ভারতে অতিবাহিত করিয়া ধর্ম্মধাতু ধর্ম্ম সংগ্রহের জন্য তীর্থভ্রমণে বাহির হন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বৈশালী, শ্রাবস্তী, কুশীনগর দেখিয়া নালন্দায় আসেন। নালন্দার মঠকে তিনি চীনাভাষায় "না-লন্‌-তো" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে তিনি তিন বৎসর বাস করেন, তবে সেই সময় তিনি কোনও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না তাহা বলেন নাই। (২)

দশম শতাব্দীতে কি-ঈ (Ki-Ye) নামে পরিব্রাজক আসেন। তিনি তাঁর যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন; তাহা হইতে আমরা নালন্দার বিষয়ে নূতন বেশী কিছু জানিতে পারি না। তবে এটী আমরা জানিতে পারি যে, রাজগৃহ দেখিয়া তিনি নালন্দার মঠে যান। তিনি লিখিয়াছেন যে, রাজগৃহ হইতে নালন্দা কেবল এগার "লি" দূরে। ইহাতে নালন্দার স্থান নির্দ্দেশে আমাদের সুবিধা হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে নালন্দা মঠের উত্তরে ও দক্ষিণে অনেক মঠ আছে, সেই সকল মঠের দ্বার পশ্চিমে অবস্থিত। তবে এই মঠগুলি নালন্দার অধীন ছিল কি না, তিনি তাহা বলেন নাই। (৩)

উপরে যে তিন জন পর্য্যটকের কথা বলিলাম, তাঁরা সকলেই চীনদেশীয়। তাঁহারাই যে চীনদেশ হইতে

(১) I-tsing- Trans.—Chavannes.

(২) Sylvain Levi and Chavannes—Ou Kong J. A, 1895, Sept. Oct.

(৩) Huber i-Ki-ye. B. E. F. O. 1902.

নালন্দায় আসিয়াছিলেন, আর নালন্দার মঠ হইতে কোন ভারতীয় যে চীনদেশে যায় নাই, এমন নহে। দশম শতাব্দীতে নালন্দা মঠ হইতে একজন ভারতীয় ভিক্ষু চীনদেশে যান, তাঁর নাম ধর্ম্মদেব বা "ফা-তিয়েন" (৯৭৩ খৃঃ অঃ)। তাঁহার কিন্তু ফা-তিয়েন নাম পছন্দ হয় নাই, পরে (৯৮২) এ নাম বদলাইয়া তিনি "ফাহিয়ান" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাছে প্রসিদ্ধ চীন ভ্রমণকারী ফাহিয়ানের সঙ্গে তাঁহার নামের গোলমাল হয়, সেই জন্য তাঁহাকে হিন্দু বা ভারতীয় ফাহিয়ান বলা হয়। তিনি নালন্দা মঠের একজন শ্রমণ ছিলেন।

চীনদেশে গিয়া ধর্ম্মদেব চীনভাষা শীঘ্র শিখিয়া লন। তিনি চীনভাষায় এত পারদর্শী হইয়াছিলেন যে চীনের সম্রাট তাঁহাকে এবং আর দুইজন ভারতীয় ভিক্ষুর উপর সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদের ভার দেন। এ কার্য্য তিনি খুব ভাল রূপেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি সে সময়ের একজন বিখ্যাত অনুবাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১০০১ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। (৪)

(৪) Chavannes, R. H. R. 1896 p. 46.

তাঁহার পর আর একজন ভারতীয় ভিক্ষুর কথা জানা যায়, যিনি নালন্দার মঠ হইতেই চীনরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চীনাভাষায় তাঁর নাম—পো-তো কি-তো (Pou-t'o-k'i-to) যখন তিনি চীনের রাজদরবারে হাজির হন, তখনকার তারিখ—৯৮৯ খৃঃ অঃ। চীনা বহিতে তাঁহাকে না-লন্-তো বা নালন্দার শ্রমণ বলা হইয়াছে, আরও বলা হইয়াছে যে তাঁর বাড়ী মধ্য ভারতে। চীনের রাজসভায় গিয়া তিনি সম্রাটকে বুদ্ধের অস্থি ও কয়েকখানি সংস্কৃত বহি উপহার দেন। (৫)

৯৮৪ অব্দে আর একজন চীনা ভ্রমণকারী নালন্দার মঠে আসেন, তাঁহার নাম—Ts'e-hoan (সে-হোন্)। দুঃখের বিষয় তাঁর নিকট হইতে আমরা নালন্দা সম্বন্ধে কোনও নূতন তথ্য পাই না। তাঁর বিবরণ লিখিতে গিয়া চীন ঐতিহাসিক নালন্দা ও বজ্রাসনের মধ্যে গোল বাধাইয়াছিলেন। (৬)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

(৫) Chavannes, R. H. R., 1896, p 46

(৬) ঐ পৃঃ ৫৩।

সুখের ভাগ

প্রথমেতে শুনেই অবাক হবি—
রথে আমায় চড়িয়ে নে যান রবি,
ইন্দ্র পাঠান পারিজাতের মালা,
সাগরবালা মুক্তাভরা ডালা,
বনদেবতা ফল ও ফুলের রাশি,
পূর্ণিমা দেন জ্যোৎস্নারি হাসি,
পদ্ম তাহার স্নিগ্ধ পরিমল,
চন্দন তার গন্ধ সুবিমল।

পরীরাণী মুখ চুমে যায়—
শুকায়নাক দাগ।
কে নিবি রে আমার সুখের ভাগ?

মোর কুটীরে আমার প্রিয়ার পাশে
কালিদাসের শকুন্তলা আসে।
সাবিত্রী যান পায়ের ধূলো দিয়ে,
ভক্তিভরা প্রণাম তাহার নিয়ে।

লক্ষ্মী তাহার 'এলুন' দেওয়া দেখে
পাজের উপর পাজটী রাখেন এঁকে।
এমনি তাহার হস্তেরি রন্ধন,
অতিথ বেশে চাখেন নারায়ণ;
ভুবন ভরে পদ্মরাগে
প্রিয়ার অনুরাগ।
কে নিবি রে আমার সুখের ভাগ?

লবকুশ আমায় শুনায় রামায়ণ
বাল্মীকি তার কাছেই বসে রন।
হরিণশিশু বসন ধরে টানে,
শুক আমারে আপন বলে জানে।
সিংহ মায়ের, আসে আমার ঠাঁই,
কাঁধে আমার কেশর বুলায় ভাই।
যমকে আমি 'গুল্‌তি' ছুড়ে মারি,
ভয়টা কিসের, কি ধার তাহার ধারি?
তোরা না হয় আমায় সবে
পাগল বলে ডাক্—
কে নিবি রে আমার সুখের ভাগ?

শিবের বিয়ের সভায় আমি পশি,
পীতাম্বরের চরণ ঘেঁসেই বসি।
পিতামহের হংস ধরে চড়ি,
মা কমলার পেচক ব্যাকুল করি।
লই কেড়ে লই অনঙ্গেরি শর,
নাইক রে কায, নাইক অবসর।
কানাই সাথে গোচারণে যাই
বাঁকা আঁখির সুধার ধারা পাই
উল্লাসেতে হোলির রাতে
কুঞ্জে ছড়াই ফাগ্।
কে নিবি রে আমার সুখের ভাগ?

অর্থ এবং অশন বসন বই,
বলতে গেলে অভাব তেমন কই?
আসছে ঘরে মুক্ত মাঠের হাওয়া,
দিবস নিশি চলছে গীতি গাওয়া;
দুঃখ সে ত প্রাণটা গোটা চায়
তারেই নিয়ে থাকবো কত হায়?
জানাচ্ছি সব ভগবানের কাছে
মাথার উপর মুরুব্বি ত আছে!
ফাগুন রাতে আমার সাথে
একটি নিশি জাগ্—
কে নিবিরে আমার সুখের ভাগ?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাহিত্য-সমাচার

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অজকুমার" উপন্যাস, আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়—কবিশেখর প্রণীত নূতন কবিতাগ্রন্থ "খুঁদকুঁড়া" প্রকাশিত হইল, মূল্য ॥০

প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক থিওফিল গোতিয়ে প্রণীত "মিলিতোনা" উপন্যাস শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷০

চন্দননগর "প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস" হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "স্বরাজের পথে" প্রকাশিত হইল, মূল্য লেখা নাই।

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কালন্দর (মুসলমান পরিব্রাজক)

চিত্রকর—৺হরিচরণ মজুমদার।

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩০

১ম খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

নারীর স্বাধীনতা ও পবিত্রতা

স্ত্রী পুরুষের একই শিক্ষা ও একই কার্য্যক্ষেত্র সকল সমাজেরই নিম্নস্তরে আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুরুষের পাশাপাশি মেয়ে কুলি, মেয়ে মজুর, মেয়ে দোকানী, মেয়ে ধাঙড়ানী, মেয়ে মেথরাণী, চাকরাণী, মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলা শকটবাহিকা পর্য্যন্ত—এসব কিছুতেই মেয়ে কর্ম্মীর অভাব নাই। একই পাতালকল্প খনির মধ্যে, একই চাবাগানের ভিতরে, একই অগ্নিগর্ভ কলের এঞ্জিনের পার্শ্বে অ.সংখ্য কুলি রমণী পুরুষের সমকক্ষবৎ সহায়তা করিতেছে। ইহাই আদিম ব্যবস্থা।

মেয়ে পুরুষের শিক্ষা ও কার্য্যক্ষেত্রের বিভাগ হইয়াছিল শুধু সমাজের উচ্চ স্তরে শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, উচ্চ শিক্ষা ও চিন্তারই ফলে। উহাই সঙ্গত ও স্বাভা-বিক বলিয়াই হইয়াছিল—এ কথা বলিতে গেলে হয়ত চারিদিক হইতে সপ্তরথী সশস্ত্রে সাজিয়া আসিবেন। কেন না তাঁরা বলেন, পুরুষ মেয়েদের পদদলিত রাখিবার মতল-বেই নাকি এই ফন্দি আঁটিয়াছিল; আর কোনও সদুদ্দেশ্য এই ভেদনীতির মধ্যে দেখিতেও নাকি পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি এই কথা বলি যে, সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যেখানে স্ত্রী পুরুষের স্বাতন্ত্র্য বাহ্যতঃ কমই দেখা যাইতেছে, সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করুন, স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার লাভ যদি সামাজিক উন্নতির পরিচায়ক হয়, তবে ঐসকল সমাজ ভদ্র সমাজ হইতে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করে নাই কেন? ঐ সকল সমাজে স্ত্রী পুরুষের সমান উচ্ছৃঙ্খলতা, সমান স্বেচ্ছাচারিতা মাত্র আমরা দেখিতে পাই কেন? ইহার নাম কি উন্নতি? নারী পুরুষ-ভাবাপন্না হইলে পুরুষের দোষ গুণেরও সমান অধিকারী হইবে নাকি? সকল সমাজেই পুরুষ-প্রকৃতি হইতে নারী-প্রকৃতি অনেকখানি সংযত। ইহার জন্য শিক্ষা সাহচর্য্য এবং প্রাকৃতিক বিধান এই তিনটিই কার্য্য করিয়া থাকে। এই ভাবের শিক্ষা, সংযম না থাকাতেই ভদ্র নারী হইতে নিম্নশ্রেণীর নারীরা পৃথক হইয়া রহিয়াছে। নতুবা স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার কিছু এই বিংশ শতাব্দীর নূতন সৃষ্টি নহে। ইহা সকল জাতির মধ্যে স্বাভা-

বিক নিয়মেই বর্ত্তমান আছে। বর্ম্মি প্রভৃতি কোন কোন জাতির মধ্যে পুরুষের অপেক্ষা নারীর স্বাধীনতা অধিকতরই রহিয়াছে; আবার অতবড় স্বেচ্ছাচারিতাও নাকি পৃথিবীর কোন নারী সমাজেই নাই। তাই মনে হয় মেয়ে পুরুষের সমান অধিকারের জন্ম চেষ্টাটাই স্ত্রীজাতির প্রধানতম চেষ্টা হওয়ার কোন আবশ্যকতা ছিল না। যে শিক্ষায় ইউরোপীয় মহিলার স্থায় ভারত রমণীও পুরুষের সহিত চাকরী লইয়া ব্যারিষ্টারী ওকালতী লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া, কেরাণীকুলের অন্নের অংশ বাঁটিয়া লইয়া এই চাকরী সমস্যার দিনে সমস্যা বাড়াইতে উদ্যত হইয়াছেন, আমাদের মত "সেকেলে" লোকেদের মনে হয় সে শিক্ষার একটু বদল হওয়া দরকার। যে যুগে ছেলেরাই এম-এ পাস করিয়া চাকরী পায় না, অনেকে মনে করেন এবং বলিয়াও থাকেন যে তাদেরও এম-এ অবধি না পড়িয়া, কতকটা বিদ্যা সঞ্চয় করিয়া লইয়া ব্যবসায়ের দিকে মনোনিবেশ করাই ভাল। অথচ এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষায় তাহারা নিজেদের আয়ু ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে তাহার পুঁজি লইয়া ব্যবসায় করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যে ক্ষেত্রে ছেলেদেরই শিক্ষায় এত বড় গলদ, সেখানে সেই শিক্ষা লাভ করিয়া ও সেই ভাবের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ পথ পাইয়া মেয়েরা কি লাভবান হইবে বুঝিতে পারাই কঠিন। লাভের মধ্যে পারিবারিক জীবনের সুসম্বদ্ধ প্রণালীটুকুই নষ্ট হইবে, আর নষ্ট হইবে মেয়েদের শারীরিক বাকিটুকু স্বাস্থ্য। বিদ্যালাভ যদি জ্ঞানলাভের সোপান হয়, তবে এই নারীর পক্ষে অনুপযোগী [যাহাকে ছেলেদের জন্ম অনুপযুক্ত বলিয়া স্যর প্রফুল্ল রায় প্রভৃতির স্থায় বহুদর্শী ও বিজ্ঞজনেরও কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন] শিক্ষার পরিবর্ত্তে যে শিক্ষায় নারী নারী থাকিয়াই, জ্ঞান লাভ করিতে পারেন; সুকন্যা, সুগৃহিণী সুমাতা ও দেশের নিঃস্বার্থ সেবিকা হইতে পারেন, সেই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে সচেষ্ট হওয়াই উচিত নহে কি? যাহা আছে তাহাকে ভাঙ্গা কঠিন, আবার সেই বেমেরা-মতি ভিত্তির উপর নূতন প্রাচীর গাঁথা কেন? আবার পুরাতনকে ভাঙ্গিলেই কার্য্য সমাধা হয় না; নূতন গড়ার দায়ীত্ব অনেক বেশী।

অনেকে বলিবেন, "তুমি পুরুষের হইয়া ওকালতি করিতেছ কেন?" আমি বলি, তাই যদি হয় তবে তার জন্ম পুরুষমণ্ডলী হইতে আমি কোনও ফি পাই নাই। কর্ত্তব্যের খাতিরে নিজের স্বার্থকেও ভুলিতে হইয়াছে এবং অপ্রিয় সত্যকেও স্বীকার করিতে হইতেছে। "তোমার লাভ? আধুনিক সভ্যতার হস্তে গঠিত জীব কি আর নিঃস্বার্থভাবে কোনও কার্য্য করিয়া থাকে?" লাভ যথেষ্টই আছে।

আমার এ সম্বন্ধে মতামত অনেকেই মৌখিক ও পত্র সাহায্যে জানিতে চাহিয়াছেন। অনেকেরই নিকট অনুরুদ্ধ হইয়া, নিজের যা ধারণা সেই মতই জানাইতে হইতেছে, ইহার মধ্যে স্বার্থান্বেষণ ত আর করা চলে না। স্বাধীনতা অবস্থাটায় অনেক সুবিধা আছে বৈ কি। প্রাণ যে সেটাকে চাহেনা তাও নয়, কিন্তু এই ভারতবর্ষের শিক্ষা ত্যাগের শিক্ষা, ভোগের নয়। Individualism বা ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার স্থান এই নিবৃত্তির পথে নাই। এখন Independence of spirit বলিয়া যেটাকে জাহির করা হয়, সেই স্বার্থপরতাপূর্ণ ঔদ্ধত্যকে সমাজের পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর বলিয়াই মনে করি। সে জিনিষটা তেজস্বীতা নহে, অবিনয় ও অহঙ্কার। আমার বিশ্বাস, ইহার ফল সমাজের পক্ষে কখনই শুভ হইতে পারে না। কূর্ম্মনীতি বা কমঠব্রত—সকল বিষয়েই তেজের পরি-বর্দ্ধক ও রক্ষক। ইহারই পালন নর বা নারী কাহারও পক্ষে হীনতার পরিচায়ক নহে। তার উপর পুরুষকে আমি যে নির্ম্মল পবিত্র দেবতার মূর্ত্তিতে দেখি-য়াছি তাও শুধু একবার নহে, বহুবার। কেমন করিয়া সেই দেবতার জাতির নিন্দায় যোগদান করিব? নারীর সাধ্য কি যে সে সকল আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে? তবু আমি নারীগৌরবে প্রায় সীতা-সাবিত্রীসমা ত্যাগ-সংযম-পুণ্যময়ী নারীকেও এ জীবনে বারে বারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আজও করিতেছি। কিন্তু তথাপি সেই দৃঢ় পবিত্রতার অত্যুচ্চ হিমগিরি, জ্ঞান-

বিদ্যার বারিধি, স্তায় সত্যের সুমেরু পর্ব্বত, দয়া দাক্ষিণ্যের রত্নাকর, সে মূর্ত্তি যে অনেক উর্দ্ধে। সে শক্তি নারীতে কি সম্ভবে? আমি অবশ্য নারীকে ছোট বলি না; বলিতে পারিও না—কিন্তু এ জীবনে পুরুষকে বারে বারে যে মূর্ত্তিতে দেখিলাম, নারী মহিমা সেখানে খর্ব্ব ইহা স্থির।

আজকাল আবার অনেক মেয়ের লেখায় পুরুষ-জাতির সমালোচনায় এমনই ভীষণ ঝাঁজ ফুটিয়া বাহির হইতে দেখি, জাতি তুলিয়া এমনি কঠোর অসংযতভাবের গালি বর্ষণ করিতে দেখি, যে তাহাতে ঐ সকল অদূরদর্শিনী অপ্রকৃতিস্থা মেয়েদের জন্য লজ্জাই বোধ হয়। পুরুষ মাত্রকেই তাঁরা নারী নির্য্যাতক ইত্যাদি নিতান্ত কটু ও রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করেন, নারীর প্রতি পুরুষের একমাত্র কুভাব ব্যতীত পুরুষের নিকট তাহাদের অপর কোন মূল্য নাই এমন ভয়ানক কথা পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন। নারীর অবস্থাকে যখন তাঁহারা এতই কদর্য্য ভাবে কল্পনা করিয়া লইয়া পুরুষজাতিকে কলঙ্ক মসিলাঞ্ছিত একটা ভয়াবহ বিকৃত মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিতে চাহেন; তখন তাঁহাদেরই কথায় বলিতে ইচ্ছা করে—"আমার দেখিয়া শুনিয়া ভয় হয়, মনে হয়, হয়ত বা এই অধম হতভাগারা ভগবানের সৃষ্টি নয়, এদের মেয়েরাই গড়িয়াছে।" নহিলে তাদের "দুষ্প্রবৃত্তি, পৈশাচিক লিপ্সা, নিষ্ঠুর পীড়নকারী" নরকের কীট মাত্ররূপে মানুষের অযোগ্য রূপে দেখাইতে পারিলেন কি রূপে? নারী পুরুষের মধ্যে কদর্য্য দৈহিক সম্বন্ধ ব্যতীত অপর কোন পবিত্র বন্ধনই নাই,নারী পুরুষের মাত্র শয্যাসখী—তাও নয়, সেবাদাসী, দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থতার উপকরণস্বরূপা—এসকল ঘৃণাজনক কথা পাঠ করিতে করিতে লজ্জা ঘৃণায় বাস্তবিকই মর্ম্মে মরিয়া যাইতে হয়। সাধ করিয়া এ কি কাজল মুখে মাখা! নিজেদের এত বড় অবমাননা কেমন করিয়া কল্পনা করা যায়? আর, তা কাদের হাতে? না, যে পুরুষের মধ্যে পরম পুরুষ স্বরূপ নিজ পিতৃদেব বর্ত্তমান, সেই পুরুষজাতিকে এত বড় কলঙ্ক লাঞ্ছিত করা কি নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচায়ক নয়?

যাঁহাদের এই সকল কথা বলিতে মুখে আটক হয় না, তাঁহাদের উক্তিকে কেহ যদি পাগলামী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাতে দোষ দেওয়া চলে না। পুরুষকে জাতি ধরিয়া কোন্ শ্রেণীর নারীগণ গালাগালি পাড়িতে অধিকারিণী? না, যাদের কাছে পুরুষের হীন প্রবৃত্তির দিকটাই মাত্র, "পৈশাচিক দুষ্প্রবৃত্তিটাই" শুধু পরিচিত—যাহারা পুরুষের দুহিতা নয়, ভগিনী নয়, পত্নী নয়, মাতাও নহে, মাত্র বিলাসপুত্তলিকা। পুরুষকে জাতি ধরিয়া অবমাননা করিলে যে নিজের পূজ্যতম পিতামহ দেব, স্বর্গ ধর্ম্ম ও পরমতপস্যা স্বরূপ—বরং স্বর্গাৎ উচ্চতরঃ যে দেবতারও অধিক দেবতা পিতৃদেব, নিজের হাতে গড়া সোণার পুতলী স্নেহের আধার ভাই-গুলি, যাঁর প্রেমে এ পৃথিবী স্বর্গরাজ্য সেই প্রেমময়, স্নেহময় প্রাণাধিক স্বামী ও নিজের হৃদয়শোণিত তুল্য শিশুসন্তান, ইহাদেরও নিদারুণ অপমান করা হয়, এত বড় সহজ কথাটাও হয়ত উঁহারা ভাবের উচ্ছ্বাসে ভাবিয়া দেখেন না, না কি? যে কিশোর সন্ন্যাসী নিজ জননীকে পর্য্যন্ত তীব্র বৈরাগ্য প্রযুক্ত পরি-ত্যাগ করিয়া কৌপীনবন্ত হইলেন, যিনি পত্নীপ্রেম কাহাকে বলে তাহার কোন খবরই লয়েন নাই, স্নেহ পুত্তলি তনয়া যাঁহার গৃহে জন্মও লয় নাই, সেই চির সন্ন্যাসী নারীকে "নরকস্য দ্বারঃ" বলিয়াছেন বলিয়া যদি আমরা অভিমান করিতে বসি, তবে মেয়ে হইয়া, স্ত্রী হইয়া, মা হইয়া কোন মুখে পিতা পতি পুত্রের জাতিকে অমন সাংঘাতিক আঘাত করিতে যাই? সংসারে ভাল মন্দ স্ত্রী পুরুষ উভয়ই আছে। মাতৃরূপিণী দেবীও আছেন, পিতৃরূপী মহেশ্বরও আছেন। আবার নরকের দ্বারস্বরূপা বিলাসিনী পতিতারও অভাব নাই; সেই নরকের দ্বার দিয়া নরক পথের যাত্রীস্বরূপ অধঃপতিত পুরুষেরও কোন অভাব নাই। মোট কথা ভদ্রসমাজের স্ত্রী পুরুষ লইয়া এসকল হীন আন্দোলন চলাই শোভন নহে।

কোনও ভদ্রসংসারের কন্যা বধূ বা জননীকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য বা তুলসীদাস

ঐ সকল শ্লোকের বা পদের রচনা করেন নাই, এবং করিলেও গৃহস্থাশ্রমবাসী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উপদেশের বিষয়ীভূত নহেন। ত্যক্তং সুখং কিং রমণী প্রসঙ্গং, কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি নারী—এসব কথা বলিয়া সাধারণ গৃহস্থকে বাতুলে ভিন্ন কেহ উপদেশ দেয় না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ভ্রষ্টাচারী বৌদ্ধমত নিরশন পূর্ব্বক সনাতনধর্ম্মী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁর উপদেশাবলী সেই যতি, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী-দের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছিল। বিষয়ে বিরক্ত মুক্ত পুরুষ যাঁহারা সন্ন্যাসের যথার্থ অধিকারী, তাঁদের জন্যই মণিরত্নমালা গ্রথিত হইয়াছিল; এ অমূল্য রত্নহারে তাঁদেরই কণ্ঠ শোভিত হইত, বেনা বনে মুক্তা ছড়াইবার জন্য ইহার সৃষ্টি হয় নাই। তাহাকে গায়ে পড়িয়া গৃহস্থ সংসারের উপরে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া অনর্থক অভিমান করিতে গেলে চলিবে কেন? ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি, সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ, যস্য নাস্তি গৃহে ভার্য্যা ইত্যাদি শ্লোক সংসারীর জন্য রচিত। আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও আচার যে অধিকারী ভেদ ধরিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছিল, এখন সে কথা অধিকাংশ নরনারীই ভুলিয়া যান, হয়ত অনেকে সে সকল তত্ত্ব জানেনও না, জানিতে ইচ্ছাও নাই। অথচ একটা কিছু দেখিলেই হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত করিবেন। তার পর আর এক কথা—যেমন সংসার—বিরক্ত নরের পক্ষে, মোক্ষ-মার্গীর পক্ষে নারী নরকের দ্বার স্বরূপ, সংসারাতীতা বালবিধবা ব্রহ্মচারিণীর নিকটেও কি পুরুষ, এবং সতী নারীর নিকটে কোন কুচরিত্র পরপুরুষ নরকের দ্বার স্বরূপ নহে? তাহাদের সহিত ইংরাজ সমাজের অনুকরণে কি ফ্লার্টেশন করা চলে? সাধ্যমত ইহাদের সঙ্গও কি তাঁদের বিষবৎ পরিবর্জ্জন করিয়া চলিতে হয় না? তবে যে নারীর তরফ হইতে এই সকল মন্দচরিত্র-পুরুষ বিদ্বেষী কোন শ্লোকের ললিত ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহা নারীরই অক্ষমতার পরিচায়ক। আধুনিক মেয়েরা যদি বেসুরা কলহ না তুলিয়া শ্লোকছন্দে ইহার উত্তর প্রদান করিতেন, তাহা হইলে জাতীয় ভাষার একটা অভাব দূর হইয়া তাহার কিছু সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারিত। শাস্ত্রে উত্তমা মধ্যমা ও অধমা নারীর মধ্যে এই তিনভাগ করিয়া কোথাও স্তুতি কোথাও মিনতি এবং কোথাও গালি পাড়া হইয়াছে। গালিটুকুই বা গায়ে লইব কেন?

আজকাল আরও একটা ফ্যাসন বাহির হইয়াছে, তাহা পুরুষের হাতে মেয়েরা যে বড়ই নির্য্যাতিতা এই ভাবের কাঁদুনি গাহিয়া বেড়ানো। সমাজের নিম্ন স্তরে নারী পুরুষের যেখানে সমান অধিকার, পুরুষ যেখানে বেশী উদ্দাম, নারী যেখানে অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল সেই খানেই পুরুষের নারীর উপর পীড়ন এবং নারীরও ইহার হীন প্রতিশোধ গ্রহণের সংবাদ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। কিছু কিছু চোখেও দেখিয়াছি। ভদ্র সমাজেরও যে অংশ অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, সেখানেও উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র পুরুষের দ্বারায় নারীর অপালন ও নির্য্যাতন কিছু কিছু আছে বৈকি। যাদের নিজ চরিত্রই অপূর্ণ তারা অন্যের প্রতি আর কি করিতে পারে? যারা আত্ম-নির্য্যাতনে রত তারা নারীরও নির্য্যাতক। তাদের সম্বন্ধে লম্বা চৌড়া প্রবন্ধই লেখ, সভাসমিতিই বসাও, সহজে কিছু হইবার নয়। অথচ সেইখানেই সমস্ত মানব সমাজের কর্ত্তব্য নিহিত রহিয়াছে—অমানুষদের মনুষ্যত্ব প্রদান করা। ইহা নারী নির্য্যাতন বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত। এ ধরিয়া সমস্ত নারী জাতিকে উৎপীড়িত আখ্যা দেওয়া যায় না। অবশ্য এ সকল নরাধমেরও সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা সামাজিক অবনতির চিহ্ন; ধর্ম্ম হীনতার লক্ষণ; তাহা সমাজ শাসনের ফল নহে, শাস্ত্রানু-শাসনের অভাব। কিন্তু তাই বলিয়া সেটাই সাধারণ নয়। স্বামী নড়িতে চড়িতে উঠিতে বসিতে চটাপট জুতা মারিয়া যাইতেছে, আর স্ত্রী পড়িয়া পড়িয়া মার খাইতেছে, দুই ঠোঁট এক করে না, নভেল বর্ণিত এই অবস্থা মাতাল স্বামীর হাতে পড়িলে সকল সমাজের সব মেয়েদেরই হইতে পারে বটে; কিন্তু সেটা বোধ হয় এদেশী সমাজেই সর্ব্বাপেক্ষা কম। মিস কলিন্স নাম্নী

একটী ইংরাজের মেয়ে আমার মাকে বাজনা শিখাইতেন; তিনি গল্প করেন, "আমাদের সমাজের মেয়েদের আদর বাহির হইতে দেখিতে খুব ভাল; কিন্তু অধিকাংশেরই স্বামী মদ খাইয়া মাতাল হয়, তখন স্ত্রীদের তারা বড়ই নির্য্যাতন করে।"

আসল কথা এই যে, বাড়াবাড়ির কিছুই ভাল না। পুরুষ একদিন উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল বলিয়াই যে মেয়েদেরও আজ তার প্রতিশোধ লইতে হইবে,তার ত কোন দরকার দেখি না; এবং কোন জাতি তুলিয়াই নিন্দা করা কাহারও পক্ষে সঙ্গত নহে। আমাদের দেশের ভদ্রসমাজের মেয়েদের অবস্থা যতটাই হীন বলিয়াই রব উঠিয়াছে, ততটাই যে হীন ছিল বা আছে আমার ত তাহা মনে হয় না। অন্ততঃ আমরা নিজেদের পরিবারে এই তিন পুরুষের মধ্যে এবং নিজের শ্বশুর গৃহে, বোনেদের ভাইদের দেবরদের ননন্দাদের, সমবয়সী সখীদের শ্বশুর ঘরে এবং বঙ্গ বিহারের বহু স্থলের বহুতর ভদ্র পরিবারবর্গের মধ্যে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সংসারে মেলামেশা করিয়া কখনও ত কৈ বিশেষ ভাবে নারী নির্য্যাতন দেখিতে পাইলাম না। বউ কুৎসিতা বলিয়া অনেক মাকে বউ বিদ্বেষ করিতে দেখিয়াছি, কুটুম্বের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি, নির্ধন স্বামীর প্রতি অনাদর করিতে দেখিয়াছি—এমন কি একবার একস্থানে শুনিয়াছিলাম তত্ত্বের জন্ম শাশুড়ী বউকে ছেঁকাপোড়া দিয়াছিলেন। একস্থানে শুনিলাম বউ ছেলের পছন্দ নয় বলিয়া মা ছেলের আবার বিবাহ দিবেন। নারীই এসব ক্ষেত্রে নির্য্যাতনকারিণী। একজন একগুঁয়ে মেয়ের স্বামী, স্ত্রীকে অভদ্রের মত বারকয়েক মারধর করিয়াছিল; এখন দুজনেই কিন্তু বেশ শান্ত হইয়া ঘরকন্না করিতেছে। মাতালের হাতেও স্ত্রীর নির্য্যাতন দুই এক স্থলে শুনা আছে। কম বেশী হইতে পারে, সংসারে এই রকমটাই ঘটে, নিছক ভাল কোন জাতি বা কোন সমাজই হইতে পারে না। কতক লোক ভাল, কতক মাঝারি, কতক বা মন্দ হয়। আমরা এপর্য্যন্ত যত ভদ্র ঘর দেখিয়াছি, শিক্ষিত পরিবারে স্ত্রীকেই সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে দেখিতে পাইয়াছি। [দুই একটি কৃপণের সংসারে পুরুষ কর্ত্তা দেখিয়াছিলাম, স্ত্রী পুত্র কন্যার কষ্ট কম নয়। কিন্তু সেখানে পুরুষ নিজেই কি কিছু ভোগে আছে যে তার কার্য্যকে নারীনির্য্যাতন নাম দিব? যে আত্ম নির্য্যাতনই করিতেছে, সে অপরের জন্ম কি করিতে পারে?] তিনি দিলে তবে একটা পয়সা বাড়ীর কর্ত্তার হাতে পড়ে। মাসকাবারে মাহিনা আসিয়া তাঁহারই হাতে জমা হয়। ছেলেমেয়ের বিবাহ ও তাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা, বাড়ী মেরামতের পরামর্শ সকলই তাঁহার সহিত। যদি কিছু সঞ্চয় হয় তাহা তিনিই জোর করিয়া করেন। দান ধ্যান, ব্রত, গহনা গড়ান, কুটুম্বিতা পালন এ সকলেও শিক্ষা ও রুচি অনুযায়ী গৃহিণীরই পূরা অধিকার। এর চেয়ে স্বরাজ যে তাঁরা আর কোথায় পাইতে পারেন আমি ত দেখি না।

আমাদের পারিবারিক সুখের মধ্যে আমি ত কোনও অপূর্ণতা দেখিতে পাই নাই। একটা কাল্পনিক অভাব তৈরি করিয়া তার পিছনে হায় হায় করিয়া বেড়াইবার দরকার যে কি তা ঠিক বুঝা যায় না। উহা নিছক বিলাতী নেশা বলিয়াই বোধ হয়। বলিবে, তোমার অদৃষ্ট হয়ত ভাল, তুমি তাই দেখিতে পাও নাই; সংসারে নারী নির্য্যাতক যথেষ্ট আছে এবং তাহা কেনই বা থাকিবে?" আমি বলিব, নারীর হস্তে নারীর এবং কদাচিৎ পুরুষেরও যে নির্য্যাতনগুলি ঘটে, সেগুলিও তাহা হইলে বন্ধ কর। সকল মানুষ নর এবং নারীকে দেবতা তৈরি কর, তবেই এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে। নতুবা মাতাল স্বামী স্ত্রীকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়িবে না; কুচরিত্রা স্ত্রী সুযোগ পাইলে স্বামীর বুকে ছুরি বসাইয়া দিবে—এমন কি মা হইয়াও রাক্ষসীর কার্য্যে দ্বিধা করিবে না। এ সকল রোগের প্রতীকার কি?

এ অত্যাচারের প্রতিবিধান কি কোথাও আছে, না নাই? থাকিলে তাহা, হিংস্র পশু বা আদিম মনুষ্যের মত অথবা অশিক্ষিত জনসাধারণবৎ পরস্পরকে ফিরিয়া আক্রমণ কি না? পুরুষের অত্যাচারে অত্যাচারিতা নারীর পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাতন্ত্রতা

অবলম্বন করা সঙ্গত কি না? [স্বতন্ত্রতাকে আমি স্বেচ্ছাতন্ত্রতা বলিতেছি না। পড়িয়া মার খাইবার অথবা দুশ্চরিত্র স্বামীর পাপপথের কোনরূপ সহায়তা করার পক্ষপাতী আমি নই। আবার পুরুষের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলি। কোনও জাতীয় অপরাধীর সহিত আমার সহানুভূতি নাই। মনুষ্য মনুষ্যত্ব লাভ করে ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত এবং এ শিক্ষা দিতে হইলে, 'পুরুষ পাপী হইলে দোষ নাই, অথচ মেয়েরা পথভ্রষ্ট হইলেই সোরগোল পড়িয়া যায়' ইত্যাদি নির্লজ্জ কলহের সৃষ্টি না করাই ভাল। মানুষ উচ্চাদর্শের উপদেশ অপেক্ষা ছোট কথাটাই কাণ দিয়া শোনে। যে শিক্ষায় মেয়ে পুরুষ কাহারও পাপের প্রতি লোভ না জন্মিতে পারে, সেই মহৎ শিক্ষার জন্যই সকলে মেয়ে পুরুষে সচেষ্ট হউন এই আমার একান্ত অনুরোধ।] আমাদের মনে হয় নিজের নাসিকাচ্ছেদ করিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ না করাই সুবুদ্ধির কার্য্য। নারী পুরুষ উভয়েই এই ধর্ম্মহীন শিক্ষার বিষফল পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করুন। মেয়েদের শিক্ষা এমন ভাবে দেওয়া হউক যাহাতে মেয়েরা সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে পারেন।

কেহ বলিবেন [বলিতেছেনও] ঐ দুইটিই কি নারী জীবনের চরমোৎকর্ষ? উহার বাহিরে আর কি মেয়েদের জন্য অন্য কোন উচ্চ আদর্শ নাই? বিশ্বমানবতার মধ্যে মিলিয়া গিয়া লোকোত্তর কার্য্য সাধনাদি দ্বারা নারী জগতে জয়যুক্তা কেন না হইতে পারিবেন? আমি বলি, ও সব ভুয়া কথার মালা গাঁথিলে ত চলিবে না বাপু, সোজা কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। মানুষ যখন নিজের সমুদয় ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যকে সম্পূর্ণ ভাবে সমাধা করিয়া তুলিতে পারে, তখনই সে কোন বৃহৎ কর্ত্তব্যের ভার লইবার প্রকৃত অধিকারী হয়। বিশ্বপ্রেম ও বিশ্ব-মানবতা শুধু মুখের কথাটি নহে, এবং ছেলের হাতের মোয়াও নয় যে টুপ করিয়া গালে ফেলিয়া দিলেই হইল। ভগবানের সৃষ্টিতে নারী মাতা হইবার জন্যই সৃষ্টা; কিন্তু সুমাতা হইতে হইলে তাঁহাকে সাধ্বী স্ত্রী এবং সুগৃহিণী হইতেই হইবে। আধুনিক মতে যদিও নারীর নারীত্ব ও সতীত্ব এ দুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বটে, তথাপি সে বিচারের রায়ে যে, ভদ্রবংশীয়া মহিলা মাত্রেই বাতুলের প্রলাপবোধে অথবা অশ্রাব্য খেয়াল বোধে কাণে আঙ্গুল দিবেন এ বিশ্বাস আমার এখনও দৃঢ়রূপেই আছে। সতীর গর্ভজাত না হইলে কখনও কি দিব্য তেজ-সম্পন্ন সুসন্তান জন্মিতে পারে? অন্ততঃ হিন্দুর পক্ষে এ ভিন্ন আর কোন কথা যে মনে করিতেই নাই। নিজের সন্তান যদি আপনাকে সতীপুত্র বলিয়া মনে করিতে না পারিল, তবে তার জীবনেই ধিক্। আমরা শুনিয়াছি, একটী কলেজের ছেলে তার মায়ের সম্বন্ধে সমবয়সীদের মুখে কোনও লজ্জাজনক বিদ্রূপ শুনিয়া আত্মঘাতী হইয়াছিল। শুনিয়াছি একজন যুবা তার মায়ের সম্বন্ধে কোনও ভীষণ কথা জানিতে পারিয়া ঘোর নির্ব্বেদ ভরে বাপকে বলিয়াছিল—কেন এই মায়ের গর্ভে আমার জন্ম হইল? কেন তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রথমেই পরিত্যাগ কর নাই? [অবশ্য আধুনিক মতে এই ছেলেদুইটীর মধ্যে উচ্চ শিক্ষার অভাব ছিল বলিয়াই সাব্যস্ত হইবে। বলিয়া রাখি, দ্বিতীয়টি একজন এম-এ, বি এল, তথন বি-এ পাস করিয়াছে। তবে হয় ত তারা অ্যানা ক্যারানিনা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সহিত পরিচিত ছিলনা। আট বছরের ছেলের মা স্বামীর লম্বকর্ণ ও রাজনৈতিকতায় অপরাধে অন্যার বাগ্‌দত্ত পতিকে ফাঁদে ফেলিয়া তাহার সহিত গৃহত্যাগিনী হইলেও, লেখক পাঠকের চক্ষে অত্যন্ত সহানুভূতির পাত্রী হইতে পারেন এ কথাটা হয়ত তাদের জানা ছিল না। আবার সেই পরিত্যক্ত শিশুকে তার পিশাচিনী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করা হয় নাই বলিয়া তার পিতাকে হীনবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে, সে উদার শিক্ষাটা উক্ত অভাগাদ্বয় হয়ত তখনও পায় নাই।]

যাঁরা বলেন, নারীর সতীত্ব না থাকিলেও তাঁর মাতৃত্বের পূর্ণ অধিকার আছে, তাঁরা এখানে কি বলিবেন? তবে এ সব ব্যতিক্রম কদাচিৎ পিতৃ গৃহেও ঘটে।

স্বভাবতঃ নীচমাতার গর্ভে নীচাশয়েরই জন্ম হইয়া থাকে, এবং এ সকল সমস্যা সেখানে আর উঠিতেই পায় না।

আজকাল আবার পতিতা উদ্ধারেরও খুব ধুম লাগিয়া গিয়াছে। নবীন নভেল-লেখকগণ বিচারে রায় দিয়াছেন যে, পতিতা কন্যাদের আনিয়া ভদ্রঘরের বধূ করা আবশ্যক। ড্রেণের মধ্য হইতে ময়লা তুলিয়া গৃহস্থের অঙ্গনে জমা করিবার মত আর কি! ভদ্রলোকের ছেলেরা পূর্ব্বে বাগান বাড়ীতে পতিতা সঙ্গ করিত শুনা যায়। এখনও সে প্রথা ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও কোথাও আছে। তাহা দুষণীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু পতিতার কন্যাকে ঘরের বধূ করিয়া আনিয়া তার গর্ভস্থ সন্তান দ্বারা পিতৃপুরুষের জল পিণ্ড দান করার কাছে ইহারও বীভৎসতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। [অবশ্য পিতৃপুরুষের সৌভাগ্যক্রমে মরাগরুকে অনেকেই এখন আর ঘাস খাওয়ান না।] মোটের উপর পতিতাদের ভোগের বস্তু করিতেই হইবে—হয় বিলাসের সখী, না হয় ঘরের ঘরণী! তৃতীয় পন্থা নাই। আমরা বলি তাহলে প্রথমোক্তটাই ভাল। ভদ্র ঘরে আর জাতি নীতি কুলগোত্র বিবর্জ্জিতা, পাপবিষে জর্জ্জরিতা (Infected) বেশ্যাকন্যাকে ঢুকাইবার প্রয়োজন নাই। সে ঘর তো শুধু তোমার একলার নহে; তোমার উর্দ্ধের ও অধস্তন সমুদয় বংশপতি এবং বংশধরগণের। তাহাকে বিষদুষ্ট করিতে তোমার অধিকার কোথায়? আজকালকার নভেল লেখকগণের মতে পতিতা কন্যারা অতি সুশীলা ও সুশিক্ষিতা, তাহাদিগকে বিবাহ করিলে পুরুষের জীবন ধন্য হইবে, ভদ্রকন্যাগণ উহাদের কাছে দাঁড়াইতে পারে না।—আজকালকার নভেল অনুসারে সে ত বটেই! ঐ জাতীয়া নারীর কুহক পুরুষকে যে চিরদিনই নরকের দ্বারে উপনীত করিয়াছেই। এও তা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সে শুধু নিজেই যাইত, এখন পূর্ণগৌরবে সগোষ্ঠী মিলিয়া শোভাযাত্রা করুক। ঐ জাতীয়া কন্যার মধ্যে কোথায় যে পাপের বীজ সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কি জান? তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষে যে তাহার পুনঃপ্রাদুর্ভাব হইবে না তাহা হলফ করিয়া বলিতে পার? তবে উন্মাদ উপদংশ ও যক্ষ্মারোগীর কন্যা সহিত পুত্রের বিবাহ দিতেই বা ভয় পাও কেন? কুষ্ঠাশ্রমের প্রয়োজনীয়তাই বা কি? বিষদুষ্ট শরীরোৎপন্ন সন্তান সমাজ অঙ্গের বাহিরে কোনও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আশ্রম-পালিত ভাবে রক্ষিত হউক। তাদের জন্যও জগতে স্বতন্ত্র স্থান আছে এবং কার্য্য আছে। [এ সম্বন্ধে আমার মতামত "বঙ্গবাণী"তে প্রকাশিত "হারানো খাতা" উপন্যাসে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি।] কিন্তু দোহাই বঙ্গীয় নভেলিষ্ট মহাশয়গণের! আর যা করিতে চাহেন করুন; গৃহস্থ ঘরের পবিত্রতাটুকুকে আর ঘুচাইতে চাহিবেন না; এটা একেবারেই অসহ্য! আর যদি এই শ্রেণীর উপন্যাস না লিখিলে না বিকায়, তাহা হইলে একটা উপসংহার ভাগও সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া দিয়া সেই পতিতা-কন্যার পতির শেষ দশাটা—অর্থাৎ কন্যা পুত্র বধূ কুটুম্ব-পরিবৃত জীবনের ইতিবৃত্তটুকুও সত্যের খাতিরে আমাদের জানিতে দিলে বাধিত হইব। প্রথম তপ্ত যৌবনে হাব-ভাব লীলা-শালিনী রূপসী তরুণী (তা'সে যতই কেন দুষ্টকুল হইতেই আসুক না—তরুবালা নাটকের পারুলের মত) বেশ সাজন্তই হইবে, গৃহস্থ কন্যারা হারি মানিয়া যাইবে। কিন্তু উপন্যাসের নায়কের মত বাস্তব মানবের ত আর শুভ বা অশুভ বিবাহেই সব শেষ নয়, বরং ঐখানেই আরম্ভ। ভবিষ্যৎ বলিয়া একটা জিনিষ আছে,—উত্তর পুরুষ বলিয়া একটা আশার বস্তু আছে,—সেইখানেই যে সমস্ত গোল বাধে। তবে এ ব্যবস্থাটা তাঁদের ব্যবস্থিত সতীত্বহীনা জননী দর সন্তান-সন্ততিবর্গের জন্য যদি নিজস্ব (স্পেশাল) ভাবে সংরক্ষিত হয় ত সে বড় মন্দ হয় না, ভদ্রঘর গুলি রক্ষা পায়।

সমাজে যেখানে কন্যাদায় একটা বিষম সমস্যা, যে দেশে ছেলের চেয়ে মেয়ের জন্ম বেশি, মৃত্যু কম, সে দেশের ভদ্র-সমাজে ভদ্র-কন্যাগণের প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে বেশ্যা কন্যাদের দাঁড় করাইবার কোনও বিশেষ আবশ্যকতা আছে কি? না শুধুই বিলাতী উপন্যাসের নিছক অনুকরণ করিবার একান্ত প্রলোভনই তাঁহাদের এই দুষ্কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে? যখন পতিতা-প্রীতির তরঙ্গ

সাহিত্য-সংসারকে প্লাবিত করে নাই, তখনকার দিনে 'ভারতী' পত্রিকায় আমার 'দেবদাসী' নামক ছোট গল্পে, 'দেবদাসী' জাতীয়া নর্ত্তকীগণের পতিত জীবনের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে তাহাদের সম্বন্ধে অবিচার আছে। [ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের খেলা চলিতেছে। এখন আইন করিয়া 'দেবদাসী' প্রথা মন্দির হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম] বলিতে পার, তুমি কি নিষ্ঠুর! পতিতাদের উপর তোমার দয়া হয় না? আমি বলিব, তাহা হয় বই কি। কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশী দয়া হয়—যাহারা ভদ্র-সমাজের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, দেশের ও দশের গৌরবস্বরূপে হয়ত একদিন এই অন্ধকার সমাজ-গগনের উজ্জল জ্যোতিষ্ক-স্বরূপে সমুদিত হইলেও হইতে পারিত, তাহাদের সেই অভ্যুদয় পথকে দূষিত বাষ্প সমাচ্ছন্ন নিবিড় মেঘসমাবৃত করিবার চেষ্টা দেখিয়া। বঙ্গের সর্ব্বজনপূজ্য, ভবিষ্যদ্দর্শনে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিতুল্য, মহা মনীষী পূজ্যপাদ পিতামহদেব ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অতুলনীয় গ্রন্থ "সামাজিক প্রবন্ধের" কর্ত্তব্যনির্ণয় নেতৃ-প্রতীক্ষা প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু কোথায় হইবে কখন হইবে, তাহার কোন অনুমান করা যাইতে পারে না। অতএব সেই ঘটনা তাঁহার নিজের ঘরেই হইতে পারে, প্রতি ব্যক্তিকেই এরূপ মনে করিতে হয় এবং তাহা মনে করিয়া আপনার গৃহকে সর্ব্বতোভাবে সেই আবির্ভাবোন্মুখ দেবতার মন্দিরের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে হয়। দ্বেষ হিংসা লোভ মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুৎসিত ও নীচ-প্রবৃত্তি হইতে নিজ নিজ মনকে শূন্য করিয়া রাখিতে হয়। আপনাপন সন্তানাদি সম্বন্ধে সকলকে ইহাও ভাবিতে হয় যে, আমাদের এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটীই সেই মহাপুরুষ হইতে পারেন।"

সন্তান বাৎসল্য ও উচ্চাদর্শের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার কি মহান্ ও পবিত্র উদাহরণ! অ-সতী গর্ভজাত বা দূষিত মাতৃ-রক্তসম্পন্ন সন্তানের সম্বন্ধে এই এতবড় আশার স্বপ্ন দেখা চলে কি? এত বড় ভরসা কি মনে স্থান দিতে পারা যায়?—অথচ এই আশায় পরপদদলিত অবনত জাতির পক্ষে ভবিষ্যতের এই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফললাভ সম্বন্ধে মহাত্মা বলিতেছেন :—

"ইহা হইতেই ভারতবাসীর সম্মিলন সূত্রের আবিষ্কার হইতে পারে, ইহা হইতেই আমাদের জন্মভূমি যশের মাল্য ধারণ করিতে পারেন, ইহা হইতেই পৃথিবীতে ধর্ম্মধনের সম্বর্দ্ধন হইয়া মানুষ বিমুক্ত-পাপাচার এবং অভূতপূর্ব্ব পুণ্যধনে ধনী হইয়া উঠিতে পারে। কোন একটী মনুষ্য-শিশুর ভাবী অবস্থা এবং ক্ষমতা কি হইতে পারে বা কি হইতে পারে না তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিতে সমর্থ? মনোমধ্যে নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রত্যাশা এইরূপে স্থিরতর এবং ব্যাপক ভাবে সঞ্চিত রাখিয়া আপনারা পবিত্র হইয়া থাকিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টাবান হইলে এবং শিশু ও যুবাদিগের সুশিক্ষার প্রতি নির্দ্দিষ্টরূপে নিরন্তর যত্ন করিলে সকল লোকেরই মন উন্নত হইয়া উঠিবে। অনেকানেক সুবোধ লোকের হৃদয় তাদৃশ উন্নত, পবিত্র এবং একাগ্র হওয়াতে নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাবের অন্যতর হেতু উপস্থিত হইবে। একোত্তমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে কোনও দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতেই উচ্চতম গিরি-শৃঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ হৃদয়বান ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হিমালয়ের অধিত্যকাদেশ হইতেই কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে, নিম্নদ্রোণীদেশ হইতে উহা উঠে নাই।"

আমরাও তাই সেই দূরদর্শী, সংযতাত্মা, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক, চরিত্রবলে সাক্ষাৎ দেব-সদৃশ ভূদেবের এই মহাবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার স্বদেশীয় নর-নারীগণকে তাঁহারই ভাষায় অনুনয় করিয়া বলিতেছি :—

"অতএব দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে যাহাতে আশা

অধ্যবসায়, একাগ্রতা, সত্যশিক্ষা এবং সহানুভূতি বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।"

নিছক বিদেশী অনুকরণে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হয় মাত্র। উহাতে কোন ক্রমেই মর্য্যাদা বর্দ্ধিত ও মঙ্গল লাভের পথ প্রাপ্তি ঘটে না। ঐহিক সাধনের প্রকৃত পথ পারমার্থিক সাধনের প্রকৃত পথ হইতে ভিন্ন নহে। কেবলমাত্র প্রবৃত্তিমার্গ দিয়া চলিয়া মানুষ কখনই কোন উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিতে পারে না। চাণক্য বলিয়াছেন—

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্।
হীনজন সহবাসে হীন মন হয়,
সমানের সঙ্গে মন সমভাবে রয়।
উন্নত লোকের সঙ্গে করিলে বসতি।
নিশ্চয় হইবে তার সমুন্নত মতি॥

অতএব শুধু রূপ দেখিয়া বা দয়া ভাবিয়া ভদ্র-সমাজের মধ্যে পতিতা-কন্যাদের অভিনন্দন করা বা হীন-প্রবৃত্তির নারীগণকে অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়া আনার সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর আপত্তি করি। মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল এবং নিবৃত্তি শক্তিই একান্ত দুর্ব্বল। ইহার ব্যতিক্রম যেখানে সেখানেই নর দেব ও নারী দেবী। [দেবী বলিলে এখন অনেক নারীই চটেন; কারণ তা হইলে যে প্রবৃত্তির পথ ছাড়িয়া নিবৃত্তি পথের পথিক হইতে হয়। এ যুগের হিন্দু নারী ভোরে উঠিয়া চা খাইতে বসেন, বাবুর্চ্চির তৈরি কটলেট স্বামীর আগেই চাখিয়া থাকেন—নিবৃত্তির নামে মূর্চ্ছা না গিয়া করিবেন কি?—কিন্তু আমরা বলি, ভাল কথার মিছাও ভাল; সাধু সাধু শুনিতে শুনিতে অসাধুর সাধু হইবার সাধ যায় এবং চোর চোর শুনিতে শুনিতে সাধুও কখন কখন চোর হইয়া দাঁড়ায় শুনা গিয়াছে]।

—কিন্তু সংসারে দেবদেবীর সংখ্যা একান্তই বিরল। মনুষ্যের সংখ্যাই অসংখ্য এবং মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিধাতা নিতান্ত বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা দেখিয়া বুঝিয়া সেখানে যাহার যেটা অভাব আছে, ও যেটা দুর্ব্বল, তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্ত সেই ভাবেরই উপদেশ দান ও উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন মাত্র; প্রবল প্রবৃত্তিকে দমন রাখার জন্যই প্রচুর পরিমাণে নিবৃত্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। নতুবা স্বভাবতঃ প্রবলা প্রবৃত্তির মুখে আবার যদি ইন্ধন যোগানো যাইত, তবে ত সংসার এতদিন লঙ্কাকাণ্ডে ছারখার হইয়া যাইত। যেমন ইউরোপীয় প্রবৃত্তি মার্গী-দের ইঙ্গিতে আজ সমগ্র ইউরোপে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের অগ্নি লেলিহান হইয়া উঠিয়া তাহারই তপ্তস্ফুলিঙ্গ সকল অগাধ জলধি উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া আমাদের দেশের উপরের পতিত হইতে ছাড়ে নাই। এখন বৈদেশিক প্রীতি-প্রবণতাগুণে ইহাকেও যদি আমাদের ঘরের চালের উপর বরণ করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের এক দিন যে পুড়িয়া মরিতে হইবেই তাহাতে আর কিঞ্চিৎমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বলিবে, শাস্ত্র কেবল রাশি রাশি নিবৃত্তির উপদেশ মাথায় চাপাইয়া দিয়াছেন, উহার ভারে ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায় মাত্র, পথ চলা ত চলেই না। শাস্ত্রকারগণ অবশ্য—

"নজাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

এই সহজ জ্ঞানের উপরেই উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। দুষ্ট ঘোড়ার রাশ একটু টানিয়াই রাখিতে হয়। সংসারে অধিকারী ভেদ আছেই—সবার জন্য সব উপদেশ ত নহে। চলিত কথায় বলে—

"বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান।
সুজনকে এক কথা মরণ সমান।"

এক কথা যার পক্ষে মৃত্যুতুল্য, তার জন্য বেশী কথার দরকার কি? কিন্তু "বেহায়া"র সংখ্যাও ত সংসারে কম নয়; কাযেই তাহাদের জন্য সাত কথা কহিতে হইয়াছে। অবশ্য যাহাদের লজ্জা অপমানই নাই, তাদের দশ কথাতেও কিছু হয় না; সে

অবশ্য খুব জানা কথাই, এবং এইরূপ লজ্জা ভয় বিবর্জ্জিতদের লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকার মনের দুঃখে বলিয়া গিয়াছেন—

উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।
পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্॥

অতএব এদেশে এখন যেমন সকল বিষয়েই শক্তিহীনতা ঘটিতেছে, তেমনই নিবৃত্তি মার্গী হিন্দুসন্তান মহান্ হিন্দু শাস্ত্রের নিবৃত্তির উপদেশকে উপহাস করিয়া প্রবৃত্তি পথের পথিক রাজার জাতির পদাঙ্কানুসরণকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া লইবেন সেটা বিচিত্র নহে। কিন্তু এতদিন আর যাহা করিয়াছেন তা করিয়াছেন, এইবার বড়ই সঙ্কটের পথকে তাঁহারা অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এর পরিণামে একেবারে রসাতলে পতন অনিবার্য্য। ইহ-পরলোকের মধ্যে সামঞ্জস্য করাই শাস্ত্রের কার্য্য। আর্য্যশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে ঐহিকতার বিরোধী নহে। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে এবং শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণকে অযথা গালি পাড়িলে শাস্ত্র বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে না; পরন্তু যা ইচ্ছে তাই করিতে করিতে যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটিয়া দাঁড়াইবে। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামাজিক প্রবন্ধ" হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইলঃ—

"× × ব্যাখ্যাতৃগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া এবং আর্য্যশাস্ত্রের মূলীভূত অধিকারী ভেদ বিচার বিষয়ে একান্ত অজ্ঞতা প্রযুক্ত, অনেকেই আর্য্যশাস্ত্রকে ঐহিকতার বিরোধী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষা লোকদ্বয়ের শুভসাধিনী—শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতি সাধিনী নহে।

"কোন সর্ব্বজনগ্রাহ্য শাস্ত্র শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই প্রস্তুত হইতে পারে না। কোন দূরদর্শী শাস্ত্রকারের চক্ষে পারলৌকিক সুখ সমৃদ্ধি ইহলৌকিক সুখ সমৃদ্ধি হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্ররূপে প্রতীয়মান হইতেও পারে না। অপ্রত্যক্ষ স্বর্গ নরকাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া 'ইহৈব নরকং স্বর্গঃ'—এই কথা লইয়াই যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও সংসার মধ্যেই পূর্ব্বলোক, বর্ত্তমান লোক এবং পরলোক তিনটী লোকই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমাদের পূর্ব্বগত পুরুষেরাই আমাদের পূর্ব্বলোক, আমরা বর্ত্তমান লোক, এবং আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষেরা পরলোক। যদি বর্ত্তমান লোকেরা দৈহিক এবং মানসিক গুণে উৎকৃষ্ট হইতে না পারেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পুরুষেরা বর্ত্তমান লোকদিগের অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবেন না।"

—সামাজিক প্রবন্ধ, পাশ্চাত্যভাব, ঐহিকতা।

এরচেয়ে চোখে আঙুল দিয়াও বেশী সহজে প্রকৃত সত্যকে দেখান যায় না। তবে মানুষের ব্যক্তিত্বই আজ প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপ এই ব্যক্তিত্ববাদের বাঁশী উচ্চস্বরে বাদন করিতেছেন, ভোরের বেলা কলের বাঁশী শ্রবণে চাকুরীজীবী কুলী নরনারীগণেরই মত সারি দিয়া প্রবৃত্তিমার্গী নরনারী এই অপূর্ব্ব বংশী রবের অনুসরণে ছুটিতেছেন। তাঁহাদের অনেকের কাছেই এখন পূর্ব্বলোকবাসীর মর্য্যাদা "মরা গরু"র সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, আর পরলোকের চিন্তার অবসর কম। তাঁহাদের মতটা প্রায় এই রকম ঃ—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?

রাগই কর, যাই কর, ব্যক্তিত্ববাদ বলিতে এ ভিন্ন আর কোন রকমই কিছু বুঝায় না। ইহাতে পূর্ব্ব এবং পরলোকের তিলমাত্র স্থান নাই। ব্যক্তিত্ববাদীদের মধ্যে অনেকেই হয় ত সবটা তলাইয়া না দেখিয়াই এ পথের অনুসরণ করিতেছেন, এ হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞাতে হউক, অজ্ঞাতে হউক, অগ্নিশিখায় হাত দিলে হাত নিশ্চয় পুড়িবে। পূতিগন্ধময় স্থানের সহিত শারীর স্বাস্থ্যের যে সম্বন্ধ, সাহিত্যের সহিত সমাজ মনেরও তাহাই। সাহিত্যে যাহা রচিত হয়, সংসারে

তাহার প্রবেশ করিতে খুব বেশী কালের ব্যবধান থাকে না। সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ স্বরূপেই দেখা হয়। হীনচরিত্রের স্তুতি ও প্রশস্তিতা কুলবধূ-সঙ্গের প্রশংসা শুধু সাহিত্যেই আবদ্ধ থাকিবে না সমাজকেও কলুষিত করিবে তাহা তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

অপূর্ণ

(উপন্যাস)

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

একটা কথা চলিত আছে—হাতী কেনা তত শক্ত নয়, যত শক্ত হাতী পোষা। তার অর্থ হয়ত এই—চোখ কাণ বুজিয়া একটা দমকা খরচ করিয়া একটা হাতী হয়ত অনেকেই কিনিতে পারে, কিন্তু নিত্য সেই অতিকায় চতুষ্পদ জীবের বিপুল খাদ্য জোটান অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব। সেইরূপ আশ্রয় জোটান আজিকার দিনে একটা বিশেষ শক্ত কায হইলেও, সেই আশ্রয় টিকিয়া থাকা আরও অনেক বেশীপরিমাণ কঠিন কায তাহা অশোক কয়েক দিনেই বেশ করিয়া বুঝিল। কিন্তু যে বিষটুকু সে স্বেচ্ছায় মুখবিবরে ঢালিয়াছে তাহা যতই বিস্বাদ ও যন্ত্রণাদায়ক হউক না কেন, তাহার সবটুকুই অশোককে নিঃশব্দে নীলকণ্ঠের মত যথাস্থানে প্রেরণ করিতে হইল।

মাসীমা প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, আজিকার ছেলেমেয়েরা খুবই শক্ত। অশোক মুখে বলিয়াছে বটে বিবাহে কিছু পায় নাই; কিন্তু সেটা যে মোটেই সত্য নহে সে বিষয়ে মাসীর কোন সন্দেহ ছিল না। একদিন তিনি উভয়ের অসাক্ষাতে বাক্স খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে উহাদের প্রতি যে ভাবের উদয় হইল তাহার সহিত শ্রদ্ধার কোন সম্পর্ক নাই; কি সবল করিয়া যে এই দুটি প্রাণী জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া তিনি ঠিক করিতে করিতে পারিলেন না।

একদিন তিনি চট্ করিয়া অনুপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, "বলি বৌমা, অশোক সত্যি সত্যি তোমাকে বিয়ে করে এনেছে তো, না—"

এই 'না' র কুৎসিৎ ইঙ্গিতটুকু অনুপ্রভাকে এমন একটা আঘাত করিল, যাহাতে তাহার সমস্ত মুখখানা একেবারে লাল হইয়া উঠিল। সে যে অশোকের বিবাহিতা স্ত্রী প্রতিবাদ স্বরূপ একথাটা বলিতেও লজ্জায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

প্রশ্নটা ঠিক মাস্-শাশুড়ীর উপযুক্ত হয় নাই এবং একথাটা অশোকের কাণে উঠিলে খুব ভাল হইবে না ইহা ভাবিয়া, মাসী ব্যপারটা সংশোধন করিয়া লইলেন, "তোকে কি আর সত্যিই বল্‌ছি তুই বিয়ে করা বৌ নস্? ও একটা কথায় কথা বল্লাম। নেকী বেটি! অত বড় এক জমীদারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'ল, না পারলি একখানা গহনা আদায় করতে, না পারলি কিছু টাকা হাতে করতে। তাইতো রাগ হল। তুই তো পর নস্, তাই তোকে এই রকম করে বল্লাম।"

কথাটা এতই নোংরা যে অশোককে সে কথা জানানো অনুপ্রভা একেবারেই অসম্ভব মনে করিল।

মাসীর ব্যবহার দেখিয়া অশোককে খুব সন্ত্রস্ত থাকিতে হইল। অনেক চেষ্টা করিয়া সে ভবানীপুরেই এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁহার ছেলে পড়াইয়া বারটি টাকার সংস্থান করিয়া লইল। মনে মনে স্থির করিল, আহার ব্যাপারটা এত লঘু ও সাদাসিদা করিতে

হইবে যাহাতে মাসীমার বারো টাকার বেশী খরচ না পড়ে। এক মাসের পর মাসী মাত্র বারটি টাকা হাতে পাইয়া মুখ-ভারি করিয়া বলিলেন, "হাঁরে অশোক, এত লেখাপড়া শিখে শেষে মাসের শেষে বারো টাকা আন্‌লি। কোথায় তোর আমার পর্য্যন্ত ভার নেবার কথা; তাতো গেল চুলোয়, এখন তোদের নিজেদের খরচটাও যোটাতে পাল্লিনে। কথায় বলে কলকেতায় যার অন্ন যুটলো না, ভূভারতে আর কোথাও যুটবে না।"

অশোক বলিতে পারিল না যে আসিয়াই সে মাসীমার হাতে যে দুখানা নোট দিয়াছিল তাহার সহিত এই বারোটি টাকা যোগ করিলে দুজন লোকের দুমাসের খোরাক একপ্রকার চলিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু তাহা না বলিয়া অশোক বলিল, "এমাসটা তো মাসীমা তেমন সুবিধে করতে পারলাম না। খুব চেষ্টা করছি যাতে একটা সুবিধা মত পাই। চাকরি বাকরির যা বাজার আজকাল!"

মাসী কথাটা উল্‌টাইয়া বলিলেন, "তোর রাজার রাজ্যি যে বাপু। লেখ দিকি তোর বাবাকে যে আমি বড় ঠেকে পড়েছি, আমাকে ১০০৲,কি ২০০৲ কি ৩০০৲ টাকা পাঠাও নইলে চল্‌ছে না। দেখি দিকি কেমন তোর বাবা না পাঠিয়ে থাকে!"

অশোককে কোন উত্তর না দিতে শুনিয়া মাসীমা বিরক্ত হইয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

অশোক দেখিল এখানে থাকা আর কিছুতেই চলিতে পারে না। কেন না বেশী টাকাকড়ি না দিতে পারিলে মাসীকে তুষ্ট করা যাইবে না এবং মাসীকে তুষ্ট করিতে না পারিলে এখানে থাকা দিন দিন কষ্টকর হইয়া উঠিবে। যেখানে হোক একটা চাকরির চেষ্টায় আশোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

একদিন দ্বিপ্রহরে কলিকাতার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার পুরাতন আত্মীয় হৃষীকেশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। কে কি করিতেছে জিজ্ঞাসাবাদ হইলে হৃষীকেশ বলিল সে ত্রিপুরার এক পল্লীগ্রামে এনট্রান্স স্কুলে হেড্ মাষ্টারি করে। অশোকও তাহার ভরসা পাইয়া বেকার অবস্থার কথা জানাইয়া হৃষীকেশকে কোথাও একটা মাষ্টারি যোগাড় করিয়া দিতে বলিল। হৃষীকেশ জানাইল তাহার স্কুলে একটা থার্ডমাষ্টারি খালি আছে, কিন্তু বেতন মাত্র ৩০৲ ত্রিশ টাকা; অশোক ইচ্ছা করিলে সে কায তাহার হইতে পারে।

এই দুঃসময়ে ৩০৲ টাকার চাকুরি অশোকের নিকট ৩০০৲ টাকা বলিয়া মনে হইল। সে বন্ধুকে অনুরোধ করিল যে ছুটির সময় সে যেন তাহকে এই কায দিবার ব্যবস্থা করে। ছুটি ফুরাইলেই সে যেন নিয়োগ-পত্র পাঠায় এবং একটা ছোটখাট বাড়ীভাড়া নিয়া রাখে, কারণ তাহাকে সস্ত্রীক যাইতে হইবে।

ইহার দিন পনের পরে হৃষীকেশের ছুটি ফুরাইল। সেখানে পৌছিয়াই সে অশোকের নামে নিয়োগ পত্র পাঠাইয়া দিল ও পথ খরচের জন্য কিছু টাকা মণিঅর্ডার করিল।

অশোক তখন সময় বুঝিয়া মাসীমাকে জানাইল যে সে ত্রিপুরার মধ্যে একটি চাকরি পাইয়াছে এবং কালই সে অনুপ্রভাকে লইয়া সেখানে রওনা হইবে।

মাসীমা তখন ক্রন্দনের অভিনয় করিয়া বলিলেন, "কেন বাবা একটা দিনের জন্য শুধু মন পোড়াতে আসা! তোরা তো যাবি, আর আমি কেঁদে কেঁদে মরব। তার চেয়ে বরং এক কায কর, বৌমাকে আমার কাছে রেখে যা, তা হলে তবু ছুটিটুটি হলে আসবি। নইলে বুড়ো মাসীকে কি আর মনে পড়বে?" ইত্যাদি।

মাসীমার জিহ্বায় যে এত মধু লুকান ছিল তাহা আজিকার পূর্ব্বে অশোক কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। ইহার আগে কোন দিন সে মাসীর অন্তরের করুণ রসের কোন সন্ধান পায় নাই। তাই তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া গিয়া মাসীর বাকচাতুর্য্যে তাহাকে কথা দিতে হইল যে সে এখন চলিয়া গেলেও মাসীর স্নেহ বিস্মৃত হইবে না, এবং তাহার চিহ্নস্বরূপ প্রথম মাসের মাহিনা পাইলেই দশ খানি মুদ্রা মাসীমাকে প্রণামী পাঠাইবে।

মাসী তখন শান্ত হইয়া উহাদের যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

পর দিন অশোক ও অনুপ্রভা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যথা সময়ে ত্রিপুরার এক সুদূর পল্লীতে অতি কষ্টে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাসীর মনে তখন এক সংকল্প জাগিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, একবার এই সুযোগে নুটুকে সঙ্গে লইয়া অশোকের পিতামাতার সহিত দেখা করিয়া সম্বন্ধটি ঝালাইয়া রাখেন। মনের মধ্যে একটা আশা উঁকি মারিতে লাগিল, এমন সোনার ছেলে নুটুকে পাইলে কি তাহারা পোষ্যপুত্র লইবে না? সরীকে কি তিনি সম্মত করিতে পারিবেন না?

দিন দুই পরেই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি অশোকদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ধনীর সন্তান, আজন্ম পিতামাতার স্নেহ যত্ন ও স্বচ্ছলতার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া, যৌবনের প্রারম্ভেই এইরূপ দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে পড়িয়া অনেকখানি মুষড়িয়া গেল। তদুপরি তাহার চিরদিনকার পোষিত একটা আকাঙ্ক্ষা একেবারে বিফল হইয়া যাওয়ায় সে আরও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক আশা করিয়া সে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল সুচিকিৎসক হইয়া আপনার দেশে ফিরিয়া আজীবন দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিবে। এমন কত দরিদ্রলোক সে দেখিয়াছে যাহারা ঘটি বাটী বিক্রয় করিয়া ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধের দাম দিয়াছে, শেষের দিকে সম্বল ফুরাইলে ঔষধ পথ্য অভাবে প্রিয়-জনের মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাহারা চিকিৎসকের যেটুকু মনোযোগ ও সাহায্য লাভ করে, তাহা না হইলেও খুব বেশী ক্ষতি হয় না। এমন অনেক বার সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে উদরাময়ের রোগী হাত দেখাইয়া সেখান হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরের একটা অতি ক্ষীণশক্তি ঔষধ শিশিতে ভরিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বৃথা ভাবিয়াছে কতক্ষণে বাড়ী যাইয়া ইহা সেবন করিয়া সুস্থ হইবে।

সে ভাবিয়াছিল এই সব দরিদ্র অজ্ঞান জনের সেবা করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিয়া সে একটা সত্যকার করণীয় কার্য্য করিবে। তাহার আগমনে যখন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ভরসা ও বিশ্বাসের হিল্লোল বহিয়া যাইবে, তাহাদের ভয়বিহ্বল পাণ্ডুর মুখে আশা ফুটিয়া উঠিবে, তখন সে তাহার শিক্ষা দীক্ষা সাধনাকে সার্থক জ্ঞান করিবে।

তাহা না হইয়া সে হইল এক অজ্ঞাত পল্লী বিদ্যা-লয়ের তৃতীয় শিক্ষক! দীর্ঘ দিন মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল, ছাত্রদের এই সব বুঝাইতে যে এখানে কর্ত্তা একবচন সেজন্য ক্রিয়ার শেষে একটা s বসিবে; আকবর যখন ভারতবর্ষের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন তখন তাহার বয়স মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর; বা একটা ত্রিভুজের যে কোনও দুইটি বাহু একত্র তাহা তৃতীয় বাহুর চেয়ে বড় ইত্যাদি। আড়াই বৎসর কাল সে যে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিল তাহা কোন কাযেই লাগিল না। সে ইহাতে না পারিল মিটাইতে তাহার অন্তরের তৃষা, না পারিল দূর করিতে তাহার জঠরের ক্ষুধা।

স্কুলের কায শেষ করিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া ভাবিত যে কি পরিশ্রম করিয়া মাসে ত্রিশটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। তাহার পিতার বিস্তীর্ণ জমিদারীতে কত লোক তাহার চতুর্গুণ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে।

মায়ের কাতর মুখখানি কল্পনা করিয়া প্রাণ তাহার আকুল হইয়া উঠিত। পিতার কথা যে মনে হইত না তাহা নহে, কিন্তু অভিমানের মধ্যে সে দুঃখ চাপা পড়িয়া যাইত। নিদ্রাভঙ্গের পর প্রভাতে উঠিয়া মায়ের কথা মনে পড়িয়া তাহার মন উদাস হইয়া উঠিত। মনে হইত যে মায়ের মনে যে দুঃখের ঝড় উঠিয়াছে, তাহারই উষ্ণ

স্পর্শ তাহার বুকের কাছে আসিয়া পৌছিতেছে। দিনের আলো নিবিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার আসিবার সময় তাহার মনে হইত, যেন মায়ের মুখখানি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছে।

তাহার মনে আর একটা কষ্ট ছিল যে, অনুপ্রভাকে পাইয়া হৃদয়ের ভারটাকে একটুও লঘু করিতে পারিল না। কারণ, দুঃখের কথা বলিতে গেলেই অনুপ্রভাকে আঘাত করা হইবে। কিন্তু অনুপ্রভাকে কিছু না বলিলেও, বুঝিতে তাহার বাকি থাকিত না। স্বামীকে বিষন্ন দেখিলে অপরাধিনীর মত সে চাহিয়া থাকিত। এক একদিন কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিত—আমার জন্যই তোমার এত কষ্ট।

একদিন অনুপ্রভা ইতস্ততঃ করিয়া স্বামীকে বলিল, "আচ্ছা, আমাকে যদি তুমি ত্যাগ কর, তাহলেও কি বাবা তোমাকে ক্ষমা করেন না ?"

অশোক প্রগাঢ় স্নেহে অনুপ্রভাকে কাছে আনিয়া বলিল, "ওকথা বোলো না। তোমার তো এতে কোনও দোষ নেই। আমি ত ইচ্ছে করেই তোমাকে এনেছি। তোমাকে যদি না পেতাম, তা হলেও ত আমি সুখী হতাম না। আমাদের অদৃষ্টে মা বাপের স্নেহ নেই, তাই পেলাম না।"

হৃষীকেশের সাহায্যেই অনেক সময় তাহার বিষন্নতা দূর করিতে হইত। বন্ধু প্রধান শিক্ষক হওয়ায় কাযেও অনেক সুবিধা হইত।

এইরূপে অশোকের এক বৎসর কাটিয়া গেল। এমন সময় হৃষীকেশ পিতার আহ্বানে দেশে ফিরিয়া গেল। তাহার পিতা তাহার জন্য আর একটা ভাল কাযের যোগাড় করিয়াছিলেন।

হৃষীকেশকে ছাড়িয়া অশোকের প্রবাস আরও ক্লেশকর হইয়া উঠিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"যাও তুমি উঠে যাও—একটু বাইরে গিয়ে বেড়িয়ে এস। সমস্ত দিনরাত এমনি করে এক জায়গায় বসে থাকলে যে অসুখ করবে। আমার কথা তুমি কিছুই শোন না।"

সরস্বতী স্বামীকে এই কথাগুলি অতি ধীরে ও ক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন।

সরস্বতী অপরাহ্ণ হইতে এই বার লইয়া এই কথাগুলি তিন বার বলিলেন। অতুলকৃষ্ণ অগত্যা উঠিয়া অশোকের মাসীমাকে কাছে ডাকিয়া দিয়া বাহিরে গেলেন।

সরস্বতী পুত্রের জন্য দুর্ভাবনায় সেই যে রোগশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন আর উঠেন নাই। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে।

প্রকৃত ভালবাসা যেখানে থাকে, সেখানে মন বুঝিতে বাকি থাকে না। সরস্বতী মুখে কিছু না বলিলেও, রোগ শয্যায় শুইয়াও তিনি যে পুত্রের কথাটা ভাবিতেছেন ইহা অতুলকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রোধ ও অভিমানে দৃষ্টি অনেকটা আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া তিনি স্ত্রীর হৃদয়ের সবখানি দেখিতে পান নাই। তাঁহার নিজের মনেও যে পুত্রের কথা উদিত হইতেছিল না তাহা নহে, কিন্তু স্বভাবের বিশেষত্ব ছিল এই যে, একবার তিনি যে সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিতেন অশেষ ক্লেশকর হইলেও সে সংকল্প হইতে বড় একটা বিচলিত হইতেন না। ক্রোধ ও অভিমান হৃদয়ের অনেকখানি জুড়িয়া ছিল বলিয়া পুত্রের চিন্তা তাঁহাকে তত ক্লিষ্ট করিতে পারিত না। আর পাছে ঐ দিকে মন বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে, সেজন্য তিনি দিনরাত্র জমিদারীর কাযকর্ম্ম লইয়া থাকিতেন। আগে অনেক গুরুতর বিষয়, অধিক আয় ব্যয় আদি বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদের উপর নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করিয়া নিজে অবসর ভোগ করিতেন। আজকাল কাহারও উপর অবিশ্বাস না হইলেও, কোন্ কাছারীতে কয়টি দিশালাই বাক্স খরচ তাহার পর্য্যন্ত হিসাব রাখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এ সব করিতেন ব্যয় কমাইবার জন্য নহে, শুধু সময় কাটাইবার নিমিত্ত।

গৃহিণী রোগশয্যা গ্রহণ করিবার পর হইতে অতুলকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এবং স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও সাধ্যমত তাঁহার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিতেন না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অতুলকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন।

মাসীমা তখন মুখ ভার করিয়া উঠিয়া গেলেন। দুদণ্ড যে বোনের সহিত নিরিবিলি বসিয়া গল্প করিয়া তাহাকে দিয়া নুটুর একটা কিনারা করিয়া লই-বেন তাহারও যো নাই। মানুষটা যেন সব সময় সংসার নিয়া পড়িয়াই আছে। মরণ আর কি! মাসীমা সেই হইতে নুটুকে লইয়া কতবার যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

এখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। শয্যা হইতে দূরে আলোকটি কমাইয়া রাখা হইয়াছে। এখনও জ্যোৎস্না উঠে নাই; শুধু তারাগণের সামান্য একটু কিরণ গৃহমধ্যে আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ঘরের আলোক বাড়ে নাই

স্বামী পুনরায় শয্যাপার্শ্বে বসিতেই সরস্বতী বলিলেন, "গেলে আর এলে যে! বাইরে একটু বসলেও না?"

অতুলকৃষ্ণ সস্নেহে সরস্বতীর তপ্ত ললাটের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "তোমাকে এই রোগশরীরে একলাটি রেখে বাইরে গেলেও তো আমার ভাল লাগবে না।"

স্বামীর এরূপ স্নেহ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি এই কথাকয়টি শুনিয়া আজ তাঁহার চক্ষু হইতে ফোঁটা কয়েক অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অতুলকৃষ্ণ ঈষৎ অন্ধকারে তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া সরস্বতী বলিলেন, "হ্যাঁগা একটা কথা বলব শুনবে?"

অতুলকৃষ্ণ পত্নীর কণ্ঠস্বরের কাতরতায় চমকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "শুনব, বল কি কথা।"

সরস্বতী বোধ হয় কথা কয়টা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিলেন না। অতুলকৃষ্ণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছিলে বল।"

অতি অস্ফুটস্বরে সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রাগ করবে না?"

অতুলকৃষ্ণ আহতভাবে বলিলেন, "না, করব না, বল। আমি কি তোমার উপর কখনও রাগ করেছি, না তুমি কখনও রাগ করবার অবসর দিয়েছ?"

সরস্বতী তখন বলিলেন, "দেখ তুমি বারণ করেছিলে তাই দেড় বছরের মধ্যে কোনও দিন তোমার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে অশোকের নাম করিনি। যে নাম অষ্ট প্রহর বুকের মধ্যে বাজছে, সে নাম একটি বারের জন্যেও মুখে না আনার কি কষ্ট তা ত তুমিও বুঝতে পেরেছ। কিন্তু আর ত বেশী দিন আমার নেই। তাকে এইবার আসতে লেখ। তার পরে এলে ত আর দেখা হবে না। এই বেলা তাকে আনিয়ে দাও।"

অতুলকৃষ্ণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সরস্বতীর শীর্ণ রোগজীর্ণ শয্যাশায়ী শরীর, তাঁহার সকাতর অনুনয়, তাঁহার এতদিনকার এই সংকোচ আজ অতুলকৃষ্ণের চক্ষে নূতন আলোক আনিয়া দিল। এ তিনি করিয়াছেন কি?

আপনার নিষ্ঠুর অভিমান বজায় রাখিবার জন্য তাঁহার সর্ব্বগুণে গুণময়ী পত্নীকে এমন নৃশংস ভাবে হত্যা করিতে বসিয়াছেন! তিল তিল করিয়া তাঁহাকে একেবারে মৃত্যুর দুয়ার পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন! পুত্র ত তাঁহার একার নহে যে তিনি তার উপর ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন। মায়েরও ত তাহার উপর সমান অধিকার আছে। কেন তিনি তাহা একটিবারও সে কথা ভাবেন নাই? এই যে পুত্রের অদর্শনে মাতৃহৃদয় শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছে, তাঁহার ক্রোধের ভয়ে এত দিনের মধ্যে এক-বার মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারে নাই 'ওগো একটিবার তাকে আনাও!' ইহার জন্য তিনিই ত দায়ী। কি অধি-কার তাঁহার ছিল পুত্রকে তাহার মায়ের নিকট হইতে এমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিবার?

স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া সরস্বতী আর একবার প্রাণপণ সাহস করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা রাগ করলে? সে ছেলেমানুষ, না বুঝে প্রাণের টানে একটা কায' করে ফেলেছে, তাই বলে কি তাকে ত্যাগ করতে হয়?

তবু সে ত কোন নীচ কায করেনি যাতে তোমার কোনও অপমান হয়। সে ত তোমারি ছেলে! না ভেবে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিল, তাই প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে তোমার অমতে কায করে ফেলেছে। তবু তারই পরে ত তোমার কাছে কত করে ক্ষমা চেয়েছে। তোমার পায়ে পড়ি, তার দোষ ক্ষমা করে তাকে একবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কর। বল করবে? বল বল।" বলিতে বলিতে সরস্বতী কাঁদিয়া উঠিলেন।

অতুলকৃষ্ণ অত্যন্ত অপরাধীর মত পত্নীর অশ্রুসিক্ত মুখ মুছিয়া দিতে দিতে কহিলেন, "তুমি স্থির হও, শান্ত হও, আমি আজ চারিদিকে খবর পাঠাচ্ছি। আমিই বুঝতে পারিনি, আমারই অন্যায় হয়ে গেছে। সত্যিই সে তেমন কিছু কঠিন দোষ ত করেনি—" বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত বাষ্পভারে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সরস্বতী এখন স্বামীর আশ্বাস বাক্যে আনন্দজনিত উত্তেজনায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মুখ দিয়া তখন তাঁহার একটি কথাও বাহির হইতেছে না। শুধু নিষেধের সংকোচ কাটিয়া গিয়া এতদিনকার অবরুদ্ধ অশ্রুর বন্যা এখন দুইটী চক্ষু দিয়া হু হু করিয়া ছুটিতেছিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বাড়ীখানি যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে আসিতেছিল। অতুলকৃষ্ণের প্রকাণ্ড অট্টালিকার বেশীর ভাগ কক্ষগুলি আজ আলোকিত হয় নাই, যেন অন্ধকারের ভিতরকার কিসের একটা আশঙ্কা অজ্ঞাত বিভীষিকার মত সেখানে অগ্রসর হইতেছিল।

অশোককে সংবাদ দেওয়া হইবে, সে আসিবে, এই আশ্বাস বাক্য পত্নীকে বলিবার পর হইতে অতুলকৃষ্ণ পুত্রের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সংবাদপত্রে পুত্রকে ফিরিয়া আসিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সময়ে যাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, অসময়ে তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। দিল্লি, আগরা, এলাহাবাদ, কাশী, কটক, পুরী ইত্যাদি না·াস্থানে ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন নগর হইতে পত্র আসিতে লাগিল কোথাও সে নাই। কলিকাতা তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইতে লাগিল। কোথাও তাহাকে মিলিল না। অতুলকৃষ্ণের কেবল মনে হইতে লাগিল, এই মরণাসন্না পুত্রগত-প্রাণা সাধ্বী নারীর জীবদ্দশায় বুঝিবা সে ফিরিবে না। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি হতাশ হইতে লাগিলেন। মনে হইল তাঁহাকে চিরকাল ধরিয়া অনুতপ্ত করিবার জন্যই বুঝি তাহার অজ্ঞতবাস ফুরাইবে না।

অতুলকৃষ্ণের বৃহৎ অট্টালিকায় নিরাশার ছায়া দিন দিন গাঢ়তর হইতে লাগিল। সরস্বতী দেবীর জীবনদীপ যে তৈল অভাবে নিবিয়া আসিতেছে তাহা চিকিৎসক হইতে দাস দাসী পর্য্যন্ত কাহারও অবিদিত ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে এখনও পর্য্যন্ত আশার মোহ কাটাইতে পারেন নাই। প্রত্যহই প্রভাতে কয়েক ঘণ্টার জন্ত তাঁহার জ্যোতিহীন চক্ষে আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিত। যেন উৎকর্ণ হইয়া কহিতেন, ঐ না কে চুপে চুপে আসিতেছে, ঐ না কাহার পদশব্দ হইল—ঐবুঝি সে আসিল!—পরে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যা হইতে একটা গভীর নিরাশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেন। ঘরের ভিতরে বা বাহিরে চক্ষে কোন রূপ আলোক তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই অতুলকৃষ্ণের অন্তঃপুরের সর্ব্বদা সুসজ্জিত ও আলোকিত কক্ষগুলি আজ নিস্তব্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেবল বহির্ব্বাটীতে কোনও স্থানে আলোকের অভাব নাই বরং প্রকটই আছে। সরস্বতী বলিয়াছিলেন সমস্ত রাত্রি বাহিরে যেন আলোক থাকে, নহিলে সে যদি আসিয়া ফিরিয়া যায়।

অশোক যখন ফিরিল না, চিকিৎসকের পরামর্শ মতে অতুলকৃষ্ণ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভাবিয়াছিলেন,

দেশভ্রমণে হয়ত শরীরও সারিবে—অন্ততঃ দিবারাত্রি প্রতীক্ষ্যমান মাতৃহৃদয়ের প্রতীক্ষার কষ্ট কমিবে। কিন্তু সরস্বতী দেবী একটা দিনের জন্যও এ বাটী ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিলেন—আমাদের অসাক্ষাতে যদি আসিয়া আবার চলিয়া যায়! একবার বাছা আসিতে চাহিয়াছিল, তুমি আসতে দাও নাই, আর আমি তেমন করিতে দিব না।

এই এক কথাতেই ভ্রমণের প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সরস্বতী দিনরাত্রি পুত্রের অপেক্ষায় রহিয়া রহিয়া অবশেষে মৃত্যুশয্যা আঁকড়িয়া ধরিলেন। শীঘ্রই যে এ অপেক্ষার অবসান হইবে সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

সেদিন সমস্ত রাত্রির জন্য চিকিৎসক নিকটে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সরস্বতী তাহা পছন্দ করিলেন না, তাই তিনি পার্শ্বের একটি কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে অতুলকৃষ্ণ রোগিণীর অবস্থা ডাক্তারকে অবগত করাইয়া যাইতেন।

আজ সন্ধ্যায় সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল লইয়া রহিয়াছেন, বুঝি এই পুত্রবিরহব্যাকুলা জননীর শেষ নিশ্বাসটুকু শূন্যে মিলিয়া যায়। অতুলকৃষ্ণ শয্যাপ্রান্তে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে সরস্বতী ক্ষীণ কণ্ঠে কি বলিতেছেন তাহা শুনিবার জন্য অতি নিকটে আসিয়া বসিতেছেন।

সরস্বতী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি মাস?"

অতুলকৃষ্ণ সস্নেহে পত্নীর মাথায় হাত বুলাইয়া উত্তর দিলেন, "বোশেখ মাস।"

অতি মৃদুস্বরে, অনেকটা যেন আপনা আপনি সরস্বতী বলিলেন, "তিন বছর হল বাছা বাড়ী ছাড়া। আমি থাকতে সে আর এল না। আচ্ছা আমার অসুখ, আমি আর বাঁচব না, এসব খবর দিয়েছিলে?"

আঘাত লাগিবে জানিয়াও অতুলকৃষ্ণকে বলিতে হইল, "হাঁ দিয়েছিলাম।"

সরস্বতী আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমার অসুখ টের পেলে সে আসবে না এমন ছেলে ত সে নয়। তা হলে বাছার কি হল?"—সেকি তবে নেই? এ কথাটা সরস্বতী ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার আর্ত্ত কাতর কণ্ঠস্বরে তাহা অপ্রকাশিত রহিল না।

অতুলকৃষ্ণ নিজের ব্যথা গোপন করিয়া কহিলেন, "তুমি ভেব না, তার কাছে নিশ্চয়ই খবর পৌছেনি। ঢের জায়গা আছে যেখানে খবরের কাগজ দৈবাৎ বা একেবারেই যায় না। হয়ত সে ঐ রকম একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছে। আর আমার লোকজন যারা খুঁজতে গিয়েছিল তারা বড় বড় সহরেই গিয়েছে, ছোট খাট জায়গায় যায়নি। আমি ফের লোকজন পাঠাচ্চি, তুমি ভেবো না। তার সন্ধানে আমি অর্দ্ধেক সম্পত্তি ব্যয় করব; তাকে ফিরিয়ে আনবই।"

চোখের জল না মুছিয়াই সরস্বতী বলিলেন, "সে যেন ফিরে আসে। এই ঘর খানিতে তার জন্যে আমি আশীর্ব্বাদ রেখে যাচ্চি। তাকে আর বৌমাকে এই ঘরটা ছেড়ে দিও। তারা যেন এই ঘরটায় থাকে।"

খানিকক্ষণ সরস্বতী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অতুলকৃষ্ণের কণ্ঠ দিয়াও কোন কথা বাহির হইল না। আষাঢ়ের বৃষ্টির ধারার মত অন্ধকারে দুজনেরই চক্ষে অশ্রু বাহির হইল।

একটু পরে আবার সরস্বতী বলিলেন, "তারা এলে বোলো, আমি তাদের উপর একটুও রাগ করি নি। তারা এসে দুজনে আমাকে এক সঙ্গে মা বলে ডাকবে এ আমার বড় আশা ছিল। কিন্তু তোমার উপর তো আমি কথা কইতে পারিনে, তাই আমি নিজে থেকে তাদের কোন খোঁজ করিনি। তারা যেন না ভাবে যে মা পর্য্যন্ত আমাদের ত্যাগ করেছিলেন।"

মৃত্যুশয্যার যাত্রীর নিকট হইতে কি মৃদু, অথচ কি তীব্র তিরস্কার!

অতুলকৃষ্ণ পত্নীর ক্ষীণ দেহ ধীরে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে, তোমায় বড় কষ্ট দিয়েছি। আমায় মাপ কোরো।"

সরস্বতী নিজের হাতখানি স্বামীর পিঠের উপর

রাখিয়া বলিলেন, "ও কথা বলে আমার পাপ বাড়িও না। কখনও তো তুমি আমার অমতে কোন কায করনি। একটা যদি করে থাক তার জন্যে কেন দোষী হবে তুমি? সব ভাল ভুলে গিয়ে একটা মন্দই মনে করে থাক্‌ব এমন শিক্ষা ত তুমি আমায় দাও নি।"

দুজনের মুখে আর কিছুক্ষণের জন্য কোন কথা বাহির হইল না।

সরস্বতী প্রথমে কথা কহিলেন, "আর তারা এলে, সব দোষ ক্ষমা করে বুকে তুলে নিও। রাজার ছেলে রাজার বৌ হয়ে তারা না জানি কত কষ্টই পাচ্ছে। আর তাদের বোলো আমি তাদের আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি তারা সুখী হবে। তাদের বোলো আমি এ বিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছি যে আমার অসুখের খবর পেলে সে নিশ্চয়ই আসত।"

অতুলকৃষ্ণের আর অশ্রুদমন করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার অশ্রুধারায় সরস্বতীর গাত্রবাস সিক্ত হইতে লাগিল।

সেদিন শেষ রাত্রে সরস্বতী এজগতে পুত্রের জন্ম প্রতীক্ষার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, পরজগতে বুঝি স্বামী পুত্রেরে প্রতীক্ষার জন্য চলিয়া গেলেন।

হায়, মানুষের এ প্রতীক্ষার কি কোনদিন শেষ হইবে না?

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উপযুক্ত পুত্র থাকিতে গৃহিনীর শ্রাদ্ধ অতুলকৃষ্ণকেই করিতে হইল। আত্মীয় কুটুম্বে ঘর ভরিয়া গেল। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শ্রাদ্ধ ব্যাপারটিকে উৎসব হিসাবেই ধরিয়া লইয়াছিলেন, বিশেষতঃ ঐ কাযে যখন এত ভোজন, কীর্ত্তন ও জনসমাগম হইয়াছিল। আত্মীয় কুটুম্বগণের সম্মিলিত হর্ষ কোলাহলের মধ্যে অতুলকৃষ্ণ শোকাকুল চিত্তে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন।

শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলেও শূন্য মিষ্টান্ন পাত্রের রসপিপাসু মক্ষিকাবৃন্দের ন্যায় অনেক আত্মীয় বাড়ী ফিরিলেন না। তাঁহারা বাড়ীটাকে এমন করিয়া অধিকার করিয়া রহিলেন যেন এখানে চিরকালের মত থাকিয়া যাইবার জন্যই তাঁহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল। দিবারাত্র সেই আত্মীয়গণের কলকোলাহলে অন্তঃপুর ও বৈঠকখানা মুখরিত হইতে লাগিল; লোকাভাব আর রহিল না। কিন্তু এই সব আত্মীয়গণের আশ্রয়স্থল এই বিশাল অট্টালিকার অধিকারী যিনি, তিনি সকল বিষয়েই নিষ্ক্রিয় অনাসক্ত ও উদাসীন হইয়া রহিলেন। তাঁহার গ্রামসম্পর্কে জ্যেঠতুত ভাই, তাহার ভগিনীপতি, তাহার এক পিসে মহাশয় ও তস্য ভ্রাতা, অশোকের মামীমার কিরকম ভগিনী ইত্যাদিতে সংসার ভরিয়া উঠিল। ইহাদের অনেকেই স্বয়ং রহিয়া গেলেন। কেহ বা কার্য্যের খাতিরে চলিয়া গেলেন, রাখিয়া গেলেন গৃহিণী ও শিশু বা কিশোর পুত্রকে—উদ্দেশ্য এই পুত্রহীন ঐশ্বর্য্যবানের স্নেহদৃষ্টি যদি পুত্রের উপর পড়িয়া যায়। অশোকের সেই মাসী ঠাকুরাণী ও তাঁহার দশ বৎসরের ছেলে মুটুবিহারী। এ সকল আত্মীয় কুটুম্বের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন।

সকলেই মুখে বলিতে লাগিলেন এ সময়ে কর্ত্তাকে একা ফেলিয়া কি করিয়া তাঁহারা! এবং সময় অসময় নিজ নিজ পুত্র কন্যাগণকে কর্ত্তার নিকট বসাইয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।

অতুলকৃষ্ণ তখন অন্তঃপুর একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আশ্রয় লইলেন। আত্মীয়গণ অন্তঃপুরে একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। অতুলকৃষ্ণ ইহা সহ্য করিয়া লইলেও, তাঁহার পুরাতন ভৃত্য সনাতন তাহা সব সময়ে সহ্য করিতে পারিত না। একদিন অপরাহ্নে সনাতন বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দেখিল দুইটি কুটুম্বযুবক অশোকের পড়িবার ঘর অধিকার করিয়া সেখানে দিব্য আরামে তাস খেলা আরম্ভ করিয়াছে।

সনাতনের এতই সেটা অসহ্য হইয়া উঠিল যে, সে কর্ত্তা বাবুর কুটুম্ব বলিয়া ইহাদের খাতির করিতে পারিল না। এবং কপাট দুইটা খুব জোরে শব্দ করিয়া

ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "বাবু, আপনারা এ ঘরটা খুলবেন না। এ ঘর খোলা দেখ্‌লে বাবুর বড় কষ্ট হয়।"

"কেন কষ্ট হবে বাবুর? ঘর কি বন্ধ করে রাখ্‌বার জন্তে হয়েছে?"—হাতের একখানি তাস ফেলিয়া একটি যুবক কথাগুলি বলিলেন।

অপর একজন বলিলেন, "চাকর হয়ে একবার আস্পর্দ্ধা দেখেছ? এসব পিসেমশায়ের আস্কারার ফল।"

সনাতন কথটা বিশেষ করিয়া গায়ে না মাখিয়াই বলিল, "চাকর ত বটেই বাবু। সেই জন্তই তো বাবুর কষ্ট হবার কথা ভাব্‌ছি।"

আর একজন বলিল, "তা তোমাকে চাকর বল্‌বে না ত কি মনিব বল্‌বে? তোমার বাবু আমার আপন কাকা তা জান? আমার ঠাকুরমার ঠাকুরদাদা আর তোমার বাবুর ঠাকুরদাদার বাবা মাসতুতো ভাই ছিলেন সে খবর রাখ? আমরা অমনি আসিনি যে ঘর ছেড়ে দিতে বল্‌বে!"

সনাতন বলিল, "আপনারা বাবুর আপনার লোক তা আমি জানি। ঘর তো ঢের আছে, আপনারা এ ঘরটা ছেড়ে অন্ত একটা ঘরে থাকুন তাই বল্‌ছি। ঘরের তো আর অভাব নেই।" বলিয়া সনাতন ঘরের তালা হাতে করিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

বাবু চতুষ্টয়ের মধ্যে তখন টেলিগ্রাফের ইংরাজীতে একটু আধটু কথাবার্ত্তা চলিল, কি করা এখন কর্ত্তব্য। তিন জনের উঠিবারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জবরদস্ত গোছের বাকি লোকটি বলিল, "কিছু ভয় নেই, বসে খেলা যাক্‌। ও বল্লে বলেই কি হবে?"

অগত্যা সকলে যেমন খেলিতেছিল তেমনি খেলিতে লাগিল।

তখন সনাতন একটু কড়া মেজাজে বলিল, "বাবু আপনারা ভদ্রলোক ভেবে ভদ্রভাবে বল্‌ছিলাম। এ ঘরে আপনাদের আস্‌বার অধিকার নেই। এ আমার দাদাবাবুর ঘর। এ ঘরে আমি দাদাবাবুকে ছাড়া আর কাউকে বস্‌তে দেব না। কর্ত্তা বাবু বল্‌লেও না।"

বলিয়া সনাতন, ঝড় যেমন বৃষ্টিভরা মেঘ কাটাইয়া দেয় তেমন চোখের জল ক্রোধ দিয়া সরাইয়া, ঘর বন্ধ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। বাবু চতুষ্টয় আর বিলম্ব না করিয়া ঘরের বাহির হইল। একজন শাসাইয়া গেল, "কাকাবাবুর কাছে আমি এখনি যাচ্চি।"

সনাতন দুয়ার বন্ধ করিয়া চাবিটি আপনার কাছে রাখিয়া দুফোঁটা বিদ্রোহী অশ্রু মুছিয়া নিরুত্তরে প্রস্থান করিল।

আর একদিন সনাতন দেখিল কর্ত্তা ও গৃহিণী যে ঘরে শয়ন করিতেন সেই ঘরটিতে কর্ত্তার কয়েকটি বর্ষীয়সী আত্মীয়া নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া পরচর্চ্চা করিতেছে। সরস্বতীকে সনাতন মা বলিত এবং সেই সতী নারীর ঘরখানিকে সে দেবমন্দিরের মত পবিত্র বলিয়া মনে করিত। এই সব কটুভাষিণী আত্মীয়ারা পরনিন্দায় সেই মাতৃ-মন্দির কলুষিত করিবে ইহা সে কিছুতেই সহিতে পারিল না। কিন্তু সেদিন বাবুদের সে যেমন করিয়া বাহিরে যাইতে বলিয়াছিল, মায়ের জাতিকে তেমন করিয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু তাঁহারা অপরাহ্নে যেমন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া কার্য্যান্তরে গেলেন, অমনি সনাতন দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া কর্ত্তার উদ্দেশে বহির্ব্বাটিতে প্রস্থান করিল।

উক্ত দুই বিষয়ের অভিযোগই কর্ত্তার নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিকট কোনও সুমীমাংসা না হওয়ায়, কেহ কেহ অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন যে চাকরের হাতে অপমানিত হইয়া তাঁহারা থাকিতে পারিবেন না। অতুলকৃষ্ণ তাঁহাদের বলিলেন, "সনাতন আমার বাবার আমলের লোক। ওকে তো আমি চাকরের মত দেখি না। ও ঘর দুটোয় গেলে ওর মনে বড় কষ্ট হয়, তাই তোমাদের মানা করেছে। ওর কথায় কেউ কিছু মনে করো না।

তখন অগত্যা আত্মীয়বৃন্দ কিছু মনে না করিয়াই চলিয়া গেলেন। আর অতুলকৃষ্ণ আত্মীয়কুল-সমাবৃত হইয়াও, সেই বিশাল ভবনের বহির্ব্বাটিতে নিতান্তই

একাকী রহিলেন। কেবল দ্বিপ্রহরে একবার আহারের সময় বাড়ীর ভিতর আসিতেন। আহারান্তে তখনি আবার ফিরিতেন।

রাত্রের আহারটা পাচক বহির্ব্বাটীতে দিয়া আসিত। কিন্তু অধিকাংশ দিনই তাহা অভুক্ত রহিত এবং অত্যন্ত ক্লিষ্ট হৃদয়ে প্রভাতে সনাতন তাহা অপর কাহাকেও ধরিয়া দিত।

রাত্রে প্রায়ই অতুলকৃষ্ণের নিদ্রা হইত না। অর্দ্ধেক রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বাহিরে আসিতেন, ও বহির্ব্বাটীর ছাদের উপর পাইচারি করিতে করিতে দুশ্চিন্তা ও অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেন। ভাবিতেন কি করিতে গিয়া কি করিয়া ফেলিলেন। আপন অহমিকা রক্ষা করিতে গিয়া পুত্রকে হারাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তমা পত্নীরও প্রাণ নাশ করিলেন। সে ছেলেমানুষ, ঝোঁকের বসে একটা কায করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার জন্ম তিনি তাহার উপর এমন মর্ম্মান্তিক ক্রোধ কেন করিয়া বসিলেন? সত্য সত্যই সে যখন সেই মেয়েটিকে ভালবাসিত, তাহার উপর প্রকারান্তরে একটা প্রতিজ্ঞার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল, তখন কেন তিনি তাহার দিকটা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন না? ছেলেমানুষ সে হৃদয়ের আবেগ দমন করিতে পারে নাই বলিয়া, তাহাকে একপ্রকার বিনা দোষে ত্যাগ করিলেন—নিজে বৃদ্ধবয়সে অহেতুক ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন কৈ? বিনা দোষে তাহাকে ত্যাগ করার শাস্তি স্বরূপই বুঝি ভগবান্‌ও গৃহিণীকে কাড়িয়া লইলেন।

অশোক কোথায় পথে পথে বেড়াইতেছে, হয়ত অর্থাভাবে দুঃখে পড়িয়া অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। তাঁহারই জন্ম অশোক গৃহ-ছাড়া হইল এই দুঃখ বুকে লইয়া গৃহিণী চলিয়া গেলেন।—এই সব ভাবিয়া অশ্রুজলে তাঁর প্রতি রাত্রি প্রভাত হইতে লাগিল।

একদিন শেষরাত্রে ছাদের উপর পাইচারি করিতে করিতে অতুলকৃষ্ণ আচ্ছন্ন হইয়া আলিসার নিকট দাঁড়াইয়া ঐ সব ভাবিতেছেন, এমন সময় নিচে হইতে গিয়া সনাতন পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া করুণার স্বরে বলিল—"বাবু, এরকম কল্লে শরীর আর কদিন টিক্‌বে?"

অতুলকৃষ্ণ বাহিরে বড় একটি আবেগ প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু সেদিন পুরাতন ভৃত্যের সমবেদনায় তাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বলিয়া ফেলিলেন, "আর বেঁচে কি হবে সনাতন?"

তাহার দৃঢ়চিত্ত বাবুর মুখে ঐরূপ করুণ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ সনাতন একেবারে উচ্ছ্বসিত স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তারপর চোখ মুখ মুছিয়া বাবর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "অমন কথা মুখে আনবেন না বাবু। খোকাবাবু ঠিক ফিরে আসবেন, এ আমি ঠিক আপনাকে বলছি। বৌমা গিয়েছেন—সতী-লক্ষ্মী, তাঁর জন্ম আর চোখের জল ফেল্‌বেন না।" বলিয়া সনাতন আর একবার হাহা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন আবার অতুলকৃষ্ণ সজল চক্ষে সনাতনকে শান্ত করিলেন।

শান্ত হইয়া সনাতন কোমল স্বরে বলিল, "বাবু একবার চলুন, তীর্থ করে আসা যাক্। আমার মন বল্‌ছে, বিদেশে বেরুলেই খোকাবাবুকে পাওয়া যাবে। এতে আপনার শরীর মন ভাল হবে; খোকাবাবুরও খোঁজ করা হবে।"

কথাগুলি অতুলকৃষ্ণের মনঃপূত হইল। তিনি সম্মত হইলেন। সনাতন তাড়াতাড়ি করিয়া শীঘ্রই বাহির হইবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

কতকগুলি আত্মীয় আত্মীয়া সঙ্গে যাইবার জন্ম বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন। কতকগুলি, বাড়ীতে থাকিলে আর্থিক সুবিধা হইবে ভাবিয়া, বাড়ী পাহারা দিবেন ভরসা দিলেন। সনাতনের ইচ্ছা ছিল না যে ইহাদের কেহই সঙ্গে যান, কিন্তু অতুলকৃষ্ণ যখন একবার তাহাতে সম্মতি দিয়া ফেলিলেন তখন আর অন্য উপায় রহিল না।

তারপর একদিন কতকগুলি আত্মীয় আত্মীয়া লইয়া অতুলকৃষ্ণ সনাতনের সহিত দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন।

বাড়ী রহিলেন দু'একজন কর্ম্মচারী ও কতকগুলি

আত্মীয় কুটুম্ব এবং ইঁহাদের সকলের কর্ত্রী হইয়া রহিলেন সপুত্রা সেই মাসী। সকলকেই বলিয়া যাওয়া হইল, যদি দৈবাৎ অশোক ইহার মধ্যে দেশে ফিরে বা তাহার কোন সংবাদ আসে, তাহা তৎক্ষণাৎ যেন অতুলকৃষ্ণকে জানান হয়।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বেলা ১০টায় ত্রিপুরার এক পল্লীর একটি একতালা ছোট বাড়ীর এক কক্ষে অশোক খাইতে বসিয়াছে; অনুপ্রভা নিকটে পাখা হাতে বসিয়া ব্যজন করিতেছে। দুয়ারের গোড়ায় একটি বছর দেড়েকের ছেলে একটি কাগজের বাক্সে একরাশ তেঁতুলের বিচি যত্ন করিয়া তুলিতেছে।

অশোকের শরীর খুব শীর্ণ। মুণ্ডিত মস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণ কেশগুলি তাহার সদ্য রোগমুক্তির পরিচয় দিতেছে। অনুপ্রভা বাতাস করিতে করিতে বলিল, "কৈ আজ যে কিছু খাচ্ছ না! ঐ ডালটুকু মেখে আর দুটি ভাত খাও।"

"উঃ যে গরম! এ সময়ে কি আর শুধু ডাল ভাত আর মাছের ঝোল খাওয়া যায়?" বলিয়া অশোক হাত তুলিয়া বসিল।

"কর কি! কর কি! উঠোনা। না হয় দুধ দিয়ে আর চারটি খাও। আমি দুধ নিয়ে আসি।" বলিয়া অনুপ্রভা দুধের জন্য উঠিল।

অশোক বলিল, "বস, বলি শোন। এখন কি দুধ দিয়ে খেতে ইচ্ছে করে যে খাব?"

অনুপ্রভা অগত্যা পুনরায় বসিয়া বলিল, "তা হলে কি দিয়ে খেতে ইচ্ছে করে তাই বল।"

অশোকের বাম দিকে আসন হইতে একটু দূরে একটা হাঁড়ির মধ্যে কাটা তেঁতুল ছিল। তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া অশোক কহিল, "ইচ্ছে করছে এমনি করে একটু তেঁতুল নিয়ে—এমনি করে পাতে ফেলে, এমনি করে ডালের সঙ্গে বেশ করে মেখে নিয়ে এমনি করে খেয়ে ফেলি।" বলিয়া অশোক সত্য সত্যই হাঁড়ি হইতে খানিকটা তেঁতুল লইয়া পাতে ফেলিল ও ডালের সহিত বেশ করিয়া মাখিয়া ভাতের সঙ্গে মিশাইয়া ৪।৫ গ্রাসে তাহা শেষ করিয়া ফেলিল।"

"ওমা, কি হবে! তুমি এই রোগা শরীরে অতখানি তেঁতুল খেলে কি করে খেলে!"

—খানিকটা হাসি অধরের নীচে চাপিয়া অনুপ্রভা গালে হাত দিয়া কথাগুলি বলিল।

অশোক তৎক্ষণাৎ বাম হাতখানি তেঁতুলের হাঁড়ির দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, "কি করে খেলাম আর একবার তাহলে ভাল করেই দেখ।"

"রক্ষে কর, আর ভাল করে দেখিয়ে কায নেই!" বলিয়া অনুপ্রভা মৃদু হাসিয়া তাড়াতাড়ি তেঁতুলের হাঁড়িটা সরাইয়া রাখিল।

"তবে আর আমার দোষ নেই," বলিয়া অশোক হাসিতে হাসিতে গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্কুলে পড়ান, বাড়ীতে পড়ান ও তদুপরি অভাব দুশ্চিন্তা ও মনঃকষ্ট সবগুলি এক সঙ্গে মিলিয়া অশোকের স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে খারাপ করিয়া ফেলিয়াছিল। হৃষীকেশ চলিয়া যাওয়ার মাসছয়েকের মধ্যে সে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। বিদেশে শয্যাশায়ী স্বামী ও শিশুপুত্রকে লইয়া অভাবের মধ্যে অনুপ্রভা একেবারে অন্ধকার দেখিয়াছিল। কিন্তু অনুপ্রভা ও অশোকের মধুর স্নিগ্ধ স্বভাবের জন্য সকলেই তাহাদের ভালবাসিত। তাই প্রতিবেশীদের সাহায্যে এ বিপদ এক রকমে কাটিয়া গিয়াছিল। অনুপ্রভাও সুগৃহিণীর মত এই সামান্য আয়ের মধ্য হইতেও প্রতিমাসে কিছু কিছু বাঁচাইত। এই সঞ্চিত অর্থ স্বামীর রোগের সময় তাহার খুব কাযে লাগিয়াছিল। তিন মাস অবিরাম শুশ্রূষার পর অনুপ্রভা অনেক কষ্টে স্বামীকে যমের দুয়ার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল।

ঐ সময়ে অনুপ্রভার খুবই ইচ্ছা হইত স্বামীর অসুখের সংবাদ একবার শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট প্রেরণ করে। কিন্তু রোগের প্রারম্ভে অভিমানের বশে অশোক স্ত্রীকে

প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল যে সে বাঁচিয়া থাকিতে যেন পিতামাতাকে সংবাদ দেওয়া না হয়।

যে সময়ে অশোক মরণাপন্ন,ঠিক সেই সময়ে সরস্বতীর অনুরোধে অশোকের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইয়াছিল ও সংবাদ পত্রে তাহাকে ফিরিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন কেইবা সংবাদপত্র দেখে, আর সেই ত্রিপুরার এক ক্ষুদ্র পল্লীপ্রান্তে কেই বা সংবাদ লইতে আসে!

কিন্তু মায়ের প্রাণ যখন বড়ই কাঁদিত, তখন অশোক সেই অজ্ঞানাবস্থার মধ্যেও যখনই জ্ঞান হইত মা মা বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইত। প্রাণের মধ্যে শুধু মার কথাই তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইত। যে রাত্রের শেষভাগে স্বরস্বতী অশোক অশোক করিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিয়াছিলেন, তখন অশোক হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেন মাকে অনেকদিন পরে দেখিতেছে এই ভাবে "ওমা, মা, মাগো অনেক দিন পরে মা" এই রূপ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল।

জাগ্রতাবস্থায় কি স্বপ্নাবস্থায় তা অশোক ঠিক বলিতে পারে না, কিন্তু তাহার এখনও স্পষ্ট মনে আছে যেন তাহার মা শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিতেছেন,"বাবা বড় কষ্ট পেয়েছিস। আশীর্ব্বাদ করি এবার তোর ভাল হবে।" যখনি ভাবে তখনি মায়ের সেই মাধুর্য্যর মূর্ত্তি মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। সদ্য স্নাত ও মার্জ্জিত মায়ের মুক্ত কেশপাশ, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা, পরণে লোহিতপ্রান্ত বস্ত্র, মুখের এক পার্থিব শান্ত সৌম্যভাব—এসব অশোক কখনও ভুলিবে না।

অশোক অনুপ্রভার সাহচর্য্যে সময়ে সময়ে এসব কথা ভুলিয়া থাকিত। কিন্তু একাকী হইবামাত্র আবার সে কথা মনে উঠিত।

এইরূপে ভাগ্যচক্রে মাতা পুত্রকে না দেখিয়া পুত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে চিরদিনের মত চক্ষু মুদিয়াছিলেন, এবং পুত্রও দূর দেশে তাঁহার কোনও সংবাদ না পাইয়া ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ আহারান্তে বিশ্রামের পর অনেকদিনের ইচ্ছা অশোক কার্য্যে পরিণত করিল। মা যখন পরলোকে, তখন সে মাকে একখানি পত্র লিখিল যে, পিতা ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি সে পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ২।৩ বার পত্র লিখিয়াছিল, কিন্তু উত্তর না পাইয়া সে বুঝিয়াছে যে পিতৃস্নেহ হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু মা তাহাকে কখনও ভুলিবেন না এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় আছে। মাকে দেখিবার তাহার বড়ই ইচ্ছা, সে জন্য মায়ের একবার অনুমতি পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইবে। পিতা আশ্রয় না দিলে আবার চলিয়া আসিবে। কিন্তু মাকে একটিবার না দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিতেছে না।

অতুল বাবু যখন অশোকের একটা সংবাদ পাইবেন এই আশায় একটা স্থান হইতে আর একটা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই সময় এই আকাঙ্ক্ষিত পত্র তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল। মাসী তখন বাড়ীর কর্ত্রী। অশোকের যদি কোন সংবাদ আসিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন। চিঠি পত্র যাহাতে প্রথমে তাঁহার কাছে আসে এ ব্যবস্থা তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিরোনামায় মাতাঠাকুরাণী দেখিয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। পুত্রের কতদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িত সেই পত্রখানি সাবধানে গোপনে ছিড়িয়া ফেলিলেন।

তীর্থ-পথে পিতা অনুশোচনার সহিত বলিতে লাগিলেন, হায় অশোকের অভিমান এখনও গেল না। একখানা পত্র লিখিয়া আর কি সংবাদ সে দিবে না!

আর প্রবাসে পুত্র ভাবিতে লাগিল, মাও এতদিনে আমাকে ত্যাগ করিলেন! হায় অদৃষ্ট!

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

কালিদাস বাঙ্গালী কি না?

মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী কি না নাকি ইহা এখন প্রশ্নের বা সন্দেহের বিষয় নহে। কালিদাস সমিতির "পরামর্শ দাতা" শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ কাব্যতীর্থ মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন—"মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন।" কলিকাতার "সাহিত্য সভায়" ১৩২৭ সনের ১৬ই আষাঢ় তারিখে পঠিত একটি প্রবন্ধে উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার মত বিবৃত করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে আমি তাহার এক খণ্ড পাইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর টাউন হলে সাহিত্য পরিষৎ শাখার একটি অধিবেশনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মত আরও পরিষ্কার রূপে জানা গিয়াছে। তাঁহার এই পুস্তিকায় তিনি "মহাকবি কালিদাসের সন্ন্যাসাবস্থার" একটি ছবিও দিয়াছেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর একখানা পুস্তিকায় ১৭।১৮ টি প্রমাণ দ্বারা তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি এবার বলিলেন তাহার অধিকাংশ প্রমাণই খণ্ডিত হইয়াছে, সেজন্য সেই পুস্তিকার আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। এবারকার পুস্তিকায় যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মতে অকাট্য। তাহাদের মধ্যে আবার একটি "মুখ্য কারণ" বা "বিনিগম হেতু (Irrevertable proof) আছে, আমরা প্রথমে তাহার আলোচনা করিব।

এ সংসারে সত্যনির্ণয় দুই প্রণালীতে হইয়া থাকে। কোনও সুধী ব্যক্তি প্রজ্ঞা (intuition) দ্বারা অথবা যোগ বলে একটা সত্য আবিষ্কার করিয়া, পরে তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য নানা প্রকার প্রমাণ সংগ্রহ করেন। তাহার একটা প্রমাণ খণ্ডিত হইলে আবার আর একটা খোঁজেন, সেটা খণ্ডিত হইলে আর একটা বাহির করেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রজ্ঞালব্ধ সত্য সিদ্ধান্তের কিছুতেই ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ ইহার উল্টা দিক দিয়া সত্য নির্ণয় করেন। তাঁহারা প্রথমে তথ্যসংগ্রহ করেন, পরে সেই তথ্যের সাহায্যে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহারা আগে conclusion স্থির করিয়া পরে তাহার প্রমাণ বাহির করেন না; তাঁহারা আগে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে conclusion বাহির করেন। আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বোধ হয় প্রথমোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। এই কারণে, তাঁহার প্রমাণের পর প্রমাণ খণ্ডিত হইতেছে, কিন্তু মূল সিদ্ধান্তের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। বরং উত্তরোত্তর নূতন প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি বাহির করিতেছেন। এজন্য তাঁহার অধ্যবসায়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়।

এই পুস্তিকায় তিনি সর্ব্বাপেক্ষা "মুখ্য প্রমাণ" যেটা দিয়াছেন, সেটা কি এবার দেখা যাক। তিনি বলেন, "মহাকবি কালিদাস যে পঞ্জিকা ব্যবহার করিতেন তাহা বাঙ্গালা পঞ্জিকা।"

অবশ্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই কথার কেহ যেন সোজাসুজি না বুঝেন যে কালিদাস বঙ্গদেশে প্রচলিত গুপ্ত প্রেস বা পি এম বাগ্‌চির পঞ্জিকা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য, বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত গ্রীষ্মকাল আর আষাঢ় মাস। অবশ্য গ্রীষ্মকালটা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও সময় সময় দেখা দেয়, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে উহা বৎসরের প্রথমেই আসে, আর কালিদাসও তাঁহার ঋতুসংহারে প্রথমে গ্রীষ্মের বর্ণনা করিয়াছেন। আবার শকুন্তলা নাটকের তৃতীয় শ্লোকেও গ্রীষ্মের এইরূপ বর্ণনা আছে:—

"সূত্রধার। আর্য্যে তদিমমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাং। সম্প্রতি হি

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবন বাতাঃ।
প্রচ্ছায় সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।"

অর্থাৎ নটী সূত্রধারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ ঋতু অবলম্বন করিয়া গান গাইব?" তদুত্তরে সূত্রধার বলিতেছেন,—এই যে এখানে অল্পদিন হইল গ্রীষ্ম ঋতু আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া গান কর, কারণ এখন জলে অবগাহন বড়ই আরাম জনক, বনের হাওয়া পাটলি পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত, বৃক্ষের ছায়াতলে শয়ন করিয়া বেশ সুনিদ্রা হয়, এবং এখন দিনের শেষ ভাগটা বড়ই রমণীয়।

সূত্রধারের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে স্থানে ও যে সময়ে এই নাটক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, ইহা সেই স্থানের ও সেই সময়ের বর্ণনা। যেমন হ্যামলেট্ নাটকে কোনও পাত্রের মুখ দিয়া কোন স্থান বা কালের যে বর্ণনা আছে তাহা ডেনমার্কের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, তাহা সেক্ষপীয়ারের জন্মভূমি ইংলণ্ড সম্বন্ধ নহে। কিন্তু আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, ঐ যে গ্রীষ্মের উপভোগক্ষমত্ব, সুভগ সলিলাবগাহতা ও দিবসের পরিণামরমণীয়তা এই কয়টা বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, ইহা একমাত্র বাঙ্গলাদেশেই খাটে, সুতরাং কালিদাস এখানে নিজের জন্মভূমি বঙ্গদেশেরই বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলেন—"কালিদাসের জন্মভূমিতে গ্রীষ্মের নামে গান বাঁধে, মধুমাসের নামে গান বাঁধে না। সে দেশের লোকে "মধুমাস এল সজনি" বলিয়া পথে পথে গান গাহিয়া বেড়ায় না।" কিন্তু দুঃখের বিষয় পণ্ডিত মহাশয় গ্রীষ্মের প্রশংসা সূচক একটাও বাঙ্গলা গান উদ্ধৃত করেন নাই; যাহা করিয়াছেন,সে মধুমাসের অথবা বসন্তের গান। তিনি আরও বলেন—"গ্রীষ্মকাল যে উপভোগার্হ একথা শকুন্তলা ব্যতীত পৃথিবীর কোনও কবির গ্রন্থ হইতে বাহির করিতে পারিবেন না।" কিন্তু স্বয়ং কালিদাসই ত ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোকে গ্রীষ্মকে "দিনান্তরম্যঃ," "স্পৃহনীয় চন্দ্রমাঃ" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিশ্চয়ই পৃথিবীর সকল কবিদিগের রচনা পাঠ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের কবিগণ যে শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালকেই অধিক উপভোগ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ইহা বোধ হয় তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যে মাসটাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রমণীয়। অবশেষে পণ্ডিত মহাশয় বলেন—"যে দেশে বসন্তের এমন আধিপত্য, সে দেশে কি না তিনি উপভোগক্ষম গ্রীষ্মকালের উল্লেখ করিয়া এক ছড়া কাটিলেন, এবং তাঁহারই প্রিয়তমা নটীও গ্রীষ্ম সময় অধিকার করিয়াই এক গান গাহিলেন। সুতরাং তিনি বাঙ্গালী; জগতের মতের বিরুদ্ধে, কেবলমাত্র বাঙ্গালী বিদুষগণের (?) পরিতোষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া, অচির প্রবৃত্ত উপভোগক্ষম গ্রীষ্মকালের বর্ণনা করিয়াছেন।" অর্থাৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে সেই উজ্জয়িনীতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় যেখানে শকুন্তলা নাটকের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, সেখানে তাঁহার শ্রোতৃবর্গ বাঙ্গালী ছিলেন!

"সুভগ সলিলাবগাহাঃ"—ইহার অর্থ—"কালিদাস যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশে প্রচুর জল পাওয়া যায়, সে দেশের মেয়েরা সমস্ত দিনই পুকুরের জলে গা ডুবাইয়া দিন কাটায়—সেটা পুকুরের দেশ।" অর্থাৎ সুখে জলে অবগাহনটা কেবল পুকুরের দেশে অর্থাৎ রাঢ়দেশে অথবা বীরভূম জেলায়ই সম্ভব, উজ্জয়িনীর সিপ্রানদীতে তাহার কোন সুবিধা ছিল না, আবার পঞ্চনদ প্রদেশে অথবা গঙ্গা যমুনা নর্ম্মদা গোদাবরী প্রভৃতি নদীতেও তখন কেহ জলে নামিয়া স্নান করিতে পারিত না।

"প্রচ্ছায় সুলভ নিদ্রাঃ"—এবং স্নিগ্ধচ্ছায়া তরু—ইহার অর্থ "অ-বঙ্গ আর্য্যাবর্ত্তে গ্রীষ্মে বৃক্ষতলে ছায়া থাকে না এবং তাহার নীচে শুইয়াও নিদ্রা দেখা যায় না।"—অর্থাৎ বাঙ্গলার বাহিরে পশ্চিমদেশে গ্রীষ্মকালে গাছের ছায়াটা গাছের তলে না থাকিয়া মাথায় উঠিয়া যায়। সেই জন্য যাহারা বৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা বৃক্ষশাখায় সমাসীন হইয়া সুখে নিদ্রা যায়।

এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পণ্ডিত মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক তাঁহার খশুরা-

লয়ের বর্ণনা, আর শকুন্তলার এই শ্লোক তাঁহার জন্মভূমির বর্ণনা।" ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোকে "প্রিয়ে" বলিয়া সম্বোধন আছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে কবি তাঁহার শ্বশুর মন্দিরে বসিয়া আপন প্রিয়াকেই সম্বোধন করিয়া ঋতুসংহার রচনা করিয়াছিলেন, কারণ বীরভূম জেলায় বোধ হয় কেহ প্রিয়াকে আপন বাটীতে লইয়া যায় না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই শ্বশুরালয়ের স্থানও নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহার একটি "ব্রাহ্মণীতলা," অন্যটি পণ্ডিত মহাশয়ের স্বগ্রাম "শ্রীপাট দোগাছীয়া" (কৃষ্ণনগর)।

এ ভিন্ন মেঘদূতের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে:—

"আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।"

ইহার অর্থ আমরা সাধারণতঃ বুঝি, রামগির্য্যাশ্রমে কতিপয় মাস অতিবাহিত করিয়া আষাঢ়মাসের প্রথম দিবস যক্ষ দেখিলেন যে বপ্রক্রীড়াসক্ত হস্তীর ন্যায় নবজলধরপটল গিরিপৃষ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন—"কালিদাস ১লা আষাঢ় তারিখে মেঘদূত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

তিনি আরও বলেন—"তিনি রামগিরি রামগড় বা উজ্জয়িনীর লোক হইলে নিশ্চয়ই মালবদেশীয় মাসের দিন গণনার রীতি গ্রহণ করিতেন। তিনি মালবনাথ বিক্রমাদিত্যের পঞ্জিকা গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই লিখিতেন আষাঢ়-শুক্ল প্রতিপদি তিথৌ। তিনি হিন্দুস্থানী জ্যোতিষী হইলে লিখিতেন, মিথুনসংক্রান্তের্গতাংশ এক দিনে। দাক্ষিণাত্যের লোক হইলে লিখিতেন—মিথুন মাস প্রথম দিনে।"

ঠিক কথা। কালিদাস যদি শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িতে বসিতেন তবে বাঙ্গালী হইলেও তাঁহাকে "আষাঢ়ে মাসি, শুক্ল-প্রতিপদি তিথৌ মিথুন রাশিস্থে ভাস্করে" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হইত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদম ভুলিয়া গিয়াছেন, কালিদাস এখানে সেরূপ কোন "সঙ্কল্প" করিতে বসেন নাই। যক্ষ কোন্ মাসের কোন্ সময়ে প্রথমে পাহাড়ের গায়ে মেঘ দেখেন, সেই কথাই বলিয়াছেন। তিনি এস্থলে মিথুন মাসে না লিখিয়া কেন আষাঢ় মাস লিখিয়াছেন, সে কথা পরে আলোচনা করিব।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালিদাস বাঙ্গালী কেবল ইহা প্রমাণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কালিদাস বাঙ্গালা দেশের কোন্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম শ্বশুরবাড়ী ও দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়ী কোন্ গ্রামে ছিল, তাহাও আবিষ্কার করিয়াছেন,—এমন কি কালিদাসের একখানা প্রস্তরমূর্ত্তি পর্য্যন্ত বাহির করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে দুইটি ঐতিহাসিক সূত্র প্রণয়ন করিতে হইয়াছে।

(১) "সেই দেশই মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি যে দেশের উল্লেখ তিনি তাঁহার গ্রন্থে প্রথমেই করিয়াছেন। যে স্থানকে স্মৃতিপথে রাখিয়া তাঁহার কবিত্বের উৎস প্রথম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।" (এতদিন জানিতাম ফুলই প্রস্ফুটিত হয়, এখন দেখিতেছি উৎসও ফোটে)। কারণ কবিদের বিশ্বজনীন রীতি এই যে "তাঁহারা আত্মবৎ রচনা করিয়া থাকেন—নিজের বাসস্থানই নায়কের বাসস্থান। ইহার ইংরাজী নাম "transfiguration of the author,"

কিন্তু এই সূত্রটি সম্বন্ধে একটু গোল বাধে এইখানে যে, একজন কবি ত অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, এবং তাহার প্রত্যেক কাব্যে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক। তাঁহার কোন নায়কটী কবি নিজে ও কোন্ গ্রন্থে তাঁহার নিজের জন্মভূমির উল্লেখ আছে বুঝিব? যাহা হউক এই সূত্রটি ঠিক হইলে, মহাকবি মিল্টন তাঁহার প্যারাডাইস্ লষ্ট মহাকাব্যে যে স্বর্গোদ্যানের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে লণ্ডনের বর্ণনা; মাইকেল মধুসূদন, দত্ত মেঘনাদবধে যে লঙ্কার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সাগরদাঁড়ীর বর্ণনা; হেমচন্দ্র তাঁহার বৃত্রসংহারে যে যে স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা খিদিরপুরের বর্ণনা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রঘুবংশকেই কালিদাসের সর্ব্বপ্রথমগ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা কালিদাসের পরিণত বয়সের রচনা। সেই রঘুবংশের কোন্ স্থানে কালিদাস

তাঁহার নিজের জন্মভূমির বর্ণনা করিয়াছেন ? বশিষ্ঠাশ্রমে। পণ্ডিতমহাশয় বলেন—"এই বশিষ্ঠাশ্রমের বর্ত্তমান নাম রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী ৺তারাপীঠ।" রঘুবংশের যে বশিষ্ঠাশ্রমে মহারাজ দীলিপ তাঁহার মহিষীর সহিত রথারোহণে গমন করিয়াছিলেন, তাহা অযোধ্যা হইতে বেশীদূর নহে, আবার হিমালয়েরও নিকটবর্ত্তী। রামপুরহাট অযোধ্যা হইতে কিঞ্চিৎ অধিক দূর বলিয়াই মনে হয়। আবার হিমালয় পর্ব্বতও তারাপীঠের খুব নিকটে নহে। এসকল ক্ষুদ্রবিষয় বিবেচনা করিলেও ক্ষতি নাই, কারণ তারাপীঠের নিকটে "ঘোষবৃন্দ" ও "কাশ্যিগোপ" নামক "গোপজাতিদ্বয়" আছে যাহা ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় না।" তবে বঙ্গদেশের "বল্লভ" শ্রেণীর ঘোষেরা মথুরায় বা বৃন্দাবনে কৃষ্ণের ধর্ম্ম হইতে জাত "ঘামঘোষের" বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়, রিজলি সাহেব এরূপ লিখিয়াছেন। আবার বৃন্দাবনে নন্দঘোষ নামে যে একজন গোপ বাস করিতেন একথা বোধ হয় সকলেই জানেন।

যাহাহউক, রামপুরহাটের নিকট যে কেবল বশিষ্ঠাশ্রম আছে তাহা নহে। তাহার নিকটে "কপিলাশ্রম" আছে, যাহার আধুনিক নাম চাকটা বা চক্রতীর্থ; সেখানে কণ্বমুনির আশ্রমও আছে যাহার আধুনিক নাম কালসোণা। বলা বাহুল্য এখানেই দুষ্মন্ত মহারাজ হস্তিনাপুর হইতে মৃগয়া করিতে আসিয়া শকুন্তলার দর্শনলাভ করেন, আবার শকুন্তলাও পদব্রজে এখান হইতে হস্তিনাপুরে রাজদর্শনে গিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সোমতীর্থ ও মেধসমুনির আশ্রমও এইখানে। এই সকল "অকাট্য" প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলেন—"এই রূপে পাওয়া গেল,—রামপুরহাট, কালসোণা, চাকটা, বোলপুর—এই চতুষ্কোণ ভূভাগের মধ্যে মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি ছিল।"

কিন্তু সে কোন্ গ্রাম ? ভট্টাচার্য্যমহাশয় তাহাও ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আর একটি ঐতিহাসিক সূত্র প্রণয়ন করিতে হইয়াছে, যথা—

(২) "কোনও কবি, কোনও লেখক, কোনও ঐতিহাসিক কখনও নিজের জন্মভূমি শত্রুতে জয় করিয়েছে একথা লিখিতে পারেন না। অতএব সেই দেশই মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি যে দেশের উল্লেখ তিনি রঘুর দিগ্বিজয়ের মধ্যে করিয়াছেন, অথচ সেই দেশের রঘুকর্ত্তৃক বিজয়বর্ণনা তিনি করেন নাই।"

কোনও কবি বা লেখক নিজের জন্মভূমি শত্রুকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে, একথা লিখিতে পারেন না, ইহা সত্য হইলে "পলাশীর যুদ্ধ," "মৃণালিনী" ও "পৃথ্বীরাজ" কাব্য যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা কবি বা লেখক হইতে পারেন না। আর একথা সত্য হইলে কালিদাসও বাঙ্গালী হইতে পারেন না, কারণ রঘুর দিগ্বিজয়ে তিনি বঙ্গদেশ রঘু কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল ইহা এই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন :—

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥"

অর্থাৎ বঙ্গদেশের নরপতিগণ রণতরীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলে রঘু সেই ভূপতিগণকে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিয়া গঙ্গাপ্রবাহমধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে (পণ্ডিত মহাশয়ের মতে নবদ্বীপে) জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উল্লিখিত সূত্রানুসারে একজন বাঙ্গালী কবি শত্রুকর্ত্তৃক বঙ্গদেশ পরাজিত হওয়ার কথা কখনও লিখিতে পারেন না। তাহা হইলে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন না ইহাই প্রমাণিত হয়। পণ্ডিত মহাশয় কিন্তু আগাগোড়া কালিদাস বাঙ্গালী ইহাই প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। তিনি বলিতে চান, কালিদাস কেবল বাঙ্গালী নহেন, তিনি রাঢ়দেশ বা বীরভূম জেলার বাঙ্গালী। উক্ত সূত্রের প্রথমাংশ দ্বারা কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব খণ্ডিত হইলেও, শেষাংশ দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইবে। কালিদাস রঘু কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ জয়ের কথা উল্লেখ করিলেও, রাঢ়দেশ জয়ের কথা উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং কালিদাস রাঢ়দেশবাসী বাঙ্গালী ছিলেন। তাই পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন—

কালিদাস সুহ্ম বা পাড়ুদেশ জয় করা লিখিলেন, বঙ্গ বা নবদ্বীপ জয় করা লিখিলেন, কিন্তু রঘু যে তালীবনশ্যামদেশ বা রাঢ়দেশ জয় করিলেন তাহা লিখিলেন না। "পৌরাস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী। প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ।" তিনি অনেক জনপদ আক্রমণ করিয়া জয় করিয়া তালীবনশ্যাম দেশ আক্রমণও করিলেন না, জয়ও করিলেন না। তালীবনশ্যাম দেশে কি মানুষ ছিল না?...রঘু কি দিগ্‌বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের মত মগধের দ্বারে আসিয়া মগধ জয় না করিয়া অন্যদেশ জয় করিতে চলিয়া গেলেন? এই তালীবনশ্যাম দেশই মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি। তালীবনশ্যাম এই ছয়টী অক্ষরের মধ্যে মহাকবি কালিদাসের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির আত্মীয়তা ঢালা আছে।"

কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন—"প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ"—অর্থাৎ মহারাজ রঘু পূর্ব্বসাগর গামিনী গঙ্গার পথে পথে দেশ জয় করিতে করিতে অবশেষে সেই মহাসাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন, যাহার উপকণ্ঠ তালীবনশ্যাম অথবা "তমাল তালীবন রাজি নীলা"। সম্ভবতঃ ইহা সুন্দর বনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় "তালীবনশ্যাম" দেখিয়াই রাঢ়দেশের তালগাছ ভাবিতেছেন। রঘুর সময়ে কি তবে বীরভূম জেলা সুন্দর বনের মধ্যে ছিল, অথবা সমুদ্র বীরভূমের উপকণ্ঠে ছিল? যাহা হউক তালীবনশ্যাম সমুদ্রের উপকণ্ঠ রঘুর বঙ্গদেশ জয়ের শেষ সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। পণ্ডিত মহাশয় এখানে একটা দেশের কল্পনা করিয়া বলিতেছেন—"রঘু সেই দেশটা জয় করিলেন না কেন? সে দেশে কি মানুষ ছিল না?" সুন্দর বনে মানুষ না থাকারই কথা। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয়ের মতে রঘুর সে দেশ জয় না করিবার একমাত্র কারণ, তাহা কালিদাসের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি! কালিদাস কি তবে সমুদ্রের কূলস্থিত তালীবনশ্যাম দেশে—অর্থাৎ সুন্দরবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? আমরা ত সুন্দর বনকে অন্য এক জাতীয় প্রাণীর জন্মস্থান বলিয়া জানি। তবে সেও বাঙ্গালী—তাহার পুরা নাম "রাজকীয় বাঙ্গালী ব্যাঘ্র।"

যাহা হউক আমরা এতক্ষণে ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা কালিদাসের জন্মভূমি বঙ্গদেশ পাইলাম, রাঢ়দেশ পাইলাম, আর রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী চারিটি আশ্রমের মধ্যবর্ত্তী চতুষ্কোণ ভূভাগও পাইয়াছি। এ সকল "আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য" দ্বারা পাওয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই আসল গ্রামটা আবিষ্কার করিবার জন্য বাহ্যসাক্ষ্যও গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ১৩২৭ সালের চৈত্র মাসে স্থানীয় অনুসন্ধানে বাহির হইয়া কয়েক জন স্থানীয় লোকের সাক্ষ্য ও জনপ্রবাদ দ্বারা কয়েকটি গ্রামের নাম অবগত হইলেন। তাহার মধ্যে কোন গ্রামটি কালিদাসের স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি তাহা নিঃসন্দেহ রূপে স্থির করিবার জন্য, তখন আবার "আভ্যন্তরীণ" প্রমাণের আবশ্যক হইল। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল, ময়ুরাক্ষীর উত্তর তীরে "সিংহের গর্ত্ত" অথবা "সিঙ্গড়ী গড্ডা" গ্রামই কালিদাসের জন্মভূমি। যখন তিনি বশিষ্ঠাশ্রমের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তখন কোনও একটি "সিংহের গর্ত্ত"ই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বলে কালিদাসের জন্মভূমি হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ বশিষ্টের হোমধেনু রক্ষার জন্য দিলীপ মহারাজ গর্ত্তের মধ্যে একটি সিংহকে দেখিয়াছিলেন, এবং সেই সিংহ তাহার শুভ্র দশন কান্তি দ্বারা সেই গিরি গহ্বরের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দিলীপের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়াছিল।

এই "সিংহের গর্ত্ত" বা সিঙ্গড়াগড্ডা গ্রাম যখন কালিদাসের জন্মভূমি স্থিরীকৃত হইল, তখন তাঁহার কেবল একটা নহে, দুইটা শ্বশুরবাড়ী আবিষ্কার করা কঠিন হইল না। কারণ বাঙ্গালী মাত্রেরই অন্ততঃ একটা শ্বশুরবাড়ী থাকে, এবং তাহা তাহার স্বগ্রাম হইতে অধিক দূরে হয় না। কলিকাতার লোক সাধারণতঃ কলিকাতার মধ্যেই বিবাহ করে, তবে কন্যাদানের বেলায় স্বতন্ত্র নিয়ম। পণ্ডিত মহাশয় স্থির করিয়াছেন, কালিদাসের প্রথমা স্ত্রী বিদ্যোত্তমার পিত্রালয়

"ব্রাহ্মণী তলা" গ্রামে, আর তাঁহার দ্বিতীয় সংসার ছিল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী "শ্রীপাট দোগাছীয়া"—যে গ্রামে এখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং বাস করিতেছেন। ইহার কারণ, এই গ্রামের নিকটে "যোয়ানিয়া ভালুকা" গ্রামে কালিদাসের "সন্ন্যাসাবস্থার" একখানি প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহার একটা ফটো এই পুস্তিকার প্রারম্ভে ছাপা হইয়াছে। সম্ভবতঃ কালিদাসের দ্বিতীয় পত্নীর সঙ্গে তাঁহার তেমন বনিবনাও হয় নাই, সেই জন্ত তিনি এখান হইতেই সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়াছিলেন, আর তখন দেশের লোক তাঁহার একটি প্রস্তর মূর্ত্তি প্রস্তত করিয়া লইয়াছিল। সেই মূর্ত্তিটি এখন পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত আছে। এই প্রস্তর মূর্ত্তির নিম্নে যে খোদিত লিপি আছে তাহার পাঠোদ্ধারে নাকি "শ্রীমতী শিবঃ" এইটুকু পড়া গিয়াছে। শ্রীমতীর সঙ্গে যখন শিবের মিলন হইয়াছে, তখন ইহার ফলিতার্থ নিশ্চয়ই কালিদাস। আর এই মূর্ত্তিটির যখন লম্বা দাড়ী আছে, তখন কালিদাস নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

আমরা এইরূপে দেখিলাম, কালিদাস সমিতির "পরামর্শদাতা" শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর গবেষণা দ্বারা মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি বঙ্গদেশে আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার সব যুক্তিই চমৎকার, তবে দুইটি প্রমাণ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। তাহার মীমাংসার জন্ত আমি সুধী মণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছি।

কালিদাস যে বাঙ্গলা পঞ্জিকা ব্যবহার করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে কালিদাসের সময়ে বাঙ্গলাদেশে কোন্ অব্দ প্রচলিত ছিল? আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গাব্দ শুনা যায় সম্রাট্ আকবর সাহ মুসলমান হিজরী সন অনুসারে চালাইয়াছিলেন, ইহাতে অবশ্য বৈশাখমাসে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে বৎসরারম্ভ হয়। কালিদাসের সময়ে অবশ্য ইহা প্রচলিত ছিল না। তবে কোন্ অব্দ প্রচলিত ছিল? বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে দুইটি অব্দ চলিয়া আসিতেছে,—তাহার একটি "সম্বৎ" অপরটি "শকাব্দা"। বিশ্বকোষ মতে মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য দিল্লির শকরাজকে যে বৎসর যুদ্ধে পরাজয় করেন, সেই খৃঃ পূঃ ৫৭ বর্ষ হইতে সম্বৎ গণনা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা চান্দ্রমাস হিসাবে গণিত হয়। এখনও এই সম্বৎ গুজরাটে, উত্তরভারতে ও রাজপুতনায় প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় অব্দ "শকাব্দা" শালিবাহন রাজার মৃত্যুকাল হইতে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭৮ বর্ষে আরব্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই শকাব্দা এক সময়ে খুব বেশী প্রচলিত ছিল বোধ হয়, কারণ প্রাচীনকালের জন্মপত্রিকায় এই অব্দ দেখা যায়। কালিদাস যদি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন (ইহাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত), তবে এই শকাব্দা তাঁহার সময়েও ছিল; এবং ইহা যেমন বঙ্গদেশে ছিল, তেমন পশ্চিম দেশেও ছিল। এই শকাব্দা অনুসারে বৈশাখ মাসে বর্ষারম্ভ হয় এরূপ প্রচলিত পঞ্জিকায় দেখা যায়। সুতরাং কেবল বঙ্গদেশে কেন, ভারতের অন্তত্রও তখন গ্রীষ্ম ঋতুতে বর্ষারম্ভ গণনা করা হইত। কালিদাসও সেই জন্ত তাঁহার ঋতুসংহারে গ্রীষ্মকালে বর্ষারম্ভ ধরিয়াছেন।

কিন্তু অমরকোষে অগ্রহায়ণ মাসে বর্ষারম্ভ ধরা হইয়াছে। অমরকোষ প্রণেতা অমরসিংহ কালিদাসের সমসাময়িক ও বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের মধ্যে অন্ততম ছিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তিনি তাঁহার অভিধানে মাসের নাম এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে দিয়াছেন—

"সমরাত্রিন্দিবে কালে বিষুবদ্ বিষুবঞ্চ যৎ।
মার্গশীর্ষে সহা মার্গ আগ্রহায়ণিকশ্চ সঃ॥
পৌষে তৈষ সহস্যৌ দ্বৌ তপা মাঘেঽথ ফাল্গুনে।
স্যাৎ তপস্যঃ ফাল্গুনিকঃ স্যাচ্চৈত্রে চৈত্রিকো মধুঃ॥
বৈশাখে মাধবো রাধো জ্যৈষ্ঠে শুক্রঃ শুচিস্ত্বয়ং।
আষাঢ়ে শ্রাবণে তু স্যান্নভাঃ শ্রাবণিকশ্চ সঃ॥
স্যুর্নভস্য প্রোষ্ঠপদঃ ভাদ্র ভাদ্রপদাঃ সমাঃ।
স্যাদাশ্বিন ইষোঽপ্যাশ্বযুজোঽপি স্যাত্তু কার্ত্তিকে।
বাহুলোর্জ্জৌ কার্ত্তিকিকো হেমন্তঃ শিশিরোঽস্ত্রিয়াং॥"

এখানে অগ্রহায়ণ হইতে বর্ষারম্ভ ধরিয়া কার্ত্তিকে শেষ করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে কখনও এই প্রকারের

বর্ষগণনা ছিল কি না জানি না। হয়ত অমরসিংহ লৌকিক বর্ষারম্ভ না ধরিয়া বৈদিক কালের বর্ষারম্ভ ধরিয়াছেন। যাহা হউক, যে দিক দিয়াই ধরা যায়, কালিদাস তাঁহার ঋতুসংহারে কেবল বঙ্গদেশের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন, যাহা অন্যত্র প্রচলিত ছিল না—এরূপ সিদ্ধান্ত আসিতে পারে না। যদি শকাব্দা অনুসারে তিনি বর্ষারম্ভ গণনা করিয়া থাকেন, তবে তাহা যেমন বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, তেমন ভারতের অন্যত্রও প্রচলিত ছিল।

মেঘদূতে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" দেখিয়াই বুঝা যায় না যে কালিদাস বঙ্গদেশে প্রচলিত আষাঢ় মাসের নাম গ্রহণ করিয়াছেন। অমরকোষে আমরা দেখিতে পাইতেছি, এক একটি মাসের অনেকগুলি নাম আছে। আষাঢ় মাসের মাত্র দুইটি নাম—আষাঢ় ও শুচি। কবিগণ ভাবার্থের জন্য অথবা ছন্দের অনুরোধে এক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করেন। কালিদাসও রঘুবংশে রাম ও সীতার ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করিয়াছেন। সেইরূপ তিনি মাসের নামেরও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন। "আষাঢ়" শব্দটাও সেই কারণে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত মাসের নাম বলিয়া নহে। বাঙ্গলাদেশে ত পৌষ মাসকে কেহ "সহস্য" বলে না, অথচ কালিদাস লিখিয়াছেন—"তুষার বর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ" (রঘু, ১৪। ৮৪); চৈত্র বৈশাখ মাসকে ত আমরা কখনও "মধু-মাধব" বলি না, অথচ কালিদাস লিখিয়াছেন "ভাস্করস্য মধুমাধবাবিব।" (রঘু, ১১।৭); শ্রাবণ ভাদ্র মাসকে আমরা "নভোনভস্য"-বলি না, অথচ কালিদাস লিখিয়াছেন—"নভোনভস্যয়ো বৃষ্টিমবগ্রহ ইবান্তরে" (রঘু, ১২।২৯)। অমরকোষেও আমরা মাসের নামের এই সকল প্রতিশব্দ পাইতেছি। তাহাতে আষাঢ় শব্দও আছে। কালিদাস অমরসিংহের সমসাময়িক বলিয়া খ্যাত, সুতরাং তিনি অভিধানে প্রচলিত "আষাঢ়" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ইহাই খুব সম্ভব। এইরূপে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ "বিনিগম হেতু"—খণ্ডিত হইল।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক-জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আমার পূজনীয়, তাঁহাকে অযথা হাস্যাস্পদ করা আমার অভিপ্রায় নহে। তিনি একজন সুপণ্ডিত হইয়াও ঐতিহাসিক গবেষণাকে কিরূপ হাস্যাস্পদ করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্যই আমি এতদূর পরিশ্রম স্বীকার করিলাম। আরও দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই সকল যুক্তির পৃষ্ঠপোষণ জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে, এবং তাঁহার এইরূপ বক্তৃতা লোকে গম্ভীর ভাবে শুনিতেছে। ইহা দ্বারা বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক গবেষণার গৌরব বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট নিশ্চয়ই বাড়িতেছে না। কালিদাসের জন্মভূমি আবিষ্কারের জন্য একটা কেন, দশটা সমিতি গঠিত হউক। সত্য নিরূপণের আন্তরিক চেষ্টা দ্বারা একদিন প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু তাহার গবেষণার প্রণালী স্বতন্ত্র, কল্পনা বা যোগলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাহা হয় না। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শুষ্ক ন্যায়ের বিচার দ্বারা তাহা হয়। ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার চেষ্টাতে স্বদেশ প্রীতি বা স্বগ্রাম প্রীতির কোন স্থান নাই। সুখের বিষয় আজকাল বঙ্গদেশে সেরূপ গবেষণারও অভাব নাই—ইহাই আমাদের আশার কথা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

সন্ধ্যা

(গল্প)

ভাগ্যদেবতার কাছে কোনও অজানিত অপরাধের ফলে পরিপূর্ণ যৌবনেই সন্ধ্যা ভোগ-ঐশ্বর্য্যের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিতা হইয়া ব্রহ্মচারিণীর ব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সর্ব্বহারা নিঃস্ব-হৃদয় যখন সাহারার মাঝখানে শান্তি-বারির আশায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছিল, তখন আপনার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া থাকিবার জন্ত সে কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সংসারের ছোট বড় সকলের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রয়োজনের অন্তরালে আপনার ক্ষণিকের বিশ্রামটুকুকেও লোপ করিয়া দিয়া, সেবার মধ্যে দিয়াই অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করিয়া সে ধন্ত হইল।

সন্ধ্যার দেবর সুরেশ্বর ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক, যাহারা বোঝার উপর শাকের আটিটিকেও অতিরিক্ত এবং অনাবশুক ভার বলিয়া মনে করে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের প্রতিপালন প্রথা পৈতৃক নিয়ম হইলেও সুরেশ্বর ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাই বাশটীর উপরে ত্রয়োদশের স্থান পূর্ণ করিতে যেদিন পিতৃমাতৃহীন অনাথ করুণ আসিয়া একটুখানি স্থান প্রার্থনা করিল, সেদিন তিনি তাহাকে অকুণ্ঠিত চিত্তেই বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কক্ষবাতায়ন হইতে সেই কিশোর ছেলেটীর যাজ্ঞার লজ্জায় আরক্তিম সুগৌর সুকোমল মুখখানিতে অতি করুণ বিপন্ন অসহায় অবস্থার আভাস দেখিয়া সন্ধ্যার বুকখানি অন্তরাল হইতে বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহারই বিশেষ চেষ্টায় পরে এখানে করুণের অন্নসংস্থান হইয়াছিল। কি জানি কেমন করিয়া সে কথা করুণ জানিতে পারিয়াছিল; অন্তঃপুর-বাসিনী সেই অদৃষ্টা করুণাময়ীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধার সীমা ছিল না।

অন্তঃপুর এবং বাহিরের মধ্যবর্ত্তী একটা প্রশস্ত বারান্দায় ছাত্রদের আহার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; অন্তরাল হইতে তাহাদের খাওয়ার তত্ত্বাবধান করাও সন্ধ্যার প্রতিদিনের নিয়মিত কায ছিল। আড়াল হইতে কতদিন সে দেখিয়াছে, ছেলেদের ভোজন সভার কোলাহল এবং পরিবেষণকারী পাচকের প্রতি রন্ধন সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্যের ও রহস্ত বিদ্রূপের স্রোতের মধ্যে যে ছেলেটী এক প্রান্তে আসন লইয়া নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে নিঃশব্দে আহার সমাধা করিয়া উঠিয়া যাইত, বয়সে সেই সকলের চেয়ে তরুণ হইলেও, গাম্ভীর্য্যে সে সকলকে পরাজয় করিয়াছিল। ছেলেটীর প্রতি একটা অকারণ স্নেহে সন্ধ্যার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

মহেশ্বরীর দশ বছরের ছেলে ভূপেন স্কুল হইতে ফিরিয়া মায়ের ভাণ্ডার হইতে দুই হাত ভরিয়া মিঠাই আনিয়া খাইতে খাইতে সন্ধ্যাকে সংবাদ দিল, "একটা মজার কথা শুনবে মামী? ঐ করুণ বাবু নিজের সব ভাত একটা ভিখিরীকে ঢেলে দিয়ে, না খেয়ে স্কুলে গেছে। লুকিয়ে ভাত দিয়েছিল তা আমি দেখে ফেলেচি, আমায় বারণ করেচে কারুকে বলতে।"

বালকের প্রতিজ্ঞা পালনের নিষ্ঠা দেখিয়া সন্ধ্যা একটু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমায় ব'লতে বারণ করেনি, না রে ভূপেন? আচ্ছা একটা কায করতে পারিস্? করুণ ইস্কুল থেকে এলে ওকে আমার ঘরে নিয়ে আসিস্ তো।" করুণের সারাদিনের অনাহার-ক্লিষ্ট মুখখানি সন্ধ্যার মনশ্চক্ষে যেন ফুটিয়া উঠিল। আজ ছেলেদের ভোজন সভায় তাহাকে না দেখিতে পাইয়া সন্ধ্যা মনে করিয়াছিল হয়তো সে আগেই খাইয়া ইস্কুলে চলিয়া গেছে। অনুতপ্ত হইয়া সে ভাবিতে লাগিল, কই একথা তো সে একবারও কল্পনায় আনে নাই যে হয়তো করুণ খায় নাই! কাহাকেও এ সম্বন্ধে প্রশ্ন

করাও প্রয়োজন বোধ করে নাই। তাহার অন্তরের মাতৃত্ব ব্যাকুল হইয়া উঠিল, ব্যাকুলস্বরে সে বলিল "আন্‌বি তো ভূপেন ?"

মূর্খের শাসন সম্ভাবনায় উৎসাহিত হইয়া ভূপেন বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয় আন্‌বো মামী। তুমি ওকে আচ্ছা ক'রে ব'কে দিও তো। সেদিন আবার কি ক'রেছিল ব'লব ? একজন অন্ধ বুড়োকে ভুল ক'রে একটা টাকাই দিয়ে ফেলেছিল, বোধ হয় হঠাৎ মনে ক'রেছিল ডবল পয়সা, কি বোকা।" বিজ্ঞতার হাসি হাসিতে হাসিতে বাকী সন্দেশটা গোটাই মুখে পুরিয়া দিয়া ভূপেন লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার মনে ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ-পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিল।

করুণ স্কুল হইতে ফিরিতেই ভূপেন তাহাকে বন্দী করিল, হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "এস, মামী তোমায় ডেকেচে।"

করুণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমাকে ? না, তুই জানিস্‌নে, আমায় ডাক্‌বেন কেন ? কোনও দিন তো ডাকেন না।"

ভূপেন চটিয়া বলিল, "ইস্, তোমাকেই নয়তো কাকে ? আমি জানিনে বুঝি ? ব'লে ইস্কুল থেকে এলেই তোমায় ধ'রে নিয়ে যেতে।"

করুণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ধ'রে নিয়ে যেতে ? কেন রে, জানিস্ ?"

ভূপেন বলিল, "জানি, কাণে কাণে ব'লব এখন, চল।" করুণের হাত ধরিয়া টানিয়া লইতে লইতে তাহার শ্রুতিমূলে মুখ রাখিয়া ভূপেন জানাইল, ভিখারীকে ভাত দিয়াছে সেজন্য মামীর কাছে তাহার শাস্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। শুনিয়া করুণ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "দুষ্টু ছেলে, তুই সেকথা ব'লে দিয়েছিস্ বুঝি ?"

সন্ধ্যা তাহার কক্ষের দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছিল, করুণ সম্মুখে আসিয়া তাহার পদধূলি লইয়া নতনেত্রে উঠিয়া দাড়াইতেই তাহার হাত ধরিয়া সে কক্ষের মধ্যে লইয়া গিয়া স্নেহ পূর্ণ স্বরে কহিল, "কিছু খেতে হবে তোমায়, আজ সারাদিন খাওনি যে।" লজ্জায় করুণ মাথা তুলিতে পারিতেছিল না, অস্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তার জন্মে আমার বিশেষ কিছু কষ্ট তো হয়নি। খাবার এমন কিছু তাড়া"—

বাধা দিয়া স্নেহপূর্ণ অনুযোগের স্বরে সন্ধ্যা কহিল, "না, কষ্ট হয়নি' বই কি। সারাটা দিন অম্‌নি গেছে। তোমার না হোক আমার কষ্ট হচ্চে ; আমি তোমার দিদি হই যে করুণ।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া শ্রদ্ধার আবেগে করুণ আর একবার সন্ধ্যার পায়ের ধুলা লইল। খাবারের থালা তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিতেই বিস্ময়-চঞ্চল কণ্ঠে করুণ কহিয়া উঠিল, "এত রকম তরকারী, লুচি, মোহন-ভোগ, কেন এত কষ্ট ক'রে ক'রেছেন, আমি—"

সন্ধ্যা কহিল, "এ খেতে হবে তোমায়। এ কথা কখনো ভুলোনা যে তোমার দিদির কথা অমান্য করবার অধিকার তোমার নেই। ভুল্‌বেনা তো।"

ভক্তিনত মাথায় মৃদুস্বরে করুণ উত্তর দিল, "কখনও ভুল্‌বো না দিদি।"

প্রহারের পরিবর্ত্তে আহারের ব্যবস্থা দেখিয়া ভূপেন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। নির্ব্বাক ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে খেলা করিতে ছুটিল।

করুণকে বিদায় দিবার সময় সন্ধ্যা স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "যখন তোমার যা' কিছু দরকার হবে, এই দিদির কাছে এসে চাইতে সঙ্কোচ কোর না; দিদির কাছে তার ছোট ভাইটির যতখানি অধিকার তার একটি কণাও কম তোমার নয়, তা তুমি জেনো। বুঝেছ ?"

"বুঝেছি দিদি।" নিবিড় ভক্তি সম্ভ্রম পরিপূর্ণ চিত্তে করুণ আর একবার সন্ধ্যার চরণতলে মস্তক স্পর্শ করিতেই সন্ধ্যা তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল "জ্ঞানী হও, চরিত্রবান্ হও।"

২

একটি মাত্র সপ্তাহের পরিচয়ের উপর নির্ভর করিয়া

কোন মুহূর্ত্তে যে 'তুমি' শব্দটা 'তুই'তে এবং 'আপনি' শব্দ 'তুমি'তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; সব রকম বাধা সঙ্কোচ দূরত্ব বোধ মন হইতে মুছিয়া গিয়া দু'জনের মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধা পাইবার একটা সহজ দাবী দাঁড়াইয়া গেল, তাহা করুণ বা সন্ধ্যা কেহই অনুভব করিতে পারিল না। কিন্তু এই আত্মবিস্মৃত প্রাণী দুইটিকে অনায়াস পরিবর্ত্তনটা ভাল করিয়া উপলব্ধি করাইবার জন্য একজন অবিলম্বেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তিনি—মহেশ্বরী ঠাকুরঝি।

সন্ধ্যার বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। বিবাহিতা হইয়া আসিয়া সে দেখিয়াছে খুড়তুতো বিধবা ননদ মহেশ্বরীই সংসারের গৃহিণী। সেই বালিকা বয়স হইতে সন্ধ্যা তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত সম্মান দিয়াই আসিয়াছে; কিন্তু কোনদিনই তিনি তাহা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এ বৃহৎ সংসারের গৃহিণীর পদে একদিন যে এই বালিকা বধূটাই প্রতিষ্ঠিতা হইবে, এবং সে অধিকার তাহার ন্যায্য প্রাপ্য, এ কথা মহেশ্বরী একদিনের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই। যেদিন সন্ধ্যার সীমন্ত হইতে সিন্দুর রেখা মুছিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সৌভাগ্যের আলোকটুকু নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গেল, সেদিন মহেশ্বরী বাহিরে হা হুতাশ করিলেও অন্তরে পরম নিঃশঙ্ক হইয়া হরিনামের মালায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

সেদিন স্নানান্তে সিক্ত বস্ত্রেই মহেশ্বরী যখন সন্ধ্যার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সে সবেমাত্র আহ্নিক সারিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। আঁচল খানি তখনও তাহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়াছিল। দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াই তীব্র কণ্ঠে তিনি কহিলেন "বলি বউ, এসব কি ভাল হ'চ্ছে ?"

জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠে সন্ধ্যা কহিল, "কি সব ঠাকুরঝি? ভিজে কাপড়ে কেন, কাপড় ছাড়েন নি' যে!" ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া মহেশ্বরী কহিলেন, "তোমার মত মেমসায়েব তো আমরা নই, বাইরের যে সে যখন তখন এসে ঘর ঢোকে,—অজাত কুজাত নিয়ে তোমার মেলামেশা,—এঘর থেকে বেরিয়ে চান না ক'রলে তো বিধবা মানুষ আমি,—জপ আহ্নিক ক'রতে পারবো না, তাই ভিজে কাপড়েই ব'লতে এলাম। কিন্তু যতই ঢাকাপর্না করনা বউ,—হিঁদুর ঘরের বিধবার আচার এগুলো নয়, এসব খিষ্টানী ধরণ।"

কথার ভাবার্থ এবং তাহার ঝাঁঝটা সন্ধ্যা একসঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাতে বিস্ময়ও সে বেশী অনুভব করে নাই, কারণ করুণের আসা যাওয়াটাকে মহেশ্বরী যে বড় সুদৃষ্টিতে দেখিবেন না এটা সে আগে হইতেই অনুমান করিয়াছিল। আগের মতই মৃদু কণ্ঠে সে উত্তর দিল, "তা'তে কিছু দোষ হয়নি ঠাকুরঝি, ও-ও বামুনের ছেলে, ছোট জাত নয় ও।"

কণ্ঠস্বরে একটু খানি দৃঢ়তা যে ছিল তাহা মহেশ্বরী বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া এই স্পষ্ট কথায় তিনি একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া যাহা খুসী বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে করুণের এবং সন্ধ্যার স্বর্গগত পিতা পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন পুরুষদিগকে উদ্দেশ করিয়া যে সকল বাক্য প্রয়োগ করা হইল, তাহাকে কোন মতেই কৌলীন্য ও বংশমর্য্যাদা জ্ঞাপক বিশেষণ বলা চলে না।

যদি সেই আত্মসম্মানাভিমানী ছেলেটা এসব কথা শুনিতে পাইয়া থাকে, তবে না জানি কত বেশী আঘাত পাইবে ভাবিয়া সন্ধ্যা বড় শঙ্কিত হইল। মাঝখানে একটিবার প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "যা' ব'লবেন আমায় বলুন, পরের ছেলের সম্বন্ধে যা'চ্ছেতাই কেন মুখে আন্‌চেন ?"

ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া মহেশ্বরী এবার যে ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন তাহা একান্তই অকথ্য। সন্ধ্যা উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ভূপেনকে চুপি চুপি কহিয়া দিল, "যা তো, দেখে আয় করুণ ইস্কুলে গেছে নাকি ?"

মায়ের রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া ভূপেন আড়ষ্ট হইয়া একটি পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এই কথায় একছুটে সে চলিয়া গেল; একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া

ভূপেন যে সংবাদ দিল তাহাতে সন্ধ্যা হাঁপ ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইল—যাক্, সন্মানের হানিকর কটু কথাগুলা সে তাহা হইলে শোনে নাই! কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আগাগোড়া চাদর ঢাকা দিয়া করুণ যে বিছানায় পড়িয়া ছিল ভূপেন তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই, তাহার ঘরটা একবার ঘুরিয়া আসিয়া সে সন্ধ্যাকে নিতান্ত ভুল সংবাদই দিয়াছিল।

সন্ধ্যাবেলা ভূপেনের মুখেই সন্ধ্যা সংবাদ পাইল যে করুণ জ্বর হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে; শুনিয়া সন্ধ্যার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। রাত্রিতে সকলের খাওয়া দাওয়ার গোলযোগ মিটিয়া গেলে বৃদ্ধ পুরাতন চাকর রামচরণের কাছে সংবাদ লইয়া সে জানিল যে একটি ছেলে করুণের কাছে বসিয়া আছে, জ্বর এখন তাহার খুব প্রবল। সন্ধ্যা আর স্থির থাকিতে পারিল না, ব্যাকুলস্বরে কহিয়া উঠিল, "রামচরণ, যে ছেলেটা ব'সে আছে তাকে নিজের ঘরে যেতে ব'লগে, আমি একবার ওকে দেখ্‌তে যাব।" দীনদরিদ্রের মাতৃরূপিনী এই বধূটির স্নেহ করুণার পরিচয় পুরাতন ভৃত্য রামচরণের অজ্ঞাত ছিল না, কতদিন তাহারই হাত দিয়া এই করুণাময়ীর কত দান, দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়াছে। এই সন্তানহীন সরল বৃদ্ধের অন্তরে সন্ধ্যা কন্যাস্নেহের অধিকার লাভ করিয়াছিল। রামচরণ উত্তর দিল, "তাই যাও মা, বড্ড ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে তিনি।"

মাথার কাছে বসিয়া সন্ধ্যা যখন করুণের উত্তপ্ত ললাটে হস্তস্পর্শ করিল, তখন করুণ বলিয়া উঠিল, "উঠে যাও হেমদা, কতক্ষণ থেকে ব'সেই আছ যে।"

মুখ নত ক'রিয়া কোমল মৃদুকণ্ঠে সন্ধ্যা কহিল, "আমি এসেচি যে করুণ।" করুণ চমকিয়া চোখ চাহিল। ললাটের উপর হইতে হাতখানি টানিয়া নিজের উত্তপ্ত হাতের মধ্যে লইয়া আগ্রহ ব্যাকুল কণ্ঠে পরম আশ্বাস ভরে কহিল "এসেছ তুমি, দিদি? আঃ!" একটা গভীর শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে চোখদুটি আবার নিমীলিত করিল।

সেই একটুখানি ক্ষুদ্র কথা যে কতখানি নির্ভরতায় পরিপূর্ণ, দিদির একটুখানি স্নেহস্পর্শের জন্য রোগ-ক্লান্ত দেহ এবং মনটা তাহার অনেকক্ষণ হইতেই যে উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা অনুভব করিয়া লইয়া তাহার মুখের উপর নত হইয়া স্নেহসিক্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল, "কি কষ্ট হচ্চে করুণ?"

"বড্ড মাথাটা ধ'রেছিল দিদি, আজ সকাল থেকেই, —তাই তো ইস্কুলে যাওয়া হ'ল না।"

সন্ধ্যা একটু চমকিয়া কহিল, "ইস্কুলে যাস্ নি বুঝি আজ?"

"পারলুম না দিদি।"

সন্ধ্যা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু এসেছিলেন?"

করুণ কহিল, "না দিদি, তিনি হয়তো জানেন না।"

সন্ধ্যা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল, রামচরণকে দিয়া গৃহ-চিকিৎসক অবিনাশ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইল। অবিনাশ বাবু প্রবীণ বিজ্ঞ চিকিৎসক, বহুদিন হইতে এ পরিবারে বাস করিতেছেন। রামচরণের কাছে সংবাদ পাইয়াই তিনি করুণের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা অন্তরালে গেল। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার কহিলেন, "সকাল বেলায় জ্বর হ'য়েচে অথচ আমায় খবরই দেওয়া হয় নি, স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলে এসব অব্যবস্থা ছিল না। যা হোক আমি এখনই ওষুধ দিচ্চি। জ্বরটা বেশী হ'য়েচে, মাথাটা একটু ধুইয়ে দিতে হবে, তা"—

রামচরণ বলিল, "বড় মা এখানেই আছেন, তিনিই দেবেন এখন।" আশ্বস্ত হইয়া ডাক্তার কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, মা থাকতে আর শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হবে না, আমি তবে চল্লুম।"

অবিনাশ বাবু চলিয়া গেলে সন্ধ্যা আবার আসিয়া করুণের মাথার কাছে স্থান গ্রহণ করিল। ঔষধ ও শুশ্রূষার গুণে ক্রমে রাত্রি শেষে জ্বর কমিয়া আসিলে, রামচরণকে সেই কক্ষে শুইবার উপদেশ দিয়া সন্ধ্যা আপনার কক্ষে ফিরিয়া গেল।

৩

জগতে একশ্রেণীর মানুষ আছে যাহারা ক্রুদ্ধ হইলে ন্যায় অন্যায় বিবেক বুদ্ধিটাকে পদদলিত করিয়া ক্রোধকেই সকলের উপরে প্রাধান্য দিয়া বসে। মহেশ্বরী যখন কোনও সূত্রে জানিতে পারিলেন যে সন্ধ্যা গত কল্য গভীর রাত্রিতে করুণের কক্ষ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন সত্যাসত্য বা কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া ঝড়ের বেগে সন্ধ্যার কক্ষে ঢুকিয়া পড়িলেন। ভীষণ ঝঞ্ঝার পূর্ব্বে প্রকৃতির অবস্থা যেমন দেখিতে ভয়ঙ্কর হয় তেমনই একটা ভাবের আভাস তাঁহার চোখে মুখে দেখিতে পাইয়া সন্ধ্যা নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই মহেশ্বরী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "বলি, লজ্জাসরমের মাথা একেবারে খেয়েছো? ঘরের বউ হ'য়ে এসব তোমার কি ব্যাভার তাই বল্‌তে পার? শেষে কি না জেঠামশাইয়ের নামটা ডুবোতে বস্‌লে? ছি, ছি, ছি! গলায় দড়ি জোটেনি তোমার বউ?"

পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক নিশ্চল সন্ধ্যা নতনেত্রে বসিয়া রহিল, একটিও প্রতিবাদ করিল না দেখিয়া সত্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া মহেশ্বরী এবার তাহার নারীত্বের সম্মানকে দুইপায়ে দলিত করিতে করিতে যে রুদ্র অভিনয়ের পালা আরম্ভ করিলেন তাহাতে সন্ধ্যার নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। ঘৃণার তরঙ্গ তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার বোধ হইতে লাগিল এই কক্ষের বিষাক্ত বায়ু যেন এখনই তাহার সংজ্ঞা লোপ করিয়া দিবে।

মহেশ্বরী চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই অতর্কিত আঘাতের বেদনাকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া সন্ধ্যা মূর্চ্ছিতের মত বসিয়া রহিল। মানুষ যে নিতান্ত অকারণেই এত কদর্য্য কুৎসিত কল্পনাকে নিঃসংশয় সত্য রূপে বিশ্বাস করিয়া লইয়া অকুণ্ঠিত উচ্চকণ্ঠে তাহা প্রচার করিতে পারে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া সন্ধ্যা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

সহসা তাহার মনে সাড়া জাগাইল, সংসারের কুটিল চরিত্রে অনভিজ্ঞ শিশুর মত সরল কোমল চিত্ত কিশোর বয়স্ক সেই ছেলেটির কথা। তাহার নিজের চেয়েও করুণের বেদনার পরিমাণ যে কত বেশী, কাল সমস্ত দিনরাত্রি প্রবল জ্বরভোগ করিবার পর দুর্ব্বল দেহ মনের উপরে এ নির্দ্দয় অপমানের আঘাত যে কত বড় কঠিন হইয়া বাজিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে গিয়া সন্ধ্যা ভয়াকুল চিত্তে বেত্রাহতের মত বিবর্ণমুখে খাটের বাজু চাপিয়া ধরিল।

সকল ব্যথাকে ছাপাইয়া সন্ধ্যার যখন মনে পড়িল সেই রোগার্ত্ত অসহায়, পথ্যের জন্য তাহারই পথপানে চাহিয়া এতখানি বেলা প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে, তখন প্রাণপণে আপনাকে শক্ত করিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

পথ্যের বাটি ফিরাইয়া আনিয়া রামচরণ জানাইল করুণ গৃহে নাই। যে শয্যাত্যাগে অক্ষম, তাহার গৃহত্যাগে সন্ধ্যা শুধু শঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল, একটি প্রশ্নও করিল না।

৪

সারাদিনের মধ্যে করুণ গৃহে ফিরিল না, সন্ধ্যাও সমস্ত দিন জলবিন্দু স্পর্শ করিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনার দীপহীন নির্জ্জন কক্ষে ভূমিতলে বক্ষ পাতিয়া সে পড়িয়া ছিল, এমনি সময়ে দ্বারের কাছে মৃদুকণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল—"দিদি।"

চমকিয়া উঠিয়া ছুটিয়া আসিয়া সন্ধ্যা আবেগভরে করুণের মাথাটী বুকে চাপিয়া ধরিতেই, সারাদিনের সঞ্চিত অজস্র অশ্রুর ভার ঝর ঝর করিয়া করুণের মাথার উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ব্যাকুল আগ্রহে দুইহাতে সন্ধ্যার পায়ের ধূলি মাথায় দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে করুণ কহিল, "একটিবার তোমার পায়ের ধুলো নিতে এসেচি দিদি। তোমার কাছে যা আমি পেয়েচি, জীবনে সে আমার সবচেয়ে বড় গৌরবের জিনিস। কিন্তু আমার জন্যেই আজ তোমার মত দেবীর—"

উচ্ছ্বসিত অশ্রুকে রোধ করিতে না পারিয়া সে কাঁদিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

গভীর রাত্রিতে সন্ধ্যা নিশ্চিত ভাবে বুঝিতে পারিল, করুণ ফিরিবে না—আর সে ফিরিবে না। রোগে দুর্ব্বল, অনাহারে ক্ষীণ দেহের সকল কষ্ট যাতনাকে পরাজয় করিয়া, অপমান নিগ্রহের বোঝা বহন করিয়া লইয়া, নিঃশব্দ রাত্রির অন্ধকারে সে আজ চিরদিনের জন্যই বিদায় লইয়া গিয়াছে।

অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে বেদনার পাহাড় গলিয়া নয়নপথে নিঃশব্দে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, তাহাকে বাধা দিবার কোন চেষ্টা না করিয়া নীরবে কক্ষ বাতায়নে মাথা রাখিয়া সন্ধ্যা অচল হইয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিল। সারারাত তাহার বুকের মধ্যে যে প্রবল ঝঞ্ঝা বহিয়াছিল, উহা তাহার অত্যাচার-ক্লান্ত অবসন্ন মনের উপর একটা নির্দ্দয় আঘাতের চিহ্ন গভীর ভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গেল।

শ্রীঅমিয়া দেবী।

কামিনী ও কাঞ্চন

"কামিনী ও কাঞ্চন দুহুঁ সমতুল্য,
মোহ মায়া লাঞ্ছন উজল প্রফুল্ল—
দুহুঁ বহু রংদার
হাতে বাঁধা সংসার"
-হায় হায় জেনে শুনে কেন গুণী ভুল্ল?
শত হোক ক্ষমতায়,
তবু কি এ দুনিয়ায়
কাঞ্চন দিতে পারে কামিনীর মূল্য?

কাঞ্চন হার গেঁথে বুকে রাখি বাইরে,
অন্তর-অন্দরে কামিনীর ঠাঁই রে!
কাঞ্চন চেষ্টায়
বহু মিলে দেশটায়,
কামিনী যে জগতের যেথা সেথা নাইরে!
নিদেশে সে বিধাতার
নিরুপম নিধি তার
চিরদিন বিনা মূলে পাই মোরা পাইরে!

"কামিনী ও কাঞ্চন দুহুঁ পরিত্যাজ্য"
—এ কি কথা শাস্ত্রের? এ কি হবে গ্রাহ্য?
কাঞ্চন ছাড়া নয়
চলিলই দিন কয়,
কামিনী ছেড়ে কি চলে বিধাতার রাজ্য?
ঘরে যার দারা নাই,
বিপদে কে হবে ভাই?
দুঃখে কে সখা হবে করিতে সাহায্য?

কে হইবে স্নেহে মাতা, উপদেশে মন্ত্রী,
রোগ শোক দুখ তাপ যন্ত্রণা হন্ত্রী?
দাসী হয়ে কোন্ জন
সেবিবে গো অনুখন?
সখী হয়ে কে বাজাবে জীবনের তন্ত্রী?
কামিনীর অনুপাম
গুণে বাঁচে ধরাধাম
—এ বিশ্বযন্ত্রের কমিনীই যন্ত্রী।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর।

সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্কিমচন্দ্র

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন কয়েক বৎসর বন্ধ ছিল। গতবৎসর মেদিনীপুরে ইহা পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে; ত্রয়োদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবার চতুর্দ্দশের পালায় দুইটি অধিবেশন হইল। একটী হইল কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমভবনে, যেখানে চতুর্দ্দশ অধিবেশন আদৌ আহুত হইয়াছিল। দ্বিতীয়টি হইল তার সাতদিন পরে নিকটবর্ত্তী নৈহাটী গ্রামে, যিনি সম্মিলন আহ্বান করিয়াছিলেন তাঁহার বাসভবনের নিকটে। শান্তিপ্রিয়, একতাপ্রিয় সজ্জনেরা ইহাতে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি ইহাতে ব্যথিত না হইয়া আনন্দিত হওয়াই উচিত। কারণ দলাদলি এদেশের পতিত পাবন। কেহ যদি সমাজের কাছে কোন অপরাধ করে, তবে তাহাকে লইয়া দলাদলি হইলেই তাহার উদ্ধার হইতে পারে, নতুবা উদ্ধার অসম্ভব। হিন্দুরা একমত হইয়া কোনও কায ভাল করিয়া করিতে পারে না। সেকালের বারোয়ারী, কবিগান, হোলিগান প্রভৃতি গ্রামে দলাদলি না থাকিলে জমিত না। সেই জাতির মধ্যে একালের সাহিত্য-সম্মিলনও দলাদলি না হইলে সফল হইতে পারে না।

দারুণ যুদ্ধের পর সাহিত্যের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। আবশ্যক জিনিষ পত্রের দাম চড়িয়া গিয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যের আশ্রয়, সেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের এখন দুর্দ্দশার সীমা নাই। চাকুরী পাওয়া যায় না; ভবিষ্যতে চাকুরী পাওয়া আরও কঠিন হইবে। ভদ্রলোকদের এখন খেয়ে বাঁচাই দায়। এই জন্য যাঁহারা দেশের গণ্যমান্য প্রভাবশালী লোক তাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শনাদিকে সখের সামগ্রী সাব্যস্ত করিয়া তাহার অনুশীলন আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া, অর্থকরী কারিগরি এবং ব্যবসায় শিক্ষাদানের করে সকলকে সকল প্রকারে উদ্যোগী হইতে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা সাহিত্য বিজ্ঞানাদির মহিমা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে সাহিত্যের পবিত্ররস কেমন চিত্তশুদ্ধি-কর; বিজ্ঞান, দর্শন বুদ্ধিবৃত্তির কেমন বিকাশ-সাধক; এবং ঐতিহাসিক তথ্যজ্ঞান রাষ্ট্রনায়কের এবং সমাজ-নেতার কত দরকারী। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ সকলপ্রকার প্রাণীর পক্ষেই খাদ্য সংগ্রহ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পালকহীন দ্বিপদ প্রাণীর (মানুষের) আর একটি বস্তুও আবশ্যক,—মনুষ্যত্বলাভ করাও বিশেষ আবশ্যক। মনুষ্যত্ব লাভের উপায় সুশিক্ষা। শৈশবে এবং যৌবনে শিক্ষা হয় বিদ্যালয়ে, শিক্ষকের কাছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইলেই শিক্ষার শেষ হয় না. শিক্ষার আরম্ভ হয় মাত্র। প্রকৃত শিক্ষার শেষ নাই, উহা সারা জীবন চালানো দরকার। বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত লোকের সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া সে শিক্ষা আজীবন চালানো কর্ত্তব্য। লোকশিক্ষার জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি। বাঙ্গালায়, মাদ্রাসে ও বোম্বাইয়ে এক সময়েই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তথাপি যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী অন্যান্য প্রদেশের লোকের অপেক্ষা একটু বেশী অগ্রসর হইয়াছে, বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলনই তাহার কারণ। সাহিত্যের অনুশীলনের ফলে অন্যান্য প্রদেশের সাধারণ শিক্ষিত লোকের তুলনায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সকল বিষয়ে একটু বেশী মনঃসংযোগ করিতে, যাহাকে ইংরাজীতে বলে interest নিতে, শিখিয়াছে। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে ক্ষণিক মনঃসংযোগ ভিন্ন সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী যে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না, কোন বিষয়েই যে ভাল করিয়া প্রবিষ্ট হইলে পারে না, তাহার কারণ বাঙ্গালী নিজের সাহিত্য ভাল করিয়া অনুশীলন করেনা; সর্ব্বদাই যেন পায়তারা কষিয়া ক্ষান্ত হয়।

বাঙ্গালায় সাহিত্যক্ষেত্রে দুই জন মহারথ আবির্ভূত

হইয়াছেন; একজন বঙ্কিমচন্দ্র, আর একজন রবীন্দ্রনাথ। সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যের হিসাব করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ কবি; গীতি কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু এই দুই মহারথই কাব্য সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য অশেষ পরিশ্রমও করিয়াছেন; সাহিত্য-ক্ষেত্রে পুরাদস্তুর গুরুগিরি করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের চেলা কৈ? এই দুই জন সাহিত্য গুরুর মধ্যে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে, রবীন্দ্রনাথ এখনও জীবিত আছেন; প্রার্থনা করি তিনি শতায়ু হউন, সহস্রায়ু হউন, চিরায়ু হউন। কিন্তু তিনি এখন বিশ্বভারতীরূপ সর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বযাগে দীক্ষিত; তিনি যে নিজেকে বিভক্ত করিয়া পুনরায় বঙ্গ ভারতীর নেতৃত্ব করিবার জন্য আসরে নামিবেন এরূপ আশা আমরা করিতে পারি না। এবার নৈহাটি সম্মিলনে গিয়াছিলেন, বঙ্কিম বাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। কাব্য ছাড়াও সাহিত্য-গুরুরূপে রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে অনেক দান করিয়াছেন; অনেক দিকের পথে আমাদিগকে অনেকটা দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহারই বা অনুশীলন করেন এখন কয় জনে? কোনও গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করেন কয়জন? এবার দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্ব দূরে থাক, ভারতবর্ষের কথাও সব সময় মনে করিতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের মায়ের সন্তান ত্রিশকোটি নয়, "দ্বিসপ্ত কোটি'ভুজ" বিশিষ্ট "সপ্তকোটি" —এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে সঙ্কীর্ণমনা বলিতে চাও বল। কিন্তু যত দিন না বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত "বঙ্গভারতী"র কর্ম্ম কিছুটা সফল হয়, যতদিন বঙ্গ, বিশ্বভারতীর সামনের বেঞ্চের এককোণে বসিবার একটু যায়গা না করিয়া লইতে পারে, ততদিন এদেশে কতকগুলি সঙ্কীর্ণমনা কর্ম্মীরও প্রয়োজন আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় কাব্যের এবং গল্প উপাখ্যানের অভাব ছিল না। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যে সকল বিষয়ের সকল প্রকার ভাবের বাহন হইতে পারে তাহার পথপ্রদর্শক বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-রচনা সৃষ্টি-লীলা। সেই লীলা-রহস্য ভেদ করা আমাদের অসাধ্য এবং তাহার চেষ্টাও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। উপন্যাস ছাড়া, বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় অন্যকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নানা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে এই সকল প্রবন্ধ আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সকল বিষয়ের প্রবন্ধেরই একটি বিশেষ লক্ষণ, আদর্শের উচ্চতা, (high standard)। তিনি যখন যে কোনও বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, সময় সামগ্রী অনুসারে সেই বিষয় সম্পর্কে যে কিছু উপকরণ পাওয়া যায় তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইয়া, তবে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সকল দিক দিয়া বিষয়টি দেখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রবর্ত্তনের পরে অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল চলিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের সুযোগ অনেক বাড়িয়াছে; সামগ্রী অনেক বেশী সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে আমাদের রচনার আদর্শ উচ্চ হইয়াছে কি? অনেক বলিবেন, এখনকার লেখকদের রচনার আদর্শ, সময় সামগ্রী হিসাবে যতটা উচ্চ হওয়া উচিত তার চেয়েও বেশী উঠিয়াছে; প্রমাণ স্বরূপ দেখাইবেন অনেক গ্রন্থলগ্ন নামজাদা লেখকের লিখিত ভূমিকা। আমরা বলিব, না, এসব ভূমিকা মানি না। কাযে কাযেই দলাদলি না হইয়া যায় না। রচনার নীচ আদর্শের শিকল ছিঁড়িতে চাই বলিয়াই বঙ্কিম-ভবনে, বঙ্গদর্শনের সূতিকা গৃহের ছায়ায় এবার যে দলাদলি হইল তাহাতে আমরা আনন্দিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সেবার দ্বিতীয় বিশেষত্ব নিষ্ঠা। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী এবং কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত করিয়া ১২৭৯ সালে তিনি বঙ্গদর্শন আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে মৃত্যুশয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত

এই ২২ বৎসর কাল তিনি কি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদর্শনে, প্রচারে, এবং স্বতন্ত্র প্রকাশিত গ্রন্থমালার পত্রে পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র একবার ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, "প্রথম চাকরীর চাপ, চাকরীতে মানুষ আধমরা হয়। তার উপর নিজের সখ—কিছু লেখা পড়ার রোগ ছিল। বঙ্গদর্শনের জন্ম কত রাত্রি জাগিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। ঘাড়ে ভূতচাপার মত আমার বিশ্রাম-সুখ-লালায়িত অবসন্ন শরীর মনকে আমার বিরুদ্ধে দিবারাত্র খাটাইয়াছে!" (নারায়ণ, ১৩২১, ৬৩০পৃঃ) এত পরিশ্রম করিয়াও ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মনে করিতেন, ডেপুটীগিরি চাকুরীর দরুণ তিনি ইচ্ছামত সাহিত্য সেবার অবসর পাইতেন না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি তিনি চাকুরী বড় ঘৃণা করিতেন এবং বড় জামাতা রাখালচন্দ্র চাকুরী নেওয়ায় তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ নিষ্ঠা, এরূপ শ্রমশীলতা (অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে) আজকালকার কয়জন সাহিত্যিকে দেখা যায়? অথচ এরূপ নিষ্ঠা না থাকিলে, আদর্শ উচ্চ না হইলে, সাহিত্য-সাধন ব্রত সফল হইতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র ৪০ বৎসর পূর্ব্বে "প্রচারে" লিখিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা।" আমাদের দেশে যে উচ্চ শিক্ষারীতি এখন প্রচলিত আছে, তাহা ইউরোপের পচা উচ্ছিষ্ট বহুদিন পূর্ব্বে নর্দ্দামায় নিক্ষিপ্ত শিক্ষারীতি। ইহার সংশোধন করিয়া উন্নত শিক্ষারীতি প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে ইউরোপ হইতে সদ্‌গুরু আমদানী করা আবশ্যক। কিন্তু সেরূপ গুরু আমদানী করিয়া শিক্ষা সংস্কারের সামর্থ্য এবং প্রবৃত্তি দেশের লোকের আছে বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধ শাস্ত্র পড়াইবার জন্ম ডাক্তার সিলভ্যান লেভিকে আনাইয়াছিলেন বলিয়া এদেশের কেহ কেহ বলিয়াছেন, "হুঃ, এদেশে কি মানুষ নেই যে বিদেশ থেকে লোক আনতে হবে?" পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের এখন যেরূপ শ্রদ্ধার অভাব দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাদের আশ্রয় লইলে যে আমরা বিশেষ উপকৃত হইতে পারিব এমন মনে হয় না। কিন্তু শিক্ষারীতির যাহা অভাব, জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন করিলে তাহা পূরণ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে বঙ্কিমচন্দ্রের মত উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের মত নিষ্ঠা সহকারে জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিলে বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ হইতে পারে। সেই কার্য্যের কিছুটা সহায়তা হইতে পারিবে, এই আশায় এবার একটী স্বতন্ত্র বঙ্কিমী দলের অভ্যুত্থান দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইতি

শ্রীপক্ষধর মিশ্র।

বিদ্যাপতির কাব্য

আমরা আজ যাঁহার কোমলকান্ত মধুর পদাবলী পাঠ করিবার নিমিত্ত সম্মিলিত হইয়াছি, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে বহুদিন হইতে নানা সংশয় বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহা অবিসম্বাদীরূপে সত্য যে তিনিই বাঙ্গালী কবিদিগের মন্ত্রদাতা। যে বিরাট বৈষ্ণব-সাহিত্য এক যুগের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও মধুর করিয়া রাখিয়াছে, তিনিই যে সে সাহিত্য-কুঞ্জবনের বাসন্তী পিক, তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়াই যে বাঙ্গালার গীতি-কাব্য মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে দ্বিধা করিবার কারণ নাই। কমলা, ত্রিযুগা, অমৃতা প্রভৃতির শীতল সলিলে "কৃতসারা" "বিদ্যাগারা" মিথিলায় মহারাজ শিবসিংহের রাজত্ব কালে যে প্রেমের গান ঝঙ্কৃত হইয়া

উঠিয়াছিল, একে একে অনেকগুলি সুদীর্ঘ শতাব্দী অতীত হইয়া গেল, কিন্তু আজিও বাঙ্গালায় সেই সুরই বাজিতেছে; বাঙ্গালীর কবি-রাজ এযুগেও সেই সুরে গান গাহিয়া চৌদিকে এমন সুরের জাল বুনিয়া দিয়াছেন, যে গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য, শক্তি, রীতি ও রাগ স্বদেশের বাহিরেও দূর বিদেশে পর্য্যন্ত পূজার অর্ঘ্য লাভ করিতেছে। বিদেশের যন্ত্রী, করধৃত মুখরা বীণাকে মূক করিয়া বিস্ময়ে কহিতেছেন—"তুমি কেমন করে গান কর হে গুণি! আমি অবাক হ'য়ে শুনি।"

প্রত্যেক দেশেরই সাহিত্যের একটি করিয়া বিশেষ গতি আছে তাহা নানা কারণে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করে। কখনও উহা বন্যার বারিপ্রবাহের ন্যায় প্রবল, উন্মত্ত ঝঞ্ঝার ন্যায় বেগগামী। আবার অন্য যুগে সেই সাহিত্যের গতি ধীর স্থির অচঞ্চল—সে সাহিত্য তখন চন্দ্রকরের ন্যায় শীতল, মলয় পবনের ন্যায় স্নিগ্ধ, চন্দনের ন্যায় সৌরভ সমন্বিত। যুগান্তরে দেখা যায়, মানুষ যখন কোমলতাময়, উচ্চাভিলাষ শূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখ-পরায়ণ ও বীর্য্যহীন, তখন তাহার সাহিত্যেও তাহার সেই মূর্ত্তিই ফুটিয়া উঠিয়া গীতিকাব্যরূপে দেখা দেয়। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় সেই গীতিকাব্য "উচ্চাভিলাষ-শূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখ-পরায়ণ। সে কাব্য-প্রণালী অতিশয় কোমলতা-পূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতি প্রণয়ের শেষ পরিচয়।"

মিথিলায় সেই "অভিনব জয়দেব," মহারাজ শিবসিংহের রাজপণ্ডিত বিদ্যাপতি যে যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে যুগে বাঙ্গালায় ও মিথিলায় জাতীয় মহাশ্মশানের উপর মিনার ও মস্‌জেদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তখন উচ্চাভিলাষ বিদূরিত, জাতীয় গৌরব স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত, মান মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পুনঃ সংস্থাপনের কামনাও কেহ করে না। তখন গৃহে ভোগাসক্তি ও আলস্য এবং বাহিরে ঈর্ষা ও সঙ্কীর্ণতা। তখন দেবায়তন হইতে যে ধূপধূম ঊর্দ্ধে উত্থিত হইত, তাহা নানা স্থানে শৈব ও শাক্তের কলহ বিদ্বেষে অপবিত্র; তখন "বিজয় সেনঃ স বিজয়ী" বিস্মৃত—শিলাসংহতবক্ষ, বারণ হস্তকাণ্ড সদৃশ বাহু লক্ষ্মণ সেনের বিজয় কাহিনী তখন আর বাঙ্গালীকে অগ্নির ন্যায় দীপ্ত করে না—লক্ষ্মণ সেনের কালের ন্যায় সেকালেও বোধ হয় সায়ংবেশ-বিলাসিনীদিগের মঞ্জু মঞ্জীর-ধ্বনি রাজপথে "বন্দ্যাং ত্রিসন্ধ্যাং নভঃ"। তখন কবি ক্ষ্মাপতি শ্রুতিধরো ধোয়ীর "পবনদূত", "শৃঙ্গারোত্তর সৎ-প্রমেয়" রচনায় অদ্বিতীয় কবি গোবর্দ্ধনাচার্য্যের কবিতাবলী, "কেন্দুবিল্ব-সমুদ্রসম্ভব" জয়দেবের—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশং।

গৃহে গৃহে, কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। পাঠক-দিগের নিকট কবি জয়দেবের সানুনয় নিবেদন, যেন সেই সকল শৃঙ্গাররসাত্মক গীতাবলী কাহারও হৃদয়ে "কলিযুগ চরিতং দুরিতং" আনয়ন না করে, তাঁহারই সুরতরঙ্গে তখন ভাসিয়া গিয়াছে। জয়দেবের শব্দে শব্দে সুর, পদে পদে গান—তাঁহার কবিতা যেন মূর্ত্তিমতী রাগিণী। সে রাগিণী ললিতে মধুরে শুধু ভোগের কীর্ত্তনই করিয়াছে। তাঁহার "কুসুম শয়নে" কামের শরশয্যা, তাঁহার "কোকিল কলরব কূজনে" "মনসিজ তন্ত্রবিচার" পরাজিত, তাঁহার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস 'মদন দহনমিব বহতি সদাহং"। তিনি নিজেও বুঝিয়াছিলেন যে সে সকল শৃঙ্গাররসাত্মক বর্ণনা পাঠ করিলে কলিযুগোচিত দুরিত আসিয়া পাঠককে আক্রমণ করিতে পারে, তাই গীতগোবিন্দের সর্গে সর্গে সুযোগ মাত্রেই তাহাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন 'বটে, কিন্তু নর-সমাজ শুধু ভক্তের সমাজ নহে—ভক্তিহীনের সংখ্যাই সে সমাজে অধিক। সুতরাং সেকালের বঙ্গসমাজের উপর এবং নিকটবর্ত্তী বলিয়া মিথিলার উপরও জয়দেবের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ভোগাকাঙ্ক্ষার বিস্তার সাধন করিয়াছিল। সেই যুগের পবনে পলে পলে সঞ্জীবিতপ্রাণ হইয়া বিদ্যাপতিও সে বিপদ হইতে সম্পূর্ণরূপে ত্রাণ পান নাই—ইহা যুগধর্ম্ম। তবুও যে তিনি প্রফুল্ল নলিনীর ন্যায় মনোহর, পূর্ণেন্দু তুল্য স্নিগ্ধ, চন্দনের ন্যায় সুবাসিত, অমৃতের ন্যায় মধুর প্রেম কুসুমের অর্ঘ্যরচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার পরম গৌরবময় বৈশিষ্ট্য বলিয়া বিবেচনা করি। মনে হয়, এই কারণেই তাঁহার লেখনী

আজিও জয়যুক্তই রহিয়াছে। পৃথিবীতে প্রেম যতদিন পুজালাভ করিবে, ততদিন বিদ্যাপতির নামে চন্দনসিক্ত গন্ধপুষ্পের অর্ঘ্য দিতেই হইবে।

আমাদের ললিত শিল্পকলায়, শুধু নয়নমনোহর নহে, বহুজনের বিস্ময়োৎপন্নকারী নিদর্শন কোনার্কের তপনমন্দির বা পুরী ও ভুবনেশ্বরের বিরাট দেবায়তনের দিকে চাহিলে কাহার হৃদয় না হর্ষে ও গর্ব্বে পরিপূর্ণ হয়? কিন্তু তখনই মনে ক্ষোভ হয়—যে আচার্য্য সেই-সকল অনিন্দ্যসুন্দর দেবায়তনগুলির পরিকল্পনা করিয়া প্রাণহীন পাষাণফলকে এত কোমলতা, এত সৌন্দর্য্য, এত ভাব, এত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কেন তিনি সেই সঙ্গে স্থানে স্থানে শ্লীলতা বর্জ্জিত ভাস্কর্য্যের পরিচয় রক্ষা করিয়াছেন? সেই পবিত্র মন্দিরের গর্ভগৃহে যখন প্রবেশ করি, তখন তাহার অন্তরতম কন্দরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিধাতার চরণতলে হৃদয় আপনিই অবনত হইয়া লুটাইয়া পড়ে। বিশেষজ্ঞগণ ও শাস্ত্রজ্ঞগণ হয়ত মন্দির গাত্রের অশ্লীল ভাস্কর্য্যের নানা ব্যাখ্যা করিবেন—কিন্তু আমার ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডহীন ধর্ম্মবিহীন মূর্খের হৃদয় সে সকল ব্যাখ্যায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। যাহা সহজেই সুন্দর, সে হৃদয় শুধু তাহাকেই চায়; পল্লবিত জটিল ব্যাখ্যার দ্বারায় যাহাকে সুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয় তাহাকে সে ধারণা করিতে পারে না—তাহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে বলিলে সে একান্তই বিদ্রোহী হইয়া উঠে—ধর্ম্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের বারণ সে মানে না, আর্টের দোহাইও সে শুনে না। সেই সকল ভাস্কর্য্যকে সে যুগধর্ম্মের প্রভাব বলিয়াই কীর্ত্তন করিতে চাহে। আমার মনে হয়, বিদ্যাপতি সেই যুগ-ধর্ম্মের মনোহর দেবায়তন। তাঁহার অন্তরের অন্তরে যে মহিমময়ী দেবতা বিরাজ করিতেন, তিনি বিশ্বের লক্ষ্মী। ভক্ত হউক বা ভক্তিহীন হউক—যে সেই মন্দিরের গর্ভ-গৃহে প্রবেশ করে তাহারই শির সেই দেবীর চরণতলে সসম্ভ্রমে বিলুণ্ঠিত হয়। বাহিরের পঙ্ক হৃদয়ের মণির দীপ্তিকে মলিন করিতে পারে না।

কামনার উপর ভোগ প্রতিষ্ঠালাভ করে—কিন্তু সেই ভোগ কয়দিনের জন্য? ভোগসুখ কতক্ষণ মানব হৃদয়কে সুখী করিতে পারে? ভোগের যে সুখ তাহা ক্ষণিক—অথচ তাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃখ। জয়দেব সেই ভোগের কবি বলিয়া সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগের কবি নহেন, প্রেমের কবি। কাম হৃদয়কে দগ্ধ করে, প্রেম হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে; কাম অতৃপ্তির বহ্নিজ্বালা, প্রেম পরিতৃপ্তির অমৃতধারা; কাম নূতনকে পুরাতন করে, প্রেম পুরাতনকে নূতন করে; কাম বন্ধন, প্রেম মুক্তি; কাম মৃত্যু, প্রেম জীবন; কামে তাড়না, প্রেমে শান্তি; কামে বিলাস, প্রেমে বিরাগ; কাম আত্মমুখী, প্রেম পরমুখী; কামে আত্ম-তৃপ্তির আশায় আহরণ, প্রেমে আত্মসাফল্যের জন্য বিতরণ; কাম ধ্বংস, প্রেম রচনা; কামে কাঞ্চনও কাচ, প্রেমে কাচও কাঞ্চন; কামে কুবের কাঙ্গাল, প্রেমে ভিখারী বিশ্বপতি। কামে শুধু "চন্দন ভরমে সীমর আলিঙ্গন শেল রহল হিয় কাঁটে।" সে জ্বালায় এবং জ্বলে, তবুও তাহার তৃপ্তি নাই—সে বারণ মানে না, কথা রাখে না, যে দিকে যাইতে নিষেধ কর সে সেই দিকেই ধায়—

"ইন্দিঅ দারুণ জতহি হটিঅ, ততহি ততহি ধাবে।"

আর প্রেম? সে যে তিলে তিলে নূতন হয়—সে পুরাতন হইতে জানে না। তাহার শেষ নাই। সে মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়াও "নয়ন ন তিরপিত ভেল," সে কণ্ঠ শুনিয়া শুনিয়া শুনিয়াও "শ্রুতিপথে পরশ না গেল।" সে প্রিয় নিকটে রহিলেও মনে হয়—

"সপন কি পরতেক কহয় না পারিয়
কিয় নিয়র কিয় দূর।"

তাহার স্পর্শলাভ করিলেও সীতাগত-প্রাণ রামচন্দ্রের ন্যায় বলিতে হয়—"সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা," বলিতে হয়—"সখি হে কি কহব, কিছু নহি ফুরে।"

"প্রীতিক সমহে দোসর নহি আন।
জাহি তুলনা দিঅ অপন পরাণ।"

মনে হয়—

"অচল চলয় জদি, চিত্র কহ বাত।
কমল ফুটয় জদি গিরিবর মাথ॥
দাবানল শিতল হিমগিরি তাপ।
চান্দ জদি বিষধর, সুধাধর সাপ॥"

তবুও "বিপরিত নহ সুজন পিরীত।" সে পরাণ-প্রিয়কে পাইলে মনে হয়—এ রূপ, এ জীবন, এ আমার সর্ব্বস্ব তাহাকেই অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিব—"ধূপ দীপ নৈবেদ করব পিয়া আগে," নয়নের জলে তাহার অভিষেক করিব—"লোচন নীরে করব অভিষেকে।" সে যে দরিদ্রের সোণা, তাহাকে কি ছাড়িতে পারি? "দারিদ হেম জনি, তিল এক ন ছোড়য়"—তাহাকে যে কোথাও রাখিয়া সুখ হয় না, তৃপ্তি হয় না, শঙ্কা যায় না—ওই ভয় যদি হারায়! আমি রঙ্ক, আমি দীনহীন দরিদ্র, কত সাধনায় তাহাকে পাইয়াছি—"নিধন পাওল ধন অনেক জতনে।" সে ধন যদি হারায় তবে যে আমার এই জগৎ মুহূর্ত্তে শূন্য হইয়া যাইবে -

রঁকক রতন হেরাএল, জগতেও সুন ভেল রে"।

তাহাকে হারাইলে "পিয়া বিনা পাঁজর" যে "ঝাঁঝর" হইবে, তাই তাহাকে কোথাও রাখিয়া ভরসা হয় না—

"জিব জঞো জনি নিরধনে নিধি পাত্র।
খনে হেরএ খনে রাখ ঝপাএ।"

সে যে আমার নির্ধনের ধন—প্রাণতুল্য রত্ন। তাহাকে লুকাইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া নিজে একবার দেখি, আবার তখনি লুকাই—ভয়, বুঝিবা আর কেহ কাড়িয়া লইল।

আবার দেখি, আবার লুকাই—অতি যত্নে হৃদয় মধ্যে তাহাকে লুকাইয়া রাখি বুঝিবা সে করচ্যুত হইয়া হারাইয়া গেল! সে শীতল ধারা বুঝি মরু প্রান্তরে পথ হারাইল। "হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতলি নিমিষে নিমিষে হারা।" তাই তাহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারি না। মনে হয় সে যেন কোন্ অপার সাগরের পরপারে, কোন্ অচিন্ দেশে চলিয়া গেল,—আর পাইব না, আর হেরিব না—"দিঠিহুঁক তত দেসাঁতর রে"—সে নয়নের অন্তরাল হইলেই মনে হয় তাহাতে আমাতে বুঝি কত নদ নদী কানন প্রান্তরের ব্যবধান ঘটিল! তাই

"মন কর মনাও ন ছাড়িঅ"
"পরাণ যেথানে রাখিব সেথানে
এমন মন মোর করে।"

ভাবি তাহাকে মন হইতে আর ছাড়িব না; মনের বাহির করিব না—দিন যামিনী শুধু তাহারই ধ্যানে মজিয়া থাকিব—যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহাকে আমার এই তপ্তবক্ষ লগ্ন করিয়া রাখিব—"রাখিঅ হিয় লাএ"। অসীম তখন সসীম হয়, দূর তখন নিকট হয়, প্রিয় যে তখন হৃদি পদ্মাসনে বিরাজ করে।

"জল মধে কমল গগন মধে সুর।
আঁতর চান কুমুদ কত দূর॥
গগগ গরজ মেবা সিখর ময়ুর।
কত জন জানসি নেহ কত দূর॥"

কোথায় সুদূর নীলাম্বরে তপন জ্বলে, আর কোথায় সরোবরে কমল আনন্দে ফুটিয়া উঠে—কোথায় কোন্ গগনে চন্দ্র হাসিলে ধরণীতলে কুমুদ হর্ষে বিকশিত হয়, কোথায় মেঘ বজ্রনির্ঘোষে ডাকিলে গিরিশৃঙ্গে ময়ুর নৃত্য করিতে করিতে তাহাকে আহ্বান করে—"যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্"—প্রেম যে কত দূরগামী কয় জনে তাহা জানে! সে প্রেমের কথা এক মুখে কেমন করিয়া কহিব? সে প্রেম আমার প্রিয়কে যে কত সুন্দর করিয়াছে তাহা ত বলিয়া বুঝাইতে পারিনা—নির্দ্দয় বিধি যে আমাকে লক্ষ মুখ দেন নাই এক মুখ দিয়া কাঙ্গাল করিয়াছেন—

"পিয়াক পিরীতি হম কহই ন পার
লাখ বয়ান বিহি ন দেল হমার।"

সেই প্রেমের কবি বিদ্যাপতি, তিনি ভোগের কবি নহেন।

বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে বলিয়াছেন—"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য,

কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন, চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটী গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটী মুখ্য উদ্দেশ্য।"

সাহিত্য দর্পণে নির্দ্দেশ আছে "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং।" "রস" শব্দ আলঙ্কারিকদিগের পরিভাষা। ইংরাজ সাহিত্যিক ইহাকে sentiment নাম দিয়াছেন। এই রস ভাব হইতে মনে উদ্ভূত হয়। সুতরাং রস পরিণতি, ভাব কারণ অর্থাৎ "conditions of the mind or body which are followed by a corresponding impression on those who behold them."

মানুষের চিত্তবৃত্তিই তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করে। যখন যে বৃত্তি যেরূপ শক্তিলাভ করে, মানুষ তখন সেইরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সকল বেগবতী চিত্তবৃত্তিকে আলঙ্কারিকগণ স্থায়িভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্থায়ী কেন? না নরচিত্তের উপর ইহা যে প্রভাব বিস্তার করে তাহা ক্ষণবিধ্বংসী নহে। স্থায়ী ভাবেরই নামান্তর তাই রস। চিত্তবৃত্তির পূর্ব্ব কথিত রূপ বেগের বর্ণনা করিয়া কবিরা সৌন্দর্য্য সৃজন করিয়া থাকেন। সেই শিব সুন্দর সৃষ্টিই কাব্যের উদ্দেশ্য—উহাই রসোদ্ভাবনা। সে রস এতই মধুর যে উহা ব্রহ্মস্বাদ সহোদর বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে সে কি? সৌন্দর্য্য; অতএব সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক। যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এজন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্য্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না।

"কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনা মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্র-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্র-নৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টি চাতুর্য্যের প্রশংসা কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাব-সঙ্গতগুণবিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাক। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিত হয়।

"যাহা স্বভাবানুসারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ দোষ-সংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন—সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।"

বিদ্যাপতির কাব্য পাঠ করিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। যাঁহারা বলেন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহুবিষয়িণী নহে, তাঁহারা বিস্মৃত হন যে "পূর্ব্বকবিগণ কেবল আপনাদিগকে চিনিতেন। আপনাদিগের নিকটবর্ত্তী যাহা তাহা চিনিতেন; যাহা আভ্যন্তরিক বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ—জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক-তত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূর-সম্বন্ধ-গ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূর-সম্বন্ধ-প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয়

সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব-শক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটী কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।"

জয়দেবের শ্রীরাধিকার সহিত যখন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন বসন্তকাল। তখন মলয়-সমীর ললিত কোমল-লবঙ্গলতাকে আলিঙ্গনে দোলাইয়া দোলাইয়া প্রবাহিত, তখন কোকিলকুল মধুকরের সহিত মিলিত হইয়া কুঞ্জকুটীরকে কূজন-মুখর করিতেছে, তখন বিরহিণী বধূজন উন্মাদ মদন মনোরথের যন্ত্রণায় বিলাপ করিতেছে, অলিকুল তখন বকুলে বকুলে মধু সংগ্রহে নিযুক্ত। কন্দর্প-জ্বর জনিত চিন্তায় সমাকুলা বাসন্তী-কুসুম-সুকুমারাঙ্গী রাধিকা তখন মিলনের আশায় ব্যাকুলা হইয়া কৃষ্ণানুসরণ করিতে করিতে কান্তারে ভ্রমণ করিতেছেন। অদূরে মুগ্ধ হরি নীলকমলশ্রেণীর ন্যায় শ্যামল কোমল অঙ্গ-সৌষ্ঠবে সকলের কামোদ্দীপন পূর্ব্বক ব্রজ-সুন্দরীগণের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। ভক্তজনের চরণে সসম্ভ্রমে প্রণিপাত করিয়া কহিতেছি, এ চিত্র ভোগের —এ চিত্র ইন্দ্রিয়াদিসহ দেহকেই দেখায়, অন্তরকে বাহিরে আনে না। এ চিত্রে প্রকৃতি দেবী রাজ-রাণীর ন্যায় আমাদের সম্মুখে বিরাজ করেন। "নবদল মাল তমাল" মৃগমদ সৌরভে তাঁহার কুঞ্জ-ভবন পরিপূর্ণ করে, "মনসিজ নখরুচি কিংশুক" তাঁহার কাননে কাননে সুষমা ছড়ায়, মহীপতি মদনের দণ্ডস্বরূপ বিকসিত-কুসুম নাগকেশর পাদপশ্রেণী তাঁহারই রাজদণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়। উন্মীলিত চূতাঙ্কুরের মধুগন্ধে লুব্ধ-মধুপ উড়িয়া উড়িয়া প্রকৃতি রাণীর জয়গান গাহে, "ক্রীড়ৎ কোকিল" কল কল কাকলি করিতে করিতে দশদিক মুখর করিয়া তুলে। প্রকৃতির সে মধুর আলেখ্য অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয় সুন্দর—বাতোন্মথিত তটিনী-তরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে"—সে যেন এক একখানি "ত্রিভুবন-বিজয়ী মালা।" কিন্তু মনুষ্যচরিত্র খনিতে যে রত্ন মিলে এখানে তাহার স্থান পাইবে না। এখানে স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল-শরীরে নিকট সম্বন্ধ এরূপভাবে সংস্থাপিত যে তাহার আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"জয়দেবের কবিতা উৎফুল্ল-কমলদলশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছবারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর—বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গ-সঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার—বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা—জয়দেবের গান মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি, বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন-সমীরণের নিঃশ্বাস", "জয়দেব ভোগ—বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।"

বিদ্যাপতির রাধিকাকে যখন আমরা, দেখি তখন "শৈশব যৌবন দরশন ভেল"—কেবল দর্শনমাত্র, শৈশব যাইতেছে যৌবন আসিতেছে। তখন হেমনলিনী কেবল ফুটি ফুটি করিতেছে, ফুটিয়া উঠে নাই; তখন বাসন্তী কৌমুদীর পূর্ব্বরাগ দেখা দিয়াছে, চাঁদ হাসে নাই; তখন গোমুখী হইতে সুর-সরিতের অমল-ধবল-ধারা কেবল ঝরিতে আরম্ভ হইয়াছে, পরিসর পরিগতা ভাগীরথী হয় নাই। তখন শ্রীমতীকে দেখিয়া "কে কহে বালা কে কহে তরুণী।" অপগতপ্রায় শৈশবের সরলতা তখনো তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই, কিন্তু যৌবন-সঙ্গিনী ব্রীড়া ধীরপদে দেখা দিতেছে, তাই ক্ষণে ক্ষণে যে বসন অসংযত হইয়া যাইতেছে, সেদিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য নাই। যখনই লক্ষ্য হইতেছে তখনই সেই ধূল্যবলুণ্ঠিত বসনাঞ্চল তুলিয়া তিনি লজ্জায় দেহাবরণ করিতেছেন—নয়দেহ কেহ দেখিল বুঝি! কখনো বা তাঁহার দৃষ্টি অপাঙ্গে পতিত হইতেছে, কখনো বা সরল-নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। বালিকাসুলভ উচ্চহাস্যে কখনো বা মুক্তাতুল্য দশনরাজি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, পরক্ষণেই তিনি সচকিত হইয়া লজ্জায় বসনে মুখ ঢাকিতেছেন। হরিণশিশু যেমন চঞ্চল-চরণে চলে, কখনো বা তিনি সেইরূপে চলিতেছেন, আবার যখনই মনে হইতেছে

আর ত শৈশব নাই, এখন তিনি কিশোরী, অমনি চরণ মন্দ হইতেছে।

"খনে খন নয়ন কোণ অনুসরই।
খনে খন বসনধূলি তনু ভরই॥
খনে খন দশন ছটাছুট হাস।
খনে খন অধর আগে গহু বাস॥
চউকি চলয়ে খনে খন চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥"

এ আলেখ্য শৈশব ও যৌবনের চিরপরিচিত দ্বন্দ্বের আলেখ্য, তাহা আমরা প্রতিদিন গৃহে গৃহে দেখিতেছি বটে, কিন্তু চিত্রকরের চক্ষে দেখি নাই। ইহা শৈশবের সারল্যের সহিত যৌবনের গাম্ভীর্য্যের প্রথম সম্ভাষণ।

ক্রমে কটির গুরুত্ব নিতম্ব পাইল, নিতম্বের ক্ষীণতা কটি হইল। "প্রকট হাস অব গোপত ভেল।" ক্রমে

"চরণ চপলগতি লোচন পাব
লোচনক ধৈরয পদতলে যাব।"

শৈশব দেখিল কৈশোরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তখন বাধ্য হইয়া "শৈশব ছোড়ল শশিমুখি দেহ"—শৈশবের সকল সেনাও তখন "দলপতি পরাভবে" "চমকি দেল পীঠ।" তখন

জোহে অবয়ব পুরুব সময়
নিচয় বিহু বিকার
সে আবে জাহু তাহু দেখি ঝাপএ।

যে দেহ পূর্ব্বে বিকার শূন্য ছিল, শৈশবের সরলতা যাহাকে আপন গৌরবে ব্যক্ত করিয়া রাখিত, সে দেহ এখন আর না ঢাকিলে চলেনা, প্রকৃতির সে কুসুমটীকে এখন শ্যামপত্রের অন্তরালে লুকায়িত করিবার প্রয়াস আরম্ভ হইল। একটী বদন সরোজে তখন যেন দুইটী খঞ্জন খেলা করিতে লাগিল—দুইটী নয়ন কটাক্ষে কটাক্ষে "লহ এক হোয় লাখে"—যেন লক্ষ নয়ন হইয়া উঠিল। যৌবন সমাগমে নয়নে কটাক্ষ দেখা দিল। কণ্ঠে পিকের কুহুধ্বনি বাজিল, তনুরুচি তুষারের ন্যায় অমল ও সুন্দর হইল। "জত দেখল তত কহহি ন পারিঅ।"

"লোল কপোল ললিত মাল কুণ্ডল
অধর বিম্ব অধ জাই।
ভৌহ ভমর নাসাপুট সুন্দর
সে দেখি কীর লজাই।"

যেন "চাঁদ সার লএ মুখ ঘটনা কর
লোচন চকিত চকোরে।
অমিয় ধোয়ে আঁচরে জনি পোছল
দহ দিস ভেল উজোরে।"

"কামিনি কোনে গঢ়লী" এ কামিনীকে কোন্ বিধি গড়িল রে, কে এমন সুন্দর করিয়া সাজাইল? এ যে "অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল" এ যে "ত্রিভুবন বিজয়ী মালা" "সুধামুখি কে বিহি নিরমিল বালা।" চন্দ্রে কলঙ্ক আছে তাই বুঝি বিধি শুধু হরিণী হীন হিমধামটুক লইয়া এ মুখ নির্ম্মাণ করিল? সুন্দরী অঞ্চল দিয়া মুখ মার্জ্জনা করিল—অমৃত ধুইয়া যেন অঞ্চলে মুছিল, তখনি "দহ দিস ভেল উজোরে।" তাহার রূপে যে আমার লোচনদ্বয় চিরলগ্ন হইয়া রহিল, সে ত আর ফিরিয়া আসিলনা—কেমন করিয়া তবে সে রূপের স্বরূপ আমি বলিব?

কামিনী কোনে গঢ়লী।
রূপ স্বরূপ মোহি কহইতে অসম্ভব
লোচন লাগি রহলী।"

"সহজহি আনন সুন্দর রে" তাহার উপর আবার সুন্দর নয়নে সুন্দর ভ্রূরেখা। তাহাতে

পঙ্কজ মধু পিবি মধুকর
উড়এ পসারএ পাখি।

মধুকর রূপ কৃষ্ণ চক্ষুতারকা বদন কমলের মধুপান করিয়া যেন উড়িবার জন্য নেত্রপক্ষ্ম রূপ পক্ষ প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে—এই বুঝি এখনই উড়িবে। যে শিল্পী কথার সহিত কথা গাঁথিয়া এমন মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন, সার্থক তাঁহার লেখনী, মনোহর তাঁহার কল্পনা, অসাধারণ তাঁহার লিপি কুশলতা। তিনি অনায়াসেই গর্ব্ব করিয়া কহিতে পারেন—

"বাল চন্দ বিজ্জাবই ভাসা—
দুহু নহি লগ্ গই দুজ্জন হাসা।
ও পরমেসর হর সির সোহই,
ঈ নিচ্চয় নাঅর মন মোহই।"

বালচন্দ্র এবং বিদ্যাপতির ভাষা, এ দুইয়ে দুর্জ্জনের হাসি নিন্দা লাগেনা—লাগেনা। বালচন্দ্রের স্থান ত যেখানে সেখানে নয়—"পরমেসর হর সির"—আর বিদ্যাপতির ভাষা? সে ত "নিচ্চয় নাঅর মন" মোহিত করে—দুর্জ্জন ইহাদিগকে স্পর্শ করিবে কিরূপে?

অভিরাম নবযৌবন যেমন শ্রীরাধিকার কনকলতা তুল্য দেহকে দিনে দিনে নবসজ্জায় সজ্জিত করিতে লাগিল, তেমনি শৈশবের রাজ্যেও নিজের পূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহার মনকে আক্রমণ করিল। এই মনস্তত্ত্বের কবিত্বপূর্ণ মনোহর বিশ্লেষণই বিদ্যাপতির গৌরব—ইহাই তাঁহার কবিতার প্রাণ।

বিদ্যাপতির কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই—যিনি ভক্ত তিনিই শুধু তাহা পারিবেন। আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় লইয়া অনেকে আমাদের নানাশাস্ত্র, শাস্ত্রের নানা নির্দ্দেশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকলেই যে সে সকল ব্যাখ্যার মর্ম্ম হৃদয়ে গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারেন তাহা আমি বলি না। ইহাও আমি বলিনা যে সকল সময়েই সেরূপ করিবার প্রয়োজন আছে। কবিতা কবিহৃদয়ের সহজাত উৎস ধারা। কোন কবি প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মানুষকে স্থাপিত করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, আর কেহ বা স্থূল বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া শুধু মনুষ্যের হৃদয়ের প্রতিই দৃষ্টি করেন। তাঁহারা বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখেন মাত্র—পরিত্যাগ করেন না, কারণ পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে। মানুষ প্রাকৃতিক লীলার সহিত একসূত্রে গ্রথিত—তাহার হৃদয়-দর্পণে প্রকৃতিক নানা মূর্ত্তি নানা সময়ে প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাকেও নানা মূর্ত্তি প্রদান করে। যে সম্বন্ধ এত নিত্য তাহাকে কি কেহ ছাড়িতে পারে? আমার হৃদয় যখন রোদন করে, মনে হয় আকাশের মেঘও তখন কাঁদিতেছে—তখনই আমরা আকুল হইয়া বলি—

সখি হে হমর দুখক নহি ওর রে।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর রে!"

আর যেদিন পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির কোমল স্পর্শে হৃদয়ের কুসুম বর্ণে গন্ধে শোভায় সম্পদে ফুটিয়া উঠে, সে দিন মনে হয় দশদিক নির্ব্বন্ধ হইয়াছে—কোথাও এতটুকু কালিও নাই। তখন—

জীবন যৌবন সফল করি মানল
দশদিশ ভেল নিরদন্দা।

গৃহ সেদিন গৃহ হয়, দেহ সেদিন দেহ হয়, জীবন যৌবন সেদিন সফল বলিয়া মনে হয়। সেদিন "পিয়া পরসাদে" সবই "ভেল অনুকূল।"

জা লাগি চানন বিখ তহ ভেল
চাঁদ অনল জা লাগি রে।

যাহার অভাবে চন্দন বিষ, চন্দ্র অনল বর্ষণ করে মিলনের ক্ষণে তাহারই প্রসাদে সকলই মধুর, সকলই স্নিগ্ধ, সকলই আমার তৃপ্তির ও সুখের অনুকূল বলিয়া জ্ঞান হয়। তখন এক কেন, লক্ষ কোকিল ডাকুক্ না, এক কেন, লক্ষ চন্দ্র উদিত হোক না, পাঁচটী কেন লক্ষ বাণ লইয়া অনঙ্গ তাঁহার ফুলধনুতে সংযুক্ত করুন না—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। সকলেই তখন অনুকূল হয়।

সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

মনুষ্য হৃদয় অপার সমুদ্র তুল্য। সেই ভাব সাগরের গূঢ়তলে যে সকল মণি জ্বলে, বহিঃপ্রকৃতির ইঙ্গিত মাত্র লইয়া কোন কোন কবি তাহাদিগকে আহরণ করেন। বিদ্যাপতি সেই শ্রেণীর সার্থক কবি। তাঁহার কাব্য আলোচনাকালে তাই আমরা আধ্যাত্মিকতার অ-সহজ পথে অগ্রসর হইব না।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ, পরে মহামহিমান্বিত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড, ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসেন। নিরঞ্জন তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত নানাদেশ পরিভ্রমণ করেন। প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সহচর লর্ড চার্লস বেরেসফোর্ডের সহিত নিরঞ্জনের পূর্ব্বেই আলাপ হইয়াছিল। প্রিন্স 'সিরাপিস' নামক যে জাহাজে আসিয়াছিলেন তাহা পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে লর্ড বেরেসফোর্ড নিরঞ্জনকে জাহাজের অধ্যক্ষের নামে এই পত্র দেন ;

From

Lord Charles Beresford

With H. R. H. the Prince of Wales.

Government House, Calcutta,

24th December 1875.

My dear Bedford

Will you kindly let somebody show an old friend of mine Mr. Niranjan Mukerjee round the ship and his friends. He is a real good fellow and most kind to us the last time I was in India.

Yours always

Charlie Beresford.

To

Commander Bedford

(Royal Navy)

H. M. S. Serapis.

নিরঞ্জন ও তাঁহার বন্ধুগণকে জাহাজের অধ্যক্ষ অতি সম্মানের সহিত লইয়া গিয়া সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়াছিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রেওয়াধিপতির কোনও কার্য্যে এবং দেশভ্রমণের জন্য নিরঞ্জন কাশ্মীররাজ্যে গমন করেন। এই বৎসর তাঁহার একটি সন্তান কালকবলে পতিত হয়। ইহাতে নিরঞ্জনের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। তাঁহার চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সান্ত্বনাপ্রদান করিয়া যে পত্র লিখেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাণিকতলা

২০শে মার্চ্চ ৭৬।

প্রিয় নিরঞ্জন,

তোমার ১৪ই তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইলম। তোমার এই পারিবারিক দুর্ঘটনায় আমি নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হইলাম। এই আঘাতটা তোমার স্ত্রীর নিশ্চয়ই খুব বেশী লাগিয়াছে। দুর্ভাগ্যবতী নারী! এতগুলি এইরূপ শোক সহ্য করিতে হইল! জীবন মরণ সকলই ভগবানের হাতে এবং তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই, আমাদের সমস্ত সহ্য করিতেই হইবে, এইরূপ চিন্তায় তোমার শোকের কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে, কিন্তু স্নেহময়ী জননীর নিকট এসকল যুক্তি পঁহুছিতে পারে না। তাঁহার ও তোমার সহিত আমার গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি। কাশ্মীরাধিপতি যে তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছেন তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আশা করি মাননীয় হোলকারও সেইরূপ ব্যবহার করিবেন।

ইদানীং আমার শরীর মোটেই ভাল ছিল না, এখন বেশী গরম পড়াতে আরও খারাপ হইয়াছে। তুমি শুনিয়া আনন্দিত হইবে যে বড়লাট বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষরূপে আমাকে ডক্টর-ইন্-ল উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। সুতরাং আমার L. L. D, হইবার যে গুজব রটিয়াছিল তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে, যদিও উপাধিটি অক্সফোর্ড হইতে আসে নাই।

রেওয়াতে ভীলসা তামাকু পাও নাই ইহা আশ্চর্য্যের

বিষয়। ভীল্‌সা ত' রেওয়া হইতে কয়েক মাইল মাত্র দূরে ?

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নিরঞ্জন জয়পুরে বেড়াইতে যান। তিনি বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং যেখানে যাইতেন সেইস্থানের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে ভালবাসিতেন। এই সকল দ্রব্যাদি তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণকে উপহার দিতেন। এই সময়ে লিখিত ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একখানি পত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাণিকতলা
প্রিয় নিরঞ্জন, জানুয়ারী ১৭, ৭৭।

তোমার ১২ই তারিখের পত্র হস্তগত হইয়াছে। জামাগুলি এখনও প্রস্তুত হয় নাই, হইলেই পাঠাইয়া দিব। তোমার দিল্লির পত্র প্রাপ্তিমাত্র উত্তর দিয়াছিলাম, আশা করি তাহা পাইয়াছ।

কাপড় ও খেলানাগুলি পাইয়াছি এবং তোমার নির্দ্দেশমত বিতরণ করিয়াছি। গামছাখানি মেমসাহেব লইয়াছেন, আমাকে কিছুতেই দিবেন না। কাপড়গুলি তাঁহার ভারী পছন্দ হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার প্রণাম জানাইতেছেন।

তোমার টাকার একটি হিসাব পাঠাইতেছি, তাহাতে দেখিবে আমার ৬৯৻১০ পাওনা হইয়াছে। উহার জন্ত তোমার টাকা পাঠাইবার আবশ্যকতা নাই, যদি তুমি আমাকে ৬খানি শ্বেতপ্রস্তরের থালা ও দুই ডজন বাটী কিনিয়া পাঠাইয়া দাও। বেশী বড় সাইজ দরকার নাই—মাঝারী হইলেই চলিবে। এখানে পাঁচ টাকায় একখানা থালা ও দশআনায় একটা বাটী পাওয়া যায়। জয়পুরে নিশ্চয়ই উহার চেয়ে অনেক কম দামে পাওয়া যাইবে। আর একটা জিনিষ দরকার। আগ্রাতে রূপার মত সাদা একপ্রকার ধাতুনির্ম্মিত হুঁকা পাওয়া যায়, তাহাতে কাল কাল ফুল থাকে। তাহাকে কি বলে জানি না, কিন্তু সেগুলি দেখিতে ভারী সুন্দর। তুমি দেখিয়াছ কি? যদি পার তাই দুইটী আমার জন্ত কিনিবে। তুমি বোধ হয় দেখিয়াছ আমাকে 'রাজা বাহাদুর' করিয়াছে। আমি ঐ উপাধিটী কিরূপ ঘৃণা করি। * * *

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

পুঃ তোমার জয়পুরী টাকাগুলি দুই পয়সা বেশী দামে বিক্রয় হইয়াছে। তোমার জামা প্রস্তুত হইলে আমি উহার হিসাব পাঠাইব। কিছুদিন পূর্ব্বে তুমি যে কমলা লেবু চাহিয়াছিলে তাহা এখন পাঠাইব কি?

জয়পুরে অবস্থানকালে একটি মজার ঘটনা হয়। নিরঞ্জন শক্তি-উপাসক ও সাধক ছিলেন। জয়পুরের মহারাজা রামসিংহ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে পূজার ঘরে ডাকাইয়া পাঠাইতেন ও তাঁহার সহিত একত্রে বসিয়া উপাসনা করিতেন। জয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন লাইব্রেরিয়ানের কর্ম্ম করিতেন। তিনি একদিন মহারাজকে বলেন—"নিরঞ্জন কলিকাতার ঠাকুর বাবুদের কুটুম্ব, তাঁহাদের পিরালি দোষ আছে অতএব তাঁহাকে আপনার পূজার ঘরে যাইতে দেওয়া উচিত নহে।" মহারাজ রামসিংহ তাঁহার সভায় সকলের সম্মুখে কান্তিবাবুকে বলেন, "আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা মোগল সম্রাটকে কন্যা দিয়াছিলেন, তাহা হইলে আমার দরবারে কর্ম্ম করা ও আমার ছোঁয়া জল খাওয়া আপনারও উচিত নহে।"

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই নিরঞ্জনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বনামধন্ত রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ নগরীতে দেহত্যাগ করেন। দক্ষিণারঞ্জনকে নিরঞ্জন গুরুর ন্তায় মানিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে নিরঞ্জন প্রাণে বিশেষ আঘাত পান।

জয়পুরে অবস্থানকালে নিরঞ্জনের প্রাচ্য সাহিত্য-বিশারদ এডওয়ার্ড ব্যাকহাউসকি ইষ্টউইক মহোদয়ের সহিত আলাপ পরিচয় হয়। ইষ্টউইক প্রথমে ভারতীয় সৈন্তবিভাগে এবং পরে পররাষ্ট্রবিভাগে কায করেন।

ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তিনি হিন্দী উর্দ্দু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি অল্প বয়সেই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ইংলণ্ডে হেলিবেরী কলেজে হিন্দুস্থানীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মার্কুইস অব সলসবেরী যখন ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ছিলেন তখন ইষ্টউইক তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। তিনি রয়েল সোসাইটীর অন্যতম ফেলো ছিলেন এবং গুলিস্তাঁ, আনোয়ার-ই-সুহেলি, প্রেমসাগর, বাগ ও বহার প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ এবং অন্যান্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তকও আছে। তিনি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইষ্ট উইক 'কৈসারনামা-ই-হিন্দ' নাম দিয়া ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের উপকরণাদি সংগ্রহ মানসে কয়েকবার ভারতবর্ষে আসেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জয়পুরে নিরঞ্জনের 'ভারতবর্ষীয় রাজ দর্পণ' প্রথম খণ্ড উপহার পাইয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যাইতে পারে জানিয়া ইষ্টউইক তাঁহার সঙ্কল্পিত গ্রন্থ সঙ্কলনে সাহায্য করিতে নিরঞ্জনকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। নিরঞ্জন যোধপুরের রাজবংশের একটি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতেছিলেন, সেই ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি তিনি সানন্দে ইষ্ট উইককে প্রদান করেন এবং পান্না, রাটলাম, ইন্দোর প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধেও নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেন। ইষ্টউইকের একখানি পত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বেলভিডিয়ার
১৭ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮১।

মহাশয়,

আপনি জানেন যে 'কৈসারনামা-ই-হিন্দ' এর দ্বিতীয় খণ্ডে (এখন যন্ত্রস্থ) আমি রাঠোরগণের এবং বিশেষ ভাবে মহারাজার পূর্ব্বপুরুষগণের বীরত্বের ইতিহাস প্রদান করিবার উদ্যোগ করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ বিষয়ে আমাকে বহুমূল্য তথ্য এবং সিপাহীযুদ্ধ কালে যোধপুরের সৈন্যগণের বীরত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি পত্র প্রদান করিয়া বাধিত করিয়াছেন। আশা করি আপনার সাহায্যে আমি একটি মূল্যবান ইতিহাস সঙ্কলন করিতে পারিব এবং তাহা পাঠ করিয়া মহারাজ সন্তোষলাভ করিবেন। আমি যাহা করিতেছি তাহা মহারাজার গোচরে আনিলে এবং আমার গ্রন্থ দুই একখণ্ড ক্রয় করিতে অনুরোধ করিলে আমি আপনার নিকট বাধিত হইব।

আপনার বিশ্বস্ত
এডওয়ার্ড বি, ইষ্টউইক।

কেবল ভারতবর্ষে নহে, ব্রহ্মদেশের শেষ রাজা থিবোর রাজত্বকালে নিরঞ্জন ব্রহ্মদেশেও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি রাজা থিবো ও তাঁহার রাণী (বৈমাত্রেয় ভগিনী) সুপিয়ালাত কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। থিবো তাঁহাকে একটি সোণার বাটী উপহার দিয়াছিলেন। এই বাটীটি নিরঞ্জন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার খুল্ল মাতামহীকে (মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননীকে) প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তা স্যর এলফ্রেড লায়্যালের সহিত নিরঞ্জনের এই বিষয়ে কথোপকথন হয়। তখন ব্রহ্মদেশে গোলযোগ বাধিয়াছে। নিরঞ্জন ইহার পূর্ব্বেই রেওয়ার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহার কিছু পরেই ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি পারিবারিক দুর্ঘটনায় নিরঞ্জন ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন। এই বৎসর এপ্রিল মাসে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বরঞ্জনের ৺কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। সর্ব্বরঞ্জন পুলিস বিভাগে কার্য্য করিতেন এবং নিরঞ্জনের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নিরঞ্জনকে লিখেন—

৮ মাণিকতলা, কলিকাতা
১৪ই জুন ৮৮।

প্রিয় নিরঞ্জন,

তোমার ভ্রাতার মৃত্যুতে তোমার যে অপরিমেয় ক্ষতি হইল, তাহা শুনিয়া আমি শোকসন্তপ্ত হইলাম। অবশ্য এই ঘটনা যে ঘটিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল, তথাপি তাহাতে শোকের লাঘব হয় না। আমি তোমাকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

গত শনিবার পারোকজী কুঠীর সর্দ্দার এখানে আসিয়াছিলেন। বিকানীরের মহারাজার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী চাই, সেই বিষয় আমার সহিত পরামর্শ করিতে। তাঁর উদ্দেশ্য আমার অভিপ্রায় কি তাহা জানা, কিন্তু আমি যেন তাহা বুঝিতে পারি নাই এইরূপ ভাব দেখাইলাম। আমি তোমার নাম করিয়াছি। তিনি বলিলেন পরদিন আসিয়া আমার নিকট হইতে তোমার নামে একখানি চিঠি লইয়া যাইবেন, কিন্তু তিনি আর আসেন নাই। তিনি যদি আসেন তাহা হইলে তাঁহার হাতে তোমার নামে একখানি চিঠি দিব, কিন্তু যদি না আসেন তাহা হইলে তোমার নিজের চেষ্টা করা উচিত, কারণ কাযটী তোমার উপযুক্ত। গ্রিফিন তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবেন। রমেন বি-এ পাশ হইয়াছে এবং শীঘ্রই একজন এটর্নীর নিকট আর্টিকেল হইবে।

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

ভ্রাতৃ বিয়োগের কিছুদিন পরেই কাশীধামস্থ বাটীতে চুরী হইয়া নিরঞ্জনের প্রায় তিন সহস্র টাকার ক্ষতি হয়। ইহার অল্পকাল পরেই, অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট নিরঞ্জন তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী মেঘাম্বরী দেবীকে হারান। ইনি মহারাজ স্যর রমানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী এবং হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহাধ্যায়ী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনী ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে নিরঞ্জন অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। বন্ধু রাজেন্দ্রলাল তাঁহাকে লিখেন :—

প্রিন্স অব্ ওয়েলেস্, পরে সপ্তম এডওয়ার্ড

৮ মাণিকতলা, কলিকাতা
৩১শে আগষ্ট ৮৮।

প্রিয় নিরঞ্জন,

প্রেমময় স্বামীর পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ তাহাই তোমার ঘটিয়াছে—তোমার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে—এই মাত্র শুনিলাম। তুমি যে কিরূপ গভীর শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছ তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, এবং এই সময় সান্ত্বনাপ্রদান করিতে যাওয়া যে কতদূর ধৃষ্টতায় কাজ তাহাও জানি। সময়ই কেবলমাত্র এই শোকের উপশম করিতে পারে—কিন্তু যদি বন্ধুগণের সহানুভূতি শোকের কিঞ্চিন্মাত্রও লাঘব করিতে পারে তাহা হইলে জানিবে আমি তোমার দুঃখে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি এবং তোমাকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি। আমার স্ত্রীও তোমাকে তাঁহার সমবেদনা জানাইতেছেন।

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে নিরঞ্জন বন্ধু-

দিন হইতে রাজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। নিরঞ্জন অধিকাংশ সময় বারাণসীতেই থাকিতেন এবং সেখান হইতে রাজেন্দ্রলালের জন্য কিম্বা তাঁহার অনুরোধে এসিয়াটিক সোসাইটীর জন্য দুষ্প্রাপ্য পুঁথী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং নানা দেশের রীতিনীতিও রাজেন্দ্রলাল তাঁহার নিকট অবগত হইতেন। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি পত্রের অংশবিশেষ নিম্নে অনুবাদিত হইল। –

(১)

কলিকাতা, ৪ঠা অক্টোবর, ৬৮

প্রিয় নিরঞ্জন,

* * আমি কিছুদিন হইতে তোমার নিকট হইতে মধুসূদন সরস্বতীর টীকা প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি উহার কি করিলে? অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে। আমার গোপথ ব্রাহ্মণ (ভাষ্যসহিত), প্রাকৃত সর্ব্বস্ব এবং প্রাকৃত সঞ্জীবনীরও প্রয়োজন হইয়াছে। এগুলি পাওয়া যাইতে পারে কি না অনুসন্ধান করিয়া জানাইবে।

ভবদীয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

(২)

৮ মানিকতলা

কলিকাতা [illegible]

প্রিয় নিরঞ্জন,

× × × আমি ব্যালান্টাইনকৃত কপিল সূত্রের সমগ্র অনুবাদ পাইয়াছি, উহা আর পাঠাইতে হইবে না। কিন্তু আমি সাংখ্য ও ন্যায়ের উপর বক্তৃতাগুলি সংগ্রহ করিতে অত্যন্ত অভিলাষী এবং যদি অধ্যাপক মথুরাপ্রসাদ আমাকে তাহা দিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

ভবদীয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

৩

৮ মানিকতলা

জুলাই ১৮, ৮৩

প্রিয় নিরঞ্জন,

বক্তৃতা দুইটীর জন্য অনেক ধন্যবাদ। সেগুলি নিরাপদে পৌঁছিয়াছে। বাবু মথুরাপ্রসাদকে বক্তৃতাগুলির জন্য আমার ধন্যবাদ জানাইবে।

ভবদীয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(৪)

আর্কেডিয়া, দেওঘর, বৈদ্যবাটী

২৪শে অক্টোবর ৮৩

প্রিয় নিরঞ্জন,

উত্তর পশ্চিমে নীচ জাতির মধ্যে এক প্রকার বিবাহ

প্রচলিত আছে তাহাকে 'সেঁতি' বলে। উহা বিধবা বিবাহ কিংবা এক রকমের নিকা। আমি একটি ছড়া জানি, তাহাতে আছে—

সেঁতিকা চন্দন ঘস্ কএ ললুয়া।

তুমি উহার বিষয় কিছু জান কিংবা উহার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া কিছু জানিতে পার কি? আমি উহার সম্বন্ধে সমস্ত জানিতে চাহি। আমি যেভাবে লিখিয়াছি তাহাতে বানান ভুল হইতে পারে কিন্তু শব্দটী শুনিতে ঐরূপ, অন্ততঃ ঐরূপই আমি শুনিয়াছি।

ভবদীয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

(৫)

আর্কেডিয়া, দেওঘর

৩০শে অক্টোবর ৮৭।

প্রিয় নিরঞ্জন,

তোমার ২৭শে তারিখের পত্র হস্তগত হইয়াছে। এইমাত্র যতীন্দ্রের নিকট হইতেও একখানি পত্র পাইলাম। সগাই নামক বিবাহ পদ্ধতির যে বিবরণ দ্বিতীয় বারে পাঠাইয়াছ তাহা প্রথম বারের বিবরণেরই সমর্থন করে। সিন্দুর পরাইবার জন্য যে অন্ধকার ঘরের প্রয়োজন তাহা আমি জানিতাম না—বিবাহের পরেই এইরূপ ঘর প্রার্থনীয়। কিন্তু বিধবার পক্ষে তাহারও প্রয়োজন নাই। এরূপ ঘর অমঙ্গলের সূচনা করে। যাহা হউক আমি আংটী ও জলপাত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বে কখনও কিছু শুনি নাই। কিন্তু তুমি সেঁতির কথা কিছুই বল নাই। ও কথাটী কি তোমাদের দিকে প্রচলিত নাই? তুমি কি এরূপ কোন ছড়া শুন নাই—

সেঁতি কা চন্দন ঘস্ এস্ ললুয়া?

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

(৬)

৮ মাণিকতলা রোড

১১ই মে ৯০।

প্রিয় নিরঞ্জন,

* * এতৎসহিত আমি আমার নির্ব্বাচিত পুস্তকের তালিকা পাঠাইতেছি। তুমি যে তালিকা পাঠাইয়াছিলে তাহার অন্তর্গত পুস্তকগুলি কিছুই নহে এবং তাহা আমার আছে। তোমার তালিকাগুলিও আমি ফেরত পাঠাইয়াছি, সেগুলিতে ১,২,৩, নম্বর দিয়াছি তাহাতে ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ হইবে না। নির্ব্বাচিত বইগুলি কিনিবার জন্য ডাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে আরও টাকা পরে পাঠাইব।

ভবদীয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রাজা শিবো ও তাঁহার রাণী সুশিলাউ
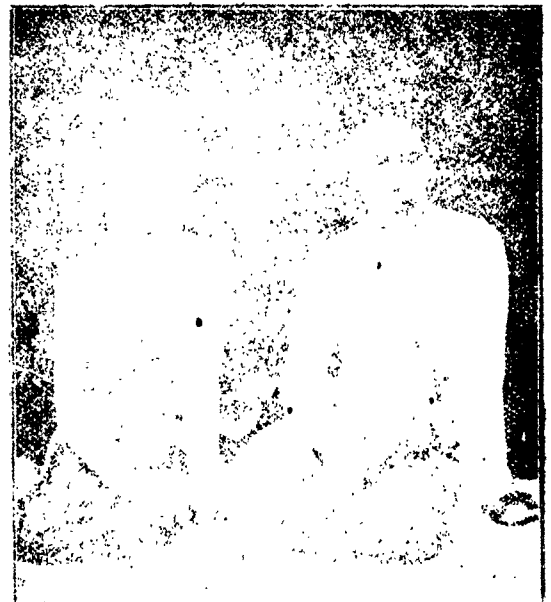
নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (প্রৌঢ় বয়সে)

(৭)

প্রিয় নিরঞ্জন,

মিষ্টার রোনাল্ডসন কি তোমাকে কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন? দুইশত টাকা পাঠাইবার আদেশ হইয়াছে। তুমি ইতিমধ্যে কোনও পুঁথি ক্রয় করিতে পারিয়াছ কি?

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

(৮)
(বাঙ্গলা পত্র)

সপ্রণাম বিজ্ঞাপনমিদম্

সম্প্রতি শৌণককৃত আর্ষানুক্রমণী, ছন্দোঽনুক্রমণী এবং অনুবাকানুক্রমণী এই কয়খানি পুস্তকের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। উক্ত তিনখানি পুস্তক কোন কোন বৃহদ্দেবতা পুস্তকের পরিশেষে সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমার নিকট ৪।৫ খানি বৃহদ্দেবতার পুস্তক আছে। তাহার মধ্য একখানির শেষে উক্ত গ্রন্থগুলি লিখিত হইয়াছে। পুস্তকগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র। যত শীঘ্র পার উহা ক্রয় করিয়া পাঠাইবে। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থ কিনিবার প্রয়োজন নাই।

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র
২—৮—৯০

(৯)

৮ মাণিকতলা
১১ই অগষ্ট, ৯০।

প্রিয় নিরঞ্জন,

তোমার ২রা তারিখের পত্র মেজদাদার শ্রাদ্ধের দিন হস্তগত হইল। আমি এখন কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। যদিও মেজদাদা স্বর্গে গিয়াছেন এবং তাঁহার সমস্তই শেষ হইয়াছে তথাপি আমার মনে ত তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল আছে এবং যতদিন না আমি তাঁহার সহিত মিলিত হই ততদিন থাকিবে। সে দিনের আর বিলম্বও নাই। আমি দিন দিন মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি। তুমি যেরূপ দেখিয়া গিয়াছিলে তাহার চেয়েও আমি এখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। নূতন পুঁথিগুলি পৌছিয়াছে। আমি সেগুলির বিষয় উপেনকে লিখিয়া রাখিতে বলিয়াছি। বাঙ্গালা পত্রে উল্লিখিত পুঁথিগুলি সংগ্রহের জন্য আমি বিশেষ ব্যগ্র। আশা করি তুমি ভাল আছ।

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

(১০)

৮ মাণিকতলা রোড
২৭ অগষ্ট ৯০।

প্রিয় নিরঞ্জন,

তোমার শরীর ভাল নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম

পুত্রপৌত্রাদি পরিবেষ্টিত নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আশা করি এখন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছ। আমি শেষ পত্র লিখিবার সময় যেমন ছিলাম তার চেয়ে ভাল নাই। আমার মনে হইতেছে আমার শেষ দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। তোমার পুঁথিগুলির প্রতীক্ষা করিতেছি। আগামী ছুটীর পূর্ব্বেই সমস্ত হিসাব মিটাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বাঙ্গালা পত্রে উল্লিখিত পুঁথিগুলি যদি না সংগৃহীত হইয়া থাকে তাহা হইলে ক্ষতি নাই। যদি সংগ্রহ হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি লইব।

ভবদীয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

(১১)

৮ মাণিকতলা রোড

৬ই সেপ্টেম্বর ৯০।

প্রিয় নিরঞ্জন,

তোমার ২৮শে তারিখের পত্র এবং পুঁথির প্যাকেট পাইয়াছি। উপেন বেচারীর পায়ে ফোড়া হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছে, চারি দিন আসিতে পারে নাই। সে আসিলেই পুঁথিগুলির বিবরণ পাঠাইব। আমার এখন কোন কায করিবার ক্ষমতা নাই। সময়ে সময়ে এমন অসুখ করে যে গাড়ীতে উঠিতে পারি না। আমার একটি কায আছে। আমার পুত্রবধুর 'সাধের' জন্য একটী বেণারসী সাড়ী কিনিয়া দিতে হইবে। রংটা লাল, কাল কিংবা নীল হইবে না। সবুজ রংটা বেশ। তুমি পছন্দ মত অন্য রঙ্গেরও কিনিতে পার। চিনেপোতী বড় পাতলা। আমি ৫০৲ টাকার বেশী দিতে পারিব না। কাযের আর দশ বার দিন মাত্র বিলম্ব আছে।

ভবদীয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

রাজেন্দ্রলালকে লইয়া কিছুদিন নিরঞ্জন দেওঘরে বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে নিরঞ্জন কম আঘাত পান নাই।

নিরঞ্জন Mesmerismএর চর্চ্চা করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালকে একবার mesmeric চিকিৎসা করিয়া ফল পাইয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব

বাহাদুরকেও একবার ঐরূপ চিকিৎসা করায় তিনি কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য নিরঞ্জন অতিশয় রাজভক্ত ছিলেন। ইংলিশম্যানের জনৈক লেখক লিখিয়াছেন যে লর্ড লরেন্স হইতে প্রত্যেক বড়লাট এবং স্যর উইলিয়ম গ্রে হইতে প্রত্যেক ছোট লাটের সহিত তিনি ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন। নিরঞ্জনের অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিষের সংগ্রহ ছিল, তন্মধ্যে মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের তরবারি অন্যতম। এই তরবারিটি মোগল-সম্রাটগণ সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করেন এবং ইংরাজ-সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হন। দিল্লীর প্রাসাদ লুঠের সময় এই তরবারি একজন ভারতীয় সৈনিকের অধিকারে আসে। উহার কোষও সরু মণিমাণিক্য খচিত ছিল বলি। সেগুলি তিনি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। তরবারির ফলকটি সেই সৈনিকের মৃত্যুর পর নিরঞ্জন সংগ্রহ করেন। মিষ্টার বার্কিল (Reporter on Economic Prodeucts, Government of India) উহা দেখিয়া উহাকে যথার্থই সম্রাট বাবরের তরবারি বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। নিরঞ্জন এই তরবারিটি ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জকে রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিতে অভিলাষী হন এবং বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেলকে এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। লর্ড কারমাইকেল ইংলণ্ডে পত্র লিখেন এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নিরঞ্জন তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে এই পত্র পান :—

Government House
Darjeeling
6th November 1915.

Dear Mr Mukharji

His Excellency has received a communication from London to the effect that the King would be very pleased to receive the sword blade to which you refer. Perhaps you will come and see His Excellency on the subject after he returns to Calcutta. Please remind me about the 17th and. I shall fix a time.

Yours
W. R. Gourlay.

বলা বাহুল্য নিরঞ্জন যথাসময়ে লর্ড কারমাইকেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সাহায্যে সম্রাটের নিকট বাবরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ তরবারিটি প্রেরণ করেন। এই উপহার পাইয়া সম্রাট মহোদয় পরম প্রীত হন এবং তাঁহার সহি করা একখানি ফটোগ্রাফ নিরঞ্জনকে প্রেরণ করেন। সম্রাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী লর্ড ষ্ট্যাম্ফোর্ডহাম এই সম্বন্ধে লর্ড কারমাইকেলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এতৎপ্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য :—

Windsor Castle.
5th May 1916.

Dear Lord Carmichael,

The sword presented to the King Emperor by Babu Niranjan Mookerji arrived safely and has been submitted to His Majesty.

Will you please convey to him the thanks of His Majesty for the interesting weapon, its historical blade having belonged to the illustrious Baber, the founder of the Mogul dynasty.

His Majesty admires the fine jade hilt which together with the scabbard, I understand from you, Babu Niranjan Mookerji has added to the original blade, and is glad that the inscription records the history of the gift.

The King Emperor has much pleasure in sending a photograph to Babu Niran-

jan Mookerji, if you will be kind enough to forward it to him.

Believe me

Yours very sincerely

Stamfordham.

His Excellency

The Lord Carmichael

G. C. I. E. K. C. M. G.

Govenor of Bengal.

লর্ড কারমাইকেলও নিরঞ্জনকে তাঁহার একটি আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি ও একটি ফটোগ্রাফ প্রদান করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা দক্ষিণারঞ্জনের প্রতি নিরঞ্জনের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা 'মানসী ও মর্ম্মবাণীতে' রাজা দক্ষিণারঞ্জনের জীবনচরিত প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি, তখন তিনি যে আমাদিগকে কিরূপ উৎসাহ দিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার উপদেশে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলাম।

নিরঞ্জন দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবনেই প্রতীত হয় তিনি শরীরের প্রতি কিরূপ যত্ন লইতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নিত্যরঞ্জনের ও কনিষ্ঠা কন্যা সুকেশী দেবীর মৃত্যু হয়। সেই অবধি তাঁহার স্বাস্থ্য দ্রুত ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তিনি উৎসাহের অবতার ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ন্যায় সদালাপী ও অমায়িক প্রকৃতির ব্যক্তি আমরা অল্পই দেখিয়াছি।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরঞ্জন অতি উদার মত পোষণ করিতেন। তিনি হিন্দু ছিলেন কিন্তু অতিরক্ষণশীল ছিলেন না। এই জন্য তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যরঞ্জনের, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতমা দৌহিত্রী (জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর কন্যা) ইরাবতী দেবীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সুকেশী দেবীরও ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অন্যতম পুত্র কৃতীন্দ্রের সহিত বিবাহ দেন। কেহ কেহ এরূপ প্রচার করিয়াছিলেন যে অর্থলোভে নিরঞ্জন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশে তাঁহার পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এ সকল কথা একেবারে ভিত্তিহীন।

নিরঞ্জনের স্মৃতিশক্তি অতি প্রখর ছিল। তিনি সেকালের কথা বলিতে বলিতে যেন যৌবনের উৎসাহ ফিরিয়া পাইতেন। আমি কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার কোনও প্রবন্ধে প্রকাশিত করিবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের একখানি চিত্র সংগ্রহ মানসে তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। ফটোখানি লইয়া বাটী ফিরিব এমন সময়ে তিনি ডাকিয়া বলিলেন "জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহের সময় যে ছড়া বাহির হইয়াছিল, পাইয়াছেন কি?" আমি বলিলাম "না।" তিনি বলিলেন "চন্দ্রকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় যে এক মস্ত ছড়া তৈয়ারি করিয়াছিলেন,—

"ভুতির মা বলে দিদি রয়েছিস্ কি সুখে,
বড় হোল মিসি বাবা, * * উঠ্‌ল বুকে,
বিবি বলে সাহেব কি মোর রয়েছে চুপ করে,
জ্ঞানেরে অজ্ঞান করে আনিয়াছে হরে,
এই মার্চে লাল চর্চ্চে মিসির হবে ম্যারেজ,
দেখবে ঘটা বলব কথা লাগবে এসে ক্যারেজ।
ইত্যাদি।

আমি মনে মনে সেই ৮৮ বৎসরের বয়সের বৃদ্ধের মুখে প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বেকার এই ছড়া শুনিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য স্মৃতি শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলাম।

নিরঞ্জনের জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন বলিয়াছি। এক্ষণে নিরঞ্জনের কনিষ্ঠ পুত্র নৃসিংহ রঞ্জন এবং জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র নিখিলরঞ্জন বর্ত্তমান আছেন। ইঁহারা উভয়েই ডেপুটী কলেক্টর।

সমাপ্ত

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

শিকার ও শিকারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হরিণ ব্যাঘ্রাদি জানোয়ার, বর্ষা অন্তে পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া আসে এবং জল শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে আরও দূর সমতল ভূমিতে (plain) চলিয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকের পাহাড় হইতে নামিবার নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। সেই সকল পথকে ঠৌর বা দোয়াল (animal track) বলে। যখন বনে স্বাধীন ভাবে ইহারা চলা ফেরা করে, তখন ঠৌর ছাড়া চলে না। তবে হঠাৎ কোন সময় তাড়া পাইলে, বা কোন কারণে ভীত হইলে, বনের মধ্য দিয়া বিপথে খানিক দূর যাইয়া, পরে পুনঃ রাস্তা ধরে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

আমি হাওদা শিকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যখনই কোনও জানোয়ার আহত বা ভীত হইয়া পালায়, তখন প্রথমতঃ খানিক দূর পর্য্যন্ত দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া, বন ঠেলিয়া যাইয়া, একটু পরেই 'ঠোর' বা দোয়াল ধরিয়া চলিতে থাকে। এই জন্যই হাওদা শিকারে সর্ব্বদাই দেখা যায়, জানোয়ার প্রথমঃ খুব 'হড় মড়' করিয়া বাহির হইয়া, পরে নিঃশব্দে চলিয়া যায়। এই সকল 'ঠোর' সাধারণতঃ বক্রগতি হয়।

পাখীর মত জানোয়ারেরও এক একটা প্রিয় জঙ্গল আছে। ইহারা যখনই পাহাড় হইতে নামে, সে যাহার প্রিয় জঙ্গলে চলিয়া যায়। এমনও দেখা গিয়াছে যে, নিকটে খুব গভীর জঙ্গল থাকিতেও, নিতান্ত ক্ষুদ্র পাতলা জঙ্গলে, প্রতিবৎসরই আসিয়া বাসা করে। সেই সব জঙ্গলে যদি ইহারা মারা পড়ে, তবে কিছুদিন পরেই, আবার ঐ স্থান নূতন জানোয়ার দ্বারা পূরণ হয়। ইহাতে এই মনে হয় কোন একটী নির্দ্দিষ্ট জানোয়ারই সে সেই জঙ্গলে আইসে তাহা নহে। স্বাভাবিক জ্ঞানেই (instinct) ইহারা এইরূপ স্থান নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। ইহারা পাহাড় হইতে ৭।৮ বা ১০ মাইল দূরবর্ত্তী জঙ্গলেও আসিয়া বেশ 'পাকা পোক্ত' হইয়া কিছু দিনের জন্য বাড়ী ঘর করিয়া বসে। আরও একটু মজা এই যে, পাহাড় হইতে সেই জঙ্গলে পৌঁছিতে ও পুনরায় ফিরিতে রাস্তায় যে সব জঙ্গলে ইহারা প্রবাস করে, প্রতিবারই সেই সব স্থানে অযাচিত অতিথি হইয়া আইসে ও ফিরিয়া যায়। তবে কেহ মারা পড়িলে, সে স্বতন্ত্র কথা। পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহারা অনেক সময় শিকারের জন্য নীচে নামিয়া আসে এবং শিকারান্তে পুনঃ পাহাড়ে উঠিয়া যায়। আবার কোন কোন সময় নীচে শিকার করিয়া উহার 'মড়ি' (Kill) উচ্চ পাহাড়ে টানিয়া লইয়া যায়। যে সব স্থানে পাহাড়ের নীচেই সমভূমি আছে, সেই সব স্থানে ইহারা নীচেই 'বসবাস' করে। ঐশ্বরিক বিধানে বাঘ ও হরিণ ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর খাদ্য খাদক সম্বন্ধ থাকিলেও এক জঙ্গলে বাস করিতে ইহারা কিছুমাত্র ভীত হয় না। স্বাভাবিক শক্তিতেই ইহারা আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

সব শ্রেণীর জানোয়ার এক জাতীয় জঙ্গল ভালবাসে না। সাধারণতঃ মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি স্থূলচর্ম্মী জানোয়ার গভীর ও ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ সমাকুল জঙ্গল ভালবাসে। ইহারা গরম সহ্য করিতে পারে না বলিয়া, স্যাঁতসেঁতে ও জলা জায়গা ইহাদের প্রিয়। ইহারা সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর হইবার পূর্ব্বেই, জলে বা কাদায় গড়াগড়ি দেয়। যে স্থানে ইহারা গড়াগড়ি দেয়, সেই স্থানকে 'গারী' বলে। অনেক সময় জলে গা ডুবাইয়া পড়িয়া থাকে। মহিষের এই স্বভাব দেখিয়া কালিদাসের এই শ্লোকাংশ মনে পড়ে—

"গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতম্"।

কাযেই এই শ্রেণীর জানোয়ার, প্রখর রৌদ্রের সময় শিকার করাই সুবিধা। তখন অনেক সময় ইহারা ঘুমাইয়া কাটায়। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা চরিবার জন্য বাহির হইয়া সমস্ত রাত্রি বনে এবং তন্নিকটবর্ত্তী শস্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ইহারা স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। এই জন্য বনের নিকটবর্ত্তী বহু শস্য ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রস্বামী 'টং' (night watch) করিয়া রাত্রে পাহারা দেয়। কোন জন্তুর 'সাড়া' পাইলেই টিন বাজাইয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ক্ষেত্রস্বামীর বাড়ী ক্ষেত্র হইতে দূর হইলে খড় দিয়া মানুষের আকৃতি গড়িয়া চূণ কালী দিয়া চিত্রিত করে ও ছেঁড়া কাপড় পরাইয়া হাতে ধনুক দেয়। এই উপায়ে তাহারা ক্ষেত্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাতে ফল কমই হয়। কারণ প্রথম প্রথম কয়েকদিন জানোয়ারেরা এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইলেও, কিছুদিনেই অভ্যস্ত হইয়া যায়। দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

শূকর প্রভৃতি জানোয়ারও মহিষাদির ন্যায়, স্যাঁত-সেঁতে স্থানে থাকিতে ভালবাসে। তবে ইহারা, ঘন ও পাতলা, উভয় শ্রেণীর জঙ্গলেই বাস করে।

হস্তীর যেপ্রকার 'মস্তি' হয়, (must মদক্ষরণ) মহিষাদি জানোয়ারেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। তখন ইহারা অধিকতর হিংস্র হইয়া উঠে। 'মস্তি' হইলে, ইহারা, বাথানে (পালিত মহিষ রক্ষণের স্থানে) আসিয়া

পোষা মহিষীর সহিত মিশিয়া, সন্তান উৎপাদন করে। কোন কোন সময়, এইরূপ বাথানে একাধিক বন্য মহিষও আসিয়া, উহা অধিকার করে। কখনও ইহারা মহিষ-রক্ষক ও পোষা মহিষের উপরও অত্যাচার করে। এই সময় মহিষরক্ষক অর্থাৎ মহিষালদিগকে অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হয়। কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, আর ইহারা অত্যাচার করে না। সাধারণতঃ ইহাদের 'মস্তি' বা গরম হইবার সময়, কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত। পালিত অধিকাংশ মহিষী. এই সময় ঋতুমতী হয়। পালিত মহিষ দ্বারা ভাল সন্তান উৎপাদন হয় না বলিয়া, মহিষালগণ, পালে বন্য মহিষের আগমন কামনা করে। অনেক সময় এই সমস্ত বন্য মহিষ, বাথানে 'আনাগোনা' করিতে করিতে পালিতপ্রায় হইয়া পড়ে। রক্ষকেরা ইহাদিগকে ধরিতে পারে না, ইহাই মাত্র পার্থক্য। ইহারা সমস্ত রাত্রি, এমন কি অনেক সময় দিনের বেলাও, পালের সঙ্গে বাথানে থাকে। আমরা অনেক সময় মহিষ শিকারের উদ্দেশ্যে বাথানে গিয়া মহিষালদিগকে জঙ্গলী বয়ারের (Bull buffallo) কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা অস্বীকার করে। প্রথমতঃ পুরস্কারের প্রলোভন, পরে ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি নানা উপায়েও অনেকবার অকৃতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু আবার অনেক সময়. দৌরাত্ম্যকারী মহিষ পালে আসিয়া জুটিলে, উহারা স্বেচ্ছায় সংবাদ দেয়। বাথানস্থিত জঙ্গলী মহিষ একটী হত হইলে, দশ পনেরো দিনের মধ্যেই আর একটী আসিয়া, সেই স্থান পূরণ করিয়া লয়। এক এক বাথানে ২।৩ শত, অনেক সময়, ৪।৫ শত পর্য্যন্ত মহিষও থাকে। গ্রামের মধ্যে ইহাদের স্থান সংকুলান হয় না বলিয়া, জঙ্গলের মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাথান করে। মহিষগণ চরিবার সময়, বহুদূর জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যায়। এই জন্যই, বাথানের কোন একটী জঙ্গলী মহিষ হত হইলে, আর একটী আসিয়া, সহজে মিলিত হয়।

পালিত মহিষ দুই শ্রেণীর—কাছর ও বাঙ্গর। কাছরগুলি সাধারণতঃ বিশাল বপুঃ, দীর্ঘশৃঙ্গ ও অনেকটা বন্য প্রকৃতির হয়। বন্য মহিষের সহযোগে এই জাতীয়া মহিষীর 'বাচ্চা' হয়। ইহারা অধিক দুগ্ধবতী হইয়া হইয়া থাকে।

বাঙ্গর জাতীয় মহিষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় ও হ্রস্বশৃঙ্গ হয়। ইহারা নিরীহ স্বভাবের, দুগ্ধও অপেক্ষাকৃত কম দেয়। পালিত মহিষেই ইহাদের সন্তান উৎপাদন করে। জঙ্গলী বয়ার ইহাদের সহিত মেশে না। কাছর ও বাঙ্গরের পৃথক পৃথক বাথান হয়। সাধারণতঃ ইহাদের এক জাতি অন্য জাতির সহিত মেশে না। কিন্তু আবার কখন কখনও কাছরের সহযোগে বাঙ্গরের 'বাচ্চা' হয়। তাহাদিগকে দো-আঁসলা বলে।

এই উভয় শ্রেণীর পালিত মহিষের মধ্যে 'নাথার' (Riding buffallo) নামক এক শ্রেণীর মহিষ আছে। ইহাদের নাকে ছিদ্র করিয়া রজ্জু সহযোগে পিঠে চড়িয়া মহিষালগণ অগ্রান্য মহিষ চরায় এবং সময় সময় হারাণো মহিষও খুঁজিয়া আনে। ঘোড়ার মত ইহাদের পিঠে চড়িয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে যাতায়াত করিতে, এমন কি সময় সময় দৌড়াইয়া যাইতেও মহিষালগণ কষ্ট বোধ করে না। সাধারণতঃ বন্ধ্যা মহিষী নাথার হইয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত বলশালিনী হয়। পালের অন্যান্য মহিষ ইহাদিগকে বড় ভয় করে।

সাধারণতঃ জঙ্গলী মহিষ তিন প্রকার।

১। জঙ্গলী পাল অর্থাৎ অনেকগুলি একদলে থাকে। ইহাদের মধ্যে বয়ার একটী, কদাচিত ২।৩টীও থাকে। অন্যগুলি 'কাকিনী (cow buffallo)। কিন্তু পালের প্রধান একটীই।

২। Solitary bull অর্থাৎ কেটো মহিষ। ইহারা একাই থাকে। কোন পালের সহিত মিশিতে ভালবাসে না। কাযেই এই শ্রেণীর মহিষ অধিকতর হিংস্র হয়। শোনা যায় ইহারা প্রথমতঃ পালেই থাকে, পরে পালের প্রধানের সঙ্গে ঝগড়ায় পরাস্ত হইয়া তাড়িত হইলে, স্বভাব বদলাইয়া এরূপ হয়।

৩। 'খুট অরণ'—ইহারা প্রথমতঃ পোষাই থাকে, পরে কোন কারণে পাল হইতে দুই একটী ছুটিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলে বহু চেষ্টাতেও মহিষালগণ যদি ইহাদিগকে ধরিতে

না পারে, তবে কালক্রমে ইহারা বন্যভাবাপন্ন হইয়া পড়ে এবং জঙ্গলী মহিষের সহযোগে সন্তান উৎপাদন করিয়া, এক বৃহৎ দলের সৃষ্টি করে। কোন কোন সময় এক দলে ৩০।৪০টাও থাকে। কিন্তু প্রকৃত জঙ্গলী মহিষ অপেক্ষা, ইহারা অধিকতর ধূর্ত্ত হয়।

মহিষাদি জন্তুর ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। হাওয়া শিকার ব্যতীত, অন্য কোন উপায়ে মহিষ শিকারের সময় সিগারেট বা তামাক খাওয়া ঠিক নহে। অত্যন্ত সতর্ক হইয়া ইহাদিগকে শিকার করিতে হয়। একটু 'টু' শব্দ বা গন্ধ পাইলেই, দূর হইতেই চম্পট দেয়। একবার পালাইতে আরম্ভ করিলে, বহুদূর না গিয়া আর বড় থামে না। ইহাতে অনেক সময় ইহারা বৃহৎ জঙ্গল হইতে পালাইয়া, পাতলা ও ছোট জঙ্গলে যেস্থানে ইহাদের গা ঢাকে না, এমন স্থানেও আশ্রয় লয়। কিন্তু সাধারণতঃ গভীর ও গাছড়া জঙ্গলের দিকেই যাইতে চেষ্টা করে। আবার কোন কোন সময় গন্ধ পাইলে মাথা উঁচু করিয়া, শুঁকিতে শুঁকিতে, আস্তে আস্তে সেই দিকে আইসে। যদি হঠাৎ সেই সময় শিকারীকে দেখিতে পায়, তবে বিনা কারণেই আক্রমণ করে। ইহাদের Charge বড় ভীষণ। যাহাকে ধরে তাহার প্রাণান্ত না করিয়া ছাড়ে না। বাঘের তাড়ায় রক্ষা পাইলেও ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন।

খুব বৃহৎ ও শক্ত চামড়ার জানোয়ার বলিয়া, ইহাদিগকে Chargeএর মুখে ফিরানো খুব মুস্কিল। বহু হাঁটা শিকারী, যাঁহারা Big bore rifle ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে আরও বিপদ। Big bore rifle হইলে ১০ কি ১২ bore এবং High velocity express rifle হইলে 577 কিংবা নং ১০ Nitro paradox ইহাদের ব্রহ্মাস্ত্র।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

ব্যর্থ

কি কহিতে কি যে কহি, তাই
ভেবে মোর চোখে আসে জল,
আপনারে ছলিতে সদাই
নিশিদিন প্রয়াস কেবল!
মরমের শোণিত লেখায়
কত কথা ফুটিবারে চায়,
নয়নের সলিল ধারায়
কত ব্যথা ঝরে অবিরল!
কে হাসিল, কে ফিরাল আঁখি,
তারি তরে দিছে ছবি আঁকি,
গানে গানে ব্যথা চেপে রাখি,
হাসি দিয়ে ঢাকি আঁখিজল।

কি গাহিতে কি যে গাহি, তাই
শুনে মোর গুমরে পরাণ,
যে রাগিণী বাঁধিবারে চাই,
কেঁপে কেঁপে থেমে যায় তান।
মনে হয় বুঝি কোথা কার
বাজে নাই হৃদয় মাঝার
মরমের কাহিনী আমার,
সুরহীন বেদনার গান;
রচি তাই ছলনার রাশি,
মুখ চেয়ে দিছে কাঁদা হাসি,
ক্ষণিকের ভালবাসাবাসি,
প্রাণহীন মান অভিমান।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

মুক্তিনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হিমালয় ভ্রমণকারী-সুলভ পথভ্রান্তি, দীর্ঘতম যোগী-দর্শন, সুখাদ্য এবং পেয় প্রাপ্তির বর্ণনা করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেও, ভ্রমণকারী-সুলভ অপর একটী বিষয়ের বর্ণনা করিবার সুযোগ অদ্য উপস্থিত হইল। চুরি কি বঞ্চনার চিত্র অঙ্কিত করিতে না পারিলে বোধ হয় কোনও ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। তাই দেখিতে পাই, নাটোরাধিপ এলাহাবাদে বাট্‌পাড়ের হাতে পড়িয়াছিলেন, রায় বাহাদুর জলধর সেনের হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গী ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কুরীয়ার ব্যাগসহ টাকা অপহৃত হইয়াছিল, এবং জুতাচোর বাঙ্গালী সাধুর সহিত তাঁহাদের লালসাঙ্গায় দেখা হইয়াছিল। "নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন" প্রবন্ধের লেখক ব্রহ্মচারীজীর "আদাবস্তেব" চোরের সহিত সাক্ষাৎ ; নেপালে গমন কালে অপরের দ্রব্যাপহারীর সহিত সাক্ষাৎ এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে ব্রহ্মচারীজীর নিজের জামাটাই (শতগ্রন্থি বিশিষ্ট কি না লেখা নাই) অপর বাঙ্গালী সাধু "পর দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত চুরি কি বঞ্চনার কোনও চিত্র অঙ্কিত করিবার সুযোগ না ঘটাতে আমি একটু ক্ষুণ্ণ ছিলাম। কাঠমণ্ডু সহরে অবস্থান কালে এক বিগ্রহের অলঙ্কার চুরি সন্দেহে মঠবাসী তরুরিব সহিষ্ণু বৈষ্ণবের দল, উন্মাদ রোগগ্রস্ত এক নেপালীকে নিরতিশয় যন্ত্রণা দিয়াছিল। কেহ ইহার প্রতিবাদ করিলে মঠধারী প্রধান বৈষ্ণব উত্তর দিয়াছিলেন, "বাবু তোমার এত মায়া হইয়া থাকে জিনিষগুলি তুমি দিলেই পার।"—ইহা নিরীহ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার—চুরির চিত্র নহে।

খান্‌চোকে ব্রহ্মচারীজীর গেলাস্‌টী অপহৃত হইয়াছিল অথবা ভারিয়া ভুল ক্রমেই ফেলিয়া আসিয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না।

অদ্য একটী চুরির চিত্র অঙ্কনের সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আমি বড়ই প্রসন্ন হইলাম।

কুস্মা বাজারে এক বৃক্ষতলে ভারিয়া, গাইড্‌ ও আমি বসিয়া আছি, ব্রহ্মচারীজী স্নানজন্য অনতিদূরবর্ত্তী ঝরণায় গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারীজী অতিদ্রুত বেগে আসিয়া জানাইলেন, ঝরণার নিকট তাঁহার কৌপীন রাখিয়া তিনি একটু অন্তরালে শৌচে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখেন কৌপীনটা কে চুরি করিয়া নিয়াছে।

ব্রহ্মচারীজীর বর্ণনা-ভঙ্গীতে দশরথের সভায় বিশ্বামিত্রের রাক্ষস কর্ত্তৃক যজ্ঞভঙ্গ বর্ণনার ছবি আমার মনে পড়িল। আমার যুগপৎ দুঃখ ও হাস্যের উদ্রেক হইল। দুঃখের কারণ, গতকল্য পবনদেব ভদ্রলোকের লেঙ্গোটাখানা গণ্ডকীকে উপহার দিয়াছেন, অদ্য যদি কৌপীন অপহৃত হয় ভদ্রলোক অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িবেন। হাস্যের কারণ প্রথমতঃ ব্রহ্মচারীজীর বর্ণনাভঙ্গী, দ্বিতীয়তঃ এরূপ বস্ত্রেরও চোর জোটে!

ব্রহ্মচারীজী আমাকে "অকুস্থলে" যাইয়া "তদন্তভার গ্রহণ" করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বহুদিন অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি—স্বয়ং চোরের অনুসন্ধান করি না, সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইলাম। তদন্তকারীর অভাব হইল না। মুখিয়ার অনুপস্থিতিতে তৎস্থলাভিষিক্ত তাহার অষ্টাদশ বয়স্কপুত্র বীরবল, জিৎবাহাদুর এবং বাজারের কতকগুলি নিকর্ম্মা বালক ও যুবক, ব্রহ্মচারীজীর সহিত ঝরণার দিকে গেল। প্রায় পনের মিনিট পরে ব্রহ্মচারীজী ব্যতীত অপর সকলে ফিরিয়া আসিল এবং বীরবল সংবাদ দিল, সে তাহার বুদ্ধি-কৌশলে চোরের নিকট হইতে কৌপীন উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে।

স্নানান্তে ব্রহ্মচারীজী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আমরাও

স্নান করিয়া আসিলাম এবং আহার ও বিশ্রাম অন্তে অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় সময় কুস্মা ত্যাগ করিলাম।

এখান হইতে আমরা অপ্রশস্ত মালভূমি দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের ডানদিকে গণ্ডকী, বামে অপর একটা নদী। উভয় নদীর পরপার হইতেই উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত অতি উচ্চ ধূসর বর্ণের পর্ব্বত-শ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী।

উভয় নদীর সঙ্গমস্থল মধুবেণী নামক স্থানে আমরা ৩ ঘটিকার সময় উপস্থিত হইলাম। আমাদের বামপার্শ্বের নদীটী মধুবেণীর নিকট পশ্চিমবাহিনী হইয়া গণ্ডকীর সহিত মিলিতা হইয়াছে, এই সঙ্গমস্থলে বৈষ্ণবদের একটী মঠ স্থাপিত। মঠে বিশেষ কিছু কারুকার্য্য নাই। স্থানের নৈসর্গিক শোভা বড়ই সুন্দর।

আমাদের সঙ্গে কোন খাদ্য দ্রব্য নাই। এখানে কোনও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করাও অসম্ভব। কুস্মা হইতে মধুবেণী পর্য্যন্ত কোন লোকালয় নাই। নদীর পরপারে উচ্চ পর্ব্বতে লোকালয় আছে, কিন্তু তাহা অনেক দূরে। আমরা মঠে অতিথি হইলাম। ব্রহ্মচারীজী আলাপে জানিতে পারিলেন মঠাধ্যক্ষ ও তিনি এক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

চাউলের গুঁড়াতে প্রস্তুত তৈলপক্ক লুচি রাত্রে আহার করিলাম। খাদ্যটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, তৃপ্তিদায়ক হইল না।

৮ই এপ্রিল ১৯২২—গত রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছে, আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। মঠধারী আমাদিগকে অদ্য তাঁহার মঠে অবস্থান জন্য অনুরোধ করিলেন, আমরা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। অদ্য একাদশী; এখানে অবস্থান করিলে আগামী কল্য পারণ না করিয়া যাওয়া যাইবে না, কিন্তু গত রাত্রের খাদ্যের অবস্থা দৃষ্টে এখানে অবস্থান সুবিধাজনক মনে করিলাম না। প্রাতঃকাল ৬-৩৫ মিঃ সময় আমরা মধুবেণী ত্যাগ করিলাম।

নদী উত্তীর্ণ হইয়া অনেকটা "চড়াই" করিবার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পথিপার্শ্বস্থ এক শিব মন্দিরে আমরা আশ্রয় লইলাম।

বৃষ্টিশেষে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা ১২—১০ মিঃ সময় আমরা বাচ্ছা নামক গ্রামের উত্তর প্রান্তে এক পার্ব্বত্য নদীর অবতরণ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

নদী আমাদের বহু নিম্নে। নদীর একতীরস্থ উচ্চ পর্ব্বত হইতে অপর তীরস্থ উচ্চ পর্ব্বতে যাইবার জন্য কয়েকখণ্ড কাষ্ঠ অসংবদ্ধভাবে রাখা হইয়াছে। এই অদ্ভুত সেতু পার হওয়াও এক বিপজ্জনক ব্যাপার। নদী উত্তীর্ণ হইয়া আমরা দক্ষিণতীরে আসিলাম এবং বহু নিম্নে অবতরণ করিলাম। নদীজলে স্নান করিয়া অনেক ক্ষণ এই নির্জ্জন স্থানে অতিবাহিত করিলাম এবং পরে বাছা গ্রামের দিকে যাত্রা করিলাম।

বাছাগ্রামে পথিপার্শ্বে কোন লোকালয় নাই। বাম দিকের এক পর্ব্বতে অনেকটা উচ্চে উঠিয়া আমরা বস্তিতে পৌছিলাম। আমরা আশ্রয় জন্য বস্তির প্রথম বাড়ীতেই প্রবেশ করিলাম। তখন বেলা দুই ঘটিকা। গৃহস্বামী তাঁহার বাড়ীতে স্থানাভাব জ্ঞাপন করিলেন এবং অনেক উচ্চে গ্রামের প্রধান ব্যক্তির বাড়ী দেখাইয়া দিলেন।

আমরা গ্রামের প্রধান ব্যক্তির বাড়ী আসিলাম। ইনি ধনী এবং সম্ভ্রান্ত লোক। গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকও ইঁহার বাড়ীতে একখানা স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থান করেন। আমরা শিক্ষকের গৃহে বিশ্রাম জন্য উপবেশন করিলাম।

গৃহস্বামী আমার সঙ্গে থাকা রাজাদেশ দুইখানি পাঠ করিলেন এবং লোক পাঠাইয়া গ্রামের "জিম্মোয়াল"কে ডাকাইয়া আনিলেন। মুখিয়া, জিম্মোয়াল, ইহারা রাজ-কর্ম্মচারী। জিম্মোয়াল অপেক্ষা মুখিয়া সম্ভ্রান্ত। ইহাদের কার্য্যপ্রণালী যতদূর জানিতে পারিলাম তাহাতে বুঝিলাম ইহারা রাজস্ব বিভাগীয় কর্ম্মচারী। প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজ সরকারে জমা দেওয়া ইহাদের কার্য্য। সাধারণের যে কোন কার্য্য—যেমন, নদীতে পুল দেওয়া কি বাঁধ বাঁধা, পর্ব্বতের ধ্বস পড়িয়া পথ বন্ধ হইলে পথ পরিষ্কার করা ইত্যাদিও ইহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য মুখিয়া কিংবা

জিম্বোয়াল রাজকোষ হইতে কোনও বৃত্তি পায় না,জায়গীর ভোগ করিয়া থাকে। প্রজাদের নিকট হইতেও মুখিয়া ও জিম্বোয়ালের একটা প্রাপ্তি আছে। সাধারণ প্রজা মুখিয়া এবং জিম্বোয়ালের ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, এবং শস্য কর্ত্তন করিবে, তজ্জন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ কোন অর্থ পাইবে না। কেবল যে ব্যক্তি যেদিন মুখিয়া কিংবা জিম্বোয়ালের ক্ষেত্রে কার্য্য করিবে, সেই দিন মুখিয়া কিংবা জিম্বোয়াল সেই ব্যক্তিকে খাইতে দিবে। সাধারণ কার্য্যে মুখিয়াল কিংবা জিম্বোয়ালের আদেশে প্রজাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে তজ্জন্য কোনই প্রাপ্তি নাই।

জিম্বোয়াল আসিয়া পৌঁছিলে গৃহস্বামী তাহাকে আমাদের পরিচয় দিলেন। গাইড এবং ভারিয়াও আসিয়া পৌঁছিলে, আমরা এই বাড়ী ত্যাগ করিলাম এবং গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে পথিপার্শ্বে অন্য এক বাড়ীতে পৌঁছিলাম।

জিম্বোয়াল আমাদিগকে এই নূতন আশ্রয়ে আনিয়া আমাদের রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিল এবং আগামী কল্য অতি প্রত্যূষে আসিবে অঙ্গীকার করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। এই বাড়ীতে একখানা অতিরিক্ত গৃহ ছিল, সেইখানা পরিস্কৃত হইয়া আমাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। রাত্রে ব্রহ্মচারীণী ও আমি কুমড়া সিদ্ধ খাইয়া একাদশী রক্ষা করিলাম। গাইড ও ভারিয়া গৃহকর্ত্রীর অতিথি হইল।

৯ই এপ্রিল ১৯২২—অতি প্রত্যূষে জিম্বোয়াল চাউল, গোলআলু, ঘৃত, দুগ্ধ, কাষ্ঠ প্রভৃতি সহ উপস্থিত হইল। এ সমস্ত জিনিষ গ্রামবাসীদের প্রদত্ত উপহার, কোন মূল্য দিতে হইল না—আমরা গ্রামের অতিথি।

স্নান ও পারণ অন্তে বেলা ১০-৩০ মিঃ সময় বাছা গ্রাম ত্যাগ করিলাম। অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিঃ সময় আমরা শ্বেতীবেণী নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। বাছাগ্রামের পর কিছুদূর দক্ষিণ দিকে গমনান্তর গণ্ডকী পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া শ্বেতীবেণী আসিয়াছে। এখানে পূর্ব্বদিক হইতে একটী নদী গণ্ডকীতে আসিয়া পড়িয়াছে। এখান হইতে আবার গণ্ডকী দক্ষিণ বাহিনী। দুই নদীর সঙ্গম স্থলে পর্ব্বতের পাদদেশে একখানা দোকান ঘর। আমরা দোকানের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

দোকান হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিলাম। দোকানদার প্রদত্ত জল আনিবার মৃৎ কলসীটী জিৎ বাহাদুর ভগ্ন করাতে উহার মূল্য দিতে হইল নেপালী দশ আনা—আমাদের দেশের পাঁচ আনা। দোকানদার অনতিদূরবর্ত্তী এক গৃহস্থের বাড়ী হইতে একটী পিত্তল কলসী আনিয়া আমাদের ব্যবহারার্থ দিল।

দোকানদার তাহার পাওনা বুঝিয়া লইয়া দোকান বন্ধ করিল এবং রাত্রির জন্য বাড়ী চলিয়া গেল। চারি জন অপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিকে দোকানের বারান্দায় রাখিয়া যাইতে তাহার মনে কোন সন্দেহের উদয় হইল না।

১০ই এপ্রিল ১৯২২—অতি প্রত্যূষে (চারি ঘটিকায়) গাত্রোত্থান করিলাম। অদ্য পুনরায় একটু অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। ছয় ঘটিকায় শ্বেতীবেণী ত্যাগ করিলাম।

কিছুদূর আসিয়া আমরা গণ্ডকীর কূল ত্যাগ করিয়া এক পর্ব্বত "চড়াই" আরম্ভ করিলাম। এই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে পর্ব্বতের দক্ষিণ পাদদেশে গণ্ডকীর তীরেই পুনরায় আসিতে হইবে। গণ্ডকী এই বিশাল পর্ব্বত শ্রেণী ভেদ করিতে না পারিয়া অনেক দূরদেশ পর্য্যটন করিয়া পর্ব্বতের দক্ষিণ পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছে। পর্ব্বতটী অতি উচ্চ, কিন্তু দুরারোহ নহে। বেলা ১১ টার সময় আমরা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে গণ্ডকীকে কবির ভাষায় একটী যজ্ঞোপবীতের ন্যায় দেখায়। গণ্ডকীর অপর তীরস্থ রাণীঘাট, অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া তান্ সিন্ যাইবার পথ এবং চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্য অতি সুন্দর। আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ শৈলশ্রেণী এখন আর প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দণ্ডায়মান নাই—এখন আমাদের দৃষ্টি অব্যাহত।

আমরা "উৎরাই" আরম্ভ করিলাম। কাকবেণী হইতে আমরা গণ্ডকীর নিম্ন প্রবাহের দিকেই অগ্রসর হইতেছিলাম, কিন্তু এই স্থান হইতে আমরা নদীর উৎপত্তি

স্থলের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বেলা একটার সময় রাণীঘাটের অপর পারে নদীর পশ্চিম কূলে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থলে নদী অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং গভীর। নদীতে কোনও সেতু নাই।

পূর্ব্বেই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম রাণীঘাটে নদী "ডোঙ্গাসে টপ্‌কানে হোগা।" সর্ব্বপ্রকার লৌহ সম্পর্ক শূন্য শূন্যীকৃতগর্ভ (dug out) এক বৃক্ষ কাণ্ডের নৌকা ঘাটে বাঁধা দেখিলাম। যাঁহারা "তালের ডোঙ্গা" কিংবা ত্রিপুরা জেলার এক গাছের "খোদা" নৌকা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ডোঙ্গার বর্ণনা অনাবশ্যক। যাঁহারা দেখেন নাই তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টাও অনাবশ্যক।

ডোঙ্গায় নদী পার হইয়া রাণীঘাটে আসিলাম; এবং এক নেওয়ার প্রদত্ত দধিচিড়া সদাব্রত গ্রহণ করিলাম। স্নান ও ভোজন অন্তে নদীকূলে বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম।

রাণীঘাট স্থানটি বড়ই মনোরম। গণ্ডকী পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া রাণীঘাটের অল্প দক্ষিণে উত্তর বাহিনী হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে; এবং পুনরায় পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে। রাণীঘাট গণ্ডকীর পূর্ব্ব তীরে। আমাদের গন্তব্য পথ রাণীঘাট হইতে দক্ষিণ দিকে, গণ্ডকীর সহিত নেপাল রাজ্যে এইখানেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

গণ্ডকীর কূলে একখানা অতি সুন্দর কাঠের বাংলো (Bungalow) এবং সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রয় জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত লম্বা ঘরগুলি রাণীঘাটের নদীতীরের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। টান্‌সিনের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর খড়্গা সমসের জঙ্গ বাহাদুর এই কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিলাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সংস্কার অভাবে উহা এখন প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা যে পথে বেণী (যেস্থানে ঝোলা পার হইতে হইয়াছে) হইতে রাণীঘাট আসিয়াছি পূর্ব্বে এ পথ বিদ্যমান ছিল না, খড়্গা সমসের জঙ্গ বাহাদুরের সময় এই পথ নির্ম্মিত হইয়াছে শুনিলাম।

অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকায় গাইড্ ও ভারিয়া আসিয়া পৌছিল, এবং আমরা বাজারে এক ঘরে আশ্রয় লইলাম।

১১ ই এপ্রিল ১৯২২ অদ্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। অনবধানতা বশতঃ ঘড়ীর কাঁচ ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, ঘড়ীটী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল।

১২ ই এপ্রিল ১৯২২ জিৎবাহাদুর, বীরবল ও আমি এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী রিরি নামক স্থানে বাসুদেব দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। পথে আমাদিগকে সময় সময় বৃষ্টি ভোগ করিতে হইয়াছিল। যখন রিরিতে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা অনুমান দ্বিতীয় প্রহর।

এখানে গ[illegible]ত্তর হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিতে পূর্ব্বে প্রবাহিতা। [illegible] একটি নদী একটি অনুচ্চ খণ্ড পর্ব্বতের উত্তর [illegible]দমূলে প্রবাহিতা হইয়া পশ্চিম দিক্ হইতে গণ্ডকীতে পতিত হইতেছে। এই অনুচ্চ পর্ব্বতের অধিত্যকায় বাসুদেবের মন্দির। মন্দির মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত অতিসুন্দর বাসুদেব মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান। চক্ষু কর্ণ বৌদ্ধ শিল্পের অনুকরণে নির্ম্মিত নহে, আমাদের বঙ্গদেশের "নাককাটা" বাসুদেবের ন্যায় নাসিকা শূন্যও নহে।

বিগ্রহ দর্শনান্তর দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিলাম। মন্দিরকে মধ্যবিন্দু করিয়া চতুর্দ্দিকে দ্বিতল যাত্রিনিবাস। দুইজন সাধু এখানে "কল্পবাস" করিয়া আছেন। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন তীর্থস্থানে বাস, কল্পবাস।

পাল্‌পা রাজ্য গোর্খারাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে এই দেব মন্দির পাল্‌পারাজের সম্পত্তি ছিল। তখন দেবার্চ্চনা ও অতিথি সেবার জন্য পাল্‌পা রাজসরকার হইতে বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। বর্ত্তমান গোর্খা রাজসরকার হইতে বাসুদেবের অর্চ্চনা ও অতিথি সেবার জন্য কোন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট নাই শুনিলাম।

বিগ্রহ ও দেবালয় দর্শনান্তর সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে আমরা রাণীঘাটে প্রত্যাগমন করিলাম। অপরাহ্ণে আকাশ নির্ম্মল ছিল। বৃষ্টি স্নাত পর্ব্বত ও বৃক্ষের উপর অপরাহ্ণ সৌরকিরণ

পতিত হইয়া চতুর্দ্দিক বড়ই সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল।

১৩ ই এপ্রিল ১৯২২—অতি প্রত্যুষে যাত্রা করিলাম, ঘড়ী অকর্ম্মণ্য হওয়ায় সময় নিরূপণ করিতে পারিলাম না।

সাধারণতঃ ভারিয়া সর্ব্বাগ্রে যাত্রা করিত। বীরবল কোন দিন ভারিয়ার সঙ্গেই যাত্রা করিত, কোনও দিন কিছু বিলম্বে যাত্রা করিত। ব্রহ্মচারীজী ও আমি সর্ব্বশেষে যাত্রা করিতাম। অদ্য জিৎবাহাদুর ও আমি এক সঙ্গে যাত্রা করিলাম।

আমাদের আশ্রয় স্থানের নিম্নে একটি স্বল্পতোয়া অপ্রশস্ত নদী। এই নদী উত্তীর্ণ হইয়া আবার চড়াই। নদী গর্ভে শিলা খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শীতের ভয়ে জিৎবাহাদুর শিলা খণ্ডের উপর দিয়া নদী পার হইতেছিল, আমি তাহার অতি নিকটে পশ্চাতে ছিলাম। কোন পিচ্ছিল শিলাখণ্ডের উপর পদক্ষেপ করাতেই হউক অথবা কোন শিলাখণ্ড পদতল হইতে অপসৃত হওয়াতেই হউক জিৎবাহাদুর নিম্নমুখ হইয়া পড়িয়া গেল। আমি তাহার কপালের উপর হইতে ডোকোর দড়ী খুলিয়া দিয়া পীঠের উপর হইতে ডোকোটি সরাইয়া লইলাম। জিৎবাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ভগবানের কৃপায় তাহার মুখ কি হাঁটুতে আঘাত লাগে নাই, দুই হস্তে পাথরের উপর ভর দিয়া নিজ দেহ ভার রক্ষা করিয়াছিল। আমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছি, ডোকোটী কোথায় রাখিয়াছি সে বিষয়ে আমার কোন ধারণাই ছিল না—আমি যেন আবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিয়াছিলাম। এখন দেখিতে পাইলাম ডোকোটি একখণ্ড শিলার উপর রাখিয়াছি—জলে ভিজে নাই। মোজা জুতা সুদ্ধ আমি জলের মধ্যে দাড়াইয়া আছি। আমার হাতের লাঠী গাছা কখন যে জলে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে তাহাও টের পাই নাই। জিৎ বাহাদুর পুনরায় ডোকো পীঠে করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমি নগ্ন পদে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বেলা অনুমান নয় ঘটিকার সময় আমরা তান্‌সিন্ পর্ব্বতের পাদমূলে আসিয়া পৌছিলাম। রক্‌সৌলের পথে যেমন শীষাগিরি, ত্রিহুম্যান গঞ্জের পথে তেমন তান্‌সিনের পর্ব্বত নেপালরাজ্যের দ্বার অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

অনেক দূর "চড়াই"এর পর পশ্চিম দিকে ধবলা গিরি পুনরায় দৃষ্ট হইল। অদ্যই হিমালয় দর্শন শেষ। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ধবল গিরির শোভা দর্শন করিলাম।

অদ্য চড়ক সংক্রান্তি, দলে দলে স্ত্রী পুরুষ উৎসবের জন্য গিরির দিকে যাইতেছে। অদ্য সকলেই দেবোদ্দেশে দুগ্ধ, ফল প্রভৃতি লইয়া যাইতেছে। কাহারও হাতে হাঁস মুরগী, কবুতর দেখিলাম না।

ক্রমে আমরা পর্ব্বতের অধিত্যকায় এক বাজারে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে পূর্ব্ব দিকে তান্‌সিনে পৌছিলাম; এবং নারায়ণথান্ দেবালয়ে মধ্যাহ্নের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

কাঠমণ্ডু সহর হইতে তান্‌সিন্ একষট্টি ক্রোশ পশ্চিমে। তান্‌সিনের পাঁচ মাইল পশ্চিমে পাল্‌পা এবং সাতক্রোশ দক্ষিণে বটৌল।

পূর্ব্বে তান্‌সিন্, পাল্‌পা এবং বটৌল তিনটি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। কালে পাল্‌পারাজ বটৌলরাজকে পরাজিত করিয়া বটৌল রাজ্য নিজরাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন। বটৌল রাজ্য পাল্‌পা রাজ্যভুক্ত হইলেও বটৌলরাজ বিজেতাকে নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিয়া স্বাধীন ভাবে আপন রাজ্য শাসন করিতেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাণী রাজেন্দ্রলক্ষ্মীর অভিভাবিকায় কালে পাল্‌পা গোর্খা শাসিত নেপাল রাজ্য ভুক্ত হয়, এবং পাল্‌পারাজ বটৌলে পলায়ন করেন। তাঁহাকে সুবিচারের আশ্বাস দিয়া কাঠমণ্ডু সহরে আসিতে অনুরোধ করা হয়, এবং সেখানে আসিলে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। নিহত পাল্‌পা রাজের এক কন্যাকে পৃথ্বীনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুর শাহ বিবাহ করেন।

পাল্‌পা রাজের হত্যার পর গোর্খাগণ বটৌল অধিকার করে এবং ১৮০৪ হইতে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকারে রাখে। যে সমস্ত কারণে ১৮১৪ খ্রীঃঅব্দে ইংরেজের সহিত নেপাল রাজের যুদ্ধ

হয়, গোর্খা কর্ত্তৃক বটৌল অধিকার তন্মধ্যে একটি কারণ।

বটৌল পুনরায় নেপাল রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে শাসন সৌকর্য্যার্থ পাল্পা ও তানসিন্ প্রদেশ এবং বটৌল একটি প্রদেশে পরিণত করা হইয়াছে। পাল্পা এবং তান্সিন্ একজন গবর্ণরের অধীন। এই শাসন কর্ত্তার পদ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ, সাধারণতঃ প্রধান মন্ত্রীর কোন নিকট আত্মীয়কেই এই পদে নিযুক্ত করা হয়। বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর ভ্রাতা। তান্সিনে গবর্ণরের অধীনে তিন রেজিমেণ্ট—দেড় হাজার সৈন্য আছে। তানসিনে একটি টাক্শাল আছে, সেখানে তাম্র মুদ্রা প্রস্তুত হয়।

তান্সিন্ একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। গুরুঙ্গদের প্রস্তুত কার্পাস বস্ত্র এখানে যথেষ্ট বিক্রীত হয়। কাঁচের আলমারীতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষিত একখানা মিঠাইএর দোকান বাজারে দেখিলাম। অপর এক দোকানে গন্ধতৈল, এসেন্স, রবারের পুতুল বিক্রয়ার্থ সজ্জিত দেখিলাম। তান্সিন্ বাজারে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসোপকরণ কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হইল।

নেপাল রাজ্য হইতে মানস সরোবর যাইবার পথ তান্সিন্ হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে। তানসিন হইতে একষট্টি ক্রোশ পশ্চিমে ভেরী গঙ্গার অপর তীরে জাজরকোট নামে নেপালের অধীন একটি ক্ষুদ্ররাজ্য অবস্থিত। এখান হইতে এক পথ কমাউন গিয়াছে অপর পথ জুম্লা হইয়া ইয়ারী বা তক্লাখার গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া তিব্বতে গিয়াছে। এই শেষোক্ত পথেই খেচরনাথ, গৌরীকুণ্ড, রাক্ষসতাল, মানস সরোবর কৈলাস প্রভৃতি তীর্থ স্থানে যাওয়া যায়। যে সমস্ত ভারতবর্ষীয় তীর্থযাত্রী নেপাল হইতে এই সমস্ত তীর্থে যাইয়া থাকে, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে লীপু গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া আলমোড়ার পথে অথবা মানা গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া বদ্রীনারায়ণের পথে ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে।

প্রাচীন চৌবিশিয়ার জের অন্তর্গত পশ্চিম নয়াকোট রাজ্যের একটু ঐতিহাসিক বিশেষত্ব আছে। বর্ত্তমানে পশ্চিম নয়াকোট পাল্পা প্রদেশের একটি জেলা।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া বর্ত্তমান গোর্খারাজবংশের আদিপুরুষ রাজপুতনা হইতে প্রথমে এই পশ্চিম নয়াকোটে আগমন করেন। কালে বংশবৃদ্ধি সহকারে অধস্তন পুরুষীয়েরা লামজুঙ্গ-এর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে পূর্ব্ব দিকে গোর্খা প্রদেশে উপনীত হইয়া রাজ্য স্থাপন করে।

আহার ও বিশ্রাম অন্তে আমরা তান্সিন্ ত্যাগ করিলাম এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ধুম্রী নামক এক স্থানে উপস্থিত হইলাম। একটী স্বল্পতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে একখণ্ড সমতল ভূমির উপর একটী দ্বিতল ধর্ম্মশালা। স্থানটী অতি নির্জ্জন। দূরে উচ্চ পর্ব্বতে লোকালয়। বীরবল লোকালয় হইতে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিল। আহারান্তে ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করিলাম।

১৪ই এপ্রিল ১৯২২—অতি প্রত্যূষে ধুম্রী হইতে যাত্রা করিলাম। অদ্যই আমাদের পার্ব্বত্য পথ পর্য্যটনের শেষ দিন। এখান হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী বটৌলে পৌছিয়া আমাদিগকে রাত্রিবাস করিতে হইবে।

আজ বৈশাখের প্রথম দিন। পথিপার্শ্বে পাহাড়িয়াগণ লতা পাতা দ্বারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের জন্য জল সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে। যদিও পার্ব্বত্য পথে প্রায়ই জলাভাব হয় না, তবু এই এক মাস তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে জলদান পুণ্য কার্য্য বিবেচনায় গ্রাম-বাসিগণ "জলছত্র" স্থাপনা করিতেছে। গ্রামবাসিগণের আর্থিক অবস্থা অনুসারে কোথাও বা মৃৎ, তাম অথবা পিত্তল পাত্রে পানীয় জল এবং একটী বাঁশের ছোট চোঙ্গা পানপাত্ররূপে রক্ষিত হইতেছে। পানপাত্র দ্বারা জলাধার হইতে জল গ্রহণ করিয়া অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল পান করিতে হয়। পানপাত্র ওষ্ঠসংলগ্ন করিয়া ইহাকে উচ্ছিষ্ট করা হয় না। কোন কোন জলছত্রে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একজন লোক থাকে এবং সেইই

পথিককে জলদান করে, কোথাও বা কোন লোক থাকে না, পথিক নিজেই জল গ্রহণ করিয়া পান করে।

প্রথম জলছত্রের নিকট উপস্থিত হইলে, এক বৃদ্ধা আমাকে ও ব্রহ্মচারীজীকে জলপান করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মচারীজী (আমিও) অস্নাত। তিনি অস্নাত অবস্থায় পান কি আহার করেন না; তাহার পর আবার বৃদ্ধা অজ্ঞাত "জাতি গোত্র প্রবর চরণ কুল ধর্ম্মা।" আমিই বৃদ্ধার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।

প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় আমরা ডোডান নামক এক বাজারে আসিয়া পৌছিলাম। বাজারের নিম্নে একটী নদী, স্নান সনাপন করিয়া এক দোকান হইতে দধি চিড়া ক্রয় করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিলাম।

ডোডান ত্যাগ করিয়া অপরাহ্ণে আমরা পর্ব্বতের দক্ষিণ প্রান্তে উপনীত হইলাম। এখান হইতে সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হইল। দক্ষিণে ও পূর্ব্বে দিগন্তবিস্তৃত সমতল ভূমি, উচ্চ পর্ব্বত হইতে সমুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

যে স্থান হইতে অবরোহণ করিয়া বটৌল সহরে আসিতে হইবে সেই স্থানে একটী পুলিশের আড্ডা আছে। চতুর্দ্দিক অনাবৃত একখানা ক্ষুদ্র গৃহে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া একটী ক্ষুদ্র পিত্তলের কামান স্থাপিত।

পর্ব্বত যেন এখানে সহসা শেষ হইয়া গেল। সমতল ভূমি হইতে যেন একটী প্রাচীর গাঁথিয়া উঠান হইয়াছে। অবতরণের পথেরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া ক্রমশঃ নিম্ন হইতে হইতে পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে এবং অবশেষে সমতলে পৌছিয়াছে।

পর্ব্বতের পাদদেশেই বটৌল সহর। বটৌল সমতলে অবস্থিত। পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম বিস্তৃত সমতল, দিগ্-বলয়-রেখা স্পর্শ করিয়াছে। কেবল উত্তর দিকে মাত্র অত্যুচ্চ ধূসর বর্ণের পর্ব্বত শ্রেণীর পর পর্ব্বত শ্রেণী।

বটৌলে পৌছিয়া বীরবল আশ্রয় অনুসন্ধানে গেল। আমি বাজার দেখিতে গেলাম। বাজারের অধিকাংশ দোকানদারই হিন্দুস্থানী এবং নেপাল তেরাইএর অধিবাসী। দুই চারিজন পাহাড়িয়াও আছে।

বটৌল, সমতল ও উচ্চ পর্ব্বতবাসীদের বাণিজ্যের সন্ধি কেন্দ্র। কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত সহরটী প্রায় লোকশূন্য অবস্থায় থাকে, শীতাবসানে পুনরায় লোক সমাগম হয়।

বাজারে দুইজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, একজন ডাক্তার অপরজন কম্পাউণ্ডার। নেপাল দরবারের দাতব্য চিকিৎসালয়ে উভয়ে কার্য্য করেন, উভয়েই বাখরগঞ্জ জেলার অধিবাসী।

স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বীরবল আমাদের আশ্রয় স্থল ঠিক করিয়াছিল। ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার বাবুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, আমরা রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

১৫ই এপ্রিল ১৯২২—আমরা হিমালয় রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমতল রাজ্যের তোরণ দেশে উপস্থিত হইয়াছি। গিরিশৃঙ্গে সেই অলস গতিতে উড্ডীয়মান কুঝটিকা এবং সূর্য্যোদয়ের পর রবিকিরণে তাহার বিলুপ্তি, স্থির ও শান্ত উষায় ধীরে ধীরে পর্ব্বত শৃঙ্গ অতিক্রমণ, পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বাস্থ্যপ্রদ আনন্দবর্দ্ধন মৃদুমন্দ মারুত হিল্লোলে স্বর্গীয় সুখভোগ আমার অদৃষ্টে আর রহিল না। হিমালয়ের সেই বিরাট্ গম্ভীর ভাব, সেই মহান্ বিবিক্তের মধ্যে লীন হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীকরণ আর অনুভূত হইবে না, এই চিন্তা আমার মনে এক যন্ত্রণা উপস্থিত করিল।

অতিপ্রত্যূষে বটৌল ত্যাগ করিলাম। বটৌল হইতে বেতাহি পর্য্যন্ত পথ নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়া। দিবা-ভাগেও নাকি এই পথে ডাকাতি হয়। সওদাগরেরা অনেকে দলবদ্ধ হইয়া গমনাগমন করে এবং আত্মরক্ষার্থ সশস্ত্র তুরুক সোয়ার নিযুক্ত করে।

বটৌল-এর রাজকর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্ত একজন কনেষ্টবল নিযুক্ত করিলেন। দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা জঙ্গলের পরপারে বেতাহি গ্রামে পৌছিলাম এবং এখান হইতে কনেষ্টবলকে বিদায় দিলাম।

১নং পরোয়ানা

গতকল্য এবং অদ্য—ইহার মধ্যে কত বৈষম্য। অদ্য সূর্য্যতেজ অসহনীয়, বাতাস যেন আগুনের শিখা বহন করিয়া আনিতেছে, রৌদ্রতেজে ভূমি উত্তপ্ত! মাসাধিক কাল হিমালয় ভ্রমণে যে কষ্ট হয় নাই, অদ্য কয়েক ঘণ্টায় তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভব করিলাম।

বেতাহি বাজারে বিশ্রাম জন্য এক ঘরে প্রবেশ করিলাম। গৃহমধ্যে একজন নেপালী মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রোগীর পায়ের নিকট বসিয়া তাহার স্ত্রী পদসেবা করিতেছে, একটী স্তনন্ধয় শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতেছে।

স্ত্রীলোকটী বলিল তাহাদের বাড়ী পোখ্‌রার নিকট কোনও পর্ব্বতে। স্বামী "ক্ষেতিপাতি" (কৃষি কার্য্য) করিবার জন্য "নীচে" (সমতলে) আসিয়াছিল, সে শিশু সহ পর্ব্বতের বাড়ীতে ছিল। দুই বৎসর স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া তাহার অন্বেষণে আসিয়া তাহাকে এই অবস্থায় পাইয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছে।

রোগীর জীবনের কোনই আশা নাই। আমাকে দেখিয়া সে তাহার নাড়ী পরীক্ষার জন্য শিরা বহুল কঙ্কালসার দক্ষিণ হস্তখানি কষ্টে উত্তোলন করিল। আমি নাড়ী পরীক্ষার ভাণ করিয়া বলিলাম, কোন ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু এ দুর্ব্বলদেহে তাহার পক্ষে বাড়ী যাওয়া কষ্ট-সাধ্য। স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল, তাহাদের সঙ্গে গরুর গাড়ী আছে তাহাতেই বটোল পৌঁছিয়া তথা হইতে "কাণ্ডি" (ডুলি) তে বাড়ী লইয়া যাইবে।

মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, স্ত্রীলোকটীকে তাহার স্বামীর জীবন সম্বন্ধে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া আমি বাহিরে আসিলাম এবং বেতাহি বাজার ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

বেতাহির পরবর্ত্তী এক বাজারে স্নান এবং দধি চিড়া জলযোগান্তে সন্ধ্যার সময় বেথরী সহরে পৌঁছিলাম। বেথরী একটী জেলার সদর আফিস। এখানেও রাজ-কর্ম্মচারীদের সৌজন্যে আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হইলাম।

রৌদ্রে ও গরমে বীরবল এবং জিৎ বাহাদুর অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। জিৎ বাহাদুরের সাহায্য জন্য অপর একজন ভারিয়ার অনুসন্ধান করা গেল, কিন্তু পাওয়া গেল না। আগামী কল্য নৌতনোয়া গ্রামে পাওয়া যাইতে পারে আশ্বাস পাইলাম।

১৬ই এপ্রিল ১৯২২—অতিপ্রত্যুষে বেথরী ত্যাগ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নেপাল রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলাম এবং ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলাম। উভয় রাজ্যের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক সীমা নাই—সার্ভে পিলার (Survey Pillar) এর ন্যায় ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভ দ্বারা সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অনুমান বেলা নয় ঘটিকার সময় আমরা নৌতনোয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামটী গোরখ্‌পুর জেলার অন্তর্গত। এখানে একটী থানা ও বাজার আছে। এখান হইতে ব্রীজম্যানগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসন ২২ মাইল এবং প্রশস্ত রাজপথ আছে।

কয়েকমাস পূর্ব্বে এখানে প্লেগের আবির্ভাব হওয়ায় বাজার ও গ্রামের লোক ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া মাঠে, আম বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

আমরা পরিত্যক্ত নৌতনোয়া বাজার ত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলাম এবং পথিপার্শ্বস্থ এক আমবাগানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। নৌতনোয়া বাজার হইতে কয়েকজন নেপালী দোকানদার এখানে আসিয়া দোকান খুলিয়াছে, তাহাদের এক দোকান হইতে জিনিষপত্র ক্রয় করিলাম এবং মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিলাম। অদ্যকার একবেলার খরচ, নেপালের পর্ব্বতে থাকা কালীন তিনবেলার খরচের সমান পড়িল।

রাত্রে কুরুবা নামক এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গ্রাম্য দোকান হইতে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করা গেল। ব্রাহ্মণ আমাদিগকে জ্বালানী কাষ্ঠ দান করিলেন।

১৭ই এপ্রিল ১৯২২—অতিপ্রত্যুষে কুরুবা ত্যাগ করিয়া দ্বিপ্রহরে লালপুর পৌঁছিলাম। মধ্যাহ্ন আহার ও বিশ্রাম অন্তে লালপুর ত্যাগ করিলাম।

লালপুর হইতে একটী ঘোড়া ভাড়া করিয়া আমাদের জিনিষপত্র জিৎ বাহাদুরের পৃষ্ঠ হইতে ঘোড়ার পৃষ্ঠে

২নং পরোয়ানা

চাপান গেল। জিনিষপত্র গুলি transferred subject হওয়ায় জিৎ বাহাদুর অনেকদিন পরে বক্রত্ব ত্যাগ করিয়া ঋজুভাবে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

অপরাহ্ন ৪-১০ মিঃ আমরা ব্রীজম্যানগঞ্জ পৌছিলাম। গোরখপুর-গামী গাড়ী রাত্রি নয় ঘটিকায় এখানে আসিবে। আমরা ষ্টেসনের বারান্দায় গাড়ীর অপেক্ষায় রহিলাম।

জিৎ বাহাদুরের অবশিষ্ট প্রাপ্য তাহাকে দিলাম। গণেশ দাস সুভায় আফিস হইতে প্রদত্ত ছাপান রসী দর পৃষ্ঠে "মাল বুঝিয়া পাইলাম" লিখিয়া কাগজখানা জিৎ বাহাদুকে দিলাম।

এখান হইতে বটৌলের পথে কাঠমণ্ডু পনের দিনের পথ। রক্সৌলের পথে চারি দিন। এখান হইতে রক্সৌলের ভাড়াও খুব বেশী নহে। বীরবল ও জিৎ-বাহাদুরের জন্য দুই খানা রক্সৌলের টিকেট ও আমার জন্য একখানা কলিকাতার টিকেট ক্রয় করিলাম। ব্রহ্মচারীজী তাঁহার জন্য কলিকাতার টিকেট ক্রয় করিলেন।

গত জার্ম্মান যুদ্ধ উপলক্ষে বীরবল আপন সৈন্যদলের সহিত লাহোর করাচি প্রভৃত স্থান দেখিয়া আসিয়াছে। রেলগাড়ী সম্বন্ধে তাহার একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। জিৎ বাহাদুর জীবনে কোনদিন রেলগাড়ী দেখে নাই।

নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা প্রায় কুড়ি মিনিট বিলম্বে রেলগাড়ী আসিয়া পৌছিল। আমরা সকলে ব্রীজম্যান গঞ্জ ত্যাগ করিয়া গোরখ্পুরে আসিয়া পৌছিলাম। বারুণী জংসনগামী গাড়ী আমাদের আগমনের পূর্ব্বেই গোরখপুর ত্যাগ করায় আমরা ষ্টেসনের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

১৮ই এপ্রিল ১৯২২—বীরবল ও জিৎ বাহাদুরকে গোরখ্পুর ষ্টেসনে রাখিয়া, ব্রহ্মচারীজী ও আমি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কখন রক্সৌল-গামী গাড়ী আসিবে, কোন্ স্থান হইতে তাহাদিগকে গাড়ীতে উঠিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে বীরবল ও জিৎ বাহাদুরকে উপদেশ দিয়া আসিলাম। জীবনে বীরবল কিংবা জিৎ বাহাদুরের সঙ্গে আমার আর কোনদিন সাক্ষাৎ হইবে না, কিন্তু হিমালয়ের স্মৃতির সঙ্গে এই দুইটী সরল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ "পাহাড়িয়া"র স্মৃতিও আমার মনে চিরকাল জাগরুক থাকিবে। "মালিক" (প্রভু) এর যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, বীরবল (যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে আমি বীরবলের মালিক ছিলাম না) ও জিৎ বাহাদুরের সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাই চেষ্টা ছিল। ইহাদের সহিত সমাজ, শিক্ষা, অবস্থাগত বৈষম্য এই দীর্ঘ হিমালয় পর্যটনে কখনও আমার মনে আইসে নাই। প্রভু-ভৃত্য ভাবের পরিবর্ত্তে সহচরের ভাবই অনুভব করিয়াছি।

ই, আই, রেলওয়ের ধর্ম্মঘটের জের তখন পর্য্যন্তও মিটে নাই। অত্যধিক মজুরী দিয়া ষ্টেসন হইতে ষ্টীমারে এবং পুনরায় ষ্টীমার হইতে ষ্টেসনে মাল আনিতে হইল। কুলী বলিল দিনরাত্রে মাত্র একখানা গাড়ী মোকামাঘাট হইয়া যায়।

রাত্রের ট্রেণ আসিল। কি লোকের ভিড়! অতি কষ্টে একখানা গাড়ীতে প্রবেশ এবং স্থান লাভ করিলাম। ব্রহ্মচারীজী কোন্ গাড়ীতে উঠিলেন কিছুই জানিতে পারিলাম না।

১৯শে এপ্রিল ১৯২২—প্রায় দুই ঘটিকার সময় হাওড়া ষ্টেসনে নামিলাম। ব্রহ্মচারীজীর সহিত ষ্টেসনে সাক্ষাৎ হইল। তিনি ভবানীপুরে গেলেন, আমি কলিকাতায় বন্ধুগৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

কোথায় চিরহিমানী-মণ্ডিত স্তব্ধ গম্ভীর হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়, আর কোথায় আতপদগ্ধ লোক-কোলাহল-মুখরিত মানবসমুদ্র কলিকাতা!

নেপালের মহারাজ বাহাদুরের অনুগ্রহে অতি আরামে হিমালয় পর্য্যটন শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কর্ম্মস্থলে পৌছিয়া মহারাজ বাহাদুরকে তাঁহার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। মহারাজ বাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটরীও সৌজন্য পূর্ণ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

নেপাল রাজসরকার হইতে যে দুইখানি পরোয়ানা আমি পাইয়াছিলাম, তাহার চিত্র এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছে ; নিম্নে পাঠোদ্ধার প্রদান করিলাম। প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারা গেলেও আদেশপত্র দুই খানির মর্ম্ম মোটামুটী বেশ বুঝা যায়, তাই বঙ্গানুবাদ দিলাম না।

সমাপ্ত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

১নং পরোয়ানা।

স্বস্তি শ্রীমদতিপ্রচণ্ড ভুজদণ্ডেত্যাদি শ্রীশ্রীশ্রীমহারাজ-চন্দ্র সমসের জঙ্গ্ বাহাদুর রাণা জি, সি, বি, জি, সি, এস্ আই ; জি, সি, এম্, জি ; জি, সি, ভি, ও ; ডি, সি, এল্ ; অনুররী জনরল্ ব্রীটীশ আর্ম্মি ; অনুররী কর্ণেল ফোর্থ গোর্খাজ্ ; থোং, লিং পীম্মা, কো, কাং, ওয়াং শ্যান্ ; প্রাইম মিনিষ্টর মার্সাল কস্য রুক্কা—

স্বস্তি শ্রীমদ্রাজকুমার কুমারাত্মজ শ্রীসুপ্রদীপ্ত মানেবর কমাণ্ডার ইন্‌চিফ , জনরল্ ভীমসম্সের জঙ্গ্ বাহাদুর রাণা কে, সি, এস্ আই ; কে, সি, ভি, ও ; কস্যপত্রং।

আগে বাগ্‌লুঙ্গ দেখি মুক্তিনাথর, মুক্তিনাথ দেখি বুটৌল বেথরী। সম্মকা অড্ডা, গৌঢ়া, গোস্বারা, চৌকী চৌকী সমেতকা হাকিম, কারিন্দা, কামদার, জিম্মাওয়াল, তালুকদার হরু সমেতকে যথোচিত উপ্রান্ত। এহাঁ নেপাল বাট মুক্তিনাথগৈ, সোমুক্তিনাথ বাট বুটৌল বেথরী কো বাট গরী ব্রিগম্‌গঞ্জ ষ্টেসনফটৈ আপন ঘর দেশ তর্ক জানে গরী ফরিদপুর বস্যা সরচন্দ্র আচার্জে আয়াকাছন্। নিজ সরচন্দ্র আচার্জেকো হিফাজৎকা নিমিত্ত হাম্রা অঠপহরিয়া কালীবাহাদুর ২ পটি সী বীরবলগুরুং সমেত সাথ পাঠাই বক্সেকো ছ। নিজ সরচন্দ্র আচার্জে তিমি হরুকা ইতাব্দা ইলাকা মা আই, নিজলাই বাস বস্ন চাহিলে দেরা দন্দ্ কো পণি বন্দোবস্ত গরীদিনু। নিজলাই খরিদ গর্ণ চাহিলে অনাজ চীজ হরু সুফদ্ মোল্মা খরিদ-গর্ণ পাউ বন্দোবস্ত মিলাই দিনু। তিমি হরুকা আফ্‌না আফ্‌না ইলাকামা নিজ আই পুগ্যা নিজলাই কুনৈ কুরা বাট পণি বে সুবিস্তা হুন্ ন পাওয়ে। গরী দি সুবিস্তা সাথ তীর্থ গরাই পঠাই দিনোস্বাম গর্নু। ইতি সম্বৎ ১৯৭৮ সাল মিতি ফাগুণ ২২ গতে ১ শুভম্।

২নং পরোয়ানা।

স্বস্তি শ্রীমদতিপ্রচণ্ড ভুজদণ্ডেত্যাদি শ্রীশ্রীশ্রীমহারাজ-চন্দ্র সমসেরজঙ্গ্ বাহাদুর রাণা জি, সি, বি ; জি, সি, এস, আই ; জি, সি, এম্, জি ; জি, সি, ভি, ও ; ডি, সি, এল্ ; অনরেরী জনরল্ ব্রিটীশ আর্ম্মি ; অনরেরী কর্ণেল ফোর্থ গোর্খাজ্ ; থোং লিং, পিম্মা, কো, কাং, ওয়াং শ্যান ; প্রাইম মিনিষ্টর মার্সাল কস্য রুক্কা—

স্বস্তি শ্রীমদ্রাজকুমার কুমারাত্মজ শ্রীসুপ্রদীপ্ত মানেবর কমাণ্ডার ইন্‌চিফ্ জনরল্ ভীমসমসের জঙ্গবাহাদুর রাণা কে, সি, এস্, আই , কে, সি, ভি, ও ; কস্য পত্রং

আগে বাগ্‌লুঙ্গ দেখি মুক্তিনাথর, মুক্তিনাথ দেখি বুটৌল বেথরী। সম্মকা অড্ডা গৌঢ়া গোস্বারা চৌকী চৌকী সমেতকা হাকিম, কারিন্দা, কামদার, জিম্মাওয়াল তালুকদার হরু সমেতকে যথোচিত উপ্রান্ত। এহাঁ নেপাল বাট মুক্তিনাথ গৈ, সো মুক্তিনাথ বাট বুটৌল বেথরী কো বাট গরী ব্রিগমনগঞ্জ ষ্টেসন ভৈ আপন ঘর দেশ তফ জানে গরী ফরিদপুর বস্যা সরচন্দ্র আচার্জে আয়াকাছন্। নিজ সরচন্দ্র আচার্জেকো হিফাজৎ কা নিমিত্ত হাম্রা অঠ্ পহরিয়া কালীবাহাদুর ২ পট্টী, সিবীর-বলগুরুং সমেত সাথ পাঠাই বক্সেকো ছ। নিজলাই ডেরা ডণ্ড বন্দোবস্ত মিলাই, খানা লাই চাহিলে চীজ হরু পনি সুফৎ মোল্মা পাওনে। গরা দি সুবিস্তা সাথ তীর্থ গড়াই দিনু। ভক্সা ৭৮ সাল ফাগুন ২২ গতে ১মা সনদ গরী বক্সেকো ছ নিজকা সাথ্ মা এহাঁ নেপাল বাট ১ জনা মাত্র হাম্রো আঠ্ পহরিয়া আয়াকো হুনালে। তাঁহা তিমিহরুকা ইলাকা আড্ডা গৌঢ়া চৌকী চৌকী মা আইপুগে, বিতিকৈ নিজ সরচন্দ্র আচার্জেকো হিফাজৎকা নিমিত্ত হামরো নেপাল বাট খাটি আয়াকা অঠপহড়িয়া সি

বীরবল গুরুংকা সাথমা তেশ আড্ডা চৌকীকো একজনা সিপাহী সমেত গৈ। নিজলাই হিফাজৎ সাথলগি, আফ্‌না ইলাকা চৌকী বট, অরু ইলাকা চৌকী অাড্ডা মা পুগি। সো আড্ডা চৌকা কো সদৎ আই সকে পছি অগ্নিজানে অড্ডা চৌকীকো সিপাহি ফার্ক আই আফ্‌না অড্ডা চৌকীমৈ বস্‌। পনি উদ্দি দি খটাই পাঠাওনে র জানে কাম গর ইতি সম্বৎ ১৯৭৮ সাল ফাগুণ ২৪ গতে ৩ শুভম্‌।

আশ্বাসিতা

সখি আজ আমারে মনের মত
সাজিয়ে দে লো সাজিয়ে দে।
আলতা রাঙা পা দুটীতে
মলের আওয়াজ বাজিয়ে দে।
বানিয়ে খোঁপা এলো চুলে,
বসিয়ে দে ঐ সোণার ফুলে
সিঁথির কোলে ডগ্‌ডগে লাল
সিঁদুরটুকু বুলিয়ে দে।
নাকের নীচে যতন করে
রতন নোলক দুলিয়ে দে।

আসমানী রঙ শাড়ীখানা
বড্ড ভালো বাসত যে;
আঁচলখানি এমনি করে
ঘুরিয়ে নিতে বলত সে;
আজ সখি দে তেমনি করে
কাপড়খানি পরিয়ে মোরে
ফুরিয়ে যে লো যাচ্ছে বেলা,
আঁধার নেমে আসবে যে!
সাজগুলি না সাঙ্গ হতে
কখন এসে ডাকবে সে!

অমন করে চোখ ঢাকলে
চলবে না লো চলবে না।
নিশ্বাসে আর চোখের জলে
হৃদয় আমার ভুলবে না।
কায যে আমার অনেক বাকি—
এখন্‌ তোরা দিসনি ফাঁকি
যতই কেন বল্‌না তোরা,
কোথাও সে আজ থাক্‌বে না;
আমার প্রাণের ডাকটুকু আজ
হেলায় ঠেলে রাখবে না।

ওরে শুক্‌নো তোদের ঠোঁটদুখানি
হাসির রসে ভিজিয়ে নে?
নেতিয়ে পড়া অঙ্গগুলি
উৎসাহেতে জীইয়ে নে।
মর্ম্ম ফাটা কথার ভারে
বুকখানা মোর ভাঙিস নারে
আশার সুখে তোদের বুকে
আজকে আমায় জড়িয়ে নে।
মরণ-কালো ঐ কথাটা
ফিরিয়ে নে লো ফিরিয়ে নে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

হীরালাল

(গল্প)

হীরালাল জাতিতে ডোম। বৃদ্ধ হইয়াছে, বয়স ৬০ বৎসরের কম হইবে না, আকার খর্ব্ব, দেহখানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অধিক স্থূলও নহে কৃশও নহে। কিন্তু এত বয়স হইলেও, তাহার দেহে এখনও বিলক্ষণ বল আছে; এক দিনে অনায়াসে ১০ ক্রোশ পথ চলিতে পারে; তাহার চক্ষুর জ্যোতি আজিও অটুট আছে—প্রদীপের আলোকেও ছুঁচে সূতা পরাইতে পারে।

গ্রাম খানির নাম মাণিকপুর। গ্রামের যেটা ডোম-পাড়া, যেখানে অন্যান্য ডোমেদের বাস, সেখানে হীরু থাকে না। গ্রামের অপর প্রান্তে, শ্মশান হইতে অল্প দূরে, একখানি মাটীর ঘরে সে একাকী বাস করে। তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবার কেহই নাই; একে একে সকলেই মরিয়াছে; লোকে বলে, ভূতেদের সহিত হীরুর ষড়যন্ত্র আছে। শ্মশান হইতে ভূতেরা, গভীর রাত্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, কথাবার্ত্তা কয়। সেই কারণেই হীরু নাকি ডোমপাড়ায় থাকে না। এবং কথাবার্ত্তার অসুবিধা হয় বলিয়াই, হীরুর সম্মতিক্রমে সেই ভূতেরাই নাকি উহার স্ত্রীপুত্রকন্যাকে একে একে মারিয়া ফেলিয়াছে; এবং সেই ভয়েই, ডোমপাড়ায় হীরুর যে সকল আত্মীয় স্বজন আছে, তাহারা কেহই আসিয়া হীরুর সহিত বাস করিতে সম্মত নহে। কিন্তু আবার কেহ কেহ বলে, হীরুর এই ভূত-অপবাদ নিতান্ত মিথ্যা কথা; তবে সে একজন গুণী লোক বটে। অনেক রকম ঔষধ তাহার জানা আছে, মন্ত্রেতন্ত্রে ঝাড়ফুঁকেও সে ওস্তাদ। অমাবস্যার রাত্রে জঙ্গলে সে ঔষধ তুলিতে যায়; গোখুরা সাপ মারিয়া তাহার বিষ বিনিষ্কাসিত করিয়া লয়। ইত্যাদি। যাহা হউক ইহা সত্য যে পাঁচখানা গ্রামের ছোটলোক, বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য হীরুর কাছে ঝাড়াইতে অথবা ঔষধ লইতে আসে।

হীরুর ঘরখানির দুই ধারে বাঁশের দুইটি মাচা বাঁধা আছে—একটিতে রাত্রে সে শয়ন করে, অন্যটিতে হাঁড়ি কলসীতে তাহার চাল ডাল এবং ঔষধপত্র থাকে। বাহিরে দাওয়ার একদিকে তাহার উনান পাতা আছে; অপর দিকে বসিয়া সে আপন জাতিকর্ম্ম করে;—কুলা ডালা ধুচুনি বুনিয়া, গ্রামে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসে।

রাত্রি তখন প্রায় ১১ টা। শ্রাবণ মাস, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী; কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া চারিদিক অন্ধকার, তবে তাহা তেমন জমাট নহে, ফিকা রকমের অন্ধকার। মাঝে মাঝে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আবার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। হীরু ঘরের মধ্যে প্রদীপের আলোয় বসিয়া, একটা ধুচুনী বোনা শেষ করিতেছিল। দ্বার খোলা ছিল, প্রদীপের খানিকটা আলো দাওয়ার উপর গিয়া পড়িয়াছিল। হীরু হঠাৎ বাহিরে চাহিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকের মত কাপড় পরা কে একজন মানুষ, তাহার দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে। হীরু জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

মানুষটী আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। পরিধানে একখানি কল্কাপেড়ে বিলাতী শাড়ী, ঘোমটায় মুখখানি ঢাকা। হীরু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

আগন্তুক আস্তে আস্তে সেখানে বসিল। বসিয়া অতি নিম্নস্বরে, প্রায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "হীরু, তুমি বাবা, আমার একটু উপকার করবে?"

হীরু বলিল, "কি উপকার, বল।"

স্ত্রীলোকটি পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে বলিল, "একটা ওষুধ" —বলিয়া সে চুপ করিল।

হীরু বলিল, "কিসের ওষুধ চাই তোমার? কি ব্যারাম হয়েছে?"

আগন্তুক একটু যেন ইতস্তত করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার কাছে বিষ টিষও থাকে ত?"

হীরু সন্দেহপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "বিষ? বিষ কোথা পাব? কিছু ওষুধ বিষুধ রাখি বটে। কি ওষুধ চাই তোমার, তাই বল না।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "ওষুধ না। বিষই দরকার। কেন আমার সঙ্গে ছলনা করছ হীরু? তোমার কাছে অনেক বিষ আছে তা আমি জানি। খানিকটে বিষ আমার দাও, বিশেষ দরকার?"

হীরু তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "কেন, বিষ নিয়ে তুমি কি করবে?"

হীরু "বিষবৃক্ষ[illegible]" নাই ইহা মনে নিশ্চয় জানিয়া, স্ত্রীলোকটি বলিল, "বড় শেয়ালের উপদ্রব হয়েছে, বুঝেছ! রান্না ঘরের বেড়া ফাঁক করে, রোজ রাত্রে শেয়াল ঢুকে, আমার হাঁড়ি খেয়ে যায়। দুটো শেয়াল মরে, এই রকম খানিকটা বিষ তুমি আমায় দিতে পার?"

হীরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল, "কেন মিছে কষ্ট করে' এই আঁধার রেতে এই জল কাদা ভেঙ্গে এসেছ তুমি? বাড়ী যাও। ও সব কথার মধ্যে আমি কোনও দিন থাকিও নি, থাক্‌বও না। পাঁচখানা গাঁয়ের মধ্যে, কোথাও কোনও দুর্ঘটনা হলে, তোমরা এসে আমাকেই নিয়ে টানাটানি কর কেন বল দেখি? দুটো অষুধ পালা জানি তাই পাঁচজনে আমার কাছে আসে। বিষ টিষ রাখিও না, কাউকে দিইও না। কেন তোমরা মিছামিছি আমায় সন্দেহ কর?"

রমণী বিস্মিত ভাবে বলিল, "আমরা সন্দেহ করি?"

"হাঁ, তোমরা সন্দেহ কর। তুমি কে, তাও আমি জানি, কি জন্যে এসেছ তাও আমি জানি।"

সভয় কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে আমি?"

"তুমি পুলিস। পুরুষ মানুষ, ছিরিলোক সেজে এসেছ। নইলে এই আঁধার রাতে, এই শ্মশানের মোয়াড়ায়, ছিরিলোকের বাবার সাধ্যি কি যে আসে?"

রমণী এই কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। নিজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "আমি পুরুষ মানুষ? গলার স্বর শুনে বুঝতে পারছ না আমি পুরুষ কি স্ত্রীলোক?"

এবার হীরু বিস্মিত হইল—স্ত্রীকণ্ঠস্বরই ত বটে! তা ছাড়া, স্বরটা যেন হীরুর পরিচিত বলিয়াও বোধ হইল। কার কণ্ঠস্বর তাহাই সে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহাকে সংশয়াপন্ন মনে করিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, "এখনও সন্দেহ? তবে দেখ!"—বলিয়া সেই অবগুণ্ঠনবতী যুবতী, কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে নিজ বক্ষের বসন সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল।

"রাম রাম!"—বলিয়া হীরু মাথাটি হেঁট করিল। বলিল, "মা, বস।"

রমণী উপবেশন করিল। হীরু বলিল, "আজকাল পুলিসের ভারি উপদ্রব হয়েছে। তোমার ঘোমটা দেখে, তোমার ফিস ফিস কথা শুনে, তাই আমি সন্দেহ করেছিলাম তুমি জাল মেয়েমানুষ, আসলে পুলিসের কোনও টিক্‌টিকি।"

স্ত্রীলোকটি অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিল, "এখন ত তোমার সন্দেহ গেল। আমি যা চাই, আমায় দাও তবে।"—এখন আর ফিস ফিস করিয়া নহে, রমণী নিজ স্বাভাবিক কণ্ঠেই কথা কহিতে লাগিল।

হীরু বলিল, "তুমি যা চাও, তা আমি তোমায় দিতে পারি। কিন্তু এ সব জিনিষের দাম খুব বেশী তা জান ত?"

রমণী বলিল, "জানি। পঞ্চাশ টাকা আমি এনেছি। এই নাও।"—বলিয়া নিজ কটিদেশ হইতে একটি "গেঁজে" খুলিয়া লইয়া, হীরুর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "গুণে নাও।"

হীরু বলিল, "তোমার শেয়াল মরলে, পুলিস এসে যখন আমায় ধরে নিয়ে যাবে, তখন ও ৫০৲ ত তাদের পূজো দিতেই যাবে। আরও ৫০ চাই।"

স্ত্রীলোক ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "আরও ৫০ চাই? আর

ত আনি নি। অত বেশী লাগবে তা তো আমি জানতাম না।"

"কাল টাকা এনে, জিনিষ নিয়ে যেও।"

স্ত্রীলোকটি কাতর কণ্ঠে বলিল, "কাল হলে চল্‌বে না হীরু—আজই আমার চাই যে! তা ছাড়া, কাল আমার আসবার উপায়ও নেই।"

হীরু বলিল, "সে তুমি বুঝো, কিন্তু ১০০্ টাকার কমে এ কায আমি পারবো না বাছা, আমার সাফ কথা।"

রমণী ক্ষণমাত্র কাল কি চিন্তা করিল। তার পর, নিজ বাম প্রকোষ্ঠ হইতে স্বর্ণবলয় উন্মোচন করিয়া বলিল, "এই নাও। এর দাম ৫০্ টাকার বেশী। দাও, আমার জিনিষ দাও।"

হীরু বালাটি হাতে লইয়া, প্রদীপের আলোকে ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেটি পরীক্ষা করিল। তাহার পর, গেঁজে হইতে টাকাগুলি খুলিয়া, সাবধানে নিঃশব্দে সেগুলি গণিল। দেখিল, ঠিক ৫০্ টাকাই আছে। টাকা এবং বালা মাচার উপর শয্যাতলে লুকাইয়া, অপর মাচা হইতে একটি হাঁড়ি নামাইয়া লইল। তাহার ভিতর গাছের কতকগুলা শুষ্ক শিকড়, কয়েকটা শিশি, ও অনেকগুলা ছোট ছোট পুঁটুলি ছিল। একটা শিশি, আলোতে ধরিয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া, একটুকরা ছেঁড়া কাগজের উপর তাহা উবুড় করিল। কাগজে পড়িল, কিসের কতকটা গুঁড়া। শিশি ছিপি বন্ধ করিয়া, কাগজটা মোড়ক করিয়া, রমণীর হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিও।"

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "এতেই হবে ত? দুটো শেয়াল মরবে?"

হীরু বলিল, "যথেষ্ট হবে।"

রমণী মোড়ক লইয়া বলিল, "এ কি?"

"শেঁখো বিষ। ভয়ানক জোর। যে শেয়ালকে খাওয়াবে, এক ঘণ্টার মধ্যে তার শরীরে কলেরার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাবে। দু তিন ঘণ্টার মধ্যেই শেষ। লোকে মনে করবে, সে কলেরা হয়ে মরেছে বুঝেছ? কলেরা—মনে রেখ।"

"বেশ।" বলিয়া রমণী অঞ্চলের কোণে মোড়কটি বাঁধিয়া লইল। বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া, ধীর পদে বাহির হইয়া গেল।

হীরু, তখন আলোটি নিবাইয়া দিল। দাওয়ায় বাহির হইয়া পথের দিকে চাহিল। দেখিল কিছু দূরে শ্বেতবস্ত্রাবৃতা রমণী গ্রামাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। আর কয়েক পদ গিয়া, সে দাঁড়াইল। নিকটেই একটা বটগাছ ছিল, তাহার ছায়াতল হইতে অপর একজন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইল। ছাতা খোলার মত খট্ করিয়া একটা একটা শব্দ হইল; তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। উভয় মূর্ত্তি, অগ্রপশ্চাৎ অল্প ব্যবধানে, গ্রামের দিকে চলিল। হীরু আস্তে আস্তে দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাতে কুলুপ লাগাইয়া, টোকা মাথায় দিয়া পথে নামিয়া নিঃশব্দে সেই শ্বেতবস্ত্র যুগলের অনুসরণ করিল।

সেই নিশাচর ও নিশাচরীর অনুসরণে, হীরু গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুদূর গিয়া, তাহাদিগকে একটা বাড়ীর সদর দরজার তালা খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিল।

হীরু তখন মনে মনে বলিল, "ওঃ, তোমায় ঠিকই সন্দেহ করিয়াছিলাম তা হলে!"

হীরু জানিত, ইহা ৺শশী মুখুয্যের বাড়ী—বুঝিল, যুবতী তাঁহারই পুত্রবধূ নীরদা।

এই বাড়ীতে হীরু মাঝে মাঝে আসিয়া, নীরদাকে কুলাটা ডালটা বিক্রয় করে। গত দুই বৎসর যাবৎ ইহার স্বামী বিদেশে। হীরু শুনিয়াছিল, নীরদার স্বামী শীঘ্র বাড়ী আসিবে। চারি বৎসরের একটি ছেলে মাত্র লইয়া, যুবতী একাকিনী এই গৃহে বাস করে। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে গ্রামে একটা কাণাঘুষা আছে, হীরুও তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বাস করিত না। এবার তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া, আপন মনে সে বলিল, "তবে ঠিকই ত বল্‌তো লোকে! যা করছিস্, করছিস্—তার উপর আবার—এই! ওরে হারামজাদী!"

হীরু নিঃশব্দে আপন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, পা ধুইয়া,

এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইয়া, মাচাটির উপর উঠিয়া শয়ন করিয়া, অবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

২

পরদিন প্রাতেও আকাশ তেমনি মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

মাণিকপুর গ্রামের দুই ক্রোশ দূরে রেলওয়ে ষ্টেশন। বেলা ৭ টার সময়, পশ্চিম হইতে একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল। মাণিকপুর গ্রামের ৺শশী মুখুয্যের পুত্র বিনোদলাল, একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে ব্যাগ ও ছাতা হস্তে নামিয়া পড়িল। প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া এদিক ও দিক চাহিয়া দেখিল, কোনও লোক তাহাকে লইতে আসিয়াছে কি না। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে মনে বলিল, "কেইবা আছে যে নিতে আসবে। বাইরে গিয়ে দেখি যদি গোরুর গাড়ীটাড়ী একখানা পাঠিয়ে থাকে।" এই সময় বৃষ্টি আসিল। ছাতাটি খুলিয়া, তখন সে টিকিট দিবার ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। টিকিট খানি দিয়া, বাহির হইয়া দেখিল, ষ্টেশন প্রাঙ্গণে দুইখানি গোরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোনও গাড়ীর গাড়োয়ানকে নিজ গ্রামের বলিয়া চিনিতে পারিল না। তথাপি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিয়া লইল—তাহারা স্থানীয় গাড়োয়ান, ভাড়া জুটিবার আশায় ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিনোদ একবার ভাবিল, একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া লয়। আবার ভাবিল, হয়ত একটা টাকা ভাড়া চাহিয়া বসিবে, সে টাকায় ছেলের জন্য, গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক হাঁড়ি রসগোল্লা কিনিতে পার যাইবে। রৌদ্র নাই, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এই দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে আর কতক্ষণ লাগিবে? পথে কাদা হইয়াছে বটে, তা জুতা যোড়াটা খুলিয়া হাতে করিয়া লইলেই চলিবে। এইরূপ ভাবিয়া, বিনোদ ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ পার হইয়া, জুতা যোড়াটি হাতে করিয়া লইয়া, নিজ গ্রামের পথ ধরিল।

এই বিনোদ লোকটির বয়স এখন ৩০ বৎসর। বেশ হৃষ্ট পুষ্ট চেহারা, চোখ দুইটি বড় বড়, সর্ব্বদাই প্রফুল্ল বদন। বাল্যকালে লেখাপড়ায় বড় মন দেয় নাই। ১৮ বৎসর বয়সে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িবার সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। বাজারে পিতার একখানি মণিহারির দোকান ছিল, তাহার আয়েই সংসার চলিত। জমিজমা ছিল—খুব বেশী নয়—তবে সম্বৎসরের ধানটা কলাইটা তাহা হইতে পাওয়া যাইত, কিনিতে হইত না। পিতার মৃত্যুর পর দোকানখানি হাতে পাইয়া, বৎসরখানেকের মধ্যেই বিনোদ তাহা লোপাট করিয়া ফেলিল। কিছুদিন ঘরে বসিয়া রহিল; কিন্তু দিন চলে না। সংসারে যদিও দুইটি বিধবা মাত্র—মা এবং পিসিমা—তথাপি দিন গুজরাণ করা কষ্টকর হইল। প্রতিদিনের বাজার খরচ, মা পিসিমার দশমী দ্বাদশীর খরচ, তাঁহাদের ব্রত পার্ব্বণ, কাপড় চোপড়—নিজের জুতাটা জামাটা ছাতাটা সিগারেটটা, তার পরে জমিদারের খাজানা আছে—এ সব আসে কোথা হইতে? এ দিকে ছেলে 'সোমত্ত' হইল, মা পিসিমা তাহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রোজগারহীন নিষ্কর্ম্মা গ্রাম্য যুবককে ভাল মেয়ে কে দিবে? এই অবস্থায় পড়িয়া, বিনোদ কলিকাতায় গিয়া অনেক চেষ্টায় একটি সামান্য কেরাণীগিরি যোগাড় করিয়া লইল। পাঁচ বৎসর সে চাকরি করিল। ইতিমধ্যে তাহার বিবাহ হইল; বেতনও কিছু বৃদ্ধি হইল। ছেলের বিবাহের বৎসরখানেক পরে, মারও বৈধব্য যন্ত্রণা শেষ হইল—একটী নাতির মুখও তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

২০৲ বেতনে ঢুকিয়াছিল, ৫ বৎসরে যদিও তাহার ৩০ বেতন হইয়াছে, তথাপি দুঃখ ঘুচে না। কলিকাতার মেসের খরচ, ট্রাম ভাড়া, বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়িয়া মাঝে মাঝে থিয়েটার বায়স্কোপেও যাইতে হয়, মাসে দুইবার বাড়ী যাওয়া আছে—বাড়ীর খরচের জন্য মাসে ৫।৭ টাকার বেশী আর বিনোদ দিতে পারে না। ছেলেটী হইয়াছে, তার দুধ আছে, খাবার আছে, অসুখ করিলে বিস্কুট বার্লি আছে—৫।৭ টাকায় কি করিয়া চলিবে?

এই সময় বড় বাজারে অমৃতসর-নিবাসী এক শালের মহাজনের সহিত বিনোদের আলাপ হইল। আহার ও বাসস্থান ছাড়া তিনি তাহাকে ৪০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া অমৃতসরে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কাযকর্ম্মে পটুতা দেখাইতে পারিলে ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের ২।১ আনার অংশীদারও করিয়া লইবেন ভরসা দিলেন। আশায় লুব্ধ হইয়া, কলিকাতার চাকরিতে ইস্তফা দিয়া, বিনোদ সেই চাকরি গ্রহণ করিল। বাড়ী গিয়া দিন দশ বারো থাকিয়া স্ত্রীপুত্রকে পিসিমার জিম্মায় রাখিয়া, দুই বৎসর পূর্ব্বে আষাঢ় মাসে বিনোদ অমৃতসর চলিয়া গিয়াছিল, আর আজ ফিরিতেছে।

অমৃতসর পৌছিবার মাস দুই পরেই সে পিসিমার মৃত্যু সংবাদ পায়। মাত্র দুই মাসের চাকরি, মনিব ছুটি দিল না, বলিল ইচ্ছা করিলে চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পার। বিনোদ পাড়া প্রতিবেশী অভিভাবক স্থানীয় গণকে চিঠি লিখিল; তাঁহারা একবাক্যে উত্তর দিলেন, আমরা রহিয়াছি ভাবনা কি? বউমাকে আগলাইবার জন্ত একজন প্রবীণা ঝি রাখিয়া দিব, নিজেরা সর্ব্বদা দেখা শুনা করিব। বিনোদের শ্বশুরবাড়ী গ্রাম হইতে অধিক দূরে নহে; কিন্তু তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী নাই, শালারাও কেহ জীবিত নাই; বিধবা খুড়শ্বাশুড়ী তাঁহার নাবালক পুত্রকন্তাগণ সহ সেখানে বাস করেন। তথাপি বিনোদ সেই খুড়শ্বাশুড়ীকে পত্র লিখিল; তিনি উত্তর দিলেন, "সে কি হয় বাবা? তোমার বাপ পিতামহের ভিটায় সন্ধ্যা পড়িবে না এ কেমন কথা। নীরদা সেই খানেই এখন থাকুক। পরে তুমি সুবিধামত তাহাকে তোমার চাকরি স্থানে লইয়া যাইও।"—নীরদা অমৃতসর গেলে বাপ পিতামহের ভিটায় কে সন্ধ্যা দিবে, সে সম্বন্ধে কোনও সদুপায় খুড়ীমা কিন্তু নির্দ্দেশ করেন নাই।

পাড়া প্রতিবেশীরা নিজেরা যত দেখা শুনা করুন আর না করুন, প্রবীণা ঝি একটি তাঁহারা যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মাস দুই পরে নীরদার সহিত ঝগড়া করিয়া সে চলিয়া যায়। একটি ঠিকা ঝি রাখা হইল, সে হাট বাজার করিয়া, বাসন মাজিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

বিনোদ বাড়ী গিয়া স্ত্রীকে লইয়া আসিবে বলিয়া মাঝে মাঝে ছুটী চাহিয়াছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আপিস ত নহে, মহাজনী কারবার, আজ না কাল, এ মাসে না ও মাসে, এই করিয়া, এত দিনে তাঁহারা বিনোদকে এক মাসের ছুটী দিয়াছিলেন।

৩

"কে রে, হীরেলাল নাকি? এখনও তুই বেঁচে আছিস?"

হীরু ডোম তাহার দাওয়ায় বসিয়া ডালা বুনিতেছিল, চাহিয়া দেখিল, ছাতা মাথায়, জুতা ও ব্যাগ হাতে বিনোদ রাস্তায় দাঁড়াইয়া ঐরূপ চীৎকার করিতেছে।

হীরুকে নিরুত্তর দেখিয়া বিনোদ রাস্তা হইতে নামিয়া হীরুর কুটীরের দিকে আসিতে আসিতে হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, "কিরে হীরু, এখনও বেঁচে আছিস্?"

এইবার হীরুর কথা যোগাইল—"আছি বৈকি দাদা ঠাকুর। এস, দাবায় উঠে এস, প্রণাম করি।"

বিনোদ বলিল, "পায়ে যে কাদা রে হীরু।"

বলিয়া রাস্তা হইতে নামিল। নিকটে একটা গর্ত্তে বর্ষার জল দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে পা ধুইয়া, হীরুর দাওয়ায় গিয়া উঠিল। হীরু তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার জন্ত নূতন এক টুকরা বাঁশের চাটাই বিছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতদিন বাড়ী ছেড়ে কোথায় ছিলে দাদাঠাকুর।"

"অমৃতসরে চাকরি করছিলাম রে। কেন, যাবার সময় ত তোকে বলে গিয়েছিলাম। মনিব ছুটি দৈয় না, কাযেই আসতে পারি নি। এক মাসের ছুটি পেয়ে, বাড়ী এসেছি।"

হীরু গম্ভীর মুখে, অন্ত দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার ভাব দেখিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "হীরু, তুই মুখখানা অমন হাঁড়ি করে বসে রয়েছিস কেন? দুবছর পরে দেখা, একটা কথা কচ্ছিস নে। হাঁরে,

আমাদের বাড়ীতে কোনও খারাপ খবর আছে না কি? তুই আজকালের মধ্যে আমাদের ওদিকে গিয়েছিলি? আমার ছেলে, পরিবার সবাই ভাল আছে ত?"

হীরু গম্ভীর ভাবে বলিল, "অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয় নি।"

বিনোদ বলিল, "তা যাবি কেন! আমি বিদেশে যাবার সময় তোকে বলে গেলাম, হীরু, আমাদের বাড়ী সর্ব্বদা যাবি, বউ একলা রইল, দেখবি শুনবি, খোঁজ খবর নিবি। তুই বল্লি, তা আর খোঁজ খবর নেব না দাদা ঠাকুর, তোমার বাপ একদিন আমার যে উপকারটা করেছিলেন, আমি ত তোমাদের বিনি মাইনের বাঁধা চাকর। তুই এ কথা বলেছিলি কি না, বল।"

হীরু পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, "মাঝে মাঝে আমি গেছি বৈকি। তোমাদের বাড়ীতে না গেলেও খবরটবর পাই। বউমাকে কালও আমি পথে দেখেছি। সবাই ভালই আছে।"

বিনোদ বলিল, "আচ্ছা হীরু, তুই বস—আমি এখন উঠি। বাড়ীতে হয় ত তারা কত ভাবছে।"—বলিয়া বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

হীরু, বিনোদকে প্রণাম করিয়া, গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। বিনোদ চলিয়া গেলে সে আপন মনে বলিল, "হায়রে সংসার!"

৪

আজ আর হীরু তাহার কুলা ডালা লইয়া গ্রামে বিক্রেয় করতে বাহির হইল না। সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া রহিল, তামাক খাইল, এবং অনেক চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল। যখন প্রায় বারোটা, হীরু তখন গতরাত্রে প্রাপ্ত সেই বালা এবং টাকা পঞ্চাশটি লইয়া কোমরে বাঁধিয়া, ঘর বন্ধ করিয়া, আস্তে আস্তে বাহির হইল।

গ্রামের ভিতরে গিয়া, ক্রমে বিনোদের বাড়ীর নিকট পৌঁছিল। বাড়ীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিল, ভিতরে কোনও সাড়াশব্দ নাই, নিস্তব্ধ, কিন্তু উঠানের আমগাছে আলো পড়িয়াছে। খিড়কী দুয়ারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীরের একটা স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া, কৌশলে তাহার উপর উঠিয়া, হীরু নিঃশব্দে ভিতর নামিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিল, রান্নাঘরের বারান্দায় একটি স্ত্রীলোক একাকী দাঁড়াইয়া আছে, নিকটে একটি হরিকেন লণ্ঠন মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। হীরু ধীর পদে সম্মুখে গিয়া বলিল, "কি দিদিঠাকরুণ, এখনও ঘুমাও নি?"

সহসা হীরুর আগমনে নীরদা ভয়ে একবারে কাঠ হইয়া গেল। কোনও কথাই সে বলিতে পারিল না। হীরু বলিল, "ভয় পেয়েছ দিদিঠাকরুণ? আমি হীরু, ভয় কি?"

এইবার নীরদার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল। সে বলিল, "হীরু, তুই চোরের মত এখানে কি করছিস? বাড়ী ঢুকলি কি করে?"

হীরু বলিল, "পাঁচিল টপকে এসেছি। কাল ওষুধ নিয়ে এলে, ওষুধের ফলটা কি রকম হল তাই দেখতে এসেছি।"

নীরদা বিস্মিত হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "ওষুধ? আমি আবার কবে তোর কাছ থেকে ওষুধ আনলাম? কি বলছিস পাগলের মত? মদ টদ খেয়েছিস্ বুঝি?"

হীরু একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ন্যাকামি রাখ না দিদিঠাকরুণ! আমি সবই জানি। কাল রাতে তোমার গলার স্বর শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে তুমি। তারপর, অন্ধকারে পিছু পিছু এসে, তোমাকে, আর,—তাকে এই বাড়ী ঢুকতে ত দেখেই গেলাম। সে যাক্। এখন বল দেখি, যেমন বলে দিয়েছিলাম, দুধের সঙ্গে সেই গুঁড়োটা মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছ ত?"

নীরদা দেখিল, আর ভণ্ডামি করা নিষ্ফল। বলিল, "হ্যাঁ হীরু, খাইয়ে ত দিয়েছিলাম। কৈ, এখনও ত কিছুই হল না। দিব্যি ত নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে।"

হীরু মৃদুস্বরে হাসিয়া বলিল, "ঘুমবেই ত। ওষুধ দিতে আমারই যে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল কি না।"

নীরদা শঙ্কিত ভাবে ব'লয়া উঠিল, "কেন, কি দিয়েছিস্ ?"

হীরু বলিল, "তুমি বিষ চেয়েছিলে ত ? বিষও আমার ছিল, ভাল ভাল বিষ ছিল। কিন্তু একে বুড়োমানুষ, তায় রাত্তির কাল, বিষের গুঁড়ো না দিয়ে, ভুলে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ফেলেছিলাম।"—বলিয়া হীরু আবার হাসিল।

নীরদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হীরুর মুখ পানে চাহিল। ক্রোধ কম্পিত স্বরে কহিল, "তবে তুই আমার সঙ্গে জুচ্চুরি করেছিস্ বল ? আমাকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছিস্, হারামজাদা ?"

এই গালি শুনিয়া হীরু রাগিয়া গেল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁলো হারামজাদি শয়তানী নচ্ছারণী! হ্যাঁ! তোকে ফাঁকি দিয়েই ত টাকা নিয়েছি। এখন আমি যে জন্তে এসেছি, তা বলি শোন্। নে, তোর গয়না কাপড় বাক্স থেকে বের করে,' পুটুলি বেঁধে নে। তোকে, আজ রাতেই কলকাতায় যেতে হবে।"

নীরদা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কলকাতায় ? কলকাতায় আমি যাব কেন ?"

হীরু ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিল, "কলকাতায় যাবি নে ত কি এইখানে থেকে স্বামী হত্যে ব্রহ্মহত্যে করবি হতভাগী ? নে, কাপড় চোপড় গুছিয়ে, নে; ভোর তিনটের গাড়ী। আমি তোকে ইষ্টিশানে পৌছে দিয়ে, টিকিট কেটে, গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে আসব।"

নীরদা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বলিল, "হীরেলাল, তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয় ? তুই আমায় হুকুম করছিস ? আমি যদি কলকাতায় না যাই ?"

হীরু বলিল, "না যাস, এখনই বিনোদ দা' ঠাকুরকে জাগিয়ে সব কথা তাকে বল্বে, তাতে আমাতে দু'জনে মিলে তোকে খুন করে,' উঠোনে গর্ত্ত খুঁড়ে তোকে পুঁতে ফেল্বো।"

হীরুর ভঙ্গি দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া নীরদা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, "হীরু, আমি যদি দোষ করে থাকি, আমার স্বামী তার বিচার করবেন। তিনি যদি আমায় ত্যাগ করেন, তখন আমি কলকাতায় যাব—যেখানে হয় যাব। তুমি কেন এর মধ্যে—"

হীরু বলিল, "আহা, নেকু! স্বামী তোমার বিচার করবেন! বেচারি অঘোরে পড়ে ঘুমুচ্চে, তুমি যদি আজ রাতেই তার গলাটি ছুরি দিয়ে কেটে দাও ? যে বিষ খাওয়াতে পারে, সে কি আর গলা কাটতে পারে না ? ও সব কথা আমি শুনবো না। ভোর তিনটের গাড়ীতে তোমায় যেতে হবে কলকাতা। না যদি রাজি থাক, বল, আমি সোরগোল সুরু করে দিই।"

নীরদা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। সে ধপ করিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কিন্তু হীরু, কলকাতায় যে আমায় যেতে বলছ, সেখানে গিয়ে আমি কি খাব ?"

হীরু বলিল, "তোমাদের দলের লোক সেখানে ঢের আছে। তারা যেমন ক'রে খায়, তুমিও সেইরকম করে খাবে।"

"কিন্তু হীরু, আমি যে কলকাতায় কখনও যাই নি, কাউকে চিনি নে। আমি কি করে সেখানে যাব, কি করে' কি করব ?"—বলিয়া নীরদা চোখে আঁচল দিল।

কথাটা শুনিয়া হীরু একটুখানি ভাবিল। শেষে বলিল, "হাঁ, তা বটে। আচ্ছা, চল, আমি নিজেই তোমায় সঙ্গে করে' রেখে আসবো। রামবাগানে যে ডোমপাড়া আছে, সেই ডোমপাড়ায় আমাদের ক'জন আত্মীয় লোক থাকে। তাদের ধরে, তোমার একটা ঠাঁই ঠিকানা করে দিয়ে, আমি আসবো।"

নীরদা দেখিল, হীরু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহার হাত হইতে নিস্তারের কোনই আশা নাই। তখন সে বলিল, "আচ্ছা, তাই চল তবে।"

হীরু বলিল, "তোমার স্বামীকে যা ঘুমের ওষুধ দিয়েছি, সে ঘুম সহজে এখন ভাঙ্গবে না। কাল বেলা চটা

৯টা পর্য্যন্ত খুব ঘুমোবে। তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার ঘরে গিয়ে তোমার কাপড় চোপড় গয়না গাঁটি গুলো বের করে নাওগে। আমি কিন্তু ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বো।"

"কেন ?"

"পাছে তুমি তোমার স্বামীর গায়ে হাত দাও, কি পালাও।"

নীরদা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল। হীরু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বারান্দায় উঠিয়া, ঠিক দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খাটের উপর দেখিল, ছেলেটিকে পাশে লইয়া, বিনোদ নাসিকাগর্জ্জন পূর্ব্বক অঘোরে ঘুমাইতেছে।

নীরদা বাক্স পেটরা খুলিয়া নিজ বস্ত্রালঙ্কার বাহির করিয়া একটি পুটুলিতে বাঁধিতে লাগিল। হীরু বলিল, "এই নাও, তোমার বালা নাও, আর চল্লিশ টাকা—পুঁটুলিতে বেঁধে নাও। দশটা টাকা আমি রাখলাম পথ খরচের জন্য।" নীরদা দ্বারের কাছে আসিয়া, টাকা ও বালা লইল। পুঁটুলি বাঁধা হইলে, সেটী কাঁধে করিয়া হীরুর সহিত বাহির হইল।

হীরু, নীরদাকে লইয়া, প্রথমে নিজ কুটীরে আসিল। বাক্স খুলিয়া, সাফ ধুতি বাহির করিয়া পরিল, বহুকালের একটি পিরাণ ছিল তাহা গায়ে দিল, একখানি উড়ানি চাদর ছিল তাহা মাথায় বাঁধিল। জুতা পায়ে দিয়া, ছাতা লইয়া, ঘরের দ্বারে কুলুপ দিয়া নীরদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষ্টেশনের দিকে চলিল।

৫

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে বিনোদ স্ত্রীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহার অন্বেষণে ব্যাপৃত হইল। ছেলেটা মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে বিনোদ, অভাগিনীর পদস্খলনের বৃত্তান্ত অবগত হইল; কিন্তু সেই রাত্রে কাহার সহিত কোথায় যে নীরদা অন্তর্দ্ধান করিল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

এ ঘটনার পর গ্রামে আর বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, বাস্তুভিটা ও জমি জমাগুলা আধা কড়িতে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া, ছুটী অন্তে ছেলেটাকে লইয়া বিনোদ অমৃতসর চলিয়া গেল। সেখানে পৌঁছিয়া বন্ধুবান্ধবে নিকট স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিল। ছেলেটীর কষ্ট দেখিয়া, পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসেই অমৃতসর প্রবাসী একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ বাঙ্গালীর কন্যাকে সে বিবাহ করিল। তদবধি বিনোদ সেইখানেই বাস করিতেছে। চাকরিতে তাহার উন্নতি হইয়াছে; নিজের একখানি বাড়ীও সেখানে নির্ম্মাণ করিয়াছে শুনিয়াছি।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ম্যাক্সিম গর্কি

(নব্যরুষিয়ার চিন্তা নায়ক)

(১১)

গতবারে ম্যাক্সিম গর্কির বিচিত্র-ঘটনা-সমাকীর্ণ সমুদ্রবৎ জীবনীর কতকটা পরিচয় দিয়াছি; এবারে তাঁহার সাহিত্য ও সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

৩১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গর্কি সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যিক-রূপে পরিচিত ও আদৃত হন। এবং তাঁহার অসামান্য সৃজন-প্রতিভার প্রভাব ও রচনাভঙ্গির বিদ্যুৎ প্রভায় সাহিত্যজগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দেন। তারপর অচির-কাল মধ্যেই লিও টলষ্টয়, গোগল ও টুর্গেনিফ প্রভৃতি তাৎকালীন রুষিয়ার প্রথিতযশ সাহিত্যাচার্য্যদিগকেও ছাড়াইয়া উঠেন। এই সময় তিনি প্রধানতঃ ছোটগল্প ও

বিচিত্র প্রবন্ধাদি রচনাতেই তাঁহার স্বজনী শক্তি নিয়োজিত ও নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। গল্প বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাঁহার গল্প ও আখ্যায়িকাগুলি সেইরূপ সুদ্ধ বাস্তবজীবনের প্রাণহীন প্রতিকৃতি মাত্র বা কল্পনাবহুল ঘটনা সমষ্টি নহে। সেগুলি এত জীবন্ত ও মানবের জীবন সমস্যা সমাধানের এমন নিবিড় চেষ্টায় পরিপূর্ণ যে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন টলষ্টয়, গোগল এবং টুর্গেনেফ্ এই তিনজনের বিভিন্নমুখী স্বজনী-প্রতিভাই একাধারে তাঁহার ভিতর স্থানলাভ করিয়াছে। তাঁহার "Orloff and His Wife," "Konovaloff," "Men with Pasts," "Three of Them," "The outcasts," প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, যে slav সভ্যতার অন্তরের করুণ আকুতি ও সুর সাহিত্যাচার্য্য টলষ্টয় প্রভৃতির রচনায় পরিস্ফুট হইয়াছে, গর্কির সাহিত্যে তাহা আরও স্ফুটতর মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। কারণ গোগল ও টুর্গিনেফের সাহিত্য স্বজনের উপাদান ও আখ্যান বিষয়গুলি সমাজের মার্জ্জিত ও অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, কাযেই সেগুলিকে কলাসৌষ্টব ও সৌন্দর্য্যদান করা তাঁহাদিগের পক্ষে যত সহজসাধ্য হইয়াছে, গর্কির পক্ষে তাহা হইতে পারে নাই। উপরন্তু তাঁহারা মার্জ্জিত ও মধ্যশ্রেণীর মানব জীবন-ধারার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা যত সহজে করিতে পারিয়াছেন, গর্কি সে সুযোগ ও সুবিধা পান নাই। কারণ সমাজে যাহারা আবর্জ্জনা বলিয়া পরিত্যক্ত এবং দুর্নীতি ও দুর্গতির অন্ধকারে নিত্য নিমজ্জিত, তাহাদের সেই শ্রীহীন লাঞ্ছিত জীবনকে কবি-প্রতিভার অমৃতালোকে উদ্ভাসিত ও শ্রীসম্পন্ন করিয়া তাহাদের ভিতর পবিত্রতা ও মহনীয়তার অরুণালোকে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিতেই তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সাধনা নিয়োজিত হইয়াছে। তাঁহার 'The Lower Depths নাট্যগ্রন্থে এই কথা কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন নাট্য-নায়ক-দিগের মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি লাইন হইতেই বুঝিতে পারিব :—

Luka—Yes, yes my friend, when I look around me...This life here... ah !

Bubnoff (a cap-maker)—The life... why, this life here would make any man howl, like a starving owl......

Luka—And you are still a man. No matter what somersaults you may turn before us, as a man you were born, and as a man you must die. The more I look around me, the more interesting he grows ; the more I contemplate mankind ......poorer and poorer he sinks and higher and higher his aspirations mount.

ইহা ছাড়া 'Orloff,' 'Konovaloff' প্রভৃতি বহু চরিত্রেই তাঁহার অন্তরের সেই একই কথা নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে; তাহার সকলগুলির আলোচনায় এখানে স্থানও নাই সম্ভবও নহে।

(১১)

এইরূপে উপন্যাস স্বজনে অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়া গর্কি নাট্য-সাহিত্য স্বজনে হস্তক্ষেপ করিলেন। নাট্য-সাহিত্য রচনায় তাঁহার প্রথম চেষ্টা "The Small Bourgeois" গ্রন্থে। ১৯০২ সালে যখন প্রথম এই গ্রন্থ খানি সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তখন ইহা এমন নিবিড় ভাবে রুষিয়ার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ও মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, যদিও ইহার আখ্যান বিষয় পূর্ব্বেই টুর্গেনেফ তাঁহার "Fathers and Sons" গ্রন্থে সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তথাপি গর্কির 'Mestchan' তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। তাহার একমাত্র কারণ, গর্কির রচিত চরিত্রগুলি এমন দরদ ও সহানুভূতির রসে সঞ্জীবিত যে, তাহা মানবের প্রাণকে সহজেই আকৃষ্ট ও দ্রবীভূত করিয়া ফেলে। তারপর একে একে তাঁহার Children of the Sun ; The Sung Citizen, A Night's Lodging প্রভৃতি নাট্য গ্রন্থ সকল

প্রকাশিত হইয়া বিশ্ব-সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে।

(১৩)

অনেকে বলিয়া থাকেন, গর্কির লেখা কথা-সাহিত্য হিসাবে খুব উচ্চস্থানীয় নহে, কারণ তাহাতে বর্ত্তমান যুগের অপূর্ব্ব সম্পদ ও সর্ব্বসাধারণের আদরের সামগ্রী উপন্যাসের বিশ্লেষণাত্মক দার্শনিকতা, শিক্ষণীয়তা এবং অতীন্দ্রিয় রাজ্যের রহস্যোদ্ঘাটন-চেষ্টা অতি বিরল। তাঁহাদের একথায় একেবারে সত্য নাই তাহা বলিতে পারি না; তবে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গর্কির লেখার আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে জানিতে হইবে এবং তাঁহার জীবন-ধারাও সম্যক্ ভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে—নতুবা তাঁহার সাহিত্য আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। কারণ শুদ্ধ কবি-প্রতিভার প্রেরণা বা কল্পনাপ্রিয়তাই তাঁহার সাহিত্য-সৃজনের নিয়ামক নহে। তিনি ঋষি, তিনি দ্রষ্টা, তিনি মুক্ত-প্রাণ, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বীর-সাধক। তিনি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, নিজের জীবনের ভিতর দিয়া যাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন, মানব সমাজের অন্তরে পরিপ্রেক্ষণের আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে নিমজ্জিত হইয়া তিনি যে সত্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এবং তাঁহার প্রকৃতিদত্ত সৃজনী-শক্তি ও প্রতিভার স্বর্ণালোকে রাঙিয়া আপনা হইতেই সেগুলি সাহিত্যরূপ গ্রহণ করিয়াছে। কাযেই তাঁহার লেখা হইতে আমরা দার্শনিকতা বা নীতি-শিক্ষার প্রচুরতা আশা করিতে পারি না। তিনি যাহা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের উদ্দেশ্য ও মূলসুর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া, জগতে যে মঙ্গলবার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন তাহা হইতেছে বিশ্বমানবের কল্যাণবার্ত্তা ও দলিত মানবের পরিত্রাণের অভয় বাণী। তিনি বিশ্ব-জনকে দেখাইয়াছেন যে, সমাজ ও লোকাচারের ঘৃণা-নির্য্যাতনের জগদ্দল-পাথর বুকে করিয়া কত কোটি কোটি নর-নারী অন্ধকারের পাতালপুরে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর মানুষ তাহাদেরই বুকের উপর দাঁড়াইয়া আভিজাত্য, ধন-গৌরব ও নিষ্ঠুর সভ্যতার পাষাণ-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া কেবলই মনুষ্যত্বের গ্লানি ও অবমাননা বাড়াইয়া তুলিতেছে। তাঁহার সাধনাই হইতেছে এই নিমজ্জিত মানব-সন্তানের সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়া তাহাদিগকে নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং তাহাদিগকে অবগত করানো যে তাহারাও অমৃতের সন্তান; সমাজ-পরিত্যক্ত, অস্পৃশ্য, শ্রীভ্রষ্ট নর-নারী হইলেও তাহারা মানুষ; মানুষের অন্তর-রাজ্যের ভিতরে সত্য-শিব-সুন্দরের যে আনন্দ-রাজ্য রহিয়াছে, যে অমৃতলোক ও রস-লোক রহিয়াছে তাহারাও তাহার সমান অধিকারী। তাঁহার গ্রন্থসমূহের চরিত্রাবলী ও নাট্য-নায়কগণ মনুষ্য-সমাজে যাহারা কাঙ্গাল ভিক্ষুক অস্পৃশ্য ও পতিত বলিয়া নির্য্যাতিত, যাহারা নেহাইত অসহায়, দুর্ব্বল, দুঃস্থ, চোর, মাতাল, বলিয়া লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত, অথচ যাহারা এই বিশ্ব-সভ্যতাকে বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহাদেরই ভিতর হইতেই সংগৃহীত। এই হতভাগ্য মানব-সন্তানগণের ভিতর মনুষত্ব বোধের প্রাণ-স্পন্দন এবং আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন করাই তাঁহার সাহিত্য-সেবা। এবং গর্কির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সাহিত্য সৃজনের মূল্য উদ্দেশ্যও তাহাই। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—"The object of literature is to aid man to understand himself, rouse in him faith in him, to kindle the soul in his existence by infusing into it the holy Spirit of beauty... to reveal to mankind the beauty that lurks within the heart of the Submerged of humanity."

(১৪)

গর্কির জীবন যেমন মানব প্রকৃতির একটি নগ্নচিত্র, গর্কিসাহিত্যও তেমনি রুষীয় সমাজ ও জীবনের একটি নিরাভরণ প্রতিকৃতি। তাঁহার মর্ম্মতুলিকায় অন্তরের বর্ণ ও আলোক সম্পাতে রুষীয় সমাজের জীবন নাট্যলীলা তাহার বহুযুগ সঞ্চিত কুসংস্কার-জাল ছিন্ন করিয়া এরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহার গ্রন্থগুলি

পাঠ করিলে একটা অব্যক্ত দরদ ও নিবিড় বেদনায় মানুষকে পীড়িত করিয়ার মর্ম্মস্থানে টানিয়া লইয়া যায়। হেনরিক ইব্‌সেন, মেতরলিঙ্ক, বার্নার্ড শ, হফ্‌টম্যান প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের নব্য সাহিত্যিকগণের রচনায়ও অবশ্য দেখা যায়, তাঁহারাও সকলেই সাহিত্য সৃজনের চিরাচরিত প্রথা সমূহ (conventions) অতিক্রম করিয়া মানব সমাজের যুগসঞ্চিত সংস্কারের দৃঢ় আবরণগুলি একটি একটি করিয়া উত্তোলন করিয়া তাহার মর্ম্মস্থানে পৌঁছাইয়া ভিতরের ভাবরাশির লীলা ভঙ্গিকে রূপ দান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনা ভাষার মাধুর্য্যে ও অসাধারণ কলাসৌষ্ঠবে এবং ছন্দের তরঙ্গ হিল্লোলে অতুলনীয় হইলেও, গর্কির রচনা যেমন মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা, ও অসহায় আর্ত্তজনের তপ্তশ্বাস বক্ষে ধারণ করিয়া স্বর্গীয় সরলতা ও গরিমায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের লেখা তেমন হয় নাই। তাঁহাদের সকলেরই রচনা ও বর্ণন-ভঙ্গিতে যেন একটা নিত্য সচেতন, নিত্য সজাগ ভাব, এবং একটা মৌলিক সৃষ্টিগৌরব পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে, যাহা সাহিত্যরস-পিপাসুর তন্ময় প্রাণকে মাঝে মাঝে একটা অস্বস্তিতে চঞ্চল করিয়া তুলে; কিন্তু গর্কির সাহিত্য রচনা প্রধানতঃ বস্তুগত হইলেও তাহাতে এমন একটা আত্মভোলা ভাব, এমন একটা দরদপূর্ণ আন্তরিকতা, এমন একটা নিরাভরণ সরল মাধুর্য্য আছে যে, তাহা হইতে আর্ত্ত মানব সন্তানের বেদনা বিধুর হৃদয়ের রুদ্ধশ্বাস ব্যাকুল সমুদ্রের কলক্রন্দনাভিঘাতের মত অন্তরে আসিয়া আঘাত করে। বিধাতার নিষ্ঠুর বিধানে নিপীড়িত, দুর্গতি ও অসহায়তার অতলস্পর্শ গহ্বর হইতে এই বিরাট মানব পরিবারের ক্লিষ্ট বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া যে আর্ত্তস্বর নিয়ত উত্থিত হইয়া সমগ্র ধরিত্রীর আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাঁহার রচিত সাহিত্যে আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তাঁহার "The Birth of a Man," "Outcasts," "The Lower Depths" প্রভৃতি গ্রন্থের দুই একটি কথা পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিলেই তাঁহারা ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। The Birth of a Man গ্রন্থের একস্থানে গর্কি সেই অসহায় নির্য্যাতিত পথিকদিগের মুখ দিয়া বলাইতেছেন;—

"What a country !"

"Aye, that it is !—a country to make one sweat !"

"As hard as a stone it is !"

"Aye, an evil country !"

আবার The Outcasts এ একস্থানে দেখিতে পাই, "I have come from below, from the nethermost ground of life, where is naught but sludge and murk…I am the truthful voice of life, the harsh cry of those who still abide down there, and who have let me come up to bear witness to their suffering."

কি দরদ, কি মমতা উছলিয়া উঠিয়াছে তাঁহার এই রচনায়! সত্যই, ভাবিলে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে মাথা নুইয়া আসে। তাঁহাকে শুদ্ধ ঔপন্যাসিক বা লেখক মাত্র বলিয়া মন তৃপ্তিলাভ করে না—বলিতে ইচ্ছা করে, ধন্য সে দেশ যে দেশ তাঁহার মত বীর সাধক, ঋষিকবি, দেশপ্রাণ মহাত্মাকে সন্তানরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছে; আর ধন্য সে জাতি, যাহারা তাঁহাকে আপনার বলিবার গৌরব লাভ করিয়াছে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

শাপে বর

(গল্প)

হরেন্দ্র দত্ত কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ছাত্রসমাজে ও বন্ধুমহলে "হরেন বাবু" নামেই অভিহিত। তিনি সদ্য বিবাহিত যুবক; বয়স ২১।২২ বৎসর; সুতরাং বেশ একটু সৌখীনতা আছে। খুব ফিট্‌ফাটে থাকেন, চোখে চশমা পরেন, দু'বেলা সাবান মাখেন, দৈনিক ক্ষৌরকার্য্য করেন, আর কম পক্ষে দিনের মধ্যে ১৫।২০ বার সিঁথি কাটেন; সুদৃশ্য কৌটায় স্থিত এক আধ টিপ্‌ নস্যেরও সদ্ব্যবহার করেন। নববিবাহের প্রথম উচ্ছ্বাসে তিনি বিভোর; নববিবাহিতা স্ত্রীর প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরে না। স্ত্রীর মধুর প্রেমলিপি পাইলে, তিনি যেন হাতে স্বর্গের চাঁদ পান, এবং বন্ধুদিগের প্রায়ই সকলকে সে সুসংবাদ দিতে বিলম্ব করেন না। সেদিন বিশ্বসংসার তাঁহার ভাবের তরঙ্গে কোথায় যে নিমগ্ন হয়, তাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেদিন তাঁহার কলেজের নীরস পাঠ্য পুস্তকগুলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অনাথ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করে।

এরূপ ভাবুক কবিপ্রাণ হরেন বাবুর আন্তরিক প্রবল ইচ্ছা যে কেবলমাত্র পাঁচ ছয় মাইল দূরে অবস্থিত শ্বশুরবাড়ী যাইয়া, নববিবাহিতা হৃদয়-তোষিণী স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া প্রাণের সব খেদ, সব আবেগ দূর করিয়া আসেন। কিন্তু একে "জামাই বাবু"; তার উপরে আবার পূর্ব্বে "নূতন" উপসর্গ যুক্ত থাকায়, শ্বশুর শাশুড়ীর বিনা আহ্বান-পত্রে তথায় কিরূপে যান্? লোকের পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ্‌ থাকলে যেরূপ অবস্থা হয়, হরেন বাবুরও সেইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। এরূপ বিপদে তিনি বন্ধুবর্গের উপদেশ চাহিলেন, কিন্তু তাহারাও তাঁহার সহিত একমত হইলেন। সুতরাং তিনি শ্বশুর শাশুড়ীর আহ্বান-পত্রের আশায় কোনরূপে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন।

২

সেদিন শনিবার। কলেজের তর্কসভার দিন। হরেন বাবু তর্কসভার সম্পাদক। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কলেজে থাকিতে হইল। ছাত্রদিগের মধ্যেও অনেকেই থাকিল। অবশিষ্ট ছাত্রগণ তর্ক-সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রিন্সিপ্যালের কড়া নোটিশ সত্বেও আস্তে আস্তে পশ্চাদ্‌ভাগ প্রদর্শন করিল। সেদিনকার তর্কসভার নির্দ্ধারিত বিষয় ছিল—"সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা।" অনেক বাদানুবাদের পরে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, চলিত ভাষাই আধুনিক সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত; কেন না, চলিত ভাষায় যেরূপ ভাবের প্রকাশ হয়, সন্ধি সমাসযুক্ত সাধুভাষায় সেরূপ হয় না। বরং সন্ধি ও সমাসের শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কল্পনা দেবীর প্রাণান্ত উপস্থিত হয়। চলিত ভাষায় ভাব সত্বরই ফুটিয়া উঠে, কিন্তু ভাবের অনুরূপ সাধুভাষা খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই আয়াস-সাধ্য। সুতরাং চলিত ভাষার প্রয়োগই প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত হইল।

তর্কসভার পরে অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত হরেন বাবুও হষ্টেলে প্রত্যাগত হইয়া, সেখানে একখানা গোরুর গাড়ী দেখিতে পাইলেন। গাড়োয়ানকে "কোথা-কার গাড়ী" জিজ্ঞাসা করায় সে প্রত্যুত্তরে জানাইল যে হরিপুরের গাড়ী। 'হরিপুর' নাম শুনিয়া হরেন বাবুর মনটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কার কাছে এসেছ?" গাড়োয়ান বলিল, "হরেন বাবুর কাছে; তেনার শ্বশুর বাড়ী থেকে খৎ নিয়ে এসেছি।" হরেন বাবুর কৌতূহল শতগুণ বর্দ্ধিত হইল।

হঠাৎ শ্বশুর বাড়ীর পত্র! এর মানে কি? কাহারও, বিশেষতঃ তাঁর স্ত্রীর কোনও বিপদ আপদ্ হইয়াছে কি? "আমিই হরেন বাবু" এই বলিয়া গাড়োয়ানের নিকট হইতে পত্র গ্রহণ করিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিলেন—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

হরিপুর
১৫ই ভাদ্র।
১৩২৭ সাল।

"দীর্ঘজীবেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ

বাবাজীবন,

এই পত্র ও গাড়ী পাঠাই। কাল্ রবিবার, কলেজ ছুটী, যদি একবার এ বাটী আইস, তাহা হইলে আমরা সকলে অত্যন্ত সুখী হই। আশা করি, আসিতে অন্য মত করিবে না। এ বাটীর মঙ্গল। তোমার কুশল প্রার্থনীয়। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। সাক্ষাতে সমস্ত বলিব। ইতি।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।"

এ যে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী যাইবার নিমন্ত্রণ পত্র! পত্র পাইয়া তাঁহার প্রাণে এক বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবাহিত হইল। তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত চলিতে লাগিল। তিনি এই পত্রের আশায় মনে যে গুরু আবেগ বহন করিতেছিলেন, আজ তাহার লাঘব হইল। তাঁহার ব্যাকুল চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইল। তাঁহার যে হৃদয়তন্ত্রী-গুলি এতদিন বেসুরে বাজিতেছিল, এখন তাহারা মৃদু সুতানে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

হরেন বাবু গাড়োয়ানকে কিছু না বলিয়া, হষ্টেলের ভিতরে গিয়া বন্ধুদিগকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিল, এবং হরেন বাবুকে এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইতে নিষেধ করিয়া অনতিবিলম্বে 'শ্রীহরি' বলিয়া শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী যাইতে উপদেশ দিল। হরেন বাবু আপত্তি করিলেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট কিরূপে "অনুমতি" লওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, গুম্ফশ্মশ্রু শোভিত হরকালী বাবু ওরফে হরদা' বলিলেন, "সে বিষয়ে কোনও চিন্তা নেই। সে ভার আমি নিলাম্; সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খোঁজ করলে আমি জবাবদিহি করবো।"

তারপর বন্ধুগণ হরেন বাবুকে নবজামাতৃবেশে সুসজ্জিত করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে গেলেন। প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন—"ওহে রাধাপদ বাবু, যে গাড়ী খানা চড়ে আমরা হরেন বাবুর বিয়ে দিতে গিয়েছিলাম্, এ যে দেখ্‌ছি সেই গাড়ী খানা। এই সাদা গোরুটা হোঁচট্ খেয়ে রাস্তার উপরে পড়ে গিয়েছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বন্ধুরা "শ্রীহরি" "শ্রীহরি" বলিয়া হরেন বাবুকে বিদায় দিলে, গাড়ী ঘড় ঘড় শব্দে মৃদু মন্থর গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল।

হরেন বাবুর শ্বশুরালয় এক পল্লীগ্রামে। তিনি বিবাহের পূর্ব্ব চিরদিনই পল্লীবালার বিরোধী ছিলেন, এবং মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন যে বরং আজীবন অবিবাহিত থাকিবেন, কিন্তু তথাপি অমার্জ্জিত রীতি-নীতি যুক্তা পল্লীবালার সহিত বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিজের জীবনকে চিরদিনের জন্য নষ্ট করিবেন না। কিন্তু হায়! মানুষ ভাবে এক, আর হয় অন্যরূপ। নিষ্ঠুর প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ অনুসারে তাঁহার অদৃষ্টে এক পল্লীবালাই বধূরূপে জুটিয়াছিল। কিন্তু নববিবাহের প্রভাবে তাঁহার পল্লীবালা সম্বন্ধে কুসংস্কার এখন দূর হইয়াছিল। তাই, আজ, স্ত্রীর সহিত মিলনের এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই প্রবল পিপাসা।

৪

হরেন বাবুর শ্বশুরবাড়ী পল্লীগ্রামে হওয়ায়, তথায় যাইতে কোনও পাকা রাস্তা নাই। মেঠো রাস্তা

বাহিয়া যাইতে হয়। সেই জন্ত গোরুর গাড়ী ভিন্ন অন্ত সকল প্রকার যানের গতি অবরুদ্ধ।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। শরতের শ্যামল ধান্তক্ষেত্রের উপর অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইয়া এক তরল রক্তিম বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছিল। কৃষকগণ নগ্নগাত্রে অলস মন্থর গতিতে গৃহে ফিরিতেছিল; পক্ষিকুল কুলায়ে প্রত্যাগমন কালে সুমধুর তানে সান্ধ্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিশ্বজগৎকে আনন্দের স্রোতে ভাসাইতেছিল। গ্রাম্য রমণীগণ জলপূর্ণ কলসী কক্ষে ধীর পদক্ষেপে গৃহে ফিরিতেছিল। পথের এই সব দৃশ্য ও সঙ্গীত হরেন বাবুর চক্ষুকর্ণের সুখ সম্পাদন করিতে লাগিল।

হরেন বাবু শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শরতের চন্দ্র স্নিগ্ধ তরল কিরণে ধরণীবক্ষ প্লাবিত করিলেন। এই মনোরম দৃশ্যে তাঁহার কবি প্রাণের ভাবগুলি মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। তিনি কল্পনানেত্রে প্রিয়ার সরস-মধুর মুখখানি দেখিতে লাগিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, আজ তিনি এ চাঁদিমা রজনী বৃথা যাইতে দিবেন না; তিনি আজ মধুর প্রেমালাপে প্রাণপ্রিয়ার সহিত সারা রাত্রি জাগিয়া প্রাণের সব দুঃখ, সব খেদ, সব হাহারব দূর করিবেন।

৫

প্রহর দেড়েক রাত্রির সময় গাড়ী হরিপুর গ্রামের আসিয়া পড়িল। তখন রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের কয়েকজন নিকর্ম্মা যুবক "ছ' তিন নয়" "কচে বারো" শব্দে চণ্ডীমণ্ডপ মুখরিত করিতেছিল। কেহ কেহ বা প্রতিবেশী কাহারও কুৎসা রটনা করিয়া তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে নরকস্থ করিতেছিল। গাড়োয়ান গাড়ী হইতে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া একটান্ তামাক খাইয়া আসিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। হরেন বাবু তখন, তাঁহার, আগমনে স্ত্রী কিরূপ সুখী হইবেন, এই গভীর চিন্তায় মগ্ন। গাড়ী হরেন বাবুর শ্বশুরবাড়ীর দরজার নিকটে আসিলে গাড়োয়ান উচ্চস্বরে জানাইল যে, কৃষ্ণনগর থেকে জামাই বাবু এসেছেন।

জামাই বাবুর আগমন সংবাদে বাড়ী মধ্যে একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া গেল। একজন দরজা খুলিয়া জামাই বাবুকে সাদরে সস্নেহ বচনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন।

হরেন বাবু যথাযোগ্য প্রণামাদি সমাধা করিলেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া, হরেন বাবু সস্ত্রীক শয়ন করিলেন। শুইবার পর বলিলেন, "কি? ভাল ছিলে ত?" তাঁহার স্ত্রী সলজ্জ ভাবে বলিলেন, "যেমন দেখছ। খুব যাহোক মনে ক'রে দেখা দিতে এসেছ! এখন ২।১ দিন কলেজ ছুটী না কি?" হরেন বাবু বলিলেন, "না ছুটী নয়। কাল্ কেবল রবিবারের ছুটী। পরশু আবার কলেজ আছে।" তাঁর স্ত্রী অভিমানভরে বলিলেন, "এমন এক দিনের জন্ত না এলেই ত হ'ত।"

হরেন বাবু বলিলেন "কি আর করি? যেমন এঁদের আমাকে আন্‌বার চাড়! দেখে শুনে যে এঁরা আমাকে আন্‌বার জন্তে আজকেই গাড়ী পাঠিয়েছিলেন।" স্ত্রী অবাক হইয়া বলিলেন, "কি? কে গাড়ী পাঠিয়েছিল? কৈ আমরা ত তোমার আসার সম্বন্ধে কিছু জানতাম্ না।" হরেন বাবু মনে করিলেন যে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহিত তামাসা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "বটে! কিছু জান না বুঝি? একেবারে যে আকাশ থেকে পড়লে! শ্বশুর মশায় যে গাড়ী পাঠিয়েছিলেন, এখন আবার তামাসা করা হচ্ছে। তিনি না পাঠালে কি গাড়ী আমার কাছে উড়ে গিয়েছিল? শুধু গাড়ী নয়, সঙ্গে চিঠিও গিয়েছিল। এই স্থাখ!" বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, কোটের পকেট হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া স্ত্রীর হাতে দিলেন।

তিনি উহা পাঠ করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। মনে মনে একটু হাসিয়া মুখে বলিলেন,

"তোমার দিব্বি, আমরা গাড়ী পাঠাই নি। তা ছাড়া, এ হাতের লেখাও আমার বাবার নয়। নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে কেউ তামাসা করেছে।"

হরেন বাবু ত হতভম্ব! কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "এ তবে হষ্টেলের বন্ধুদের কায!"

তাঁহার স্ত্রী মনে মনে বন্ধুদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা' যা' হো'ক, এ শাপে বর হল। বন্ধুরা এভাবে আমাকে না পাঠালে আমার এখানে আসা হ'ত না। এখন দেখছি বন্ধুরা ভালই করেছে।"—এই বলিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর সুন্দর অধরে সাদর চুম্বন দিলেন।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

শান্তিজল (উপন্যাস)

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা মজুমদার প্রেসে মুদ্রিত এবং ৮নং রাধামাধব লেন "শরৎ সাহিত্যকুঞ্জ" হইতে শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৫০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৲

দেবব্রত ও সুধাব্রত দুই ভাই। সুহাসিনী দেবব্রতের স্ত্রী। মহালক্ষ্মী বিমাতা হইলেও, দেবব্রতকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। এবং দেবব্রত বৈমাত্রেয় ভাই হইলেও সুধাকে সহোদরাধিক স্নেহ করেন। উত্তম কথা। কিন্তু এই স্নেহের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া লেখক এমন বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, এমন সব ঘটনা ও কথাবার্ত্তার অবতারণা করিয়াছেন যে ব্যাপারটা অসহ্য ন্যাকামিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। লেখক দেবতা গড়িতে গিয়া, গড়িয়া বসিয়াছেন সঙ। পাত্রপাত্রীগণ ভদ্রবংশ সম্ভূত, গ্রামের জমিদার, অথচ তাহাদের কথাবার্ত্তাগুলি স্থানে স্থানে ইতরের মত হইয়া পড়িয়াছে। আখ্যানবস্তুও নিতান্ত খেলো রকমের।

একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। এই গ্রন্থকার, "বিন্দুর ছেলে," "দেবদাস," "চরিত্রহীন" প্রভৃতি প্রণেতা প্রথিতযশা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নহেন, ইনি ভিন্ন ব্যক্তি। বৎসর দুই হইবে ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। ইনি চট্টোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মা বাপে ইঁহার নাম শরৎচন্দ্র রাখিয়াছিলেন, সুতরাং উপন্যাস লিখিয়া তাহার মলাটে ঐ নাম মুদ্রিত করা সম্বন্ধে ইঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইনি সাহিত্যের আসরে নামিবার বহু পূর্ব্বেই যখন অন্য এক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস লিখিয়া সেই আসর জমকাইয়া বসিয়াছিলেন, তখন নবীন গ্রন্থকার নিজ নামের পরিবর্ত্তে একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করিলেই তাঁহার সাধুতা ও সদ্বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাইত। এই নূতন শরৎবাবু, পুরাতন শরৎ বাবুর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির মুদ্রাদোষগুলি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহার গুণগুলির ত্রিসীমানার কাছ দিয়াও যাইতে পারেন নাই।

সৌন্দরনন্দ কাব্য

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ-বি-এল কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত। কটন প্রেসে মুদ্রিত, এবং মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬পেজি ১৮২+১৪ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ১৲

ইহা অশ্বঘোষ বিরচিত ঐ নামের মহাযান বৌদ্ধকাব্যের অনুবাদ। প্রথম সংস্করণ সমালোচনাকালে (ফাল্গুন ১৩২৯) আমরা এই বঙ্গানুবাদ খানির গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহার পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র।

চীন সভ্যতার অ আ ক খ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত। কলিকাতা হেয়ার প্রেসে মুদ্রিত, এবং ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, বেঙ্গল বুক কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬পেজি ২৪১ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

গ্রন্থের নামকরণ আমাদের নিকট একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। অ আ ক খ—ইহা ইংরাজি "A B C of—"এর দুষ্পাচ্য অনুবাদ। ইহা সেকালের বিলাত-ফেরৎ সন্তানের "ঠাকুমা মারা গিয়েছেন", "দিদি পিয়ানো খেলছেন", "তাঁকে ডিনারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে" গোছের বাঙ্গলা। কিন্তু "নামেতে কি যায় আসে?" এই বইখানির বর্ণিত বিষয়গুলি অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। লেখক সুপণ্ডিত ব্যক্তি, সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া চীনদেশের বহুবিধ ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ

করিলে অ আ ক খ অপেক্ষা অনেক বেশী জানিতে পারা যায়।

চরিত্র চিত্র

শ্রীমতী সুনীতিবালা চন্দ বি-এ ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-টি প্রণীত। কলিকাতা মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ১নং কলেজ স্কোয়ার, মেসার্স চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যখন সমস্ত 'বসুধাই' আমাদের কুটুম্ব স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন শুধু নিজ দেশীয় মহাত্মাদের জীবনের আলোচনাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে না, বিদেশীয় মহাত্মাদের জীবনবৃত্তের সহিত পরিচিত হওয়ারও একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। আলোচ্য চরিত্র-চিত্র পুস্তক খানির সাহায্যে আমাদের সে প্রয়োজন অনেকটা সুসিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাতে রাজা রামমোহন বিদ্যাসাগর, গোখলে এবং ডেভিড হেয়ার, হাওয়ার্ড, ও বায়রন, নাইটিংগেল, ডাক্তার মণ্টেসরী, পুশীকুট জনসন প্রভৃতি স্বদেশের ও বিদেশের পনেরটি জীবনচরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। যদিও ইঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় স্থান এ গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে হয় নাই, তথাপি রচনাগুণে প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভাষা অনাড়ম্বর ও সংযত।

বিদ্যার জাহাজ

ইংরেজী আমি শিখিনি বলিয়া জানি না কি কিছু আর?
বাংলা এবং সমোসকৃততে আছে মোর অধিকার।
কবিদের সেরা কালিদাস কবি,
পড়িয়া ফেলেছি তার পুঁথি সবি,
'বেণী সম্ভব', 'রঘুসংহার', 'মেঘদূত বধ' আর।
'মায়রাক্ষস' নাটক লিখেছে 'ভবরুচি' কবি আহা!
'ভাষ্য'সমেত পড়িয়া ফেলেছি কতবার আমি তাহা।
সাংখ্যের স্মৃতি, পাণিনির গীতা,
মনুসংহিতা, হনুসংহিতা,
দশম অঙ্ক 'মদ্ভাগবত' নিঙাড়ি নিয়েছি সার।
পনের কাণ্ড মহাভারত যে লিখে গেছে বাল্মীকি,
বিংশ পর্ব্ব ব্যাস রামায়ণ, তাও আর পড়িনি কি?
লোচনদাসের 'কবিকঙ্কণ',
রামপ্রসাদের 'মানভঞ্জন'
চণ্ডীদাসের 'চণ্ডীর গান' পড়িয়াছি কতবার।
বিদ্যাপতির বিদ্যার রূপ-বর্ণন বলিহারি!
গোবিন্দদাস 'গীত গোবিন্দে' চটক দিয়েছে ভারি।
নীলদর্পণ লিখে মাইকেল
ছয়টি বছর খেটে গেল জেল,
আছে মুখস্থ হেম বন্দ্যোর 'অন্নদ রায়বার'।
গিরীশ বোসের 'বিষবৃক্ষ' ও অমৃতের 'বলিদান',
পড়েছি পড়েছি ডিয়েল রায়ের 'পলাশীযুদ্ধ'খান
বঙ্কিম কৃত 'মেবারপতন,'
'গোলে বকাবলি', 'মনের মতন,'
নবীন সেনের 'চন্দ্রশেখর' 'মৃণালিনী' 'সংসার'।
নিধুর পাঁচালি দাশুরই মতন—খুড়োর ভাইপো বটে!
হরু ঠাকুরের বিদ্যে কি আছে র ব ঠাকুরের ঘটে?
তবু এক তার 'বিবিচোর' ছাড়া
আর সব বই করিয়াছি সারা,—
'মেয়ে বোম্বেটে' 'প্রেম খুন' আর 'মায়াবিনী' 'একাকার।'

শ্রীকালিদাস রায়।

১৫শ বর্ষ, ১ম খণ্ড সমাপ্ত

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

বর্ত্তমান সংখ্যার সহিত আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ছয় মাস পূর্ণ হইল। ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণ দয়া করিয়া বাকি ছয় মাসের মূল্য ২।০ মনি অর্ডারে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। নচেৎ ভাদ্র সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভি পিতে পাঠাইব, উহা যেন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা ২৷৵৹ দিয়া গ্রহণ করেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "মানসী ও মর্ম্মবাণী" ২৩ বি বেথুন রো, কলিকাতা।

কলিকাতা